ভ্রমণকাহিনী সমগ্র

নবপত্র প্রকাশন / কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম নবপত্র-প্রকাশ ঃ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক ঃ আশীষ কোঙার
শ্রীগুরু প্রিণ্টার্স
৯এ রায় বাগান স্ট্রীট / কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

পথে প্রবাসে

ভূমিকা

আমি যখন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম 'পথে প্রবাসে' পড়ি, তখন আমি সত্য-সত্যই চমকে উঠেছিলুম। কলম ধরেই এমন পাকা লেখা লিখতে হাজারে একজনও পারেন না। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্করের লেখা পড়লেই মনে হয় যে, তাঁর মনের কথা মন থেকে কলমের মুখে অবলীলাক্রমে চলে এসেছে। এ গদ্যের কোথাও জড়তা নেই এবং এর গতি সম্পূর্ণ বাধামুক্ত। আমরা যারা বাঙলা ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করি, আমরা জানি যে, ভাষাকে যুগপৎ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ করা কতদূর আয়াসসাধ্য। সুতরাং এই নবীন লেখকের সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত স্বপ্রকাশ ভাষার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন যে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম, তাতে আর আশ্চর্য কি?

এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই সমান সজাগ, আর তাঁর চোখে ও মনে যখন যা ধরা পড়ে তখনই তা ভাষাতেও ধরা পড়ে। আমি আগেই বলেছি যে, এই নবীন লেখকের ইন্দ্রিয় ও মন দুই খোলা, আর প্রবাসে গিয়ে তাঁর চোখ কান মন আরও বেশ খুলে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন—'আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।' তিনি যে চোখ বুঁজে পৃথিবী ভ্রমণ করেননি, তার প্রমাণ 'পথে প্রবাসে'র পাতায় পাতায় আছে। আমরা, অর্থাৎ এ যুগের ভারতবাসীরা অর্ধসুপ্ত জাত, আমরা এই বিচিত্র পৃথিবীতে আসি, আর কিছুদিন থেকে চলে যাই। মাঝামাঝি সময়টা একরকম ধ্যানস্তিমিত লোচনেই কাটাই। এর কারণ নাকি আমাদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য। আমাদের এই মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন :

'চুপ ক'রে ঘরে ব'সে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ক'রে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দু'টি চক্ষু বিদ্ধ ক'রে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো'—কিন্তু এ ভালো তিনি চাননি, কারণ তিনি বৈরাগ্যবিলাসী নন। এর ফলে তাঁর 'পথে প্রবাসে'র মধ্যে থেকে, 'মানবমানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গির সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ' পাঠকের চোখের সুমুখে আবির্ভূত হয়েছে।

শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন যে—'নতুন দেশে এলে কেবল যে সব কটা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তা নয়; সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হয়ে ওঠে, তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট করে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না।'

সমগ্র 'পথে প্রবাসে' এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইউরোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ে লেখকের মন বিশেষ চঞ্চল ও ইন্দ্রিয় পুরোমাত্রায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। এর কারণ, ইউরোপ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন দেশ। আর যিনি কখনো ও-দেশে গিয়েছেন, তাঁরই কাছে এ সত্য ধরা পড়েছে যে, সে দেশটা ঘুমের দেশ নয়, মহাজাগ্রত দেশ। জাগরণ অবশ্য প্রাণের ধর্ম, আর তার বাহ্যলক্ষণ হচ্ছে

দেহ ও মনের সক্রিয়তা। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা দেশের বিষয়ে বলেছেন যে, এ দেশটা স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এক কথায় যদি ইউরোপের বর্ণনা করতে হয় ত বলতে হয় যে, সে দেশটা গতি দিয়ে তৈরি আশা দিয়ে ঘেরা।

প্রথম বয়সে যখন আমাদের ইন্দ্রিয় সব তাজা থাকে, আর যখন মন বাইরের রূপ বাইরের ভাব স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে গ্রহণ করতে পারে, তখন ও-দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে যেটা আমাদের দেশের যুবকরা সব প্রথম মনে ও প্রাণে অনুভব করে, সে হচ্ছে ও-জগতের প্রাণের লীলা। আমি যখন যৌবনে পদার্পণ করে তারপর ইউরোপে পদার্পণ করি, তখন আমারও মন এই বিচিত্র প্রাণের লীলায় সাড়া দেয়। শ্রীমান অন্নদাশঙ্করের এ-কটি কথায় আমাদের সকলেরই মন সায় দেয়, কারণ আমাদের লুপ্তপ্রায় পূর্বস্মৃতি সব আবার স্বরূপে দেখা দেয়—

'ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের এক স্রোতে ভাসা।' আজকালকার ভাষায় যাদের তরুণ বলে, তাদের মন এর প্রতি কথায় সাড়া দেবে। কারণ সে হচ্ছে যথার্থ তরুণ, যার হৃদয়মন সহজে ও স্বচ্ছন্দে যা স্বাভাবিক, তাতে আনন্দ পায়। অর্থাৎ যারা কোন শাস্ত্রের আবরণের ভিতর থেকে দুনিয়াকে দেখে না, সে শাস্ত্র দেশীই হোক আর বিলেতিই হোক; শঙ্করের বেদান্তই হোক আর Karl Marx-এর Das Kapital-ই হোক। শ্রীমান অন্নদাশঙ্কর আমার বিশ্বাস বিলেত নামক দেশটা চোখ চেয়ে দেখেছেন, পুস্তকের পত্র-আবডালের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখেননি। এর ফলে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত যথার্থ সাহিত্য হয়েছে।

'পথে প্রবাসে'র ভূমিকা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লিখতে বসেছি দু-কারণে। বাঙলায় কোন নতুন লেখকের সাক্ষাৎ পেলেই আমি স্বভাবতঃ আনন্দিত হই। বলা বাহুল্য যে যিনি নতুন লিখতে আরম্ভ করেছেন তিনিই নতুন লেখক নন। যিনি প্রথমতঃ লিখতে পারেন, আর দ্বিতীয়তঃ যাঁর লেখার ভিতর নূতনত্ব আছে, অর্থাৎ নিজের মনের বিশেষ প্রকাশ আছে, তিনি যথার্থ নতুন লেখক। 'পথে প্রবাসে'র লেখকের রচনায় এ দুটি গুণই ফুটে উঠেছে। আমরা, যারা সাহিত্যজগতে এখন পেনসন-প্রার্থী—আমরা যে নতুন লেখকদেরও যথার্থ গুণগ্রাহী, এ কথাটা পাঠকসমাজকে জানাতে পারলে আমরা আত্মতুষ্টি লাভ করি।

দ্বিতীয়তঃ, আমি সত্য সত্যই চাই যে, বাঙলার পাঠকসমাজে এ বইখানির প্রচার ও আদর হয়। এ ভ্রমণবৃত্তান্ত যে একখানি যথার্থ সাহিত্যগ্রন্থ এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যরসের রসিক মাত্রেই আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। তবে আমি আশা করি যে, ও রসে বঞ্চিত কোনও প্রবীণ অথবা নবীন পাঠক, পুস্তকখানিকে শাস্ত্র হিসাবে গণ্য করবেন না, কারণ তা করলেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া হবে। পৃথিবীতে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় নানা মত উঠছে ও মিলিয়ে যাচ্ছে। মনোজগতে এই জাতীয় মতামতের উত্থানপতনের ভিতরও অপূর্বতা আছে। কিন্তু এই সব মতামতকেই মহাবস্তু হিসাবে দেখলেই তা সাহিত্যপদভ্রষ্ট হয়ে শাস্ত্র হয়ে পড়ে। মতামতের বিশেষ কোন মূল্য নেই, যদি না সে মতামতের পিছনে একটি বিশেষ মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আর এ লেখকের মতামতের পিছনে যে একটি সজীব মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

পূর্বকথা

আমার পথের আরম্ভ হলো শ্রাবণের এক মধ্যরাত্রে—তিথি মনে নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের আকাশে চাঁদ ছিল না।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ঘুরে ভারতবর্ষের বাইরে আমার পথ—কটক থেকে বম্বে, বম্বে থেকে লণ্ডন। বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে, পূর্বঘাট পর্বতমালার ধারে ধারে, চিল্কাহ্রদের কোল ঘেঁষে, গোদাবরীর বুক চিরে, হায়দরাবাদের তেপান্তরী মাঠ পেরিয়ে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানু জুড়ে আমার পথ—কটক, ওয়ালটেয়ার, বেজওয়াডা, সেকেন্দ্রাবাদ, পুনা, বম্বে।

চিল্কার সঙ্গে এবার আমার দেখা আঁধার রাতের শেষ প্রহরে, সুন্দরী তখন আলোর স্বপ্ন দেখছে, তার দিগন্তজোড়া চোখের পাতায় যোগমায়ার অঞ্জন শ্বেতাভ হয়ে আসছে।

তমালবন দেখতে পেলুম না, কিন্তু চিল্কা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত—হয়তো আরো দক্ষিণেও—তালীবনের অন্ত নেই। পথের একধারে পাহাড়ের পর পাহাড়, কিন্তু সব ক'টাই রুক্ষ, গায়ে তরুলতার শ্যাম প্রলেপ নেই, মাথায় নির্ঝরিণীর সরস স্নেহ নেই। পথের অন্যধারে ক্ষেত—কিন্তু বাংলার মতো তরল হরিৎ নয়।

প্রকৃতির এই বর্ণ-কার্পণ্য মানুষ তার পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্র্য দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছে। বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজতে হয়। মেয়েরা তো রঙিন ছাড়া পরেই না, পুরুষেরাও রঙিন পরে, এমন দেখতে পেলুম। এ দেশে অবরোধপ্রথা নেই, পথে ঘাটে সুবেশা সুকেশীর সাক্ষাৎ মেলে—'সুকেশী', কারণ এ দেশের মেয়েরা মাথায় কাপড় দেয় না, বিধবারা ছাড়া। এ দেশের জীবননাট্যে নারীর ভূমিকা নেপথ্যে নয়। দক্ষিণ ভারত নারীকে তার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত না ক'রে পুরুষকে সহজ হবার সুযোগ দিয়েছে। মুক্ত প্রকৃতির কোলে Wordsworthএর Lucy যেমন ফুলের মতো ফুটেছিল, মুক্ত সমাজের কোলে মানুষও তেমনি মাধবী লতার মতো সুন্দর এবং সহকারের মতো সবল হতে পায়। বদ্ধ সমাজের অর্ধজীবী নারী-নর এহেন সত্য অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু এ দেশের লোককে তর্কের দ্বারা বোঝাতে হবে না যে, মানুষ মানে পুরুষ ও মানুষ মানে নারী। নারীকে নিজের কাছে দুর্লভ ক'রে আমরা উত্তর ভারতের লোক নিজেকে চিনতে ভুলেছি এবং যে আনন্দ আমরা হেলায় হারিয়েছি তার ধারণাও করতে কষ্ট পাচ্ছি। জন্মান্ধের যেমন আলোকবোধ থাকে না আমাদের তেমনি নারী-বোধ নেই, যা আছে তার নাম দিতে পারা যায় 'কামিনী-জননী-বোধ'।

এখন যার নাম হায়দরাবাদের নিজামরাজ্য আগে তার নাম ছিল গোলকোণ্ডা। দেশটি সুদৃশ্য নয়, সুজলা সুফলাও নয়। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি প্রান্তর, কদাচ কোথাও শৈলগুণ্ঠিত, কদাচ কোথাও শস্যচিত্রিত। মাঝে মাঝে দেখা যায়—পাহাড়ের গায়ে দুর্গ। সন্দেহ হয় পাহাড়টাই দুর্গ, না

দুর্গটাই পাহাড়। সমস্ত দেশটাই যেন একটা বিরাট ঘুমন্তপুরী—জনপ্রাণী নেই, গাছপালা নেই, পাখি-পাখাল নেই। তা বলে হায়দরাবাদের লোকসংখ্যা বড় অল্প নয়—প্রায় দেড় কোটি। এর পূর্বভাগে তেলেগুদের বাস, পশ্চিমভাগে মরাঠা ও কানাড়ীদের। আর এ দেশের রাজার জাত মুসলমানেরা। রেলে যাদের দেখলুম তাদের বেশির ভাগ মুসলমান। উর্দুজবান জানা থাকলে ভ্রমণের অসুবিধা নেই।

কানাড়ী মেয়েদের অবরোধ নেই। তারা পুরুষের সঙ্গে পুরুষেরই মতো কঠিন খাটছে, এমন দেখা গেল। পথের ধারে ক্ষেত, কিসের ক্ষেত জানিনে, ধানের নয়, জোয়ারের কিংবা বাজরার কিংবা অন্য কিছুর। ছাব্বিশজন পুরুষের মাঝখানে হয়তো একজন মেয়েও খাটছে, 'লজ্জা সরম' নেই! নারী যে কর্মসহচরীও।

মহারাষ্ট্র পাহাড় পর্বতের দেশ—বহিঃপ্রকৃতি রুদ্র সুন্দর। নরনারীর মুখে চোখে কমনীয়তা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। বেশভূষায় নারী যেন পুরুষের দোসর। মালাবারে যেমন পুরুষেও কাছা দেয় না, মহারাষ্ট্রে তেমনি মেয়েমানুষেও কাছা দেয়। ফলে, পায়ের পশ্চাদ্ভাগ অনাবৃত ও কটু দেখায়। কিন্তু নারীকে যদি পুরুষের মতো স্বচ্ছন্দে চলাফেরা ও ছুটোছুটি করতে হয় তবে এছাড়া উপায়ান্তর নেই। আমেরিকায় কর্মী-মেয়েরা পায়জামা পরে কাজ করে। মরাঠা মেয়েরা কর্মী-প্রকৃতি। তাদের অবরোধ নেই, তরুণীরা পায়ে হেঁটে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, বয়স্কারা attache' case হাতে বাজার করতে বেরিয়েছেন, কত মেয়ে একাকী ট্রামে উঠছে, ট্রেনে বেড়াচ্ছে, ভয়ডর নেই, লজ্জা সঙ্কোচ নেই, পুরুষের সঙ্গে সহজ ব্যবহার। পায়ে বর্মা চটির মতো হালকা খোলা চটি, পরনে নীল বা বেগুনী—একটু গাঢ় রঙের—ঈষৎ কোঁচা কাছা দেওয়া শাড়ি, পিঠের ওপর একরঙা শাড়ির বহুরঙা আঁচল চওড়া করে বিছানো, মাথায় কাপড় নেই, কবরীতে ফুলের পাপড়ি গোঁজা কিংবা ফুলের মালা গোল করে জড়ানো, হৃষ্টপুষ্ট সুবলয়িত দেহাবয়বে অল্প কয়েকখানা অলঙ্কার, প্রশস্ত সুগোল মুখমণ্ডলে সপ্রতিভ পুরুষকারের ব্যঞ্জনা—মহারাষ্ট্রের মেয়েদের দেখে মোটের ওপর মহাসম্ভ্রম জাগে। তন্বী ওদের মধ্যে চোখে পড়ল না। কিন্তু পৃথুলাও চোখে পড়ে না। সুস্থ সবল ও সপ্রতিভ বলে এদের অধিকাংশকেই সুশ্রী দেখায়, কিন্তু 'রমণীয়' দেখায় বললে বোধ হয় বেশি বলা হয়। এদের চালচলনে-চেহারায় পৌরুষের ছায়া পড়েছে বলে এদের নারীত্বের আকর্ষণ কমেছে এমনও বলা যায় না। পুরুষের কাছে নারী যদি কাবুলী পায়জামার ওপরে গেরুয়া আলখাল্লা ও গাড়োয়ানী ফ্যাশানের দশ আনা ছ'আনা চুলের ওপরে চিমনী প্যাটার্নের সিল্ক টুপি পরে, তবু পুরুষের কাছে সে এমনি চিত্তাকর্ষক থাকবে। মরাঠা পুরুষের চোখে মরাঠা মেয়েদের যে অপূর্ব রমণীয় ঠেকে এ তো স্বতঃসিদ্ধ, আমার চোখেও তাদের নারীর মতোই ঠেকেছে। দৃষ্টিকটু বোধ হচ্ছিল কেবল শ্রমিক-শ্রেণীর মেয়েগুলিকে; মালকোচ্চা মারা পালোয়ানদের বুকে একটুকরো জামার উপর ময়লা নীল কাপড় জড়িয়ে বাঁধলে যেমন দেখাত এদেরও অনেকটা তেমনি দেখায়। যেমন এদের ভারবহন ক্ষমতা, তেমনি এদের ছুটে চলার ক্ষিপ্রতা। আমাদের অঞ্চলের পুরুষরা পর্যন্ত এদের তুলনায় কুঁড়ে।

মরাঠা পুরুষদের বাহুবল সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধি আছে সেটা সত্য নয়, অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে। এদের মনের বল কিন্তু অসাধারণ। মুখের ওপর আত্মসম্মানবত্তার এমন সুস্পষ্ট ছাপ অন্য কোনো জাতের মধ্যে লক্ষ্য করিনি। অর্থনৈতিক জীবনযুদ্ধে কিন্তু মরাঠারা গুজরাটীদের কাছে হটতে লেগেছে। বম্বে শহরটার স্থিতি মহারাষ্ট্রেরই জিওগ্রাফীতে বটে, বম্বে শহরের জিওগ্রাফীতে কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্থিতি গলির বস্তিতে আর গুজরাটের স্থিতি শড়কের চারতলায়। বাঙালী বাঘের ঘরে যেমন মাড়োয়ারী ঘোঘের বাসা, মরাঠা বাঘের ঘরে তেমনি গুজরাটী ঘোঘের বাসা। গুজরাটী মানে পারসীও বুঝতে হবে। পারসীদেরও মাতৃভাষা গুজরাটী। ইদানীং অবশ্য ওরা কায়-বাক্যে

ইংরেজ হবার সাধনায় লেগেছে।

গুজরাটী জাতটার প্রতি আমার কেমন এক রকম পক্ষপাত আছে। শুনেছি ওদের সাহিত্য বাংলা সাহিত্যেরই ঠিক নিচে এবং রবিহীন বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষ। গান্ধীর মতো ভাব-শিল্পী যে জাতির মনের স্তন্যে পুষ্ট সে জাতির মনকে বাঙালীমনের অনুজ ভাবা স্বাভাবিক। গুজরাটীরা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশের ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের মনেরও আমদানী করছে এবং বিদেশী মনের সোনার কাঠি আমাদের মতো ওদের সাহিত্যকেও সোনা করে দিচ্ছে। তফাৎ এই যে, আমরা যা বইয়ের মারফৎ পাই ওরা তা সংসর্গের দ্বারা পায়।

গুজরাটী পুরুষরা যে পরম কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ এ তো আমরা দেশে থেকেও জানি, তাদের ব্যবসায়বুদ্ধিও বহুবিদিত। গুজরাটী মেয়েদের মধ্যেও এই সব গুণ আছে কিনা জানি নে। তাদের পর্দা নেই, তবে উত্তর ভারতের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট বলে গতিবিধির স্বাধীনতা মরাঠাদের চেয়ে কিছু কম। গুজরাটী মেয়েদের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য আমাদেরি মেয়েদের মতো; কাপড় পরার ভঙ্গিতে ইতরবিশেষ থাকলেও মোটের ওপর মিল আছে। মরাঠা মেয়েরা সচরাচর যে অন্তর্বাস পরে তার ঝুল বুকের নিচে পর্যন্ত—কোমরের কাছটা অনাবৃত ও শাড়ি দিয়ে ঢাকতে হয়। গুজরাটী মেয়েরা কিন্তু আপাদচুম্বী অন্তর্বাস পরে তার ওপরে শাড়ি পরে। শুনেছি আমাদের মেয়েদের অন্তর্বাস পরা শুরু হয় গুজরাটেরই অনুকরণে ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নীর দ্বারা।

আমাকে সকলের চেয়ে মুগ্ধ করল গুজরাটী মেয়েদের দেহের তনুত্ব ও মুখের সৌকুমার্য। মরাঠাদের সঙ্গে এদের অমিল যেমন স্পষ্ট, বাঙালীদের সঙ্গে এদের মিলও তেমনি স্পষ্ট। তবে বাঙালী মেয়েদের দেহের গড়নের চেয়ে গুজরাটী মেয়েদের দেহের গড়ন অনেক বেশি সুসমঞ্জস; এবং বাঙালী মেয়েদের মুখশ্রীতে যেমন স্নিগ্ধতার মাত্রাধিক্য, গুজরাটী মেয়েদের মুখশ্রীতে তেমন নয়।

পারসীরাই হচ্ছে এ অঞ্চলের Leaders of fashion। তারা কাঞ্চনকুলীন তো বটেই, রীতিরুচিতেও অভিজাত। পারসী মেয়েদের জাঁকালো বেশভূষার সঙ্গে ইঙ্গবঙ্গদের পর্যন্ত তুলনা করা চলে না। অন্ততঃ তিনপ্রস্থ অন্তর্বাস বাইরে থেকে লক্ষ্য করতে পারা যায়; প্রৌঢ়াদেরও শাড়ির বাহার আছে। মরাঠাদের যেমন আঁচলের বাহার পারসীদের তেমনি পাড়ের বাহার। হালকা রঙের আদর এ অঞ্চলে নেই। হাজার হাজার নানা বয়সী মেয়ের মধ্যে মাত্র কয়েকজন কিশোরীকেই হালকা রঙের শাড়ি পরতে দেখলুম। শাদার চল একমাত্র গুজরাটীদের মধ্যেই পরিলক্ষ্য। বলতে ভুলে গেছি গুজরাটী ও পারসীরা মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু ঘোমটার মতো করে নয়, খোঁপার সঙ্গে এঁটে। গহনার বাহুল্য নেই—আমাদের মেয়েদের তুলনায় এরা নিরলঙ্কার। পারসী মেয়েরা ইংরেজী জুতো পায়ে দেয়—গুজরাটী মেয়েরা সচরাচর কোনো জুতোই পায়ে দেয় না—মরাঠা মেয়েরা চটি পরে।

বম্বে শহর কলকাতার চেয়ে আকারে ছোট কিন্তু প্রকারে সুন্দর। প্রায় চারিদিকে সমুদ্র, অদূরে পাহাড়, ভিতরেও 'মালাবার হিল' নামক অনুচ্চ পাহাড়, তার ওপরে বড় বড় লোকের সাজানো হর্ম্য। শহরের রাস্তাগুলি যেন প্ল্যান করে তৈরি। বম্বেবাসীদের রুচির প্রশংসা করতে হয়—টাকা তো কলকাতার মাড়োয়ারীদেরও আছে, কিন্তু তাদের রুচির নিদর্শন তো বড়বাজারের 'ইটের পর ইট'! বম্বের প্রত্যেকখানি বাড়িরই যেন বিশেষত্ব আছে—প্রত্যেকেরই ডিজাইন স্বতন্ত্র। শহরটা ছবিল কিন্তু আমার মনে হয় এ সত্ত্বেও বম্বে ভারতীয় নগর-স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন নয়। বম্বের বাস্তুশিল্পের গায়ে যেন ইংরেজী গন্ধ পেলুম, তাও খাঁটি ইংরেজী নয়। তবু কলকাতার নাই-শিল্পের চেয়ে বম্বের কাণা শিল্প ভালো।

পথে প্রবাসে

॥ এক ॥

ভারতবর্ষের মাটির ওপর থেকে শেষবারের মতো পা তুলে নিলুম আর সদ্যোজাত শিশুর মতো মায়ের সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হ'য়ে গেল। একটি পদক্ষেপে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের কক্ষচ্যুত হ'য়ে অনন্ত শূন্যে পা বাড়ালুম তখন যেখান থেকে পা তুলে নিলুম সেই পদ-পরিমাণ ভূমি যেন আমাকে গোটা ভারতবর্ষেরই স্পর্শ-বিরহ অনুভব করিয়ে দিচ্ছিল; প্রিয়জনের আঙুলের ডগাটুকুর স্পর্শ যেমন প্রিয়জনের সকল দেহের সম্পূর্ণ স্পর্শ অনুভব করিয়ে দেয়, এও যেন তেমনি।

জাহাজে উঠে বম্বে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি করুণ। এত বড় ভারতবর্ষ এসে এতটুকু নগরপ্রান্তে ঠেকেছে, আর কয়েক মুহূর্তে ওটুকুও স্বপ্ন হবে, তখন মনে হবে আরব্য উপন্যাসের প্রদীপটা যেমন বিরাটাকার দৈত্য হ'য়ে আলাদীনের দৃষ্টি জুড়েছিল, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা তেমনি মাটি জল ফুল পাখি মানুষ হ'য়ে আজন্ম আমার চেতনা ছেয়েছিল, এতদিনে আবার যেন মানচিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

আর মানচিত্রে যাকে ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝখানে গোষ্পদের মতো দেখাত সেই এখন হয়েছে পায়ের তলার আরব সাগর, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোনো দিকে চক্ষু তার অবধি পায় না। ঢেউগুলো তার অনুচর হ'য়ে আমাদের জাহাজখানাকে যেন গলাধাক্কা দিতে দিতে তার চৌকাঠ পার ক'রে দিতে চলেছে। ঋতুটার নাম বর্ষা ঋতু, মনসুনের প্রভঞ্জনাহুতি পেয়ে সমুদ্র তার শত সহস্র জিহ্বা লকলক করছে, জাহাজখানাকে একবার এদিকে কাৎ ক'রে একবার ওদিক কাৎ ক'রে যেন ফুটন্ত তেলে পাঁপরের মতো উল্টে পাল্টে ভাজছে।

জাহাজ টলতে টলতে চলল, আর জাহাজের অধিকাংশ যাত্রি-যাত্রিণী ডেক ছেড়ে শয্যা আশ্রয় করলেন। অসহ্য সমুদ্রপীড়ায় প্রথম তিন দিন আচ্ছন্নের মতো কাটল, কারুর সঙ্গে দেখা হবার জো ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্যাবিনে শয্যাশায়ী। মাঝে মাঝে দু'একজন সৌভাগ্যবান দেখা দিয়ে আশ্বাসন করেন, ডেকের খবর দিয়ে যান। আর ক্যাবিন স্টুয়ার্ড খাবার দিয়ে যায়। বলা বাহুল্য জিহ্বা তা গ্রহণ করতে আপত্তি না করলেও উদর তা রক্ষণ করতে অস্বীকার করে।

ক্যাবিনে প'ড়ে প'ড়ে বমনে ও উপবাসে দিনের পর রাত রাতের পর দিন এমন দুঃখে কাটে যে, কেউ-বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ-বা ভাবে মরতে আর দেরি নেই। জানিনে হরবল্লভের মতো কেউ ভাবে কি না যে, মরে তো গেছি, দুর্গানাম ক'রে কী হবে। সমুদ্রপীড়া যে কী দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া অপর কেউ ধারণা করতে পারবে না। হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা',—মাথার যন্ত্রণায় অমন লোভনীয় বইও পড়তে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে কেবল চুপ ক'রে প'ড়ে থাকতে, প'ড়ে প'ড়ে আকাশ পাতাল ভাবতে।

সদ্য-দুঃখার্ত কেউ সংকল্প ক'রে ফেললেন যে, এডেনে নেমেই দেশে ফিরে যাবেন, সমুদ্রযাত্রার দুর্ভোগ আর সইতে পারবেন না। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এডেন থেকে দেশে ফিরে যেতে চাইলেও উটের পিঠে চ'ড়ে মরুভূমি পেরিয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ফেরবার যখন উপায় নেই তখন ফিরতে হবে সেই সমুদ্রপথেই। আমরা অনেকেই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেললুম মার্সেল্‌সে নেমে প্যারিসের পথে লণ্ডন যাব।

আরব সাগরের পরে যখন লোহিত সাগরে পড়লুম তখন সমুদ্রপীড়া বাসি হ'য়ে গেছে। আফ্রিকা-আরবের মধ্যবর্তী এই হ্রদতুল্য সমুদ্রটি দুর্দান্ত নয়, জাহাজে থেকে থেকে জাহাজটার ওপর মায়াও প'ড়ে গেছে; তখন না মনে পড়ছে দেশকে, না ধারণা করতে পারা যাচ্ছে বিদেশকে; কোথা থেকে এসেছি ভুলে গেছি, কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছিনে; তখন গতির আনন্দে কেবল ভেসে চলতেই ইচ্ছা করে, কোথাও থামবার বা নামবার সংকল্প দূর হ'য়ে যায়।

বিগত ও আগতের ভাবনা না ভেবে উপস্থিতের ওপরে দৃষ্টি ফেললুম—আপাতত আমাদের এই ভাসমান পান্থশালাটায় মন ন্যস্ত করলুম। খাওয়া-শোওয়া-খেলা-পড়া-গল্প করার যেমন বন্দোবস্ত যে-কোনো বড় হোটেলে থাকে এখানেও তেমনি, কেবল ক্যাবিনগুলো যা যথেষ্ট বড় নয়। ক্যাবিনে শুয়ে থেকে সিন্ধু-জননীর দোল খেয়ে মনে হয় খোকাদের মতো দোলনায় শুয়ে দুলছি। সমুদ্রপীড়া যেই সারল ক্যাবিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অমনি কমল। শোবার সময়টা ছাড়া বাকী সময়টা আমরা ডেকে কিংবা বসবার ঘরে কাটাতুম। ডেকে চেয়ার ফেলে ব'সে কিংবা পায়চারি করতে করতে সমুদ্র দেখে দেখে চোখ শ্রান্ত হ'য়ে যায়; চারিদিকে জল আর জল, তাও নিস্তরঙ্গ, কেবল জাহাজের আশে পাশে ছাড়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব নেই, যা আছে তা বাতাসের সোহাগ-চুম্বনে জলের হৃদয়-স্পন্দন। বসবার ঘরে অর্ধশায়িত থেকে খোশ গল্প করতে এর চেয়ে অনেক ভালো লাগে।

লোহিত সাগরের পরে ভূমধ্য সাগর, দু'য়ের মাঝখানে যেন একটি সেতু ছিল, নাম সুয়েজ যোজক। এই যোজকের ঘটকালীতে এশিয়া এসে আফ্রিকার হাত ধরেছিল। সম্প্রতি হাতের জোড় খুলে দুই মহাদেশের মাঝখানে বিয়োগ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার দ্বারা তা ঘটল তার নাম সুয়েজ কেনাল। সুয়েজ কেনাল একদিকে বিচ্ছেদ ঘটাল বটে, কিন্তু অন্যদিকে মিলন ঘটাল—লোহিতের সঙ্গে ভূমধ্যের মিলন যেন ভারতের সঙ্গে ইউরোপের মিলন। কলম্বাস যা পারেননি, লেসেপ্‌স্ তা পারলেন। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান, ঐটুকুর জন্যে ভূমধ্যের জাহাজকে লোহিতে আসতে বহু সহস্র মাইল ঘুরে আসতে হতো। মিশরের রাজারা কোন্ যুগ থেকে এর প্রতিকারের উপায় খুঁজছিলেন। উপায়টা দেখতে গেলে সুবোধ্য। ভূমধ্য ও লোহিতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডটাতে গোটাকয়েক হ্রদ চিরকালই আছে, এই হ্রদগুলোকে দুই সমুদ্রের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে দিলেই সেই জলপথ দিয়ে এক সমুদ্রের জাহাজ অন্য সমুদ্রে যেতে পায়। কল্পনাটা অনেক কাল আগের, কিন্তু সেটা কার্যে পরিণত হ'তে হ'তে গত শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হ'য়ে গেল। কেনালটিতে কলাকুশলতা কী পরিমাণ আছে তা স্থপতিরাই জানেন, কিন্তু অব্যবসায়ী আমরা জানি—যাঁর প্রতিভার স্পর্শমণি লেগে একটা বিরাট কল্পনা একটা বিরাট কীর্তিতে রূপান্তরিত হলো সেই ফরাসী স্থপতি লেসেপ্‌স্ একজন বিশ্বকর্মা—তাঁর সৃষ্টি দূরকে নিকটে এনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতার শত অপরাধ যাঁরা নিত্য স্মরণ করেন, এই ভেবে তাঁরা একটি অপরাধ মার্জনা করুন।

সুয়েজ কেনাল আমাদের দেশের যে-কোনো ছোট নদীর মতোই অপ্রশস্ত, এতে বড় জোর

দু'খানা জাহাজ পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে, কিন্তু কেনাল যেখানে হ্রদে পড়েছে সেখানে এমন সংকীর্ণতা নেই। কেনালটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি দিকে নানান রকমের গাছ, যত্ন ক'রে লাগানো, যত্ন ক'রে রক্ষিত, অন্যদিকে ধু-ধু করা মাঠ, শ্যামলতার আভাসটুকুও নেই। কেনালের দুই দিকেই পাথরের পাহাড়, যেদিকে মিশর সেই দিকেই বেশি। এই পাহাড়গুলিতে যেন যাদু আছে, দেখলে মনে হয় যেন কোনো কিউবিস্ট এদের আপন খেয়ালমতো জ্যামিতিক আকার দিয়েছে আর এক-একটা পাহাড়কে এক-একটা পাথর কুঁদে গড়েছে।

কেনালটি যেখানে ভূমধ্য সাগরে পড়েছে সেখানে একটি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পোর্ট সৈয়দ। জাহাজ থেকে নেমে শহরটায় বেড়িয়ে আসা গেল। শহরটার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট ফরাসী প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। কাফেতে খাবার সময় ফুটপাথের ওপর ব'সে খেতে হয়, রাস্তায় চলবার সময় ডানদিক ধ'রে চলতে হয়। পোর্ট সৈয়দ হলো নানা জাতের নানা দেশের মোসাফেরদের তীর্থস্থল—কাজেই সেখানে তীর্থের কাকের সংখ্যা নেই, ফাঁক পেলে একজনের ট্যাঁকের টাকা আর একজনের ট্যাঁকে ওঠে।

পোর্ট সৈয়দ মিশরের অঙ্গ। মিশর প্রায় স্বাধীন দেশ। ইউরোপের এত কাছে ব'লে ও নানা জাতের পথিক-কেন্দ্র ব'লে মিশরীরা ইউরোপীয়দের সঙ্গে বেশি মিশতে পেরেছে, তাদের বেশি অনুকরণ করতে শিখেছে, তাদের দেশে অনায়াসে যাওয়া আসা করতে পারছে। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি তাদের অপরিচয়ের ভীতি বা অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা নেই, ইউরোপের স্বাধীন মনোবৃত্তি তাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে সঞ্চারিত হয়েছে।

পোর্ট সৈয়দ ছেড়ে আমরা ভূমধ্য সাগরে পড়লুম। শান্তশিষ্ট ব'লে ভূমধ্য সাগরের সুনাম আছে। প্রথম দিন-কতক চতুর ব্যবসাদারের মতো ভূমধ্য সাগর 'Honesty is the best policy' করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা রক্ষা করলে না। আর একবার ক'রে কেউ কেউ শয্যাশায়ী হলেন। অধিকাংশকে মার্সেল্‌সে নামতেই হলো। পোর্ট সৈয়দ থেকে মার্সেল্‌স্ পর্যন্ত জল ছাড়া ও দু'টি দৃশ্য ছাড়া দেখবার আর কিছু নেই। প্রথমটি ইটালি ও সিসিলির মাঝখানে মেসিনা প্রণালী দিয়ে যাবার সময় দুই ধারের পাহাড়ের সারি। দ্বিতীয়, স্ট্রম্বোলী আগ্নেয়গিরির কাছ দিয়ে যাবার সময় পাহাড়ের বুকে রাবণের চিতা।

মার্সেল্‌স্ ভূমধ্য সাগরের সেরা বন্দর ও ফরাসীদের দ্বিতীয় বড় শহর। ইতিহাসে এর নাম আছে, ফরাসীদের বন্দে মাতরম্ 'La Marseillaise'-এর এই নগরেই জন্ম। কাব্যে এ অঞ্চলের নাম আছে, ফরাসী সহজিয়া কবিদের (troubadour) প্রিয়ভূমি এই সেই Provence—বসন্ত যেখানে দীর্ঘস্থায়ী ও জ্যোৎস্না যেখানে স্বচ্ছ। এর পূর্ব দিকে সমুদ্রের কূলে কূলে ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম, সেই সব গ্রামে গ্রীষ্মযাপন করতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। Bandol নামক তেমনি একটি গ্রামে আমরা একটি দুপুর কাটালুম। মোটরে ক'রে পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপর থেকে মার্সেল্‌স্‌কে দেখলে মনে হয় যেন সমুদ্র তাকে সাপের মতো সাতপাক জড়িয়ে বেঁধেছে। মার্সেল্‌স্ শহরটাও পাহাড় কেটে তৈরি, ওর একটা রাস্তার সঙ্গে আরেকটা রাস্তা সমতল নয়, কোনো রাস্তায় ট্রামে ক'রে যেতে যেতে ডানদিকে মোড় ফিরলে একেবারে রসাতল, কোনো রাস্তায় চলতে চলতে বাঁদিকে বেঁকে গেলে সামনে যেন স্বর্গের সিঁড়ি। মার্সেল্‌সের অনেক রাস্তার দু'ধারে গাছের সারি ও তার ওপারে ফুটপাথ।

মার্সেল্‌স্ থেকে প্যারিসের রেলপথে রাত কাটল। প্যারিস থেকে রেলপথে ক্যালে, ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার এবং ডোভার থেকে রেলপথে লণ্ডন।

॥ দুই ॥

লণ্ডনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি হলো গোধূলি লগ্নে। হ'তে না হ'তেই সে চক্ষু নত ক'রে আঁধারের ঘোমটা টেনে দিলে। প্রথম পরিচয়ের কুমার-বিস্ময় গোড়াতেই ব্যাহত হ'য়ে যখন অধীর হ'য়ে উঠল তখন মনকে বোঝালুম, এখন এ তো আমারি। আবরণ এর দিনে দিনে খুলব।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি আকাশ কলের ধোঁয়ায় মুখ কালো ক'রে ছিঁচকাঁদুনে ছেলের মতো যখন তখন চোখের জল ঝরাচ্ছে। সূর্যদেবের ঠিক-ঠিকানা নেই। সম্ভবতঃ তিনি কাঁদুনেটাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মাস্টারের ভয়ে দুষ্টুছেলের মতো ফেরার হয়েছেন। লণ্ডনের চিমনীওয়ালা বাড়িগুলো চুরুটখোরদের মতো মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আকাশের দিকে চেয়ে হাসছে, আর যে-দু'চারটে গাছপালার বহু কষ্টে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারা আমাদের অসূর্যম্পশ্যাদের মতো চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে পাতা খস্‌খস্ করতে করতে হতভাগ্য আকাশটার দিকে ছলছল চোখে তাকাচ্ছে।

ক্রমে জানলুম এইটেই এখানকার সরকারি আবহাওয়া। মাঝে মাঝে এর নিপাতন হয়, গ্রীষ্মকালে এর ব্যতিক্রম হয়, কিন্তু সারা শীতকালটা নাকি এমনি চলে। কদাচ কোনোদিন আকাশের উঠোন নিকিয়ে নির্মল করা হ'লে রূপালী সূর্য উঠে ধূমলা নগরীকে বলে, 'গুড মর্ণিং'। অমনি ঘরে ঘরে খবর রটে, পথে পথে পথিক দেখা দেয়, চেনামুখ চেনামুখকে বলে, 'হাও লাভ্‌লী! আজ সারাদিন যদি এমনি থাকে—!' মুখের কথা মুখ থেকে না মিলাতেই সূর্য বলে, এখন আসি,—বৃষ্টি বলে, এবার নামি,—একদল পথিক ভাবে ছাতা না এনে কী বোকামি করেছি, আরেকদল পথিক ভাবে ভাগ্যে রেনকোটখানা সঙ্গে ছিল। ইংলণ্ডের ওয়েদার এমনি খোশমেজাজী যে, খবরের কাগজওয়ালারা প্রতিদিন তার ভাবী চালের খবর নেয় ও কাগজের সর্বপ্রথম পৃষ্ঠার সর্বোচ্চে ছেপে দেয়—কাল বাতাস প্রথমে পশ্চিম থেকে ও পরে নৈর্ঋত থেকে বইবে, ক্রমশ তার বেগ বাড়বে, সূর্য গা-ঢাকা দেবে, কিন্তু বৃষ্টি জোর পড়বে না।

এ গেল লণ্ডনের অন্তরীক্ষের খবর। জলস্থলের বৃত্তান্ত বলা যাক।

লণ্ডন শহর টেম্‌স্ নদীর কূলে। কিন্তু গঙ্গা গোদাবরীর দেশের লোক আমি টেম্‌স্‌কে নদী বলি কেমন ক'রে? লণ্ডনের যে-কোনো দু'টো চওড়া রাস্তাকে পাশাপাশি করলে টেম্‌সের চেয়ে এক এক জায়গায় কম অপ্রশস্ত হয় না। ছোট হ'লে কী হয়, নদীটি নৌবাহ্য, বড় বড় জাহাজকে অনায়াসে কোল দেয়, বলিষ্ঠ শিশুর তন্বঙ্গী মায়ের মতো। লণ্ডনের যোজনজোড়া জটায় জাহ্নবীর মতো এঁকে বেঁকে নির্গমের পথ খুঁজছে, পিছু হটছে, মোড় ফিরছে। শহরের বাইরে তার উভয় তটে ছবির মতো বন, তার কূল সবুজ মখমলে মোড়া। কিন্তু শহরের ভিতরে তার জল কলকাতার গঙ্গার মতো বিবর্ণ, কাশীর গঙ্গার মতো স্বচ্ছ নয়। তার ধারে দাঁড়ালে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে; বাতাস তো নেই, আছে ধোঁয়া। ঝাপসা চোখে দু'ধারের দৃশ্য দেখি, শিপিয়া-কালো ইট-কাঠের স্তূপ, তাদের গায়ে বড় বড় হরফে বিজলী আলোর বিজ্ঞাপন—'মদ' কিংবা 'সিগরেট' কিংবা 'খবরের কাগজ'। ঐ তিনটে তিন রকমের বিষ এ দেশে প্রচুর বিক্রি হয়।

লণ্ডন শহর গোটা সাত আট কলকাতার সমান। আয়তন ছাড়া নতুন কিছু দেখবার নেই। সেই ট্রাম সেই বাস সেই ট্যাক্সি সেই ট্রেন, সেই গলি সেই বস্তি সেই মাঠ সেই প্রাসাদ। প্রভেদ এই যে, সমস্তই সুপারলেটিব, সমস্তই অতিকায়। লণ্ডনের দীনতম অঞ্চলগুলিরও প্রত্যেকটি যেন এক একটি দক্ষিণ কলকাতা, ঐশ্বর্যে অতটা না হোক পরিচ্ছন্নতায় অতটা। এত বড় শহর, কিন্তু সেই

অনুপাতে কোলাহলমুখর নয়। অবশ্য কলের কর্কশ আওয়াজে বাড়ির ভিৎ পর্যন্ত নড়ে এবং মোটরের দাপাদাপিতে রাস্তাগুলোর বুক দুড়দুড় করে, কিন্তু জনতার মুখে কথা নেই। ভিড়ের মধ্যে ফিসফিস করলেও শোনা যায়। ফেরিওয়ালার রকমারি হাঁক নেই, তার চলন্ত বিজ্ঞাপন প'ড়ে বুঝতে হয় সে কি বেচতে চায় ও কত দামে। দুধওয়ালা ঘরে ঘরে দুধ বিলি ক'রে যাবার সময় এমন সুরে 'milk' বলে যে, শুনলে মনে হয় কোকিলের 'কু—উ', ডাকপিয়ন কাঠ-ঠোকরার মতো দরজায় দুই ঠোক্কর দিলে বুঝতে হয় দরকারি চিঠি এসেছে, রুটিওয়ালা মাংসওয়ালা কয়লাওয়ালা ইত্যাদি প্রত্যেকেরই নিজস্ব 'চি-চিং ফাঁক' আছে, সেই সঙ্কেত শুনলে বন্ধ দুয়ার আপনি খুলে যায়, অর্থাৎ বাড়ির ঝি দরজা খুলে দেয়। এক কথায় বলতে গেলে এখানে হাটের মধ্যে তেমন হট্টগোল নেই, যেমন আমাদের দেশের ঘরে ঘরে। কিন্তু এতটা নিস্তব্ধতা কি স্বাভাবিক, না সুন্দর? সুর ক'রে 'দই নেবে গো, মিষ্টি দই' হাঁকতে হাঁকতে চুড়ি বাজিয়ে যাওয়া সুন্দর, না পিঠে বিজ্ঞাপন এঁটে বোবার মতো পায়চারি করা সুন্দর? এ দেশে নিরক্ষরতা নেই ব'লে এদের কানের ক্লেশ কমেছে, কিন্তু চোখের জ্বালা? বিজ্ঞাপনওয়ালারা যেন পণ ক'রে বসেছে মানুষের চোখে আঙুল গুঁজে বোঝাবে যে, বিধাতা মানুষকে চোখ দিয়েছেন দোকানদারের ঢাকপেটা চোখ পেতে শুনতে।

লণ্ডনের পথে পথে রথযাত্রার ভিড়, কিন্তু ভিড়ের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। পুলিশের বন্দোবস্ত অতুলনীয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, পুলিশের নয়, জনতার। শৃঙ্খলা মেনে চলা যেন এদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। রাস্তায় কিছু একটা ঘটেছে, কৌতূহলীরা দাঁড়িয়ে দেখছে, লাইনের পিছনে লাইন, যে লোকটা সকলের শেষে এসে পৌঁছল সে লোকটা মাত্র দুটো কনুইয়ের জোরে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না, যে আগে এসেছে সে আগে, যে পরে এসেছে সে তার পিছনে কিংবা পাশে। রেলের টিকিট করতে হবে, ঠেলাঠেলি ধস্তাধস্তি ইতর ভাষায় গালাগালি কোনোটাই কোনো কাজে লাগবে না; যে আগে আসবে সে আগে দাঁড়াবে, তার পিছনে তার পরের জন, তার পিছনে তার পরের। ড্রিলের ভাষায় যাকে file বলে কিংবা চলতি ভাষায় যাকে queue বলে তেমনি ক'রে সকলে দাঁড়ালে পরে একজনের পর একজন টিকিট নেবে; সিঁড়ি দিয়ে একে একে ট্রেনের কাছে যাবে, ট্রেনের থেকে যাদের নামবার কথা তারা নামলে পরে ট্রেনে যাদের ওঠবার কথা তারা উঠবে এবং জায়গা থাকে তো আগে মেয়েরা বসবে, না থাকে তো যারা আগে থেকে ব'সে আসছে তারা উঠে মেয়েদের জায়গা দিয়ে নিজেরা দাঁড়াবে। এইটুকু করতে আমাদের দেশে হাত পা মুখ কান সব ক'টা অঙ্গের কসরৎ হ'য়ে যায়, বিশেষ ক'রে কানের। এ দেশে কিন্তু সমস্ত নিঃশব্দে সারা হয়। ট্রেনে চ'ড়ে হনুমানজীর ভজন কিংবা পটলার মা'র পুরাবৃত্ত শুনে বধির হ'তে হয় না। কিন্তু এদের এই নিঃশব্দ প্রকৃতি আমার নিছক ভালো লাগেনি। ট্রেনে পাশাপাশি বসতে না বসতেই দেশের মতো কেউ গায়ে প'ড়ে পিতৃপিতামহের নাম শুধায় না, বিয়ে হয়েছে কি না, ক'টি ছেলেমেয়ে, কত মাইনে, কত উপরি পাওনা ইত্যাদি খুঁটিয়ে জেরা ক'রে উত্যক্ত করে না; কিন্তু ঐ অনাহূত উপদ্রবের মধ্যে মানুষের ওপরে মানুষের একটা স্বাভাবিক দাবী থাকে,—অন্তরঙ্গতার দাবী, সামাজিকতার দাবী, —মানুষ যে সমাজপ্রিয় জীব। এ দেশের লোকও ও দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না, কিন্তু ওর সঙ্গে কিছু মৌখিকতার খাদ মিশিয়ে দেয়। 'আজ দিনটা বড় ঠাণ্ডা, না?' 'তা ঠাণ্ডাই বটে।' এমনি ক'রে আলাপ আরম্ভ হয়, কিন্তু বেশি দূর এগোয় না, কারণ কথাবার্তার পুঁজিই হলো ওয়েদার; পুঁজি ফুরোলে নিঃশব্দে সিগরেট ভস্ম করা ছাড়া অন্য পন্থা থাকে না। এরা বাচাল নয় বটে, কিন্তু বাক্‌পটুও নয়। কথোপকথনের আর্ট এদের অজানা।

বলেছি লণ্ডন শহরে নতুন কিছু দেখবার নেই, আয়তন সমৃদ্ধি ও সজ্জা ব্যতীত। তবু

মোটাগোছের গোটা কয়েক প্রভেদ স্থূলদৃষ্টি এড়ায় না। এই যেমন মাটির নিচে টিউব বা ইলেকট্রিক রেলরাস্তা,—যেন পাতালপুরীর রাজপথ। যাত্রীরা নিচে নামছে, মিনিটে মিনিটে ট্রেন পাচ্ছে, মাইলের পর মাইল যাচ্ছে, ট্রেন থেকে নেমে মাটির ওপরে উঠে আপিস আদালত করছে। মাটির নিচে রেল, মাটির ওপরে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি। কিংবা যেমন কলে পয়সা ফেললে সিগরেট চকোলেট সর্দি কাশির ট্যাবলেট থেকে আরম্ভ ক'রে রেলের টিকিট ডাকঘরের স্ট্যাম্প স্নানের জল উনুনের আগুন পর্যন্ত আপনা আপনি হাজির হয়, যেন দেবতার বাহন, স্মরণমাত্র উপস্থিত। কিংবা উঁচু নিচু পাহাড়কাটা রাস্তা, দু'ধারে একই প্যাটার্নের একই রঙের একই সাইজের এক-এক সারি বাড়ি, একটা দেখলেই একশোটা দেখা হ'য়ে যায়। বাড়ির আশে পাশে হয়তো এক টুক্‌রো সবুজ, সবুজের ওপরে এক ঝলক রক্ত বা একমুঠো হরিদ্রা। কিংবা যেমন শহরের স্থানে স্থানে মাঠ, গড়ের মাঠের চেয়ে চওড়া তাদের বুক, কিন্তু তেমন চিক্কণ নয়, বন্ধুর। পাহাড়-বক্ষ হ'তে ক্ষীরধারার মতো হ্রদ-রেখা নেমেছে; সেই কৃত্রিম হ্রদে নরনারী দাঁড় টানে, সাঁতার দেয়, দমদেওয়া পুতুলজাহাজ ভাসায়, হাঁসের সাঁতার দেখে, ছিপ ফেলে মাছের আশায় দিন কাটায়। মাঠের মেজের ওপরে সবুজ দূর্বার কার্পেট বিছানো, এত সবুজ আর প্রচুর যে, মুহূর্তকাল অনিমেষ চেয়ে রইলে যেন সবুজ জন্‌ডিস্ জন্মায়, তখন যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকে সবুজ। কালো কুৎসিত চিমনীর ধোঁয়ায় চোখ যখন নির্জীব হ'য়ে আসে তখন ঐ এক ফোঁটা সবুজ আরক তাকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়।

লণ্ডনের উপবনগুলি নানা জাতের গাছপালায় গহন, গাছেদের মাথায় সোনালী চুল। দুঃখের কথা এ দেশের ফুলে গন্ধ নেই। গুণ নেই রূপ আছে, ফুল নয় তো ফুলবাবু। তাই হাওয়া ফুলের গন্ধে বেহোঁস হয় না, রাত ফুলের গন্ধে উতলা হয় না, মানুষের একটা ইন্দ্রিয় বুভুক্ষু থেকে যায়। মাঠ বা পার্কগুলি এদের ন্যাশনাল প্লে-গ্রাউণ্ড। সেখানে ছোট ছেলেরা গাছে ওঠে, ছোট মেয়েরা বল নাচায়, কিশোরেরা ঘুড়ি ওড়ায়, কিশোরীরা বাজি রেখে দৌড়ায়, যুবক যুবতীরা টেনিস খেলে, বৃদ্ধেরা ব'সে ব'সে ঝিমায়, বৃদ্ধারা কুকুরের শিকলহাতে ঠুক্‌ঠুক্ ক'রে হাঁটে। সেখানে খোকাবাবুরা খুকুমণিরা ঠেলাগাড়িতে চ'ড়ে দিগ্‌বিজয়ে বাহির হ'ন, মায়েরা ঠেলতে ঠেলতে চলেন ও চেনামুখ দেখলে ফিক ক'রে হেসে দুটো কথা ক'য়ে নেন, বাবারা সময় ক'রে উঠতে পারলে খোকা-খুকুর সফরে মায়েদের সহগামী হ'ন, এবং সেখানে যুগলের দল 'আড়াল বুঝে আঁধার খুঁজে সবার আঁখি এড়ায়।'

মাঠ বা পার্কগুলিতে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণ বুঝতেই পারা যায় না যে, লণ্ডনের ভিতরে আছি। জনসমুদ্রের মাঝখানে এগুলি এক-একটি দ্বীপ, দ্বীপের চারিধারে ঢেউয়ের ওপরে ঢেউ ভেঙে পড়ছে, সেখানে অনন্ত কলরোল। কিন্তু দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে তার প্রতিধ্বনি পৌঁছয় না, তার দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে আসে, সবুজ আসন পেতে মাটি বলে, 'একটু বসো', সোনালী চামর ঢুলিয়ে গাছেরা বলে, 'একটু জিরিয়ে নাও'। কিন্তু লণ্ডনের মানুষকে শান্তির মন্ত্রে বশ মানানো যায় না, দু'দণ্ড সে স্থির হ'য়ে বসতে চায় না, উদ্ভিদের মতো স্থাবর হ'তে তার আপত্তি, সে জন্ম-যাযাবর। কাজ আর অকাজ তাকে নানান সুরে ডাকে, তার ব্যস্ততার ইয়ত্তা নেই। যেখানে সে আপিস করতে শেয়ার কিনতে টাকা রাখতে যায় সেখানটার নাম সিটি, প্রায় হাজার দুয়েক বছর আগে তাকে নিয়ে লণ্ডনের পত্তন হয়। সিটির পশ্চিম দিকে ওয়েস্ট এণ্ড। সে অঞ্চলে লোকে বাজার করতে আমোদ করতে আহার করতে যায়, সেখানে বড় বড় দোকান বড় বড় হোটেল বড় বড় ক্লাব বড় বড় থিয়েটার সিনেমা নাচঘর কন্সার্ট হল চিত্রাগার মিউজিয়াম প্রদর্শনী। সিটিতে বড় কেউ বাস করে না, ওয়েস্ট এণ্ডে ধনীরা বাস করেন। দরিদ্রদের জন্যে ইস্ট এণ্ড আর মধ্যবিত্তদের জন্যে শহরতলীগুলো। এগুলি মোটের ওপর নিরালা স্বাস্থ্যকর ও সুবিন্যস্ত। আমার আক্ষেপ কেবল এই যে, এদের নগরকল্পনায়

বিশিষ্টতার স্থান নেই। সবটা জুড়েছে ইউটিলিটি বা প্রয়োজনীয়তা। সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌষ্ঠব কার না দরকার? কিন্তু সেই দরকারটাই চরম হলো, সৌন্দর্য হলো অবান্তর। তাই দেখি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন বাঁধানো পথ ঘাট, বাতায়নবহুল উপকরণাঢ্য পরিপাটি বাড়ি ঘর, কিন্তু রাস্তার সব ক'টা বাড়ি একই ধাঁচের, একেবারে হুবহু এক, যেন এক ছাঁচে ঢালা সীসের টাইপ। এরা সৈনিক নাবিকের জাত, কচি বয়স থেকে ড্রিল করতে অভ্যস্ত, সারি বেঁধে গির্জায় যায়, সারি বেঁধে ইস্কুল থেকে ফেরে, এদের চালে চলনে উঠতে বসতে ড্রিল। তাই এদের ঘরবাড়িগুলো পর্যন্ত লাইন বেঁধে পরস্পরের সঙ্গে সমান ব্যবধান রেখে এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে খাড়া, তাদের সকলের গায়ে ইউনিফর্ম, তার একই মাপ একই রঙ একই রেখা একই গড়ন। চোখের ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত হ'য়ে তাকাই আর ক্ষোভে নৈরাশ্যে মরীয়া হ'য়ে উঠি। শুনলুম সমগ্র ইংলণ্ড নাকি সপ্তাহের একই বারে কাপড় কাচতে দেয়, একই বারে কাপড় ফিরে পায়।

শহরের যে-কোনো রাস্তায় পা দিলে যে দশটা দোকান সর্বপ্রথম চোখে পড়ে তাদের গোটা দুই মদের দোকান, গোটা দুই রেস্তরাঁ, একটা সিগরেটের একটা জামাকাপড়ের ও একটা আসবাবের দোকান, একটা খবরের কাগজের স্টল, একটা চুল সাজাবার সেলুন, একটা ব্যাঙ্ক। এর ওপরে যদি টিপ্পনির দরকার হয় তো বলি, rum খেয়ে নাকি এরা Somme জিতেছিল, তাই সোমরসের এত আদর। রবিবারেও যে তিনটি দোকান খোলা থাকে তাদের নাম মদের দোকান, সিগরেটের দোকান, খবরের কাগজের স্টল। সিগরেট সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ওর একটা ডিবে কাছে না থাকলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না, কারুর সঙ্গে দেখা হলেই ওটা সামনে ধ'রে বলতে হয়, 'নিতে আজ্ঞা হোক'। এ দেশের মেয়েরা যখন ভালোমন্দ উভয় বিষয়ে পুরুষের অনুধর্মিণী হবেই ব'লে কোমর বেঁধেছে তখন তাদের কারুর আলতা পরা মুখে আগুন জ্বলতে দেখলে আশ্চর্য হইনে, কিন্তু কোনো কোনো ভারতবর্ষীয়া যখন স্মার্ট দেখাবার লোভে চিবুকের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সিগরেট লকলক করতে করতে ভুরু কাঁপিয়ে মাথা নাচিয়ে কথা বলেন তখন রিজেণ্টস পার্ক চিড়িয়াখানার দৃশ্যবিশেষ মনে প'ড়ে যায়। দৃশ্যটা আর কিছু নয়, বাঁদরদের টি-পার্টি। মানুষকে ওরা অবিকল নকল করতে পেরেছিল, দুঃখের বিষয় তবু কেউ ওদের মানুষ ব'লে ভুল করলে না। এদিকে আমি যুবকদের সঙ্গে কথা ক'য়ে দেখেছি ওরা নিজেরা সিগরেট খায় ব'লে কুণ্ঠিত বোধ করে ও নিজের বোনকে খেতে দেখলে লজ্জিত বোধ করে; কিন্তু পরের বোনকে খেতে দেখলে কেমন বোধ করে এ প্রশ্নটার উত্তরে তাদের মতবিচ্যুতি দেখা গেল। অমন অবস্থায় পড়লে সবারই মত বদলায়।

রেস্তরাঁ যে এ শহরে কত লক্ষ আছে তার গণনা চলে না। আহারের জন্যে রেস্তরাঁ, নিদ্রার জন্যে ফ্ল্যাট বা রুমস—সাধারণ গৃহস্থের জন্যে এই হচ্ছে এখানকার ব্যবস্থা। এ দেশের স্বাচ্ছন্দ্যনীতির সঙ্গে তাল রেখে গৃহস্থালী গড়া এ দেশের বহুসংখ্যক স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। যাদের সঙ্গতি আছে তারাও বাড়িতে না খেয়ে বাইরে খায় এই জন্যে যে, সারাদিন যেখানে জীবিকার জন্যে খাটতে হয় বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে, কিংবা বাড়িতে রান্না করতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকুর বাজারদর রেস্তরাঁয় খাবার খরচের চেয়ে বেশি, কিংবা বাড়িতে অল্প সংখ্যক লোকের রান্নায় যত খরচ রেস্তরাঁয় বহুসংখ্যক লোকের রান্নায় সে অনুপাতে কম। কথা উঠবে তবে বাড়ির মেয়েরা করে কি? তার জবাব এই যে, বাড়ির মেয়েরাও আপিস করে। সকলে নয় অবশ্য, কিন্তু অনেকে। তরুণী মাত্রেই স্কুল কলেজে যায়, বয়স্কা মাত্রেরই কোনো কাজ আছে। মায়েরাও ছেলেদের ইস্কুলে দিয়ে কাজে যায়, তবে কোলের ছেলে হ'লে তার গাড়ি ঠেলে মাঠে নিয়ে যায়, খোকা যতক্ষণ হাওয়া খায়, অন্ততঃ ফীডিং বটল চুষে দুধ খায়, খোকার মা ততক্ষণ জামা সেলাই

করে। কাজ করে না, ব'সে খায়, এমন লোক তো দেখছিনে; যার আর কিছু না জোটে সে একটা সভাসমিতি খুলে বসে। সে সব সভাসমিতির উদ্দেশ্যও বিচিত্র; কোনোটার উদ্দেশ্য জবাই করবার অনিষ্ঠুর উপায় উদ্ভাবন, কোনোটার উদ্দেশ্য সদস্যদের মৃতদেহ কবরস্থ না ক'রে অগ্নিসাৎ করা। ভালো মন্দ দরকারি অদরকারি কত রকমের অনুষ্ঠান যে এ দেশে আছে তার আভাস পাওয়া যায় রবিবারের দিন হাইড পার্কের বেড়ার ভিতর প্রবেশ করলে। একখানা ক'রে চেয়ার যোগাড় ক'রে তার ওপরে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কত বক্তাই যে ভূমিতে দণ্ডায়মান বা সম্মুখ দিয়ে চলন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে কত তত্ত্বই প্রচার করেন তার সংখ্যা হয় না। এ দেশে ধর্মের হাজারো সম্প্রদায় আছে, রাজনীতির হাজারো দল আছে, বক্তৃতা দেওয়া কাজটাও কঠিন নয়, আর লোকের ভিড়ের ভিতরে এমন দশপঁচিশ জন অখণ্ড ধৈর্যশীল সহিষ্ণু শ্রোতা বা শ্রোত্রী কি পাওয়া যাবে না যারা অন্ততঃ পাঁচটি মিনিট বিনিপয়সায় গলাবাজি দেখবে বা নাম-সংকীর্তন শুনবে? এমনি ক'রেই পাবলিক ওপিনিয়ন সৃষ্ট হয়। শ্রোতারা তর্ক করে, টিটকারি দেয়, এক বক্তার লোক ভাঙিয়ে নিয়ে আরেক বক্তা উল্টো বক্তৃতা শোনায়, তবু সে বক্তার মেজাজ তরুর চেয়ে সহিষ্ণু ও সংকল্প মেরুর মতো অটল, একটিও যদি শ্রোতা না রয় তবু তার বাক্যের ফোয়ারা ফুরোবে না। হাতে কোনো একটা কাজ না থাকলে যেন এরা বাঁচতে পারে না, জীবন ফাঁকা ঠেকে। চুপ ক'রে ব'সে থাকা এদের ধাতে সয় না, তাই ছুটি পেলে এরা বড় বিব্রত হ'য়ে ভাবে ছুটি কেমন ক'রে কাটাবে। ভিক্ষা করা এ দেশে আইনবিরুদ্ধ; করলে কঠিন সাজা। তাই ভিক্ষুকেরাও কোনো একটা কাজ করবার ভান ক'রে পয়সা রোজগার করে, হয় দু'পয়সার দেশলাই চারপয়সায় বেচে অর্থাৎ বেচবার ভান ক'রে হাত পাতে, নয় ফুটপাথের ওপরে ছবি এঁকে পথিকদের সামনে টুপি খোলে, নয় কিছু একটা বাজিয়ে বা গেয়ে দাতাকে খুশি করে, কিন্তু মুখ ফুটে বলে না যে, 'ভিক্ষা দাও', বললেই পুলিশে ধ'রে নিয়ে যায়। এত কথা এ প্রসঙ্গে বলবার উদ্দেশ্য, এরা কাজ জিনিসটাকে কি চক্ষে দেখে তাই বোঝানো। নিষ্ক্রিয়তাকে এ দেশে ধর্ম বলে না।

জামাকাপড়ের দোকানের এত বাহুল্য কেন? একটা কারণ, শীতের দেশের মানুষ কম্বল সম্বল ক'রে ধুনি জ্বালিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে পরকালের ধ্যান করলে পরকালের দিন ঘনিয়ে আসে, দেহ সম্বন্ধে নির্বিকল্প হ'লে দেহীমাত্রেই বরফ হ'য়ে যায়, তাই পথের ভিখারীরও গায়ে ওভারকোট ও পায়ে বুটজুতো চাই। মেয়েরা স্কার্ট হ্রস্ব ক'রে ও গলা খোলা রেখে পরিধেয় সংক্ষেপ করেছে বটে, তবু ওদের পরিধেয় শুধু একখানা শাড়ির মতো সরল নয়। আর একটা কারণ, আংটি বা হার বা দুল ছাড়া অন্য অলঙ্কার বড় কেউ পরে না, তাই ভূষণের রিক্ততার ক্ষতি পূরণ করতে হয় বসনের বাহারে। একটু আগে বলেছি এদের নগর-স্থাপত্যে বিউটির চেয়ে বড় কথা ইউটিলিটি। এদের বেশভূষা সম্বন্ধেও ওকথা সমান খাটে। মেয়েরাও এখন কাজের লোক হয়েছে, গজেন্দ্রগমনে চললে ট্রেন ফেল ক'রে আপিস কামাই ক'রে বসবে সেই আশঙ্কায় পক্ষিরাজের মতো মাটি ছুঁয়ে ওড়ে, ছুটে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রেনের ওপরে লাফ দিয়ে ওঠে, জায়গা পেলে বসে, না পেলে দাঁড়ায়, এক সেকেণ্ড সময় নষ্ট না ক'রে খবরের কাগজ কিংবা গল্পের বই বার ক'রে পড়তে আরম্ভ ক'রে দেয়। ছুটোছুটির সুবিধার জন্যে স্কার্টের ঝুল হাঁটুর ওপরে উঠে কোমর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। দম আটকাবার ভয়ে গলার ফাঁস খুলতে খুলতে আবক্ষ বিস্তৃত হচ্ছে. স্নান-প্রসাধন সুকর হবে ব'লে মাথার চুল ছেঁটে কবরীর অনুপযুক্ত করা হচ্ছে। ফলে শরীর হালকা লাগছে, প্রতি অঙ্গে বাতাস লাগছে, স্বাস্থ্য ভালো থাকছে, স্বাস্থ্যজনিত শ্রীও বাড়ছে, এক কথায় স্ত্রীজাতির তথা সমাজের বহুতর উপকার হচ্ছে; ইউটিলিটির দিক থেকে জয়জয়কার। এবং এর দরুন মেয়েরা যে সেক্সলেস্ বা পুরুষালী হয়ে উঠছে এমনও নয়। নারীর নারীত্ব যে সাগরতলের চেয়েও অতল; পরিবর্তন সে তো

জলপৃষ্ঠের বুদ্বুদ, কোনো কালেই তা অতলস্পর্শী হ'তে পারে না: বিপ্লবের মন্দর দিয়ে মথন ক'রেও নারীর নারীত্বকে নড়ানো যায় না, কেবল কাড়তে পারা যায় তার সুধা আর তার বিষ।

পরিবর্তনকে আমি দোষ দিইনে, আর ইউটিলিটিকে আমি মহামূল্য মনে করি। তবু আমার ধারণা, এ যুগের নারীর পরিচ্ছদ যদি এ যুগের নারীর প্রতিবিম্ব হয় তবে বিম্ব দেখে বলতে পারি বিম্ববতী সুন্দরী নয়। নারীত্বের বিষ যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সুধাও যাচ্ছে। পরিচ্ছদকে উপলক্ষ্য ক'রে এত কথা বলবার অভিপ্রায়—পরিচ্ছদ তো কেবল নগ্নতার আচ্ছাদন বা শীত বর্ষার বর্ম নয় যে, তার প্রয়োজনীয়তাই তার পক্ষে চূড়ান্ত হবে; পরিচ্ছদ যে দেহেরই সম্প্রসারণ, দেহেরই বহির্বিকাশ, দেহের চারিপাশে সৌন্দর্যের পরিমণ্ডল। এরা জীবনকে ব্যস্ততায় ভ'রে এমন সংক্ষিপ্ত ক'রে আনছে যে, মানুষের মনের আর সে-অবসর নেই যে-অবসর নইলে মানুষ নিজের পরিমণ্ডল নিজে রচনা করতে পারে না। তখন ডাক পড়ে পোশাক-বিক্রেতার আপিসের পোশাক ডিজাইনারকে এবং পোশাক-বিক্রেতার দোকানের ম্যানীকিন্‌দের। গণতন্ত্রের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে, আর গণতন্ত্রের রুচি বন্ধক দেওয়া হয়েছে লার্জ স্কেল্ ম্যানুফ্যাক্চার-ওয়ালাদের কাছে। যখন দেখি আজানুলম্বিত আলখাল্লার মতো লোমশ ওভারকোটের অন্তরালে নারীদেহের contour (রেখাভঙ্গি) ঢাকা পড়েছে, দেখা যাচ্ছে কেবল কচ্ছপের খোলার ভিতর থেকে বা'র করা আজানু-উন্মুক্ত পা দুটি, আর টুপির দ্বারা রাহুগ্রস্ত মুখটি, তখন মনে হয় যেন দু'টি চলন্ত স্তম্ভের ওপরে কালো বা মেটে রঙের একটি বস্তা উপুড় করা হয়েছে, সেই বস্তার পৃষ্ঠভাগ একেবারে প্লেন, তার কোথাও একটা রেখা বা একটা বন্ধনী নেই, কটির স্থিতি যে কোন্‌খানে আর পরিধি যে কতখানি তা অনুমান ক'রে নিতে হয়।

পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, কারণ পুরুষ চিরকাল কাজের লোক, সে যে ইউটিলিটি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে এত বড় প্রত্যাশা তার কাছে করা যায় না। মজার কথা এই যে, নারীর পোশাক যত সরল হচ্ছে পুরুষের পোশাক তত জটিল হচ্ছে; তার আপাদমস্তক পোশাক দিয়ে মোড়া, সে-পোশাকের স্তরের পর স্তর, আণ্ডার ওয়ারের ওপরে আণ্ডার ওয়ার, কোটের ওপরে ওভারকোট, জুতোর ওপরে জুতো, মোজার ওপরে স্পাট্‌, টাই-কলারের ওপরে মাফলার!

শীতের দেশের লোককে বিছানা পুরু করবার জন্যে লেপ কম্বলের বহুল আয়োজন করতে হয়, আর ইউরোপীয় পরিচ্ছদ প'রে মেজের ওপরে শোওয়া বসা চলে না ব'লে খাট পালঙ্ক কৌচ সোফা চেয়ার টেবিল দরকার হয়। এ ছাড়া কাপড় রাখবার ওয়ার্ডরোব, খাবার রাখবার কাবার্ড, হাতমুখ ধোবার সরঞ্জাম, প্রসাধনের আয়না-দেরাজ, রান্নার স্টোভ, ঘর গরম রাখবার অগ্নিস্থলী ইত্যাদি গরীব-দুঃখীরও চাই। দেশে আমাদের বাড়ির ঝি বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে গায়ে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে শীতের দিনে ঘুঁটের আগুন পোহায়। এখানে আমাদের বাড়ির ঝির জন্যে স্বতন্ত্র ঘর, ঘরের মেজেতে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ওয়ালপেপার আঁটা, লোহার খাটে আধ ফুট পুরু বিছানা, ঘরের একপাশে অগ্নিস্থলী, সেখানে কয়লা পোড়াতে হয়, একপাশে টেবিল চেয়ার আয়না দেরাজ আলনা, সিলিঙে ইলেকট্রিক আলো ও জানলায় নক্সাকাটা পর্দা। এই জন্যেই এ দেশে আসবাবের দোকান এত। দোকান থেকে আসবাব ভাড়া ক'রে আনতে হয় কিংবা কিনে এনে মাসে মাসে দামের ভগ্নাংশ দিতে হয়। আসবাব সম্বন্ধেও ইউটিলিটির সঙ্গে বিউটির ছাড়াছাড়ি। সৌষ্ঠব আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য নেই,—বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু কলে-তৈরি প্রাণহীন বৈচিত্র্য। যন্ত্ররাজ বিভূতির কল্যাণে একালের রামশ্যামও সেকালের রাজরাজড়াদের চেয়ে স্বচ্ছন্দে আছে। শস্তায় বাদসাহী চালে চলছে, কিন্তু রামের সঙ্গে শ্যামের এখন একতিলও তফাৎ নেই; রামের নাম ৪৬৩ তো শ্যামের নাম ৪৭৬;

নামের তফাৎ নেই, সংখ্যার তফাৎ। 'কলি' যুগ বটে!

আমাদের বাড়ির ঝি ফুরসৎ পেলেই খবরের কাগজ পড়ে, কোনো কোনো দিন খাবার সময়, কোনো কোনো দিন পরিবেশন করার ফাঁকে। এই থেকে বুঝতে হয় এ দেশে খবরের কাগজের কেমন প্রচার ও প্রভাব। যে কাগজ আমাদের ঝি পড়ে সে কাগজে গুরুগম্ভীর লেখা থাকে না, তার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ আধ কলমও নয়, সম্পাদক মহাশয় হালকা সুরে গ্রেহাউণ্ড রেসিং বা শরৎকালের ফ্যাশান সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে আমাদের ঝি ঠাক্‌রুণের সন্তোষবিধান করেন, উঁচুদরের রাজনৈতিক চাল বা অর্থনৈতিক সমস্যার ধার দিয়েও যান না; সংবাদের কলমে থাকে খেলাধূলা, ঘোড়দৌড়, চোরডাকাত, বিবাহ ও বিবাহভঙ্গ ইত্যাদি চটকদার ও টাটকা খবর। আদালতে কে কেঁদেছে, এরোপ্লেনে কে হেসেছে, থিয়েটারে কে নেচেছে তাদের ফোটো তো থাকেই, সময় সময় তাদের সঙ্গে 'আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি'র সাক্ষাৎকারের লোমহর্ষণ বিবরণ থাকে। আমাদের দেশের কাগজের সঙ্গে এ দেশের কাগজগুলোর মস্ত একটা তফাৎ এই যে, এ দেশের কাগজে গালাগালি থাকে না। ক্যাথেরিন মেয়োর ওপর রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তাকে বেশ্যা ব'লে গালাগাল দেওয়াটা ইতরতা। অমন ইতরতা এ দেশের কাগজওয়ালারা এদের প্রধানতম শত্রুদের বেলাও করে না। পাঞ্চ কাগজখানার পেশাই হচ্ছে ভাঁড়ামি, কিন্তু সে ভাঁড়ামির মধ্যে অশ্লীলতা থাকে না। এ দেশে ক্যাথেরিন মেয়োর যারা প্রশংসা গেয়েছে তারা স্পষ্ট ক'রে বলতে ভোলেনি যে, লেখিকা ইংরেজ নয়, আমেরিকান; এবং অনেকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে, ইংরেজ লেখক হ'লে কুরুচি-পরিচায়ক প্রসঙ্গগুলো অমন খোলাখুলিভাবে বীরদর্পে উল্লেখ করত না। বাস্তবিক, অশ্লীলতা সম্বন্ধে ইংরেজ জাতির একটা স্বাভাবিক ভীরুতা আছে, তাই এ দেশের খবরের কাগজে কেলেঙ্কারির বর্ণনাটাও নিচু গলায় হয়। মোটকথা, রেসপেকটেবল ব'লে গণ্য হবার জন্যে এ দেশের 'ইতরেজনাঃ'র একটা ঝোঁক আছে, তাই ডেলী হেরাল্ডকেও টাইমসের আদর্শ অনুসরণ করতে হয়। আমাদের ঝি-ঠাক্‌রুণের শ্রেণীর মেয়েরাও মনে মনে এক-একটি লেডী। ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা কমেছে, কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এ দেশ কুলীনকে অন্ত্যজ না ক'রে অন্ত্যজকে কুলীন ক'রে তুলছে।

এর পরের প্রসঙ্গ, চুল সাজাবার সেলুন। এই জিনিসটা আগে এ দেশে পুরুষদের জন্য অভিপ্রেত ছিল, সুতরাং সংখ্যায় অর্ধেক ছিল। এখন মেয়েরা হয় পুরুষের মতো ছোট ক'রে চুল ছাঁটে, নয় হরেক রকমের বাবরী রাখে। শিংল্ করাটা একটা আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ আর্টের আর্টিস্ট হচ্ছেন নরসুন্দর আর তুলি হচ্ছে তাঁর কাঁচি। যার চুল যেমন ক'রে শিংল্ করলে মানায় তার চুল তেমনি ক'রে শিংল্ করাটা যথেষ্ট সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। তবে ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য, মাসে মাসে নরসুন্দরকে খাজনা গুনতে হয়। চুল ছেঁটে নাকি মেয়েরা সোয়াস্তি পায়। সম্ভবতঃ পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই ইউটিলিটির প্রশ্ন। আগে ইউটিলিটি, তার পরে ওরই ওপরে একটু সৌষ্ঠবের ব্যবস্থা, সেজন্যে নরসুন্দরের শরণাপন্ন হওয়া, নিজের রুচি পরের কাছে বন্ধক রাখা ও শতসংখ্যকের জন্যে লার্জ স্কেলে সৌন্দর্য ম্যানুফ্যাকচার করা। ভবিষ্যতে নরসুন্দরের কুটীরশিল্পটা বিদ্যুৎচালিত কারখানা শিল্পে পরিণত হবে না তো? সুন্দরীরা দলে দলে কলের নিচে মাথা পেতে slot-এ ছ'পেনি ফেললে আপনা আপনি চুল ছাঁটা টেরি কাটা ঢেউ খেলানো, শিং-বাঁকানো কান-ঢাকানো কলপ-মাখানো পাঁচ মিনিটে সমাপ্ত হবে না তো?

এবার ব্যাঙ্কের কথা ব'লে আজকের মতো পাৎতাড়ি গুটাই। সকল বাবুয়ানা সত্ত্বেও ইংরেজরা হিসাবী জাত, যেমন ফুর্তি করে তেমনি খাটে এবং খাটুনির অর্জন থেকে যতটা ব্যয় করে ততটার বহুগুণ সঞ্চয় করে। ব্যাঙ্ক হচ্ছে প্রত্যেকের খাজাঞ্চিখানা ঘরে টাকা না রেখে সেইখানে গছিয়ে দেয় ও দরকার হলেই চেক লিখে দেয়। আমাদের বাড়ির ঝিও ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেয়, সে টাকা দেশের ব্যবসাবাণিজ্যে খাটে, তার থেকে সে সুদ পায়। ইংলণ্ডে অগণ্য ব্যাঙ্ক আছে, পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙ্কের শাখা। পাড়ায় ঐ ব্যাঙ্কটি না থাকলে পাড়ার ঐ ন'টি দোকানও থাকত না, ইংলণ্ডের এ সমৃদ্ধিও থাকত না, আমাদের বাড়ির ঝি টাকা না জমিয়ে উড়িয়ে দিত কিংবা মাটিতে পুঁতে টাকার ব্যবহারই করত না। ব্যাঙ্ক থাকায় আমাদের বাড়ির ঝি'র দশ বিশ টাকা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরছে, এই মুহূর্তে হয়তো নিউজিল্যাণ্ডের চাষারা ও-টাকা ধার নিলে, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনির মালিকেরা ও-টাকার সুদ দিলে, কিংবা হাওড়ার পাটের কলওয়ালারা ও-টাকার শেয়ারে ওর দুগুণ ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করলে।

।। তিন ।।

নতুন দেশে এলে মানুষের সব ক'টা ইন্দ্রিয় এক সঙ্গে এমন সচেতন হ'য়ে ওঠে যে, মিষ্টান্নের দোকানে শিশুর মতো মানুষ কেবলি উতলা হ'য়ে ভাবে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা দেখি, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা শুনি, কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নিই। একান্ত তুচ্ছ যে, সেও নবীনত্বের রসে ডুব দিয়ে রূপ-কথার দাসী-কন্যার মতো রাণীর যৌবন নিয়ে সম্মুখে দাঁড়ায়। বলে, দেখ দেখ আমাকে দেখ, আমি ভালো নই মন্দ নই, সুন্দর নই কুৎসিত নই, আমি রূপবান আমি নতুন। তখন মানুষের ভিতরকার রসিকটি দেহ-দুর্গের চার দেয়ালের দশ জানলা খুলে দিয়ে জানলার ধারে বসে। সে নীতিনিপুণ নয়, সে ভালোমন্দ ভাগ ক'রে ওজন ক'রে বিচার করতে পারে না, সে কেবল দেখতে শুনতে চাখতে ছুঁতে চায়; কিন্তু কত দেখবে কত শুনবে কত চাখবে কত ছোঁবে! হায়, আমার যদি সহস্রটা চোখ সহস্রটা কান থাকত, আর থাকত সহস্রটা—না, না, পাঁচশোটা—মন, তাহলে জগতের আনন্দ-যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ এমন ব্যর্থ যেত না। তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে বাতির নিচে আগুনের দিকে পিঠ ক'রে ব'সে 'বিচিত্রা'র জন্যে ভ্রমণকাহিনী লিখতুম না, আমি আরেক বিচিত্রার দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী অফুরন্ত লীলা উপভোগ করতে পথে বেরিয়ে পড়তুম। কিন্তু দ্যুলোকব্যাপী?—হায়, লণ্ডনের কি দ্যুলোক আছে! লণ্ডনের লঙ্কাপুরীতে ভুবনের ঐশ্বর্য আহৃত, কিন্তু লণ্ডনের আকাশ নেই, সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, তারা নেই। দিনের পর দিন যায়, সূর্য ওঠে না, আকাশ মানিনীর মতো মুখ আঁধার ক'রে রাখে, আর আমরা নিরীহ লণ্ডনবাসীরা পিতামাতার দ্বন্দ্বে অবোধ শিশুর মতো অবহেলিত হ'য়ে আলোর ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হই। আমাদের জ্যেষ্ঠরা যাঁরা লণ্ডনের কোলে দীর্ঘকাল আছেন তাঁরা হিন্দু বিধবার মতো উপবাস সইতে অভ্যস্ত, কিন্তু আমরা কনিষ্ঠরা আলোর দেশ থেকে সদ্য আগন্তুক, ডাল ভাতের বদলে মাংস রুটি খেয়ে দেহ ধারণ করতে যদিচ পারি, তবু সূর্যের আলোর অভাবে গ্যাসের আলো ছুঁইয়ে মনের বৃন্তে ফুল ধরাতে পারিনে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে এলে, শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগে অর্জুন যেমন গাণ্ডীব তুলতে অক্ষম হয়েছিলেন,

রবির বিরহে কবিতা লিখতে তেমনি অক্ষম হন। আলোর দেশের মানুষের দেহ আলোব সঙ্গে ছন্দ রেখে গড়া, তার লোমকূপে-কূপে আলোর আকাঙ্ক্ষা জঠরজ্বালার মতোই সত্য। সেই দেহের ওপরে যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনবচ্ছিন্ন অন্ধকারের চাপ পড়ে তখন মন বেশি দিন অস্বস্তির ছোঁয়াচ এড়াতে পারে না, সূর্যাস্তের পরে তরুর মতো মাথা যেন নিস্তেজ হ'য়ে নুয়ে পড়ে।

এক একদিন কালো কুয়াশায় দিনের ভিতর রাতের জের চলে, রাতের দুঃস্বপ্ন যেন বুকের ওপরে ব'সে ক্ষান্ত হয় না দিনের বেলা মনেরও ওপরে চাপে। এক একদিন শাদা কুয়াশায় সামনের মানুষ দেখা যায় না, পদাতিকের দল 'চলি-চলি-পা-পা' ক'রে শিশুর মতো হাঁটে, মোটব গাড়িতে ঘোড়ার গাড়িতে মন্থরতার প্রতিযোগিতা বাধে, তবু তো শুনি গাড়িতে গাড়িতে মাথা ফাটাফাটি হয়, পথের মানুষ গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে। হঠাৎ এক একদিন মেঘ-ধোঁয়া-কুয়াশার পর্দা তুলে আকাশের অন্তঃপুরে সূর্যের পদপাত হয়, আমাদের মুখের ওপরে খুশির হাসির লহর খেলে যায়। দু'তিন সপ্তাহে একদিন ক'রে আলোর জোয়ার আসে, দু'এক ঘণ্টায় তার ভাঁটা পড়ে, তবু সেই দু'টি একটি ঘণ্টার জন্যে আমরা সমরখন্দ ও বোখারা দান করতে রাজি আছি। এক সহস্র ক্যাণ্ডল্-পাওয়ার-বিশিষ্ট বিজলির আলোর চেয়ে এক কণা সূর্যের আলোর দাম যে কত বেশি তা যেদিন নয়নঙ্গম হয়, সেদিন

'না চাহিতে মোরে যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ'

সে মহাদানের মূল্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে লণ্ডনের বিভবসম্ভোগ তুচ্ছ মনে হয়। দৈবাৎ এক আধবার চাঁদ দেখা দেয়। আমার বিরহী বন্ধুটি খবর দিয়ে যায়—চাঁদ উঠেছে। সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে আসা চাঁদ, কোন্ বিরহিণীর পাঠিয়ে দেওয়া চাঁদ। আমাদের কাছে চাঁদের মতো আশ্চর্য আর নেই, সে তো কেবল আলো দেয় না, সে দেয় সুধা। বিজলীর আলোর সঙ্গে তার তফাৎ ঐখানে। সভ্যতা আমাদের কেরোসিনের আলোর পরে গ্যাসের ও গ্যাসের আলোর পরে বিজলীর আলো দিয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দয়া ক'রে যে সুধাটুকু দিয়েছে সভ্যতা তার পরিমাণ বাড়াতে পারেনি।

কথা হচ্ছিল নতুন দেশে এলে মানুষের সব কটা ইন্দ্রিয় একসঙ্গে এমন সচেতন হয়ে ওঠে যে, মানুষের দশা হয় সেই ভদ্রলোকের মতো যে ভদ্রলোক একপাল আত্মীয় পরিবৃত হয়ে কাশীতে বা পুরীতে ট্রেন থেকে নামেন। দশটা পাণ্ডা যখন দশটি আত্মীয়কে ছিনিয়ে নিয়ে দশদিকে রওনা হয় এবং আরো দশটা এসে কর্তার দশ অঙ্গে টান মারে, তখন তাঁর যে অবস্থা হয় আমার মনেরও এখন সেই অবস্থা। ঘর ছেড়ে একবার যদি বা'র হই তো লণ্ডন শহরের সব ক'টা রাস্তা একসঙ্গে আহ্বান করতে থাকবে, 'এদিকে, বন্ধু, এদিকে', সব ক'টা মাঠ উদ্যান, সব ক'টা মিউজিয়াম আর্ট গ্যালারি থিয়েটার কন্সার্ট সমবেতস্বরে গান ক'রে উঠবে, 'এখানে বন্ধু, এখানে।' তাদের আহ্বান যদি নাই শুনি, যদি কোনো একটা রাস্তা ধ'রে ক্ষ্যাপার মতো যেদিকে খুশি পা চালাই, তবে মানব-মানবীর শোভাযাত্রা থেকে কত রঙের পোশাক কত ভঙ্গির সাজ কত রাজ্যের ফুলের মতো মুখ আমার চোখ দু'টিকে এমন ইঙ্গিতে ডাকবে যে, মনটা হাল ছেড়ে দিয়ে ভাববে, এর চেয়ে চুপ ক'রে ঘরে ব'সে ভ্রমণকাহিনী লেখা ভালো, বৈরাগ্যবিলাসীর মতো সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ ক'রে সর্ব প্রলোভনের অতীত হওয়া ভালো, সুরদাসের মতো দু'টি চক্ষু বিদ্ধ ক'রে ভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া ভালো।

আমি ঘরে ব'সে লিখছি, আমার চোখজোড়া অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ভূপ্রদক্ষিণে বেরিয়েছে। প্রথমে যেখানে গেল সেটা আমাদের বাড়ির পাশের টেনিসকোর্ট, সেখানে যুবক যুবতীরা লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে ছুটে হেসে হেসে খেলছে। যে দুটো জাতির পরস্পর থেকে শত হস্ত ব্যবধানে

থাকা উচিত, সেই দুটো জাতি যে বয়সে মানুষের শিরায় শিরায় ভোগবতীর বন্যা ছোটে সেই বয়সে কেবল যে স্বাস্থ্যের জন্যে শীতবাতাসের মধ্যে আঁধার আকাশের তলে খেলা করছে তা নয়, সেই সঙ্গে এত প্রচুর হাসছে যে ভারতবর্ষের লোক মোহমুদ্‌গরের আমল থেকে আজ অবধি সব মিলিয়ে এত হাসি হাসেনি। আমার চোখ ঘরের জানলা ছেড়ে রাস্তায় নামল। আমাদের পাড়ার বাড়িগুলো এক-পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত বকের মতো নিস্তব্ধ। এটা একটা শহরতলী। সামনের বাড়ির ঝি মাটিতে হাঁটু গেড়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সিঁড়ির উপর ন্যাতা বুলোচ্ছে, তার হাত প্রতি দেশের কল্যাণী নারীর হাত, ধূলা যার স্পর্শ পেয়ে প্রত্যহ শুচি হয়। আমার চোখ এগিয়ে চলল। এর পরের রাস্তাটা পাহাড় থেকে নেমেছে, তার নামবার মুখে খাস লণ্ডন। নামতে নামতে দেখছি ছোট ছেলের দল পায়ে চাকা বেঁধে ফুটপাথের ওপর দিয়ে সোঁ ক'রে নেমে চলেছে, চলতে চলতে বাধালো হয়তো কোনো বুড়ো ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা, বার্ধক্যের চোখ তারুণ্যের দিকে কোমল ভাবে চাইল। ছোট মেয়েরা দোকানের কাঁচের বাইরে থেকে ভিতরের কেক্ চকোলেটের দিকে লুব্ধ নিরাশ দৃষ্টি ফেলছে, হয়তো দার্শনিকের মতো ভাবছে, কমল যদি এত সুন্দর তো কমলে কন্টক কেন? চকোলেট যদি এত সুস্বাদ তো চকোলেটের চারপাশে কাঁচের বেড়া কেন? আমার চোখ পথে চলতে চলতে দেখছে মদের দোকানের ওপর বিজ্ঞাপনের নামাবলী, গির্জার দ্বারদেশে মুদ্রিত ধর্মানুশাসন, কসাইয়ের দোকানে দোদুল্যমান হৃতচর্ম পশুর শব, কেমিস্টের দোকানে নানারোগের দাওয়াই, পোশাকের দোকানের কাঁচের একপারে হঠাৎ-থামা নারীর কৌতূহলদৃষ্টি, অন্যপারে চোখ-ভুলানো পোশাকের নমুনা ও দাম। ফলের দোকানের কর্মচারিণী বাইরের কাঁচ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করছে। 'এমপ্লয়মেণ্ট এজেন্সী'-র কর্ত্রী ঝিদের জন্যে গিন্নী ও গিন্নীদের জন্যে ঝি ঠিক ক'রে দিচ্ছে। সরকারী ইস্কুলের এক প্রান্তে ছেলেরা ও অপর প্রান্তে মেয়েরা সমান বিক্রমে মাতামাতি করছে; তাদের ভাগ্য ভালো, ভারতবর্ষে জন্মায়নি; সে দেশে জন্মালে এতদিনে ছেলেরা গোপাল হ'য়ে উঠতো, মেয়েরা মেয়ের মা হতো।

আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশনের কাছে এসে আমার চোখ দোটানায় পড়েছে— ট্রেনে চড়বে, না, বাসে উঠবে? বাসেই উঠল, দোতালার এককোণে আসন নিল। দুপাশে দোকান বাজার—দোকানে ক্রেতা ক্রেত্রীর ভিড়—কর্মচারিণীদের ব্যস্ততা—উভয়পক্ষে শিষ্টাচার। রেস্তরাঁ—দলে দলে নরনারী আহারে রত—পরিবেশনকারিণীদের মরবার ফুরসৎ নেই—ছুরি কাঁটা প্লেটের ঝনৎকার—সুখভোগ্য খাদ্যপেয়ের সুগন্ধবাহী ধোঁয়া। রেস্তরাঁর বাইরে অন্ধ ভিক্ষুক চীরধারিণী পত্নীর হাত ধ'রে দেশলাই বেচছে বা বাজনা বাজাচ্ছে বা ফুটপাথে ছবি আঁকছে। রাস্তা মেরামত করছে কুলিরা, তাদের পরিধান কাদামাখা ও জীর্ণ, মুখে প্রতি দেশের কুলী-মজুরের মতো সরলতাব্যঞ্জক প্রাণখোলা হাসি। জমকালো পোশাক পরা অশ্বারোহী সৈনিক চলেছে, বুড়ীরা হাই তুলতে তুলতে নির্নিমেষে দেখছে। গতযুদ্ধে তাদের এমনি-সব ছেলেরা তো মরেছে। তরুণীরা গৃহবাতায়ন থেকে উল্লাসধ্বনি করছে, যৌবন যে ঠেকেও শেখে না, হারিয়েও হারায় না। থিয়েটারের ম্যাটিনীর সময় হলো—টিকিট কেনবার জন্যে স্ত্রী-পুরুষ 'কিউ' (queue) ক'রে দাঁড়িয়েছে—দু'জনের পেছনে দু'জন—পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি। সর্বত্র পুরুষের চেয়ে স্ত্রী সংখ্যা বেশি—সভাসমিতিতে স্কুলে কলেজে থিয়েটারে কন্সার্টে দোকানে আপিসে সর্বত্র নারীর আক্রমণে পুরুষ পলাতক—কেরানী মানে নারী, স্কুল শিক্ষক মানে নারী, গৃহভৃত্য মানে নারী। রাস্তার মোড়ে বাস থামল—শালপ্রাংশু বলিষ্ঠকায় পুলিশের তর্জনী-সংকেতে শতশত বাষ্পীয় যান থেমেছে—শতশত নরনারী রাস্তা পারাপার করছে—মেয়েরা ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে ভিড়ের মধ্যে ছুটে মিলিয়ে

যাচ্ছে—ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ছে—শিশু কাঁখে নিয়ে শিশুর বাবা তার মা'র পশ্চাদবর্তী হচ্ছেন—বুড়ীকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে বুড়ীর ছেলেমেয়েরা মাঠে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে—প্রেমিক যুগল হাতে হাত জড়িয়ে বাজার ক'রে ফিরছেন। বাস চলতে আরম্ভ করল—একটা পার্কের কাছ দিয়ে যাচ্ছে—পার্কের বেঞ্চিতে বসে কাগজ পড়তে পড়তে দরিদ্ররা রুটি কামড়ে খাচ্ছে—তাদের মধ্যাহ্ন ভোজনটা দু'একখানা রুটিতেই সমাপ্ত হচ্ছে।

বাস কলেজের কাছে থামতেই আমার চোখজোড়া তৎক্ষণাৎ নেমে প'ড়ে দৌড় দিলে কলেজের অভিমুখে। কোনো অগ্রগামিনী হয়তো দয়া ক'রে দরজাটা খুলে রাখলেন, প্রবেশ ক'রে ধন্যবাদ দিয়ে কপাটটা খুলে ধরা গেল পশ্চাদাগতের জন্যে। তারপর ক্লাসে গিয়ে আসন অধিকার করা—অধ্যাপকের আগমনের আগে মেয়েদের তুমুল ফিস ফাস—কে কী সাজ ক'রে এসেছে অন্যমনস্কতার ভান ক'রে দেখা ও দেখানো—লাফ দিয়ে পেছনের চেয়ার থেকে সামনের চেয়ারে যাওয়া—অধ্যাপকের প্রবেশ—অধ্যাপকোবাচ—সুবোধ বালিকাদের কর্তৃক একান্ত তন্ময়ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথার শ্রুতিলিখন—পলাতকমতি উন্মনা বালক কর্তৃক উপন্যাসপাঠ বা কবিতাসংরচন—বার বার ঘড়ির দিকে চাতক দৃষ্টিক্ষেপ—অবশেষে ছাত্র ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ—ধাক্কাধাক্কিপূর্বক ক্লাস থেকে বহির্গম।

নতুন দেশে এলে কেবল যে সব-কটা ইন্দ্রিয় সহসা চঞ্চল হ'য়ে ওঠে তা নয়, সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে খোলস ছাড়তে ছাড়তে কখন যে নতুন হ'য়ে ওঠে তা দেশে ফিরে গেলে দেশের লোকের চোখে খট্‌ ক'রে বাধে, নিজের চোখে ধরা পড়ে না। মানুষ খাদ্য পেয় সম্বন্ধে বোধ হয় কিছু রক্ষণশীল, দেশী রান্নার স্বাদ পেলে রসনা আর কিছু চায় না। কাঁচা বাঁধাকপি চিবিয়ে খেতে যতখানি উৎসাহ দরকার, বাঁধাকপির ডালনা-চাখা রসনা কোনো জন্মে ততখানি উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারে না। কিন্তু পরিচ্ছদ সম্বন্ধে মানুষের এতটা রক্ষণশীলতা নেই। দেশে যখন এক-আধ দিন কোট-ট্রাউজার্স পরা যেত তখন সে কী অস্বস্তি! আর সে কী সাহেব-মানসিকতা! ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালীগুলোর উপরে তখন কী অকারণ করুণা! জাহাজে থাকবার সময় জাহাজী কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে ধুতি পাঞ্জাবি পরার স্মৃতি মনে প'ড়ে গেলে হাসি পায়। এতদিনে ইউরোপীয় ধড়াচূড়া গায়ে ব'সে গেছে, চব্বিশ ঘন্টা এই বেশে থাকতে একটুও বেখাপ্পা বোধ হয় না; এখন মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক, যেন এই পোশাক প'রে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। প্রতিদিন যন্ত্রচালিতের মতো টাইটা বাঁধি, ট্রাউজার্স জোড়াটার হাঁ-দুটোতে পা-জোড়াটা গলিয়ে দিই, মণখানেক ভারি ওভারকোটটার বাহন হ'য়ে চলি। দৈবাৎ কোনোদিন ধুতি পাঞ্জাবি চাদর বার ক'রে পরি তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনে, আমোদের অন্ত থাকে না, জগৎকে দেখিয়ে আসতে ইচ্ছে করে আমাদেরও জাতীয় পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কি একটা? মাদ্রাজী ভায়াদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ভায়াদের আপাদমস্তক অমিল, বাঙালী মুসলমান পেশোয়ারী পাঠানের যমজ ভ্রাতা নন। আমার সফেদ ধুতি আর সবুজ পাঞ্জাবিটার ওপরে নীলকৃষ্ণ উত্তরীয়খানা জড়িয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াই তো রাস্তায় ভিড় জমে যাবে; পুলিশ যদি বা আমাকে মানুষ ব'লে না চিনতে পেরে চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষদের হাতে সমর্পণ না করে তো ট্রাফিক বন্ধ করার অজুহাতে সার্বজনীন শ্বশুরালয়ে চালান দেবে।

নতুন দেশে এলে নতুন আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে গোটা মানুষটারই একটা অন্তঃপরিবর্তন ঘ'টে যায়। যাঁরা বলেন তাঁদের পরিবর্তন হয়নি তাঁরা খুব সম্ভব জানেন না কোথায় কি ঘ'টে গেছে।

দেশে ফেরবার সময় তাঁরা সর্বাংশে—এমন কি মতবাদেও—ঠিক সেই মানুষটি থেকেই ফিরতে পারেন, কিন্তু মনেরও অগোচরে মানুষের কোন্‌খানে কোন্ প্যাঁচটি আলগা হ'য়ে যায় তা মানুষ কোনোদিন না জানতে পারলেও সত্যের নিয়ম অমোঘ। নিজেকে জেরা করলে বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে আমার যেন সেই অবস্থা হবে যে অবস্থা হয় দীঘিতে ফিরে গেলে স্রোতের মাছের। ইউরোপের জীবনে যেন বন্যার উদ্দাম গতি সর্বাঙ্গে অনুভব করতে পাই, ভাবকর্মের শতমুখী প্রবাহ মানুষকে ঘাটে ভিড়তে দিচ্ছে না, এক একটা শতাব্দীকে এক একটা দিনের মতো ছোট ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে স্বাভাবিক বোধ হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের প্রতি কাজে সংযুক্ত থেকে নারী ও নরের একস্রোতে ভাসা। নারী সম্বন্ধে এ দেশের পুরুষ দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নিয়ে মুমূর্ষুর মতো বাঁচে না, নারীর মাধুর্য তার দেহকে ও মনকে তুল্যরূপ সক্রিয় ক'রে তোলে। কেবল চোখে দেখবারও একটা সুফল আছে, মানুষের রূপবোধকে তা ঐশ্বর্যান্বিত ক'রে দেয়। নারীকে অবরুদ্ধ রেখে আমাদের দেশের পুরুষ নিজের চোখের জ্যোতিকে নিজের হাতে নিভিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য কোনো বার লিখব। যা আমার কাছে তর্ক নয় রহস্য নয় সহজ অনুভূতি তাই আমাদের দেশের লোকের কাছে বাক্যের সাহায্যে বোঝাতে হবে—দুর্ভাগ্য! বেশ বুঝতে পারি দেশে ফিরে গেলে দেশটা একটা পার্টিশন দেওয়া ঘরের মতো ঠেকবে—একপাশে পুরুষ একপাশে নারী মাঝখানে সহস্র বৎসরের অন্ধ সংস্কার।

আর একটা সহজ অনুভূতি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সমস্কন্ধের মতো মেশা; কোনো ব্রাহ্মণের কাছে নতশির থাকতে হয় না, কোনো দারোগার কাছে বুকের স্পন্দন গুণে চলতে হয় না, কোনো মনিবের কাছে মাটিতে মিশিয়ে যেতে হয় না, মনুষ্যমর্যাদাগর্বে প্রত্যেকটি মানুষ গর্বিত। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিলে এই মুক্ত মানসিকতার অভাব সমস্ত মন দিয়ে বোধ করব, ভারতবর্ষ যে প্রভু-মানসিকতার দাস-মানসিকতার দেশ, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ একজনের দাস অন্যজনের প্রভু।

।। চার ।।

বড়দিনের ছুটিতে লণ্ডন ছেড়ে লেজাঁয় গিয়ে দেখি, সে এক তুষারময় স্বপ্ন, যেন নিসর্গের তাজমহল। নিবিড়-নীল অকূল আকাশে সেটি একটি পর্বত-দিগ্‌বলয়িত নিরালা তুষারদ্বীপ; তার মাটি বরফের, হাওয়া বরফের, মেঘ বরফের: তার জলস্থল-অন্তরীক্ষের ভিৎ দেয়াল ছাদ মর্মরনিভ বরফের। যেন আকাশসিন্ধুর ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়ের পর পাহাড় হয়ে উঠেছে আর ফেনায় ফেনায় মাটির বেলা ঢেকে গেছে। সে আকাশ এত নীল আর এত উজ্জ্বল আর এত সুন্দর যে চাতকের মতো দিবারাত্র অনিমেষ চেয়ে থেকে সাধ মেটে না, মনে হয় এ এক মহার্ঘ বিলাসিতা, শুধু এরি জন্যে এক সমুদ্র একাধিক নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের এক সীমানা থেকে আরেক সীমানা অবধি রেলদৌড় দিয়ে সুইস্ আল্পসের শাখা-শিখরে উঠতে হয়। সে তো লণ্ডনের মাথার ওপরে কালো শামিয়ানার মতো খাটানো দশহাত উঁচু দশহাত চওড়া দশহাত লম্বা আকাশ নয় যে চোখ বাড়ালেই নাগাল পাব, মন বাড়ালেই মাথা ঠুকে মরব, দশদিকের পেষণে ধৃতনিঃশ্বাস হব। লেজাঁয় যেদিন নামলুম সেদিন অসহ আনন্দে নিজেকে শতধা করতে পারলে বাঁচতুম। মুক্ত আকাশের মধ্যে

মানবাত্মার যে মুক্তি সে মুক্তি আর কিছুরি মধ্যে নেই। সেই আকাশকে যারা কয়লার ধোঁয়া দিয়ে কালো ক'রে দশতালা বাড়ির ঘের দিয়ে খাটো ক'রে তুলেছে তারা কুবের হলেও কৃপার পাত্র, তারা স্বখাদ-সুড়ঙ্গতলের যখ।

সেই উজ্জ্বল নীল প্রশস্তপরিধি আকাশে যখন এক পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য উঠি-উঠি করে, মেঘের মুখে সেই সংবাদ পেয়ে আর-পাহাড়ের এপারের বরফ হীরের মতো ঝক্‌মক্ করে, রঙের সপ্তকের ওপর আলোর আঙুল ঝল্‌মল্ ঝিল্‌মিল্ ক'রে পিআনোর ঝংকার তুলে যায়, তখন এক মুহূর্তের জন্যে অনুভব করতে পারি আদিযুগের ধ্যানীর চেতনায় কেমন জ্যোতি ঝলসে উঠেছিল, কোন্ আবিষ্কারের অসম্বরা বাণী তাঁর কণ্ঠভেদ ক'রে আপনি ফুটেছিল, কিসের আনন্দে তাঁকে বলিয়েছিল শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ...

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সারাদিন সূর্য কিরণ ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চলে আর মাটির বরফ মাঠের বরফ গাছের বরফ ছাদের বরফ ঝরণার বরফ পাহাড়ের বরফ কখনো সোনা হয়ে ওঠে রূপালী রঙের মুকুরে সোনালী মুখের ছায়ার মতো, কখনো রাঙা হয়ে ওঠে শ্বেত-পদ্মিনীর কপোলে অশোক-রঙা লজ্জার মতো, কখনো নীলাভ হয়ে ওঠে শ্বেত-শঙ্খিনীর নয়নতারার নীল চাউনির মতো। সূর্য বিদায় নিলে চন্দ্রের পালা। চাঁদের অপলক দৃষ্টির তলে তুষারময়ী পুরী বিবশার মতো শায়িতা, তার তরুণ দেহের নিটোল কঠিন চূড়ায় চূড়ায় জ্যোৎস্নার চুম্বন, তার রজত আভরণের গাত্রে তারার ঝিকিমিকি। দন্তুর পর্বতের সারি পার্শ্বরক্ষীর মতো সারারাত্রি পাহারা দিচ্ছে, বিমুগ্ধা 'শালে'গুলি গবাক্ষের ঘোমটা তুলে বিজলী-আলোর উঁকি মেরে দেখছে, টোপর-পরা পাইনগাছের দল স্থগিতযাত্রা পদাতিকের মতো খাড়া রয়েছে।

শুধু শোভা নয়, সংগীত। এক নিশান্ত থেকে আরেক নিশান্ত অবধি মিষ্টিসুরের নহবৎ বাজে গ্রাম-কুক্কুটের অনবসন্ন কণ্ঠে, তার সঙ্গে সুর মিলায় স্লেজ্‌বাহী অশ্বের গলার ঘণ্টা, তার সঙ্গে তাল দেয় গিরিগৃহত্যাগিনী অভিসারিণী ঝরণার 'চল্ চল্ চল্'। দিনের কাজের সঙ্গে রাতের স্বপ্নের সঙ্গে চেতনার আড়ালে ধ্বনি মিশিয়ে রয়, যারা কাজ করে স্বপ্ন দেখে তারা হয়তো শুনতে পায় না জানতে পারে না কিসে তাদের অমৃত দেয়।

কাজ? সেখানকার কাজের নাম খেলা। ডাকঘরের ছোকরা চিঠি বিলি করতে যাচ্ছে, তার গাড়িখানার না আছে চাকা না আছে ঘোড়া, দুই হাতে একবার ঠেলা দিয়ে দুইপায়ে দিলে গাড়ির মধ্যে লাফ, গাড়ি চলল বরফ-ঢাকা ঢালু রাস্তায় পিছলে, এক রাস্তার থেকে আরেক রাস্তায় বেঁকে, এক দরজার থেকে আরেক দরজায় থেমে। এক বাড়ির লোক আরেক বাড়ি যাচ্ছে, যার পিঠে চ'ড়ে বসেছে সেটার নাম লুজ, উঁচু একখানা পিঁড়ির মতো তার আসনটা, বাঁকা দুখানা শিঙের মতো তার পায়া দুটো, চ'ড়ে ব'সে পা তুলে নিয়ে হাত ছেড়ে দিলে বরফের রাস্তার ওপর ঘষতে ঘষতে চলে। যারা খেলা-ই করতে চায় তারা দুই পায়ে দুটো নৌকাকৃতি কাঠ বেঁধে হাতে লগি তুলে নিচ্ছে, আর দুই নৌকায় পা রেখে জমাট জলের ওপর দিয়ে রসাতলে নেমে যাচ্ছে। এরি নাম শী-খেলা (Skiing)। শুধু খেলা করতে কত দেশ থেকে কত পুরুষ কত নারী প্রতি শীতকালে সুইট্‌জারলণ্ডে আসে, বরফের ওপর দিয়ে পাহাড়ে ওঠে, শী করে, স্কেট করে, লুজে চড়ে, স্লেজে চড়ে। কী অমিতোদ্যম স্বাস্থ্যচর্চা বলচর্চা যৌবনচর্চা! ভূতের মতন খাটতে পারে শিশুর মতন খেলতে পারে, যুবক যুবতীর তো কথাই নেই, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উৎসাহ দেখলে মনে হয় বানপ্রস্থে গেলে এরা বনকে জ্বালাত। খাটো আর খেলো আর খাও—এই হচ্ছে এদের ত্রি-নীতি। ইউরোপে এতদিন আছি,

কাঁদতে কাউকে দেখিনি, কান্নাটা এদের ধাতবিরুদ্ধ। যার মুখে সহজ হাসি নেই তার অন্ততঃ হাসির ভান আছে, কিন্তু সহজ হাসি নেই এমন মানুষ তো দেখিনে। আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে খুব একটা গভীরতার দাগও কারো মুখে দেখিনে; তরঙ্গহীন শান্তি অন্তঃসলিলা অনুভূতি অতলস্পর্শী তৃপ্তি কারো চোখে মুখে চলনে বলনে দেহের গড়নে লক্ষ্য করিনে। সাত্ত্বিকতার চর্চা ইউরোপে নেই, কোনোকালে ছিল না। ইউরোপের খ্রীস্টধর্ম যীশুর ধর্ম নয়, সেণ্টপলের ধর্ম—রামের ধর্ম নয়, হনুমানের ধর্ম। তার মধ্যে বীর্য আছে, লাবণ্য নেই।

কিন্তু লাবণ্য নাই থাক, ক্লীবত্ব নেই। প্রচণ্ড শীতে যে দেশে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায় দেহকে সে দেশে মায়া বলে কার সাধ্য? দেহরক্ষার জন্য সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্যে দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে, হয় উপনিষৎ লিখতে নয় মোহমুদ্গর লিখতে, ইউরোপের লোক কোনো দিনই পারলে না। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনকে নিয়ত উত্তপ্ত রাখতে যারা ব্যাপৃত, শীতল শান্তির সুযোগ-অবকাশ তাদের দেহ মনের আবহাওয়ায় কই? এদের ভিতরে বাইরে কেবলি দ্বন্দ্ব কেবলি ব্যস্ততা, এদের মনীষীরা সত্যকে পান দ্বৈরথ-সমরে, তাঁদের মনন একটা যুদ্ধক্রিয়া। এদের দেহীরা নিজের অভাব মেটায় প্রকৃতির স্তনে দাঁত বসিয়ে, তাদের জীবনধারণ প্রকৃতির ওপর দস্যুতায়। ইউরোপের মাটি বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না, বিনা যত্নে তাতে নীবার ধান্য গজায় না, তার ঝরণার জল এত হিমেল যে স্টোভে গরম না করলে ব্যবহারে লাগে না। বাল্মীকি যদি এ দেশে জন্মাতেন তবে ধ্যান করতে ব'সে বল্মীকে নয় বরফে ঢেকে যেতেন; বুদ্ধদেব যদি এ দেশে জন্মাতেন তবে তপস্যায় ব'সে কোনো সুজাতার কল্যাণে ক্ষুধাশান্তি করতে পেতেন হয়তো, কিন্তু বেশিক্ষণ খালি গায়ে থাকলে তাঁকে যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়ের সুজাতাদের শুশ্রূষা গ্রহণ করতে হতো।

ইউরোপের সেই নিষ্ঠুরা প্রকৃতিকে মানুষ দেবী ব'লে পূজা করেনি, কালী ব'লে তার পায়ের তলায় নিজের শব বিছিয়ে দেয়নি, তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে নিজের বাঁশির সুরে খেলিয়েছে, তাই একদিন যে ছিল নিষ্ঠুর আজ সেই হয়েছে কৌতুকের। তাই বরফ পড়লে কোথায় ভয় পেয়ে ঘরে লুকিয়ে আগুন জ্বালবে, না, মানুষ বেরিয়ে পড়ল বরফের বুকের উপর পা রেখে কালীয় দমন করতে—স্কেট করতে শী করতে লুজে চড়তে শ্লেজে চড়তে।

সুইট্জারলণ্ডের এই পার্বত্য পল্লীটি জেনেভা হ্রদের অনতিদূর ও অনতিউচ্চে। প্যারিস থেকে লোজান ছাড়িয়ে মিলানের পথে ট্রিয়েস্টের অভিমুখে যে রেলপথটি এঁকে বেঁকে চলে গেছে এগ্লের কাছে তাকে নিচে রেখে অন্য একটি রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড়ে উঠতে হয়। এই রেলপথটি শীর্ণকায়, এবং এর ট্রেনগুলি ছোট। পাহাড়ের ওপর ওঠবার সময় পেছনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে শিশুর মতো হামাগুড়ি দেয়, পোকার মতো মন্থর বেগে চলে। পথের দু'পাশে দু'সারি পাহাড় কিংবা একপাশে পাহাড় ও একপাশে খাদ। দু'পাশে পাইনের বন, বনের ফাঁক দিয়ে ঝরণা ঝরে পড়ছে। পাইনের কাঁচা চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছে বরফ-গুঁড়ো, ঝরণার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াচ্ছে বরফের বাঁধ।

গ্রামটি নিকট হয়ে এলে একটি দু'টি ক'রে 'শালে' দেখা দেয়। 'শালে' (Chalet) হচ্ছে এক ধরনের বাড়ি, যেমন আমাদের দেশে 'বাংলো'। বাড়ির আগাগোড়া কাঠের, কেবল ছাদটা হয়তো শ্লেটের এবং ভিতরটা হয়তো পাথরের। প্রত্যেকটির গড়ন স্বতন্ত্র, স্থিতি ছাড়া-ছাড়া, আকার বিভিন্ন এবং রঙের সমাবেশ বিচিত্র। দো-চালা ছাদ, ঝুলানো বারান্দা, ছোট্ট গবাক্ষ, জ্যামিতিক নক্সা, রঙিন আলপনা, উৎকীর্ণ উক্তি, দু'তিনশো বছর বয়স—সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি এমন একটি বিশিষ্ট

দৃশ্য যে একবার চাইলে চোখ আটকে যায়, ফিরিয়ে নেবার সাধ্যি থাকে না। দেশটির প্রকৃতি এত সুন্দর, তাতেও মানুষের তৃপ্তি হলো না, সে ভাবলে এমন সুন্দর আকাশ এমন সুন্দর পাহাড় এমন সুন্দর বরফ পাইন ঝরণা, দশদিকে এমন অকৃপণ সৌন্দর্য, কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়? এই ভেবে সে বাহিরের সৌন্দর্যের অঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্য মাখিয়ে দিলে, সকলের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব জুড়ে দিলে, বিধাতার সৃষ্টি আর মানুষের সৃষ্টি, এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। তিন dimensionএর ছবির মতো বহুকোণ 'শালে', ধাপে ধাপে লাফ-দিয়ে-নামা পাথর-বাঁধানো ঝরণা, বাঁকে বাঁকে ঘুরে-ঘুরে-নামা পাহাড়-কাটা রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে গাছ, রাস্তার স্থানে স্থানে বেঞ্চি, দুশো তিনশো বছরের বাড়িতেও অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য, বিজলী আলো জলের কল সেন্ট্রাল হীটিং। ইউরোপের লোক যুগোচিত পরিবর্তন বোঝে। সেইজন্যে চার হাজার ফুট উঁচু পর্বতশ্রেণীর পিঠে নিরালা একটি ছোট্ট গ্রামে বাস ক'রে কোনো কিছুর অভাব বোধ করে না। লেজাঁর পাঁচ দশ মাইল দূরের দু'টি গ্রামে বেড়িয়ে এসেছি, সে সব গ্রামেও কমবেশি এমনি স্বাচ্ছন্দ্য, অস্থায়ী পর্যটকদের জন্যে অন্ততঃ কয়েকটি কাফে তো আছেই।

লেজাঁ গ্রামটিতে দু'তিন হাজার লোকের বাস, তাদের বোধ হয় অর্ধেক নানাদিগ্‌দেশাগত যক্ষ্মারোগী। ইংরেজ আমেরিকান জার্মান ওলন্দাজ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান পর্তুগীজ ইতালিয়ান জাপানী ভারতীয়—কত নাম ক'রব। তাঁদের মধ্যে আমাদের এক বাঙালী ভদ্রলোকও আছেন, তাঁর ভাই 'রমলা'-কার মণীন্দ্রলাল বসু মহাশয় তাঁর তত্ত্ব নেন।

যক্ষ্মারোগের সৌরচিকিৎসার পক্ষে এই স্থানটির উপযোগিতার কারণ এখানে সূর্যের আলো প্রচুর অথচ তার আনুষঙ্গিক তাপপ্রাচুর্য নেই। শীত ও রৌদ্রের এহেন সমাবেশ অন্যত্র বিরল। পার্বত্য হাওয়া, মুক্ত প্রকৃতি, স্তব্ধ গ্রাম, পাখির গান, পাইনের মর্‌মর্‌, ঝরণার কল্‌কল্‌, বাসি শেফালীর মতো অতি আলগোছে মৃদু তুষারপাত। একত্র এত গুণ কোন্‌ শহরের ক'টা গ্রামের আছে? রোগীর জন্যে কেবল প্রাকৃতিক নয় কৃত্রিম আনন্দেরও বহুল ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের জন্যে ছোট বড় বহু-সংখ্যক ক্লিনিক, তাদের আত্মীয়দের জন্যে বহুসংখ্যক হোটেল, উভয়ের জন্যে দোকান বাজার ডাকঘর ব্যাঙ্ক সিনেমা গির্জা কাফে। বড় ক্লিনিক ও বড় হোটেলগুলিতে নাচগানের বন্দোবস্ত। যারা দু'তিন বছর একাদিক্রমে শয্যাশায়ী, যাদের পাশ ফিরে শুতেও দেওয়া হয় না, তাদের নিজের নিজের ঘরে গ্রামোফোন বাজছে কাগজপড়া হচ্ছে খাবার পৌঁছচ্ছে নার্স পরিচর্যা করছে বন্ধুরা গল্প করছে। নিজের নিজের ঘর থেকে শয্যাসমেত তুলে নিয়ে তাদের সকলকে একঠাঁই একজোট ক'রে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে সকলে মিলে গল্প করছে কন্সার্ট শুনছে সিনেমা দেখছে এবং তাদের বন্ধুবান্ধবীদের নাচ উপভোগ করছে।

একটি বড় ক্লিনিকের কথা বলি। খ্রীস্টমাস ইভে খ্রীস্টমাস ট্রি স্থাপনা হলো, ট্রির ওপরে শতসংখ্যক মোমবাতি জ্বলে উঠল, রোগীদের শয্যাসমেত ব'য়ে এনে সারি ক'রে সাজিয়ে রাখা গেল, তাদের বন্ধুবান্ধবীরা সারি বেঁধে বসলেন, কন্সার্ট চলল, ধর্মোপাসনা হলো, এক প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকারের স্ত্রী ম্যাদাম দুআমেল আবৃত্তি শোনালেন। নিকোলা বুড়ো সেজে একজন এসে যতগুলি ছেলেমেয়ে সেখানে জুটেছিল তাদের সকলকে এক একটা উপহার দিলে, সকলের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করলে। বাতি নিবল, কন্সার্ট থামল, উৎসব শেষ হলো, রোগীরা নিজ নিজ ঘরে ফিরলে—অবশ্য ইতিমধ্যে সকলে মিলে কিছু পানাহার করলে।

একটি ছোটদের ক্লিনিকের কথা বলি। খ্রীস্টমাস ইভ, খ্রীস্টমাস ট্রির শাখায় শাখায় পুতুল ঝুলছে, ইলেকট্রিক আলোর নকল মোমবাতি জ্বলছে, ইংরেজ জার্মান ফরাসী ইতালিয়ান ইত্যাদি

নানাজাতের নানাভাষী রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলি এক একটি শয্যায় দু'জন ক'রে শুয়েছে, তাদের আত্মীয়রা তাদের বিছানার কাছে ব'সে তাদের আনন্দে যোগ দিচ্ছেন, নার্সেরা পিআনো বাজাচ্ছে। প্রেমিক প্রেমিকা সেজে দুটি সুস্থ ছেলেমেয়ে গীতাভিনয় করলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুটি রুগ্ন ছেলেমেয়েতে ডুয়েট হলো, দু'জন নার্স ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সেজে রঙ্গ করলে। ছেলেরা নিকোলা বুড়োর জন্যে অধীর হয়ে উঠল। একটি নার্স এল নিকোলা বুড়ো সেজে, 'নিকোলা এসেছে' 'ঐ রে নিকোলা' 'নিকোলা...নিকোলা' ক'রে সোরগোল প'ড়ে গেল, প্রত্যেকের জন্যে নিকোলা কত উপহার ব'য়ে এনেছিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রত্যেকে উপহারের ভারে চাপা পড়তে লাগল, কত রকমের খেলনা, কত রকমের ছবির বই; একজনের একটা ক্ষুদে গ্রামোফোন এসেছিল, সেটা বার ক'রে সে একটা ক্ষুদে রেকর্ড চড়িয়ে দিলে, সকলের তাক লেগে গেল। এতজনের এত উপহার এসেছিল যে স্বয়ং ক্লিনিকের কর্ত্রী এসে নিকোলার সাহায্য করতে লাগলেন, নার্সেরা ছুটোছুটি ক'রে যার উপহার তার বিছানায় পৌঁছে দিতে লাগল। কারো উপহারের পর উপহারই পৌঁছচ্ছে, কারো দেরি হচ্ছে, সে বেচারা পরের উপহার নাড়াচাড়া ক'রে সান্ত্বনা পাচ্ছে।

বৎসরের শেষ রাত্রের উৎসব (Sylvester) সেই বড় ক্লিনিকে। রোগীরা সেই হলে সমবেত। প্রত্যেকেই একটা-না-একটা ফ্যান্সী পোশাক প'রে এসেছে। যে রোগী দু'তিন বছর এক শয্যায় সর্বদা শুয়ে রয়েছেন তাঁরও কত শখ, তিনি রেড ইণ্ডিয়ানের মতো মাথায় পালখ পরেছেন, কিংবা নকল দাড়ি গোঁফ পরচুলা লাগিয়েছেন। বন্ধুবান্ধবীরাও সেজে এসেছেন—কেউ সেজেছেন দাঁড়কাক, কেউ সেজেছেন মুসলমানী, কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী অভিজাত, কেউ রঙিন কাপড় পরা স্পেনদেশের পল্লীবাসিনী। বন্ধুবান্ধবীদের নাচ হচ্ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, নারীতে পুরুষে বাহু ধরাধরি ক'রে তালে তালে পা ফেলছে, বাজনার সুরটা এমনি যে যারা নাচছে না তাদেরও পা নেচে নেচে উঠছে। দুআমেল বললেন, নাচের বাজনার থেকে ইউরোপীয়ান সংগীতের বিচার করবেন না। দুআমেল আত্মস্থ প্রকৃতির স্বল্পভাষী সুপুরুষ, তাঁর 'Civilization' গ্রন্থখানা ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ Goncourt prize পেয়েছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে নাচ চলল, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। তারপর রোগীদের খাটের কাছে কাছে ব'সে তাদের বন্ধুবান্ধবীদের পানাহার ও রোগীদের শুয়ে শুয়ে যোগদান। রাত বারোটায় বছর বদলাল, দলে দলে গান গেয়ে উঠল, গ্লাসে গ্লাস ঠুকিয়ে নববর্ষের স্বাস্থ্যকামনা করলে। পানাহার শেষে আবার নাচ। ইতিমধ্যে ফ্যান্সী পোশাকের উৎকর্ষ বিচার ক'রে যে কয়জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল দাঁড়কাক তাঁদের মধ্যে প্রথম।

এমনি ক'রে ইউরোপীয়রা রোগশোককে তুচ্ছ করে, খেলার দাপটে জরাকে ভাগিয়ে দেয়। একাদিক্রমে তিন বছর এক শয্যায় শায়িত থাকা কী ভয়ানক দুর্ভোগ তা সুস্থ মানুষে কল্পনা করতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও রোগীদের মুখে হাসি, তাদের আত্মীয়দের মুখে ভরসা, তাদের সেবিকাদের মুখে আশ্বাসনা। মৃত্যুর কাছে ব্যাধির কাছে জরার কাছে কিছুতেই হার মানব না, তালি দিয়ে গান গেয়ে হালকা তালে নেচে যাব—এই হলো ইউরোপের পণ। অনাদ্যন্ত জীবনপ্রবাহে জরা ব্যাধি মৃত্যুর কতটুকুই বা স্থান, সেই স্থানকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা কত সহস্র বৎসর ধ'রে বৈরাগ্য চর্চা ক'রে আসছি, আমাদের সন্ধান সংসার হতে মুক্তি, জীবনশিখার নির্বাণ, আমাদের সাধনা দুঃখকে এড়িয়ে চলবার সাধনা, নিজেকে নিশ্চিন্ত করবার সাধনা। বুদ্ধ-শঙ্কর-রামকৃষ্ণ কেউ তো বলেননি, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।'

স্ত্রীপুরুষের মিলিত নাচ ব্যাপারটাকে আমরা কুনীতিকর ভেবে থাকি, ইউরোপীয়েরা ভাবে

না। ইউরোপে প্রতিদিন নতুন নাচের আমদানি ও উদ্ভাবন চলেছে, নাচ না হলে ওদের উৎসবই হয় না। স্বাস্থ্যবান সমাজ মাত্রেই মিলিত নৃত্যের চলন আছে; আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি আদিমদের নাচ কতস্থানে দেখেছি, তা দেখে কুনীতির কথা মনেই ওঠেনি। অনাদি কাল থেকে যে সব সমাজে উৎসব তিথিতে স্ত্রীপুরুষের যৌথনৃত্য প্রচলিত রয়েছে ও আশৈশব যারা একত্র নাচতে অভ্যস্ত হয়েছে, পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করলে তাদের চিত্তবিক্ষেপ না হবারই কথা। আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র জগতে বাস করেন, নিজের নিকট আত্মীয় আত্মীয়া ছাড়া এত বড় সমাজের যত পুরুষ যত নারী সকলেই পরস্পরের কাছে অলক্ষ্য অস্পর্শ্য। তার ফলে নীতির দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম কৌতূহলের সৃষ্টি ও রুচির দিক থেকে জন্মান্ধতার উদ্ভব। আমাদের রূপবোধের একদেশদর্শিতা স্পর্শবোধের অস্বাভাবিক বুভুক্ষা আমাদের সমাজকে তো ক্লীবত্বের অচলায়তন করেছেই, আমাদের সাহিত্যকেও খণ্ডিত (repressed) রিরংসার ব্যবচ্ছেদাগার ক'রে তুলছে। বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে বিচিত্র গীত শুনতে শুনতে বিচিত্র স্পর্শ পেতে পেতে মানুষের সৌন্দর্যচেতনা বাড়ে, মানুষ সৌন্দর্যবিচারক হয়, এ সবের সুযোগ আমাদের সমাজে বিরল ব'লে আমাদের চিত্রকলা সংগীতকলা ভাস্কর্যকলা মাথা তুলতে পারলে না, আমাদের পোটোরা কেবল দু'দশটি টাইপের নারী-মূর্তি আঁকেন, আমাদের অভিনেত্রীরা অবিদগ্ধা বাঈজী আর ভাস্কর্য আমাদের নেই। চিত্রকরের যেমন জীবন্ত মডেল দরকার ভাস্করেরও তেমনি জীবন্ত মডেল দরকার যার গড়ন সে অনুভব করতে পারবে। আমাদের ছবিই বলো কাব্যই বলো গল্পই বলো এমন ফিকে এমন অবাস্তব এমন এক-ছাঁচে ঢালা হবার কারণ কি এই নয় যে, আমাদের সমাজে একটা সেক্স্ সম্বন্ধে আরেকটা সেক্স্ একান্ত স্বল্পচেতন?

বল্‌রুমের নাচ উঁচুদরের কেন কোনোদরেরই আর্ট নয়। ওটা হচ্ছে সামাজিকতার একটা অঙ্গ, সমাজের দশ জন পুরুষের সঙ্গে দশ জন নারীকে পরিচিত ক'রে দেবার একটা উপায়। যে সমাজে নিজের স্বামী বা নিজের স্ত্রী নিজেকে অর্জন করতে হয় সে সমাজে এই প্রকার পরিচয়ের সুযোগ থাকা আবশ্যক। এমন সমাজে প্রতি পুরুষের পৌরুষের ওপরে সর্বনারীর নারীত্বের দাবী যেমন প্রতি পুরুষকে বলবান প্রিয়দর্শন ও সুগঠিতদেহ হতে প্রেরণা দেয়, প্রতি নারীর নারীত্বের ওপর সর্বপুরুষের পৌরুষের দাবী তেমনি প্রতি নারীকে রূপবতী স্বাস্থ্যবতী ও সুগঠিতদেহা হতে প্রেরণা দেয়। সর্বপুরুষের ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি পুরুষের দাবী এবং সর্বনারীর ভিতর থেকে বিশেষ ক'রে একটি নারীর দাবী বলবানকে করে প্রেমবান ও রূপবতীকে করে প্রেমবতী। পুরুষের সাধনা সকলকে এড়িয়ে কেবল একটি নারীর জন্য নয়, সকলকে ছাপিয়ে বিশেষ একটি নারীর জন্য। নারীর সাধনা সকলকে বাদ দিয়ে কেবল একটি পুরুষের জন্য নয়, সকলকে স্বীকার ক'রে বিশেষ একটি পুরুষের জন্য। ইউরোপের পুরুষ একটি নৈর্ব্যক্তিক স্বামী হয়ে সুখ পায় না, সে স্বয়ম্বর সভার জেতা। ইউরোপের নারীও একটি নৈর্ব্যক্তিক স্ত্রী হয়ে সুখ পায় না, সে বহুর মধ্যে বিশিষ্টা।

এ সমস্ত বাদ দিয়ে বল্‌রুমের নাচ একটা কসরৎ এবং অবসর বিনোদনের একটা উপায়। ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষের পা অত্যন্ত স্থূল পুষ্ট মাংসপেশীবহুল। নৃত্যকালে পরস্পরের হাত উঁচু ক'রে ধরার ফলে বাহুরও রীতিমতো চালনা হয়। পুরুষের পক্ষে কসরৎটা কিছু বেশি, কারণ সঙ্গিনীটি যদি গুরুভার হয়ে থাকেন তো সঙ্গিনীকে মোড় ফেরাবার সময় বাহুবলের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

বল্‌রুম নাচের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে নৈতিক আপত্তি শুনতে পাই। যে দেশে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখলে পাপ হয় ও ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাইয়ের দেখা নিষেধ, যে দেশের পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বয়স্কা বোনকে ঘোমটা দিতে হয়, সে দেশের লোক

অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে তখন দৈহিক সংঘর্ষে যে নরক দেখবে এর সন্দেহ নেই। যদি বলি ব্যাপারটা এত নির্দোষ যে ভাইবোন বাপ-মেয়ে ও মা-ছেলে পর্যন্ত হাত ধরাধরি ক'রে সকলের সামনে নাচে তবে হয়তো 'উল্টো বুঝলি রাম' হবে, এ দেশের পিতৃত্ব মাতৃত্ব সৌভ্রাত্রের ওপরেও সন্দেহ পড়বে। মানবচরিত্রের প্রতি যাদের সশ্রদ্ধ বিশ্বাস আছে আমাদের দেশের সেই সকল ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দিই মিলিত নাচ সরল প্রকৃতি আদিমদের মধ্যেও আছে এবং ইউরোপীয়রা যখন আদিম ছিল সেই সময় থেকে তাদের মধ্যে চলিত হয়ে আসছে। এটা তাদের সংস্কারগত এবং কচি বয়স থেকে বালক বালিকা মাত্রেই এর অনুশীলন করতে শেখে। মানুষকে যাঁরা গ্রীন হাউসে পূরে সতী বা যতি বানাতে চান সে সব নীতিনিপুণদের বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে, এ দেশেও সতী ও যতির অপ্রতুলতা নেই, কিন্তু সমাজের ফরমায়েসে নয়, অন্তরের নিয়মে।

• ক্লিনিকের কথায় নাচের কথা উঠল, পাঁসিওঁর কথায় খাওয়ার কথা বলি। আমাদের পাঁসিওঁতে (একটু ঘরোয়া ধরনের হোটেলকে ফরাসীতে পাঁসিওঁ বলে) আমরা অনেক দেশের লোক থাক্‌তুম, যখন খাবার ঘণ্টা পড়ত তখন খাবার টেবিলে যারা সমবেত হতুম তাদের মধ্যে মণিদা ও আমি বাঙালী, অন্যদের কেউ আমেরিকান কেউ ইংরেজ কেউ জার্মান কেউ হাঙ্গেরিয়ান রুমেনিয়ান ফিন্‌ ইতালিয়ান ওলন্দাজ। এতগুলি জাতের লোক একসঙ্গে একঘণ্টা বসলেই নানাদেশের কথা ওঠে। রাজনীতি অর্থনীতি আর্ট সমাজ ধর্ম সকল বিষয়ে আলোচনা চলে। আলোচনার ফাঁক দিয়ে জাতির স্বভাব ধরা প'ড়ে যায়, আন্তর্জাতিক জানাশুনা হয়, ফরাসীরা দেখে জার্মান মাত্রেই শয়তান নয়, আমেরিকানরা বোঝে ক্যাথেরিন মেয়োর বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি হিন্দুর মেলে না। সভাসমিতিতে সব দেশের লোক ততটা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে পারে না যতটা মেশে খাবার টেবিলে। এই সত্যটা জানা থাকলে আমরা হিন্দুমুসলমানে জনসভা না ক'রে জন-ভোজ করতুম এবং ব্রাহ্মণের ডানদিকে মুসলমানকে ও বাঁদিকে নমঃশূদ্রকে আসন দিয়ে দু'টো মহাসমস্যার মীমাংসা দু'টো দিনেই করতুম।

পরিবারের বড় ছোটতে মিলে এক টেবিলে খাবার সময় ছোটরা বড়দের কথা কান পেতে শোনে ও বড়দের রীতি চোখ বুলিয়ে দেখে। আমরা যা বই প'ড়ে বা মাস্টারের উপদেশে শিখি এরা তা খেতে খেতেই শেখে। আমেরিকার মহিলাটির সঙ্গে জার্মানীর মার্ক-মুদ্রার বিনিময়-হার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, তাঁর বালিকা মেয়ে দুটি তা সাগ্রহে শুনছে ও সে বিষয়ের প্রশ্ন করছে, অথচ এক্সচেঞ্জের মতো দুরূহ বিষয় যে কী, তা আমরা মার কাছে শেখা দূরে থাক বি-এ ক্লাসের অধ্যাপক মহাশয়ের কাছে শুনেও সহজে বুঝে উঠতে পারিনে, কারণ আমাদের ঘরে ওবিষয়ের চর্চা নেই, আমাদের সমাজ বলতে কেরানী-উকিল-ডাক্তার-ইস্কুলমাস্টারের সমাজ। আমেরিকান মহিলাটি যে বেশ একজন বিদুষী তা নয়, সম্ভবতঃ তিনিও ওসব শুনতে শুনতে শিখেছেন, নিজের ঘরের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলে মিলে দৈনিক পত্র পড়তে পড়তে কিংবা পরের ঘরের চায়ের টেবিলে জাহাজের ব্যাপারীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে—কেবল কি টাকাকড়ির কথা?—ভালোমন্দ দরকারি অদরকারি হরেক রকমের অনেক তথ্য অনেক গুজব এবং অনেক মিথ্যাই মগজে জমিয়েছেন। জার্মান মহিলাটির স্বামী ডাক্তার, আত্মীয়েরা কেউ চিত্রকর কেউ যোদ্ধা কেউ ব্যবসাদার। তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর নিজের শিক্ষাও ঘরে যতটা হয়েছে স্কুলে ততটা হয়নি এবং ছবি ও গান সম্বন্ধে তিনি যেরকম রসগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন আমাদের দেশের কোনো ডাক্তারের স্ত্রী সেরকম পারতেন না। তবে স্কুলেও যে এঁরা কেবল পড়েন না সেকথাও জানিয়ে রাখতে চাই। এঁদের প্রতি স্কুলে সংগীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রতি স্কুলে কলেজে প্রতি সপ্তাহে বলরুম-নাচের আয়োজন আছে, স্কুল

থেকে এঁরা প্রত্যেকেই দুটো একটা বিদেশী ভাষা শিখে রাখেন এবং প্রত্যেকেই কয়েকটা গৃহশিল্পের ট্রেনিং পান। ফরাসী ইংরাজী ও জার্মান এই তিনটে ভাষা ব্যবসা বা সামাজিকতার খাতিরে ইউরোপের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষই অল্পবিস্তর জানেন এবং জানবার প্রধান সুযোগ পেয়েছেন নানাদেশে বেড়াবার সময় নানাদেশের লোকের সঙ্গে কাফেতে রেস্তরাঁয় হোটেলে এক টেবিলে ব'সে আড্ডা দিতে দিতে। এহেন আড্ডার পক্ষে সুইট্‌জারলণ্ড যেমন অনুকূল তেমন আর কোনো দেশ নয়।

ঐ তো ছোট্ট একটুখানি দেশ, ওর লোকসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ, আয়তন আমাদের ছোটনাগপুরের মতো হবে, তবু টুরিস্টদের দৌলতে এবং ঘড়ি ও চকোলেট বিক্রি ক'রে ওদেশ বড়-মানুষ। ঐটুকু দেশে তিন তিনটে ভাষা আর দু'দুটো ধর্ম চলিত, অথচ ওর ঐক্য ইতিহাসবিশ্রুত।

সুইট্‌জারলণ্ডের প্রত্যেক শহরে টুরিস্টদের জন্যে হোটেল পাঁসিওঁ কাফে আর ব্যাঙ্ক ডাকঘর ঔষধালয় তো আছেই, প্রত্যেক স্থানে তাদের খেলার বন্দোবস্ত ও বাজারের আয়োজন আছে। সমগ্র দেশটাই যেন টুরিস্টদের জন্যে তৈরি একটা বিরাট পান্থশালা।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে অন্যান্য দেশের টুরিস্টদের ডাকছে এবং দেশ দেখিয়ে তাদের পকেট হালকা করছে। ভারতবর্ষ যদি সুইট্‌জারলণ্ডের মতো উদ্যোগী হতো ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ঘুচত। কিন্তু ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোকই আরেক প্রদেশে সমাজ পায় না, ইউরামেরিকার টুরিস্টদের সমাজ দেবে কে? তারা যদি ইউরোপীয় হোটেলেই থাকে ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খায় ইউরোপীয়দের সঙ্গেই খেলে ও ইউরোপীয়দের সঙ্গেই আড্ডা দেয় তবে তাদের অর্থে ভারতবাসী ধনী হবে না এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে তারা দেশে ফিরবে সে ধারণা আমাদের অনুকূল হবে না। এবং দু' দশটা মুসলমান বাবুর্চি হিন্দু দোকানদার ও ফিরিঙ্গী আয়া দেখে যদি তারা ভারতবর্ষের লোক সম্বন্ধে বই লেখে তবে সে বইয়ের দেশব্যাপী প্রতিবাদ করলেই আমাদের কাজ ফুরোবে না। আমাদের সমাজের সত্যিকার পরিচয় তারা পাবে কী ক'রে? সে যে অভিমন্যুর ব্যূহের উল্টো, তার মধ্যে তাদের প্রবেশ-পথ কোথায়? ইউরোপের এক দেশের সমাজের সঙ্গে অন্য দেশের সমাজের মিল আছে, ভাষা জানা থাকলে এক সমাজের লোক আর এক সমাজে মিশে যেতে পারে; জাতীয় সংস্কার স্বতন্ত্র হলে কি হয়, সামাজিক আচার সর্বত্র প্রায় এক। এই বৈচিত্র্যহীনতা অনেক সময় মনকে পীড়া দেয়। আমেরিকান মহিলাটি বললেন, তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসে নতুন কিছু দেখবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এই যান্ত্রিকতার যুগে সমস্তই এমন এক ছাঁচে ঢালা যে ইউরামেরিকার সব দেশের পুরুষের একই পোষাক, সব দেশের নারীর একই পরিচ্ছদ, স্থলে স্থলে এমন কি একই প্যাটার্নের একই রঙের একই ভঙ্গির। কোনো লীগ অব নেশন্স ফতোয়া দিয়ে এত দেশের এতগুলো মানুষকে একই রকম সাজ করতে বলেনি, কোনো মিশনারী এবিষয়ে প্রচার কার্য করেননি, তবু কেমন ক'রে যে আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া থেকে ইউরোপের রুমেনিয়া অবধি প্রায় প্রতি নারীই কবরী ছেঁটে স্কার্ট ছেঁটে জামার হাত কেটে পূর্ব নারীদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সাজলে সেই এক আশ্চর্য! অথচ সর্বত্র পুরুষ তার পূর্বপুরুষের মতোই জবড়জঙ সাজে বিদ্যমান, ক্যালিফর্ণিয়া থেকে রুমেনিয়া অবধি তেমনি কোট-ট্রাউজার্স টুপি-ওভারকোট। অবশ্য ইতর বিশেষ আছে, তবু মোটামুটি বলতে গেলে সর্বত্র হোটেলমূলক সভ্যতা, গির্জামূলক ধর্ম, নাচঘরমূলক সমাজ এবং খাটা-খেলা-খাওয়া নামক ত্রিনীতি। এহেন সমাজে খাপ খেয়ে যেতে বেশি কষ্ট হয় না, এমন কি আমরা বাইরের লোকও অল্পায়াসেই এ সমাজের মধ্যে স্থান পেতে পারি।

লোঁজার পর্বতমালার নিচে জেনেভা হ্রদকে বেষ্টন ক'রে অগণ্য পল্লী, কিন্তু তাদের প্রত্যেকটাই টুরিস্টদের জন্যে হোটেলে দোকানে ছাওয়া। এমনি এক পল্লীতে রম্যা রলাঁ থাকেন, মণিদা ও আমি একদিন তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে এলুম।

॥ পাঁচ ॥

রলাঁর কুটীরটির একদিকে হ্রদ অপর দিকে পর্বত। হ্রদের শাড়িটির পাড় ধ'রে যেমন পর্বতের পর পর্বত চ'লে গেছে, হ্রদের জল থেকে সোপানের মতো তেমনি পর্বতের ওপর পর্বত উঠে গেছে। হ্রদের কূলে কূলে পর্বতের মূলে মূলে পল্লীর পর পল্লী। রলাঁদের পল্লীটির নাম Villeneuve, আর রলাঁর কুটীরটির নাম Villa Olga।

ভিল্‌নভের অদূরে Chateau de Chillon নামক দ্বাদশ শতাব্দীর একটি প্রসিদ্ধ দুর্গ। বায়রণের কাব্যে এর বর্ণনা আছে, Bonnivardকে এখানে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। দুর্গটির তিনদিকে জল, একদিকে পর্বত। Bonnivardএর কারা-কক্ষটির গবাক্ষ থেকে যতদূর চোখ যায় কেবল জল আর আকাশ, আর উভয়ের হস্তগ্রন্থির মতো দিগ্‌বলয়। দেহকে যারা বেঁধেছিল কতটুকুই বা তারা বেঁধেছিল! আসল মানুষটি যে চোখের ফাঁক দিয়ে সারাক্ষণই ফাঁকি দিত। বরং বন্দী ছিল তাঁর প্রহরীটা।

ভিলা অল্‌গার একপাশে Hotel Byron নামক বৃহৎ হোটেল। রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে রবীন্দ্রনাথ নাকি এইখানে ছিলেন।

রলাঁর কুটীরটির বাহিরটা নিঃস্ব। দেখলে প্রত্যয় হয় না যে এতবড় একজন সাহিত্যিক এ রকম একটা অসুন্দর ছোট জরাজীর্ণ 'শালে'তে থাকেন। কিন্তু ভিতরটি সাজানো—বসবার ঘরে বইভরা শেল্‌ফ, বই-ছড়ানো টেবিল, ফুলের সাজি ফুল গাছের টাব্, দেয়ালে দেয়ালে ছবি ও দেয়ালজোড়া পিআনো।

রলাঁর সাক্ষাৎ পাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মনেই জাগেনি যে, তাঁর ঘরের অন্তর বাহির তাঁর নিজের অন্তর বাহিরের প্রতিরূপক!

দীর্ঘদেহ ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষটি, মুখখানি লাজুকের মতো ঈষৎ নত, মুখের গড়ন উল্টো-করে-ধরা পেয়ার ফলের মতো চওড়া সরু উঁচু নিচু। প্রশস্ত উন্নত ললাট, সুদীর্ঘ শাণিত নাসা, ক্ষুধিত শীর্ণ কপোল, উদগ্র সংকীর্ণ চিবুক। চোখ দু'টিতে কতকালের ক্লান্তি, হরিণশিশুর নিরীহতা। ঠোঁট দু'টিতে গাম্ভীর চেয়েও সরল হাসি, বেদনায় পাণ্ডুর। সাদাসিধে পোষাক, নীলকৃষ্ণ সুট, টাই নেই, পাদ্রীসুলভ কলার। এক হাতে দারিদ্র্যের সঙ্গে অন্য হাতে অসত্যের সঙ্গে জীবনময় যুদ্ধ ক'রে এসেছেন, তবু ক্ষান্তি নেই, কঠিন খাটছেন, সকাল বেলাটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে লেখেন; রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় এমন ব্যাপৃত যে, L'ame Enchantée—(মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা)র চতুর্থ ভাগ এখনও লেখা হয়ে উঠল না।

মণীন্দ্রলাল বসুর 'পদ্মরাগে'র সুখ্যাতি করলেন, Wagner-কৃত জার্মান অনুবাদ পড়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্তে'র ভূয়সী প্রশংসা ক'রে তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। 'শ্রীকান্তে'র ইতালিয়ান অনুবাদ হয়েছে, ফরাসী অনুবাদ হচ্ছে। দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে ভারতীয় সংগীত শুনে প্রীত হয়েছেন, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ধর্ম-সঙ্গীতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু মধ্যযুগের পরে উভয় সংগীতের ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হওয়ায় ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সংগীতের বহুদূর ছাড়াছাড়ি ঘ'টে গেছে, এখনকার ইউরোপ ও-সংগীত গ্রহণ করবে কি না নিশ্চয় ক'রে বলতে পারলেন না।

এতক্ষণ সহজভাবে কথা বলছিলেন, আপনার লোকের মতো ঘরোয়া ভাবে মৃদুমিষ্ট হেসে। যেই ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠল অমনি উত্তেজিত হ'য়ে পড়লেন রাজা লীয়ারের মতো। নির্বাণোন্মুখ শিখার মতো স্তিমিত নেত্রে আবেগ জ্ব'লে উঠল। দক্ষিণ হস্ত আবেগে উঠতে পড়তে লাগল, বেগময়ী ভাষার সঙ্গে তাল রেখে। তন্ময় হ'য়ে চেয়ার থেকে স'রে স'রে এসে খ'সে পড়েন বুঝিবা। গত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকে তাঁর হৃদয়ের এক স্থলে একটি ক্ষত আছে, সেই ক্ষতটিতে আঙুল ছোঁয়ালে যাতনায় অধীর হ'য়ে ওঠেন।

প্রতীতির সহিত বললেন, নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি, যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে যুদ্ধের দেখছি অবসান হলো না! তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আর্টিস্টের কর্তব্য নিয়ে কথা উঠল। আর্টিস্ট কি কেবল চিরকালের সৌন্দর্য সৃষ্টি নিয়েই থাকবে, না, স্বকালের সমস্যা-সমাধানেও সাহায্য করবে? বললেন, দুই-ই করবে। সকল যুগের জন্যে কিছু, নিজের যুগের জন্যে কিছু। মানুষের মধ্যে একাধিক আত্মা আছে—কোনোটার কাজ আর্টের পূজা, কোনোটার কাজ সমাজের সেবা। যে-মানুষ আর্টিস্ট সে-মানুষ কেবল আর্ট চর্চা ক'রে ক্ষান্ত হবে না, সে ভালোর স্বপক্ষে ও মন্দের বিপক্ষে প্রোপাগাণ্ডা করবে, ভলতেয়ার ও জোলার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধ চালাবে। এর জন্যে যে তার যুগোত্তর সৃষ্টির ক্ষতি হবে এমন নয়, কেন না তার যুগোত্তর সৃষ্টির ভার তার যে-আত্মাটির হাতে সে-আত্মাটি কিছু সর্বক্ষণ সজাগ নয়।

মানুষের একাধিক আত্মা আছে একথা রলাঁর রচনার অনেক স্থলেই পড়েছি, তবু মানুষের অখণ্ড ব্যক্তিত্বটাকে এমন খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখার প্রস্তাবে মন সায় দিলে না। তা'ছাড়া সমস্যা তো প্রতিযুগেই আছে, প্রতিযুগেই থাকবে, সেজন্য ভাববার ও খাটবার লোকও যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। আর্টিস্ট তাঁদের কাজ কেড়ে নেবে কেন? তাঁদের বাহন হবে কেন? বিশুদ্ধ আর্টের দেবী কি বড় সহজ দেবী? অসপত্ন পূজা না পেলে কি তিনি বরদান করেন? কালিদাসের যুগের সমস্যার জন্যে কালিদাস কী করেছিলেন? গ্যেটের যুগের সমস্যার জন্যে গ্যেটে কী করেছিলেন? জিজ্ঞাসা করলুম, শেক্‌স্‌পীয়রের যুগেও তো সমস্যা ছিল, তাঁর সৃষ্টিতে তার ছায়া দেখিনে কেন? তাঁর স্বকালের প্রতি তাঁর দায়িত্ব দেখিনে কেন? উত্তরে বললেন, কিছু কিছু দেখি বৈকি। কিন্তু তাঁর যুগে হয়ত এযুগের মতো বড় কোনো সমস্যা ছিল না।

মন না মানলেও প্রতিবাদ করলুম না। এই যথেষ্ট যে, আর্টিস্টকে রলাঁ দেশকালের অনুরোধে বিশুদ্ধ আর্ট চর্চা মুলতুবি রাখতে বলছেন না, বিসর্জন দিতে বলছেন না, বলছেন শুধু তাই ক'রে নিরস্ত না হ'তে, তাইতেই আবদ্ধ না রইতে। রুশনায়কদের মতো ফরমায়েস দিচ্ছেন না যে, 'হে

আর্টিস্ট, তুমি যূথের মনোরঞ্জন করো, যূথতন্ত্রের জয়গান করো, বলো বন্দে যূথম্'; কিংবা ভারত-নায়কদের মতো ফতোয়া দিচ্ছেন না যে, 'ঘর যখন পুড়ে যাচ্ছে তখন হে কবি, তোমার কাব্যবিলাস ছাড়ো, ফায়ার ব্রিগেডে ভর্তি হও, নেহাৎ যদি তা না পারো তো অন্যদের কর্তব্যসচেতন করতে সব রস ছেড়ে কেবল ঝাল রসের কবিতা লেখো।' তিনি যা বলছেন তার মর্ম এই যে, মানুষের সমস্তটা যখন আর্টিস্ট নয় তখন বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টির অবসরে সে অপর কিছুও করতে পারে, এবং যেহেতু তার অস্ত্র হচ্ছে লেখনী কিংবা তুলিকা সে-হেতু তারি সাহায্যে সে ধর্মযুদ্ধ করলে ভালো হয়। এইটে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তিনি আর্টিস্টকে অন্-আর্টিস্ট হয়ে যুগ-ঋণ শোধ করতে বললেও অন্-আর্টকে আর্ট বলেননি, প্রোপাগাণ্ডাকে আর্টের থেকে পৃথক ক'রে ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

কথায় কথায় বললেন, টাকার জন্যে আর যাই করুন বই লিখবেন না। টাকার জন্যে অন্য খাটুনি, আনন্দের জন্যে বই-লেখা। ...তাঁর নিজের যৌবনে তিনি দারিদ্র্যদায়ে শিক্ষকতা করেছেন, আরো কত কী ক'রে স্বাস্থ্য হারিয়েছেন, কষ্টার্জিত স্বল্পপরিমিত অবসর-সময়কে ফাঁকি দিয়ে সরস্বতীর সেবা করেছেন, কিন্তু সরস্বতীকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেননি।

সমাজের প্রতি আর্টিস্টের দায়িত্ব প্রসঙ্গে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য কিছু-ক'রে কায়িক শ্রম করা, আর্টিস্টও যখন ব্যক্তি তখন আর্টিস্টেরও এই কাজ করা উচিত।

ম্যাদ্‌লীন রলাঁ টিপ্পনী দিলেন, স্বয়ং কায়িক শ্রম করবার অবসর পাননি ব'লে রলাঁর একটা আক্ষেপ থেকে গেছে—তাঁর শরীর ভেঙে পড়বার ওটাও একটা কারণ।

কিন্তু যে-মানুষ জগৎকে জাঁ ক্রিস্তফ্ দিতে পারেন সে-মানুষের শক্তি কায়িক শ্রমে অপচিত হ'লে কি জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হতো না? আর্টিস্ট যদি কায়িক শ্রমে হাত দেয় তো 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টে'র আশঙ্কা থাকে না কি?

ম্যাদ্‌লীন রলাঁ বললেন, এমন কোনো কথা নেই। এই যে তিনি অর্থাভাবে ছেলে পড়িয়ে সময় ক্ষয় করতে বাধ্য হলেন এর বদলে যদি কায়িক শ্রম করলে চলত (অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের জন্যে আবশ্যক অর্থ জুটত) তবে তাঁর স্বাস্থ্যের এদশা হতো না, তিনি আরো কত সৃষ্টি করতে পারতেন। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস এই আত্যন্তিক স্পেশালিজেশনের যুগে সর্বমানবকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখবার জন্যেও একটা-কিছু দরকার, নইলে উর্ধ্বশ্রেণীর মানুষ নিম্নশ্রেণীর মানুষকে বুঝবে কী সূত্রে? যারা গতর খাটিয়ে খায় তাদের উপর থেকে যারা মাথা খাটিয়ে খায় তাদের অবজ্ঞা ঘুচবে কী ক'রে?

বুঝলুম মহাত্মাজীর সর্বভারতীয় যোগসূত্র যেমন চরকা, রলাঁর সর্বমানবিক মিলনসূত্র তেমনি কায়িক শ্রম। উভয়ের মনের এই ভাবটি টলস্টয়ের সুরে বাঁধা। শ্রমীদের ওপরে বিশ্রামীদের পরগাছাবৃত্তি পৃথিবীশুদ্ধ মানব-প্রেমিককে ভাবিয়ে তুলেছে। সমাজের যেসব দাস-মক্ষিকা এত যুগ ধ'রে সমাজের রাণী-মক্ষিকাদের জন্যে আনন্দহীন খাটুনি খেটে এসেছে, সেই সব দলিত মানব আজ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। এটা হচ্ছে শূদ্রবিদ্রোহের যুগ। তারা বলছে, পেটের দায় তো প্রতি মানুষেরই আছে, একলা আমরা কেন খেটে মরব? এসো, সকলে মিলে দায় ভাগ করে নিই, কায়িক শ্রম তোমরাও করো আমরাও করি। শূদ্রবিদ্রোহের এই মূল-ধুয়াটার এখন জগৎ জুড়ে মহলা চলেছে, বৈশ্যরা ভয়ে কাঁপছেন, ক্ষত্রিয়রা ঘটা ক'রে গোঁফে তা দিচ্ছেন, ব্রাহ্মণরা রফার উপায় খুঁজছেন।

সাময়িক একটা রফার দিক থেকে রলাঁ-গান্ধীর প্রস্তাব মতো প্রতি মানুষের আংশিক শূদ্রীকরণের মূল্য আছে, সন্দেহ নেই। এঁরা না বললেও ঘটনাচক্রে বাধ্য হয়ে শূদ্র ধর্ম স্বীকার করতেই হবে সকলকে। ঘটনাচক্রে বাধ্য হ'য়ে সকলেই একদিন ক্ষাত্রধর্ম স্বীকার করেছিল।

ঘটনাচক্রে বাধ্য হ'য়ে সকলকেই আজ বৈশ্যধর্ম স্বীকার করতে হচ্ছে। এখনকার দিনে এমন কোন্ আর্টিস্ট আছেন—ব্রাহ্মণ আছেন—যিনি অন্ন বস্ত্রের জন্যে অর্থ উপার্জন করছেন না? কেউ আর্টের বিনিময়ে করছেন, কেউ অন্য কিছুর বিনিময়ে করছেন। আর্টের বেশ্যাবৃত্তি যাঁর কাছে নীতিবিরুদ্ধ আর্টেতর বৈশ্যবৃত্তি তাঁর ভরসা। রলাঁ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু ইস্কুলমাস্টারী করেছেন, রবীন্দ্রনাথ টাকার জন্যে বই লেখেননি, কিন্তু জমিদারী করেছেন। দায়ে প'ড়ে পরধর্মের শরণ না নিয়ে যখন উপায় নেই তখন শূদ্রোচিত কায়িক শ্রম ভালো, না, বৈশ্যোচিত মস্তিষ্ক-বিক্রয় ভালো? রলাঁর মতে প্রথমটা। যদিও কার্যতঃ তিনি দ্বিতীয়টার আশ্রয় না নিয়ে পারেননি। কারণ, হাতের দাসত্বের চেয়ে মাথার দাসত্বের বাজারদর বেশি—এক বোল্‌শেভিক রাশিয়া ছাড়া সর্বত্র।

কিন্তু একটা না একটা দাসত্ব কি করতেই হবে চিরকাল? এমন দিন কি আসবে না যেদিন মানুষমাত্রেই সর্বতোভাবে স্রষ্টা হবে নিজের নিজের ক্ষেত্রে, বিচ্যুত হ'তে বাধ্য হবে না স্ব-স্ব-ধর্ম থেকে? শূদ্রত্বের অগৌরব সকলে মিলে ভাগ ক'রে নিলে তো রোগের জড় মরে না, সকলে মিলে রোগে ভোগা যায় মাত্র। লেবারের ডিগ্‌নিটি প্রমাণ করবার জন্যে সকলে মিলে ম্যানুয়াল লেবার করলে তো বেগার খাটার নিরানন্দ অপ্রমাণ হয় না, কর্মের দাসত্বকে 'কর্তব্য' আখ্যা দিয়ে নিজেদের ভোলানো হয় মাত্র। প্রতিভার প্রেরণায় যে মানুষ চাষ করে সুতো কাটে, সে-মানুষের শূদ্রত্বে দাসত্বের গ্লানি কোথায় যে, তাই ভাগ ক'রে নেবার জন্যে রলাঁকে চাষ করতে হবে, রবীন্দ্রনাথকে চরকা কাটতে হবে? সমাজ ধনী হবে, যদি প্রতি মানুষের প্রতিভা পায় আপন চরিতার্থতা। বিকচ ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য স্বীকার ক'রে যে জটিল সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হবে সেই সামঞ্জস্যই তো সমাজের আদর্শ, সেই তো সনাতন, সেই তো সম্পূর্ণ। চাতুর্বর্ণের সাঙ্কর্য ঘটিয়ে দিয়ে বৈচিত্র্যধ্বংসী বহিঃসাম্য স্থাপনা করলে সাময়িক একটা রফা হয়তো হয়, কিন্তু এতে মানুষের তৃপ্তি নেই। মানুষ চায় স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, এ ছাড়া আর সমস্তই তার পক্ষে দাসত্ব। শূদ্রকে দাও স্রষ্টৃত্বের স্বাধীনতা, তার শ্রম হোক তার কাছে গান গাওয়া ছবি আঁকার মতো আনন্দময়, তার শ্রমের পুরস্কারে সে রাজা হোক—কিন্তু অশূদ্রকে স্বধর্মচ্যুত ক'রে পূর্ণতঃ হোক অংশতঃ হোক শূদ্র কোরো না; তার বীণা তুলি কেড়ে নিয়ে তাকে কাস্তে হাতুড়ি ধরিয়ো না; মাত্র আধঘণ্টার জন্যে হলেও তাকে দিয়ে চরকা কাটিয়ো না।

কায়িক শ্রম সম্বন্ধে আমার এই সব ধারণা আমি রলাঁকে জানাইনি। জানালে সম্ভবতঃ তিনি বলতেন যে, একই মানুষ কি ব্রাহ্মণ শূদ্র দুই হ'তে পারে না? প্রতি মানুষের মধ্যে যে একাধিক আত্মা আছে! Maeterlinck নাটক লেখেন, লাঙল ঠেলেন, মৌমাছি ও পিঁপড়েদের তদারক ক'রে প্রামাণ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ লেখেন—তাঁর তা হ'লে গোটা তিনেক আত্মা। কোনোরকম কায়িক শ্রমের প্রতি যার একটাও আত্মার একটুও রুচি নেই এমন মানুষ সম্ভবতঃ একজনও পাওয়া যাবে না।

এমন যদি তিনি বলতেন তবে আমি আপত্তি করতুম না। নিজেকে নানাদিকে কুশলী করবার সাধ মানুষ মাত্রেরই আছে। এই সাধ যদি মানুষ মাত্রকেই সুতো-কাটা নামক কাজটিতে কৃতী হ'তে প্রেরণা দেয় তবেই সে চরকা ধরবে। নতুবা স্পেশালিজেশনের প্রতিকার স্বরূপ কিংবা সর্বতোভাবে আত্ম-সম্পূর্ণ হবার দুরাশায় কিংবা সর্বমানবের সঙ্গে যুক্ত হবার ধারণায় যদি ধরে বা ধরতে বাধ্য হয় তবে সেটা হবে তার সৃষ্টির সতীন, তার অন্তরের দাসত্ব। আধ ঘণ্টার জন্যে হলেও সেটা তার স্বাধীনতার শ্বাসরোধী। সার্বজনীন দাসত্বের দ্বারা সর্বমানবের যে একীকরণ সে-মন্ত্রের উদ্‌গাতা যদি রলাঁ-গান্ধী-টলস্টয়ও হন তবু সেটা ছদ্মবেশী জড়বাদ।

মণীন্দ্রলাল জিজ্ঞাসা করলেন, এ যুগের লোক কাব্য পড়ে না কেন? রলাঁ বললেন, এ যুগের লোকের দুঃখ সুখের কথা কেউ কাব্যে লেখে না ব'লে। ভিক্তর উগোর মতো জনসাধারণের কবি

থাকলে জনসাধারণ কাব্য পড়ত বৈকি।

এবার তাঁর মনের আরেকটা কোণ ছোঁয়া গেল। তাঁর কাছে আর্টের অভীষ্ট সমঝদার, আলটিমেট্ সমঝদার—জনসাধারণ। জনসাধারণের জন্যেই আর্ট। তিনিই একদিন People's Theatreএর পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু শিব তা-থেকে যদি একজন মানুষও বঞ্চিত থাকে তবে আর্টিস্টের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। তা ব'লে তিনি কোথাও এমন বলেননি যে, জনসাধারণের আর্ট জনসাধারণের দিকে নেমে যাবে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, খাঁটি আর্টের আবেদন এমন গভীর যে, নিম্নতম অধিকারীর হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়। প্রমাণ, শেক্স্পীয়রের নাটক। ও-জিনিস বোঝবার জন্যে বৈদগ্ধ্যের দরকার থাকতে পারে, কিন্তু বোধ করবার পক্ষে প্রকৃতি যা দিয়েছে তাই যথেষ্ট। শেক্স্পীয়র দেখবার জন্যে ইতর সাধারণের আগ্রহ শিক্ষিতদের আগ্রহকে ছাড়িয়ে যায়।

চা খেতে খেতে শেষ কথা হলো সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে। সাহিত্যের প্রভাবে যদি নৈতিক অরাজকতা ঘটে তবে তার জন্যে কি সাহিত্যিক দায়ী হবে? বললেন, ধর্মের প্রভাবে জগতে কত যুদ্ধই ঘ'টে গেছে, তার জন্যে কি কেউ ধর্ম-সংস্থাপকদের দায়ী করে? সাহিত্যিক যদি সুস্থমনা হ'য়ে থাকে তবে সমাজের সত্যিকার আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যিকার আদর্শের বিরোধ হবে না; আর যদি সুস্থমনা না হ'য়ে থাকে তবে তার রচনাকে সাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যকে সাজা দেওয়া সাজে না।

রলাঁর কথাগুলির প্রতিলিপি দিতে পারলুম না, ভাবছায়া দিলুম। এইখানে ব'লে রাখি যে, এই আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হয়েছিল মণি-দা'তে ও রলাঁতে; এবং আমি ফরাসী ভালো না বুঝতে পারায় তথা রলাঁ ইংরেজী আদৌ না বলতে পারায় মণি-দা'র ও কুমারী রলাঁর ওপরে আমাকে এতটা নির্ভর করতে হয়েছে যে, এই লেখায় অনেক ভুলচুক থেকে গিয়ে থাকতে পারে। তবু মোটের ওপর এতে কিছু এসে যাবে না এই জন্যে যে, এই আলাপ-আলোচনার আগে ও পরে বহুবার আমি রলাঁর মতবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-পরিচিত হয়েছি। এসব তাঁর মুখে নতুন শুনলুম এমন নয়। আমরা তো তাঁর কথা শুনতে যাইনি, আমরা গিয়েছিলুম তাঁকে শুনতে—ও তাঁকে দেখতে। কাব্য প'ড়ে যেমন ভাবি কবি তেমন কি না, এইটি জানবার জন্যে প্রত্যেকেরই একটি স্বাভাবিক কৌতূহল থাকে। সৃষ্টি দেখে স্রষ্টার যে-কল্পমূর্তিটি গড়া যায় বাস্তবের সঙ্গে তার তুলনা ক'রে না দেখা পর্যন্ত যেন সৃষ্টিটাকেই পূর্ণরূপে দেখা হয় না।

জাঁ ক্রিস্তফের স্রষ্টাকে তাঁর ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে মনে মনে যে-কল্পমূর্তিটিকে গড়েছিলুম সে-মূর্তিটিকে ভেঙে ফেলতে হলো ব'লে দুঃখ হলো, কিন্তু মানুষটিকে ভালোবাসতে বাধল না। বলিষ্ঠমনা পুরুষের বাহিরটা বলিষ্ঠদেহ পুরুষের মতো হয়ে থাকলে শ্রদ্ধা বাড়ত, কিন্তু ঐশ্বর্যময় মনের বাহিরটা শিশু ভোলানাথের মতো দেখে মমতা জন্মাল। দেহে মনে সুসমঞ্জস পার্সন্যালিটি বলতে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি; গান্ধীকে দেখে নিরাশ হয়েছিলুম, রলাঁকে দেখে হলুম। এঁদের দেহ এঁদের মনের আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে ও আগুনকে ঢেকেছে; সন্ন্যাসীর গায়ের বিভূতি যেমন তার অন্তরের তপস্যাকে ঢাকে। কিন্তু যেমন গান্ধীর প্রতি তেমনি রলাঁর প্রতি এমন একটি মমতা জাগল যেমনটি নিছক গুণীব্যক্তির প্রতি জাগে না। ভালোবাসা ও ভালোলাগার মধ্যে কোন্খানে যে একটি সূক্ষ্ম রেখা আছে চিন্তা ক'রে তার নিরিখ পাইনে, বোধ ক'রে তার অস্তিত্ব জানি। এক-একটা বিরাট পার্সন্যালিটির সংস্পর্শে এলে এই বোধ-ক্রিয়াটি একান্ত সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

।। ছয় ।।

ফরাসীদের পারী নগরীর নামে পৃথিবীশুদ্ধ লোক মায়াপুরীর স্বপ্ন দেখে। আরব্য রজনীর বোগ্‌দাদ্‌ আর কথাসাহিত্যের পারী উভয়েরই সম্বন্ধে বলা চলে, 'অর্ধেক নগরী তুমি অর্ধেক কল্পনা।' পৃথিবীর ইতিহাসে পারীর তুলনা নেই। দু'টি হাজার বৎসর তার বয়স, তবু চুল তার পাকলো না। কতবার তাকে কেন্দ্র ক'রে কত দিগ্‌বিজয়ীর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো, কতবার তার পথে পথে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার রক্তগঙ্গা ছুটল, কত ত্যাগী ও কত ভোগী, কত জ্ঞানী ও কত কর্মী, কত রসজ্ঞ ও কত দুঃসাহসী, বিপ্লবে ও সৃষ্টিতে স্বাধীনতায় ও প্রেমে তাকে অমর মানবের অমরাবতী করলেন, সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নাট্যকলায় সুগন্ধিশিল্পে পরিচ্ছদকলায় স্থাপত্যে ও বাস্তুকলায় সে সভ্যজগতের শীর্ষে উঠল। পারীই তো আধুনিক সভ্যতার সত্যিকারের রাজধানী, অগ্রসরদের তপস্যাস্থল, অনুসারকদের তীর্থ। এর একটি দ্বার প্রতি দেশের কাঞ্চনবান সম্ভোগপ্রার্থীদের জন্যে খোলা, অন্য দ্বারটি প্রতিদেশের নিঃসম্বল শিল্পী ভাবুক বিদ্যার্থীদের জন্যে মুক্ত। একদিক থেকে দেখতে গেলে পারী রূপোপজীবিনী, আমেরিকান টুরিস্টদের হীরা জহরতে এর সর্বাঙ্গ বাঁধা পড়েছে, তবু জাপান অস্ট্রেলিয়া আর্জেণ্টিনা থেকেও শৌখীন বাবুরা আসেন এর দ্বার-গোড়ায় ধর্না দিয়ে একটা চাউনি বা একটু হাসির উচ্ছিষ্ট কুড়োতে। অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে পারী অন্নপূর্ণা, সর্বদেশের পলাতকদের আশ্রয়দাত্রী, তার জাতিবিদ্বেষ নেই, সে পোল্‌ রুশ্‌ রুমেনিয়ানকেও শ্রমের বিনিময়ে অন্ন দেয়, নিগ্রোকেও শ্বেত-সেনার নায়ক করে এবং নানাদেশের যে অসংখ্য বিদ্যার্থীতে তার প্রাঙ্গণ ভ'রে গেছে তাদের কত বিদ্যার্থীকে সে বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকাও যোগায়।

পৃথিবীর অন্য কোনো নগর দেখতে পৃথিবীর এত দেশের এত টুরিস্ট আসে না; পারী দেখতে প্রতি বৎসর যে-কয় লক্ষ বিদেশী আসে, তাদের পনেরো আনা আমেরিকান ও ইংরেজ। আমেরিকানদের চোখে পারীই হচ্ছে ইউরোপের রাজধানী, আর ইউরোপের লোকের চোখে পারী হচ্ছে লণ্ডন ভিয়েনা বার্লিন মস্কোর চেয়েও আন্তর্জাতিক। আমেরিকান বিদ্যার্থীতে পারী ছেয়ে গেছে, আর ইউরোপের নানাদেশের বিদ্যার্থীদের কাছে পারী চিরকালই আমাদের কাশীর মতো কালচার-পীঠ। শুধু কাশী নয় কামরূপও বটে, যত রাজ্যের রোমান্স-পিপাসু এই নগরীতেই তীর্থ করতে আসে।

আয়তনে ও লোকসংখ্যায় পারী লণ্ডনের প্রায় অর্ধেক, কলকাতার প্রায় তিন গুণ। আজকালের দিনে একটা শহরের সঙ্গে আরেকটা শহরের বাইরে থেকে যে তফাৎ সেটা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বড় ভাইয়ের তফাৎ, বয়স ও বৃদ্ধির উনিশ-বিশ থাকলেও পারিবারিক সাদৃশ্য উভয়েরই মুখে।

পারীতে ট্রাম মেট্রো বাস ট্যাক্সি ধোঁয়া কাদা বস্তি ব্যারাক্‌ লণ্ডনের মতো সমস্তই আছে, কিন্তু মোটরগাড়ি কিছু বেশি সংখ্যক, বাড়িগুলো কিছু স্বাধীন গড়নের, কাদাটা কিছু গভীর ও গাঢ়। মোটের ওপর পারী লণ্ডনের মতো ফিটফাট নয়, বেশ একটু নোংরা এবং অনেক বেশি গরীব। উঁচুদরের বাস্তুকলা তার কয়েকটি প্রাসাদে সৌধে থাকলেও লণ্ডনের সৌষ্ঠব তার অধিকাংশ বাড়ির নেই। ঐতিহাসিক প্রাসাদ-সৌধের ছবি দেখে পারীকে যা ভাবি সর্বসাধারণের বাসগৃহ দেখলে সে কল্পনা ছুটে যায়। কিন্তু পারীর আসল সৌন্দর্য তার প্রশস্ত সরল রাজপথগুলি, তার বৃহৎ চতুষ্কোণ প্লাসগুলি, তার সপ্তসেতুবেষ্টিত সর্পিণী নদীটি, সর্পিণীর দুই রসনার মতো সেন্‌ নদীর দু'টি অর্ধের মধ্যবর্তী দ্বীপটি এবং নগরীর দুই উপান্তের প্রমোদোদ্যান দু'টি।

পারীতে লণ্ডনের মতো পার্ক বিরল; তবে তার এক একটি রাজপথ এক একটি সরলরেখাকৃতি পার্ক বিশেষ। পারীর নিতান্ত মাঝারি রাজপথগুলিও সেন্ট্রাল এভিনিউর চেয়ে চওড়া। 'সাঁজেলিসী'র এক পাশ থেকে আর এক পাশ দেখা যায় না, পাশাপাশি দশটা চৌরঙ্গির মতো। সে তো একটি রাজপথ নয় একসঙ্গে অনেকগুলি রাজপথ, রাজপথের মাঝখানে এক সারি বাগান, রাজপথের ওপরে এক একটি দোকান বা প্রাসাদ বা থিয়েটার। এক একটা বুলভার্দ এক একটা বিরাট ব্যাপার, যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রস্থ। অধিকাংশ রাস্তার সম্বন্ধে একথা খাটে যে, একটি রাস্তা মানে একটি রাস্তা নয়, সমান্তরাল দু'টি তিনটি রাস্তা, কোনো কোনো স্থলে পাঁচটি রাস্তা। অর্থাৎ প্রতি রাস্তার অনেকগুলি ক'রে ভাগ আছে, যেমন ইন্দ্রধনুর সাতটি ভাগ। প্রথমে ফুটপাথ, ফুটপাথের পরে রাস্তা, রাস্তার পরে গাছের সারি, গাছের সারির পরে ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, সে রাস্তার পরে গাছের সারি ও বসবার বেঞ্চি, তার পরে আবার ঘোড়দৌড়ের রাস্তা, তার পরে আবার গাছের পার্টিশান্, তার পরে আবার রাস্তা, তার পরে আবার ফুটপাথ। সব রাস্তার অবশ্য একই রকম ভাগ-বিভাগ নয়, তবে অধিকাংশ রাস্তাই অসাধারণ চওড়া আর অনেক রাস্তার ফুটপাথের ওপরে স্থলে স্থলে ছোট ছোট দোকান আছে, যেমন পুরীর 'বড় দাণ্ডে'র ওপরে অস্থায়ী ছোট ছোট দোকান। এক একটা ফুটপাথও রাস্তার মতো চওড়া, সেইজন্যে তার স্থলে স্থলে এই সব দ্বীপের মতো দোকান, অধিকাংশ ছেলেদের খেলনার বা মেয়েদের এটা-ওটার দোকান। ঠিক আমাদের দেশের মতো সে সব দোকানে ভিড় জমেছে, দরদস্তুর চলেছে, হৈচৈ হট্টগোল।

আমাদের সঙ্গে ফরাসী ইতালিয়ান প্রভৃতি দক্ষিণ ইউরোপীয়দের প্রকৃতিগত মিল আছে। এরাও খুব গোলমাল ভালোবাসে, অতিরিক্ত রকম বাচাল, আর বাদশাহী রকমের কুঁড়ে। কুঁড়ে বললে বোধ হয় ভুল বলা হয়, বরং বলি বিশ্রামপ্রিয়। সময়ের দাম এরা ইংরেজ আমেরিকানদের মতো বোঝে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। তা ব'লে এরা বড় কম খাটে না। পারীর যারা আসল অধিবাসী খুব খাটতে পারে ব'লে তাদের সুনাম আছে। মেয়েরা গল্প করবার সময়ও জামা সেলাই করছে, শৌখীন জামা। জামা কাপড়ের শখটা ফরাসীদের অসম্ভব রকম বেশি, বিশেষ ক'রে ফরাসী মেয়েদের ও শিশুদের, পুরুষরা কতকটা বেপরোয়া। তাদের প্রধান সম্পদ তাদের জাঁদরেলী গোঁফ, তাদের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটিতে শান দেবার দিকে তাদের যত নজর তত নজর তাদের স্নান-না-করা গাত্রের দিকে নেই। সুগন্ধিশিল্প পারীকে আশ্রয় করবার কারণ হয়তো এই। হাঁ—পারীর লোক খুব খাটতে পারে বটে, খুব ভোরে উঠে খাটতে আরম্ভ ক'রে দেয়, অনেক রাত অবধি খাটে, কিন্তু পানাহারটা সেই অনুপাতে ঘটা ক'রেই করে। এরা ব্রেকফাস্ট্ বেশি খায় না, লাঞ্চটা ইংলণ্ডের তুলনায় বেশি খায়, আর ডিনারটা ইংলণ্ডের তুলনায় রাত ক'রে খায়। আহার সম্বন্ধে এদের মোগলাই রুচি, গোপালের মতো যাহা পায় তাহা খায় না, রন্ধনশিল্প ইউরোপের কোথাও থাকে তো পারীতে। এত রকমের খাদ্য এত সস্তায় কেন অনেক দাম দিয়েও লণ্ডনে পাবার যো নেই। দুনিয়ার সব দেশের খানার এরা সমঝদার, সেই জন্যে যে-কোনো রেস্তরাঁয় সব নেশনের খাদ্যের একটা না একটা নমুনা পাওয়া যাবেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে পারীতে অত্যল্প খরচে অনেকখানি তৃপ্তির সহিত খেতে পারা যায়। রান্নাটা উঁচু দরের তো বটেই, রান্নাটা টাটকা। শাকসব্জী ও মাংসের জন্যে ইংলণ্ড অন্য দেশের মুখাপেক্ষী, ফ্রান্স তেমন নয়।

এ তো গেল আহারতত্ত্ব। ফরাসীরা পাননিপুণও বটে। যে কোনো রেস্তরাঁয় গেলে ভোজ্য তালিকার সঙ্গে সঙ্গে একটা পানীয় তালিকাও দেয়। ও-রসে বঞ্চিত ব'লে খাঁটি খবর দিতে পারব

না, কিন্তু সে জন্যে অপদস্থ হয়েছি পদে পদে। এ কেমন মানুষ যে 'ভাঁ' খায় না?—এই ভেবে ওরা হাঁ ক'রে তাকায়। আমি মনে করেছিলুম ইংরেজরাই ভারি মদ খায়, কেননা লণ্ডনের অলিতে গলিতে 'পাব্লিক বার'। ও হরি! পারীর গলিতে গলিতে যে, একটা নয় দুটো নয় পঞ্চাশটা কাফে! লণ্ডনে কাফে নেই, কাফে নামধেয় যা আছে আসলে তা রেস্তরাঁ, লণ্ডনের রেস্তরাঁর সংখ্যা পারীর তুলনায় আঙুলে গোণা যায়।

এই কাফে জিনিসটি ফরাসী সভ্যতার একটা অঙ্গ। ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাস তার কাফেগুলিতেই তৈরি হয়েছে, ইংলণ্ডের ইতিহাস যেমন তৈরি হয়েছে তার ইস্কুলগুলির প্লেগ্রাউণ্ডগুলিতে। পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতো যতগুলি বিপ্লবের অভিনয় পারীতে হয়ে গেছে সকলগুলির রিহার্সল্ হয়েছিল কাফেগুলিতে, কাফেই হচ্ছে ফরাসীদের চণ্ডীমণ্ডপ, ফরাসীদের ক্লাব। কাফেতে গিয়ে এক পেয়ালা কাফী বা শোকোলা ('Chocolat') বা হালকা মদের ফরমাস ক'রে যতক্ষণ খুশি ব'সে আড্ডা দাও—দু'ঘণ্টা তিন ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা! তাস খেলো, দাবা খেলো, গান বাজনা শোনো, কাগজ পড়ো, চিঠি লেখো, ছাত্র হয়ে থাকো তো পড়া করো। কাফেতে একবার গিয়ে বসলে আর উঠতেই ইচ্ছা করে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে ইয়ার্কি দেওয়া, ফ্লার্ট করা, একটু আধটু নেশায় ধরলে রঙ্গকৌতুক থেকে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত উদারা মুদারা তারা। ওরই মধ্যে একটু স্থান ক'রে নিয়ে একটু আধটু নাচাও স্থলবিশেষে হয়। অনেক তপস্বীর তপস্যা আর অনেক কুঁড়ের কুঁড়েমি দুই একসঙ্গে চলতে থাকে যখন, তখন একথা বিশ্বাস হয় না যে এদের কেউ কোনোদিন জগৎকে ধন্য ক'রে দেবে চিন্তাবৈশিষ্ট্যে, অবাক ক'রে দেবে কর্মনেতৃত্বে, মুগ্ধ ক'রে দেবে অভিনেত্রীরূপে। তখন এই কথা মনে হয় যে, এদের যেমন খাটুনির সীমা নেই তেমনি কুঁড়েমিরও সীমা নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল মজলিসী রসিকতা আর মজলিসী আদবকায়দা আর মজলিসী সুরাপান।

এই একটা মস্ত জিনিস যে কাফে ভয়ানক সস্তা। দু'চার আনা খরচ ক'রে দু'ঘণ্টা এক স্থানে বসা ও প্রাণ খুলে গল্প করা—লণ্ডনে এমন সুযোগ নেই। আমাদের দেশে চায়ের দোকানগুলোতে তর্কসভা বসে—সেইগুলোই আমাদের ভাবী যুগের কাফে। তাই থেকে আমাদের ভাবী সাহিত্যিকদের উদ্ভব হবে, ভাবী রাষ্ট্রনেতাদের অভ্যুত্থান ঘটবে। ব্যয়সাধ্য ক্লাব যে আমাদের মাটিতে শিকড় গেড়ে আমাদের বট অশ্বত্থের মতো দীর্ঘজীবী হবে এমন আমার মনে হয় না। ঐ চায়ের আড্ডাগুলোর সঙ্গে একটা ক'রে পাঠাগার জুড়ে দিলে ঐগুলোই হবে জনসাধারণের বিশ্রাম, আমোদ ও শিক্ষার স্থান।

কাফের মতো 'পাতিসেরী'গুলোতেও আড্ডা বসে। পাতিসেরী মানে কেক্ রুটির দোকান, ওখানে গিয়ে কেক্ কিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পারা যায়। অনেক পাতিসেরীতে চা-কাফী খাবার জন্যে একটু ঠাঁই ক'রে দেওয়া হয়, সেই সুযোগে গল্প জমে, তর্ক ওঠে, আলাপ পরিচয় হয়, দেশের মানুষ দেশের মানুষকে চিনতে চিনতে দেশকে চেনে, বিদেশের মানুষকে চিনতে চিনতে বিদেশকে চেনে। ফরাসীরা ইংরেজদের মতো নীরবপ্রকৃতি নয়, গম্ভীরপ্রকৃতি নয়; ওরা ভদ্রতার খাতিরে আবহাওয়া সম্বন্ধে দু'একটা তুচ্ছ প্রশ্ন করে চুপ ক'রে না, ওরা বকে আর বকায়।

পারীর লোক জন্ম-রসিক। আমোদের জন্যে এমন অকৃপণ ব্যবস্থা কুত্রাপি নেই। অবশ্য আমোদ মাত্রেই বিশুদ্ধ নিষ্পাপ হরিনাম জপ করা নয়, বরং বহুক্ষেত্রে পঙ্কিল। পথে ঘাটে জুয়োর আড্ডা। এ আপদ লণ্ডনে নেই। পথে ঘাটে নাগরদোলা প্রভৃতি শিশুসুলভ কৌতুক। খেলাধুলোর রেওয়াজ ইংলণ্ডের মতো নেই। ইংলণ্ডে মাঠে মাঠে ফুটবল খেলা, টেনিস খেলা, সাঁতার। ইংরেজরা

জন্ম-খেলোয়াড়। স্বাস্থ্যচর্চাটাকেই ওরা চরম ব'লে জেনেছে। ঐখানে ওদের জিৎ।

পারীতে অন্ততঃ বিশটি উঁচুদরের থিয়েটার আছে। এছাড়া সিনেমা, 'কাবারে' (Cabaret) ও সংগীতশালাও আছে অগুনতি। 'কাবারে'গুলি পারীর বিশেষত্ব, লণ্ডনে নেই, লণ্ডনে প্রবর্তন করবার প্রস্তাব অনেকে করছেন। এর সঙ্গেও ফরাসী ইতিহাসের যোগ আছে, কেননা এতে যে সব নাচ তামাসা হয় সে সব অনেক সময় পলিটিক্যাল ব্যঙ্গবিদ্রূপ। সংগীতশালা পর্যায়ভুক্ত এমন সব রঙ্গালয় আছে যেখানে কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখানো হয়, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সম্বন্ধ নেই, এবং দৃশ্যের সঙ্গে বাদ্য আছে, কিন্তু কথা নেই। একে বলে 'revue', এ জিনিস লণ্ডনেও প্রবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এ জিনিস আসরে নামাতে অনেক টাকা অনেক বুদ্ধি ও অনেকখানি 'নির্লজ্জতা' দরকার। এ সকলের সমন্বয় লণ্ডনে দুর্লভ, লণ্ডনের লোক এক নম্বরের শুচিবায়ুগ্রস্ত। পারীর লোক বিবসনা স্ত্রী মূর্তি দেখে শক্ড্ হবে, এমন কচি খোকা নয়। তারা অতি অল্প বয়স থেকে পারীর দশ বারোটা মিউজিয়ামে গ্রীক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখে চোখকে শিক্ষিত ও চিত্তকে নির্বিক্ষেপ করেছে; তারা রুশো-ভলতেয়ার ও জোলা-ফ্লোবেয়ারের রচনা প'ড়ে সুনীতি দুর্নীতি ও সুরুচি কুরুচির হিসাব-নিকাশ ক'রে রেখেছে; তারা আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যের নাগরিক,—ন্যাকামি বা নাসিকা-সীটকারকে তারা উচ্চাঙ্গের মর‍্যালিটি বলে না; তারা সুন্দরের সমঝদার, মানবদেহকেও সুন্দর ব'লে জানে। 'মূল্যাঁ রুজ' বা 'ফোলী বের্‌জেয়ারে' অর্ধ-বিবসনাদের নির্নিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ ক'রে শক্ড্ হ'তে পিউরিটান নিউ ইংলণ্ডের টুরিস্টরা দলে দলে যান, আসল ফরাসীরা যায় কিনা সন্দেহ; যদি বা যায় নৃত্যনৈপুণ্য বা সজ্জানৈপুণ্য খুঁটিয়ে বিচার করবার মতো শিক্ষা নিয়ে যায়, কেবল একজোড়া কৌতূহলী চক্ষু ও একটা শুচিবায়ুগ্রস্ত মন নিয়ে যায় না। পারীর বহুসংখ্যক প্রমোদাগার বিদেশীদের জন্যই অভিপ্রেত এবং তাদেরই দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত। মার্কিনের টাকার লোভে মার্কিনের বৈশ্যসুলভ স্থূল রুচির ফরমাস তারা খাটছে। এই আভিজাত্যহীন পঙ্করস-বোধ, এই চর্চা-অবসরহীন পল্লবগ্রাহী সমঝদারী, এই অবিশ্রান্ত অফুরন্ত থ্রিল পিপাসা ফরাসী কালচারকে ডলারের গোলা মেরে উড়িয়ে দিতে বসেছে, এর আক্রমণে ফরাসীদের বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো আর বেশিদিন টিকবে না, ফরাসী সভ্যতার সরস্বতী অবশেষে বাঈজীর মতো সস্তা গান শুনিয়ে ও সস্তা নাচ নেচে সরাব পান ক'রে নাসিকাধ্বনি করবেন। ফরাসী জাতিটার অমেয় জীবনীশক্তির ওপরে আমার অটল আস্থা আছে ব'লেই যা' আশা হয় চর্তুদশ লুই ও প্রথম নাপোলেঅঁর দেশ এই নতুন আঘাতকেও যথাকালে কাটিয়ে উঠবে, এই বিষকেও পরিপাক করবে নীলকণ্ঠের মতো।

ফরাসীরা একটা আত্মবিপরীত জাতি, তাদের ধাতটা এক্সট্রিমিস্ট, তারা দু'দল চরমপন্থীর সমন্বয়—গোঁড়া ক্যাথলিক আর গোঁড়া যুক্তিবাদী। যারা মানে তারা সমস্ত মানে, ঈশ্বর শয়তান স্বর্গ নরক যীশু যীশুর কুমারী-মাতা পোপ কন্‌ফেসন প্রতিমা কর্মকাণ্ড। যারা মানে না তারা কিছু মানে না, তারা জ্ঞানমার্গের নাইহিলিস্ট, তারা বদ্ধ সীনিক, তারা পাঁড় এপিকিওর। জাতটা অতিমাত্রায় শক্তের ভক্ত অথচ নৈরাজ্যবাদী। বাঙালী জাতটার সঙ্গে এ বিষয়ে এদের মিল আছে—যেমন ইমোশনাল তেমনি নাস্তিক; যারা মানে তারা মন দিয়ে মানে না, হৃদয় দিয়ে মানে,—যারা মানে না তারা মন দিয়ে উড়িয়ে দেয়, হৃদয় দিয়ে পারে না। নইলে আনাতোল ফ্রাঁসের মতো তীক্ষ্নদৃষ্টি পুরুষ কখনো গত মহাযুদ্ধের মতো নির্বোধ একটা ব্যাপারের তলা পর্যন্ত দেখেও সস্তা পেট্রিয়টিজমের ঢাক পিটতে যান?

গোঁড়া ধার্মিক হোক গোঁড়া অধার্মিক হোক রসবোধ জিনিসটা এদের জাতিগত, ও জিনিস

এরা খ্রীস্টধর্মের মতো বাইরে থেকে পায়নি ব'লে ও নিয়ে এরা ঝগড়া করে না। Venus de Milo-র উলঙ্গ সৌন্দর্য এরা পিতাপুত্র মিলে দেখে এবং পিতাপুত্রে মিলে আলোচনা করে। উলঙ্গতা নিয়ে তর্ক বাধে না, ওটা চোখ-সওয়া হয়ে গেছে, ওটা স্বাভাবিক, ওটা উভয় পক্ষেই আবশ্যক ব'লে ধ'রে নিয়েছে, তর্ক বাধে সৌন্দর্য নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বললে অবান্তর হবে না যে, দক্ষিণ ইউরোপের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের এইখানে একটা তফাৎ আছে—ফরাসী, ইতালীয়, গ্রীক প্রভৃতি জাতিরা দেহকে প্রগাঢ় ভালোবাসে ও ভক্তি করে, সহজিয়াদের মতো দেহের মধ্যে তত্ত্ব খুঁজে পায়। এরা প্রতিমাপূজক জাতি, এদের দেবতারা সশরীরী, এদের শিল্পীরা যখন মাতৃমূর্তি আঁকে তখন স্তনের ওপরে বস্ত্র টেনে দেয় না, যখন বালক যীশু আঁকে তখন খামোখা কৌপীন পরিয়ে দেয় না, বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার ওপরে এরা সৃষ্টি খাড়া করে, মাতৃমূর্তির চোখে সুধা মাখিয়ে দেয়, শিশুমূর্তির মুখে তৃপ্তি ফুটিয়ে তোলে। উত্তর ইউরোপের লোক প্রোটেস্টান্ট, গোঁড়া নিরাকারবাদী, ওদের চিত্রকলা একান্ত দরিদ্র, ভাস্কর্যের বালাই ওদের নেই। ওরা মুসলমান, এরা হিন্দু। ওদের তেজ বেশি, এদের লাবণ্য বেশি।

এখন বলি পারীর থিয়েটারগুলির কথা। প্রথমতঃ, পারীর থিয়েটারগুলি অসম্ভব সস্তা, দ্বিতীয়তঃ, তাদের আয়োজন অসম্ভব জাঁকালো। লণ্ডনে যত খরচ ক'রে যে-দরের সাজসজ্জা বা যে-দরের অভিনয় দেখতে পাওয়া যায় পারীতে তার সিকিভাগ খরচ ক'রেও তার চারগুণ ভালো সাজসজ্জা চারগুণ ভালো অভিনয় দেখতে পাওয়া যায়। এর একটা কারণ এই যে, ফরাসীরা ভালো জিনিসের কদর বোঝে, দলে দলে দেখতে যায়, প্রত্যেকে অল্প অল্প দিলেও সবশুদ্ধ অনেক টাকা ওঠে, ফলে প্রযোজনার খরচ পুষিয়ে যায়। এছাড়া গভর্ণমেণ্টও থিয়েটারওয়ালাদের অর্থসাহায্য করে, যদিও সাহায্যস্বরূপ ডান হাতে যা দেয় ট্যাক্সস্বরূপ বাঁ হাতে তা' ফিরিয়ে নেয় ব'লে থিয়েটারওয়ালাদের আক্ষেপ। তবু এটা তো অস্বীকার করা যায় না যে, গভর্ণমেণ্ট ডান হাতে যা দেয় ওটা মূলধনের কাজ করে ও ঐ থেকে উচ্চাঙ্গের প্রযোজনার গোড়াকার খরচ জোটে।

পারীর থিয়েটারগুলোর জাতিবিভাগ আছে, যেটাতে অপেরা হয় সেটাতে কেবল অপেরাই হয়, যেটাতে কমেডী হয় সেটাতে কেবল কমেডীই হয়, যেটাতে ক্লাসিক (গ্রীক নাটকের অভিনয়) হয় সেটাতে কেবল ক্লাসিকই হয়। লণ্ডনে কোনো স্থায়ী অপেরা-গৃহ নেই এবং জাতিবিভাগ নেই। একটি স্থায়ী অপেরার স্কীম চলেছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এক পেনীও সাহায্য করবে না, এবং জনসাধারণও যথা-প্রয়োজন শেয়ার কিনবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং যতদূর দেখছি লণ্ডনের ভাগ্যে আছে ভ্রাম্যমান অপেরার দলগুলির মধ্যে মধ্যে শুভাগমন। তাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি ব্রিটিশ সেগুলি গভর্ণমেণ্টের সাহায্য পায় না ব'লেই হোক কিংবা জনসাধারণের ঔদাসীন্য বশতই হোক কণ্টিনেণ্টাল দলগুলির কাছে মাথা তুলতে পারে না। কণ্টিনেণ্টাল দলগুলিতে অনেক দেশের শিল্পীরা যোগ দেয়, তাদের পেছনে অনেক দেশের টাকার জোর। পারীর যেটি স্থায়ী অপেরাগৃহ সেটি পৃথিবীর বৃহত্তম রঙ্গালয়, তার পেছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে, তার সাজসজ্জা বহুকালাগত, তার নটনটীরা সমাজে বিশিষ্ট সম্মান পায়, তাতে তাদের গভর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ঢালে ও সেটি তাদের জাতীয় সম্পত্তি*। অথচ তার সীটগুলি যথেষ্ট সস্তা। পারীর দরিদ্রতম শ্রমিকও তার নিম্নতম শ্রেণীর দাম জোটাতে পারে, ধনী দরিদ্র সকলেরই জন্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মহার্ঘ বেশভূষা প'রে মহৈশ্বর্যময় স্টেজে অবতীর্ণ হয়। পারীর অন্যান্য থিয়েটারগুলোরও প্রযোজনা খুব চমকপ্রদ, অথচ সীট আরো সস্তা; চার আনা দিয়ে তিন ঘণ্টা আমোদ উপভোগ করতে পারা যায়, তবে এটা ঠিক

* ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্টে একজন মিনিস্টার অফ ফাইন আর্টস থাকেন, ইংলণ্ডে সেরূপ নেই, ইংরেজরা সব বিষয়ের মতো প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের পক্ষপাতী।

লণ্ডনের সীটের আরাম পারীর সীটে নেই, লণ্ডনের লোক গদীপাতা চেয়ার ছেড়ে কাঠের বেঞ্চিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে চাইবে না। পারীতে অনেক শ্রেণীর সীট আছে, অন্ততঃ দশ বারো শ্রেণীর; কিন্তু উচ্চতম থেকে নিম্নতম অবধি অল্প দামের ক্রমান্বিত ব্যবধান, চার আনার পরে ছ'আনা, ছ'আনার পরে আট আনা, এমনি ক'রে সব চেয়ে দামী সীট হয়তো চার টাকা। লণ্ডনে কিন্তু এক টাকার পরে দু'টাকা তার পরে তিন টাকা, এমনি ক'রে সব চেয়ে দামী সীট হয়তো পনেরো টাকা। সেইজন্যে ইংরেজরা থিয়েটারের চেয়ে সিনেমাই দেখে বেশি, গরীব লোকদের সঙ্গতি নেই ব'লে তাদের রসবোধ অচরিতার্থ থেকে যায়। ইংরেজরা আর্টকে সর্বসাধারণের হাতে দেবার মতো স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে পারেনি, (এদিকে একমাত্র সফল প্রচেষ্টা 'Old Vic'), সেইজন্য আর্ট এদের কাছে গঙ্গাজলের মতো ন্যাশনাল নয়। আমরাও যে গ্রামের লোককে গ্রামছাড়া ক'রে শহরের কোণে কোণে বস্তি গড়ছি আমাদেরও ভাবা উচিত গ্রামের যাত্রা পার্বণ কথকতা থেকে ও শহরের নাট্য সংগীত ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হ'য়ে তারা সমগ্র দেশকে নিরানন্দ ক'রে তুলছে কি না। নাগরিকতার নাগপাশে জড়িয়ে ইংলণ্ডের আত্মা যে একান্ত ক্লিষ্ট বোধ করছে ইংলণ্ডের অসামান্য স্বাস্থ্যের আড়ালে ঢাকা পড়লেও তা সত্য। নাগরিক ইংলণ্ড প্রাণবান, কিন্তু অমৃতবান নয়; অজর কিন্তু অমর নয়।

ফরাসীদের আর একটা জাতীয় সম্পদ তাদের মিউজিয়ামগুলো। জগৎপ্রসিদ্ধ লুভ্‌র ছাড়া লুক্‌শাঁবুর্গ ত্রোকাদেরো গীমে ইত্যাদি আরো ডজনখানেক ছোট বড় মিউজিয়াম আছে পারীতে। লুভরের ঐশ্বর্যের তুলনাই হয় না, তার আকার এত বড় যে সেটা একটা যাদুঘর নয় একটা যাদু-পাড়া, সমস্তটি একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে দু'দিন লেগে যায়। Venus de Miloকে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া হয়েছে, সে-ঘরে তার বন্ধুদের জন্যে চমৎকার বসবার বন্দোবস্ত হয়েছে, সে সব আসনে ব'সে যে কোনো কোণ থেকে তাকে নিরীক্ষণ করতে পারা যায়, বলা বাহুল্য যে-দিক থেকেই দেখি না কেন সব দিক থেকেই সে সমান সুদর্শনা। তাজমহলকে যেমন বার বার নানা আলোকে দেখেও চির-অপূর্ব মনে হয় গ্রীক ভাস্করের এই মানসী মূর্তিটিকেও তেমনি। তবে আমার ভারতবর্ষীয় চোখ নিছক রূপ দেখে তৃপ্তি পায় না, এবং বিউটিফুলের অতৃপ্তির চেয়ে সাব্লাইমের তৃপ্তিই তাকে প্রগাঢ়তর রস দেয়। সেইজন্যে 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'র ওপরে তার একটা পক্ষপাত আছে, সে পক্ষপাত নিয়ে সে বিশ্বের সামনে তর্ক করতে চায় না, সেটা ভারতবর্ষীয়ের ধাতের পক্ষপাত।

আমাদের কালিদাস যে নীতিনিপুণ ছিলেন এহেন অপবাদ তাঁকে তাঁর শত্রুতেও দেবে না, আশা করি স্বয়ং দিঙ্‌নাগাচার্যও দেননি। সেই শিল্পীই কিনা উমাকে শেষকালে জননীরূপে না এঁকে তৃপ্তি পেলেন না। ফুলবতীর চেয়ে ফলবতী লতার প্রতি আমাদের ধাতুগত পক্ষপাত 'উর্বশী'র কবিকেও 'কল্যাণী' লিখিয়েছে—পারফেকশন নয়, পরিণতিই আমাদের প্রিয়। এবং নীতি নয় রুচিই আমাদের অন্তর্মুখীন করেছে। বিবসনা শ্যামাকে মা বলতে পারি তো বিবসনা Venusকেও প্রিয়া বলতে পারতুম, তবু যে বলিনে এর কারণ যতই নিখুঁত হোক না কেন, Venusএর পরিণতি নেই, বৃদ্ধি নেই, সে আমাদের শুধু একটা রসই দেয়, জীবনের সমস্ত রস দেয় না, তার মধ্যে আমাদের কুমারের জননীকে দেখিনে—'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী!'

লুভ্‌র মিউজিয়ামে 'মোনা লিসা' (লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-কৃত)-কেও দেখলুম। তার সেই রহস্যময় হাসি মানুষের পিছু নেয়, তাকে ভোলবার সাধ্য নেই, ইচ্ছা করলেও চেষ্টা করলেও ভুলতে পারিনে। লুভরে কিছু না হোক লাখখানেক ছবি তো আছেই, পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের আঁকা। কেমন ক'রে বলব যে তার চেয়ে কেউ সুন্দরী নয়? তখন তো মনে হচ্ছিল অনেকেই

সুন্দরতরা। একে একে সকলেই মিথ্যা হ'য়ে গেছে, স্বপ্নদৃষ্টার মতো। প্রভাতী তারার মতো চোখে লেগে আছে শুধু 'মোনা লিসা'র হাসিটি।

ফরাসীরা এসব ছবি এসব মূর্তি নানা উপায়ে সংগ্রহ করেছে, সব উপায় সাধুও নয়। এদের অনেকগুলি যুদ্ধলব্ধ। রাজ্য জয় ক'রে অনেক বিজেতা অনেক রত্নই হরণ করে, কিন্তু ফরাসীরা হরণ করেছে শিল্পসম্ভার। ফরাসীদের হারিয়ে দিয়ে বিসমার্ক অনেক কোটি স্বর্ণমুদ্রা আদায় ক'রেছিলেন, সে সোনা এতদিনে ধূলা হয়ে গেছে, জার্মানী এখন পুনর্মূষিক। কোন্ জাতি কোন্ জিনিসকে বেশি দাম দেয় তাই নিয়েই তার ইতিহাস। ভারতবর্ষ যদি আত্মাকে সত্যিই তার সর্বস্ব দিয়ে কিনে থাকে তবে ভারতবর্ষের আত্মা মরবে না।

ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়াম প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে যা' মনে হ'য়েছিল ফ্রান্সের লুভ্‌র ত্রোকাদেরো প্রভৃতি জাতীয় সম্পদ দেখে তাই মনে হলো—ভাবলুম, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে জন্ম নিয়ে আত্মিক সুবিধা আছে, বাল্যকাল থেকেই মিউজিয়াম দেখতে দেখতে মানুষ হব, বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করব, তখন যদি আর্টক্রিটিক হ'য়ে উঠি তো বাংলা মাসিকপত্রের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে রসবোধের শ্রাদ্ধ করব না, চোখ পাকবে কিন্তু মন পাকবে না, প্রতিদিন একটু ক'রে বড় হব কিন্তু বুড়ো হব না, আমার প্রাচীন দেশের পরিপক্ব শিক্ষাকে আমার চির-তরুণ অন্তরে ধারণ করব এবং প্রতি দেশের নিজস্ব শিক্ষাকে আমার নিজস্ব শিক্ষার মধ্যে গ্রহণ করব।

ফরাসী জাতিটা হচ্ছে যাকে বলে কসমোপলিট্যান্—এর মানে এ নয় যে ওরা বিশ্বপ্রেমিক, এর মানে ওরা বিশ্বচেতন। প্রমাণ ওদের পথ-ঘাটের নামগুলো। পৃথিবীর সব দেশের ইতিহাস ও সব দেশের ভূগোল পড়বার যাঁদের সময় নেই তাঁরা কেবল পারীর মানচিত্রখানার ওপরে চোখ বুলিয়ে যান, দেখবেন রাস্তার নাম লণ্ডনের মতো প্রত্যেক পাতায় একটা করে Old Street, New Street, High Street ও Park Road নয়, রাস্তার নাম Moscou, Tokio, Pekin, Constantinople ইত্যাদি ও President Wilson, Edouard VII, Garibaldi, Hausmann ইত্যাদি। প্লাসের নাম Etats-unis (য়ুনাইটেড স্টেটস্), Italie, Europ ইত্যাদি ও রেলস্টেশনের নাম George V, St. Francis Xavier, Michel-Ange (মাইকেল এঞ্জেলো) ইত্যাদি। এছাড়া স্বদেশের মহাপুরুষ মাত্রেরই ও স্বদেশের প্রতি অংশের নাম পারীর সর্বাঙ্গে বৈষ্ণবের সর্বাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নামের মতো ছাপা। ফ্রান্সের লোকের দেশাত্মজ্ঞান অমনি ক'রেই হয় ব'লেই তাদের দেশাত্মবোধ আপনা আপনি জন্মায়। শৈশব থেকেই তারা পথে চলতে চেনে তাদের জাতীয় পূর্বপুরুষদের—যাদের নিয়ে তাদের ইতিহাস লেখা হয়েছে; আর তাদের দেশের প্রতি জেলায় প্রতি শহরের প্রতি পর্বতের নাম—যাদের কোলে তাদের অখণ্ড জাতি লালিত হয়েছে। স্বদেশকে চেনে ব'লেই তারা স্ববিশ্বকেও চিনতে পারে।

॥ সাত ॥

এ দেশে স্বতন্ত্র বর্ষাঋতু নেই ব'লে প্রত্যেক ঋতুই অংশত বর্ষাঋতু। সময় নেই অসময় নেই বর্ষাঋতুর বর্গীরা অপর ঋতুদের খাজনা থেকে চৌথ আদায় ক'রে যায়। সকালবেলা শুয়ে শুয়ে দেখলুম আলোতে ঘর ভ'রে গেছে, ফুটফুটে খোকার মুখে হাসি আর ধরে না, আকাশের সেই হাসি তরুণী ধরণীর মাতৃ-মুখখানিকে পুলকে গর্বে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে। এটা বসন্তকাল। কোকিলের কুহু শুনছিনে, কিন্তু সমস্তদিন কত পাখির কিচিমিচি। গাছেরা নতুন দিনের নতুন ফ্যাশান অনুযায়ী সাজ বদলে ফেলেছে, তাদের এই কাঁচা সবুজ রঙের ফ্রকটিকে তারা নানা ছলে দেখাচ্ছে, ঘুরে ফিরে দেখাচ্ছে, আধেক খুলে দেখাচ্ছে। বাতাস একজন গ্যালাণ্ট যুবার মতো তাদের শ্রীমুখের তুচ্ছতম মামুলীতম কায়দা-দুরস্ত ফরমাস শুনবে ব'লে উৎকর্ণ হ'য়ে নিমেষ গুনছে এবং শুনবামাত্র শশব্যস্ত হ'য়ে দিগ্‌বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তার সেই ব্যস্ততার উষ্ণ স্পর্শ পেয়ে উঠে বসলুম। ভাবলুম এবারকার বসন্তটাকে এক ফার্দিং-ও ফাঁকি দেব না, পরিপূর্ণভাবে ভোগ ক'রে নেব। আকাশ এত নীল, মাটি এত সবুজ, বাতাস এত কবোষ্ণ, পাখি এত অস্থির, ফুল এত অজস্র—এই ভরা ভোগের মাঝখানে আমি যদি আনমনা থাকি তো আমার শিরসি চতুরানন কী না লিখবেন?

কিন্তু, এ কি হা হন্ত কোথা বসন্ত! দেখতে দেখতে এলেন কি না ইন্দ্ররাজের ঐরাবতের পাল, স্বর্গরাজ্যের ইস্কুলমাস্টার তাঁরা, অত্যন্ত পক্ক প্রবীণ অভ্রান্ত তাঁদের গুম্ফশ্মশ্রু-ধবল বদন-মণ্ডল। তাঁদের স্থূল হস্তাবলেপনে আকাশের চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল, তার সদ্যোজাত লাবণ্য গেল এক ধমকে মলিন হয়ে। হায় হায় ক'রে উঠল পৃথিবীর জননী-হৃদয়টা।

এ দেশের এই খেয়ালী ওয়েদার দু'দিনেই মানুষকে মরীয়া ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। বার বার আশাভঙ্গের মতো পরীক্ষা আর নেই, প্রতিদিন সেই একই পরীক্ষা। সকালের আশা দু'পুরে ভাঙে, রাত্রের আশা সকালে ভাঙে। নিত্য অনিশ্চয়ের মধ্যে বাস করতে করতে জীবনের ফিলজফীটাই যায় বদলে। মনে হয়, দূর হোক ছাই, বাইরের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করব না, কালেভদ্রে যখন যেটুকু পাই তখন সেইটুকু ঢের, যেন সেইটুকুকেই হাতে হাতে ভোগ ক'রে নিতে প্রস্তুত থাকি, অন্যমনস্ক ভাবে লগ্ন না বইয়ে দিই, কিংবা চপল লগ্নকে র'য়ে স'য়ে ভোগ করতে গিয়ে মুখের গ্রাস থেকে বঞ্চিত না হই।

বাইরের কাছ থেকে আনুকূল্য না পেয়ে ইংলণ্ড একদিকে হয়েছে ভোগগ্রাহী, অন্যদিকে হয়েছে ভোগসংগ্রাহী। সে বাইরে থেকে যা পায় তার তলানি অবধি শুষে নেয়, যা পায় না তাকে প্রাণপণে অর্জন করে। বার বার আশাভঙ্গজনিত অনিশ্চয় তাকে অভিভূত করতে পারলে সে কবে মরত, কিন্তু অভিভূত করা দূরে থাক তার জেদ বাড়িয়ে দিয়েছে। বাইরের সঙ্গে তার যে পরিচয় সে যেন 'খড়্গো খড়্গো ভীম পরিচয়।' প্রতিপক্ষকে হার মানাবে ব'লে সে প্রতিপক্ষের নাড়ী-নক্ষত্র জেনে নিয়েছে—সেই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। জগৎটাকে মায়া বলবার মতো সাহস যে তার হয়নি তার কারণ মরীচিকা দেখতে পাবার মতো চোখ-ধাঁধানো সূর্যালোক এ দেশে দুর্লভ। যা পায় তাকে অনিত্য ব'লে ত্যাগ করবার মতো বাবুয়ানাও তার সাজে না, কেননা সে যা পায় তা অপ্রসন্না প্রকৃতির বাম হস্তের মুষ্টিভিক্ষা, আর আমরা যা পাই তা অন্নপূর্ণা প্রকৃতির অঞ্জলিভরা দান। ভিক্ষা ক'রে এ দেশে একমুঠো ভিক্ষার সঙ্গে এত মুঠো অপমান মেলে যে, নিতান্ত দায়ে ঠেকলে ভিক্ষার চেয়ে উদ্বন্ধনই

হয় শ্রেয়। অথচ ভিক্ষা করাটা আমাদের উপনয়নের অঙ্গ, সন্ন্যাসের অবলম্বন, আমাদের শিব স্বয়ং ভিখারী। অবশেষে এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশে সন্ন্যাসী যত আছে গৃহস্থ তত নেই, মুখের চেয়ে হাতের সংখ্যা কম, পুরুষকারের অভাবে সমস্ত দেশজোড়া ক্লৈব্য। সেইজন্যে ভোগের নামটা পর্যন্ত আমাদের কানে অশ্লীল।

ইংলণ্ডের মানুষের একমাত্র ভাবনা যে, জীবনটাকে এন্‌জয় করতে পারছে কি না; এন্‌জয় করা ছাড়া তার কাছে জীবনের অন্য কোনো মানে নেই। ভোগের জন্যে সে প্রাণপণে ভুগেছে, বার বার আশাভঙ্গ সত্ত্বেও প্রাণ ভ'রে আশা রেখেছে, যে লক্ষ্মীকে সে অর্জন করল তাকে যদি সে ভোগ করতে না পারল তবে তার জীবনটাই ব্যর্থ হলো। তার স্ত্রীকে তো সে পিতার হাত থেকে পায়নি যে অতি সহজে ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীয়ানা করবে! সে স্বয়ম্বর-সভার বীর, প্রকৃতি তার ভোগ্যা। প্রকৃতিকে এড়াবার তপস্যা তার নয়, মুক্তি নয় ভুক্তিই তার লক্ষ্য, এর জন্যে যে ক্ষমতা চাই সেই ক্ষমতার তপস্যাই ইংলণ্ডের তপস্যা।

ঈস্টারের ছুটিতে লণ্ডনের বাইরে গিয়ে ভোগের চেহারা দেখলুম। তপস্যার জন্যে কাজের জন্যে লণ্ডন। ভোগের জন্যে ছুটির জন্যে সমস্ত ইংলণ্ড। যেখানে যাই সেখানে দেখি অসংখ্য হোটেল, বোর্ডিং হাউস, সরাই, রেস্তরাঁ, পেয়ীং গেস্ট্ রাখতে ইচ্ছুক গৃহস্থ বাড়ি। সর্বত্র মোটরগম্য মজবুত তকতকে রাস্তা। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলিতে স্নান সাঁতার নৌ-চালনার আয়োজন। কোথাও মাছধরা কোথাও শিকার করা। সর্বত্র টেনিস্‌কোর্ট সর্বত্র গল্‌ফকোর্স। এমন স্থান অতি অল্পই আছে যেখানে সিনেমা নেই রেডিও নেই টেলিগ্রাফ টেলিফোন ডাকঘর নেই সারকুলেটিং লাইব্রেরী নেই। যার যতদূর সাধ্য সে ততদূর খরচ ক'রে ছুটি কাটাতে যায়, অত্যন্ত অল্পবিত্তদের পক্ষেও এর ব্যতিক্রম হয় না। আমাদের যেমন তীর্থযাত্রার বাতিক, এদের তেমনি হলি-ডে হ্যাবিট। কাজের সময় যেমন কাজকে এক মিনিট ফাঁকি দেয় না, ছুটির সময় তেমনি ছুটিকে এক সেকেণ্ড ফাঁকি দেয় না। ছুটি পেলেই এক একখানা সুটকেস হাতে ক'রে বালক-বৃদ্ধ-বনিতা কর্মস্থল ছেড়ে ক্রীড়াস্থলে রওনা হয়। তারপর একস্থানে যতদিন খুশি হোটেল বাস, char-a-banc পূর্বক স্থান-পরিক্রম, খেলাধূলার ধূম, পানাহারের আড়ম্বর, নাচ-গানের মজলিস। গত যুগের পূজা পার্বণ আর নেই, দেড় শতাব্দীর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইংলণ্ডের চেহারা বদলে দিয়েছে। কর্মের সঙ্গে ধর্মের এবং ছুটির সঙ্গে পার্বণের যে সোদর সম্বন্ধ ছিল এখন সে সম্বন্ধ অনেক দূর সম্বন্ধ, মাঝখানে অনেক পুরুষ গত হয়েছে।

আমি যে অঞ্চলে গিয়েছিলুম তার নাম আইল্ অব ওয়াইট্। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৬০ মাইল, কিন্তু তারি মধ্যে গুটি আট দশ ছোট ছোট শহর ও বিশ পঁচিশটি ছোট ছোট গ্রাম। এই শহর ও গ্রামগুলির অধিকাংশই টুরিস্টজীবী। গ্রীষ্মকালে যে সব টুরিস্ট আসে তাদের খাইয়ে খেলিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদেবি দৌলতে বৎসরের বাকি সময়টা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তখন হোটেলগুলো খাঁ খাঁ করতে থাকে, দোকান পাট কোনো মতে বেঁচেবর্তে রয়, খেলার মাঠে আগাছা গজায়। স্থানীয় লোকগুলি সাধারণত চাষা মুদি রুটিনির্মাতা মাঝি জেলে মজুর। তবু এরাই নিজেদের প্রতিনিধি দিয়ে এই সব শহর গ্রাম শাসন করে। খুব ছোট ছোট গ্রামগুলিতেও স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত।

শহর যেমন সব দেশেই প্রায় একই রকম গ্রামও দেখলুম সব দেশেই প্রায় এক রকম। মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে ইট পাথরের দেয়ালের ওপরে খড়ের চালা বা টালির ছাদ, দেয়ালের গায়ে লতা উঠেছে, ছাদের উপরে ঘাস গজিয়েছে—এরি নাম কটেজ। তবে নতুনের সঙ্গে সন্ধি না ক'রে পুরাতনের গতি নেই। সংকীর্ণ গবাক্ষ, কিন্তু কাঁচের সার্শী। সেকেলে গড়ন, কিন্তু একেলে সরঞ্জাম।

মুদির দোকানের ভিতরে ডাকঘর বসেছে, তামাক-চকোলেটের দোকানে টেলিফোনের আড্ডা, রেল স্টেশনের ভিতরে সস্ত্রীক স্টেশন মাস্টারের আস্তানা। প্রত্যেক গ্রামে ছেলেদের খেলার মাঠ আছে, পাব্লিক লাইব্রেরী আছে। স্কুলের চেয়েও এ দুটো জিনিস উপকারী। স্কুলের সংখ্যা ক'মে এ দুটোর সংখ্যা বাড়লে ছেলেগুলি বাঁচে। শিক্ষার নামে শিশুমনের ওপর যে-বলাৎকার সব দেশেই চ'লে এসেছে এ যুগের শিশু সে-বলাৎকার সহ্য করবে না। শিশুও চায় স্বরাজ। তার নিজস্ব শিক্ষা সে নিজেই খুঁজে নেবে।

শহর ও গ্রামগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিপাটি। ক্ষুদ্রতম গ্রামেরও পথঘাট অনবদ্য এবং বাড়িঘর সুখদৃশ্য। অতি দরিদ্র ঝাড়ুদার (চিম্‌নী-সুইপ) যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির বাইরে বেল আছে, তার কাঁচের জানলার ওপাশে ধবধবে পর্দা, যথাস্থানে সন্নিবেশিত অল্পবিস্তর আসবাব, সমস্ত গৃহটির বাইরে ভিতরে এমন একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের আভাস যে তেমনটি আমাদের ধনীদের গৃহেও বিরল। ধন নয়, মনই রয়েছে এর পিছনে, সে মন ভোগ-তৎপর মন। সেইটি যদি থাকে তো উপকরণের অভাব হয় না, যা জোটে তাকেই কাজে লাগানো যায়, যা জোটে না তাকে অর্জন ক'রে নেওয়া যায়। এ সংকেত আমরা জানিনে, কেননা পরলোকে বাসা বাঁধবার ব্যস্ততায় ইহলোকের বাসাকে আমরা এক রাত্রির পান্থশালা ভেবে এসেছি, তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব মানিনি; যে-দেহে বাস করি সে-দেহকে যেমন অনিত্য ভেবে অনাস্থা দেখাই, যে-গৃহে বাস করি সে-গৃহকেও তেমনি অনিত্য ভেবে অবহেলা করি। এদিকে কিন্তু ইহলোককে এরা ম'রেও ছাড়তে চায় না, কফিনের ভিতরে শুয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, এদের বিশ্বাস জগতের শেষ দিন অবধি এদের এই মাটির শরীরখানা থাকবে।

তা ছাড়া আমার মনে হয় এ দেশের এই গৃহ-পারিপাট্য ও পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের মূলে রয়েছে এ দেশের নারী-শক্তির সক্রিয়তা। আমাদের ইহবিমুখ ধর্ম হচ্ছে নারীবিমুখ ধর্ম, আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে নারীর অন্তরের সায় নেই, আমাদের গৃহ নারীর সৃষ্টি নয় এবং গৃহের বাইরেও নারী আমাদের সৃষ্টি করতে পায় না। ইংলণ্ডের নারী তার স্বামীগৃহের রাণী, শাশুড়ী-জা'দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, নিজের ঘরের সমস্ত দায়িত্ব এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার হাতে, সেইজন্যে ইংলণ্ডের গৃহিণীর হাত এক মুহূর্ত বিশ্রাম পায় না, ঘরটির ঝাড়া মোছা ঘষা মাজাতে সর্বক্ষণ ব্যাপৃত। সন্তান সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি দায়িত্ব এবং ততখানি স্বাধীনতা। জা-শাশুড়ীর সাহায্য নেই হস্তক্ষেপ নেই। ইংলণ্ডের ছেলেরা 'হোম' নামক যে-জিনিসটি পায় সেটির একদিকে মা অন্যদিকে বাবা, মাঝখানে ছোটবড় ভাইবোনগুলি। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এক টেবিলে সকল ক'টিতে মিলে খায়, রাত্রে এক অগ্নিস্থলে সকল ক'টিতে মিলে গল্প বা গান বাজনা করে, অল্পে সম্পূর্ণ ছোট একটুখানি নীড়। এর মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজ, এর মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগি করতে গিয়ে নিত্য কলহ নেই, এটা একটা বিরাট যজ্ঞশালার মতো কোলাহলমুখর নয়।

সে যাই হোক, ইংলণ্ডের গৃহিণীদের কাছ থেকে আমাদের গৃহিণীদের অন্ততঃ একটি বিষয় ভক্তিভরে শিক্ষা করবার আছে। সেটি, গৃহের শৃঙ্খলাবিধান ও পারিপাট্যসাধন। নিজের আশপাশকে নিয়েই নারীর সৃষ্টি। নারীর আভামণ্ডল হচ্ছে নারীর পরিচ্ছদ, নারীর গৃহ। কিন্তু আমাদের রন্ধনপর্ব এত অধিক সময় নেয় যে, তার পরে অন্য কিছু করবার না থাকে অবসর, না থাকে বল। অথচ গ্যাসের উনুনের সাহায্যে এ দেশে দরিদ্রতমা গৃহিণীরাও আধ ঘণ্টায় এক বেলার রান্না চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তার পরে হায়ার পারচেজ প্রথার প্রবর্তন হ'য়ে অবধি গরীবের ঘরেও আসবাবের নিঃস্বতা নেই, অনেকের একটি পিআনো পর্যন্ত আছে। কোন্ বিষয়ে খরচ কমিয়ে কোন্ বিষয়ে খরচ বাড়াতে

হয় সেটা একটা আর্ট। খরচ কমানো মানে কেবল টাকার খরচ না, সময়েরও খরচ। আমাদের দেশে যা দাসীর কাজ এ দেশের গৃহিণীরাও তা যন্ত্রের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত ক'রে স্বহস্তে সারেন। তার ফলে যে টাকা ও সময় বাঁচে সে টাকায় ও সময়ে বিদ্যাবতী কলাবতী স্বাস্থ্যবতী হওয়া যায়। গ্রামে দেখলুম প্রায় প্রত্যেকেরই বাগান আছে, সে বাগানে বাড়ির মেয়েরাই কাজ করে, ছেলেরা বাইরের কাজে ব্যস্ত। লণ্ডনেও অনেক বাড়িতে ছোট একটুখানি বাগান আছে, বাগানকে ইংরেজেরা বড় ভালোবাসে। বাইরের কাজ থেকে ফিরে এসে বাগানের কাজ করা এদের অনেকেরই একটা হবি। গ্রামে দেখলুম অবসর পেলেই গৃহিণীরা সেলাই নিয়ে বসেছেন, গল্প গুজবে গা ঢেলে দিয়েও হাতের কাজটিতে ঢিলে দিচ্ছেন না। হাজারো বিলাসিতা করুক এ দেশের মেয়েরা উপার্জন করতে পটু, তথা উপার্জন বাঁচাতে পটু। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় কারুশিল্পের ও গার্হস্থ্য অর্থনীতির। জনপিছু ছ' পেনী খরচ ক'রে কতখানি সাপার (নৈশ ভোজন) রাঁধা যেতে পারে কিংবা অল্প খরচে কি কি পোষাক স্বহস্তে তৈরি করা যেতে পারে প্রতিযোগিতার এইরূপ বিষয় নির্দেশ ক'রে দেন গ্রামের কর্তৃপক্ষ। অনেক বাড়িতে যে বাগান আছে সেই বাগানে পর্যটকদের চা' খাইয়ে অনেকে সংসারের আয় বাড়ায়। এই সব 'টী-গার্ডন' ছাড়া অনেকের বাড়িতে বা ফার্ম হাউসে দু' তিনটে ঘর খালি থাকে, সেখানে পেয়িং গেস্ট রাখা হয়। অধিকাংশ গৃহস্থের মুরগী শুয়োর গোরু ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পোষ্য আছে। অর্থাগমের ও অর্থসঞ্চয়ের যতো উপায় আছে কোনোটাই কেউ পারৎপক্ষে বাদ দেয় না।

গ্রামে দেখলুম সাইক্লের চল কিছু বেশি। এবং ওটা সাধারণতঃ মেয়েদেরই যান। মেয়েরা ঐ চ'ড়ে বাজার করতে যায়। ছেলেরা চড়ে মোটর সাইক্ল। তবে মেয়েরা যেমন উঠে প'ড়ে লেগেছে আর কিছুকাল পরে ওটাও হবে প্রধানত মেয়েলি যান। এরোপ্লেনে ক'রে এ্যাটলান্টিক অতিক্রম করতে গিয়ে মরাটাই হচ্ছে এখন তাদের আধুনিকতম ফ্যাশান। হিস্টিরিয়ায় মরার চেয়ে এটা তবু স্বাস্থ্যকর ফ্যাশান। মহাযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে cult of joyএর চর্চা বেড়েছে। যুবকরা জেনেছে, যে-কোনো দিন দেশের ডাকে প্রাণ দিতে হবে, এই নিষ্ঠুর যুগে প্রাণের মূল্য নেই, প্রাণ সম্বন্ধে সীরিয়াস কেউ নয়। সুতরাং যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ হাস। যুবতীরা জেনেছে পুরুষ-সংখ্যার স্বল্পতাবশতঃ বিবাহ অনেকের ভাগ্যে নেই, আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ মাতৃত্ব আরো অনেকের ভাগ্যে নেই। সুতরাং যতটুকু পাই হেসে লবো তাই। ঘোরতর মোহভঙ্গের ভিতরে এ যুগের তরুণ তরুণীরা বাস করছে। ছেলেদের চোখে ডেমক্র্যাসীর কালো দিকটা ধরা প'ড়ে গেছে, উনবিংশ শতাব্দীর সব আদর্শ খেলো হ'য়ে গেছে, জীবন নামক চিত্রিত পর্দাখানা তারা তুলে দেখলে এর পেছনে লক্ষ্য ব'লে কিছু নেই। শুধু বাঁচবার আনন্দে বাঁচতে হবে, হাসবার আনন্দে হাসতে হবে। এ যুগের তরুণ যত হাসে তত ভাবে না। মেয়েরা বুঝতে পেরেছে, ভোট এবং আর্থিক অনধীনতাই সব কথা নয়, ওসব পেয়েও যা বাকি থাকে তার ওপরে জোর খাটে না, সেটা হচ্ছে পরের হৃদয়। এ যুগের মেয়েদের মতো দুঃখিনী আর নেই। তবু তারা পণ করেছে কিছুতেই কাঁদবে না, কিছুতেই হটবে না। জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি প্রত্যাশা করা চলে না, এইটে এ যুগের ইউরোপের মূল সুর। যেটুকু আমাদের নিজেদের আয়ত্তগম্য সেইটুকুর ওপরে এ যুগের ইউরোপের ঝোঁক পড়েছে। সেইজন্যে এত দেহের দিকে নজর, আয়ুর দিকে নজর, যৌবনের দিকে নজর। ক্রমশই ইউরোপের লোকের স্বাস্থ্য বেড়ে চলেছে, আয়ু বেড়ে চলেছে, যৌবন বেড়ে চলেছে। সেই গর্বে এ যুগের অগ্রসরপন্থীরা খ্রীস্টীয় চরিত্রনীতি মানতে চায় না, ইউরোপে এখন পেগানিজ্‌মের যুগ ফিরে এসেছে, দেহের উৎকর্ষের জন্যে এখন চরিত্রের সাতখুন মাপ।

এ যুগের মানুষ নির্জনতাকে বাঘের মতো ডরায়। গ্রামের আদিম নির্জনতার ভয়েই সে শহর

শরণ করেছে, শহরে অরুচি হলে মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্যে সে গ্রামে যায়, সেই সঙ্গে শহুরে আমোদ প্রমোদ আরাম বিলাসগুলোকেও পুঁটলি বেঁধে গ্রামে নিয়ে যায়। প্রতি গ্রামের যে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল নাগরিক সভ্যতার স্টীম্ রোলার তাকে থেঁৎলে গুঁড়িয়ে সমতল ক'রে দিচ্ছে। সেই সমতলের ওপর দিয়ে নাগরিকের দল char-a-banc চ'ড়ে দু'ঘণ্টায় ষাট মাইল চক্কর দিয়ে যান, তারি নাম দেশ-ভ্রমণ। এবং ছেঁটে কেটে সমান ক'রে আনা দৃশ্যগুলোকে মুহূর্তমাত্র চোখে ছুঁইয়ে পরমুহূর্তে বিস্মৃতির ওয়েস্ট পেপার বাসকেটের মধ্যে নিক্ষেপ করেন, তারি নাম দেশ-দর্শন। তারপর সন্ধ্যা জুড়ে বন্ধ ঘরে সিগরেটের ধোঁয়ায় অন্ধকূপ রচনা ক'রে সেই গর্তের মধ্যে সিনেমা দেখা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আহার নিদ্রা বিশ্রম্ভালাপ। কাজের দিনে ভূতের মতো খাটুনি, ছুটির দিনে অরসিকের মতো সময়ক্ষেপ।

শহরে এ জিনিস চোখে লাগে না। কিন্তু গ্রামে যখন এই জিনিস দেখি তখন কেমন খাপছাড়া ঠেকে, চারিদিকের সঙ্গে এর মেলে না। প্রকৃতি সেই আদিকালের মতো শান্ত সুস্থির আত্মস্থভাবে কাজের সঙ্গে ছুটির মিতালি ক'রে গরজের সঙ্গে আনন্দের তাল রেখে একঠাই দাঁড়িয়ে একটি পায়ে নূপুর বাজাচ্ছে। আর মানুষ কি না কাজকে দাসখৎ লিখে দিয়ে তার অনুগ্রহদত্ত অবকাশটুকু লাটিমের মতো ঘুরে অপচয় করছে। সমুদ্রের কলরোলের দিকে কান দেবার অবসর নেই, তৃণের সীমাহীন শ্যামলতার আহ্বানে চোখ সাড়া দেয় না। মাথার ওপরে উড়ছে এরোপ্লেন, সমুদ্রের ওপরে ভাসছে লাইনার জাহাজ, রাস্তা তোলপাড় করছে বাস মোটর, মাঠ তোলপাড় করছেন গলফ্‌ক্রীড়ারত টেনিসক্রীড়ারত মানব-মানবীর দল। গতিশীল সভ্যতা যে জীবনের আনন্দ বাড়িয়েছে এমন তো মনে হয় না, বাড়িয়েছে কেবল জীবনের উত্তেজনা। জীবনকে সচেতন ভাবে ভোগ করা নয়, কোনোমতে হেসে খেলে ভুলে কাটিয়ে দেওয়া। নির্জনতার মধ্যে নিজের সঙ্গে একলা থাকার মতো শাস্তি আর নেই। কাজে হোক অকাজে হোক কিছু একটাতে ব্যাপৃত না থাকতে পারলে মনে হয় সময়টা মাটি হলো, এই সময়টা অন্যেরা কাজে লাগাচ্ছে, ফুর্তি লুটছে। কাজের দিনে এক মুহূর্ত ধ্যানস্থ হবার জন্যে স্থির হবার জো নেই পাছে প্রতিযোগীর দল মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়, পেছিয়ে প'ড়ে প্রাণে মরি। ছুটে চলার এই বেগ ছুটির দিনেও সংবরণ করতে পারিনে, নানা ব্যসনে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মনে করি খুব এনজয় করছি বটে, এই তো সক্রিয় আনন্দ, এই তো জ্যান্ত মানুষের মতো। আসলে কিন্তু এইটেই হচ্ছে চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তা। ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলার চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ঢেউ ভাঙা বড় কঠিন আনন্দ। আত্মস্থ না হয়ে ভোগ নেই।

তবে এই একটা মস্ত কথা যে, একালের ব্যসন সেকালের মতো বলক্ষয়ী নয়। একালের মানুষ হয়তো দৃশ্য-গন্ধ-সংগীতের রসগ্রাহী নয়, কলার নামে কৃত্রিমতাকেই সে মহামূল্য মনে করে, বাস্তবতার অন্বেষণে সে কল্পনাবৃত্তি খুইয়েছে, প্রগাঢ় প্যাসনের পরিবর্তে উগ্র সেনসেশনই তার অনুভূতি জুড়েছে। তবু এসব সত্ত্বেও সে স্বাস্থ্যবান প্রাণবান বলবান। বিষপান করেও সে নীলকণ্ঠ। প্রচুর হাস্যরস তার স্বাস্থ্য বাড়িয়ে দিচ্ছে, অজস্র খেলাধূলা তার বল বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিজ্ঞান তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছে—'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

আইল্ অব ওয়াইট্ বড় সুন্দর স্থান। নীলরঙের ফ্রেমে বাঁধানো একখানি সবুজ ছবির মতো সুন্দর। তবে এ দেশের সবুজ যেন আমাদের সবুজের মতো কান্ত নয়, স্নিগ্ধ নয়, কেমন যেন তীব্র আর ঝাঁঝালো। তৃপ্তি দেয় না, উন্মাদনা দেয়; ছাড়তে চায় না, টেনে রাখে; আবেশের চেয়ে জ্বালা বেশি। দ্বীপটির কোনো কোনো স্থল এত নিরালা যে নেশার মতো লাগে। দিন যেদিন উজ্জ্বল থাকে চোখ সেদিন তন্দ্রালসে নুয়ে পড়তে চায়। বাতাসে পাল তুলে দিয়ে নৌকা ভেসে যাচ্ছে। গম্ভীর

ভাবে ওপারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে দূরদেশগামী জাহাজ। মাথার ওপরে চিলের মতো উড়ছে এরোপ্লেন—এত ওপরে যে, তার বিকট কণ্ঠরব কানে পৌঁছয় না। কানে বাজছে শুধু জলকণ্ঠের ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল। তটকে যেন আদি কাল থেকে সেধে আসছে, তবু তার মান ভাঙাতে পারছে না। মাটি তার সবুজ চুল এলিয়ে দিয়েছে। যেমন তার রূপ তেমনি তার গন্ধ। ঘুমের থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়, চেতনার থেকে প্রতীতি কেড়ে নেয়। সব মিলিয়ে মনে হতে থাকে যেন স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম। সত্য কেবল ঐ আপনভোলা শিশুগুলি, ঐ যারা বালি দিয়ে ঘর তৈরি করছে, বাঁধ তৈরি করছে, ঘরের মধ্যে ভালোবাসার পুতুলকে রাখছে। সমুদ্রের এক ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ওরা তাই দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠছে, আবার সেই ঘর ইত্যাদি।

গ্রামের লোকগুলিকে ভালো লাগল। বিদেশী দেখলেই সম্মান করে, কুশল প্রশ্ন করে, সাহায্য করতে ছুটে আসে। শহুরে ইংরেজদের দেখে ইংরেজ জাতিকে যতটা নিঃশব্দপ্রকৃতি ভেবেছিলুম গ্রাম্য ইংরেজদের দেখে ততটা মনে হলো না। সৌজন্যের চেয়ে বড জিনিস সৌহার্দ্য। গ্রামের লোকের কাছে অল্পতেই ও জিনিস পাওয়া যায়। শহরের লোকের সঙ্গে বিনা ইন্‌ট্রোডাক্‌শনে ভাব করবার উপায় নেই, যেটুকু আলাপ হয় সেটুকু ঘড়ির উপরে চোখ রেখে। কিন্তু গ্রামের লোকের হাতে কাল অন্তহীন। সময়কে তারা ফাঁকি দিতে ডরায় না, সময়ের মূল্য নামক কুসংস্কারটা তাদের তেমন জানা নেই। তাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মনে অন্তরঙ্গতা যেমন সব দেশে, তেমনি এ দেশেও। নিজের গ্রামের যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময়, সুখদুঃখের আলোচনা। মুখ গুঁজে না দেখার ভান ক'রে পালাবার পথ খোঁজা নেই, কিংবা ওয়েদার সম্বন্ধে দুটো তুচ্ছ প্রশ্নোত্তর ক'রে ঘণ্টা ধ'রে চুপ ক'রে এক গাড়িতে ভ্রমণ করা নেই।

তবে গ্রাম্য সভ্যতার এখন দিন ঘনিয়ে এসেছে সব দেশে। ইংলণ্ডে এখন পল্লীতে যত লোক থাকে তার তিনগুণ থাকে নগরে। ফ্রান্সে জার্মানীতেও ক্রমশ গ্রামকে শোষণ ক'রে নগর মোটা হচ্ছে। Back to the village যে ভারতবর্ষে সম্ভব হবে এমন তো মনে হয় না। বড় জোর গ্রাম থাকবে দেহে, তার আত্মা যাবে বদলে। গ্রাম্য সভ্যতার শবখানাতে ভর করবে নাগরিক সভ্যতার তাল বেতাল। গ্রামগুলি হবে নগরেরই ক্ষুদে সংস্করণ। তাছাড়া গ্রামে নগরে ভেদরেখা কোন্‌খানে টানব? লোকসংখ্যা বাড়লেই গ্রামের নাম হচ্ছে নগর। নগরে ও গ্রামে যে প্রভেদ সেটা আকৃতিগত নয়, আকারগত প্রভেদ। নগরেরই মতো গ্রামও হোটেলে ভ'রে যাচ্ছে, ভাড়াঘরে ভ'রে যাচ্ছে। এর মানে এই যে, এ যুগের মানুষ কোথাও স্থায়ী হতে চায় না। বেদেরা তাঁবু ঘাড়ে ক'রে বেড়ায়, আমরা তা করিনে। অন্যলোক আমাদের জন্যে তাঁবু খাটিয়ে রাখে, সারাজীবন আমরা কেবল এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে পাড়ি দিতে থাকি। এক কালে আমরা যাযাবর ছিলুম। তারপর কোনো একদিন ধানের ক্ষেতের ডাকে ঘর গড়লুম, স্থিতিশীল হলুম। এখন আমরা বাণিজ্যের পণ্য নিয়ে ফেরিওয়ালার মতো পথে বেরিয়ে পড়েছি, আমরা গতিশীল। পথও মনোহর। এতে শীত-আতপের কষ্ট আছে ধুলো-বালির ঝড় আছে, কোথাও কর্দম কোথাও কঙ্কর, তবু এও ভালো।

লণ্ডনের বাইরে গিয়ে দেখলুম লণ্ডনের জনতার ভিড়কে অন্যমনস্কভাবে ভালোবেসে ফেলেছি। কাউকে চিনিনে, তবু সকলের প্রতি অজ্ঞাত টান। যেখানে যাই সেখানে দেখি লণ্ডনের লোক পরস্পরকে ঠিক চিনে নিচ্ছে, লণ্ডনে থাকলে যার সঙ্গে কোনোদিন নমস্কার বিনিময়টা পর্যন্ত হয়ে উঠত না, তার সঙ্গে অল্পতেই ঘনিষ্ঠতা জন্মে যাচ্ছে। শহরের আড়ষ্টতা বাইরে থাকে না, আদব কায়দা চুলোয় যায়, শহর ছেড়ে যারা গেছে তাদের সেই অল্প ক'জনের মধ্যে কতকটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতো দাঁড়ায়। তবে এটা দীর্ঘকালের নয় ব'লেই এত মধুর। সকলেই মনে মনে জানে যে, ছাড়াছাড়ি যে-কোনো মুহূর্তে হ'তে পারে। বিচ্ছেদটা অনিশ্চিত নয়, মিলনটাই অনিশ্চিত। অবুঝের

মতো ভাবতে ইচ্ছা করে, ব'লেও বসা যায় যে, আবার দেখা হবে, পুনর্দর্শনায় চ। কিন্তু আঁধার রাতের অপার সমুদ্রের জাহাজ দু'টির সেই যে সংকেত-বিনিময়, সেই আরম্ভ সেই শেষ। তারপর মাথা খুঁড়লেও আর দেখা হবে না। যদি হয়ও তবে সে দেখা বন্দরের সহস্র জাহাজের ভিড়ে। তখন জনতার টানে টানছে, জনের টান গায়ে লাগে না। তখন সে দেখায় চমক থাকে না, মামুলি মনে হয়।

এটা পুনর্যাযাবরতার যুগ, আমরা সকলকেই চাই, কাউকেই চাইনে, আমাদের আলাপী বন্ধু শত শত, কিন্তু দরদী বন্ধু একটিও নেই, আমরা বিশ্বশুদ্ধ প্রসিদ্ধ লোকের নাড়ীর খবর জানি, কিন্তু আমাদেরি পাড়াপড়শীদের নাম পর্যন্ত জানিনে। পাড়াপড়শী দূরে থাক আমাদেরি ফ্ল্যাটের নিচের তলায় যারা থাকে চোখেও তাদের দেখিনি। রেল স্টীমার এরোপ্লেনের কল্যাণে জগৎটা তো ছোট হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের মানুষকে যে মনে হচ্ছে লক্ষ যোজন দূর। তবু এও সুন্দর। আমরা পথিক, আমদের স্নেহ প্রীতি বন্ধুতার বোঝা হালকা হওয়াই তো দরকার, নইলে পদে পদে বাঁধা পড়তে পড়তে চলাই যে হবে না। একটি প্রেমে আমরা সকল প্রেমের স্বাদ পেয়েছি—সেটি চলার পথের প্রেম। এর মধ্যে আর যাই থাক আসক্তি নেই। আমরা নিষ্কাম ভোগী, আমরা ভোগ করি লোভ করিনে। কেননা লোভ করলে পথে থামতে হয়, আর পথে থামাই হচ্ছে পথিকের মৃত্যু।

॥ আট ॥

এই ক'টি দিন সুধায় গেল ভ'রে। কয়েকদিন থেকে আলোর আর অবধি নেই, ভোর চারটের থেকে রাত (?) ন'টা অবধি আলো। যেদিন সূর্য থাকে সেদিন তো স্বর্গসুখ, যেদিন মেঘলা সেদিনও সুখ বড় কম নয়, কেবল আলো—সেও অনেকখানি। আর উত্তাপ কোনো দিন আমাদের ফাল্গুন মাসের মতো, কোনো দিন আমাদের চৈত্র মাসের মতো। আমার পক্ষে তো বেশ আরামের, কিন্তু এ দেশের লোকগুলি ছটফট করতে শুরু করেছে। এদের মতে এটা অকাল গ্রীষ্ম। শীত, বর্ষা, কুয়াশা এদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, ও নিয়ে এরা প্রতিদিন খুঁৎ খুঁৎ করে বটে, কিন্তু ওছাড়া আর কিছু ভালোও বাসে না।

অবশ্য সাধারণের কথাই বলছি, কেন না অসাধারণেরা তো এখন কোনো দেশের বাসিন্দা নন, তাঁরা সব-দেশের বাসাড়ে। তাঁরা শীতকালটা রিভিয়েরায় কাটান, বসন্তটা সুইট্জারলণ্ডে, গ্রীষ্মকালটা বরফের সন্ধানে কাটান, শরৎকালটা পৃথিবী পরিক্রমায়। তা' ব'লে সাধারণরাও যে একই স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে এমন নয়। তারাও এক শহর থেকে আরেক শহরে এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশে বাসা বদলাতে লেগেছে। অসাধারণদের সঙ্গে তাদের তফাৎটা কেবল এই যে, তাদের টান ছুটির টান নয় কাজের টান। তবু কাজের টানে বারোমাস কেউ কর্মস্থলে কাটায় না, এক আধ মাসের জন্যে হ'লেও দশ বিশ ক্রোশ দূরে গিয়ে মুখ বদলিয়ে আসে। আর ছুটির টানে বারো মাস যাঁরা বিশ্বময় ঘুরপাক খাচ্ছেন তাঁরাও বড় সাবধানী পথিক, তাঁরা এজেন্সী নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে কাগজে লিখে পাথেয় জোটান।

পাথেয় যে যেমন ক'রেই জোটাক সকলেই একালে পথিক, কেউ একালে গৃহস্থ হ'তে চায়

না। এই লণ্ডন শহরে কত ফরাসী ফ্যাশানজ্ঞ, জার্মান সংগীতজ্ঞ, ইতালীয়ান নৃত্যনিপুণ, রাশিয়ান পলাতক, দিনেমার চাষীদের এজেন্ট, চাট্‌গেঁয়ে জাহাজের খালাসী, চাইনিজ্ কোকেন চালানদার ইত্যাদি নানা দিগ্‌দেশাগত মানুষ এক আধ বৎসরের জন্যে বাসা বেঁধেছে। এ শহরে না পোষালে নিউইয়র্কে কিংবা বুএনস্ এয়ার্সে ভাগ্যান্বেষণ করবে। এদের সামনে সারা পৃথিবী প'ড়ে রয়েছে, যেখানে যতদিন থাকতে পারে ততদিন থাকবে, তারপরে সুটকেস হাতে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।

রোজ এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় যে পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে কাটিয়ে এসেছে—কেউ জাহাজে কাজ নিয়ে হনলুলু ঘুরে এসেছে, কেউ সৈন্যদলে যোগ দিয়ে ল'ড়ে এসেছে। রোজ এমন লোকও দেখি যে কিছু পয়সা জমাতে পারলে এখানকার ব্যবসা তুলে দিয়ে আরজেণ্টাইনায় ব্যবসা ফাঁদবে, কিংবা নিউজীলণ্ডে চাকরীর যোগাড় করবে। এদের কাছে পৃথিবীটা এত ছোট বোধ হচ্ছে যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী। এদের অপরাধ কী, আমারি তো এখন মনে হচ্ছে যেন ভারতবর্ষ ছোট একটা দেশ, বম্বে কলকাতা ছোট এক-একটা শহর। নিউইয়র্কের লোক জাহাজে চ'ড়ে ছ'সাতদিনে পারী পৌঁছয়, সেখানে বাড়ির লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে। আর কিছুকাল পরে যখন পারীর সঙ্গে নিউইয়র্কে এরোপ্লেন চলাচল সহজ হবে, তখন নিউইয়র্কে ডিনার খেয়ে পারীতে ব্রেকফাস্ট খেতে পারা যাবে, যেমন কলকাতায় ডিনার খেয়ে কাশীতে ব্রেকফাস্ট।

এর ফলে দেশে আর মানুষের মন টিকছে না, বিদেশের স্বপ্নে মন বিভোর। শনিবার হ'লেই চলো লণ্ডন ছেড়ে পারী, সেখানে রবিবারটা কাটিয়ে ফিরে এসো লণ্ডনে। পরের শনিবারে চলো বেলজিয়াম, কিংবা হল্যাণ্ড। সাতদিনের ছুটি পেলে চলো জার্মানী কিংবা সুইট্‌জারলণ্ড। তিন সপ্তাহের ছুটি পেলে চলো নিউইয়র্ক কিংবা ওয়েস্টইণ্ডিজ। দেড় মাসের ছুটি পেলে চলো সাউথ আফ্রিকা কিংবা ইণ্ডিয়া। ছ'মাসের ছুটি পেলে চলো ওয়ার্লড টুরে। এগুলো অবশ্য জাহাজী যুগের মানুষের স্বপ্ন। এরোপ্লেনী যুগের মানুষ—অর্থাৎ এরোপ্লেন যখন জাহাজের মতো সস্তা ও নিরাপদ ও সর্বত্রগামী হবে, তখনকার মানুষ আপিসের ঘড়িতে ছ'টা বাজলেই ছুটবে পারীর এরোপ্লেন ধরতে। এখন এরোপ্লেনে পারী পৌঁছতে তিন ঘণ্টা লাগছে, তখন লাগবে দেড় ঘণ্টা। সুতরাং ডিনারের সময় পারীতে হাজির হতে পারবে। শনিবার হলে সে ভাববে যাওয়া যাক ঈজিপ্টে, রবিবারটা পিরামিড দেখে সোমবার সকালে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট খেয়ে লণ্ডনের আপিসে আসা যাবে গাধা-খাটুনি (ড্রাজারী) খাটতে। খাটুনির ফাঁকে রেডিওতে শোনা যাবে বুএনস্ এয়ার্সের ট্যাঙ্গো নাচের বাজনা আর টেলিভিসনে দেখা যাবে সেই নাচের দৃশ্য। ঐ উত্তেজনায় আরো কিছুক্ষণ গাধা-খাটুনি সুসহ হবে। তারপরে ছুটি, পারী-গমন, রাত্রিভোজন, থিয়েটার-দর্শন, নিদ্রা।

আমাদের নাতিনাতনীরা ভাববে, এই তো জীবন! আমরাই তো সেণ্ট পারসেণ্ট বাঁচছি! আমাদের পূর্বপুরুষগুলো কি বাঁচতে জানত? ছিল ওদের আমলে এমন সব পাড়া-ময় শহর-ময় হোটেল? পেত ওরা এমন সব কলে তৈরি বিশুদ্ধ হাইজিনিক খাবার? পারত ওরা নিউইয়র্কের ব্যাণ্ড শুনতে শুনতে কলকাতায় নাচতে? সারা জগতের কোথায় কী ঘটছে তা চোখে দেখতে দেখতে বিশ্রামকাল কাটাতে? ওদের সময় নাকি স্নেহ প্রেম আতিথ্য ইত্যাদির ছড়াছড়ি ছিল—বাজে কথা। ওদের সময় গ্রামে গ্রামে মামলা মোকদ্দমা দেশে দেশে যুদ্ধ লেগেই থাকত, ইতিহাসে লেখে। মেয়েরা নাকি গৃহকোণে বন্দী হয়ে স্বামীপুত্রের সেবা করত—ধিক্। মেয়েদের যেন নিজস্ব প্রতিভা নেই, তারা যেন পুরুষের মতো তাই নিয়ে দিনরাত ব্যাপৃত থাকতে পারে না, তাদের যেন পাব্লিকের প্রতি দায়িত্ব নেই, তারা থাকবে স্বার্থপরের মতো গৃহ সংসার নিয়ে!

হায়! গতি-গর্বে গর্বিত হয়ে ওরা তো বুঝবে না ওদের পূর্বপুরুষদের স্থিতিসুখ। ওরা যখন

ঘন্টায় একশো মাইল বেগে এরোপ্লেন চালিয়ে থ্রিলের আতিশয্যে মূর্ছাসুখ পাবে, তখন তো ওরা বুঝবে না গোরুর গাড়িতে চ'ড়ে ঘন্টায় এক মাইল অগ্রসর হবার তন্দ্রাসুখ। মার্স ভেনাসের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার উত্তেজনায় ওরা ভুলে থাকবে আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙ্গা বাধাবার উত্তেজনা। পৃথিবীটাই যখন ওদের আরাম ক'রে পা ছড়াবার পক্ষে নিতান্ত অপরিসর ঠেকবে তখন ওরা কী ক'রে বুঝবে আমার নগণ্য আঙিনাটুকুই আমার স্ত্রীর চোখে কত বৃহৎ ব'লে সে-বেচারী লজ্জায় ভয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। আমাদের সেই রাত ভোর ক'রে বেলা দশটা অবধি যাত্রা দেখা, দুপুর বেলা ঘুম দিয়ে রাত ন'টায় ওঠা, একটি গ্রামে একটা জীবন সাঙ্গ ক'রেও তৃপ্তি না মানা, ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখা—এসব ওদের কাছে তুচ্ছ মনে হবে। 'সেকেলে' ব'লে ওরা আমাদের অবজ্ঞা করবে।

তা করুক, কিন্তু একথা আমরা কোনো মতেই স্বীকার করব না যে, কোনো একটা যুগ কোনো আরেকটা যুগের চেয়ে সুখের, কোনো এক যুগের মানুষ কোনো আরেক যুগের মানুষের চেয়ে সুখী। পৃথিবী দিন দিন বদলে যাচ্ছে, মানুষ দিন দিন বদলে যাচ্ছে, সমাজ দিন দিন বদলে যাচ্ছে—কিন্তু উন্নতি? প্রগতি? পারফেকশন? তা' কোনো দিন ছিলও না, কোনো দিন হবারও নয়। অতীত-পূজকরা বলবেন, সত্যযুগ ছিল না তো কোন্ আদর্শের আমরা অনুসরণ করব? ভবিষ্যৎ-পূজকরা বলবেন, সত্যযুগ হবে না তো কোন্ আদর্শের অভিমুখে আমরা যাব? আমরা কিন্তু বর্তমান-প্রেমিক, আমরা বলি, এইটেই সত্যযুগ, এইটেই কলিযুগ, এটা ভালোও বটে মন্দও বটে। লাখ বছর পরে যারা আসবে তাদের যুগ এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এমনি ভালোয়-মন্দে-মেশা দুঃখে-সুখে-বিচিত্র প্রেমে-হিংসায়-জটিল থাকবেই। আমরা চলার আনন্দে চলি, কারুর অনুসরণেও না, কারুর অভিমুখেও না। গতিটাই আনন্দের; শম্বুকের গতি আর পক্ষিরাজের গতি বেগের দিক থেকে ভিন্ন, আনন্দের দিক থেকে একই।

কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে, ক্রমেই আমাদের চলার বেগ বাড়ছে, ধীরে চলার আনন্দ গিয়ে ছুটে চলার আনন্দ আসছে। মানুষ এখন ঘর ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল, উদ্ভিদের মতো একঠাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলতে চাইল না, পাখির মতো ঠাঁই ঠাঁই উড়তে উড়তে চলল। কোনো স্থানের প্রতি তার স্থায়ী আসক্তি রইল না। আগে ছিল গ্রামের প্রতি পেট্রিয়টিজম্, তার পরে দেশের প্রতি পেট্রিয়টিজম্, তারপরে পৃথিবীর প্রতি। দেখতে দেখতে এক-একটা দেশের বৈশিষ্ট্য চ'লে যাচ্ছে, দেশের লোক বিদেশে যাচ্ছে, বিদেশের লোক দেশে আসছে, কে যে কোন্ দেশে জন্মাচ্ছে কোথায় বিয়ে করছে কোন্খানে মরছে তার ঠিক নেই। এই ইংলণ্ডের এক অতি অখ্যাত অতি বিজন পল্লীগ্রামে এক তামিল চাষা—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও ঘোর অশিক্ষিত—ইংরেজ মেয়ে বিয়ে ক'রে ছেলেপিলে নিয়ে সংসার করছে। সামান্য পুঁজি নিয়ে সে ঘর ছেড়েছিল, এখন বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন হয়েছে। এর ছেলেপিলে হয়তো ক্যানাডায় বাসা বাঁধবে কিংবা অস্ট্রেলিয়ায়। কোন্ দেশের প্রতি তাদের পেট্রিয়টিজম্ যাবে? বাপের মাতৃভূমি, না নিজের মাতৃভূমি, না নিজের ছেলের মাতৃভূমি—কার প্রতি?

কত চীনা-মালয়-কাফ্রির ইংরেজ ছেলে দেখছি, কত কত ইংরেজের ফরাসী, জার্মান, জাপানী ছেলে দেখছি, কত শাদা-রঙের আয়া লালচে কালো-রঙের ছেলেকে ঠেলা গাড়ি ক'রে বেড়াতে নিয়ে যায়, কত আর্য-ধাঁচের মুখে মঙ্গোলীয়-ধাঁচের ভুরু শোভা পায়। জগৎ জুড়ে একটা সঙ্কর জাতি গ'ড়ে উঠেছে, সে জাতির নাম মানব জাতি। এই নতুন মানবের জন্য যে নতুন সমাজ খাড়া হচ্ছে সে সমাজের নীতিসূত্রও নতুন। সে সব নীতিসূত্র এরোপ্লেনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৈরি, গোরুর গাড়ির সঙ্গে অত্যন্ত বেখাপ্পা।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরো নর নারীর মিলন-নীতি। গোরুর গাড়ির যুগের নর নারী অল্প বয়সে বিবাহ করত পিতামাতার নির্বন্ধে, পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে চিনত না জানত না দেখত না, দুজনেই একস্থানে থেকে জীবন শেষ করত এবং একজন করত গৃহের অন্দরের কাজ, অন্যজন করত গৃহের সদরের কাজ। এরোপ্লেনের যুগের নর নারী বিবাহ করে বেশি বয়সে পঞ্চশরের নির্বন্ধে; পরস্পরকে ছাড়া অন্য অনাত্মীয় স্ত্রী-পুরুষকে শৈশবে দেখতে পায় ইস্কুলে; যৌবনে দেখতে পায় আপিসে; বিবাহের পূর্বে দেখতে পায় ক্লাবে নাচঘরে টেনিস কোর্টে কাফে-রেস্তরাঁয়; বিবাহের পর দেখতে পায় আপিসের সহকর্মিণী বা সহকর্মীরূপে, একলা পথের সহযাত্রিণী বা সহযাত্রীরূপে, একলা প্রবাসের বান্ধবী বা বান্ধবরূপে। তারপর স্বামী স্ত্রী একস্থানে থাকতে পায় না, দু'জনের দুইস্থানে জীবিকা। দু'জনেই বাইরের কাজ করে, হোটেলে বাস করে, রেস্তরাঁয় খায় এবং সুবিধা না হ'লে দেখা করতে পায় না। সন্তানরা মেটার্নিটি হোমে জন্মায়, বোর্ডিং স্কুলে বাড়ে এবং বড় হলে জীবিকার সন্ধানে দেশে-বিদেশে বেড়ায়।

এহেন যুগে প্রেম ও সতীত্বের নীতি বদলাতে বাধ্য। প্রেম বা সতীত্ব থাকবে না এমন নয়, থাকবে, কিন্তু তাদের সংজ্ঞা হবে অন্যরকম। একনিষ্ঠতা সুকর ছিল যখন স্বামী স্ত্রী থাকত একস্থানস্থ এবং যখন অনাত্মীয় আত্মীয়াদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ ছিল অল্পই। এখন স্বামী লণ্ডনের দোকানে কাজ করে তো স্ত্রী কাজ করে শিকাগোর দোকানে, এবং উভয়েরই দোকানে বা দোকানের বাইরে বান্ধব-বান্ধবীর সংখ্যা নেই। একদিন যে প্রেম এ্যাটলান্টিকের এক জাহাজে যেতে যেতে হয়েছিল, চিরদিন সে প্রেম নাও টিকতে পারে এবং সে প্রেমের পথে প্রলোভনও তো অল্প নয়। সুতরাং ডিভোর্স এবং পুনর্বিবাহ এবং আবার ডিভোর্স। কিংবা বিবাহটা একজনের সঙ্গে পাকা, মিলনটা অন্যান্য জনের সঙ্গে কাঁচা। এটা অবশ্য গোরুর গাড়ির ধর্মনীতির সঙ্গে এরোপ্লেনের হৃদয়-গীতির সন্ধি করার প্রয়াস। কেননা ডিভোর্স আইন এখনো গোরুর গাড়ির অনুশাসন অনুসারে কড়া, এবং রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মে নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতে সন্ধির দরকার হবে না, গোরুর গাড়ি হটবেই, ডিভোর্সটা বিবাহের মতো সোজা হবে এবং বিবাহটা স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে বদলাবে। কেবল মুশকিল এই যে, মানুষের হৃদয়টা অত সহজে বদলাবার নয়, এডোনিসকে হারিয়ে ভেনাস কেঁদে আকুল হবে, ইউরিডিসকে খুঁজতে অর্ফিউস পাতাল প্রবেশ করবে, সীতার শোকে রঘুপতি স্বর্ণসীতাকেই হৃদয় দেবেন।

এতদিন নারী নরের সম্বন্ধগুলো ছিল পারিবারিক—মাতা ও পুত্র, ভগিনী ও ভ্রাতা, স্ত্রী ও স্বামী, কন্যা ও পিতা। এখন এক নতুন সম্বন্ধের সূত্রপাত হয়েছে—সখা ও সখী। বিয়ের আগে বুঝতে পারা যাচ্ছে না শতেক সখীর মধ্যে কোন্‌টি প্রিয়তমা—কোন্‌টি স্ত্রী। বিয়ের পরেও পদে পদে সন্দেহ হচ্ছে, যাকে বিয়ে করেছি সে স্ত্রী না সখী, এবং যাদের সঙ্গে সখ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে কোন একজন সখী না স্ত্রী। গুরুজনের নির্বন্ধে যখন বিয়ে করা যেত এবং অনাত্মীয়া নারীর সঙ্গে পরিচয় ঘটত না, তখন যাকে পাওয়া যেত সেই ছিল স্ত্রী। কিন্তু এখন নিজের বিবাহের দায়িত্ব নিজের হাতে, ঠিক করতে গিয়ে ভুল ক'রে ফেলা অতি সহজ, এবং ভুল থেকে উদ্ধার পাওয়া অতি শক্ত। এখন অনাত্মীয়াদের সঙ্গে নানাসূত্রে পরিচয়। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও স্ত্রীর সঙ্গে যত না সাক্ষাৎ হয় সখীদের সঙ্গে ততোধিক, স্ত্রী যখন নিকটে থাকে তখন শোবার সময় ছাড়া অন্য সময় দেখা করবার ফুরসৎ কোনো পক্ষেরই নেই। যে যার নিজের কাজে যায় ও রেস্তরাঁয় একা একা খায়। আর স্ত্রী যখন দূরে থাকে তখন তো দেখা হবারই নয়।

এই দূরে থাকাথাকিটাই বেশির ভাগ স্থলে ঘটছে। কেননা বিয়ের আগে স্ত্রী যে কাজে বিশেষজ্ঞ

হয়েছে বিয়ের পরে সে কাজটি ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে এক কর্মস্থল থেকে আরেক কর্মস্থলে ঘুরতে থাকা তার পক্ষে মস্ত বড় ত্যাগ, এবং সে ত্যাগে সমাজেরও ক্ষতি। সুতরাং প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর স্বামী যদি সংবাদপত্রের ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয় তো স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয় বৎসরান্তে একবার। কিংবা কৃষক স্বামীর স্ত্রী যদি ভ্রাম্যমাণ চিত্রকর হয় তো স্বামীর সঙ্গে সে একেবারে বেশিদিন থাকতে পারে না। অথচ অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন নূতন পুরুষের আলাপ-বন্ধুতা এবং সংবাদদাতার সঙ্গে প্রতিদিন নূতন নারীর সাক্ষাৎ পরিচয়। এরূপ স্থলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, কে স্ত্রী, কে সখী—যাকে বিবাহ করেছি সে নাও হ'তে পারে স্ত্রী, যাকে বিবাহের আগে দেখিনি সেই হ'তে পারে সখীর অধিক। যারা হৃদয় সম্বন্ধে অনেস্ট্ তাদের পক্ষে এটা এক বিষম সমস্যা, যারা সমাজকে ভয় ক'রে ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে কিছু নয়। তারা হয় চুপ ক'রে স'য়ে যায়, কাঁদে; নয় যতক্ষণ না ধরা পড়ে ততক্ষণ ডুবে ডুবে জল খায়।

বিশ বছর আগেও স্ত্রী পুরুষের বন্ধুতা ছিল সমাজের চোখে সন্দেহাত্মক, বিশেষত বিবাহের পরেও স্বামীর বা স্ত্রীর অনভিমতে। এখন বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে স্পষ্ট বোঝাপড়া হ'য়ে যাচ্ছে যে, স্ত্রীর সখাদের নিয়ে স্বামী কিছু বলতে পাবে না, স্বামীর সখীদের নিয়ে স্ত্রী কিছু বলতে পাবে না, পরস্পরের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। পরপুরুষের বা পরস্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুতা কোনো কোনো স্থলে সঙ্কট ঘটালেও মোটের ওপর সমাজ-সম্মত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ-সম্মত না হ'লে চলতও না। কারণ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন একটা ব্যবধান অনিবার্য হ'য়ে পড়েছে, দূরত্ব-জনিত ব্যবধান। স্ত্রী আর গৃহিণী নয়, হোটেলবাসীর গৃহিণীর প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী আর সচিবও নয়, ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা তার অভিনেত্রী-স্ত্রীর কাছে কি মন্ত্রণা প্রত্যাশা করতে পারে? স্ত্রী নিজের কাজে ব্যস্ত। বরং একজন সাংবাদিকার কাছে মন্ত্রণা প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। তারপর স্ত্রী যদি বা সখী হয় তবু দূরে থাকে ব'লে বন্ধুতার সব দাবী মেটাতে পারে না,—ধরো, একসঙ্গে টেনিস্ খেলতে পারে না, সিনেমায় যেতে পারে না, টেবিলে খেতে পারে না, মোটরে বেড়াতে পারে না, অবসরকালে গল্প করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই যে অনিবার্য ব্যবধানটি, এটিকে পূরণ করতে পারে অন্য নারী বা অন্য পুরুষ—সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক্ না কেন। সেই জন্যে এখন পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে-নারীতে বন্ধুতার মতো স্ত্রী-পুরুষে বন্ধুতাও চলতি হ'য়ে গেছে, এ নিয়ে কেউ কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হয় না।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে সেকালের প্রেম ও সতীত্বের সংজ্ঞা একালে অচল। প্রথমতঃ, প্রেম যে চিরস্থায়ী, এমন কি দীর্ঘস্থায়ী হবেই এমন কোনো কথা নেই। বিবাহের সময় এখনকার তরুণ তরুণীরা তাদের ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা'র মতো গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করে না যে, যাবজ্জীবন পরস্পরের প্রতি একনিষ্ঠ থাকবেই। প্রতিজ্ঞা যদিও বাঁধা-নিয়ম মেনে করে, তবু লঘুভাবেই করে, মুখে যা বলে মনে তা' বলে না। মনে মনে যোগ ক'রে দেয়—'আশা করি'। যেক্ষেত্রে ডিভোর্স যত সুলভ সেক্ষেত্রে লঘুভাবটা তত বেশি। এই লঘুভাবটা না থাকলে মানুষ ভয়ে আধমরা হতো। কেননা এখন তো বিবাহ পিতামাতার নির্বন্ধে নয় যে, ভুলের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভগবানকে ডেকে আশ্বস্ত হবে। নির্বন্ধ যখন নিজেরি হাতে তখন ভুলের দায়িত্বও নিজেরি। একদিনের ভুলের জন্যে চিরজীবন প্রায়শ্চিত্ত করা অসহ্য। তা ছাড়া ভুল নাই হোক, ঠিকই হোক, একদিনের ঠিক কি চিরদিন ঠিক থাকে? বিশ বছর বয়সের ঠিক কি ত্রিশ বছর বয়সেও ঠিক থাকে? দু'পক্ষই বদলায়, দু'পক্ষই নতুন সত্যকে পায় পুরোনো সত্যকে ভোলে। রলাঁর 'আনেৎ' যাকে প্রাণ ভ'রে ভালোবাসত তাকে কথা দিতে পারল না যে চিরদিন তেমনি ভালোবাসবে, সেই জন্যে তাকে বিবাহই করতে পারল না, অথচ তার ভালোবাসার চিহ্ন ধারণ করল তার সন্তানের মা হ'য়ে।

দ্বিতীয়তঃ, সতী নারীর স্বামী ছাড়া অপর পুরুষের সঙ্গে তেমনি অন্তরঙ্গতা থাকতে পারে যেমন অন্তরঙ্গতা এ যাবৎ কেবল সখীর সঙ্গেই সম্ভব ছিল। পর-পুরুষকেও ভালোবাসা যায়, তার সঙ্গে গা-ঘেঁষে বসা যায়, তার কোলে মাথা রাখা যায়, অভিনয়কালে তাকে চুম্বন আলিঙ্গনও করা যায়, এমন কি অন্য সময়ও। স্বামীর সঙ্গে যেমন ব্যবহার সখার সঙ্গে তেমনি। অথচ সতী ধর্মের ব্যত্যয় হয় না। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ়তম ভালোবাসা থাকে। এক কথায় সখ্য প্রেম ও মধুর প্রেম পরস্পর বিরোধী নয়, একই হৃদয়ে দু'য়েরি স্থান হতে পারে। এবং এমনো একদিন হতে পারে যে সখ্য প্রেমই মধুর প্রেমে পরিণত হয়েছে, মধুর প্রেম সখ্য প্রেমে পর্যবসিত। সেরূপ স্থলে সম্বন্ধ-পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রী ঠাঁই ঠাঁই থাকার ফলে এমন ঘটা বিচিত্র নয়। স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই স্বতন্ত্র, দু'জনেই স্বাবলম্বী, দু'জনেই ভ্রাম্যমাণ—একদিন যে দু'টি নক্ষত্র ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে মিলেছিল চিরদিন তারা সেইস্থানে থাকতে পারে না, পরস্পরের থেকে সমান দূরত্ব রাখতে পারে না, দূরত্বের কম বেশি ঘটে, অন্য নক্ষত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এক সম্বন্ধ আরেক হয়ে ওঠে। যে ক্ষেত্রে তেমন ঘটে না,—দাম্পত্য ও সখ্য যেমন ছিল তেমনি থাকে, সে ক্ষেত্রেও যে সতীত্বের পুরোনো আদর্শ খাটে না এটা স্বতঃসিদ্ধ। কেননা পুরোনো সতীত্বের সঙ্গে ছিল নিজের দ্বারা স্ত্রীকে বা স্বামীকে সাতপাকে ঘিরে রাখা, এখন অনেকখানি ঢিলে দিতে হচ্ছে, কোনো পক্ষেই বিশ্বস্ততার জন্যে পীড়াপীড়ি নেই, বিশ্বস্ততার জন্যে বাধ্যবাধকতা নেই, ওথেলো ক্রমশ সেকেলে হয়ে পড়েছে। স্বামী স্ত্রীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে যা পাচ্ছে না অন্যের কাছে তা পাচ্ছে। চিরকুমার থাকলে সেকালে উপবাসী থেকে যেতে হতো, চিরকুমার থাকলে একালে আধপেটা থাকতে পারা যায়—সখী থাকে কাছে। বিবাহ করলে সেকালে পেট ভ'রে উঠত, বিবাহ্ ক'রেও একালে আধপেটা থাকতে হয়—স্ত্রী থাকে দূরে। একালের কুমারীদের অনেক দুঃখ থেকে অব্যাহতি মিলেছে, সেইজন্য তারা বিবাহের জন্যে কেঁদে মরছে না। এবং একালের বিবাহিতারাও অনেক সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই জন্যে তারা সৌভাগ্যগর্বে বাড়াবাড়ি করছে না।

তবে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রমুখ দেশে স্ত্রী-পুরুষের সাতিশয় সংখ্যা-বৈষম্যের দরুন প্রেম-পরিণয়ের ক্ষেত্রে কতকটা কৃত্রিমতার উৎপত্তি হয়েছে বটে। কর্তারা দুনিয়া দখল করতে ব্যস্ত, যুদ্ধ না করলে তাদের চলে না, দেশের নারী সংখ্যার অনুপাতে পুরুষ সংখ্যা যে কমতেই লেগেছে আর সেজন্যে নারী ও পুরুষ উভয়েরই যে নীতিভ্রংশ (demoralisation) হচ্ছে একথা কর্তারা বুঝেও বুঝছেন না। ছেলেরা জানে মেয়েরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি, সুতরাং বিবাহের গরজটা মেয়েদেরই বেশি, সাধতে হয় তো ওরাই সাধবে, তপস্যাটা একেবারে ও-তরফা। মেয়েরা জানে সকলের বরাতে বিবাহ নেই, বিবাহ যদি বা হয় তবু স্বামীকে ধ'রে রাখতে পারা যাবে না, একজনকে হারালে আরেক জনকে পাবার আশা নেই, তপস্যাটা অনর্থক এ-তরফা। এর পরিণাম এই হচ্ছে যে, তপস্যাটাকে কোনো তরফই স্বীকার করছে না, হাতে হাতে যখন যা পাচ্ছে তখন তা নিচ্ছে, পরমুহূর্তে ছেলেরা ফেলে যাচ্ছে, মেয়েরা কান্না চাপছে। এ বড় নিষ্ঠুর খেলা। দু'পক্ষে সমান নিয়ম খাটছে না, একপক্ষ ফাউল করতে করতে অতি সহজে জিতছে, অপরপক্ষ ফাউল সইতে সইতে অতি সহজে হারছে। দু'পক্ষেরই নীতিভ্রংশ, তবু মেয়েরা দোষ ধরছে ছেলেদের, ছেলেরা দোষ ধরছে মেয়েদের। মেয়েরা বলছে, বাপ রে। একেলে ছেলেগুলোর কী দেমাক; এরা আমাদের খাওয়াবে না পরাবে না প্রতিপালন করবে না, শুধু আমাদের বিয়ে ক'রে মাথা কিনবে, এরই জন্যে এত খোশামোদ। আমাদের ঠাকুরমাদের জন্যে আমাদের ঠাকুরদা'রা কী না করতেন, ডুয়েল ল'ড়ে প্রাণ বিপন্ন করতেন, যাকে অত কষ্টে পেতেন তাকে কত যত্নে রাখতেন। আর আমাদের এরা—।

ছেলেরা বলছে, তোমরা সব স্বাধীনা স্বতন্ত্রা আলোকপ্রাপ্তা শী-ম্যান, আমাদেরকে না হ'লে তোমাদের যে চলে না এ তো বড় লজ্জার কথা! আর, আমরা তো বেশ লক্ষ্মীছেলেই ছিলুম, তোমরা এতগুলোতে মিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছ, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা রোহিণীর কাকে ছেড়ে কাকে ধরা দেব আমরা পুরুষ চন্দ্রমারা!

॥ নয় ॥

এ দেশে এসে অবধি দেখছি বিপুলভাবে ধর্মচর্চা চলেছে। পাড়ায় পাড়ায় গির্জা, পথে ঘাটে ধর্মপ্রচার, কুলীর পিঠে ধর্মবিজ্ঞাপন। যে জাতীয় সংবাদপত্রে কুকুর-দৌড়ের শেয়ার মার্কেটের ও ডিভোর্স কোর্টের খবর থাকে সে জাতীয় সংবাদপত্রেও ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। রেলে ও বাসে আপিস থেকে ফেরবার সময় এক হাতে সান্ধ্য কাগজ ও অন্য হাতে ছ'পেনী দামের ধর্মগ্রন্থ নিয়ে একবার এটাতে ও একবার ওটাতে চোখ বুলিয়ে যেতে কত লোককেই দেখি। শুনতে পাই এখন ধর্মগ্রন্থগুলোর যত কাটতি নভেল নাটকেরও নাকি তার বেশি নয়। বছর পনেরো কুড়ি আগে নাকি এতটা ছিল না। যুদ্ধের পর থেকে হঠাৎ ধর্মচর্চার মরা গাঙে বান ডেকেছে। তা ব'লে অর্থচর্চা বা কামচর্চা যে কিছুমাত্র কমেছে এমন নয়। এক সঙ্গে ত্রিমূর্তির উপাসনা চলেছে—গড, ম্যামন, Eros। ব্যাঙ্কে এক্স্‌চেঞ্জে ডার্‌বীতে থিয়েটারে নাচঘরে হোটেলে পার্কে গির্জায় সর্বত্র লোকারণ্য, কোনো একটার ওপরে বিশেষ পক্ষপাত কারুর নেই; স্কুলে কলেজে লাইব্রেরীতে কারখানায় যেখানে যাই সেখানে লোকের ভিড়; মিউজিয়ামে চিত্রশালায় হাসপাতালে অন্ধ-আতুর-অনাথাশ্রমে যুদ্ধনিবারণী সভায় কোথাও কারুর আগ্রহ কম নয়। একটা জীবন্ত জাতির হাজারো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই সমান জীবন্ত, যেমন তাদের বৈচিত্র্য তেমনি তাদের বৈপরীত্য, ভালো মন্দ সুন্দর কুৎসিত পদ্ম পাঁক ঐশ্বর্য দৈন্য প্রেম হিংসা সবই একাধারে বিধৃত, এবং সবই সমান প্রচুর। সেইজন্যে ধর্ম সম্বন্ধে সকলেই ভাবতে শুরু করেছে, একুশ বছর বয়সের ফ্ল্যাপার পর্যন্ত। শনিবারের দিন সন্ধ্যাবেলা যে-সব যুবক যুবতী পরস্পরের কোলে মাথা রেখে মাঠে বাগানে সকলেয় সামনে প্রেমালাপ করে, রবিবারের দিন সকালবেলা সেই সব যুবক যুবতী গির্জায় ভিড় ক'রে অখণ্ড মনোযোগের সহিত ধর্মোপদেশ শোনে, কলের পুতুলের মতো হাঁটু গাড়ে। এবং সোমবারের দিন দুপুরে যখন তারা আপিসে গিয়ে পাশাপাশি কাজ করে তখন কেউ কারুর সঙ্গে ইঙ্গিতেও কথা বলে না, এমনি কঠোর ডিসিপ্লিন। কাল যদি যুদ্ধ বাধে ছেলেরা হাসিমুখে বন্দুক কাঁধে নিয়ে মরণযাত্রা করবে, মেয়েরা দেশের ভার কাঁধে নিয়ে ঘর ও বাহির দুই আগলাবে। সুখের সময় সুখ, দুঃখের সময় আশা, সব সময় প্রস্তুত ভাব—এই হচ্ছে ইংলণ্ডের ধর্ম. ইউরোপের ধর্ম।

সামরিক সংস্কার বহুদিন হ'তে আমাদের সমাজে নেই, যখন ছিল তখন সমস্ত সমাজটার একটি বিশেষ অংশেই নিবদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে ক্ষাত্রধর্মেরও উচ্ছেদ হয়েছে। ইউরোপের সমাজের সর্বশ্রেণীর আবালবৃদ্ধবনিতা কিন্তু যুদ্ধে বিশ্বাসী, এ বিশ্বাসের ওপরে এদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা খাটে না, এ বিশ্বাস এদের প্রকৃতিগত, যুদ্ধহীন জগৎ এরা মনেও আনতে পারে না। মানুষে-মানুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা' এদের অনেকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে কিন্তু সংস্কার থেকে পায়নি। পশুতে মানুষে যুদ্ধ

যে মন্দ তা আমরা আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধের সময় থেকে জেনেছি, এরা এখনো জানেনি। প্রকৃতিতে পুরুষে যুদ্ধ যে মন্দ তা আমরা দৈব-বাদীরা কবে শিখলুম জানিনে, এরা কোনোদিন শিখবে না। এদের ভাবজগতেও আইডিয়াতে আইডিয়াতে যুদ্ধ। এদের ধর্ম যুদ্ধের জন্যে সদা প্রস্তুত থাকার ধর্ম। ন কিঞ্চিদপি বলহীনেন লভ্যম্। নিশ্চেষ্ট যদি এক মুহূর্তের জন্যেও হও তবে অপরে তোমাকে মাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে।

ধর্ম ও রিলিজন এক জিনিস নয়। আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, লোকমুখে হিন্দু ধর্ম, হিন্দু মানে ভারতীয়, সুতরাং ভারতীয় ধর্ম। আমাদের রিলিজনগুলোর নাম বৈষ্ণব মত, শাক্ত মত, সৌর মত, শৈব মত, গাণপত্য মত ইত্যাদি। আমরা যদি খ্রীস্টীয় মত বা মহম্মদীয় মত নিই তবু আমরা হিন্দুই থাকব, ধর্মত হিন্দু। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে ধর্মমতের তেমন সহজ সম্বন্ধ থাকবে না, কতকটা স্বতঃবিরোধ এসে পড়বে। আমাদের মধ্যে যাঁরা মুসলমান বা খ্রীস্টান হয়েছেন তাঁরা হিন্দুই আছেন, কিন্তু ভিতর থেকে সৃষ্টির স্ফূর্তি পাচ্ছেন না, ইচ্ছানুসারে ইসলামকে বা খ্রীস্টিয়ানিটিকে পরিবর্তন করতে পারছেন না, পরমুখাপেক্ষী হচ্ছেন। ইউরোপেরও এই দশা। ইউরোপের ধর্ম ও ধর্মমত অঙ্গাঙ্গী নয়, বিরুদ্ধ। ইউরোপের প্রকৃতি হোমারের আমলে যা ছিল এখনো তাই কিন্তু মাঝখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের একটি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস ইউরোপের প্রকৃতির পক্ষে আড়ষ্টতাজনক। খ্রীস্টিয়ানিটির দ্বারা ইউরোপের অশেষ উপকার হয়েছে, কিন্তু খ্রীস্টিয়ানিটির পেষণে ইউরোপের আত্মা সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তি পায়নি। ইউরোপের ধাত বিশ্লেষণশীল, এশিয়ার ধাত সংশ্লেষণশীল, ইউরোপের কীর্তি বিজ্ঞানে, এশিয়ার কীর্তি যোগে। ইউরোপ বিনা পরীক্ষায় কিছুই মানে না, পরীক্ষার পর যা মানে তার বাইরে সত্য খুঁজে পায় না। আমরা অম্লানবদনে সব মেনে নিই, অধিকারী ভেদে মিথ্যাকেও বলি সত্য। ইউরোপ বিশ্বাস করে যোগ্যতমের উদ্বর্তনে, আমরা বিশ্বাস করি সমন্বয়ে। এহেন যে ইউরোপ তাকে তার নিজস্ব রিলিজন অভিব্যক্ত করতে না দিয়ে রাহুগ্রস্ত ক'রে রাখল খ্রীস্টিয়ানিটি। সেই দুঃখে গোটা মধ্য যুগটা ইউরোপ অন্ধকারেই কাটাল। যেদিন গ্রীসকে দৈবাৎ পুনরাবিষ্কার ক'রে সে আপনাকে চিনল সেদিন ঘটল Renascence, তার পর থেকে শুরু হলো Reformation অর্থাৎ খ্রীস্টিয়ানিটির অগ্নিপরীক্ষা। সে অগ্নিপরীক্ষা এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু ধর্মচর্চার এই প্রাবল্য দেখে মনে হয় এ বোধ হয় নির্বাণ দীপের শেষ দীপ্তি, এর পরে হয় খ্রীস্টিয়ানিটিকে ভেঙে বিজ্ঞানের আলোয় নিজস্ব ক'রে গড়া হবে, নয় বিজ্ঞানের ভিতর থেকে নতুন একটা রিলিজন বা'র করা হবে। বিজ্ঞান কথাটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। ইউরোপীয় দর্শনটাও বিজ্ঞানেরই তাঁবেদার। এবং বিজ্ঞান বলতে কেবল Physics ও Biology নয়, Psychologyও বোঝায়। এখনো বিজ্ঞানের সামনে বিরাট একটা অজানা রাজ্য রয়েছে—মানুষের মন। ক্রমে ক্রমে যতই তাকে চেনা যাবে ততই একটা নতুন রিলিজনের মালমশলা পাওয়া যাবে।

রিলিজনের জন্যে মানব হৃদয়ের যে সহজ তৃষা তাকে শান্ত করবার ভার অপরকে দিলে চলে না; নিজেরি ওপরে নিতে হয় সে ভার। ইউরোপের ভার এতদিন অন্যে বয়েছে। অন্যের ফরমাস খেটে ও বাঁধা বরাদ্দ পেয়ে ইউরোপের তৃষা তো মেটেনি, অধিকন্তু খ্রীস্টিয়ানিটির ওপরে রাগ ক'রে রিলিজনের প্রতি জন্মেছে অনাস্থা—যেন রিলিজনকে না হলেও মানুষের চলে। গত দেড়শো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে সে উন্নতি বহু দিনের রুদ্ধ জলের নিষ্কাশন, তাই সে এমন তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রীসের যদি মরণ না হতো, তবে গ্রীসের ছেলেটি আয়ার কোলে অমানুষ না হয়ে তার নিজের কোলে দিন দিন শশিকলার মতো বাড়তে বাড়তে এতদিনে কেমন হয়ে উঠত

জানিনে, কিন্তু খ্রীস্টিয়ানিটির ওপরে আধুনিক ইউরোপের মহা মনীষীদের এমন অশ্রদ্ধা ও রিলিজনের ওপরে তাঁদের এমন অনাস্থা দেখতুম না। তাঁরা বলছেন, এই হতভাগা ধর্মমতটার জন্যেই এত যুদ্ধ, এত অশান্তি, এত গোঁড়ামি, এত কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাসী যাজকরা সেক্সকে পাপ ব'লে নিজেরা বৈরাগী হয়েছে, অথচ অন্যদের বলেছে বহু সন্তানবান হতে, আর জনবৃদ্ধির ফলে যখন যুদ্ধ বেধেছে তখন এরাই দিয়েছে মরণ-মারণের উত্তেজনা; এরা প্রচার করেছে আত্মসম্মাননাশী উৎকট পাপবাদ—'We are born in sin', আমরা অধম, একমাত্র যীশুই ভরসা; গণতন্ত্রের এরাই শত্রু, স্বাধীন মানুষকে এরা সহ্য করতে পারে না; দাসব্যবসায়ের এরাই সমর্থক; এরা বড়লোকের মোসাহেব, ক্যাপিটালিস্টের বাহন, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে রাশিয়া থেকে চার্চ উঠে গেল, ফ্রান্সে চার্চের ওপরে কড়া নজর, ইংলণ্ডে চার্চের প্রতিপত্তি কিছুদিন থেকে যতটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে ততটা ছিল না। তবে ইংলণ্ডের চার্চ ইংলণ্ডের স্টেটেরই মতো জনসাধারণের ইচ্ছাধীন। সেই জন্যে জনসাধারণকে খুশি রাখার জন্যে এর অবিশ্রাম চেষ্টা।

চার্চ ও স্টেট এ দেশের সমাজের এপিঠ ওপিঠ। যাঁরা চার্চের নেতা তাঁরা পার্লামেন্টে বসেন, যাঁরা স্টেটের কর্ণধার তাঁরাও পার্লামেন্টে বসেন, পার্লামেন্টই হচ্ছে এ দেশের সমাজপতিদের আড্ডা। আমাদের দেশে স্টেট ও সমাজ এক নয় এবং চার্চ আমাদের নেই। চার্চ যে এদের কতখানি তা' আমরা দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারব না, কেন না চার্চ মানে শুধু গির্জা নয়, চার্চ মানে সঙ্ঘ এবং সঙ্ঘ আমাদের দেশে বৌদ্ধ যুগের পর থেকে নেই। কেশবচন্দ্র সেন সঙ্ঘের পুনঃ প্রবর্তন করেন, আমাদের আধুনিক সঙ্ঘের নাম ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজকে কেউ কেউ ব্রাহ্মচার্চ ব'লে থাকেন, প্রবর্তক সঙ্ঘকেও প্রবর্তক চার্চ নাম দেওয়া চলে। কিন্তু হিন্দুসমাজকে হিন্দু চার্চ বলা চলে না। হিন্দুসমাজ কোনো একটা বিশেষ ধর্মমতকে প্রতিপদে মেনে চলবার জন্যে গঠিত একটা কৃত্রিম সঙ্ঘ নয়, হিন্দুর কাছে ধর্মমত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্বামী শাক্ত ও স্ত্রী বৈষ্ণব ও সন্তান নাস্তিক হলেও হিন্দুসমাজ আপত্তি করে না। আজ যদি হিন্দুসমাজ সেকালের মতো জীবন্ত থাকত তবে স্বামী শৈব ও স্ত্রী মুসলমান হলেও আপত্তি করত না। হিন্দু ধর্ম ছিল দেশের ধর্ম, দেশে যে কেউ বাস করত সে ছিল হিন্দু। জাতিভেদের উৎপত্তি হয়েছিল পেশাভেদের দ্বারা, পেশা বদলালে জাতিও বদলাত; কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো অধিবাসীকেই অহিন্দু বলা হতো না, যাই হোক না কেন তার ধর্মমত বা রিলিজন।

হিন্দুসমাজ কোনো দিন ধর্মমত নিয়ে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু দেশের আচারকে বা দেশের প্রথাকে শাক্ত বৈষ্ণব নির্বিশেষে মেনেছে। এখনো কি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-আর্য খ্রীস্টান-মুসলমান ভারতীয়রা সাকারবাদী শাক্ত বৈষ্ণবদের মতো একান্নবর্তী পরিবার ও তার অনিবার্য পরিণাম বাল্যবিবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত? একান্নবর্তী পরিবারের সঙ্গে বাল্যবিবাহ উঠে যাচ্ছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশনের ফলে। এর সঙ্গে ধর্মমতের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, কিন্তু ধর্মমত নির্বিশেষে অখণ্ড হিন্দুসমাজের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, খ্রীস্টান-মুসলমান-বৈষ্ণব-শাক্ত সকল ভারতীয়দের মধ্যে একই সংস্কার বিদ্যমান। তবু কয়েকটা ধর্মমতকে হিন্দু নাম দিয়ে অন্যগুলিকে অহিন্দু নাম দেওয়া হচ্ছে ধর্মমতকে ধর্ম ব'লে ভুল ক'রে।

চার্চ বা সঙ্ঘ হচ্ছে একটা ধর্মমতের বা রিলিজনের দ্বারা পরিচালিত সমাজ, জাতীয় প্রকৃতি বা জাতীয় ধর্মের সঙ্গে তার রক্ত-সম্পর্ক নেই। চার্চ অনায়াসেই আন্তর্জাতিক হতে পারে। রোমান চার্চ একদিন সমস্ত ইউরোপকে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক উভয় ভাবেই শাসন করছিল, ক্রমশ আধিভৌতিক দিকটাকে নিয়ে আধুনিক ধরনের স্টেট গ'ড়ে ওঠে, চার্চের কাজ লাঘব হয়। তারপর নানা দেশে স্টেটের সঙ্গে চার্চের নানা বিচ্ছেদ দেখা দেয়। কোথাও স্টেট চার্চকে গ্রাস করে, কোথাও

স্টেট চার্চকে ভাতে মারে, কোথাও স্টেট চার্চকে কোনো মতে টিকে থাকবার অনুমতি দেয়। ইংলণ্ডে কিন্তু স্টেট ও চার্চ বেশ বনিবনা ক'রে চলছে, চার্চ অবশ্য এখন স্ত্রৈণ স্বামীর মতো স্টেটের বিশেষ অনুগত, নইলে রাশিয়ার চার্চের মতো তাকেও ভিটে ছাড়া হয়ে বনে পালাতে হতো। কিন্তু অত্যাধুনিক স্ত্রীদের খোশ মেজাজের ওপর অতটা ভরসা রাখা স্বামী মাত্রেরই পক্ষে ভয়াবহ। ইংলণ্ডের চার্চও কবে disestablished হয়ে মনের দুঃখে বনে যাবে বলা যায় না, স্টেটের জুলুম দিন দিন বাড়ছে।

খ্রীস্টীয় আদর্শের যাঁরা সমর্থক তাঁদের অনেকে বলছেন, 'Christianity never had a trial.' খ্রীস্টীয় আদর্শকে আমরা গ্রহণই করিনি এতদিন, আমরা গ্রহণ করেছি চার্চের কর্ম কাণ্ড, আমরা শরণ করেছি সঙ্ঘকে। চার্চের দ্বারা খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব এতকাল ঢাকা প'ড়ে এসেছে, খ্রীস্টের সরল উক্তিগুলিকে চার্চের মহামহোপাধ্যায়রা টীকা ভাষ্যের দ্বারা জটিল ক'রে—কুটিল ক'রে ব্যাখ্যা করেছেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের সৃষ্টিতত্ত্ব ও নিউ টেস্টামেন্টের ত্রাণতত্ত্বকে গোড়াতে স্বীকার না ক'রেও খ্রীস্টের অনুজ্ঞা পালন করা সম্ভব, খ্রীস্টকে অনুসরণ করা সম্ভব। খ্রীস্টের জন্মঘটিত রহস্যগুলো সম্বন্ধে খ্রীস্ট স্বয়ং কিছু বলেননি, চার্চই যা-খুশি বানিয়েছে। নিজের প্রতিপত্তির জন্যে চার্চ খ্রীস্টকে এক্সপ্লয়েট করেছে, খ্রীস্টকে ইচ্ছামতো ভেঙে গড়েছে। আমরা সত্যিকার খ্রীস্টকেই চাই, আমরা চার্চের হস্তক্ষেপ সহ্য করব না। আমরা খ্রীস্টের সৃষ্ট খ্রীস্টিয়ানিটিকেই চাই, আমরা চার্চের বানানো খ্রীস্টিয়ানিটি বর্জন করব।—চার্চের হাত থেকে রিলিজনকে উদ্ধার ক'রে তাকে ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণার বিষয় করবার দিকে অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এতকালের চার্চকে এক কথায় বিদায় দেওয়া যায় না, তুলে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া সঙ্ঘের মধ্যেও একটা সত্য আছে, সঙ্ঘবদ্ধ সাধনারও একটা মূল্য আছে, ব্যক্তি ও সমাজের মাঝখানে হয়তো চিরকাল একটা মধ্যস্থ থেকে যাবেই, সেটার নাম গ্রুপ বা পার্টি বা সম্প্রদায় যাই হোক না কেন। নির্জলা ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বা নির্জলা সমাজতন্ত্রবাদ সফল হ'তে না জানি কত কাল লাগবে। হিন্দুসমাজের পেশাগত জাতি একদিন জন্মগত জাতি হ'য়ে না দাঁড়িয়ে থাকলে হিন্দুসমাজই জগৎকে একটা মস্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকত।

রিলিজনের ক্ষেত্রে পূর্ব দেশের কাছ থেকে কোনো রকম দিশা পাওয়া যায় কি না এই নিয়ে অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তি গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, বুদ্ধকেও নিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার বছর রিলিজন বলতে কেবল খ্রীস্টিয়ানিটিই যাঁরা বুঝেছেন, তাঁদের মুখ বদলাবার পক্ষে পৃথিবীর অপরাপর রিলিজনগুলোর মূল্য থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি সত্যিই যে তাঁরা স্থায়ীভাবে ওগুলিকে গ্রহণ করবেন এমন ভাবা ভুল। কারণ ওসব রিলিজন খ্রীস্টিয়ানিটিরই মতো অন্য মাটির গাছ, ইউরোপের মাটিতে রোপণ করলে ওদের বৃদ্ধি তো হবেই না, ইউরোপের নিজের ফসল ফলাবার জন্যে যথেষ্ট জায়গাও থাকবে না। ইউরোপের ধর্মের সঙ্গে বাইরের ধর্মমতের নাড়ীর বাঁধন নেই, তেলে জলে মিশ খাবার নয়। ইউরোপের প্রকৃতি নিজের ফুল নিজে ফোটাতে পারে তো নিজেই একদিন ফোটাবে, অন্যের ফুল আদর ক'রে দেখতে পারে, পরতে পারে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে তাজা রাখতে পারবে না। ইউরোপের আপনার জিনিস তার ফিলজফি তার বিজ্ঞান। পরের কাছে ধার করা থিওলজিকে সে এখনো আপনার করতে পারল না, দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল না। আবার যদি ধার করতে যায় তো দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধার করবে, নিজের ধাতের ভিত্তির ওপরে পরের মতের সৌধ-প্রতিষ্ঠা করবে, ভূমিকম্প হয় তো ভিত্তি টলবে না, সৌধই ধ'সে পড়বে। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে পুরুষকার, আমাদের হাড়ে হাড়ে দৈব। ইউরোপের হাড়ে হাড়ে দ্বন্দ্বভাব শত্রুভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি; আমাদের হাড়ে হাড়ে সন্ধিভাব মিত্রভাবের সাধনায় সত্যের উপলব্ধি। ইউরোপ

অর্জন ক'রে উড়িয়ে দেয়; আমরা অমনি ভিতর থেকে পাই, সঞ্চয় করি। আমাদের উপলব্ধি ইউরোপ যদি নেয় তো নিজের মনের মতো ক'রে নেবে, খ্রীস্টিয়ানিটির আত্মাটুকু বাদ দিয়ে যেমন ধড়টাকে চার্চে ঝুলিয়ে রাখল, এবং নিজের যুদ্ধপ্রিয়তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাকে বেতাল ক'রে তুলল, আমাদের বেদান্ত বা বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাই করবে, এবং নিজের বিজ্ঞান-দর্শনের দ্বারা ডিস্টিল্ ক'রে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই তার গ্রহণ করবে না। সেইজন্যেই আমার মনে হয় ইউরোপকে আমরা মুরুব্বির মতো শিক্ষা দিতে পারব না, কেবল বন্ধুর মতো সাহায্য করতে পারব। আমাদের সাহায্যে ইউরোপ যদি নিজের রিলিজন নিজে সৃষ্টি করে, আর ইউরোপের সাহায্যে আমরা যদি আমাদের রিলিজনগুলোকে বিজ্ঞান শোধিত ক'রে নিই, তবে অতি দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের আত্মার মিলন হবে নিবিড়তম ; দু'টিতে হবে হরিহরাত্ম। তার পরে যখন আরো দূর ভবিষ্যতে দুই মহাদেশের প্রকৃতি এক হ'য়ে আসবে, ধর্ম এক হ'য়ে আসবে, তখন দু'টিতে হবে এক দেহমন, একাত্ম।

এই মুহূর্তে রিলিজন সম্বন্ধে ছোটবড় ইতরভদ্র সকলেই কিছু কিছু ভাবছে কিন্তু এখনো সে ভাবনা তেমন ঐকান্তিক হয়নি, যেমন হ'লে নতুন একটা রিলিজনের জন্ম-লক্ষণ দেখা যেত। মাত্র দেড়শো বৎসরের বিজ্ঞান চর্চা জীবনকে এখনো যথেষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত করেনি, দেড়শো বছর আগের গোরু ঘোড়ার গাড়ি থেকে মাত্র এরোপ্লেন অবধি উঠেছে, এখনো অসংখ্য উদ্ভাবন বাকি। আগামী দেড়শো বছরে হয়তো আকাশে বাড়ি তৈরি ক'রে বাগান তৈরি ক'রে ফুল ফুটিয়ে দেবে। জীবন যতই জটিল হয় রিলিজনকে ততই দরকার হয়—রিলিজন খুলে দেয় গ্রন্থি, রিলিজন ক'রে তোলে সরল। সরলীকরণের আকাঙ্ক্ষা এখনো তীব্র হয়নি বটে, তবু সরলীকরণ যে দরকার সে জ্ঞান সকলেরই কতকটা হয়েছে। ভারতবর্ষে গান্ধীর জন্ম, তিনি যন্ত্রের প্রতাপ সামান্যই দেখেছেন, তাঁর বিশ্বাস যন্ত্রকে না হলেও মানুষের চলে, তিনি জীবন থেকে যন্ত্রকে ছেঁটে ফেললেই সরলীকরণের সাক্ষাৎ পান। কিন্তু ইউরোপে যে সব মনীষীর জন্ম তাঁরা যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, তাঁদের জন্মের বহু পূর্ব হতেই যন্ত্র ও জীবন এক হয়ে গেছে, যন্ত্রকে ছেঁটে ফেলা ও শরীরের চর্ম তুলে ফেলা তাঁদের পক্ষে একই কথা. সরলীকরণের জন্যে তাঁরা যন্ত্রকে ছেড়ে যন্ত্রীর দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছেন, যন্ত্রকে রেখেও জীবনকে কতখানি সরল করা যায় এই হচ্ছে তাঁদের প্রশ্ন।

সেইজন্যে দেখা যায় ধনীদের ঘরেও আসবাবের বাহুল্য কমছে, সুন্দর দেখে অল্প কয়েকটি আসবাব রাখা হচ্ছে। মেয়েদের পোশাকের ওজন কমছে, বহর কমছে; সুরুচিকর দেখে অল্প কয়েকখানা কাপড় পরা হচ্ছে। খোলা আকাশ খোলা হাওয়া খোলা মাঠের টানে ছেলেরা পায়ে হেঁটে পৃথিবীময় ঘুরছে। অল্প কাপড়, সাদাসিধে খাবার, প্রচুর শারীরিক শ্রম, খোলা জায়গায় নিদ্রা—এই সব হলো ইয়ুথ মুভমেন্টের মূলসূত্র। জার্মানী অঞ্চলে কাপড় জিনিসটাকে যথাসম্ভব বাদ দেবার চেষ্টা চলেছে, অথচ ঐ ভয়ানক শীতে। উলঙ্গ ব্যায়াম উলঙ্গ সাঁতার অর্ধোলঙ্গ নাচ ক্রমেই চলতি হচ্ছে। খাদ্যগুলো ক্রমেই কাঁচার দিকে যাচ্ছে। বাসগৃহগুলোর জানলাগুলো বড় হতে হতে এত বড় হয়ে উঠছে যে ঘরে থেকে বাইরে থাকা যাচ্ছে। বৈঠকখানায় বরফ বিছিয়ে স্কেট করা হচ্ছে। দারুণ শীতেও বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে স্নান ক'রে উঠে অল্প সংখ্যক পাৎলা কাপড় পরা হচ্ছে। এক কথায় দেহটাকে লোহার মতো মজবুত ক'রে গড়া হচ্ছে। গ্রীক মূর্তির মতো সবল সুষম সুন্দর দেহ এখনকার আদর্শ। নর-নারী উভয়েই এ আদর্শ গ্রহণ করছে। খ্রীস্টিয়ানিটি দেহকে তাচ্ছিল্য ক'রে ইন্দ্রিয়কে রিপু ব'লে উপবাসকে শ্রেয় ব'লে আত্মনিগ্রহকে ধর্ম ব'লে চালিয়েছিল, কিন্তু এ ধর্ম ইউরোপের প্রকৃতিগত নয়। সেই জন্যে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিক্রিয়া চলেছে। সেক্সকে খ্রীস্টিয়ানিটি

এত ঘৃণা করেছিল ব'লেই সেক্সকে হঠাৎ এত শ্রদ্ধা করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার সময় কোন্ জিনিসের যে কত দাম তা স্থির করা শক্ত হয়। মানুষের মধ্যে যে-ভাগটা পশু সে-ভাগটাকে অযথা নিন্দা ক'রে অযথা নির্যাতন করা হয়েছে; পরিণামে আজ সেই ভাগটাই সবচেয়ে বড় ভাগ, হয়তো সেইটেই সব, এমন কথাও শুনতে হচ্ছে। গ্রীককে অক্ষুণ্ণ রেখে তার ওপরে খ্রীস্টানকে ঢেলে সাজালেই হয়তো সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু কোনোপক্ষের গোঁড়ারা সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি ছাড়বেন না।

সরলীকরণ বলতে যারা পেগানিজম্ বুঝে দেহের বোঝা লাঘব করছে, তারাই রিলিজনের মোহ এড়াতে না পেরে গির্জায় যাচ্ছে, ধর্মগ্রন্থ পড়ছে, ধর্মালোচনা করছে, ঘরে ব'সে রেডিওতে ধর্মকথা শুনছে। শ্যাম ও কুল দুই রাখছে, কিন্তু দু'য়ের সমন্বয় করতে পারছে না। দু'হাজার বছরের অভ্যাস বড় সহজ কথা নয়, বাঘকে আফিং অভ্যাস করালে বাঘও হাই তোলে। আফিঙের বদলে কোকেন ধরিয়ে লাভ নেই—প্রাচ্য রিলিজন মাত্রেই ইউরোপের পক্ষে পরধর্ম। তার যখন ক্ষুধা প্রবল হবে সে তখন নেশার বদলে খাদ্য খুঁজে নিলেই সব দিক থেকে ভালো। সে খাদ্য তার নিজের ভাঁড়ার ঘরে মালমশলা আকারে প'ড়ে রয়েছে, নিজের রান্নাঘরে নিয়ে পাক ক'রে নিলে পরে পরিপাকযোগ্য হবে। ইউরোপের রিলিজন ইউরোপের লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী-স্টুডিও-স্টেডিয়াম থেকেই ভূমিষ্ঠ হবে, গির্জা-মসজিদ-মন্দির থেকে নয়।

।। দশ ।।

পার্লামেন্টের সদস্যনির্বাচন অবশ্য বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হয় না, কিন্তু এক নির্বাচনের পর থেকে আরেক নির্বাচন অবধি প্রত্যেকটি দিন সমস্ত দেশটাই নির্বাচনের মালা জপতে থাকে। এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে না, কেন না চোখ কাড়বার মতো দৃশ্য এই একটি নয়, ইংলণ্ডের মতো দেশে দু'টি চোখ নিয়ে বাস করা এক ঝকমারি। সম্প্রতি এখানে বৈশাখ মাসের গরম, ষোলো সতেরো ঘণ্টা সূর্যালোক, তাই মাস চার পাঁচ আগে যে সময় ঘুমুতে যেতুম, সেই সময় বেড়াতে বেরিয়ে দেখি রাত্রের আহার শেষ ক'রে লোকে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে এক-একজন বক্তা এক-একখানা টুল বা চেয়ার বা ভাঙা বাক্স বা কোনো রকম এক উঁচু আসন যোগাড় ক'রে তার উপরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দেখবামাত্র আমাদের দেশের সঙ্গে দুটো তফাৎ ধরতে পারি। প্রথমতঃ, বক্তা যে দলেরি হোন তিনি যুক্তি দেখান, দেখাতে বাধ্য হন, প্রশ্নের চোটে তাঁকে নাকাল করবার মতো শ্রোতার অভাব হয় না, নানা দলের লেখা বক্তৃতা প'ড়ে শুনে প্রত্যেকেরি চোখ কান এতটা সজাগ হয়েছে যে, কারুর চোখে ধুলো দেওয়া বা কানে মন্তর দেওয়া সোজা কথা নয়। ভাব-প্রবণতা এ জাতটার ধাতে নেই, গোলদীঘির বক্তাদের হাইড পার্কে দাঁড় করিয়ে দিলে শ্রোতা নয় দর্শক যদি বা জোটে তবে তাদের একজনেরো চোখের পাতা ভিজবে না, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হবে না, শিরায় বিদ্যুৎ খেলবে না। সুতরাং বক্তারা শ্রোতাদের অন্য রকম দুর্বলতার সুযোগ নেন। ইংলণ্ডে জনসাধারণ হয় বোঝে যুক্তিতথ্য, নয় বোঝে মদ; সেকালে মদ খাইয়ে ভোট আদায় করা হতো, একালে ও সব উঠে গেছে, তাই যুক্তিতথ্যকে এমন কৌশলে পরিবেশন করতে হয় যা'তে শ্রোতার বা পাঠকের নেশা ধরবে। Statisticsএর মারপ্যাঁচে মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে

মিথ্যা করতে না জানলে ইংলণ্ডের ভবীকে ভুলানো যায় না। তাকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা বৃথা, কান্না পাওয়ানোর চেষ্টা হাস্যকর। বক্তারা তর্জন গর্জন বা বিলাপ প্রলাপের দিক দিয়েও যান না, তাঁরা নিপুণ ক্যান্‌ভাসারের মতো বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে দেন।

দ্বিতীয়তঃ, বক্তারা অত্যন্ত আন্তরিকতা-সম্পন্ন নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। গালাগালি সহ্য করা তো তুচ্ছ কথা, কোনো মতেই তাঁরা মেজাজ হারাবেন না, বেফাঁস কথা ব'লে বসবেন না, তাঁদের ব্যক্তিগত মান অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, তাঁদের একমাত্র ভাবনা তাঁদের দল কেমন ক'রে পুরু হবে। অথচ তাঁরা ভাড়াটে বক্তা নন; হয়তো পেশাদার বক্তাও নন; কেউ দুপুর বেলা মাটি কেটে এসেছেন, কেউ গাড়োয়ানী ক'রে এসেছেন, এখন চান দলের লোকের সাহায্য করতে। রাজনৈতিক দলাদলির ঠিক নিচে ধর্মনৈতিক দলাদলি। কিন্তু সব দলেই অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবিকা আছে—তারা দলের জন্যে আর কিছু ত্যাগ করুক না করুক অন্ততঃ অসহিষ্ণুতাটুকু ত্যাগ করেছে। তাদের দলের তালিকায় যদি একটাও নাম বাড়ে তবে বোধ করি তারা জুতোর মারও সহ্য করবে। মিশনারীরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন গ্রাম নেই যেখানে তারা ধর্মপ্রচার করেনি, এমন ভাষা নেই যে ভাষার বর্ণমালা না থাকলেও যে ভাষায় তারা বাইবেল ছাপায়নি। এই অসাধারণ উদ্যোগিতা এদের জাতিগত। ভোট দেবার অধিকার লাভ করবার জন্যে এদের মেয়েরা পঞ্চাশ বছর ধ'রে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে—কী অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে দিনের পর দিন খেটে এসেছে! জনকয়েকের প্রচেষ্টা ক্রমশঃ লক্ষ লক্ষ জনের হলো, তারপরে জয়। কিন্তু ঐটুকুতে তারা সন্তুষ্ট হয়নি, তারা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সব বিষয়ে সমান অধিকারী করবে, তার আগে থামবে না। এখন তাদের যুদ্ধ চলেছে স্ত্রীপুরুষকে সমান খাটুনির বিনিময়ে সমান মজুরি দেওয়া নিয়ে, বিবাহিতা নারীকে বিবাহিত পুরুষের মতো চাকরি করতে দেওয়া নিয়ে, সব রকম জীবিকায় স্ত্রীপুরুষকে সমান শর্তে স্থান দেওয়া নিয়ে। এদের শ্রমিকরাও এমনি নাছোড়বান্দা প্রকৃতির যোদ্ধা। নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্যে তারা সর্বক্ষণ সচেষ্ট। আমাদের শ্রমিকদের এখন যে অবস্থা, এদের শ্রমিকদেরও এক শতাব্দী আগে সেই অবস্থা ছিল। কিন্তু তারা গ্রামে ফিরে গিয়ে সামান্য জমিজমাকে শতভাগ ক'রে মান্ধাতার আমলের চরকাখানাকে শতবার ঘুরিয়ে ফল পেল না, কলকারখানার কাছে Slum তৈরি ক'রে ঐখানেই জেদ ক'রে প'ড়ে রইল, এবং জেদের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল। এখনো তাদের অবস্থার যেটুকু উন্নতি হয়েছে সেটুকু তাদের মনঃপূত নয়, তাই তাদের লড়াই থামছে না, তারা সব বিষয়ে ধনিকদের মতো না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাবেই। ধনিকরাও চুপ ক'রে ব'সে থাকেনি, এরা ডালে ডালে চলে তো ওরা পাতায় পাতায় চলে, সুতরাং লড়াই কোনো কালে থামবার নয়।

লড়াই যারা করে তারা প্রাণের দায়ে করে। তাই বক্তারা প্রাণপণে বক্তৃতা দেয়। সেটা তাদের শৌখীন বাচালতা নয়, সেজন্য তারা কারুর হাততালির আশা রাখে না, কেউ না শুনলেও তারা রণে ভঙ্গ দেয় না, যে পর্যন্ত একটিও শ্রোতা থাকে সে পর্যন্ত তাদের বক্তৃতা চলতে থাকে, বরং তখনই তাদের বক্তৃতা জোরালো হয়। আমাদের দেশে মাত্র দু'টি শ্রেণীর লোককে আমি এমন নাছোড়বান্দা হতে দেখেছি—পাণ্ডা আর ঘটক। অভিমান কাকে বলে কেবল এই দুই শ্রেণীর লোক জানে না; বাকি সকলেই অল্প-বিস্তর অভিমানী। কিন্তু ইংলণ্ডে পরের উপর মান করলে ঘরের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না। তাই অভিমান কথাটা ইংরেজী ভাষায় নেই। এতে ইংরেজী ভাষার ক্ষতি হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু ইংরেজ জাতটার বৃদ্ধি হয়েছে। দুনিয়ার সর্বত্র জাহাজ না পাঠালে ইংলণ্ডকে প্রায়োপবেশনে মরতে হয়, সুতরাং ইংলণ্ডকে দুনিয়ার সকলের দ্বারে ধাক্কা দিতেই হয়—'Knock and it shall be opened unto you.' এমনি ক'রে ইংলণ্ড আমেরিকার অষ্ট্রেলিয়ার আফ্রিকার বন্ধ

দুয়ার খুলল, ভারতবর্ষকেও ঘুমাতে দিল না।

যে কারণে ইংলণ্ডকে বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফিরতে হয় সেই কারণে ইংলণ্ডের লোককে ঘরের ভাণ্ডারে ভাগ বসাবার চেষ্টা করতে হয়। পার্লামেন্টের হাতে ভাণ্ডারের চাবি। চাবিটার জন্যে দিনরাত লড়াই। এক মুহূর্ত ঢিলে দিলে সর্বনাশ। চাবিটা যাদের হাতে আছে তাদের যেমন ভাবনা, চাবিটা যাদের হাতে নেই তাদেরো তেমনি ভাবনা। আমাদের দেশে রাজনীতিকে লোকে জীবনমরণের ব্যাপার ব'লে ভাবতে শেখেনি; আমাদের কাজের লোকেদের শেষ জীবন কাটে কাশীতে বৃন্দাবনে; রাজনীতি চর্চাটা এখনো আমাদের চোখে দেশের প্রতি একটা অনুগ্রহ; সে অনুগ্রহটুকু যাঁরা করেন তাঁরা একলম্ফে দেশপূজ্য। এ দেশে কিন্তু ওটা ধর্মচর্চার মতো অবশ্যকরণীয় ব্যাপার; যাঁরা করেন তাঁরা নিজের বা নিজের দলের বা নিজের দেশের গরজে করেন; সেজন্যে বাহবা পাবার কথাই ওঠে না; দেশপূজ্য হওয়া দূরে থাক দেশের কাজে লাঞ্ছনা পাওয়াটাই ঘটে। লয়েড জর্জ কাশী-বৃন্দাবনে না গিয়ে পার্লামেন্টে যান—সে জন্যে তাঁকে ছেড়ে কথা কইতে হবে কেন? তাঁর পুণ্যার্জনের লোভ আছে; তাই তিনি ভারতবর্ষ হ'লে কাশী যেতেন, ইংলণ্ড ব'লে পার্লামেন্টে গেলেন; লোকে যেমন কাশীবাসীকে ছেড়ে কথা কয় না, পার্লামেন্টবাসীকেও ছেড়ে কথা কয় না। বলডুইন দেশের জন্যে ত্যাগ বড় কম করেননি, ইংলণ্ডের আদর্শে সে ত্যাগ চিত্তরঞ্জনের ত্যাগের চেয়ে ছোট নয়। তবু তাঁকে তাচ্ছিল্য করতে রাস্তার টম্ ডিক্-ও পশ্চাৎপদ নয়। লয়েড জর্জ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্দিনে তাকে রক্ষা করলেন—অথচ তাঁকে ঠাট্টা করা ও ক্ষ্যাপানো এখনকার একটা ফ্যাশান।

ইংলণ্ড দিনকের দিন যতই গণতান্ত্রিক হচ্ছে ততই তার মহাপুরুষ-ভীতি বাড়ছে। মাঝারি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ ক্রমশঃই ইংলণ্ডের মাটিতে অসম্ভব হ'য়ে আসছে। একজন ক্রমওয়েল্‌কে বা একজন মুসোলিনিকে ইংলণ্ড দু'চক্ষে দেখতে পারবে না। এমন কি একজন পীল্‌কে বা গ্লাডস্টোনকেও না। ইংলণ্ডের মতো অতি স্বাধীন দেশে কোনো মানুষই যথেষ্ট স্বাধীন নয়। হাজারো আইন কানুন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দশজনের একটা mass suggestionও আছে, সমাজের দশজন চায় না যে তাদের মধ্যে কোনো একজন সর্বেসর্বা হোক কিংবা বাকি ন'জনের চেয়ে মাথায় উঁচু হোক। গণতন্ত্রের আন্তরিক ইচ্ছা, কেউ বামন হবে না কেউ দৈত্য হবে না, সবাই প্রমাণ সাইজ হবে। তাই ইংলণ্ডের মহাপুরুষরা, কেবল রাজনীতিতে নয়, কোনো বিষয়েই আকাশস্পর্শী হচ্ছেন না। সাহিত্য ক্ষেত্রে গত শতাব্দীর ব্রাউনিং টেনিসন কার্লাইল ডিকেন্সের দোসর দেখা যাচ্ছে না, বিজ্ঞানেও কোনো একজন লোক ডারুইনের মতো অতি অসাধারণ নন। অথচ মাঝারি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও বাজনীতিজ্ঞেরা গত শতাব্দীর চেয়ে এ শতাব্দীতে সংখ্যায় অধিক ও উৎকর্ষে বড়। তাঁরা লোকের নিন্দা প্রশংসা পাচ্ছেন, কিন্তু বিশেষ শ্রদ্ধা বা বিশেষ অশ্রদ্ধা পাবার মতো মহান তাঁরা নন। তাঁদের নিয়ে এক-একটা school দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য schoolএর সঙ্গে মাথা ফাটাফাটি বাধছে এমন নয়। গণতন্ত্রের দেশের জনসাধারণ কোনো একজনকে অসাধারণ হ'তে দেয় না। আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়ার চেয়েও ইংলণ্ডের গণতন্ত্র খাঁটি। সেইজন্যে ইংলণ্ডে একটি ফোর্ড বা আনাতোল ফ্রাঁস্ বা লেনিন সম্ভব হয় না।

তবে এটা কেবল ইংলণ্ডের নয়, এ যুগের সব দেশেরি অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে মহাপুরুষের খাপ খায় না। গণতন্ত্রের সব সুখ, কেবল ঐ একটি দুঃখ। গণতন্ত্র সকলকে সমান করতে চায়, কাউকে অসমান করতে চায় না। আগে ছিল ভোটের সাম্য, এখন আসছে মজুরির সাম্য, তারপর আসবে মাথার সাম্য। ইস্কুল মাস্টারের সাহায্যে সকলের মাথাকে সমান শক্তিবিশিষ্ট

না করলে বুদ্ধির জোরে গোটাকয়েক লোক বাকি সকলের চেয়ে সুবিধা ক'রে নিতে পারে। এখন থেকেই কোনো কোনো লোক স্টেট সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে এই ব'লে আপত্তি করছে যে, সকলকে যদি সব বিষয়ে সমান সুযোগ দেওয়া হয় তবে তাদের মধ্যে যারা ইহুদীবংশীয় তারাই বুদ্ধির জোরে বড় বড় পদগুলো দখল করবে ও বাকী সকলের উপরে সর্দারি করবে। সব সইতে রাজি আছি, কিন্তু ইহুদীর কর্তৃত্ব! কিন্তু ইহুদীকে কোনো বিষয়ে কোনো সুযোগ না দিলেও কি তাকে দাবিয়ে রাখা যায়? ইহুদী যে সোলার মতো, তাকে সমুদ্রের তলে পাথর চাপা দিলেও সে ভাসবেই। ইউরোপ আমেরিকার এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে ইহুদীকে হাজার দাবিয়ে রাখলেও সে উপরে ওঠেনি? ভাবী কালের গণতন্ত্র রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র মুড়ি মিছরি—সকলেরি একদর হবে, কিন্তু কতগুলো লোক যদি বেশি বুদ্ধিমান হয় তারা তো বেশি সুবিধা ক'রে নেবেই—তারা ইহুদী বা আর যাই হোক না কেন। শেষকালে তাদের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, বংশধরদের মাথা সমান করতে হবে। রাশিয়ার মানুষের মাথাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা ক'রে তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, কিন্তু উৎকর্ষের তারতম্য থেকে গেলে তম-প্রত্যয়ান্ত মাথাগুলো তর-প্রত্যয়ান্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে চাইবে না কি?

এমন কথাও আজকাল শুনতে হয় যে আর্টকে সকলের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, দর্শনকে সর্বজনবোধ্য করতে হবে, সব শাস্ত্রের অ-আ-ক-খ সকলের জানা চাই, সকলেই একখানা ক'রে মোটর গাড়ি পাবে, সকলের মাথায় bowler hat না থাকলে সর্বমানবের ঐক্যবোধ হবে না, সকলের গায়ে কটিবস্ত্র না থাকলে ভারতবর্ষের মধ্যে ধনী দরিদ্র ভেদ থেকে যাবে। গণতন্ত্রের যুগের যতগুলি প্রোফেট সকলেই সাম্যবাদী এবং সাম্য বললে এ যুগে বোঝায় বহিঃসাম্য। গান্ধী লেনিন ফোর্ড বার্নার্ড শ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইউটোপিয়ায় সব মানুষকে সমান বানাতে চান। কিন্তু সব মানুষ কি আত্মায় সমান নয়—কোনো দিন সমান ছিল না? সব মানুষ কি দেহে মনে সমান হ'তে পারে—কোনো দিন সমান হবে? অতীতে আমরা অধিকারী ভেদের উপরে বড় বেশি জোর দিয়েছিলুম, বর্তমানে আমরা অধিকারী সাম্যের উপরে বড় বেশি জোর দিচ্ছি। সেইজন্যে আমাদের মধ্যে যাঁরা আর্টিস্ট তাঁরা ভাবছেন, যে আর্ট জনকয়েক সমঝদারের মধ্যে নিবদ্ধ সে আর্ট একটা মহার্ঘ বিলাসিতা, আর্টকে জনসাধারণের যোগ্য করতে গিয়ে দুধের সঙ্গে জল মেশাতে হবে। যাঁরা উদ্ভাবক তাঁরা এমন মোটর গাড়ি উদ্ভাবন করতেই ব্যস্ত যে মোটর গাড়ি সব চেয়ে সস্তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো হবে, তা নইলে বেশি লোকে মোটর কেনবার সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। যাঁরা শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ তাঁদের ইচ্ছা শিক্ষাকে এমন সুকর করা হয় যাতে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্বল্পতম সময়ে বহু বিষয়ে শিক্ষিত হ'য়ে উঠতে পারবে। ইংলণ্ডে দেখছি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক শ্রেণীর বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। 'Children, do you know?' এই হলো প্রশ্ন। এর উত্তর বইয়ের পাতায়। কে সর্বপ্রথম কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের চূড়ায় হাতী দেখেছিল, কোথায় গাছের ডালে বিছানা পেতে মানুষে শোয়, কোন্ তারাটার আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে ঠিক বারো বছর এগারো মাস ঊনত্রিশ দিন তেইশ ঘণ্টা লাগে—এমনি সব উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর না জেনে রাখলে ভদ্র সমাজে বেচারা শিশু পণ্ডিত ব'লে মুখ দেখাতে পারবে না, প্রতি প্রশ্নে অপদস্থ হবে।

সব জিনিস যে সকলকে জানতেই হবে পেতেই হবে করতেই হবে এইটে আমাদের যুগের কুসংস্কার। এরি উৎপাতে আমরা গভীরতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রসারের দিকেই দৃষ্টি দিচ্ছি বেশি। একটা তাজমহল সৃষ্টি না ক'রে এক লাখ বাসগৃহ তৈরি করছি। একটি যীশুর জন্যে প্রস্তুত না হ'য়ে সহস্র সহস্র পাদ্রী প্রস্তুত করছি। Mass productionএর পেছনেও এই মনোভাব। দু' একজন কোটিপতির ভোগের জন্যে নির্মিত একটি ময়ূর সিংহাসন এ যুগে অসম্ভব, এ যুগের শিল্পীদের চোখ

publicএর ভোগযোগ্য একরাশ এক প্যাটার্নে তৈরি লোহার বেঞ্চির উপরে, যে বেঞ্চিতে ব'সে একজন কয়লাফেরিওয়ালা এক পেনী দামের Daily Mail পড়তে পড়তে বিশ্রাম করবে। রাশিয়ার রাজপ্রাসাদগুলো এখন নাকি গুদামঘরে পরিণত হয়েছে, Versaillesএর রাজনগর এখন একটা চিত্র প্রদর্শনী। আভিজাত্যের ভাবটা পর্যন্ত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যারা লোপ পেতে দিচ্ছে তারা আর কেউ নয়, অভিজাতেরা স্বয়ং। রুমেনিয়ার রাণী এক পেনী দামের খবরের কাগজের জন্যে নিজের ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনী লিখে প্রচুর টাকা পান, তবে তাঁর ঠাট বজায় রয়! লর্ডেরাও কেউ মদ বিক্রি ক'রে লক্ষপতি হবার পরে লর্ড পদবী পেয়েছেন। কেউ জাহাজের খালাসীগিরি করবার পরে ওকালতিতে উন্নতি ক'রে লর্ড পদবী পেয়েছেন। ইংলণ্ডে তবু নামমাত্র একটা লর্ড শ্রেণী আছে, ফ্রান্স জার্মানী প্রভৃতি দেশে বুর্জোয়ারাই সর্বোচ্চ শ্রেণী এবং রাশিয়াতে সে শ্রেণীও নেই।

একদিন মানুষ প্রাণপণে যা চায় আরেকদিন যখন হাতের মুঠায় তা পায় তখন ভাববার সময় আসে যা পেলুম সত্যিই কি তা এতই ভালো যে এর জন্যে যা হাতে ছিল তাকে ছাড়লুম! ইউরোপের কেউ কেউ এখন ভাবতে আরম্ভ করেছেন, গণতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্রের চেয়ে সত্যিই ভালো? লাখ লাখ মাঝারি মানুষ কি এক আধজন মহাপুরুষের চেয়ে সত্যিই কাম্য? The greatest good of the greatest number কি প্রতি মানুষকে একটি ক'রে ভোট ও একশো টাকা ক'রে মাইনে দিলে হয়? খাওয়া পরার কষ্ট ও পরাধীনতার কষ্ট অতি অসহ্য কষ্ট—কিন্তু এ কষ্ট দূর করলেও কি সব চেয়ে বড় কষ্টটা থাকবে না? সব চেয়ে বড় কষ্ট অভিজাতের অভাব, কোয়ালিটির অভাব। দু'একটি মানুষ যদি বাকী সকলের চেয়ে অত্যন্ত বেশি বড় হয় তবে সেই অত্যন্ত বেশি বড় হওয়াটা কি বাকী সকলের পক্ষে greatest good নয়? ক্যাপিটালিজমের পেছনেও একপ্রকার আভিজাত্য ছিল। এক একজন ক্যাপিটালিস্ট যখন পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা ফাঁদেন, প্রকাণ্ড একটা combineএর কর্তা হন, তখন তাঁর সেই শ্রেষ্ঠতা কি মানব জাতির শ্রেষ্ঠতা নয়? কিন্তু ইংলণ্ডের মতো দেশে ক্যাপিটালিজমের দৌড় সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে, আমেরিকাতেও হ'য়ে আসবে। ক্যাপিটালিজম থামবেই কিন্তু যে-বুদ্ধিবলের আভিজাত্য ক্যাপিটালিজমের পেছনে সেই আভিজাত্যও যদি সেই সঙ্গে থামে তবে তাতে মানুষের লাভ বেশি না, ক্ষতি বেশি?

আমেরিকার স্বাধীনতা ফ্রান্সের বিপ্লব ও ইংলণ্ডের যান্ত্রিকতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যে সাম্যবাদ জড়িত ছিল সে সাম্যবাদ সমস্ত পৃথিবীকে সমতল না ক'রে ছাড়বে না। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যে সে ইউরোপ আমেরিকাকে একাকার ক'রে তুলেছে। এখন এক স্থানে ব'সেই দেশভ্রমণের ফল পাওয়া যায়। ইতর ভদ্র শূদ্র ব্রাহ্মণ শ্রমিক ধনিক প্রজা রাজা নারী নর তরুণ প্রবীণ সকলকেই এক নেশায় পেয়েছে—পরস্পরের সঙ্গে সমান হ'তে হবে। এ যুগের একমাত্র বিরোধী সুর কেবল নীট্‌শে! কিন্তু তাঁর চেলারা তাঁর পরুষ কণ্ঠকে যথেষ্ট ললিত করতে লেগেছেন, তা নইলে ডেমক্র্যাসীর কর্ণপটহে ব্যথা লাগবে। আসল কথা বৈষম্যবাদের সবে শুরু হচ্ছে। অসম পুরুষকে ঠিক মতো কল্পনা করতে পারা যাচ্ছে না। কল্পনা ক'রেও কোনো ফল নেই। তিনি যখন আসবেন তখন আপনি আসবেন, তাঁকে বানাবার ভার যে বামনরা নিতে চায় তাদের সব কল্পনার চেয়ে তিনি বড়। তিনি এলে তাঁর সমাজের যে কেমন চেহারা হবে তার নকশা তৈরি করা এইচ. জি. ওয়েল্‌সেরও অসাধ্য।

॥ এগারো ॥

সম্প্রতি এখানে air raid হ'য়ে গেল। একদল লোক এরোপ্লেনে লণ্ডন আক্রমণ করলে, আরেক দল লোক লণ্ডন রক্ষা করলে। যুদ্ধটা এমন নিঃশব্দে হলো যে খবরের কাগজ ছাড়া কোথাও রেশ রেখে গেল না। নিন্দুকেরা বলছে আসল যুদ্ধ এত সহজ ব্যাপার নয় এবং যারা সত্যিই লণ্ডন আক্রমণ করবে তারা এই যাত্রার দলের যোদ্ধাদের রিহার্সেলের সুযোগ দেবে না।

ইংলণ্ডের মতো দেশে যুদ্ধ একটা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। যারা পেশাদার সৈনিক তারা ভাবী যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন প্রস্তুত রয়েছে, যারা অব্যবসায়ী তারাও 'দবকার পড়লে সৈনিক হব' এই মনোভাব নিয়ে খাটছে ও খেলছে। এ ক্ষেত্রে বড়লোক ছোটলোক নেই, সব শ্রেণীর সব অবস্থার লোকের পক্ষে এটা সন্ধ্যাহ্নিকের মতো আচরণীয়। পাঁচ বছরের ছেলের দলও মার্চ ক'রে বাজনা বাজিয়ে শোভাযাত্রায় চলে, বড়দের তো কথাই নেই। মেয়েরা তাদের নকল করে, উৎসাহ দেয়, এবং নিজেরা দল ক'রে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগুলোর জন্যে তৈরি হয়। আহতদের শুশ্রূষার ভার তো মেয়েদেরি উপরে। আকাশ-যোদ্ধাদের মধ্যে মেয়েও আছে।

সামরিক সংস্কার এদের আবালবৃদ্ধবনিতার মজ্জাগত। পরিবারের দু'টি একটি ছেলে যুদ্ধকে তাদের জীবিকা করবেই, একথা প্রত্যেক পিতা মাতা একরকম ধ'রেই রাখেন, এবং পরিবারের দু'টি একটি মেয়ে সৈনিককে বিবাহ ক'রে বিধবা হ'লেও হ'তে পারে, এও পিতা মাতার দূরদৃষ্টির বাইরে নয়। একান্নবর্তী পরিবার এ দেশে নেই, ছেলে বড় হ'লে ঘর ছেড়ে যায়, তার উপরে বাপ মায়ের দাবী নগণ্য। সুতরাং ছেলে যদি যুদ্ধে প্রাণ হারায় তবে বাপ মায়ের শোক যত বড়ই হোক অসুবিধা অপ্রত্যাশিত হয় না। একান্নবর্তী-পরিবার-প্রথা না থাকায় এ দেশের যুবকদের পক্ষে দুঃসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের তুলনায় সহজ। বিধবাবিবাহও এ দেশে নিষিদ্ধ নয়, সুতরাং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ দিলে স্ত্রীর শোক যত বড়ই হোক, আশার ক্ষীণ রশ্মি থাকে। সেই জন্যে হয় প্রাণ দিতে, নয় যশস্বী হ'তে, এদের স্ত্রীরা যেমন এদের যুদ্ধে ঠেলে, আমাদের স্ত্রীরা তেমনি আমাদের যুদ্ধে দূরের কথা, বিদেশে যেতেও ঠেলে না; অধিকন্তু বাধা দেয়। যখন সহমরণ প্রথা ছিল তখন স্ত্রীর আনুকূল্য পাওয়া দুষ্কর ছিল না; কেননা বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতির উপায় ছিল; এবং পুনর্মিলনের আশাও ছিল নিকট।

আমাদের স্ত্রীলোকদের মতো প্রচ্ছন্ন শত্রু আমাদের আর নেই। তারা যে এদের স্ত্রীলোকদের চেয়ে স্নেহময়ী এমন মনে করলে দেশকাল-নিরপেক্ষ নারীপ্রকৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু তারা এদের স্ত্রীলোকদের তুলনায় স্নেহান্ধ, তারা আমাদের 'রেখেছে বাঙালী ক'রে, মানুষ করেনি।' কোনো দুঃসাহসিক ব্রতে তারা আমাদের নিষ্ঠুর আনুকূল্য করে না, তাই সে হতভাগিনীদের আমরা 'পথি বিবর্জিতা' ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাওয়াটাকেই মনে করি চরম দুঃসাহসিকতা। এবং যখন সন্ন্যাসী হ'য়ে যাই, তখন কুলবনিতায় বারবনিতায় ভেদ রাখিনে, এক নিঃশ্বাসে ব'লে যাই নারী কালভুজঙ্গিনী কামিনী, কাঞ্চনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইউরোপের উপরে যে খ্রীস্টিয়ানিটি নামক সন্ন্যাসীশাসিত ধর্মমতটি চাপানো হয়েছে সেটিও সম্ভবতঃ বৃহৎ-পরিবার-কণ্টকিত কাঁটা গাছের ফল। কিন্তু খ্রীস্টিয়ানিটি তো ইউরোপের সত্যিকার ধর্ম নয়, সরকারী ধর্ম; তাই চার্চের কর্তারাও স্টেটের কর্তাদের মতো যুদ্ধ বিগ্রহে পাণ্ডার কাজ ক'রে থাকেন, এমন কি ফরাসী যাজকরা

উঁচুদরের ডিপ্লম্যাট ও পর্তুগীজ যাজকরা উঁচুদরের ব্যবসাদারও হ'য়ে থাকেন। এই যে এখন যুদ্ধ নিবারণের প্রচেষ্টা চলেছে, এতে চার্চের নেতৃত্ব নেই, এবং যেটুকু যোগ আছে সেটুকু চার্চভুক্ত জনকয়েক ব্যক্তিবিশেষের।

ইংলণ্ডে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তিবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু যে কারণে বাড়ছে সে কারণটা ইংলণ্ডের বার্ধক্যের লক্ষণ কি না বলা যায় না। শান্তিবাদীদের দলে যাঁদের নাম দেখি তাঁরা সাধারণতঃ বর্ষীয়ান এবং তাঁদের ভাবনা এই যে, আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়াকে যদি একটুও প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে ভাবী যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হ'য়ে যাবে। এরোপ্লেন থেকে বোমা ছুঁড়ে এত শতাব্দীর এত বড় লণ্ডন শহরটাকে একদিনেই শ্মশান ক'রে দেওয়া সম্ভব। মানুষ যত সহজে ধ্বংস করতে শিখেছে তত সহজে নির্মাণ করতে শেখেনি। একটা যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কত বৎসর চ'লে যায়। আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়া এমন মারাত্মক যে, যে-সব দেশ যুদ্ধে যোগ দেবে না সে-সব দেশেও মহামারী পৌঁছাতে পারবে। এবং এক দেশের বিষে সব দেশ জর্জর হ'তে পারবে। এক জাতির ক্ষতিতে সব জাতির ক্ষয়, এটা যে কত বড় সত্য তা মানুষ এতকাল বুঝত না, এখন বুঝছে। কিন্তু বুঝলে কি হয়, বুদ্ধি তো মানুষের সব নয়, প্রবৃত্তি যে তার বুদ্ধির অবাধ্য। 'জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।' গত মহাযুদ্ধে যে শিক্ষাটা হলো, সে শিক্ষা ইতিমধ্যেই বাসি হ'য়ে গেছে। আর কয়েক বছরেই নতুন জেনারেশন রাজত্ব করবে; নবীন চিরদিনই বেপরোয়া; শৈশবের যুদ্ধস্মৃতি যৌবনে মিলিয়ে যাবে; তখন চলবে নতুন যুদ্ধে নতুন কীর্তির আয়োজন। সে আয়োজনে তরুণকে প্রেরণা দেবে তরুণী; সে তার কানে কানে বলবে. 'None but the brave deserves the fair'; অর্জুনের রথে সারথি হবে সুভদ্রা। তারপরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; তারপরে পতিপুত্রহীনাদের নারীপর্ব; তারপরে আবার নতুন বংশ নতুন পুরুষ নতুন সৃষ্টি।

বেঁচে থেকে মানুষ করবে কি? মানুষ যে কঠিন কিছু না করতে পারলে জড় হ'য়ে যায়, ভীরু হ'য়ে যায়। যুদ্ধ মানুষ হাজার হাজার বছর ক'রে আসছে শুধু কঠিন কিছু না ক'রে তার শান্তি নেই ব'লে। যুদ্ধহীন জগতের শান্তির মতো অশান্তি তাব পক্ষে আর নেই। মানুষ যে মানুষকে হিংসাই করে এটা মিথ্যা, সুতরাং 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' মানুষের পরম ধর্ম নয়। মানুষ আঘাত করতে ও আঘাত পেতে ভালোবাসে, কারণ মানুষ প্রেমিক। তার প্রেমে আঘাত আছে অবহেলা নেই; অহিংসা তো অবহেলারই নামান্তর। আমি তোমাকে অহিংসা করি বললে তোমার প্রতি কিছুই করা হয় না, না ভালো না মন্দ। অহিংসা হচ্ছে একলা মানুষের নিষ্ক্রিয় মানুষের ধর্ম, সে মানুষ অসহযোগীই বটে। তেমন মানুষের সমাজে বাস ক'রে আনন্দ নেই। আমরা চাই দু'টো মারতে দু'টো মার খেতে, আমরা রাগীও বটে অনুরাগীও বটে, কিন্তু রক্ষা করো, আমরা বৈরাগী নই।

আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়ায় মানুষকে কি মানুষের নিকট ক'রে তোলেনি? মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়নি? অধিকাংশ মানুষ দেশের বাইরে যাবার সুযোগ পায় না, প্রধানত আর্থিক কারণে। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে যোগ দিয়ে তারা যখন বিদেশ অভিযান করে তখন বিদেশকে জানবার সুযোগ পায়, বিদেশীকেও জানে। গত মহাযুদ্ধে দ্বীপবদ্ধ ইংরেজ প্রথমবার জার্মান সংস্পর্শে এসে জার্মান জাতিকে জানল, তার ফলে এখন জার্মানীর প্রতি শ্রদ্ধা তাদের কত! গত মহাযুদ্ধে ফ্রান্স থেকে যাঁরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের কারো কারো লেখায় পড়লুম, জীবন মরণের সন্ধিক্ষণেই দুই যোদ্ধা বোঝে যে তারা দু'জনেই মানুষ; তাদের দু'জনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। কিসের এক অবোধ্য প্রেরণায় তাদের এক ক্ষেত্রে মিলিয়েছে; অমূল্য এ মিলন, কিন্তু এর মূল্য দিতে হবে জীবন দান ক'রে! মিলন মাত্রেই বিয়োগান্ত।

ভাবী যুদ্ধের বিশ্বব্যাপী মহামারীতে মানুষকে আরেকটুখানি মিলাবে। অকথ্য লোকসান দিয়ে

মানুষ জানবে যে, সকলেরই স্থান এক নৌকায়। ভারতবর্ষের লোক ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে এসে দেখে গেছে পৃথিবীটা নেহাৎ ছোট, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে মেনে নিয়েছে পৃথিবীর এক কোণের ছোঁয়াচ আরেক কোণে পৌঁছায়। গত মহাযুদ্ধের পর সকলেই অল্পাধিক বুঝেছে যে, জেলায় জেলায় যুদ্ধ যেমন জ্ঞাতিবিরোধ দেশে দেশে যুদ্ধও তেমনি জ্ঞাতিবিরোধ। সেদিন এক গির্জার দ্বারে লিখেছে 'Duelling is illegal. War is the duel between nations. Why not make it illegal by taking your national quarrel to an international court of justice?'

এ দেশের 'লীগ অব নেশনস ইউনিয়ন' যুদ্ধনিবারণের জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে। নানাদেশের নানাজাতির মানুষের যাতে দেখাশুনা আলাপ পরিচয় হয় সে চেষ্টারও বিরাম নেই। ভাবী যুদ্ধ যদি নিকট ভবিষ্যতে ঘটে তবে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আত্মরক্ষার গুরুতর কারণ না দেখলে যুদ্ধে নামতে চাইবে কি না সন্দেহ। যদি সুদূর ভবিষ্যতে ঘটে তবে বুদ্ধির চেয়ে প্রবৃত্তিই প্রবল হবে বোধ হয়। পৃথিবীকে এক রাষ্ট্রে পরিণত না করা অবধি যুদ্ধের ক্ষান্তি নেই। শুধু এক রাষ্ট্র নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শুধু গণতান্ত্রিক নয়, ধনসাম্যমূলক। রেল স্টীমার যেমন কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ দিল্লীকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর ক'রে ভারতবর্ষকে এক রাষ্ট্র করেছে, এরোপ্লেন তেমনি নিউইয়র্ক লণ্ডন কায়রো সিঙ্গাপুর টোকিওকে পরস্পরের পক্ষে নিকটতর না করা অবধি পৃথিবীব্যাপী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার আশা নেই। তবে ইউরোপ যে তাড়াতাড়ি এক রাষ্ট্র হ'য়ে উঠছে এর সন্দেহ নেই। 'United States of Europe' আর বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বছর।

যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যুদ্ধেরই মতো কঠিন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে। নতুবা মৃত্যু-সংখ্যা কমাবার জন্যেই যদি যুদ্ধ তুলে দিতে হয়, তবে বৃদ্ধের সংখ্যা বেড়ে যাবে; সমগ্র পৃথিবীটাই একটা ভারতবর্ষ হ'য়ে উঠবে, যেখানে যযাতির রাজত্ব হাজার কয়েক বছর থেকে চ'লে আসছে। তখন পৃথিবীময় 'পিতা স্বর্গ' ও 'জননী স্বর্গাদপি'র জ্বালায় মাথাটা ভক্তিতে এমন নুয়ে আসবে যে মেরুদণ্ড যাবে বেঁকে, এবং পিঠের উপর চেপে বসবেন পতিব্রতার দল। ইউরোপেরও যদি এহেন অবস্থা হয়, তবে পৃথিবীর কোথাও বাস ক'রে শান্তি থাকবে না, সর্বত্রই এত শান্তি! যুদ্ধ যদি উঠে যায় তবে যৌবনের পক্ষে সে বড় দুর্দিন। ভাবুকরা বলছেন প্রচুর খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যাবে, ভয় নেই। এই যেমন Olympic games। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এমন কিছু চাই যা আরো বিপজ্জনক, আরো প্রাণান্তক। সমাজকে অতীতকালের মতো ভাবীকালেও প্রচুর প্রাণক্ষয় ক'রে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পেতে হবে; সমাজের বাজেটে লোকসানের ঘরের অঙ্ক চিরকাল সমান বিপুল হওয়া চাই। ইতিহাসে এই দেখা গেছে যে, কোটি প্রাণীর তপস্যায় কয়েকটি প্রাণী সিদ্ধিলাভ করেছে, অভিব্যক্তির ইতিহাসে যোগ্যতমেরই উদ্বর্তন। যে মানুষ সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে যোগ্যতম, সে মানুষকে সহজ পথ দেখিয়ে মানবজাতি লাভবান হবে না।

যুদ্ধকে অনাবশ্যক ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তো ভালোই, কিন্তু ক্ষতিকর ব'লে যদি তুলে দেওয়া হয় তবে বুঝতে হবে ক্ষতি স্বীকার করবার মতো ক্ষমতা মানবজাতির নেই। সে ক্ষমতা বর্বরের ছিল, কেননা বর্বরের প্রাণশক্তি ছিল প্রভূত। সভ্যতা যদি মানবের প্রাণশক্তি হরণ ক'রে থাকে তবে সভ্যতার পক্ষে সেটা ভয়ের কথা! বর্বরতার শক্ত বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সভ্যতার পাকা দালানে ফাটল দেখা দেয়। মানবের মধ্যে যে পশু আছে তাকে দুর্বল করলে মানব দুর্বলই হয়। বহুকাল মানবকে মনে করা হয়েছে পশু থেকে স্বতন্ত্র একটা সৃষ্টি, একেবারে ভুঁইফোড়। সভ্য মানবকে মনে করা হয়েছে বর্বর থেকে স্বতন্ত্র একটা জাতি, পূর্বপুরুষহীন। কৌলীন্যের পেছনে যেন সাঙ্কর্য নেই, আভিজাত্যের পেছনে যেন জারজতা নেই, পদ্মের পেছনে যেন পাঁক নেই! আসলে কিন্তু পাঁকই হচ্ছে সার, সে না থাকলে জলের পদ্ম হতো কাগজের পদ্ম। বহুকাল থেকে

আমরা বর্বরতার তেজ হারিয়ে সভ্যতার আলো নিয়ে খেলা ক'রে এসেছি, তৈমুরের ভোঁতা তরোয়ালে শান দিয়ে তাকে দাড়ি চাঁচবার ক্ষুর বানিয়েছি, জীবনের মোটা কথাগুলোর সূত্র হারিয়ে সূক্ষ্ম তত্ত্বের জট পাকিয়েছি।

সেই জন্যে দেখি আমাদের যুগে আদিম যুগের সঙ্গে অন্বয়রক্ষার চেষ্টা; কেউ বলছে 'back to the village'; কেউ বলছে 'back to the forest'; কেউ বলছে বর্বরের মতো দিগম্বর হও; কেউ বলছে পশুর মতো আকাশের তলে ঘাসের উপরে খাও-শোও। এ সবের তাৎপর্য এই যে, আমরা আদিম প্রাণীর জোর হারিয়েছি, আপনার গাঁথা জালে জড়িয়েছি। অতি বুদ্ধির নাকে দড়ি, সেই হয়েছে সভ্য মানবের দশা। যুদ্ধ দোষের নয়, দোষের হচ্ছে কূটনীতি, গুপ্তচরবৃত্তি, বিষবায়ু-প্রয়োগ, ব্যাধিবীজনিক্ষেপ ইত্যাদি কৌরবসুলভ কুকার্য। মানুষ ধর্মযুদ্ধ ভালোবাসে, যে যুদ্ধে তার গুণগুলোর পরিচয় দিয়ে সে তৃপ্তি পায় মরণেও। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের বারো আনাই যে মিথ্যাপ্রচার, কাগজে কাগজে যুদ্ধ। অসির চেয়ে মসীর উপদ্রব বেশি। আধুনিক যুদ্ধে যত মানুষ প্রাণে মরে তার বেশি মানুষ আত্মায় মরে,—এইখানেই অধর্ম, যুদ্ধে অধর্ম নেই।

যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার পরীক্ষা। যুদ্ধের চেয়ে সহজ উপলক্ষ্য চাইনে, যুদ্ধের পরিবর্তে অন্যবিধ উপলক্ষ্যে আপত্তি নেই। কিন্তু সে উপলক্ষ্য যেন আবালবৃদ্ধবনিতাকে যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ দিয়ে দিতে প্রস্তুত রাখে, সাহসে উদ্যমে উদ্যোগে বিক্রমে প্রত্যেককে ভ'রে দেয়। যুদ্ধনিবারণী প্রচেষ্টার যাঁরা নায়ক তাঁরা যুদ্ধের বদলে করবার কী আছে তা বলেননি, শুধু বলছেন, 'যুদ্ধ কোরো না'; হাঁ-মন্ত্র না দিয়ে দিচ্ছেন না-মন্ত্র; 'Thou shalt' না ব'লে বলছেন 'Thou shalt not'। যুবকের প্রাণ ভাবের বদলে অভাবে ভ'রে ওঠে না, যুবক চায় positive commandment। যুদ্ধের বদলে সালিশি করা তরুণের কাজ নয় এবং যুদ্ধের বদলে পুলিশি ক'রেও তরুণের তৃপ্তি নেই। তাই শান্তিবাদীদের আবেদন তরুণের বুক দোলায় না। এখন যদি কেউ এসে বলতেন 'তোমরা প্রেমের অভিযানে জগতের হৃদয় জিনে লও' তবে সেও হতো এক রকম যুদ্ধ, তাতে দুঃখ কিছুমাত্র কম হতো না, মরণাধিক বেদনা থাকতো। সে যুদ্ধে স্বার্থপরতাব গ্লানি ও মিথ্যাভাষণের পাপ চাপা পড়ত এবং ভীরুতার স্থান থাকতো না। সে যুদ্ধে বর্বরকে ঘৃণা ক'রে তার অবদান হ'তে সভ্যতাকে বঞ্চিত করা হতো না; পশুকে অবহেলা ক'রে তার সংস্পর্শ হ'তে মানুষকে দূরে রাখা হতো না। যে ডাক শুচিবাতিকগ্রস্তের নয়, নীতিবাতিকগ্রস্তের নয়, অহিংসাবাতিকগ্রস্তের নয়, প্রেমিকের,—সেই ডাকের প্রতীক্ষায় আমাদের যুগ পদচারণ করছে।

।। বারো ।।

বসন্ত যখন আসে তখন এমনি ক'রেই আসে। তখন ফুল যত ফোটে কুঁড়ি ঝ'রে যায় তার বেশি, যত ফুল সফল হয় তার বেশি ফুল হয় নিষ্ফল। 'বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের খেলা রে? দেখিস্ নে কি ঝরা ফুলের মরা ফুলের মেলা রে?' লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি; তবু অপরিসীম লাভ, সেই অপরিসীমতাকে বলি বসন্ত। জীবনের চেয়ে জরা ব্যাধি মৃত্যুই বেশি; তবু অপরিসীম জীবন, সেই অপরিসীমতাকে বলি যৌবন।

জার্মানীতে এসে দেখতে পাচ্ছি জাতির জীবনে বসন্ত এসেছে। জার্মানদের দেখে বিশ্বাস হয় না যে, কিছুদিন আগে এরা যুদ্ধে হেরে সর্বস্বান্ত হয়েছে এবং এখনো এরা অংশত পরাধীন ও অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত। মুখে হাসি নেই এমন মানুষ আছে কিনা খোঁজ নিতে হয়, এবং সকলেরই স্বাস্থ্য অনবদ্য। অথচ যুদ্ধে এরা প্রত্যেকেই ধন জন হারিয়েছে এবং মার্কমুদ্রার পতনকালে এদের অধিকাংশের সর্বস্ব গেছে। কিন্তু সর্বস্ব গেলেও যদি যৌবন থাকে তবে সর্বস্ব ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। জার্মানীর লোক ধন দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু যৌবন দেয়নি। তাই এমন অবিশ্রান্ত যৌবনচর্চা চলেছে ক্ষতিকে পুষিয়ে নিতে। যারা গেছে তাদের স্থান পূরণ করছে যারা এসেছে তারা, শিল্পে বিজ্ঞানে ক্রীড়ায় কৌতুকে নবীন জার্মানীর পরাক্রম দেখে মনে হয় না যে, প্রবীণ জার্মানী বেঁচে থাকলে এর বেশি পরাক্রমী হ'তে পারত।

বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ঝরাতে হয় লাখে লাখে, সমাজকে তেমনি মানুষ খোয়াতে হয় লাখে লাখে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের শর্ত এই যে, প্রকৃতি আমাদের যা দেবে তা আমরা পালা ক'রে ভোগ করব। আমাদের এক দলকে মরতে হবে আরেক দলকে বাঁচতে দেবার জন্যে। মৃত্যুর মধ্যে যে তত্ত্ব আছে সে আর কিছু নয়, সে এই—যারা জন্মায়নি তাদেরকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে যারা জন্মিয়েছে তারা মরবে। সমাজকে তাই হয় দুর্ভিক্ষের জন্যে, নয় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়—দুর্ভিক্ষের মরা তিলে তিলে, যুদ্ধের মরা এক নিমেষে।* দুর্ভিক্ষে যারা মরে তারা আগে থাকতে দুর্বল, তারা সাধারণতঃ বৃদ্ধ কিংবা শিশু কিংবা স্ত্রীলোক। আর যুদ্ধে যারা মরে তারা যুবা, সব চেয়ে বলবান, সব চেয়ে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। যে সমাজের যৌবন অফুরন্ত সে সমাজ যুবাকেই মরতে পাঠায় যুবাকে স্থান ছেড়ে দেবার জন্যে, সে সমাজ কোনোদিন যুবার অভাব বোধ করে না। আর যে সমাজের যৌবন অল্প তার ব্যবস্থা অন্যরকম, সে সমাজের যৌবন শুকিয়ে শুকিয়ে লোলচর্ম হ'লে পরে যখন তার মৃত্যু আসে তখন এক স্থবিরের স্থান পূরণ করতে থুড়থুড় ক'রে অগ্রসর হয় আরেক স্থবির। ঠাকুরদা মশায়ের পরে জ্যাঠা মশায়, তার পরে বাবা মশায়, তার পরে কাকা মশায়, তার পরে দাদা, তার পরে আমি। চুল না পাকলে রাজত্ব করবার অধিকার কারুর নেই। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই বার্ধক্য চর্চা করতে হয়।

কিন্তু ইউরোপে দেখছি বিপরীত ব্যাপার। যৌবন রক্ষা করবার জন্যে মহাস্থবিরেরা monkey glandএর শরণ নিচ্ছেন, প্রৌঢ় প্রৌঢ়ারা বালক বালিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খালি গায়ে খোলা জায়গায় সাঁতার কাটছেন, নৌকা চালাচ্ছেন, কঠিন কাঠের তক্তার উপরে প'ড়ে প'ড়ে মধ্যাহ্নসূর্যের কিরণে সিদ্ধ হচ্ছেন। এটাও একটা ফ্যাশান, কিন্তু ফ্যাশান তো weather cockএর মতো দেখিয়ে দেয় বাতাস কোন্ দিক থেকে বইছে। যুদ্ধের আগে জার্মানীতে প্রত্যেক পুরুষকেই রণশিক্ষা করতে হতো। এখন তার উপায় নেই, কিন্তু সংস্কার যায় কোথায়? জার্মানদের বহুকালাগত আদর্শ—মানুষকে হ'তে হবে 'blood and iron'। পুরুষদের সঙ্গে এখন মেয়েরাও যোগ দিয়েছে, জাতীয় দুর্দশা স্মরণ ক'রে কেউ তাদের বাধা দিতেও পারছে না। চার্চ একটু খুঁৎ খুঁৎ করেছিল। ওরা বললে, অমন করলে চার্চ মানব না। তখন চার্চ হাল ছেড়ে দিলে। জার্মানদের মতো গোঁড়া খ্রীস্টান জাতি নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে এ অনাচার সহ্য করত না।

যারা যুদ্ধে প্রাণ দেয় তারা দেশের সব চেয়ে প্রাণবান পুরুষ। যারা বেঁচে থাকে তারা

* যে সমাজ দুর্ভিক্ষও চায় না যুদ্ধও চায় না সে সমাজের তৃতীয় পন্থা জন্মশাসন। গান্ধীমার্কা জন্মশাসনে দুর্ভিক্ষের ভাব আছে—অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার মৃত্যু। স্টোপ্‌স্‌মার্কা জন্মশাসনে যুদ্ধের ভাব আছে—অজাত প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভাব্যতার হত্যা। কিন্তু যে সমাজ না চায় দুর্ভিক্ষ না চায় যুদ্ধ না চায় কোনো প্রকার জন্মশাসন, সে সমাজের আবদার প্রকৃতির অসহ্য।

বালবৃদ্ধবনিতা। তবু তাদেরি ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টির উদ্‌গম যখন হয় তখন অবাক হ'য়ে দেখি এ সৃষ্টিও আগেরি মতো পরাক্রান্ত। তখন মনে হয় একে পরাক্রান্ত হবার সুযোগ দেবার জন্যেই আগের সৃষ্টিকে ধ্বংস হ'তে হলো। জীবনকে আমরা ব'লে থাকি লীলা, এরা ব'লে থাকে সংগ্রাম। একই কথা। কেননা লীলা যেমন নবনবোন্মেষ, সংগ্রামও তেমনি নূতন সৃষ্টির জন্যে পুরাতনের ধ্বংস। বহু শতাব্দী ধ'রে দেখা যাচ্ছে প্রতি জেনারেশনে ফ্রান্স একবার ক'রে নিঃক্ষত্রিয় হয়, তার বলবান পুরুষেরা প্রাণ দেয়, তার সুন্দরী নারীরা nun হ'য়ে যায়। তবু ভস্মের ভিতর থেকে আগুন জ্ব'লে ওঠে, নতুন ফ্রান্সের কীর্তি পুরাতন ফ্রান্সের গৌরব ম্লান ক'রে দেয়। 'হইলে হইতে পারিত' কথাটা অক্ষম দেশের পক্ষে প্রযুজ্য; ফ্রান্সের পক্ষে নয়। ফ্রান্স যা হ'য়েছে তাই এত আশ্চর্য যে, এই হওয়াটার খাতিরে তার 'হইলে হইতে পারা'টা চিরকালের মতো না হওয়া থেকে গেল। যা হ'তে পারতুম তাই যদি হতুম, তবে যা হয়েছি তা হ'তে পারতুম না। বাস্তবটা এমন শোচনীয় নয় যে সম্ভাব্যতার জন্যে হাহুতাশ করব। স্বর্গ থাকলে মর্ত্য যদি না থাকে তবে চাইনে স্বর্গ।

মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন ক'রে দিয়ে জার্মানী নতুন দিনের আলোয় নতুন ক'রে বাঁচছে। তার ধনবল নেই, সৈন্যবল নেই, কিন্তু তার লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা যুবক যুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া যেরূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবনচর্চা করছে তা দেখে মনে হয় ভাবীকালের জার্মান জাতিকে নিয়ে আবার বিপদ বাধবে। জার্মানী যা করছে তার কোথাও কিছু কাঁচা রাখছে না। পৃথিবীর যেখানে যে বিষয়ে যে বই প্রকাশিত হয় জার্মানী তার অনুবাদ ক'রে পড়ে, ক্ষুদ্র শহরে ক্ষুদ্র দোকানেও আমি ভারতীয় আর্টের উপরে লেখা বৃহৎ বই এবং মহাত্মা গান্ধীর Young Indiaর অনুবাদ দেখলুম! তা ব'লে ভারতবর্ষের প্রতি জার্মানীর পক্ষপাত নেই, Sigrid Undsetএর নূতনতম বইয়ের অনুবাদও সে দোকানে ছিল এবং যে বই অল্পদিন আগে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছে সে বই অনুবাদ করতে জার্মানীর বিলম্ব হয়নি। জার্মানীর ছোট ছোট শহরেও যে সব মিউজিয়াম আছে সেগুলিতে পৃথিবীর কোনও দেশ বাদ পড়েনি। জার্মানীর শিক্ষাপ্রণালীর গুণে দেশের ইতর সাধারণও পৃথিবীর কোন্ দেশে কোন্ বিষয়ে কতটা উন্নতি হয়েছে সে খবর রাখে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ এমন সর্বজ্ঞ নয়।

কিন্তু আমাকে সব চেয়ে চমৎকৃত করেছে দু'টি বিষয়। প্রথমতঃ, জার্মানীর যে ক'টি ছোট ও বড় গ্রাম ও শহর দেখলুম সে ক'টিতে Slum নেই, বরং মজুরদের বাড়িগুলি আমাদের মধ্যবিত্তদের বাড়ির তুলনায় অনেক উপভোগ্য! জার্মানীর গরীব লোকদের অবস্থা ইংলণ্ডের গরীব লোকদের চেয়ে অনেক ভালো। জার্মানীর জাতীর দুর্দশার দিনে তার শক্তিকে অপচয় থেকে রক্ষা করেছে তার অন্তর্বিবাদের স্বল্পতা। তাছাড়া জার্মানী প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে Slumএর কিছু সোদর সম্বন্ধ নেই। দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীর শ্লীলতাবোধ এমন বনেদী যে কলকারখানার সঙ্গে কদর্যতাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। ফ্যাক্টরিগুলো যথাসম্ভব গ্রাম বা শহরের বাইরে। তাদের ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যে গ্রাম বা শহরের চতুঃসীমায় বাগান ক'রে দেওয়া হয়েছে কিংবা বাড়ির সঙ্গে একটি বাগান করতে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা যে-সব বাড়িতে থাকে সে-সব বাড়িরও সুন্দর গড়ন সুন্দর রং; কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই আছে। হোটেল বা রেস্তরাঁর দেয়ালেও ওয়াল পেপারের বদলে একপ্রকার আলপনা। স্টেট থেকে অপেরা হাউস ও থিয়েটার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক শহরে। গান বাজনার একটি আবহাওয়া সর্বত্র বোধ করা যায়। ইংলণ্ডের সাধারণ লোক বোবা-কালা, এবং সিনেমা দেখে দেখে তাদের চোখও গেছে। কিন্তু জার্মানীর সকলেই গান বাজনায় যোগ দেয়। আর জার্মানীতে ছবি আঁকার ঝোঁক নিয়ে যত লোক বেড়ায় ফোটো তোলার বাতিক নিয়ে তত লোক বেড়ায় না।

বেড়ানোর নেশা পৃথিবীর দু'টি জাতির আছে, আমেরিকান আর জার্মান। কিন্তু আমেরিকান যখন বেড়ায়, তখন ভেসে ভেসে বেড়ায়, দিনের দু'চার ঘণ্টায় দু'শো মাইল দেখে নিয়ে বাকী সময়টায় বার বার খায় দায় নাচে খেলে। তার জন্যে সব চেয়ে দামী রেল জাহাজ, সব চেয়ে আরামের মোটর কোচ, সব চেয়ে বড় হোটেল। ভ্রমণ করবার সময় যাতে সে বিশ্রাম সুখ পায় সেই দিকেই তার দৃষ্টি। কিন্তু জার্মান যখন বেড়ায় তখন পায়ে হেঁটে বেড়ায়, ফোর্থ ক্লাস রেল গাড়িতে চড়ে, নিজের পিঠে বাঁধা 'ruck sack' থেকে কিছু 'wurst' বার ক'রে খায়, সস্তা সরাইতে গিয়ে পেট ভ'রে এক ঘড়া সস্তা beer পান করে, বিশ্রাম করতে করতে ছবি আঁকে, আর চলতে চলতে প্রাণ খুলে গান গায়। জার্মানী দেশটি আমাদের যে কোনো প্রদেশের চেয়ে বড়। তার উত্তরটা প্রোটেস্টান্ট-প্রধান, দক্ষিণটা ক্যাথলিক-প্রধান। তার প্রত্যেক জেলার নিজস্ব ইতিহাস আছে, প্রত্যেক জেলাই ছিল স্বতন্ত্র। জার্মানীকে একটি ছোট স্কেলের ভারতবর্ষ বলতে পারা যায়, তেমনি বহুধা বিভক্ত। তাই জার্মানরা চায় নিজেদের দেশের অলিতে গলিতে ঘুরে নিজের দেশকে সমগ্র ভাবে জানতে। তাদের বেড়ানোর নেশার পেছনে তাদের এই উদ্দেশ্যটি আছে। যুদ্ধে হেরে জার্মানী এক হয়েছে। আগে ছিল প্রাশিয়ার একাধিপত্য। তবু প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণ মরেনি এবং প্রোটেস্টান্টে ক্যাথলিকে বিরোধ আছে।

জার্মানরা ইংরেজদের মতো প্রধানত প্রোটেস্টান্ট বা ফরাসীদের মতো প্রধানত ক্যাথলিক নয়। এদের দুই সম্প্রদায়ই সমান প্রবল। রাইনল্যাণ্ড ও ব্যাভেরিয়ার সর্বত্র ক্যাথলিক প্রভাব লক্ষ্য করছি। গির্জার যেমন সংখ্যা নেই, তেমনি গির্জার বাইরে ও ভিতরে মূর্তি ও চিত্রেরও সংখ্যা নেই। এখনো লোকে সে-সব প্রতিমার কাছে দীপ জ্বালে, ফুল রাখে, হাঁটু গাড়ে, মাথা নোয়ায়, মনস্কামনা জানায়। খ্রীস্টিয়ানিটি বহুদূর থেকে এলেও ইউরোপের হৃদয় অধিকার করেছে।

মূর্তি ও চিত্রগুলি সচরাচর ক্রশবিদ্ধ যীশুর কিংবা যীশুজননী মেরীর। যীশুর পবিত্র জন্ম ও করুণ মৃত্যু—এই দু'টি বিষয় নিয়ে অসংখ্য চিত্রকর চিত্র এঁকেছেন, অসংখ্য ভাস্কর মূর্তি গড়েছেন এবং অসংখ্য সংগীতকার গান রচনা করেছেন। মধ্যযুগের ইউরোপীয় আর্ট প্রধানত এই দু'টি বিষয়কে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। রেনেশাঁসের পরে ইউরোপ নিজেকে চিনল, বিষয়ে দারিদ্র্য রইল না, এবং ইউরোপীয় আর্ট গির্জার আঁচল ছাড়ল। খ্রীস্টিয়ানিটি যে ইউরোপের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছায়নি তার প্রমাণ খ্রীস্টিয়ানিটিকে ইউরোপ আপন ইচ্ছামতো ভাঙতে গড়তে পারেনি, যেমনটি পেয়েছিল তেমনটি রাখতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর সামগ্রী উপহার রূপে পেলে লোকে সাজিয়ে রাখতেই ব্যস্ত হয়।

খ্রীস্টিয়ানিটিকে তার বাড়ির পাশের আরব পারস্যের লোক গ্রহণ করল না; এমন কি তার বাড়ির লোক ইহুদীরা পর্যন্ত অসম্মান করল, কিন্তু দূর থেকে ইউরোপ ডেকে নিয়ে মান দিল। কেন এমন ঘটল? সম্ভবতঃ ইউরোপের পরিপূরক রূপে এশিয়াকে দরকার ছিল। কিংবা ইউরোপীয় চরিত্রের পরিপূরক রূপে যীশুর আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তটির প্রয়োজন ছিল। জার্মানীর যেখানে যাই সেখানে দেখি যীশুর ক্রশবিদ্ধ করুণ মূর্তিটি বাণবিদ্ধ পাখির মতো দু'টি ডানা এলিয়ে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়েছে, যেন বিনা কথায় বলতে চায়, 'আমার দুঃখ দেখে কি তোমাদের মায়া হয় না? তোমরা এখনো পাপ করছো?' ভোগলোলুপ ইউরোপকে ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দেবার দরকার ছিল। শুধু কথায় তার মন ভিজত না, দৃষ্টান্ত তাকে মুগ্ধ করলে। আমার কিন্তু এ দৃশ্য ভালো লাগে না—কসাইয়ের দোকানে গোরু ভেড়ার ধড় ঝুলছে, তার ঠিক সামনে গির্জার দেয়ালে যীশুর শব-মূর্তি ঝুলছে, এ যেন যীশুকে বিদ্রূপ করা। মনে হয় যেন ইউরোপের লোক পরস্পরকে যীশুর দোহাই দিতে চায় এই জন্য যে তাদের কারুর পক্ষে যীশুর আদর্শ অন্তরের দিক থেকে সত্য নয়,

অথচ বাইরের দিক থেকে সে আদর্শের প্রয়োজন আছে।

চোখে দেখতে জার্মান ও ইংরেজ একই রকম, ফরাসীও ভিন্ন নয়। ইউরোপের সব জায়গায় একই পোশাক একই খানা একই আদব-কায়দা—সব জাতির বহিরঙ্গ একই। স্থান ও পাত্র ভেদে যেটুকু ব্যতিক্রম দেখা যায় সেটুকু ধর্তব্য নয়। জার্মানদের ধারণা তারা ভয়ানক কেজো মানুষ। তাই তারা মাথা মুড়ায়, plus fours কিংবা breeches পরে সাধারণত। তাদের মেয়েদেরও মোটা কাপড়ের প্রতি টান—খদ্দর পরা মেয়ে অহরহ দেখছি। জার্মান মেয়েরা কায়িক শ্রমসাধ্য কাজে পুরুষের দোসর। তারা গোরু ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় ও পিঠে বোঝা বেঁধে হাঁটে। ফরাসী মেয়েদের দেখলে যেমন মনে হয় সারাক্ষণ পুষিমেনির মতো শরীরটিকে ঘ'ষে মেজে সাজিয়ে রেখেছে, জার্মান মেয়েদের দেখলে তেমন মনে হয় না। আবার ইংরেজ পুরুষদের দেখলে যেমন মনে হয় মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো অবধি ফিটফাট, জার্মান পুরুষদের দেখলে তেমন মনে হয় না। জার্মানরা কেজো মানুষ, স্মার্ট হবার মতো শৌখীনতা তাদের সাজে না। সাজসজ্জায় তারা ভোলানাথ—তালি দেওয়া চামড়ার হাফপ্যান্ট পরে পা দেখিয়ে রাস্তায় বা'র হ'লে লণ্ডনে ভিড় জ'মে যেত, মিউনিকে কেউ কিছু ভাবে না।

॥ তেরো ॥

অস্ট্রিয়ায় যাবার আগে বড় ভাবনা ছিল, কী আর দেখব! গত মহাযুদ্ধে অস্ট্রিয়ার যে সর্বনাশ ঘ'টে গেল কোন্ দেশের তেমন ঘটেছে! কত শতাব্দীর কত বড় সাম্রাজ্য, চারটি বছরের যুদ্ধে তার চৌচির অবস্থা! কোথায় গেল হাঙ্গেরী, কোথায় ট্রানসিলভেনিয়া, কোথায় গেল ক্রাকাউ, কোথায় বোহেমিয়া, কোথায় গেল ক্রোয়েশিয়া, ড্যাল্‌মেশিয়া, বস্‌নিয়া। চারটি বছরে চারশত বছরের কীর্তি নিঃশব্দে ভেঙে পড়ল, যেন একটা তাসের কেল্লা একটি আঙুলের একটু ছোঁয়া সইতে পারল না। সাম্রাজ্য যদিও চার শতাব্দীর রাজবংশ প্রায় আট শতাব্দীর। যেন আলাউদ্দিন খিলজী থেকে পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত একটি রাজবংশ দিল্লীর সিংহাসনে ব'সে রাজ্যবিস্তার ক'রে আসছিলেন, ভেবেছিলেন সূর্যচন্দ্র যতদিনের তাঁরাও ততদিনের। ভালোই হলো যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটও গেলেন, নইলে এখনকার ঐটুকু অস্ট্রিয়ায় অত বড় বনেদী রাজবংশকে মানাত না।

বড় ভাবনা ছিল, ভিয়েনায় গিয়ে কী আর দেখব, সুন্দরী ভিয়েনার বিধবার সাজ কি আমার ভালো লাগবে! ভিয়েনাকে রাণীর বেশে সাজাবার সামর্থ্য অস্ট্রিয়ার নেই, অস্ট্রিয়ার না আছে বন্দর না আছে খনি, অস্ট্রিয়ার লোকসংখ্যা এখন এত অল্প যে ভিয়েনার মতো বৃহৎ নগরীর নাগরিক হবার জন্যে আমেরিকানদের সাধাসাধি করতে হয়। আর কিছুদিন পরে ভিয়েনাটাকেও তারা প্যারিস ক'রে ছাড়বে—প্যারিসেরই মতো আমেরিকার উপনিবেশ।

ভিয়েনার সঙ্গে তার আশপাশের সঙ্গতি নেই। একটা কৃষি-প্রধান দেশের এক প্রান্তে এত বড় একটা শিল্প-প্রধান শহর, যার ত্রিসীমানায় বন্দর বা খনি নেই। বন্দর যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও কেড়ে নিয়েছে ইটালি। আর খনি যদি বা ছিল অনেকদূরে তাও পড়ল চেকো-স্লোভাকিয়ার ভাগে। কেবল টুরিস্ট নিয়ে তো একটা বড় শহর বাঁচতে পারে না। ভিয়েনার লোকসংখ্যা কমেছে। বাদশাহী

জাঁকজমক আর নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভিয়েনা অতুলনীয়া সুন্দরী। তার প্রায় চারদিকে পাহাড়, কাছেই ড্যানিউব নদী, ভিতরে নদীর খাল। 'Ring' নামক রাজপথটি ভিয়েনারই বিশেষত্ব। বার্লিন দেখিনি, কিন্তু লণ্ডন প্যারিসের চেয়েও ভিয়েনা দু'টি কারণে সুন্দর। প্রথমতঃ, ভিয়েনার পথঘাট প্যারিসের চেয়ে তো নিশ্চয়ই, লণ্ডনের চেয়েও পরিষ্কার। দ্বিতীয়তঃ, ভিয়েনার সৌধগুলি লণ্ডনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই প্যারিসের চেয়েও সুধা-ধবল। ধোঁয়া আর ফগের ভয়েই বোধ হয় লণ্ডনের বাড়িগুলো চুন মাখতে চায় না। কিন্তু আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাটিও যদি অন্ধকার হয় তো মনের উপরে তার প্রতিক্রিয়া হয় সাংঘাতিক। ভিয়েনায় এ আপদ নেই তাই সেখানে নয়ন দু'টি মেলিলে পরে পরাণ হয় খুশি।

কিন্তু ভিয়েনার নির্জনতা লণ্ডন প্যারিসের মনকে ঘুম পাড়াতে চায়। মধ্যাহ্নকে মনে হয় মাঝ রাত। কত বড় বড় বাড়ি, কত বড় বড় রাস্তা—কিন্তু এত জনবিরল যে ঘুমন্তপুরীর মতো লাগে। বৃহৎ রেস্তরাঁ, ঢুকে দেখা গেল লোক নেই, অথচ অমন রান্না সারা ইউরোপ ঢুঁড়লেও পাওয়া যায় না, অপিচ অত সস্তায়। প্যারিসে লোক কিলবিল করছে, আর মানুষ যত নেই মোটর আছে তত; আর সে-সব মোটর যারা হাঁকায় তারা বিদ্যুতের সঙ্গে টক্কর দেবার স্পর্ধা রাখে। প্যারিস থেকে ভিয়েনায় গেলে বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। অথচ ভিয়েনা চিরদিন এমন ছিল না। এই বিগত-যৌবনা রূপসী একদিন ইউরোপের রাণী ছিল। তখন কত ডিপ্লম্যাট কত বণিক কত গুণী ও কত পর্যটক সোনা দিয়ে তার মুখ দেখতে আসত। সংগীতে ভিয়েনার সমান ছিল না। ভিয়েনার অপেরা এখনো তার পূর্ব-গৌরব হারায়নি। কিন্তু মহাকাব্যের মতো অপেরারও দিন যায়-যায়। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিকাগোর অপেরা লণ্ডনে ব'সে দেখবার শোনবার উপায় হয়েছে ও হচ্ছে কিন্তু নতুন একখানা অপেরা লেখবার মতো প্রতিভা একমাত্র Strauss-এর আছে এবং সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গেই লোপ পাবে। থিয়েটারে সাজসজ্জার যে উন্নতি হয়েছে তা শেক্স্পীয়রের পক্ষে কল্পনাতীত, কিন্তু শেক্স্পীয়রের পায়ের ধুলো নেবার উপযুক্ত নাট্যকার একটিও জন্মাচ্ছে না। এবং রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় জগতের শেষ মহাকবি।

ঠাট বজায় রাখতে ভিয়েনার লোক অদ্বিতীয়। অত বড় সাম্রাজ্য হারাবার পরে সোশ্যালিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তারা আগের মতোই কায়দা-দুরস্ত আছে। রেস্তরাঁয় লোকই আসে না, তবু ওয়েটার বাবাজীদের দরবারী পোশাকটি অপরিহার্য। পাহারাওয়ালা অন্য সব দেশে কেবল পাহারাই দেয়, তার হাতে একটা বেটন থাকলেই যথেষ্ট, কিন্তু ভিয়েনার পাহারাওয়ালার গায়ে সৈনিকের সাজ ও কোমরে সুখচিত তরবারি। ভিয়েনার লোক কিছুতেই ভুলতে পারছে না যে তাদের সম্রাট ও তাঁর সভাসদেরা ছিলেন ইউরোপের মধ্যে অভিজাততম, যদিও এখন তারা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বললে হয় এবং খেতে পায় না ব'লে লীগ অব নেশনসের মধ্যস্থতায় টাকা ধার নিয়েছে। অস্ট্রিয়াকে সম্ভবতঃ একদিন বাধ্য হ'য়ে জার্মানীর অন্তর্গত হ'তেই হবে, কিন্তু ভিয়েনা কেমন ক'রে ভুলবে যে সেই ছিল জার্মানীর তথা ইউরোপের দীর্ঘকালের রাজধানী। সেদিনকার বার্লিনের কাছে ভিয়েনা কেমন ক'রে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াবে! যে-প্রাসিয়া একদিন তার ভৃত্যের মতো ছিল তার কাছে অস্ট্রিয়া হবে ছোট! কিন্তু গরজ বড় বালাই। কত বড় বড় উঁচু মাথাকে সে ধূলায় মিশিয়েছে। যে কারণে এখন ছোট ছোট কারবার টিকতে পারছে না, পৃথিবীব্যাপী combine গ'ড়ে উঠছে, ঠিক সেই কারণে এখন ছোট ছোট রাষ্ট্র টিকতে পারবে না, মহাদেশব্যাপী মহারাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতেই হবে।

অস্ট্রিয়ানদের দরিদ্র বললুম ব'লে যেন না মনে করেন ওরা আমাদের মতো দরিদ্র। ভিয়েনার পশ্চিমদিকে যাকে দারিদ্র্য বলা হয় ভিয়েনার পূর্বদিকে তার নাম সচ্ছলতা। অর্থাৎ ইউরোপের দরিদ্ররা এশিয়ার মধ্যবিত্ত। ইংলণ্ডে যাকে Slum বলে সেটা আমাদের উত্তর কলকাতার চেয়ে

কুৎসিত নয়। ইউরোপের পারিয়াদের দাবীর ফিরিস্তি আমাদের মধ্যবিত্তদের তাক লাগিয়ে দেয়—চড়া হারের মজুরি, বিনা পয়সায় চিকিৎসা, সস্তায় আমোদ প্রমোদের টিকিট, ঘন ঘন ছুটি, প্রচুর পেন্সন, আপদে বিপদে জীবনবীমা। আরো কত কী! জীবনের কাছে আমাদের দাবী কোনোমতে বংশ-রক্ষা করা ও মরে গেলে পিণ্ডিটুকু পাওয়া। এদের দাবী হয় রাজসিক জীবন নয় রাজসিক মৃত্যু। সামান্য কারণে এরা বিদ্রোহ ক'রে বসে, যত সহজে মরে তত সহজে মারে। জীবনের মূল্য যত প্রাণের মূল্য তত নয়। স্বল্পতম ভার সইতে পারে না ব'লে এদের সমাজ লোকসংখ্যা বাড়লেই যুদ্ধের অছিলা খোঁজে। এদের সমাজকে পাতাবাহারের গাছের মতো মাঝে মাঝে ছাঁটলে তবে তার স্বাস্থ্য থাকে। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শটি এদের কাছে এত মূল্যবান যে এই জন্যে যুদ্ধের আর বিরাম নেই, এই জন্যে এরা পিণ্ডাধিকারী না রেখে চিরকুমার অবস্থায় মরাটাকে অধর্ম জ্ঞান করে না, বেশি বয়সে বিয়ে করার আনুষঙ্গিক অন্যায়—হয় আত্মনিগ্রহ নয় অপকীর্তি—তো করেই, বিয়ের পরেও যে-কোনো মতে জন্ম-শাসন করে। এত বড় ইউরোপে কোথাও একটি পশু-পাখি-সাপ-ব্যাঙ-মশা-মাছি দেখতে পাওয়া শক্ত, অন্নের ভাগ দিতে পারবে না ব'লে অভক্ষ্য প্রাণীকে এরা মেরে সাবাড় করেছে ও ভক্ষ্য প্রাণীকে অন্নে পরিণত করেছে। একটা পোষা প্রাণীর যদি স্বাস্থ্য গেল তো তাকে এরা তখুনি গুলি ক'রে ভাবল দু'পক্ষের আপদ চুকল। অপরপক্ষে কিন্তু পোষা প্রাণীকে এরা রুগ্ন হ'তেই দেয় না, এত যত্নে রাখে। পীড়িত পশুকে দিয়ে গাড়ি টানালে কঠিন সাজা। হত্যা ব্যাপারটা যাতে এক মুহূর্তে সমাপ্ত হয়, পশুর পক্ষে যন্ত্রণাকর না হয়, সেজন্যে কসাইদের পিস্তল ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একটা মুমূর্ষু প্রাণী দশদিন ধ'রে—না, দশ ঘণ্টা ধ'রে—একটু একটু ক'রে মরছে ও অসহ্য যন্ত্রণা পাচ্ছে এ দৃশ্য ইউরোপে দেখবার জো নেই। নিজে যন্ত্রণা ভালোবাসে না ব'লে এরা যন্ত্রণা দিতে ভালোবাসে না। Vivisectionএর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে। ইউরোপের সব দেশেই এখন নিরামিষাশী-সংখ্যা বাড়ছে এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হয়েছে অনেকেই।

অনাবশ্যককে ইউরোপ নির্মমভাবে ছেঁটেছে। বুড়ো বুড়ীকেও না খাটিয়ে খেতে দেয় না। 'Dying in harness' তার জীবনের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকের বহরকেও সে বাড়াতে লেগেছে। যৌবন আগে ছিল গোটাকয়েক বছরের। এখন চাই শতবর্ষের যৌবন। এর জন্যে কত প্রাণী হত্যা করতে হবে, কত মানুষকে যুদ্ধে মারতে হবে, কত লোককে আর্থিক প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে হবে, কত অজাত শিশুকে জন্মাতে দেওয়া যাবে না, কত শিশুকে প্রকারান্তরে হত্যা করতে হবে। এত কাণ্ড করলে তবে হবে জন কয়েকের দীর্ঘ যৌবন, নিখুঁত স্বাচ্ছন্দ্য। দুর্ভিক্ষের চেয়ে আত্মনিগ্রহের চেয়ে শিশুমৃত্যুর চেয়ে চিররুগ্নতার চেয়ে এ ভালো, না, মন্দ?

দূর থেকে শুনতুম অস্ট্রিয়ানদের মরো মরো অবস্থা, তারা বুঝি আর বাঁচে না, দেখলুম তারা দিব্যি আছে, আমাদের চেয়ে সচ্ছল ভাবে। বুঝলুম ইউরোপের লোক সামান্য অসুবিধাকেও বাড়িয়ে দেখে, চার বেলার এক বেলা না খেতে পেলে বলে দুর্ভিক্ষে মারা গেলুম! লণ্ডনে সেদিন দশ বারোটা লোক নাকি অনশনে মরেছিল, তাই নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলীর আসন ট'লে উঠল। অথচ ওরা যদি যুদ্ধে মরতো তবে কেউ ওদের কথা ভুলেও ভাবত না। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের দুর্ভাবনা এই যে তাদের স্ত্রীরা পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে অনবদ্য স্বাস্থ্য অটুট রাখতে পারে না, তাদের স্বামীদের মজুরী এত কম! আর আমাদের বড়লোকের মেয়েরাও কুড়িতে বুড়ী হন। দূর থেকে আমাদের দেশটাকে মাঝে মাঝে মনে হয় একটা বিরাট Slow suicide club—এত আমাদের সহিষ্ণুতা, অল্পে সন্তোষ, আত্মনিগ্রহ, চক্ষুলজ্জা। আমরা বলি, নিজের ছাড়া বাকী সকলের উপকার করো। এরা বলে, 'Help yourself', কেননা 'God helps those who help themselves', অর্থাৎ নিজের মাথায় যদি তেল ঢালো তো

ভগবান তোমার তেলা মাথায় তেল ঢালবেন। বেকার সমস্যা নিয়ে ইংলণ্ড বড় বিব্রত। অথচ ইংলণ্ডের ধনীরা যদি একখানা ক'রে রুটি দেয় তবে ইংলণ্ডের যত বেকার আছে প্রত্যেকেই এক একজন মোহান্ত মহারাজের মতো বৈষ্ণবী নিয়ে পরম আহ্লাদে মালা জপতে পারে। শুধু তাই নয় ইংলণ্ডের ধনীরা ইচ্ছা করলেই বিশ ত্রিশ কোটি ইঁদুর বাঁদর প্রভৃতি কেষ্টর জীবের জন্যে একটা দেশব্যাপী চিড়িয়াখানাও স্থাপন করতে পারে। কিন্তু ভিক্ষা দিয়ে অপরের উপকার করা এ দেশের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—যোগ্যতা না দেখলে, বাধ্য না হ'লে কেউ দেয় না। ধনী দরিদ্রের মধ্যে এমন মন কষা-কষি আমাদের দেশে নেই, এত দলাদলিও আমাদের দেশে নেই। তবে সন্ধি করবার কায়দাও এরা জানে। সময় বুঝে সন্ধি না করলে দু'পক্ষের একপক্ষ অবশিষ্ট থাকবে না, একহাতে তালি বাজবে না। যুদ্ধটা হচ্ছে সহিংস সহযোগ, ও ব্যাপার একা একা হয় না। ভবিষ্যতে আবার লড়বে ব'লে শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কেননা শত্রুই হচ্ছে যুদ্ধের সহযোগী। যে জন্তুকে এরা শিকার করবে সে জন্তুকেও এরা বন জঙ্গলে পালন করে। খাবার জন্যেই এরা গোরু শূকরকে খাইয়ে মোটা করে।

ইউরোপের বহিঃপ্রকৃতি তার অন্তঃপ্রকৃতিকে কী পরিমাণ নিষ্করুণ করেছে তার একটা নিদর্শন ইউরোপের যে দেশে যাই সে দেশে দেখি। আমাদের যেমন চালের দোকান এদের তেমনি মাংসের দোকান; প্রায় প্রত্যেক অলিতে গলিতে আছেই, কষ্ট ক'রে খুঁজতে হয় না, আপনি খোঁচা দেয়। বেচারা মুসলমানেরা ক'টাই বা গোরু খায়, যদি বা খায় তবে ক'টা গোরুর ছাল-ছাড়া ধড় রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে সাজিয়ে ঝুলিয়ে রাখে, খদ্দের এলে করাত দিয়ে নির্দিষ্টস্থানের মাংস কেটে ওজন ক'রে প্যাক ক'রে বিক্রি করে? একসঙ্গে একশোটা মরা পাখি পাকা কলার মতো ঝুলছে কিংবা একশোটা মরা খরগোস! সাজিয়ে রাখাটাকে এরা একটা আর্ট ক'রে তুলেছে ব'লে বীভৎস ঠেকে না, ক্রমে ক্রমে কলা-মূলো-কপি-কুমড়ার মতো লাগে, আমিষ নিরামিষের পার্থক্যবোধ লোপ পায়। রাগ করবার উপায়ও নেই, কেননা মাছকেও তো আমরা কলা-মূলোর সামিল মনে ক'রে থাকি, বিশেষ ক'রে বাঙালীর চোখে মাছ একটা প্রাণীই নয়। প্রাণ সম্বন্ধে ঐ অসাড়তাটাকে আরেকটু প্রশ্রয় দিলে আমরাও ইউরোপীয় হ'য়ে পড়তুম, ঝুলন্ত হ্যাম দেখে—চোখে নয়—জিভে জল এসে পড়ত।

দোকান সাজানোতে ইংরেজ-জার্মান-অস্ট্রিয়ান-সুইস্‌রা ওস্তাদ। ফরাসীরা আমাদেরি মতো এলোমেলো। শুধু দোকান নয়, রেল স্টীমার হোটেল রেস্তরাঁ পথঘাট প্রদর্শনী—সর্বত্র একটি শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য উত্তর ইউরোপের বিশেষত্ব ব'লেই মনে হয়। ভিয়েনা ও প্যারিস এই দু'টি শহরের মধ্যে ভিয়েনা অনেক বেশি সৌষ্ঠবসম্পন্ন, যদিও এলোথেলো সৌন্দর্য প্যারিসেরই বেশি। ভিয়েনায় তো সেন নদীর মতো আঁকা বাঁকা নদী নেই, তার কূলে ব'সে মাছধরা নেই, তার কূলে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকা নেই, তার বাঁধে পুরোনো বইয়ের দোকানে ঝুঁকে পড়া বই-পাগলা বুড়ো নেই, তার আশেপাশের রাস্তায় রঙিন কার্পেট কাঁধে নিয়ে পায়চারি-করতে-থাকা ইজিপশিয়ান ফেরিওয়ালা নেই। এত রকম রাস্তার দৃশ্য (street sights) প্যারিসের মতো আর কোথায় আছে? সারাক্ষণ যেন অভিনয় চলেছে প্রতি রাস্তায়। অথচ নোংরা রাস্তা, মোড়ে জল জমেছে, ফুটপাথে দোকানের নিচে দোকান, তাতে একসঙ্গে একশো রকম জিনিস জট পাকিয়েছে, তরমুজ আর বাঁধা-কপির সঙ্গে খরগোস আর মাছ এবং গেঞ্জি আর পুলোভার। দোকানের গায়ে-গায়ে একটা কাফে আর মদের দোকান—সেও অকথ্য নোংরা এবং অগোছাল। এ-সব অনাচার ভিয়েনায় কিংবা লণ্ডনে নেই, কোলোনে কিংবা মিউনিকে নেই, বার্ণে কিংবা লুসার্ণে নেই। মার্সেল্‌সে আছে, ভার্সেল্‌সে আছে এবং সম্ভবতঃ সমস্ত ফ্রান্সে আছে। এবং সম্ভবতঃ সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপে। প্রদীপের নিচে অন্ধকারের

মতো ফরাসীদের নিখুঁত বাস্তুকলার সঙ্গে প্রচুর ধুলো কাদা যোগ দিয়েছে। ভিয়েনা চিত্রে ভাস্কর্যে বাস্তুকলায় প্যারিসের নকল, কিন্তু শৃঙ্খলায় ও পারিপাট্যে প্যারিসের বাড়া। অবস্থা-বিপর্যয় সত্ত্বেও তার এই গুণগুলি যায়নি, তার সোশ্যালিস্ট মিউনিসিপালিটির মেজাজটা বোধ হয় বাদশাহী।

বাদশাহের প্রাসাদগুলি অবশ্য এখন মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। দশ বছর আগে যে বাগানে বাদশাজাদীরা হাওয়া খেতেন এখন সেখানে গরীবের মেয়েরা খেলা করতে যায়। দশ বছর আগে যে-সব ঘরে বাদশাহ্ শয়ন বিশ্রাম ভোজন করতেন, যে-সব ঘরে বেগম সখীদের সঙ্গে গল্প করতেন বা অতিথিচর্যা করতেন, বা নাচের মজলিস ডাকতেন, সে-সব ঘর এখন সামান্য কিছু দর্শনী দিলে কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তার লোকের সম্পত্তি। দশ বছর আগে সাধারণের চোখে যা আলাদীনের প্রদীপের মতো ছিল তাই এখন ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ তারই মতো সাধারণ মানুষকে বাদশাহ্ পদবী দিয়ে তারই গৃহের মতো সাধারণ গৃহকে অমরাবতী কল্পনা করেছিল এবং সমস্ত ব্যাপারটির গায়ে পুরাণ ইতিহাসে রূপকথার সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সেটিকে নিজের প্রতিদিনের জীবন থেকে লক্ষ যোজন দূরে রেখেছিল। ঈশ্বর-ভক্তির মতো রাজভক্তিও মানুষের নিজের তৃপ্তির জন্যে; এবং একটা কাল্পনিক দূরত্বই তার প্রাণ। আজ সে-দূরত্ব ঘুচে গেছে; প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে যে রাজপ্রাসাদটা বাহির থেকে হাঁ ক'রে দেখবার মতো এমন কিছু মায়াপুরী নয়, বারো আনা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে নিতান্তই রক্ত মাংসের মানুষের আহার-নিদ্রার স্থান, এবং ছোট ছোট মান অভিমান পরশ্রীকাতরতার দাগে দাগী। মানুষে মানুষে যে কাল্পনিক ব্যবধান এত কাল এত কাব্য ও এত কলহ উদ্রেক করেছিল আজ মনে হচ্ছে—সব মিথ্যা, সব স্বপ্ন। এবার মানুষ যে নতুন জগতের দ্বারে দাঁড়িয়েছে সে-জগৎ দিনের আলোর জগৎ, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা তার নাড়ীনক্ষত্র জানা, কোথাও একটু কল্পনার অবকাশ নেই, নিদারুণ মোহভঙ্গের মধ্যে তার পথ। কোন্ রাজপ্রাসাদকে দেখে স্বর্গ কল্পনা করবে? কোন্ রাজাকে দেখে দেবতা? কোন্ রাজপুত্রকে নিয়ে উপকথা রচনা করবে? কোন্ রাজবংশকে নিয়ে কাব্য? তাই শেক্স্পীয়রও আর হয় না, রবীন্দ্রনাথও আর হবে না।

॥ চোদ্দ ॥

যতগুলো রাজপ্রাসাদ দেখলুম তাদের কোনোটাই মনে ধরল না, কেননা কোনোটাই যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ নয়। পোশাকে প্রাসাদে যানে বাহনে বেগমে গোলামে আমাদের রাজরাজড়ারাই দুনিয়ার সেরা। আগ্রা দিল্লী লক্ষ্ণৌ বেনারসের সঙ্গে ভার্সেল্স ভিয়েনা মিউনিক বুডাপেস্টের এইখানেই হার যে রাজাতে প্রজাতে ভারতবর্ষে যেমন আসমান জমীন ফরক্, সম্ভবতঃ এক রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোথাও তেমন ছিল না। আমরা ধাতে এক্স্ট্রীমিস্ট। আমরা রাজা বাদশা ও ভিখারী ফকির ছাড়া কারুকে সম্মান করিনে। তাই আমাদের দেশে ভোগের নামে লোকে মূর্ছা যায়, ভাবে না জানি কোন্ রাজরাজড়ার মতো ভোগ করতে গিয়ে ভিখারীতে সমাজ ভরিয়ে দেবে! আর ত্যাগের নাম করলে ধড়ে প্রাণ আসে,—হাঁ, সমাজের পাঁচজনের উপরে লোকটার দরদ আছে বটে। দেখছ না, আমাদেরি জন্যে উনি কৌপীন ধরলেন।

ভোগের আড়ম্বর ও ত্যাগের আড়ম্বর বোধ হয় কেবল ভারতবর্ষের নয়, প্রখর সূর্যালোকিত

দেশগুলির দুর্ভাগ্য। ইজিপ্টে ও গ্রীসে সমাজের একটা ভাগ দাসত্ব করেছে, অপর ভাগ সেই দাসত্বের উপরে পিরামিড খাড়া করেছে। অতটা একস্ট্রীমিজ্‌ম্‌ প্রকৃতির সহ্য হয় না—ইজিপ্ট ও গ্রীস ট'লে পড়েছে। দাসও মরেছে, দাসের রাজাও। ভারতবর্ষেও কোনো একটা রাজবংশ দু'চার পুরুষের বেশি টেকেনি, যত বিজেতা এসেছে সবাই দু'চার পুরুষ পরে বিজিত হয়েছে। ইংরেজের বেলা এর ব্যতিক্রম হলো, কেননা ইংরেজ ভারতবর্ষের জল-হাওয়া কিংবা ধাত কোনোটাকেই স্বীকার করেনি, ইংরেজ দূর থেকে শাসন করে এবং ঘরের প্রভাববশত মনে প্রাণে নাতিশীতোষ্ণ থাকে। ইংরেজের temper গরমও নয়, নরমও নয়; অসহিষ্ণুও নয়, সহিষ্ণুও নয়। ইংরেজ আশ্চর্য রকম মধ্যপন্থী। তবে এও ঠিক যে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি মাঝারি। এই মাঝারিত্বকে লোকে গালাগাল দিয়ে বলে conservatism; আসলে কিন্তু ইংরেজের conservatism স্থাণুত্ব নয়, ধীরে সুস্থে চলা, slow but sure—কচ্ছপ-গতি। সূর্যের আলোর মদে মাতাল ফরাসীরা কতকটা আমাদেরি মতো একস্ট্রীমিস্ট, তাই তারা সুদীর্ঘকাল মহাশয়ের মতো যাই সওয়াবে তাই সয়, অবশেষে একদিন এট্‌না আগ্নেয়গিরির মতো অগ্নিবৃষ্টি ক'রে আবার চুপচাপ ব'সে মদে চুমুক দেয়। তার ফলে খরগোসকে ছাড়িয়ে কচ্ছপ এগিয়ে যায়।

তবে ফরাসী বলো জার্মান বলো ইংরেজ বলো—কেউ আমাদের মতো ছোটতে বড়তে আসমান জমীন ব্যবধান ঘটতে দেয় না, সময় থাকতে প্রতিকার করে। এই যে সোশ্যালিস্ট মুভ্‌মেণ্ট, এটার মতো মুভ্‌মেণ্ট প্রতি শতাব্দীতে ইউরোপের প্রতি দেশে দেখা দিয়েছে। আজ যদি এ মুভ্‌মেণ্ট অতি বৃহৎ হ'য়ে থাকে তবে যার বিরুদ্ধে এ মুভ্‌মেণ্ট সেও আজ অতি বৃহৎ হ'য়ে উঠেছে। সমাজের একটা পা আজ বিপর্যয় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে ব'লেই অপর পা'টা বিপর্যয় লাফ দিয়ে সঙ্গ রাখতে ব্যগ্র। ইউরোপের ধনীরা আজকের এই উন্মুক্ত পৃথিবী থেকে যে প্রচুর ধন আহরণ ক'রে ঘরে আনছে, ইউরোপের শ্রমিকরা সেই প্রচুর ধনেরই একটা সমানানুপাত বণ্টন চায়।

এক হাজার বছর আগেও আমদের দেশে বৈরাগ্যাভিমানী ছিল বিস্তর, এরা সমাজের সেই ভাগটা যে ভাগ বৃহৎ ব্যবধান সইতে না পেরে সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ির মতো আকাশে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়। এরা ধনীলোকের ধনভার লাঘব ক'রে দরিদ্রের দারিদ্রভার লাঘব করেনি, কেননা সেজন্যে অনেক দুঃখ ভুগতে হয় এবং কোনোদিন সে ভোগের শেষ নেই। প্রকৃতির অনাদ্যন্ত এই যে সাধনা এই ভারসাম্যের সাধনায় প্রকৃতির সঙ্গে সন্ন্যাসী যোগ দেয় না, সে চিরকালের মতো সিদ্ধি চায়। যে জগতে প্রতিদিন বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র ভাঙছে, মহাশূন্যের গর্ভে বড় বড় নৌকাডুবি ঘটছে, প্রতিদিন ছোট ছোট অণুপরমাণু থেকে নব নব গ্রহ নক্ষত্র গ'ড়ে উঠছে, ছোট ছোট প্রবালকীট মিলে অপূর্ব প্রবালদ্বীপ গেঁথে তুলছে—এই প্রতিদিনের খেলাঘরে সন্ন্যাসীকে কেউ পাবে না। সে তার কাঁথা-কম্বল-ছাল-বল্কল আঁকড়ে ধ'রে বিবাগী হ'য়ে গেছে। এদিকে মহারাজের অন্তঃপুরে রাণীমক্ষিকার সংখ্যা বাড়ছে এবং দাসমক্ষিকাদের ক্রন্দনগুঞ্জনে সংসারচক্র মুখর হলো। প্রাসাদে আর কুটীরে ভারতবর্ষের মাটি আর মর্ত্য নয়, একাধারে স্বর্গ—পাতাল। আল্পস পর্বত ও ভূমধ্য সাগর সহ্য হয়, কেননা উঁচু নিচু হ'লেও তাদের ব্যবধান দুরতিক্রম্য নয়, কিন্তু হিমালয় পর্বত ও ভারত সাগর সহ্য হয় না। উপরে ত্রিশ হাজার ফিট ও নিচে বিশ হাজার ফিট—পঞ্চাশ হাজার ফিটের ব্যবধান দুরতিক্রম্য। ভারতবর্ষের রাজা মহারাজারা যে চালে থাকেন ইউরোপের সম্রাটদের পক্ষেও তা স্বপ্ন এবং ভারতবর্ষের চাষা-মজুররা যে চালে থাকে ইউরোপের ভিখারীদের পক্ষেও তা দুঃস্বপ্ন। এবং এই ব্যাপার খুব সম্ভব হাজার হাজার বছর থেকে চ'লে আসছে। কেন না আমরা চিরকাল Intemperate Zoneএর লোক। আর আমাদের দেশটাও চিরকাল এত বেশি উঁচু নিচু যে

আমাদের চোখে জীবনের বিশ্রী রকম উঁচু নিচুও একটা সহজ উপমার মতো স্বাভাবিক ঠেকে।

রাজপ্রাসাদগুলি পরিদর্শন করবার সময় লক্ষ্য করেছি সেগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর দুঃখ সুখের নীড়—এক একটি 'home'। ইংরেজী 'home' কথাটির ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই, কেননা 'home' কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠ-পাথরের রূপান্তরিত প্রেম। ইংরেজ যুবক যখন বিবাহ করে তখন তার স্ত্রী তার কাছে এমন একটি গুহা প্রত্যাশা করে যেখানে সে সিংহীর মতো স্বাধীন, যেখানে তার স্বামী পর্যন্ত তার অতিথি, শাশুড়ী শ্বশুর জা দেবর তার পক্ষে ততখানি দূর, শাশুড়ী শ্বশুর শ্যালক শ্যালিকা তার স্বামীর পক্ষে যতখানি। গুহার বাইরে তার স্বামীর এলাকা, গুহার ভিতরে তার নিজের; কেউ কারুর এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। বাড়িতে একটা চাকর বাহাল করবার অধিকারও স্বামীর নেই, কিংবা চাকরকে জবাব দেবার। বাজার করাটাও স্ত্রীর এলাকা, কেবল দাম দেবার বেলা স্বামীকে ডাক পড়ে। এক আপিসে এবং ক্লাবে ছাড়া স্বামীকে কেউ চেনে না, আসবাবের দোকানে গহনার দোকানে পোশাকের দোকানে ধোপার বাড়িতে ছেলে মেয়েদের ইস্কুলে বাড়িওয়ালার কাছে নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে পার্টিতে নাচে সর্বত্র স্ত্রীর বৈজয়ন্তী। এ সমস্তই 'home'এর এলাকায় পড়ে। অতএব 'home'কে আপনারা কেউ চারখানা দেয়াল ও একখানা শিলিং ঠাওরাবেন না। ছেলের দোলনা থেকে ছেলের বাপের খাবার টেবিল পর্যন্ত যাঁর রাণীত্ব তিনি সুগৃহিণী নন, সমাজে তাঁর নিন্দা, তিনি কুনো। গির্জায়, charity bazaarএ, সমাজসেবার সব আয়োজনে যাঁর হাত (বা হস্তক্ষেপ) তিনিই সুগৃহিণী।

এত যদি স্ত্রীর অধিকার তবে feminismএর ঝড় উঠল কেন? কারণ industrial revolutionএর ফলে সমাজে একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে, ছেলেরা সারাজীবন দেশ দেশান্তরে ঘুরছে, মেয়েরা 'home' করবে কাকে নিয়ে? 'Home'এর মধ্যে একটা স্থায়িত্বের ভাব আছে, স্থানিক স্থায়িত্ব না হোক, সাময়িক স্থায়িত্ব। প্রেম স্থায়ী না হ'লে 'home' হয় না। স্বামী স্ত্রী ঠাঁই-ঠাঁই হ'লেও ভাবনা ছিল না, দু'জনের হৃদয়ও যে ঠাঁই-ঠাঁই হ'তে আরম্ভ করেছে। আমরা হ'লে বলতুম, দুয়ো-সুয়ো চলুক না? অন্ততঃ সদর মফঃস্বল? মুশকিল এই যে, এতটা পতিব্রতা হ'তে এ দেশের মেয়েরা এখনও শিখল না। সুয়োকে কোথায় বোন ব'লে আপনার ক'রে নেবে ও স্বামীর শয্যায় পাঠিয়ে দেবীর পার্ট প্লে করবে—আরে ছি ছি, রাম রাম, স্বামীদেবতাকে বিগ্যামীর অপরাধে পুলিশে দেয়! আর মফঃস্বলের খবর পেলে, একেবারে ডিভোর্স কোর্ট—ধিক! এরি নাম সভ্যতা!

ইংরেজ-জার্মান-স্কাণ্ডিনেভিয়ান মেয়েরা নিজের পাওনাগণ্ডাটি চিরকাল বুঝে নিয়েছে। অতীতকালে এরা স্বামীকে বলেছে, তোমাকেই আমি চিনি, তোমার মা-বাবাকে না। তাই এদের স্বামীবা পিতৃ-পিতামহের সনাতন ট্রাইব ছেড়ে স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে ফ্যামিলি সৃষ্টি করেছে—ফ্যামিলি ও পরিবার এক কথা নয়, যেমন 'home' ও গৃহ এক কথা নয়; এই মজ্জাগত পাওনা-গণ্ডা বুঝে নেবার স্বভাব থেকেই বর্তমান কালে feminismএর উৎপত্তি। এর মূল সুরটি এই যে, 'home'এর দায়িত্ব যখন তোমরা স্বীকার করছ না তখন আমরাও স্বীকার করব না, তোমরা মুক্ত হও তো আমরাও মুক্ত হই। আপনারা বলবেন, সহিষ্ণুতাই নারীর ধর্ম, মা বসুমতী কত সইছেন! কিন্তু ম্লেচ্ছ মেয়েরা এত বড় তত্ত্বকথাটা বোঝে না, তাই তাদের স্বামীদের পদভারে মা বসুমতী টলমল, এবং তাদের পদভারে তাদের স্বামীরা শিবের মতো চিৎপাত।

ভিয়েনার রাজপ্রাসাদগুলিতে রাণী মারিয়া থেরেসার ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। রাণী বলতে অসপত্ন রাণী বুঝতে হবে—এবং জা-শাশুড়ী-হীন। এবং সামাজিক প্রাণী। দিল্লী—আগ্রা—ফতেপুর সিক্রীতে বেগমের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন-বিশেষ যদি বা দেখা যায় তবু ও-সব রাজপ্রাসাদকে 'home' মনে

করতে পারিনে। এবং সামাজিক প্রাণী হিসাবে বেগমদের অস্তিত্ব ছিল না। সমাজের পাঁচজন পুরুষ তাঁদের চোখে দেখেননি, তাঁদের আতিথ্য পাননি; রাজন্যশ্রেণীর পাঁচজন পুরুষ তাঁদের সঙ্গেও দু'দণ্ড আলাপ করতে পারেননি, দু'দণ্ড নাচবার আস্পর্ধা রাখেননি। বাঁদী ও বান্দায় ভরা বিশাল বেগম-মহলে বাদশা মাসে একবার পূর্ণচন্দ্রের মতো উদয় হন, পুত্র কন্যারা মা-বাবার সঙ্গে দু'বেলা আহার করবার সৌভাগ্য না পেয়ে দাস দাসীর প্রভাবে বাড়েন। এমন গৃহকে গৃহিণীর সৃষ্টি বলতে প্রবৃত্তি হয় না। তাই প্রাচ্য রাজপ্রাসাদ আড়ম্বরে অপ্সরাপুরীর মতো হ'য়েও দুঃখে সুখে নীড়ের মতো নয়। এখানে ব'লে রাখা ভালো যে, লুই-রাজার বা নেপোলিয়নেরও মফঃস্বল ছিল, কিন্তু সেটা নিপাতন ও সমাজের স্বীকৃতি পায়নি। বস্তুত প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে রাজার সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ এক নয়। আমাদের রাজারা সমাজের আইন-কানুনের উপরে, তাঁরা সমাজহীন। এদের রাজারা সামাজিক মানুষ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত পোপের নির্দেশ অনুসারে রাজা ও প্রজা উভয়েই চালিত হতো। ইংলণ্ডের রাজা চার্চ অব ইংলণ্ড ও পার্লামেন্টের কাছে এতটা দায়ী যে তাঁর বিবাহ বা বিবাহচ্ছেদ পর্যন্ত সমাজের এই দু'টি হাতে। রাশিয়ার অত বড় স্বেচ্ছাচারী জারও স্ত্রী বিদ্যমানে পুনর্বার বিবাহ করতে পারতেন না কিংবা সুয়োরাণীর ছেলেকে রাজ্যাধিকার দিয়ে যেতে পারতেন না। সে-ক্ষেত্রে তিনি গ্রীক চার্চের নির্দেশসাপেক্ষ। তবে এও অস্বীকার করছিনে যে পোপ বা প্যাট্রিয়ার্করা মাঝে মাঝে ঘুষ খেয়ে ছাড়পত্র লিখে দিতেন। কিন্তু সেটা নিপাতন ও তার বিরুদ্ধে সমাজের বিবেক চিরদিন বিদ্রোহ করেছে। প্রোটেস্টান্টিজ্‌ম্ তো এই জাতীয় একটা বিদ্রোহ! ওটাও আধুনিক সোশ্যালিস্ট মুভমেণ্ট বা এর আগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই মতো মানুষে মানুষে দুরতিক্রম ব্যবধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আসবাব-শিল্পের জন্যে ভিয়েনার খ্যাতি আছে। এই মুহূর্তে ইউরোপের সর্বত্র আসবাব-শিল্পের বিপ্লব চলেছে। কোলোনে মিউনিকে ও ভিয়েনায় নতুন ধরনের ঘর ও নতুন ধরনের আসবাবের কত রকম নমুনা দেখা গেল। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই এখন দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের মাঝখান থেকে আর্থিক ব্যবধান ঘুচে গেছে। চাষা-মজুরদের অবস্থার যতটা উন্নতি হয়েছে মধ্যবিত্তদের অবস্থার ততটা উন্নতি হয়নি। কাজেই দুই শ্রেণীর জন্যে অল্প দামের মধ্যে মজবুত অথচ বৈশিষ্ট্যসূচক বাড়ি ও আসবাব দরকার হয়েছে লাখে লাখে। যার যে নমুনা পছন্দ হয় সে অবিলম্বে জিনিসটি পায়। Large scale productionএর নীতি অনুসারে খরচ বেশি পড়ে না, হাঙ্গামাও নেই, পছন্দ করবার পক্ষে নমুনাও যথেষ্ট। মনে রাখতে হবে যে ঘরের সাইজ ও রঙ ইত্যাদি অনুসারে আসবাবের সাইজ, রঙ, রেখা ও গড়ন। দুই দিকেই বিপ্লব ঘটেছে—বাড়ি ও আসবাব দুই দিকের দুই বিপ্লব পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে। দুই-ই সরল, লঘুভার, নাতিবৃহৎ, বাতালোকপূর্ণ, বিরলবসতি. নিরলঙ্কার। মানুষের রুচি এখন সভ্যতার অতিবুদ্ধিকে ছেড়ে প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত বলকারক সত্যগুলির দ্বারস্থ হয়েছে। সেই জন্যে নতুন ধরনের চেয়ার, টেবিল, খাট বা দেরাজের উপরে পাগলামির ছাপ যদি বা দেখতে পাওয়া যায় চালাকির মারপ্যাঁচ বা বড়মানুষীর চোখে-আঙুল-দেওয়া ভাব এক রকম অদৃশ্য। এর একটা কারণ, আগে যে-শ্রেণী Slumএ থাকত তাদেরও চাহিদা অনুসারে এ সবের যোগান। এবং তাদের রুচি অতি সূক্ষ্ম বা অতি খুঁতখুঁতে নয় ব'লে তাদের সঙ্গে তাদের নামমাত্র উপরিতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেও রুচি মেলাতে হচ্ছে। Mass productionএর মজা এই যে চাষা-মজুরের সিকিটা দুয়ানিটার জন্যে যে সিনেমার ফিল্ম—তার রুচির সঙ্গে কলেজের ছাত্রের রুচি না মেলে তো কলেজের ছাত্র নাচার। সিকি দুয়ানির দিক থেকে কলেজের ছাত্র ও চাষা-মজুর দু'পক্ষই সমস্কন্ধ, অগত্যা রুচির দিক থেকেও দু'পক্ষকে সাম্যবাদী হতে হবে।

।। পনেরো ।।

ইংলণ্ড দেশটা যে কী সাংঘাতিক ছোট একটু ঘুরে ফিরে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ছোট তো আমাদের এক একটা প্রদেশও, কিন্তু তাদের ছোটত্ব মানুষের হাতে গড়া। আর ইংলণ্ডের ছোটত্ব নৈসর্গিক। এর সর্বাঙ্গ ঘিরেছে আঁট পোশাকের মতো সমুদ্র, এর মাথার উপরে চাপ দিয়েছে টুপির মতো আকাশ। আকাশ? না, আকাশ বলতে আমরা যা বুঝি তা এ দেশে নেই। সেইজন্যেই তো দেশটাকে অস্বাভাবিক ছোট বোধ হয়। একটা অন্ধকূপ বিশেষ। এর ভিতরে যারা থাকে তারা পরস্পরের বড্ড কাছাকাছি থাকে, পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গোনে। ইংলণ্ডে যখনি যে এসেছে সে বেমালুম ইংরেজ হ'য়ে গেছে। এর উদরের জারক রস এতই প্রবল যে আমিষ ও নিরামিষ দুধ ও তামাক যখন যাই পেয়েছে তখন তাই পরিপাক ক'রে এক রক্ত মাংসে পরিণত করেছে। ইংলণ্ডের আশ্চর্য একতার কারণ ইংলণ্ড দেশটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় অত্যন্ত আঁটসাট ও ছোট।

ভারতবর্ষে যখন সারাদিনের খাটুনির শেষে তারা-ভরা আকাশের তলে ব'সে নিঃশ্বাস ছাড়ি তখন সে নিঃশ্বাস লক্ষ যোজন দূরে নিঃসীম শূন্যে মিলিয়ে যায়, মনে হয় না যে ভারতবর্ষ আমাদের বেঁধে রেখেছে। আমাদের বিশাল দেশ, বিরাট আকাশ; আমরা কোটি তারকার সঙ্গ পেয়ে ধন্য, মানবসংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতাকে আমরা তুচ্ছ ব'লেই জানি। আর এরা? এদের কিবা রাত্রি কিবা দিন—সমস্ত জীবনটাই একটা non-stop dance কিংবা non-stop flight। ছন্দহীন যতিহীন বেতালা জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অশ্রান্ত বন্যাবেগ, এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে বসলে প্রতিযোগীরা লাথি মেরে এগিয়ে যায়, বৃদ্ধ বয়সেও অন্নচিন্তায় অস্থির ক'রে রাখে। দিনের পরে কখন রাত আসে, রাতের শেষ কোনো দিন হয় কি না, ঠিক নেই। এ দেশের সূর্য সাম্রাজ্য পাহারা দিতে বেরিয়ে স্বরাজ্যে হাজিরা দেবার সময় পায় না। মাটি ও আকাশের মাঝখানে মেঘ ও কুয়াশার প্রাচীর, মানুষের প্রাণের কথা তারালোকে পৌঁছায় না, ঘরের কোণে ছোট ছোট দুঃখ সুখকে মহাজগতের বড় বড় দুঃখ সুখের সঙ্গে মিলিয়ে ধরবার সুযোগ মেলে না, 'the world is too much with us!'

তারপরে এদের আকাশের আঁধার এদের মনকেও আঁধার করেছে, হাৎড়াতে হাৎড়াতে যখন যেটুকু সত্য পায় তখন সেইটুকু এদের কাছে সব, এরা কত বড় একটা সাম্রাজ্য চালায় নিজেরাই জানে না, সাম্রাজ্য এরা গড়েছে অন্যমনস্ক ভাবে। খাঁটি প্রাদেশিকতা যাকে বলে তা দ্বীপবাসীতেই সম্ভব এবং আকাশহীন দ্বীপবাসীতে। এরা তিন dimensionএর দ্বীপবাসী। ইংলণ্ডে দলাদলির অন্ত নেই, কিন্তু প্রত্যেক দলই স্বভাবে ইংরেজ অর্থাৎ আকাশহীন দ্বীপবাসী। কোনো একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন ইংলণ্ডে টিকবে না, খ্রীস্টধর্ম টিকল না, সোশ্যালিজ্‌ম্ টিকছে না। একদিন যেমন চার্চ অব্ ইংলণ্ড নিজস্ব খ্রীস্টধর্ম সৃষ্টি করল আজ তেমনি লেবার-পার্টি নিজস্ব সোশ্যালিজ্‌ম্ সৃষ্টি করছে। নির্জলা ন্যাশনালিজ্‌ম্ ইংলণ্ডেই প্রথম সম্ভব হয়, ইংলণ্ডেই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এর কারণ নৈসর্গিক। তবে নিসর্গের উপরে খোদকারী করছে মানুষ। জাহাজের যা সাধ্যাতীত ছিল এরোপ্লেন তাকে সাধ্যায়ত্ত করছে, channel tunnel হয়তো অসাধ্য সাধন করবে, ইংলণ্ড আর দ্বীপ থাকবে না। কিন্তু মেঘের প্রাচীর?

দক্ষিণ ইংলণ্ডের নানা স্থানে ঘুরে ফিরে দেখা গেল। নিসর্গ ও মানুষ মিলে অঞ্চলটাকে সর্বতোভাবে একাকার ক'রে দিয়েছে। একই রকম অগুনতি ছোট শহর, প্রত্যেকটাতে একই

হোটেলের শাখা-হোটেল ও একই দোকানের শাখা-দোকান। স্থানীয় সংবাদপত্র ও থিয়েটারও বহুদূর থেকে চালিত। রেল ও বাস যদিও অগুনতি তবু একই কোম্পানীর। একই আবহাওয়া, একই রকম ছিঁচকাঁদুনে আকাশ, অসমতল ভূমি। মানুষও বাইরে থেকে একই রকম—পোশাকে চলনে বুলিতে আদব কায়দায় সামান্য যা ইতর বিশেষ তা বিদেশীর চোখে স্পষ্ট নয়। ঘন ঘন স্থান পরিবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি মানুষ ইংরেজ হ'য়ে গেছে, প্লিমাথ্-ওয়ালা বা টর্কী-ওয়ালা ব'লে কেউ নেই। অধিকাংশ বাড়িই এখন বাসা, পূর্বপুরুষের ভিটা মাটির মর্যাদা যদি থাকে তো পূর্বপুরুষের গোরস্থান। বাড়ির মালিকরা হয় বাড়িতে থাকেন না, নয় বাড়িতে বোর্ডিং হাউস খোলেন। এই সব শহরের সর্বপ্রধান ব্যবসায় অতিথিচর্চা। অতিথিরা হয় ছুটিতে বেড়াতে আসে, নয় বাণিজ্যসংক্রান্ত কাজে আসে। যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদেরও দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, তারা হয় দূরস্থিত পিতামাতার বোর্ডিং স্কুলে পড়তে থাকা সন্তান, নয় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পেন্সনপ্রাপ্ত পিতামাতা। ছোটদের জন্যে বোর্ডিং স্কুল ও বুড়োদের জন্যে নার্সিং হোম সমুদ্রতীরবর্তী বহুশত শহরে ও গ্রামে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান।

ইংলণ্ড যে দিন দিন socialised হ'য়ে উঠছে, এর প্রমাণ ইংলণ্ডের এই সব বোর্ডিং স্কুল নার্সিং হোম হাসপাতাল পাব্লিক লাইব্রেরী ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান জনসাধারণের চাঁদায় চলছে, এসব অনুষ্ঠানে যারা থাকে তারা অনেক সময় জনসাধারণের চাঁদায় থাকে, এসব অনুষ্ঠানের শিক্ষায় বা চিকিৎসায় কোনো একজনের প্রতি পক্ষপাত নেই। গভর্ণমেণ্টের খরচে চললেও এগুলি এমনি ভাবেই চলত। যে দেশে জনসাধারণ যা গভর্ণমেণ্টও তাই, সে দেশে জনসাধারণের চাঁদায় চালিত বে-সরকারী হাসপাতাল ও জনসাধারণের খাজনায় চালিত সরকারী হাসপাতালে তফাৎ কতটুকু? ইংলণ্ডের অসচ্ছলরা চার্চ প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে যে চাঁদা পায় গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় সচ্ছলদের কাছ থেকে সেই চাঁদাই পেতে চায়, যদিও তার নাম চাঁদা হবে না, হবে পাওনা। কিন্তু সেই পাওনা ও এই পাওনা তলে তলে একই জিনিস—এমনি বোর্ডিং স্কুলের অপক্ষপাত শিক্ষা, হাসপাতালের অপক্ষপাত চিকিৎসা, নার্সিং হোমের অপক্ষপাত সেবা। এতে আত্মীয় স্বজনের হাত নেই, হৃদয় নেই, এর উপরে সমাজের ফরমাস প্রবল, ব্যক্তির রুচি-অরুচি ক্ষীণ। সমাজের অলিখিত হুকুমে মা তার কোলের ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে দেয়, রুগ্ন ছেলেকে হাসপাতালে রাখে। নিজের হৃদয়ের দাবীকে সমাজের দশজনের মতো নিজেও সেণ্টিমেণ্টাল্ ব'লে উড়িয়ে দেয়।

এই সব হোটেল বোর্ডিং হাউস স্কুল ও নার্সিং হোম সাধারণত মেয়েদের হাতে। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো এরা homeএর সাধ হোটেলে ও আত্মীয় স্বজনের সাধ অতিথি নিয়ে মেটায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একই আদর্শই উদযাপিত হ'তে চলল। নাম নিয়ে মারামারি ক'রে ফল নেই, এও একরকম সোশ্যালিজ্‌ম্। তলিয়ে দেখলে সোশ্যালিজ্‌মের আসল কথাটা কি এই নয় যে সমাজ ও ব্যক্তির মাঝখানে মধ্যস্থ থাকবে না, সম্পর্কে ও সম্পত্তিতে 'private' অঙ্কিত বেড়া থাকবে না? যে জননী জন্মের পর মুহূর্তে সন্তানকে Dr. Barnardo's Homeএ ত্যাগ করে ও যে জননী জন্মের অল্পকাল পরে সন্তানকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয় তাদের একজনের সন্তানের খরচা বহন করে বদান্য জনসাধারণ, অপর জনের সন্তানের খরচা বহন করে দূরস্থিত পিতামাতা; শিক্ষা উভয়েই পায় অনাত্মীয়দের অপক্ষপাত তত্ত্বাবধানে, পক্ষপাতী পিতামাতার সান্নিধ্য কেউই পায় না অধিকাংশ স্থলে। এদের আর্থিক অবস্থার উনিশ বিশ থাকলেও এরা সোজাসুজি সমাজের হাতে গড়া।

প্রবীণাদের মুখে চোখে কথাবার্তায় এমন একটি স্নিগ্ধতা ও শান্তি লক্ষ্য করা গেল যা কোনো

দেশবিশেষের বিশেষত্ব নয়, যা যুগবিশেষের বিশেষত্ব। অস্তগামী চন্দ্রের স্নিগ্ধতার মতো ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-মুখের স্নিগ্ধতারও দিন শেষ হ'য়ে এলো। এর পরে বিংশ শতাব্দীর স্বতন্ত্রা নারীর প্রখর জ্বালা, লাবণ্যহীন পিপাসাময় দুঃসাহসিক অরুণরাগ। ভারতের কল্যাণী নারীকে ভিক্টোরীয় ইংরেজ নারীতে কত স্থলে প্রত্যক্ষ করেছি, বহু-সহোদরবিশিষ্ট প্রশস্ত গৃহাঙ্গনে এঁদের বাল্যকাল কেটেছে, যন্ত্রমুখর জীবন-সংগ্রামে জীবিকার জন্যে এঁরা প্রাণপণ করেননি, পাঁচ জনকে খাইয়ে খুশী ক'রেই এঁদের তৃপ্তি, জগতের সামান্যই এঁদের জানেন ও একটি কোণেই এঁদের স্থিতি, উদ্যানলতার ভঙ্গি এঁদের স্বভাবে ও উদ্যানপুষ্পের সুরভি এঁদের আচরণে। অনূঢ়া হ'লেও এঁরা গৃহিণী নারী, এঁরা স্বতন্ত্রা নারী নন। আর এঁদের পরবর্তিনীরা ফ্ল্যাটে বা বোর্ডিং হাউসে থাকা সাবধানী পিতামাতার স্বল্পসহোদর বিশিষ্ট সন্তান, প্রিয় জনের সঙ্গে প্রাত্যহিক দান প্রতিদান কলহ মিলনে যে শিক্ষা হয় সে শিক্ষা অল্পবয়স থেকে বোর্ডিং স্কুলে বাস ক'রে হয়নি। তারপরে জীবিকার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে আধুনিক সভ্যতার বেড়াজালে এঁরা যখন হরিণীর মতো ছটফট করেন তখন স্বভাবে আসে বন্যতা, আচরণে আসে ব্যস্ততা এবং বিবাহের সৌভাগ্য ঘটলেও নীরব নিভৃত জীবনে মন বসে না, মন চায় অভ্যস্ত মত্ততা, আগের মতো খাটুনি, আগের মতো নাচ, আগের মতো সন্তানঘটিত দুশ্চিন্তার প্রতি বিতৃষ্ণা, স্বামীঘটিত তন্ময়তার প্রতি অনিচ্ছা। এ নারী গৃহিণী নারী নয় স্বতন্ত্রা নারী। সমাজের কাজে এর অতুল উৎসাহ, প্রভূত যোগ্যতা, নার্স হিসাবে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে হোটেলের ম্যানেজারেস্ হিসাবে আপিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হিসাবে এ নারী নিখুঁত। সচিব সখী ও শিষ্যারূপে এ নারী পুরুষের শ্রদ্ধা জিনে নিয়েছে, আধুনিক সভ্যতার সর্বঘটে বিদ্যমান দেখি যাকে সে নারী এই স্বতন্ত্রা নারী—গৃহহীন, পক্ষপাতহীন, জনহিতপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যে অটল। এ নারী সব পুরুষের সহকর্মিণী, কোনো একজনের রাণী ও দাসী নয়, সকলের সম্মানের পাত্রী, কোনো একজনের প্রেম ও ঘৃণার পাত্রী নয়। কথাটা অবিশ্বাস্য শোনালেও বলতে হবে যে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় socialisation of women চলেছে, ভারতবর্ষও বাদ যায়নি। এর ফলে কাব্যলোক থেকে প্রেয়সী নারী অন্তর্হিত হলো, তার স্থান নিল সঙ্গিনী নারী, passionএর স্থানে এল understanding।

যুগলক্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ইংরেজ নারীর কতক বিশেষত্ব আছে—প্রবীণা ও নবীনা এ ক্ষেত্রে সমান। প্রথমতঃ, ইংরেজ নারী চিরদিনই স্বাধীন-মনস্ক, শক্তমনস্ক। ইংরেজ পুরুষও তাই। গুরুজনের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলিয়ে দেওয়া তার দ্বারা কোনো যুগে হয়নি। সে নিজের ইচ্ছাকে নিজের হাতে রেখে স্বেচ্ছায় সমাজের বাঁধন স্বীকার করেছে, সামাজিক ডিসিপ্লিন মেনেছে। এই জন্যেই বিবাহটা দু'জন স্বাধীন মানুষের contract: এতে গুরুজনের হাত পরোক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, নারীত্বের কোনো ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আদর্শ এ দেশের নারীর সামনে তেমন ক'রে ধরা হয়নি যেমন আমাদের সীতা সাবিত্রীর আদর্শ। এর ফলে এ দেশের নারী প্রত্যেকেই এক একটি আদর্শ, কোনো দু'জন ইংরেজ নারী কেবল ব্যক্তিহিসাবে নয় typeহিসাবেও এক নয়। সীতা সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালতে গিয়ে আমাদের নারীজাতিকে আমরা সীতা সাবিত্রী জাতি বানিয়েছি, তাদের মধ্যে নারীত্বের অল্পই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের নিয়ে আরেক খানা রামায়ণ কিংবা মহাভারত লেখা হলো না, অথচ হেলেন ও পেনেলোপীর পরবর্তিনীদের নিয়ে আজ পর্যন্ত কত কাব্যই লেখা হ'য়ে গেল, কত ছবিই আঁকা হ'য়ে গেল। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ নারীর বেশভূষার প্রতি তেমন মনোযোগ নেই যেমন মনোযোগ গৃহসজ্জার প্রতি, শিশুচর্যা বা পশুচর্যার প্রতি। অধিকাংশ ইংরেজ নারীর সাজসজ্জা রূপকথার Cinderellaর মতো। কতকটা এই কারণে, কতকটা অন্য কোনো কারণে অধিকাংশ ইংরেজ নারীরই বাইরের charm নেই। পুরুষের প্রেমের চেয়ে পুরুষের শ্রদ্ধাই এদের কাম্য, সহযোগিতার চেয়ে প্রতিযোগিতার কামনা তীব্র।

॥ ষোল ॥

আবহতত্ত্ববিদ্‌দের মুখে ছাই দিয়ে আজ আবার সোনার সূর্য উঠেছে, দশদিক সোনা হ'য়ে গেছে।

কিছুদিন থেকে এমনি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য প্রতিদিন আমাদের চমক লাগিয়ে দিচ্ছে, এ যেন একটা প্রাত্যহিক miracle। আকাশ উজ্জ্বল নীল, পৃথিবী উজ্জ্বল শ্যাম, গাছেরা এখনো পাতা ফিরে পায়নি, কিন্তু ফুলের ভারে ভেঙে পড়ছে, মেঠো ফুলের রঙের বাহার দেখে মনে হয় যেন ফুলের আয়নায় সূর্যের আলোর সব ক'টি রঙ বিশ্লেষিত হয়েছে। পাখিরাও বসন্তের সঙ্গে দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরল, তাদের নহবৎ আর থামেই না।

এমনি miracleএর উপর আস্থা রেখে আমরা মাঝে মাঝে লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে চোখ যায় সেইদিকে চরণ যায়, আহার নিদ্রার ভাবনাটা একাদশম ঘটিকার আগে হাজির হয় না, এবং ভাবনা যদি বা হাজির হয় আহার নিদ্রাকে হাজির করানো সেও এক প্রাত্যহিক miracle। 'মোটের উপর একটা কিছু হ'য়ে ওঠেই ওঠে।'

অথচ ঐটুকু অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তাল কাটতেও পারিনে। এত বড় উৎসবসভায় পান পায়নি ব'লে খুঁৎ খুঁৎ করবে কোন্ বেরসিক? একসঙ্গে এতগুলো আনন্দ মিলে আক্রমণ করেছে— রঙ, রূপ, গান। সৌন্দর্যের বাণ সর্বাঙ্গ বিঁধে শরশয্যা রচনা করল। মুখ ফুটে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই, এত অসহায়। স্তবের মতো দেহমন লুটিয়ে পড়ে। পরস্পরকে অকারণে ভালোবাসি, অপরিচিতকে হারানো বন্ধুর মতো বুকে টানি। কুয়াশার মতো সংশয় উধাও হ'য়ে গেছে, ফেরার! আকাশব্যাপী আলোর মতো হৃদয়ব্যাপী প্রত্যয় দিবসে সূর্যের মতো নিশীথে চন্দ্রের মতো জাগরূক। জগতের পূর্ণতা জীবনের অপূর্ণতাকে সমুদ্রের কোলে স্পঞ্জের মতো ওতঃপ্রোত করেছে। ধন্য আমরা—সৌন্দর্যসায়রের কোটি তরঙ্গাঘাত সইতে সইতে আমরা আছি, আমাদের দুঃখগুলি আনন্দসায়রের বীচিবিভঙ্গ। অভাব? এমন দিনে অভাবের নাম কে মুখে আনবে? আমাদের একমাত্র অভাব—বাণীর অভাব, তৃপ্তি জানাবার বাণীর। আদিম মানবেরই মতো অন্তিম মানবও বাণীর কাঙাল থেকে যাবে, কৃতজ্ঞতা জানাবার বাণীর। সেই জন্যেই তো মানুষের মধ্যে কবি সকলের বড়—ঋষির চেয়েও, বীরের চেয়েও, ব্যবস্থাপকের চেয়েও, ক্ষুধা-নিবারকের চেয়েও, লজ্জা-নিবারকের চেয়েও। কবিকে বাদ দিলে সুন্দরের সভায় মানুষ বোবা, কবিকে কাছে রাখলে তার কথা ধার নিয়ে মানুষের মান থাকে। নইলে ঋষি থেকে ক্ষুধা-নিবারক পর্যন্ত কেউ একটা পাখির সম্মানও পেতেন না।

শরৎকালে সেকালের রাজারা দিগ্বিজয়ে যেতেন, বসন্তকালে একালের আমরাও দিগ্বিজয়ে যাই। আমরা যাই কোন্ দিকে কোন্ আপনার লোক অচেনার মতো আত্মগোপন ক'রে রয়েছে তাদের মুখোশ খসাতে। এমন দিনে কি কেউ কারুর পর হ'তে পারে? এ কি কুয়াশা-কালো দিন যে শত হস্ত দূরের মানুষকে শৃঙ্গী ব'লে ভ্রম হবে? নিজের দুধের বাটিতে মুখ ঢেকে ভাবব পৃথিবী-শুদ্ধ আমাকে দেখে হিংসায় জ্ব'লে পুড়ে মরছে? না, বসন্তকালে আমাদেরও মুকুল খোলে, আমরা ভালোবাসার সীমা খুঁজতে ফুলের গন্ধের মতো দিশাহারা হই, কোন্ শহর থেকে কোন্ গ্রামে পৌঁছাই, কোন্ তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোন্ বেড়া টপকাই, কোন্ গাছের তলায় শুয়ে কোন্ কোকিলের গলা শুনি, কোন্ চেরির গুচ্ছ চুরি ক'রে কোন্ প্রিয়জনকে সাজাই, অতি অপরিচিত শিশুর গায়ে চকোলেটের ঢিল ছুঁড়ে ভাব করি। এটা আমাদের দোষ নয়, ঋতুর দোষ। নইলে

আমাদের মতো কাজের লোকেরা কি টাইপরাইটারের খট্‌খটানি ফেলে মোরগের কু-ক্‌-রু-কু-উ শুনতে যায়? না, রাজারা রঙমহাল ছেড়ে রণক্ষেত্রে রঙ মাখতে যায়?

শীতকালের ইংলণ্ড যদি নরকের মতো, গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড স্বর্গের মতো। প্রতিদিন হয়তো সূর্য ওঠে না, উঠলেও প্রতি ঘণ্টায় থাকে না, কিন্তু তাতে কী? ফুলের মধ্যে তার রঙ, পাতার মধ্যে তার আলো, পাখির গলায় তার ভাব জমা থাকে। মেঘলা দিনে ঐ সঞ্চয় ভেঙে খরচ করতে হয়। ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রথম কথা তার গড়ন। ইংলণ্ড বন্ধুরগাত্রী। যে কোনো একটা ছোট গ্রামে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালে কী দেখি? দেখি যেন একখানা concave আয়না। রেখার উপরে রেখা হুড়মুড় ক'রে পড়েছে। অসমতল বললে ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না। বলতে পারি অযুত-সমতল। সমতলের সঙ্গে সমতল মিলে অযুত কোণ রচনা করেছে, এবং এক কাঠা জমিকেও সমতল রাখেনি। যেটুকু সমতল দেখা যায় সেটুকু মানুষের কুকীর্তি। সুখের বিষয় ইংলণ্ডের সমাজের মতো ইংলণ্ডের মাটিকেও মানুষ সরল রেখা দিয়ে সরল করেনি। এই এক কারণে শীতকালেও ইংলণ্ড অসুন্দর বা অস্বাস্থ্যকর হয় না, হয় কেবল অন্ধকার। শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই ইংলণ্ডে বর্ষা। কিন্তু বর্ষার জল দাঁড়াবার মতো একটু সমতল খুঁজে পায় না।

দেশের মাটির সঙ্গে মানুষের মনের যোগাযোগ বোধ হয় কথার কথা নয়। প্রাণীসৃষ্টির একটা স্তরে মানুষ ও উদ্ভিদ্‌ একই পর্যায়ভুক্ত নয় কি? আমার মনে হয় ইংরেজের মন যে Law and Orderএর জন্য এত ব্যাকুল এর কারণ তলে তলে সে তার মাটির মতো Law and Orderহীন, অযুত-সমতল। ইংলণ্ডের মাটির উপরকার জল যেমন অহরহ সমতল পাবার চেষ্টা করছে, পাচ্ছে না, ইংরেজের সমাজও তেমনি যুগে যুগে সাম্যের চেষ্টা ক'রে এসেছে, পায়নি। Snobbery ইংরেজ সমাজের মজ্জাগত, উপর-তল না হ'লে তার সামাজিক রথ গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে পারে না। অথচ সাম্যকেও তার মন চায়; নইলে চেষ্টা থাকে না, সবই আপনা-আপনি ঘটতে থাকে, উপরের জল চোখ বুজে নিচে যায়, নিচের ধোঁয়া চোখ বুজে উপরে ওঠে। এমনি নিশ্চেষ্টতা আমাদের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ব'লে আমাদের সামাজিক রথ কোনোমতে চলছে ও কোনো মতে থামবারও নয়। হিন্দুর মরণ নেই, সে হিন্দুবিধবার মতো, টিকে থাকবেই।

ইংরেজের মনের ভিত্তি অস্থির—সে যেন পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত পৌছেছে, সেখানে সবই বিশৃঙ্খল, সবই আগুন! অবচেতনভাবে সে ঝড় ঝঞ্ঝাকে ভালোই বাসে, সমস্যার অভাব সইতে পারে না, কিছু না হোক একটা crossword puzzle তার চাইই, কোনো রকম একটা যুদ্ধ—হোক না কেন 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'—না থাকলে সে বেকার। 'হরি হে, কবে শান্তি ও শৃঙ্খলা পাব', এটা তার চেতনার কথা। তার অবচেতনার কথা কিন্তু 'শান্তি ও শৃঙ্খলাকে পাবার চেষ্টা যেন কোনো দিন ক্ষান্ত না হয়, এমনি চলতে থাকে।' ইংলণ্ডের একটা হাত সমস্যার সৃষ্টি করে, আরেকটা হাত সমস্যার ধ্বংস করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উভয়ের মধ্যে ষড়যন্ত্র না থাকলেও অন্তরালে দুই হাতের একই স্বার্থ—তারা পরস্পরের অন্তরটিপুনি অনুসারে সমস্যার বাড়্‌তি কম্‌তি ঘটায়, মীমাংসা কাঁচা-পাকা রাখে। আপিসের দুই চালাক কর্মচারী তারা, অদরকারী ব'লে কোনো দিন তারা বেকারের দলে পড়ল না। ইংলণ্ডকে দেখলেই মনে হয়, সাবাস, খুব খাটছে বটে, কী ব্যস্ত! কিন্তু তদারক করলে ধরা প'ড়ে যায়, সমস্যা ও মীমাংসার উপরে যে একটা স্তর আছে সে স্তরে কি এ দেশ কোনো দিন উঠবে! সাত্ত্বিকতার শিবনেত্র কি কখনো এর ললাটে জ্বলবে! এ যে সব পর্যবেক্ষণ করে, কিছুই দেখে না, সব জ্ঞাত হয়, কিছুই জানে না, সব বোঝে, কিছুই উপলব্ধি করে না। এর জীবন যেন জীবন ব্যাপী ছেলেমানুষি। সাড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত লাট্টুর সঙ্গে লাট্টুর মতোই ঘুরছে।

প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী সাজে, মানুষ তখন তার সাজ দেখবার জন্য কাজ কর্ম ফেলে রাখে; এই জন্যে আমাদের বারোমাসে তেরো পার্বণ। ইংলণ্ডেও নাকি এককালে মাসে মাসে দোল দুর্গোৎসব ছিল, কিন্তু তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ। এখন প্রতিরাত্রে পার্বণ চলে নাচঘরে ও সিনেমায়, প্রতিদিন খেলার মাঠে। বড় দিন বা ঈস্টার এখন নামরক্ষায় পর্যবসিত। ভারতবর্ষের লোকের কাছে এই হিসাবে ইংলণ্ড অত্যন্ত নিরানন্দ দেশ। এ দেশে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পূজ্যের সঙ্গে পূজারীর সম্বন্ধ থেকে কখন নেমে এসে শিকারের সঙ্গে শিকারীর সম্বন্ধে দাঁড়িয়েছে। এখানকার আমোদ প্রমোদগুলো যেন যুদ্ধে জিতে শত্রুর মৃত দেহের উপরে মাতলামি করা। এমন আমোদের শিরায় শিরায় ভয়, মৃত্যুভয় দারিদ্র্যভয় ব্যাধিভয়। প্রকৃতির প্রতিশোধগুলোর নামে মানুষ বিবর্ণ হ'য়ে যায়। প্রকৃতি যে কত রকমে প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে হিসাব হয় না। একটা মস্ত প্রতিশোধ হচ্ছে যুদ্ধ। আধুনিক কালে আমরা অধিকাংশই রুটিন দেখে ইস্কুলে পড়ি, আপিসে কাজ করি, খেলতে যাই ও তামাসা দেখি। প্রত্যেক দেশেই এখন হাজার হাজার ইস্কুল কলেজ, লাখে লাখে আপিস কারখানা সংখ্যাতীত সিনেমা নাচঘর। প্রত্যেকটি মানুষ হয় সরকারী নয় বেসরকারী ব্যুরোক্রাট্—সরকারী ডাক-ঘরের মেয়ে কেরানী থেকে Lyonsএর চায়ের দোকানগুলোর কর্মচারিণী পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি। এই কোটি কোটি মৌমাছির চিত্তবিনোদনের জন্যে একই অভিনেতা অভিনেত্রী একাদিক্রমে তিনশো রাত একখানি নাটক অভিনয় ক'রে যান। তিনশোবার বাজালে একখানা গ্রামোফোনের রেকর্ডেরও ইজ্জৎ থাকে না, কিন্তু ধন্য এদের গলা!

এর পরিণাম জীবনে বিরক্তি। ছুটির দিন সস্তা টিকিট কিনে ট্রেন বোঝাই ক'রে একই স্থানের পাশাপাশি হোটেলে যখন হাজার হাজার জন অভ্যাগত টমাস কুকের তর্জনী সংকেতে পরিচালিত হন ও charabancএর পিঠে চ'ড়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে যান তখন অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দু'জনেই 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' ক'রে ওঠেন। তাঁরা বলেন, 'রুটিনের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো, মানচিত্রের হাত থেকে, এস্টিমেটের হাত থেকে।' তখন এমন কোথাও যাবার জন্যে মানুষ ছট্‌ফট্ করে যেখানে টমাস কুক নেই, পাকা সড়ক নেই শোবার ঘরওয়ালা মোটর কোচ নেই—এক কথায় আমাদের শিশুবর্জিত পশুঅলঙ্কৃত সর্বস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত ফ্ল্যাটের আরাম নেই। সমস্ত পৃথিবীটা যেমন শনৈঃ শনৈঃ একই রকম হ'য়ে উঠছে, দেখে মনে হয় টমাস কুক গ্রামে গ্রামে দোকান খুলবে, কাউকে প্রাণ হাতে ক'রে বেহিসাবীভাবে অজানা পথে বিবাগী হ'তে দেবে না। তখন মানুষের একমাত্র আশা ভরসার স্থল হবে যুদ্ধক্ষেত্র, সত্যিকারের ছুটি পাওয়া যাবে ঠিক সেইখানেই, সেখানকার কিছুই আগে থেকে জেনে রাখা যাবে না, পদে পদেই অকস্মাতের সঙ্গে দেখা।

গত মহাযুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে তারই পূরণের জন্যে প্রকৃতি অপেক্ষা করছে, তাই এখনো আমরা যুদ্ধের নামে জিভ কাটছি, মেয়েরা আগামী পার্লামেন্টটাকে Parliament of Peacemakers করবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু যে শিশুরা গোড়া থেকেই মোহমুক্ত হ'য়ে বাড়ছে, যাদের কল্পনাকে খোরাক দেবার জন্যে দ্যুলোকে ভূলোকে একটিও অপরিচিত প্রাণী একটাও অপরিচিত স্থান নেই, সেই সব বাস্তববাদী যখন বড় হয়ে দলে দলে সরকারী বে-সরকারী ব্যুরোক্রেসীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে রুটিন সামনে রেখে কাজ করবে তখন তাদের প্রত্যেকের চোখের সুমুখে না হয় ঝুলিয়ে রাখা গেল 'There is no fun like work' এবং সোশ্যালিস্টদের দয়ায় তাদের কর্মকাল না হয় ক'রে দেওয়া গেল দিনে পাঁচ ঘণ্টা, তবু তারা সেই সোনার খাঁচা থেকে উড়ে গিয়ে মরতে চাইবে না কি? অত্যন্ত বেশি সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার পরিণাম চিরকাল যা হয়েছে তাই হবে, প্রকৃতি কোনো সঙ্ঘকেই টিকতে দেয়নি,—না বৌদ্ধ সঙ্ঘকে, না খ্রীস্টান সঙ্ঘকে। এবং অন্নবস্ত্রের জন্যে যে নতুন সঙ্ঘটা প্রতি দেশেই নানা নাম নিয়ে শশীকলার মতো বাড়ছে সোশ্যালিজ্‌ম্ তার শেষ অধ্যায় বটে, কিন্তু

তার পরেও উপসংহার আছে। এবং সে উপসংহার তেমন মুখরোচক নয়।

প্রকৃতির প্রতি ইংরেজের দরদ এখনো লোপ পায়নি, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাতি নাতনীকে দেখতে এখনো পাওয়া যায়। রাস্তার দু'ধারে গাছ রুইবার জন্যে সমিতি হয়েছে, উদ্যান-নগর বা উদ্যান-নগরোপান্ত (Garden Suburb) রচিত হচ্ছে, পল্লীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার আন্দোলন তো কবে থেকে চ'লে আসছে, কিন্তু রেলগাড়িওয়ালা মোটরগাড়িওয়ালা ও নতুন বাড়িওয়ালাদের লুব্ধদৃষ্টির উপরে ঘোমটা-টেনে-দেওয়া পল্লীসুন্দরীর ক্ষমতার বাইরে।* দু'পাঁচজন অসমসাহসিক স্বপ্নদ্রষ্টা পল্লীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের নব সভ্যতাকে আবাহন করতে ব্যগ্র, কিন্তু হাটের কোলাহলে তাঁদের কণ্ঠস্বর বড়ই ক্ষীণ। পলিটিসিয়ানদের কাছে তাঁরা আমল পান না, কেননা পলিটিসিয়ানরা হয় বড় বড় কল কারখানাওয়ালাদের তাঁবেদার, নয় কল কারখানার শ্রমিকদের সর্দার। দুই দলের স্বার্থই আরো অধিকসংখ্যক কল কারখানা পাকা সড়ক নতুন বাড়ি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য এরা যা হাতের কাছে পাচ্ছে তাই করতে উদ্‌গ্রীব. দশ বছর পরে তার ফলে দেশের চেহারাটা কেমন হবে তা ভাবতে গেলে ভোট পাওয়া যায় না, ক্ষুধিতের ক্ষুধাও বাড়তে থাকে। এমনিই তো দেশটাতে জমি যত আছে রাস্তা তার বেশি, রাস্তা যত আছে বাড়ি তার বহুগুণ; আরো দশ বছর পরে দেখা যাবে যে সারা ইংলণ্ডটা একটা বিরাট শহর, এবং এই শহরের লোক নিজেদের খাদ্য নিজেরা একেবারেই উৎপাদন করে না। বলা বাহুল্য সোশ্যালিস্টরা শহুরে শ্রমিকদের ভোটের উপর নির্ভর করে; গ্রাম্য কৃষকদের জন্য তাদের মাথাব্যথা নেই। কৃষকদের ভোট পাবার জন্যে অন্যান্য দলের এক-একটা কৃষি-পলিসি আছে বটে, কিন্তু পলিটিসিয়ান জাতীয় প্রাণীদের কাছে দূরদর্শিতা প্রত্যাশা করা বৃথা, তারা তুবড়ির মতো হঠাৎ জ্ব'লে হঠাৎ নেবে, তাদের জীবদ্দশা বড় জোর বছর পাঁচেক। সমগ্র দেশের নব সভ্যতার আবাহন করা তাদের কাজও নয় তাদের সাজেও না। তাদের একদল আরেকদলের জন্যে বসবার জায়গা রেখে যেতেই জানে, সমস্ত জাতিটার চলার ভাবনা তাদের অতি সূক্ষ্ম মস্তিষ্কে প্রবেশপথ পায় না।

এখনকার ইংলণ্ডকে দেখে দুঃখিত হবার কারণ আছে। সে কারণ এমন নয় যে ইংলণ্ডের নৌবহরকে আমেরিকার নৌবহর ছাড়িয়ে উঠছে, ইংলণ্ডের উপনিবেশরা পর হ'য়ে যাচ্ছে, ইংলণ্ডের অধীন দেশগুলি স্বাধীন হ'য়ে উঠছে, ইংলণ্ডের অন্তর্বিবাদে তার ধনবৃদ্ধি বাধা পাচ্ছে। আসলে সাম্রাজ্যের জন্য ইংলণ্ড কোনোদিন কেয়ার করেনি, যেমন ঐশ্বর্যের জন্যে চিত্তরঞ্জন দাশ কোনোদিন কেয়ার করেননি। ইংলণ্ড একহাতে অর্জন করেছে অন্যহাতে উড়িয়ে দিয়েছে, একদিন যাদের ক্রীতদাস করেছে অন্যদিন তাদের মুক্ত ক'রে দিয়েছে, যেদিন আমেরিকা হারিয়েছে সেইদিন ভারতবর্ষ পেয়েছে। পুরুষস্য ভাগ্যম্। আধিভৌতিক লাভক্ষতির কথা ইংলণ্ড এতদিন ভাবেনি, এইবার ভাবতে শুরু করেছে দেখে মনে হয় এবার আর তার সেই পুরাতন অন্যমনস্কতা নেই, এবার সে অক্ষমের মতো নিজের অক্ষমতার কথাই ভাবছে। ব্যাপার এই যে ইতিমধ্যে কবে একদিন—উনবিংশ শতাব্দীতেই বোধ হয়—ইংলণ্ডের আত্মা অন্তর্হিত হয়েছে কিংবা জীবন্মৃত হয়েছে। শেক্‌স্‌পীয়র থেকে ব্রাউনিং পর্যন্ত এসে সে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল। যে ইংরেজের প্রাণ ছিল adventure বা বিপদ্‌বরণ, সে এখন মন্ত্র নিয়েছে, 'Safety first'। যা-কিছু এক কালে অর্জন করেছে তাই এখন সে নিরাপদে ভোগ করতে চায়। কিন্তু সংসারের নিয়ম এই যে, বীরছাড়া অন্য কেউ বসুন্ধরাকে ভোগ করতে পারবে না, অর্থাৎ অর্জন করা ও ভোগ করা একসঙ্গে চলা চাই। বস্তুতঃ অর্জন করাটাই ভোগ করা। অর্জিত ধনকে র'য়ে ব'সে ভোগ করা হচ্ছে সংসারের আইনে

* একটি সমিতির সেক্রেটারী লিখছেন, 'আপনি কি জানেন যে আমাদের বনফুলগুলি একে একে লোপ পেয়ে যাচ্ছে? তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই সমিতির প্রয়াস ও উপায় উদ্ভাবনে আপনি যোগ দেবেন?'

চুরি করা। এ আলস্যকে সংসার কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। যার মাইট নেই তার রাইট তামাদি হ'য়ে গেছে, যার হজম করবার ক্ষমতা নেই সে খেতে পাবে না।

কিছুকাল থেকে আধিভৌতিক ঐশ্বর্যের উপরে মন দেওয়া ছাড়া ইংলণ্ডের গত্যন্তর থাকেনি, কেননা মন দেবার মতো আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য তার কখন ফস্কে গেছে। এখন আধিভৌতিক ঐশ্বর্যও যায়-যায় দেখে তার মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। ধনকে যে মানুষ পরম কাম্য মনে ক'রে কোটিপতি হলো, সে যখন দেখে যে আরেকজন কেমন করে দ্বি-কোটিপতি হয়েছে তখন সে চোখে আঁধার দেখে, তার পা টলতে থাকে। ভদ্রলোকের ছেলে যখন ইতরলোকের ছেলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে যায় ও একটি অশ্লীল কথা বলতে গিয়ে দশটি শুনে আসে, তখন তার যে অবস্থা হয় ইংলণ্ডের অনেকটা সেই অবস্থা। ধনবলকে সে সকলের থেকে শ্রেয় মনে করেছিল, আজ ধনবলে সে প্রথম থাকতে পারছে না আমেরিকা তার চেয়ে বড় 'power' হ'য়ে 'জগৎ গ্রাসিতে করেছে আশয়'। ইংলণ্ডের এই অপমান এখনো তার মর্মে বেঁধেনি, কিন্তু চামড়ায় বিঁধছে। বেশ একটু 'inferiority complex'ও তার মধ্যেও লক্ষ্য করছি। ভারতবর্ষের মতো সেও বলতে আরম্ভ করেছে, 'আমি বড় গরীব, আমি গোবেচারা', কিন্তু সংসারের আইনে গরীব হওয়া হচ্ছে ফাঁসীর আসামী হওয়া। হয় আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে হবে, নয় আধিভৌতিক ঐশ্বর্যে ধনী হ'তে হবে, অস্তিত্বের মূল্য দেবার জন্য ধনী না হ'লে চলে না।

॥ সতেরো ॥

কেবলমাত্র সূর্যের আলোর দ্বারা একটা দেশের কতটা পরিবর্তন ঘটতে পারে তার সাক্ষী গ্রীষ্মকালের ইংলণ্ড। মাটি তেমনি আছে, মানুষ তেমনি আছে, সভ্যতার জগন্নাথের রথ তেমনি উদ্‌ভ্রান্তগতিতে চলেছে; কিন্তু মেঘ-কুয়াশার কপাট যেই খুলল অমনি দেখা দিল সূর্যলোক চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোক। ইংলণ্ড ছাড়াও যে দেশ আছে সমুদ্রের নজরবন্দী হ'য়ে মেঘ-কুয়াশার কারাগারে সেকথা আমরা জানতুম না; এখন দেখা গেল আকাশজোড়া অমরাবতী। স্বর্গ আমাদের এত কাছে যে হাত বাড়ালে হাতে ঠেকে, কেবল হাত বাড়ানোটাই শক্ত, কেননা হাত দিয়ে যে আমরা মাটি আঁকড়ে থাকতেই ব্যস্ত।

এমনি মধুর গ্রীষ্মকালে কেমন ক'রে মানুষের যুদ্ধে মতি হয় অনেক সময় আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি। শীতের অন্ধকারে শরীরটাকে গরম রাখবার জন্যে পরস্পরের শরীরে বেয়োনেটের চিমটি কাটা ও পরস্পরের মুখ দেখবার জন্যে বারুদে আগুন ধরানো, এর অর্থ বুঝতে পারি। কিন্তু বসন্তকালে গ্রীষ্মকালে শরৎকালেও অরসিকের মতো যুদ্ধ করতে কেমন ক'রে ইউরোপের লোকের প্রবৃত্তি হলো? আকাশের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে দিনের পর দিন যায়, তবু তার রহস্যের কূল পাওয়া যায় না। সে আমাদের নিত্য বিস্ময়। পাখিগুলো যে কেন সারাবেলা গান গেয়ে মরে, এত ফুল যে কোন্ আনন্দে ফোটে, বন ও মাঠ দখল করেও রাজপথের বক্ষ ভেদ ক'রে ঘাস মাথা তোলে কেন, মোটরের দাপাদাপিকে অগ্রাহ্য ক'রে শামুক তার অবসর মতো ঘণ্টায় দশ ইঞ্চি অগ্রসর হয় কেন, এই অপরূপ শহরটাকে কেন এমন অপূর্ব দেখায়, কলকারখানার কলঙ্ক নিয়েও কেন ইংলণ্ড এখনো

অম্লানযৌবনা—এসব ধাঁধার একমাত্র জবাব, সূর্যের করুণা।

সূর্য অভয় দিয়ে বলছে, পৃথিবীকে তোমরা যত খুশি কুৎসিত যত খুশি দুঃখময় যত খুশি বিশৃঙ্খল করো না কেন আমি আছি তার সুখ-সৌন্দর্য-শৃঙ্খলার কুবের-ভাণ্ডারী, আমি তাকে সোনা ক'রে দেব।

সূর্য আমাদের বিনামূল্যের বীমা-কোম্পানী। যখন যা হারায় তা গড়িয়ে দেয়। জীবন হারালেও জীবন ফিরিয়ে দেয়। সূর্যের assurance শুনলে তাই ফুল-পাখি-ঘাস-শামুকের মতো আমাদেরও প্রাণে ভরসা আসে, আমরা জীবনকে একটা কানাকড়ির চেয়ে মূল্যবান মনে করিনে, আমরা ওদেরি মতো নিরুদ্বেগে দিন কাটাই, অকারণে খুশি হই। ঐ যে শাদা প্রজাপতিটি, ওর জীবন একটা দিনের—কোথায় ওর মৃত্যুভয়, কোথায় ওর জীবনের মূল্য, কোথায় ওর অপ্রিয় কর্তব্য? খোলা আকাশের জানলা দিয়ে সভ্য মানুষের অর্থহীন হট্টগোল ও আর্তনাদ সুতো-ছেঁড়া ফানুসের মতো কোথায় উড়ে গেল।

এমন দিনে চোখ-কান-মন খোলা রেখে বেড়াতে বেরিয়ে সুখ আছে। যাই দেখি তাই নতুন মনে হয়, আশ্চর্য মনে হয়। রাস্তার এক কোণে দুই বুড়ী ব'সে ফুল বেচছে। অত ফুল তারা পেল কোথায়? সব ফুলের কি তারা নাম জানে, মর্ম বোঝে, যত্ন জানে? শাকসব্জীর হাট; নানাদেশের ফল পাতা জাহাজে ক'রে গাড়িতে ক'রে এসেছে। গাড়ি সেই মান্ধাতার আমলের টাট্টুঘোড়ার গাড়ি, গাধার গাড়ি, মোটরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার গাড়োয়ান দুরুচ্চার শব্দ ক'রে চলেছে, তার হাঁটু থেকে পা অবধি একটা পাটের থলে কম্বলের কাজ করছে, তার অলক্ষিতে কখন একটা ছোঁড়া গাড়ির পেছন ধ'রে ঝুলে পড়েছে। হাটের কাছে অপেরা হাউস, রাত্রে Chaliapine অপেরায় নামবেন, সকাল থেকে লোক জ'মে গেছে; এক একখানা ক্যাম্বিসের চেয়ার ভাড়া ক'রে এক একজন ব'সে গেছে সন্ধ্যাবেলা কখন টিকিট-ঘর খুলবে তারি প্রতীক্ষায়; কেউ সংগীতের স্বরলিপি নকল করছে: কেউ বই পড়ছে; কেউ গল্প করছে; কেউ বা চেয়ারের উপর নিজের নামের কার্ড এঁটে দিয়ে আপিসে গেছে কিংবা বেড়াতে গেছে। কাছেই ড্রুরী লেনের থিয়েটার—কবেকার থিয়েটার—গ্যারিক্ ও সেরা সিডন্স্ একশো দেড়শো বছর আগের মানুষ। ইংলণ্ডের থিয়েটারগুলোর অধিকাংশই অত পুরোনো নয়, কিন্তু প্রত্যেকের পিছনে বহু শতাব্দীর রুচি ও সাধনা রয়েছে—এক অভিনেতার থেকে আরেক অভিনেতায় সংক্রামিত, লুপ্ত থিয়েটার থেকে চলিত থিয়েটারে হস্তান্তরিত। সেই জন্যে ইংলণ্ডের থিয়েটার এক একটা যুগে খুব উঁচুদরের না হ'লেও কোনো যুগেই নিচু দরের হ'তে পারে না, আগের যুগের আদর্শ তাকে পাঁক থেকে টেনে তোলে। ফ্রান্সের থিয়েটার আরো পুরাতন—ফ্রান্স যতদিনের থিয়েটার ততদিনের। সে যেন জাতির ধমনী। তার স্বাস্থ্যনাশ জাতির স্বাস্থ্যনাশের সামিল। ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে, মহাযুদ্ধের দিনেও ফ্রান্সের থিয়েটারে লোকারণ্য। ইংলণ্ডের থিয়েটার তার অতখানি নয়—ইংলণ্ডের ধমনী তার ক্রিকেট খেলার মাঠ, তার ঘোড়দৌড়ের মাঠ।

কাছেই হাইকোর্ট। হাইকোর্টটি যে-কোনো ভারতবর্ষীয় হাইকোর্টের থেকে ছোট ও জন-বিরল। ইংরেজের দেশে স্পেক্‌টাকুলার কিছুই নেই, এক যুদ্ধ জাহাজ ছাড়া। তাই ভারতবর্ষের লোক লণ্ডনে এসে বিষম ক্ষেপে যায়—এই তো দেশ, এই তো মানুষ, এই তো দৃশ্য, এই তো খাদ্য, এই দেখতে এতদূর আসা! লণ্ডনের অর্ধেকের বেশি লোক অকথ্য বস্তির বাসিন্দা, মে-ফেয়ারের অদূরেই ওয়েস্ট-মিন্‌স্টারের বস্তি, পার্লামেণ্টের প্রদীপ যেখানে জ্বলছে সেইখানেই আঁধার। মে-ফেয়ারও এমন কিছু আহা-মরি নয়, আমাদের মালাবার হিল্ ওর থেকে ঢের বিলাস-যোগ্য। বিলেতে দেশটা মাটির ব'লে মাটির! ব্যাঙ্ক গাড়াতে বেড়াতে যাও—কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীটের দোসর। টেম্‌স্ নদীর

চেহারা তো জানোই—সিন্ধুপ্রদেশে বোধ করি ওর থেকে বড় বড় নালা আছে। লণ্ডনের বাগানগুলো দেখে একজন লাহোরবাসীর নাক সিঁটকানো দেখবার মতো। উত্তর ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মসজিদ ও দক্ষিণ ভারতের যে কোনো তৃতীয় শ্রেণীর মন্দির ইংলণ্ডের ক্যাথিড্রালগুলোকে হার মানায়। রাজবাড়ির তুলনা ভারতবর্ষে অন্ততঃ ছ'শো বার মিলবে, কেননা ভারতবর্ষের সামন্ত রাজারা ক্ষমতায় যাই হোন জাঁকজমকে এক একটি চতুর্দশ লুই। পঞ্চম জর্জ তো তাঁদের তুলনায় একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষের লোক সাইট্‌সীয়ার হিসাবে ইংলণ্ডে এলে ঠ'কে যাবে। সিনেমা দেখাই যদি অভিপ্রায় হয় তবে দেশে সিনেমা স্থাপন করতে তো বেশি খরচ লাগে না। বিদ্যালাভের জন্যে যদি আসতে হয় তবে এত দেশ থাকতে কেবল ইংলণ্ডে কেন? হাঁ, ব্যবসা করতে আসা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তা করতেও গোটা দুনিয়া প'ড়ে আছে।

তবু ভারতবর্ষের লোকের সব দেশের চেয়ে বেশি ক'রে ইংলণ্ডেই আসা উচিত। এবং সব দেশের লোকের চেয়ে ভারতবর্ষের লোকেরই ইংলণ্ডে আসা বেশি দরকার। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড চরিত্রের জগতে antipodes। ইংলণ্ডের যে গুণগুলি আছে ভারতবর্ষের সেই গুণগুলি নেই, ও ভারতবর্ষের যে গুণগুলি আছে ইংলণ্ডের সেই গুণগুলি নেই। এই এক কারণে এত দেশ থাকতে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যোগাযোগ ঘটল। এবং এই এক কারণে স্বাধীন ভারতবর্ষকেও সাম্রাজ্যহীন ইংলণ্ডের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ রক্ষা করতে হবে। ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া কমবেশি ভারতবর্ষেরই মতো। তাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের শেখবার আছে অনেক কিন্তু তাদের চরিত্র ভারতবর্ষের চরিত্রের সঙ্গে এত মিলে যায় যে তাদের চরিত্র থেকে ভারতবর্ষের আয়ত্ত করবার আছে অল্পই। অন্য কথায় তারা ভারতবর্ষের সগোত্র, তাদের সঙ্গে বিবাহ বড় বেশি ফল দেবে না। ইংলণ্ডের গোত্র আলাদা। ভারতবর্ষ সবাইকে ঘরে টানে, ইংলণ্ড সবাইকে পথে বার করে। ইংলণ্ড খোঁজায়, ভারতবর্ষ খোঁজার শেষ ব'লে দেয়। ইংলণ্ড প্রশ্ন, ভারতবর্ষ উত্তর। ব্রিটানিয়া নিষ্ঠুরা স্বামিনী,—তাকে খুশি করবার জন্যে প্রাণ হাতে ক'রে জাহাজ ভাসাতে হয়, হয় রত্ন নিয়ে ফিরে আসা, নয় প্রাণ হারিয়ে দেওয়া, নয় উপনিবেশ গ'ড়ে ফিরে আসবার নাম না করা। ভারতবর্ষ করুণাময় ঋষি-গৃহস্থ,—ক্রৌঞ্চ পাখিকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামীবর্জিতাকে আশ্রয় দেয়, যে আসে সেই তার স্নেহের অতিথি। একের চরিত্রের চির বিপদ্‌বরণস্পৃহা অপরের চরিত্রের সহজ শান্তির সঙ্গে সমন্বিত হবে, এই অভিপ্রায় উভয়ের বিধাতার মনে ছিল। ইতিহাস তো এক রাশ আকস্মিকতা নয়। আকাশের এক কোণে বাতাসের অভাব ঘটলে অন্য কোণ থেকে যেমন বাতাস ছুটে যায়, ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণতা দিতে ইংলণ্ড তেমনি ছুটে গেছে। অন্য দেশ যায়নি, কারণ অন্য দেশ ভারতবর্ষেরই মতো। অন্য দেশ গিয়ে ফিরে এসেছে, কারণ অন্য দেশকে ভারতবর্ষের দরকার ছিল না।

একথা ঠিক যে, ফ্রান্স যদি ভারতবর্ষের হাত ধরত তবে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার মনের অমিল ঘটত না, যেমন ইংলণ্ডের সঙ্গে ঘটেছে। কিন্তু তা হ'লে ভারতবর্ষের চরিত্র কোনো দিন পূর্ণতা পাবার সুযোগ পেত না। ফ্রান্স যে দেশে গেছে সে দেশকে ফ্রান্সে পরিণত করেছে, সে দেশকে বলেছে—তোমরাও ফরাসী, তোমরাও স্বাধীন। এ বাণীর সম্মোহন কোনো দেশ এড়াতে পারেনি। ফ্রান্সের দখলে থাকলে আমরা কেউ কেউ ফ্রান্সের সেনাপতি হ'য়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট বা সম্রাটও হ'তে পারতুম, যেমন কর্সিকাবাসী ইতালিয়ানবংশীয় নেপোলিয়ন একদিন হয়েছিলেন। কেবল নিজেকে ফরাসী ব'লে ঘোষণা করতে হতো, এই যা কষ্ট। ফরাসীরা অনেকটা মুসলমানদের মতো ডেমোক্রাটিক—তাদের দলে ভর্তি হওয়া খুব সোজা, এবং ভর্তি হ'লে আর পালাতে ইচ্ছা করে না। ভারতবর্ষের মুসলমান আরব দেশের মুসলমানের কাছ থেকে কীই বা পেয়েছে, শুধু নামটা

ছাড়া। তবু সেই নামটাকে পাসপোর্ট ক'রে সে পৃথিবীর সব দেশে সমনামাদের প্রীতি পায়। ফরাসী নামটারও তেমনি মহিমা। এই নাম নিয়ে আমরা এত দিনে ভারতবর্ষের মানচিত্রের উপরে লিখতুম 'ফ্রেঞ্চ রেপাব্লিকের কয়েকটা জেলা'—যেমন আলসাস বা লোরেন তেমনি বাংলা বা আসাম।

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা সবই আমরা পেতুম, ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা স্বপ্নেও ভাবতুম না। কিন্তু আমাদের কোনো বৈশিষ্ট্যকেই ফ্রান্স আমল দিত না, ফ্রান্সের লজিকপ্রিয় মগজ অসঙ্গতি সহ্য করতে পারে না। সম্ভবতঃ ফরাসীরা আমাদের দেশে একটিও দেশীয় রাজ্য থাকতে দিত না, ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা আঁকবার পক্ষে সোজা হতো। হিন্দু মুসলমান আইনের বদলে চালাত কোড্ নেপোলিয়ন। এক কথায়, আমাদের ভারতীয়ত্বটুকু কেড়ে নিয়ে আমাদের দিত তার চেয়ে অনেক সুবিধাজনক ফরাসীত্ব।

কিন্তু গোড়ায় গলদ, ফ্রান্স কোনো দিন ভারতবর্ষ নিতেই পারত না। কেননা ফ্রান্সের চারিত্রিক দোষগুণ মোটের উপর আমাদের কাছাকাছি। ফরাসীরা গৃহপ্রিয়, দেশ ছেড়ে বেরুতেই চায় না, বড় জোর খিড়কির কাছে আফ্রিকা পর্যন্ত ওদের গতিবিধি। ইন্দোচীন প্রভৃতি খুচরো উপনিবেশগুলোকে ধর্তব্য মনে করলে ফিজি প্রভৃতি জায়গায় আমাদের উপনিবেশকেও ধরতে হয়। গৃহপ্রিয় মানুষের স্বভাব ঘরের লোকের সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া করা; চক্রান্ত করা; সন্ধি করা ও' পাশাপাশি থাকা। ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভায় যতগুলো চেয়ার ততগুলো দল। ফ্রান্সের সাহিত্যরাজ্যেও যতগুলি লেখক ততগুলি পত্রিকা, যতগুলি পত্রিকা ততগুলি দল। কোনো একটা দলের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে লেখককে লোকে অজ্ঞাতকুলশীল ভেবে খাতিরই করতে চায় না। ফ্রান্স পরিবারপ্রধান দেশ। পরিবারের সঙ্গে জড়িত না হ'লে পরিবারের ভার মাথায় না নিলে ব্যক্তিকে সে ব্যক্তিই মনে করে না। ইংলণ্ড ব্যক্তিকে চ'রে বেড়াবার পক্ষে যথেষ্ট মুক্তি দিয়েছে, John Bull ষাঁড়ই বটে, তার পারিবারিক দায়িত্ব সামান্য। তাই ইংরেজের ব্যক্তিত্ব একলা মানুষের ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ষাঁড়েরও গোষ্ঠ থাকে, বৃহৎ গোষ্ঠ। ইংরেজের বৃহৎ ক্লাব, বৃহৎ পার্টি। বৃহৎ পার্টির একজন না হ'লে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এ দেশে নগণ্য এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অক্রিয়। এ দেশের মাটিতে আকাশকুসুম যদি বা জন্মায় তবে সে নেহাৎ আগাছা, তাকে উপড়ে ফেলবার আগেই সে মানে মানে স'রে পড়ে। Shelley ইটালি প্রয়াণ করলেন। Bertrand Russell আমেরিকা প্রয়াণ।

ইংলণ্ডের চরিত্রের আরেকটা গুণ, তার চরিত্র মুহুর্মুহু বদলায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজকে দেখলে প্রপৌত্র ব'লে চিনতে পারবে না, এরা আরেক জাতি। তিন পুরুষের ব্যবধানে সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘ'টে গেছে। কিন্তু চাকার তলার দিকটা কখন উপরের দিক হয় চাকা তা জানে না, চাকা ঘুরতেই ব্যাপৃত। প্রতিদিন একটু একটু ক'রে বিপ্লব চলেছে; চোখে পড়ে না এই জন্যে যে, চোখও বিপ্লবের অঙ্গ। Galsworthyর নতুন নাটক 'Exiled'এ নিচের ধাপের লোক উপরের ধাপে উঠল, Galsworthy একে ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'evolutionary process' এবং যারা নবাগতের ধাক্কা খেয়ে উপরের ধাপ থেকে পা পিছলে পড়ল তাদের জন্যে দুঃখ করলেন। কিন্তু তারাও তো 'evolutionary process'-এরই কল্যাণে ভুঁই ফুঁড়ে উপরে উঠেছিল। এখনকার ভুঁইফোঁড়রাও পঞ্চাশ বছর পরে উপরের ধাপ থেকে 'exiled' হবে। তা ব'লে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, ইংলণ্ড যতই বদলাক ইংলণ্ডই থাকবে, চাকা যতই ঘুরুক চাকাই থাকবে। পুরাতনকে ইংলণ্ড সমীহ করে, কিন্তু নির্বাসিতও করে, এ্যারিস্টক্র্যাটের প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা, কিন্তু পালা ক'রে সবাইকে সে একই গদিতে বসাবে ব'লে কাউকেই দীর্ঘকাল গদিয়ান হ'তে দেয় না। পর্বতের চূড়ায় যেই ওঠে সেই টাল সামলাতে না পেরে আছাড় খায়, অথচ যে দেশের সমাজের গড়ন পার্বত্য সে দেশে কতকগুলো লোককে চূড়ায় চ'ড়ে চূড়াচ্যুত হ'তেই হবে।

অধিকাংশ এ্যারিস্টক্রাটেরই বংশলোপ হয়, সুতরাং কষ্ট ক'রে তাদের মাথা কাটতে হয় না। স্বাচ্ছন্দ্যের আদর্শ বাড়াতে গিয়ে অতিমাত্রায় জন্মশাসন, তার ফলে বংশলোপ। উচ্চতর মধ্যবিত্তরাও জন্মশাসনপূর্বক নিজেদের সংখ্যা কমাতে লেগেছে, তার ফলে নিম্নতর মধ্যবিত্তরা উচ্চতর মধ্যবিত্ত হ'য়ে উঠছে। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। নিম্নতর মধ্যবিত্তদের পরিবারে আজকাল তিনচারটির বেশি সন্তান দেখতে পাওয়া ভার। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর লোক ক্রমশ নিম্নতর মধ্যবিত্ত হ'য়ে উঠছে। এই হলো 'evolutionary process'। এটা ইংলণ্ডের একটা মস্ত উদ্ভাবন। এতে শ্রেণীবিশেষের লাভ লোকসান হতে পারে, সমস্ত দেশটার লাভলোকসান কিছুমাত্র নেই। পরিবর্তন বিনা কোনো জীবন্ত দেশের জীবন থাকে না, এবং দু-তিন পুরুষ অন্তর মাথাকাটাকাটি না ক'রে প্রতি পুরুষেই একের নির্বাসন ও অপরের রাজ্যপ্রাপ্তি ভালো, না, মন্দ? এতে জাতির চরিত্রটাতেও মরচে ধরে না, নতুন গুণাবলী পুরোনো গুণাবলীকে মুছে সাফ ক'রে দেয়। পুরোনো এ্যারিস্টক্রাসীর সঙ্গে তুলনা করলে নতুন এ্যারিস্টক্রাসীর কোনো গুণ দেখতে পাও না কি? ভুঁইফোঁড় ব'লে ঠাট্টা যদি করো তবে ভুঁইফোঁড়ের ভিতরকার সত্যকে হারাবে। দুটোকে যে এক সঙ্গে বাহাল করেনি এর কারণ ইংলণ্ড একসঙ্গে দুটো সত্যকে সইতে পারে না। ইংলণ্ডের পাকশাস্ত্রে পাঁচমিশেলি নেই। মাছ-মাংসের সঙ্গে আমরা আলু-কপি মিশিয়ে রাঁধি, এ কথা শুনে একজন থ' হ'য়ে গেলেন। 'তা হ'লে তোমরা মাছের কিংবা মাংসের কিংবা আলুর কিংবা কপির বিশেষ স্বাদটি পাও কী করে?' এর জবাব—'তা পাইনে। কিন্তু সমস্তটার সমন্বয়ের স্বাদটি পাই।'

বিপ্লবকে ইংলণ্ড ঠেকিয়ে রাখে প্রতিদিন একটু একটু ক'রে ঘটতে দিয়ে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর রেভল্যুশন যেমন প্রতিদিনের ব্যাপার অথচ কোনোদিন আমরা খবর পাইনে যে আমরাও সেই রেভল্যুশনের ব্যাপারী, ইংলণ্ডেও তেমনি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক রেভল্যুশন নিত্যকারের ঘটনা ব'লে কোনো ইংরেজ টের পায় না কত বড় ঘটনায় সে লিপ্ত। টের পেলে সে ঘটতে দেবে না, সেইজন্য বিপ্লবটাকে কিস্তিবন্দীভাবে ঘটাতে হয়। এ্যারিস্টক্রাটের হাত থেকে শ্রমিকের হাতে শাসনভার আসতে দু'শো বছর লেগেছে; স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন অন্ততঃ একশো বছরের; দেড়শো বছর ধ'রে আক্রমণ ক'রেও টাট্টুঘোড়ার গাড়িকে এখনো ঘায়েল করতে পারা যায়নি, চরকা এখনো কোনো কোনো ঘরে ঘর্ ঘর্ করছে; এবং এমন লোক এখনো অনেক যারা 'immaculate conception' প্রভৃতি খ্রীস্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস হারায়নি। তথাচ ইংলণ্ড কোনোদিন চুপ ক'রে ব'সে নেই, সে প্রতিদিন ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, প্রতিদিন পুরোনো গহনাকে ভেঙে নতুন ফ্যাশানে গড়িয়ে নিচ্ছে। ইংলণ্ডের মন সংস্কারকের মন। পলিটিক্সের মতো সব বিষয়েই ইংলণ্ডে একটা চিরস্থায়ী প্রতিপক্ষ (permanent opposition) আছে—ইংরেজ মাত্রেই কোনো না কোনো বিষয়ে একজন বিদ্রোহী। আবহমান কাল ইংরেজ মাত্রেই ব'লে আসছে—'This state of things must not continue.' আমাদের বুলির সঙ্গে এ বুলির কত না তফাৎ। আরো ভাববার কথা, এ বুলি আবহমান কালের ও প্রতিজনের। 'Something must be done'—এই হলো এ বুলির উপসংহার। একটা নমুনা দিই। সার্কাস ইংলণ্ডে নেই বললেও হয়। তবু সার্কাসে বাঘ হাতী প্রভৃতি বন্য জীবকে নাচানো অনেকের চোখে নিষ্ঠুর ঠেকে। এখনো ইংলণ্ডের কোনো কোনো জায়গায় খরগোস-শিকার পাখি-শিকার চলে, সেটাও নিষ্ঠুর কাজ। খুনিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া তো রীতিমতো বর্বরতা। এই সব বন্ধ করবার জন্যে পার্লামেন্টকে আবেদন করা চলেছে। এই ধরনের আবেদন প্রতি বছর পার্লামেন্টে পৌঁছয়। Vivisectionএর বিরুদ্ধে লোকমত গড়া বহুকাল থেকে চ'লে আসছে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এই সব ছোটখাটো সংস্কার অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অবসর সময়ের উদ্যোগিতার ফল—মহাত্মা গান্ধীর মতো অসাধারণ লোকের সারা সময়ের কাজ নয়। সমাজ-রাষ্ট্রের এক একটা

চক্রাংশ যদি প্রত্যেকে ঘোরায় তবে সমস্ত চাকাটা বোঁ বোঁ ক'রে ঘোরে, সমাজ-রাষ্ট্র দেখতে দেখতে বদলে যায়, অধ্যবসায়ীর পক্ষে জীবিতকালেই চক্র-পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা শক্ত হয় না। প্রত্যেক ইংরেজ মরণকালে এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে, আমিও কিছু না কিছু ঘটিয়েছি। অবশ্য খুব বেশি নয়, খুব অসাধারণ নয়, তবু কিছু!—আমাদের দেশেও যদি সবাই সামান্য ক'রেও কিছু করত—প্রতিদিন করত—তবে আমাদের অসাধারণ মানুষগুলিকে অহরহ চরকার মতো ঘুরতে হতো না, চরকাও ঘোরাতে হতো না এবং আমাদের সাধারণ মানুষগুলি করবার মতো কত কাজ প'ড়ে রয়েছে দেখে 'কোন্‌টা করি, কোন্‌টা করি' ভাবতে ভাবতে জীবন ভোর ক'রে দিত না, কিংবা এক সঙ্গে সব ক'টাতে হাত দিয়ে সব ক'টা মাটি করত না, কিংবা হাজার বছরের আলস্যের হাজারটা নোঙরকে এক বিপ্লবের ঝড়ে বিপর্যস্ত করবার দিবাস্বপ্ন দেখত না। Eternal vigilanceএর বদলে দু'টো দিনের খুনোখুনি খুব স্পেক্‌টাকুলার বটে, কিন্তু দু'টো দিনই তার পরমায়ু।

।। আঠারো ।।

সেদিন যে জেনেরল ইলেক্‌শন হ'য়ে গেল সেটা সম্ভবতঃ ইতিহাসের বিষয়; কিন্তু এত নিঃশব্দে ঘটল যে আমাদের কারুর বিয়েতেও ওর বেশি ধূমধাম হয়। শুনলুম লণ্ডনে না হ'লেও মফঃস্বলে বেশ ধূমধাম হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব সংবাদদাত্রীর পত্রের কিয়দংশ অনুবাদ ক'রে দিই—'আমি লেবারকেই ভোট দিলুম, কারণ প্রথমতঃ, আমি সোশ্যালিস্ট, দ্বিতীয়তঃ, আমাদের এ অঞ্চলে নির্বাচনটা যাদের নিয়ে তাদের একজনের ছিল যৌবন, মগজ ও উৎসাহ, অন্যজনের জরা, জেদ ও অসামর্থ্য। তবু কিন্তু খুবই আশ্চর্য হলুম শুনে যে, H—নির্বাচিত হয়েছেন; কেননা এই অঞ্চলটা সেই থেকেই কন্‌জারভেটিভদের একচেটে হ'য়ে এসেছে যেদিন নোআ তাঁর আর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন। মাত্র গোটা কয়েক ভোটের আধিক্যে H—জিতে গেলেন। আমার ঘরের কাছেই একটা নির্বাচনস্থলী। শুক্রবারের রাত্রি পৌনে তিনটের সময় আমার ঘুম ভেঙে যায় যারা ফলাফল জানবার জন্যে অপেক্ষা করছিল তাদের অতি উদ্দাম আনন্দধ্বনি শুনে। যেই আমার চেতনা ফিরল, চটি পায়ে দিলুম ও ড্রেসিং গাউন গায়ে দিলুম, আর দৌড়ে গিয়ে ঢুকলুম মায়ের ঘরে—সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। মা'কে বিরক্ত ক'রে জানলা খুললুম, মাথা বাড়িয়ে দিলুম, একজন অচেনা পথিককে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে জিতল?' খবরটা শুনে পরম উল্লাসে নিজেব ঘরে ফিরে এলুম।'*

মোটের উপর ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগল। মাসখানেক আগে থেকে এখানে ওখানে বক্তৃতা চলছিল ঘরে ঘরে নির্বাচনপ্রার্থীদের বিজ্ঞাপন ঝুলছিল, এবং কাগজে কলমে খুবই বাণ বর্ষণ হচ্ছিল। কার কোন্‌ পক্ষে ভোট তা এক রকম জানাই ছিল, এক ফ্ল্যাপারদের ছাড়া। যেই মন্ত্রীদল গঠন করুক জনসাধারণের বড় বেশি আসে যায় না, রাষ্ট্র যেমন চলছিল তেমনি চলে। দোকান বাজার থিয়েটার সিনেমা ডাকঘর রেল—কোথাও কোনো পরিবর্তন সুস্পষ্ট নয়। আমার ঘরের কাছে যে সব মজুর কাজ করছে তাদের একজন গান ধরেছে—কাবুলিতে গান গায় ('শ্রীকান্ত')

* H-টি হচ্ছে আর্থার খুড়োর এক ছেলে—খুড়োর আরেক ছেলে আরেক জায়গায় জিতেছেন। খুড়োর নাম তো জানে বিশ্বের সব জনে, আমাদের সেই তাহার নামটি বলব না।

সেও যেমন অবিশ্বাস্য, ইংরেজেতে গান গায় এও তেমনি অপূর্ব। আমরাই এবার দেশের হর্তা কর্তা, আমাদের র‍্যাম্‌জে সর্দারকে রাজা দেশের সর্দার করেছেন, এই ভেবে তার যদি গান পেয়ে থাকে তবে ধন্য বলতে হবে। নইলে এমন সুন্দর মেঘ ও রৌদ্রের খেলার দিনটাতে কি কেবল পাখিই গান গাইত, মানুষ তার পাল্টা গাইত না?

ইংরেজ মজুর শ্রেণীর লোকেরা খুব শিষ্ট—তারা হল্লা করতে দাঙ্গা করতে শান্তিভঙ্গ করতে জানে না। তবে চিরদিন যে তারা এত সুবোধ বালক ছিল ইতিহাসে কিংবা জনশ্রুতিতে ওকথা বলে না। ক্রমে ক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ হবার পর থেকে ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্বীকার করবার পর থেকে তারাই হয়েছে দেশের সবচেয়ে আইন-মানা সম্প্রদায়। আইনের প্রতি অনাস্থা যদি কেউ দেখায় তো সে বড়লোক মোটরওয়ালা কিংবা নাইটক্লাবওয়ালী। মোটের উপর ইংরেজ মাত্রেই অত্যন্ত আইন-বশ। পুলিশকে বাধা দেবার কথা তো কেউ ভাবতেই পারে না, পুলিশকে সাহায্য করবার জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। এদিকে পুলিশের উপরে খবরের কাগজওয়ালাদের কড়া নজর থাকায় পুলিশও যার পর নাই ভদ্র হ'য়ে উঠেছে। আগে এতটা ছিল না, তার প্রমাণ আছে। লণ্ডনে গুণ্ডা নেই। ইংলণ্ড দেশটি ছোট ও সব ক'টি ইংরেজ রক্ত সম্বন্ধে এক হওয়ায় আইন অমান্য করতেও মানুষের সহজে প্রবৃত্তি হয় না, হ'লেও তেমন মানুষের সঙ্গী জোটে না, ধরা পড়াও তার পক্ষে সোজা। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা ইংলণ্ডে ক্রাইম ক'মে আসছে। দ্বি-বিবাহ ও ভিক্ষুকতা—এ দুটোকে আমাদের দেশে ক্রাইম বলে না, এ দুটোর বিচার করতে এদের আদালতের অনেক সময় যায়। দ্বি-বিবাহ বেশ বাড়ছে ব'লেই মনে হয়। এ সম্বন্ধে লোকমত হু হু ক'রে বদলাচ্ছে বলতে হবে। কেননা দ্বি-বিবাহকারীকে বিচারক নাম মাত্র সাজা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন এই শর্তে যে প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকবে না ও প্রথম স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে। যে দেশে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষ-সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি সে দেশে এই ব্যবস্থাই সব চেয়ে ভালো। দুয়ো সুয়ো দুটিকে নিয়ে এক সঙ্গে ঘর করাটা নিতান্ত প্রাচ্য প্রথা, তা'তে পাশ্চাত্যদের সংস্কারে বাধে।

ইংরেজদের সমাজে আইন যা আমাদের সমাজে আচার তাই। অথচ আইন সম্বন্ধে ইংরেজরা প্রতিদিনই বলাবলি করছে যে, 'অমুক আইনটা এত অযৌক্তিক যে সবাই ঐ আইন ভাঙছে, আর পুলিশ নিজেও যখন বোঝে ওটা অযৌক্তিক তখন অপরাধটা দেখেও দেখছে না। এমনি ক'রে একটা আইন ভাঙতে ভাঙতে সব আইন ভাঙতে মানুষ প্রশ্রয় পাচ্ছে। অতএব অমুক আইনটা বদলানো দরকার, তুলে দেওয়া দরকার।' আচার সম্বন্ধে আমরাও যদি প্রতিদিন এমনি বলাবলি করতুম তবে আচারমাত্রের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একান্ত ঔদাস্য এবং অশিক্ষিত সাধারণের একান্ত আসক্তি দেখা যেত না। ইংরেজ সমাজের মাথা হচ্ছে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট।* নিকটে যে আমাদের দেশে পার্লামেন্ট জাতীয় কিছু গ'ড়ে উঠবে ও আমাদের অন্নপ্রাশন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত শাসন করবে এমন আশা করা শক্ত। হিন্দুসভা যদি রাজনৈতিক না হ'য়ে সামাজিক হ'য়ে থাকত তবে হয় তো রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা তারই মধ্যে মূর্তি পেত। আগে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতের নিজস্ব আচার নিয়ামক সভা ছিল এখন সমগ্র হিন্দু সমাজের তেমনি কোনো সভা কেন হয় না, যে-সভায় প্রত্যেক জাতের প্রতিনিধি ব'সে সকল জাতের সাধারণ আচার নির্দেশ করবেন? এই সভার অধীনে সামাজিক আদালত থাকে না কেন, যে আদালতে অনাচারের প্রতিকার হয়? গ্রাম্য স্থবিরদের অত্যাচার থেকে সমাজকে উদ্ধার ক'রে ন্যায়সঙ্গত আচারের প্রতি মানুষকে সশ্রদ্ধ করতে হলে এ ছাড়া অন্য উপায় কী?

---

* কেউ তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি না, শ্যালিকাকন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি না পার্লামেণ্ট এ সম্বন্ধে বিধান দেয়। আগে ছিল চার্চের এলাকা, এখন চার্চের অধীনে আদালত নেই।

ভারতীয় চরিত্রের মূলকথা যেমন সমন্বয়, ইংরেজ চরিত্রের মূলকথা বিনিময়। ইংরেজ কঞ্জুস নয়, কিন্তু হিসাবী। একটা পেনীরও হিসাব রাখে— নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে নিলে নিজের স্ত্রীকে ফেরৎ দেয়। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হওয়া ইংরেজের পক্ষে অসম্ভব, তার খাদ্য আনতে হয় বিদেশ থেকে, বিদেশকে দিয়ে আসতে হয় পরিধেয় বা অন্য কিছু। এমনি ক'রে তার বিনিময়বোধ পাকা হয়েছে, বণিকসুলভ বৃত্তিগুলি পোক্ত হয়েছে। ফরাসী দোকানদার ও ইংরেজ দোকানদার দুইয়ের তুলনা করলে দেখা যায় ইংরেজ দোকানদার কঞ্জুস নয়, ঠকায়ও না, ভদ্রও, কিন্তু দোকানদারের বেশি নয়, মানুষ নয়। ফরাসী দোকানদার দোষে গুণে উল্টো। ইংরেজকে নেপোলিয়ন দোকানদার ব'লে সেই যে প্রশংসাপত্রটা দিয়েছিলেন সেটার মর্ম এমন নয় যে ইংরেজ ঠকায়, সেটার মর্ম ইংরেজ বিনিময়শীল। গ্রাহককে খুশি করতে ইংরেজ দোকানদার প্রাণপণ করে, কিন্তু দেনা পাওনা ভোলে না, আত্মীয়তা করে না। আত্মীয়তার জন্যে ক্লাব আছে, খেলা-ক্ষেত্র আছে। দোকানে শুধু প্রয়োজন-বিনিময়। আমার ঘরের অনতিদূরে স্বামী স্ত্রীর দুটো আলাদা দোকান, দুই আলাদা তহবিল, এক জনের কাছে আরেকজন সওদা করলে তক্ষুনি বিল লিখে দেয়। এদের দেশে একান্নবর্তী পরিবার কেন গ'ড়ে উঠল না? পরিবারও কেন ভেঙে গেল? যে কারণে বার্টার থেকে আধুনিক এক্সচেঞ্জ অভিব্যক্ত হয়েছে, সেই কারণে স্বামী স্ত্রীর দুই উপার্জন দুই তহবিল হয়েছে। সন্তানের জন্যে দু'পক্ষ চাঁদা দেবে, কথা চলছে। তারপর সন্তানরা ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করলে মা-বাবার কাছ থেকে মাইনে পাবে এমন কথাও শোনা যায়। এক কথায়, যার যতটুকু যোগ্যতা সেটা টাকা দিয়ে পরিমাপ করতে হবে। এবং দু'পক্ষের যোগ্যতার ভগ্নাংশ টাকার মধ্যস্থতায় বিনিময় করতে হবে। আমরা ওটা হৃদয়ের মধ্যস্থতায় ক'রে থাকি ব'লে আমরা এখনো বার্টারের যুগে আছি, আমরা 'সভ্য' হ'য়ে উঠিনি। সভ্যতার লক্ষণ ভগ্নাংশ-ভাগ, চুলচেরা বিচার। অতি সূক্ষ্ম ন্যায়। এ দেশের ভিক্ষুক যে দেশলাই বেচবার ভান ক'রে পয়সা চায় এও বিনিময়শীলতার বিকার। কিছু না দিয়ে শুধু নিলে পুলিশে ধ'রে নিয়ে যায়—ওটা একটা ক্রাইম। আইনের চোখে ভিখারী হচ্ছে আসামী!

জগতের অন্ততঃ একটা জাতির এই গুণটি চরিত্রগত হওয়ায় জগতের অনেক ক্ষতি সত্ত্বেও কত লাভ হয়েছে ভাবী কাল তা খতিয়ে দেখবেই। ইংরেজ যত দেশকে শোষণ ও শাসন করেছে তত দেশকে এক সূত্রেও বেঁধেছে, ঐক্য দিয়েছে। মৌমাছি যেমন ফুলদের মধু নেয় তেমনি মিলন ঘটায়। মধুটা ঘটকালীর মজুরী। তা' ছাড়া, মৌমাছিরও তো অন্নদায় আছে। ফুলেরা চাঁদা ক'রে তাকে না খেতে দিলে সে বাঁচে কী ক'রে?

নানা কারণে ইংরেজ এখনো বহুকাল বাঁচবে। প্রথমতঃ, মৌমাছির কাজ এখনো শেষ হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এক প্রকার লীগ অব নেশনসই বটে। নূতন লীগ অব নেশনস যতদিন না শৈশব অতিক্রম ক'রে আন্তর্জাতিক ঘটকালীর দায়িত্ব নেয় ততদিন সে দায়িত্ব ব্রিটিশ ফ্রেঞ্চ ও ডাচ লীগ অব নেশনসগুলোরই থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজী ভাষা ক্রমশ সার্বভৌম ভাষা হ'য়ে ওঠায় পৃথিবীর সবাইকেই ইংলণ্ডে এসে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ ক'রে যেতে হবে কিংবা ইংলণ্ড থেকে লোক নিয়ে নিজের দেশে ও-ভাষায় নিপুণতা লাভ করতে হবে। কিছুকাল আগে যখন ফরাসী ছিল বিশ্বভাষা তখন বিশ্ব ছিল ইউরোপ খণ্ডের অন্তর্গত। এখন বিশ্বের সীমানা বেড়েছে—এখন কাফ্রির সঙ্গে কাশ্মীরীকে কথা কইতে হবে ইংরেজীতে। 'Talkies'এর দৌরাত্ম্যে ইংরেজী ভাষার ছিরি যেমনি হোক, প্রচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের ভাষা শিক্ষা-রাজধানী প্যারিস থেকে উঠে এসে লণ্ডনে ও লণ্ডনের চতুষ্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হলো ব'লে। এদিকে কিন্তু বিশ্বের বাণিজ্য-রাজধানী নিউইয়র্কে পাড়ি দিল ও যন্ত্রশিল্প-রাজধানী বার্লিন। বার্লিন এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর। তার লোক

সংখ্যা বিয়াল্লিশ লাখ। একা বার্লিন শহরেই একশো তেরোটা মাটির উপরের রেল স্টেশন ও একাত্তরটা মাটির নিচের রেল স্টেশন আছে।* এরোপ্লেনের রাস্তা আছে আঠারোটা (গ্রীষ্মকালে), ও সাতটা (শীতকালে)। এখন থেকে প্যারিস হবে কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদ-রাজধানী। এবং জেনেভা রাজনীতি-রাজধানী।

বৃহৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র ছড়ানো—এক দেশের অভিজ্ঞতা আরেক দেশে পৌঁছে দেওয়া ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের কাজ। সেই সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগে, ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতা ইজিপ্টের। ইংরেজ জাতিকে বিধাতা ঘরছাড়া ক'রে সৃষ্টি করেছেন, এরা চ'রে বেড়ায়, খুঁটিতে বাঁধা থেকে জাবর কাটতে জানে না। এই কারণে ইংরেজের সেই সব কোমল বৃত্তিগুলি নেই যা আমাদের আছে, (অনেকটা) ফরাসীদের আছে। কোলের ছেলেকে ভারতবর্ষ থেকে কিংবা হংকং থেকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়, বয়স্ক ছেলের বিয়ের পরে এক শহরে থেকেও কদাচ দেখতে আসে—এমন মা-বাবা একমাত্র ইংলণ্ডেই সম্ভব। আমাদের যেমন মামা-মামী মাসী-মেসো কাকা-কাকী ও পিসে-পিসীতে ঘরসংসার জমজমাট, এদের তেমন নয়; গার্হস্থ্য বৃত্তিগুলি এদের ভোঁতা। হৃদয়কে চরিতার্থতা দিলে কাজ নষ্ট যে হয়! বিউটির চেয়ে ডিউটিকে ইংরেজ বড় ব'লে মানে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় প্রেমের কবিতা ইংরেজী ভাষায় যত ও যত রকম ও যত গভীর অন্য কোনো ভাষায় তত নয়। এক চণ্ডীদাস ছাড়া কোনো বাঙালী কবি কোনো দিন সর্বস্ব পণ ক'রে ভালোও বাসেননি, ভালোবাসার কবিতাও লেখেননি। গদ্য কবিদের মধ্যে শরৎ চট্টোপাধ্যায়। ইংরেজীতে প্রেমিক কবির সংখ্যা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, love কথাটার সংজ্ঞা কী তা কোনো ইংরেজ জানে না, তবু বিবাহ করবার আগে love করতে হবে এ কথা অন্য কোনো সমাজ এতটা জোরের সঙ্গে বলেছে ব'লে আমার মনে হয় না। আমাদের সমাজে ওটা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ—আমাদের বিবাহ ব্রহ্মচর্যের পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করবার তোরণ। ধর্মের পরে কাম, তার আগে নয়। ফরাসীরা যদিও প্রেমের নামে গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠে ও আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরদের মতো সহস্রবিধ প্রেমের লক্ষণ আওড়ায়, তবু ও-প্রেম মস্তিষ্কজাত (cerebral) ও বচনবহুল। ওরা মাথা দিয়ে অনুভব করে ও কথা দিয়ে তন্ন তন্ন করে; কিন্তু বাণবিদ্ধ কুরঙ্গের বোবা আকুতি ইংরেজরাই বোঝে। Love-making ও love এক জিনিস নয়। প্রথমটার চর্চা প্যারিসের একচেটে হ'তে পারে, কেননা প্যারিসের লোকের হাতে কাজ নেই; দ্বিতীয়টা ইংরেজের মতো অত্যন্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল-প্রকৃতি কাজের মানুষদের জীবনে অপ্রত্যাশিত রূপে এসে বহু বৎসরের কাজ একদিনে নষ্ট ক'রে দিয়ে যায়।

।। উনিশ ।।

ইউরোপের শরৎকাল। পাতা ঝরা শুরু হয়ে গেছে। এই তো সেদিন বসন্ত এলো সবুজ পাতার পোষাক পরে, যেন কোনো ফ্যান্সি ড্রেস-পরা নাচের অতিথি। এরই মধ্যে রঙ্গ শেষ হয়ে এলো, বাতি নিবু নিবু, সভা ভাঙে ভাঙে। এর পরে পোশাক খুলে ফেলে বিছানায় গা মেলে দিতে হবে।

* এ ছাড়া আধা-উপরে আধা-নিচের রেল স্টেশন উনচল্লিশটা।

এও এক উদ্যোগ পর্ব।

আমাদের দেশে শীতের জন্য প্রস্তুত হবার কাল হেমন্ত। শরৎ আমাদের দেশে শীতের অগ্রদূত নয়, আমাদের শরৎ স্বাধীন। আমরা শরতের মুখ চেয়ে দিন গুণি; শরৎ আসছে শুনে তার আগমনী গাই; শরৎ চলে গেলে কাঁদি ও কাঁপি। কিন্তু এদের শরৎ যৌবনের শেষের দিকে প্রথম পাকা চুলটির মতো অনাহূত আগন্তুক; আনন্দের নয় আতঙ্কের পাত্র। এর পিঠ পিঠ শীত আসবেন। তিনি যেমন তেমন অতিথি নন, স্বয়ং দুর্বাসা। তাঁর অভিশাপে গুটি কয়েক evergreen জাতীয় তরু ছাড়া সকল তরু তরুণীর পত্রসজ্জা নিঃশেষে খসে পড়বে; তারা লজ্জায় কাঠ হয়ে রইবে।

ইংলণ্ড থেকে থুরিঙ্গিয়ায় এসেছি। গ্যয়টে শিলার বাখ্-এর থুরিঙ্গিয়া, বনরাজিনীলা। অঞ্চলটি বিরল বসতি নয়, গ্রামে গ্রামে কারখানার চিমনী কর্মব্যস্ততার প্রমাণ দিচ্ছে। তবু অঞ্চলটির হাতে অফুরন্ত ছুটি। এতে যেন আকাশের অংশ আছে, আকাশের ব্যাপ্তি। প্রাচীন তপোবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তার সঙ্গে থুরিঙ্গিয়ার এই মাটির আকাশটিকে বেশ মানায়। বনের দ্বারা আকাশ ঢাকা পড়বে না, যদি পড়ে তো তপোবনে ও রাজনগরীতে প্রভেদ কোথায়? মানবাত্মার সহজ মুক্তিটিকে রাত্রিদিন উপলব্ধি করবার জন্যেই তপোবন। তপোবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ দশদিকব্যাপী স্পেস্।

থুরিঙ্গিয়ার হাওয়া সমুদ্রবক্ষের হাওয়ার মতো মুক্ত এবং মুক্তির স্বাদে স্বাদু। ইচ্ছা করে সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে শোষণ করি। শহরে থেকে বাতাস আমরা আধপেটা খাই, আমাদের নাসার ক্ষুধা মেটে না। লণ্ডনের মতো শহরে নাক বুঁজেই থাকতে হয়, অভ্যাসের দোষে পার্কের বাতাসও গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বয়ং পঞ্চম জর্জেরও সাধ্য নেই যে লণ্ডনের জল হাওয়া বৃষ্টি কুয়াশার অতীত হন। অথচ থুরিঙ্গিয়ার চাষীরাও তাঁর তুলনায় ভাগ্যবান।

গ্যয়টের যুগে থুরিঙ্গিয়া আরো বন্য ও আরো বিজন ছিল, সন্দেহ নেই। তাঁর কর্মস্থল ভাইমার এত ছোট যে প্রায় পল্লীবিশেষ, তখনকার দিনে নিশ্চয়ই ছিল অরণ্য-পল্লী। একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীও আছে তাতে। গ্যয়টের দরবারী মনকে অরণ্য সর্বদাই ডাক দিত, তাঁর বাগানবাড়িটি অরণ্যেরই অন্তর্গত একটি কুটীর। দরবার থেকে ছুটি নিয়ে সেইখানে তিনি প্রস্থান করতেন। সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করেও যে তিনি মুক্ত পুরুষ ছিলেন, অন্ততঃ মুমুক্ষু পুরুষ ছিলেন, তার কারণ তিনি কেবল নাগরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরণ্যকও। গ্যয়টের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে সমন্বয়, অন্ততঃ যে সমন্বয় প্রয়াস দেখি, সে এমনি করেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি এ্যারিস্টক্রাট তো ছিলেনই, অধিকন্তু প্রকৃতির খুব কাছে কাছে ছিলেন, অন্ততঃ থাকবার জন্যে প্রাণপণ করেছিলেন।* আমি এতবার 'অন্ততঃ' কথাটা ব্যবহার করলুম, তার কারণ সকলের মতো আমারও ধারণা গ্যয়টের ভিতরটায় দু'বেলা কুরুক্ষেত্র চলত, সত্যে অসত্যে অষ্টপ্রহর সংগ্রাম। তবু আমার বিশ্বাস তাঁর মধ্যে একটি সহজ সর্বজ্ঞতাও ছিল। তিনি ছিলেন অন্তরে ঘটতে থাকা দ্বন্দ্বের অতীত (above the battle)। মহামানবের মতো মহামানবের এই কবিও ছিলেন স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না, নিছক দ্রষ্টা—বিশ্বরূপদ্রষ্টা। গ্যয়টের যতগুলি প্রতিকৃতি আমি দেখেছি সেগুলিতে তাঁর চক্ষু আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর সকল কিছুর চেয়ে। তাঁর দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠযুগ তাঁর চক্ষুরই বাহন; তাঁর চক্ষুরই সংকল্প তাঁর ওষ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে।

'স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না'—অর্থাৎ তাঁর সত্যকারের যে তিনি, তিনি স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না।

---

* তাঁর অসংখ্য সুপাত্রীর কারুকে বিবাহ না করে এ্যারিস্টক্রাট তিনি বিবাহ করলেন কি না এক চাষানীকে, তাও বহুকাল একসঙ্গে বাস করবার পরে। এর অর্থ কি এই নয় যে তিনি চীনে মাটির পুতুলের কাছে যা পেতেন তার বেশি পেয়েছিলেন মাটির মেয়ের কাছে? প্রকৃতির হাতে গড়া প্রাণময়ী নাবীর কাছেই মনোময় পুরুষের পরিপূরকতা।

তা' বলে তাঁর মধ্যে স্রষ্টা ছিল না বিদ্রোহী ছিল না এমন কদাচ নয়। বিশুদ্ধ বিদ্রোহের সুর তো তাঁর সৃষ্টির মর্ম ভেদ করে উঠছে 'I am the spirit that denies!' এ বিদ্রোহ অন্নবস্ত্রের জন্যে নয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে নয়, এমন কি মুক্তির জন্যেও নয়। বিদ্রোহের জন্যে বিদ্রোহ। উদ্দেশ্য তার সে নিজেই। যেমন, নটরাজের নৃত্য। সাধারণত বিদ্রোহ বলতে আমরা বুঝি সশস্ত্র ভিক্ষুকতা। ভিক্ষা পেলেই বিদ্রোহের ক্ষান্তি। কিন্তু Mephistopheles বলে —

I am the spirit
That evermore deny—and in denying
Evermore am I right—'No!' say I, 'No!'
To all projected or produced—whate'er
Comes into being merits nothing but
Perdition—better then that nothing were
Brought into being,—what you men call sin—
Destruction—in short, evil—is my province,
My proper element

মানুষের মধ্যে এক জন দায়িত্ববান বিধাতা আছেন। আর আছে একজন দায়িত্বহীন অবাধ্য। এই দু'জনকে নিয়েই এবং দু'জনের অতীত হয়েই মানুষ। এই মানুষের মহানাটক লিখেছেন এমনি মানুষ গ্যেটে।

বিশুদ্ধ দৃষ্টির তপস্যা ভারতবর্ষের পরে এক জার্মানীই করে এসেছে, তাই জার্মানীর উপর ভারতবাসীর এত পক্ষপাত। ভারতবর্ষের বাইরে মাত্র একটি ভারতবর্ষ আছে, যেখানে মানুষ ইংরেজের মতো নাগরিক মুক্তিকে কাম্য করেনি, একমনে কামনা করেছে আত্মার মুক্তি। তাই ইংরেজ ফরাসীরা যখন বড় বড় সাম্রাজ্যের মালিক হলো, জার্মানরা তখনো দার্শনিক তর্কে মশগুল এবং সংগীতের সম্মোহনে আবিষ্ট। হোহেন্‌জোলার্নরা জোর করে এদের ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়, বিসমার্ক এদের অত্যন্ত কেজো করে তোলেন। আধ্যাত্মিক একাগ্রতাকে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে প্রয়োগ করে এরা অচিরাৎ এক বিভীষিকা হ'য়ে উঠল, যেন নৈমিষারণ্যের যোগীরা হঠাৎ ধনুর্বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে মৃগয়ায় বাহির হলো। গত যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় তার মনে লাগেনি, কেননা আসলে ওটা হোহেন্‌জোলার্নদেরই পরাজয়। জার্মানরা স্বভাবত যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র দাবী প্রত্যেক জাতিকেই কতকটা স্বভাবভ্রষ্ট হতে বাধ্য করছে, জার্মানীকেও। তাই জার্মানীর অতি-কৃষ্ট মন যন্ত্রশিল্পের দিকে ধাবিত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পে জার্মানীর উন্নতি যেমন অদ্ভুত তেমনি কিম্ভূত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে গোয়েন্দা পুলিশ হ'লে যেমন দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে এও তেমনি। এর দয়া মায়া নেই, রুচি-নীতি নেই। বার্লিন শহরটার মতো রাক্ষুসে শহর আমি দেখিনি। মানুষের একটা হাত যদি বাঘের একটা থাবা হয়ে ওঠে তবে ওটাকে ক্রমবিকাশ বলা চলে না। বার্লিনের প্রাণ আছে, হৃদয় নেই, রুচি নেই, মাত্রা-জ্ঞান নেই।

বার্লিনের পেছনে দীর্ঘকালের ইতিহাস না থাকায় শহরটা কলকাতার মতো অনভিজাত। লণ্ডন প্যারিস রোম ভিয়েনা—এমন কি মিউনিক ফ্রাঙ্কফোর্ট ড্রেসডেন কোলোনের সঙ্গে ওর নাম করতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ওর সঙ্গে মানুষের মহত্ত্বের স্মৃতি জড়িয়ে নেই জড়িয়ে রয়েছে মানুষের দস্যুতার স্মৃতি। হোহেন্‌জোলার্নরা বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করেছেন ও তাঁদের শহরটাকে তাঁদের সৈন্যদলের মতো পিটিয়ে মজবুত করেছেন। লণ্ডনের নগরবৃদ্ধেরা রাজাদের কাছ থেকে ক্রমাগত নতুন অধিকার আদায় করেছেন, ইংলণ্ডের অন্য সর্বত্র যখন যথেচ্ছাচার চলিত ছিল

একমাত্র লণ্ডন তখন নিজের নিয়মে নিজে চালিত। প্যারিসও স্বায়ত্তশাসনের দাবী কোনোদিন ছাড়েনি, যদিও সে দাবী পূর্ণ হয়েছে কদাচিৎ। জার্মানীর 'স্বাধীন নগরগুলো' লণ্ডন প্যারিসের মতো বৃহৎ না হলেও মহৎ। কিন্তু বার্লিন ছিল হোহেন্‌জোলার্নদের খাস সম্পত্তি, সবে সেদিন স্বাধীন হয়েই তার একমাত্র অভিলাষ দাঁড়িয়েছে আমেরিকান হ'য়ে ওঠা।

প্রাসিয়ানদের দেহের মতো মনও বোধ হয় অত্যন্ত ভারি। বার্লিন যেন একখানা রান্নাঘরের শিল, মাটির উপরে এমন চেপে বসেছে যে ভূমিকম্প হ'য়ে গেলেও নড়বে না। খুব পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিতও বটে, কিন্তু জলদগম্ভীর। বার্লিন থেকে লাইপৎসীগে এলে মনটা প্রজাপতির মতো লঘুভার হয়ে উড়তে চায়। সংগীতের রাজধানী,—সুপ্রাচীন, সুপরিকল্পিত, নাতিবৃহৎ। আধুনিকতার দাবী লাইপৎসীগও মেনেছে, কিন্তু ইহকালের জন্যেও পূর্বকাল খোয়ায়নি। লাইপৎসীগ ছাপাখানার রাজধানীও বটে, কিন্তু ছাপাখানার নিনাদ সংগীতকে ও ছাপাখানার কালি নগরসৌষ্ঠবকে ছাপাতে পারেনি।

ড্রেসডেনকে সুন্দর না বলে সুশ্রী বলা ভালো। আমাদের লক্ষ্ণৌয়ের সগোত্র। ওর বাস্তুকলায় তেজ নেই, অলঙ্কার আছে। গির্জে এমন হওয়া উচিত যাতে প্রবেশ করবামাত্র মন ভক্তিতে ভরে ওঠে, অহঙ্কার চোখের জলে গলে যায়, মেরীর মাতৃমূর্তি ও যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি জীবনকে বিষাদ মধুর করে। ড্রেসডেনের ফ্রাউয়েন কির্‌খে তেমন গির্জে নয়। মূর্তি আছে বটে, কিন্তু তাতে মূর্ত হয়েছে শিল্পীর কিংবা শিল্পী যাদের ভৃত্য তাদের বাবুয়ানা । গির্জেতে মানুষের হাঁটু পাতবার কথা, কিন্তু থিয়েটারের মতো আয়েস ক'রে বসবার আয়োজন করা হয়েছে উপরে নিচে। ড্রেসডেন কতকটা ভিয়েনার মতো। লাবণ্যকে এরা ক'রে তুলেছে লালিত্য। পথে ঘাটে ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, কিন্তু এমনি তার আড়ম্বরপ্রিয়তা যে কোনো কোনো স্থলে পাথরের উপর সোনার গিল্টি করা। ভঙ্গিতেও সরলতার বদলে সর্পিলতা। কিন্তু সর্বত্র একটি লঘুতা সুপরিলক্ষ্য। প্রাসিয়ার বিপরীত। পাথরের মূর্তি যেন মোমের মূর্তির মতো।

বার্লিন আমাকে হতাশ করেছিল, ড্রেসডেনও করল; ভ্রমণের খাতিরে ভ্রমণ করাতে মোহভঙ্গ নেই, কিন্তু মরীচিকার সন্ধানে ভ্রমণ করা বিড়ম্বনা। কল্পনার আকাশে যা ফোটে মাটির কুসুমে তার আদল কোথায়? মানুষের কল্পনগরী কল্পনাতেই থাকে। তবু কোনো কোনো স্থান আমাকে কল্পনাতীত আনন্দ দিয়েছে। যেমন, প্যারিস, থুরিঙ্গিয়া, চেকো-স্লোভাকিয়া। কল্পনাকে যথাসম্ভব ফাঁকা রেখে বেড়ানো ভালো। তা হ'লে স্বপ্ন ছুটবে না, স্বপ্ন জুটবে।

কেন ড্রেসডেনকে সুন্দর ব'লে কল্পনা করেছিলুম? সেখানকার চিত্রশালায় রক্ষিত Sistine Madonnaর প্রতিলিপি দেখে। ফুল সুন্দর হ'লে ফুলদানীও সুন্দর হবে এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক। নইলে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা হয় না— বাস্তবে যাই হোক আদর্শে অসঙ্গতি আসে। ভেবেছিলুম ঐ একখানি ছবি যে সৌন্দর্য বিকীরণ করছে তাই দিয়ে ড্রেসডেন সুন্দর হ'য়ে গেছে। তা হয়নি। তবু সুখদৃশ্য হয়েছে, সেই অনেক।

Sistine Madonnaকে প্রত্যক্ষ ক'রে ধন্য হয়েছি। বুঝেছি, মানুষ বংশানুক্রমে মরবে, কিন্তু এমন আনন্দকে মরতে দেবে না। রাজা গেছেন, রেপাব্লিক এসেছে, সেও যাবে, কমিউন আসবে। কিন্তু যৌতুকরূপে যে নিধি একদিন ইটালি থেকে ড্রেসডেনে এসেছিল পৃথিবীশুদ্ধ মানুষ তাকে বাঁচিয়ে রাখবেই। রাফেল মানুষের দেশে সাঁইত্রিশ বছর মাত্র ছিলেন। তাঁর চেয়ে দীর্ঘজীবী লক্ষ লক্ষ ছিল ও আছে। কিন্তু সকলে যাকে মরলেও মরতে দেয় না সেই ভাগ্যবান অমর।

তুলি ও রঙ দিয়ে পটের উপর রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করতে বিধাতাও পারতেন না। গতিহিল্লোলময়ী ম্যাডোনার বসনের খস খস শুনতে পেলুম। শিশু যীশুর সর্বাঙ্গের চপলতা

চাউনিতে একীকৃত হয়েছে। তরুণী মা তাঁর দুরন্ত শিশুকে কোল থেকে নামতে দিচ্ছেন না, তাঁর চাউনিতে ভয়। দেবতা এখানে প্রিয় হয়েছেন, মানুষ হয়েছেন।

ড্রেসডেন থেকে এলবে নদী ধরে প্রাগ যাবার পথটি অতুলনীয়। নদীর বাঁধ যেন উঁচু হতে হতে পাহাড় হয়ে গেছে, তাও দেয়ালের মতো খাড়া। চেকো-স্লোভাকিয়া ওরফে বোহেমিয়া পর্বত-বন্ধুর, যদিও প্রাগ অঞ্চলটি সমতল। প্রাগ নিজে বন্ধুর ও পাষাণ-পিহিত। প্রাগের বিশেষত্ব, প্রাগ প্রাচীন অথচ অত্যন্ত নবীন। কল-কারখানাতে ও সুপরিপাটি বস্তিতে এর প্রাচীন অংশটি ঢাকা প'ড়ে গেছে। রাজপথের ভিড় ঠেলে (প্রাগের লোকসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে স্বাধীনতার পর থেকে) পুরাতন শহরের খানিকটা দেখা যায়, কিন্তু প্রাগ যেমন কালের সঙ্গে তাল রেখে ছুটেছে, মনে হয় অচিরেই আমেরিকান কলেবর ধারণ করবে।

চেকরা দীর্ঘকাল নাবালক থাকার পর এই সেদিন আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, উৎসাহ তাদের তরুণ বয়সের অরুণ আভার মতো দিগ্‌দিগন্ত উৎসর্পী। অন্যান্য দেশের কোনোটাতে জেতার মোহভঙ্গ, কোনোটাতে পরাজিতের গ্লানি, কিন্তু চেকো-স্লোভাকিয়ায় উর্ধ্বপ্লাবী নির্ঝরের মতো আকাশের সঙ্গে কুস্তি করবার আগ্রহ। (চেকদের এরোপ্লেন সংখ্যা অনুপাত-অতিরিক্ত) বোহেমিয়া দেশটি পুরাতন হলেও চেকরা নতুন জাতি, তাদের অতীত বড় নয় ব'লে তাদের ভবিষ্যতের উপর মন। এই কয়েক বছরে তারা বৈষয়িক উন্নতি তো করেইছে শিক্ষা দীক্ষায় ইউরোপকে নতুন আদর্শ দিয়েছে, নতুন সম্ভাবনা দেখিয়েছে এবং সংগীতে তাদের এত একাগ্রতা দেখে মনে হয় নিকট ভবিষ্যতে তাদের ভিতর থেকেই ইউরোপের গুণীদের আবির্ভাব হবে।

চেকদের রক্ত নতুন, সেটা তাদের প্রথম সুবিধা। চেকদের মনের জমিতে অস্ট্রিয়ান-জার্মানরা ভাবের পলিমাটি বিছিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা তাদের পরম সুবিধা। আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে দ্বিতীয়টা পেয়েছি, অথচ নিজেদের কাছ থেকে প্রথমটা পাইনি বলেই ভাবনা। এর প্রতিকার বর্ণ-সাঙ্কর্যের দ্বারা রক্তকে নতুন করা। সভ্যতার প্রাচীনতা ভালো জিনিস, কিন্তু রক্তের প্রাচীনতা মারাত্মক। রক্ত-কৌলীন্যের মোহে যে জাত মজেছে, তার সভ্যতাও মিউজিয়ামের মমি হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভারতের নবীনতা আরো জরুরি। আমাদের অতীতের চেয়ে আমাদের ভবিষ্যৎকে যেদিন দীর্ঘতর বোধ হবে সেইদিন আমাদের নিশান্ত হবে, আমরা প্রভাতের চাঞ্চল্য সর্বাঙ্গে অনুভব করব। স্বাধীনতার বিপুল দায়িত্ব বইবার প্রসন্ন ধৈর্য সেই চাঞ্চল্যের আনুষঙ্গিক।

নুর্নবার্গ সুন্দর। কিন্তু নুর্নবার্গ একটি নয়, নুর্নবার্গ দু'টি। পুরাতন নুর্নবার্গের সীমানার বাইরে নতুন নুর্নবার্গ তার অসংখ্য কারখানায় স্টীম এঞ্জিন, মোটর গাড়ি, খেলার পুতুল তৈরি করছে— পুরাতন নুর্নবার্গ তার স্বকীয়তা রক্ষা ক'রে পৃথিবীর চারুশিল্পামোদীদের তীর্থস্থলী হয়েছে। প্রাচীন রীতির বাস্তুগুলি তেমনি আছে। ভ্রম হয় এ কোন্ শতাব্দীতে এসে পড়লুম। দুর্গপ্রাচীর, তোরণ, গম্বুজ, পরিখা বিংশ শতাব্দীর বাস্তবের মাঝখানে মধ্যযুগের স্বপ্নকে ধরে রেখেছে, মধ্য রাত্রির স্বপ্নের জের মধ্য দিবায় চলেছে।

নুর্নবার্গ যে দিক দিয়ে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা চারুশিল্পের নয় যন্ত্রশিল্পের দিক। জার্মানীতে দেখা গেল যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের কেবল যে প্রয়োজনসিদ্ধির সম্বন্ধ আছে সে কথা সত্য নয়, যন্ত্রের প্রতি মানুষের গভীর মমতা আছে। জার্মানীতে যন্ত্রকে মানুষ ততখানি ভালোবেসে সেবা করে ইংলণ্ডে ঘোড়াকে যতখানি কিংবা ভারতবর্ষে গোরুকে যতখানি। বার্লিনের লোক যেন যন্ত্রের আত্মাকে দেখতে পেয়েছে, যন্ত্র যেন তাদের কাছে যন্ত্র নয়, আত্মীয়। আধুনিক যুগে যন্ত্র যে সব সমস্যার সূত্রপাত করেছে তাতে যন্ত্রের প্রতি রাগ হবারই কথা। কিন্তু ও যে মানুষের আত্মজ। পুত্র কি পিতামাতাকে কম জ্বালাতন করে?

হল্যাণ্ড আমাকে অবাক করেছে। দেশটি আমাদের যে কোনো একটা বড় জেলার চেয়ে বড় নয়। তবু তার সাম্রাজ্য আছে তার থেকে বহু সহস্র ক্রোশ দূরে। তার চেয়েও যা বড় কৃতিত্ব—হল্যাণ্ড সমুদ্রকে পিছু হটাতে লেগেছে। সমুদ্র হল্যাণ্ডের বেগার খেটে দিয়ে আসছে কবে থেকে। তার খালে জল ভ'রে দেয়, ক্ষেতে জল সেচ করে, তার অসংখ্য জাহাজকে পাণ্ডার মতো পৃথিবী পরিক্রমায় নিয়ে যায়। ইংরেজ সমুদ্রের কাছ থেকে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি আদায় করতে পারেনি, ওলন্দাজ তার বেশির ভাগ ভূমি সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে কেড়ে নিয়েছে।

হল্যাণ্ড এখন বিশ্বজনের শান্তিপঞ্চায়েৎকে চণ্ডীমণ্ডপ ছেড়ে দিয়েছে। The Hague শুধু হল্যাণ্ডের রাজধানী নয়, আন্তর্জাতিক রাজধানীগুলোর অন্যতম। আমি যে সময় হেগে ছিলুম সে সময় ফরাসী-ইতালিয়ান-বেল্‌জিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফিলিপ স্নোডেনের বচসা চলছিল। হোটেলগুলোতে নানা নেশনের পতাকা উড়ছিল, সমুদ্রের কূলে লোকারণ্য। কত দেশের লোক! সমুদ্রকূলে স্ত্রী স্বাধীনতার মাত্রাটা কিছু বেশি হয়েই থাকে।

বেলজিয়মের রাজধানী প্যারিস। ব্রাসেল্‌স্ যেন প্যারিসের শহরতলী। ব্রাসেল্‌সের যেটুকু প্রাচীন সেইটুকু তার বিশেষত্ব। যেমন তার গির্জে। এবং টাউন হল (Hotel de ville)। প্রাচীন জার্মানীতে প্রতি নগরেই রাট্ হাউস ছিল, এগুলি সার্বজনীন ক্রিয়াকর্ম আমোদ আহ্লাদ আহার-বিহারের কেন্দ্র। ইংলণ্ডের টাউন হলগুলিতে নাচ গান হয়। আমরা টাউন-হল করেছি, কিন্তু বক্তৃতার জন্যে। আমাদের নগরগুলি কেন্দ্রহীন।

।। কুড়ি ।।

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে যখন ইংলণ্ডের আকাশে বাতি নিবিয়ে দিয়েছে, অষ্ট প্রহর বৃষ্টি ও বৃষ্টির আনুষঙ্গিক শীত, তখনো ইটালির আকাশ নীল নির্মেঘ সূর্যকরোজ্জ্বল। বনে বনে তখনো পাতা ঝরার দেরি। ছায়াতরুতলে রৌদ্র সন্ত্রস্তা ধরণীকে তখনো আশ্রয় ভিক্ষা করতে হয়।

ইটালি যেন আমাদের দেশ। সূর্য যে যে দেশের প্রতি সদয় তাদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত মিল আছে। গাছপালার মতো মানুষও বেঁটে খাটো এবং প্রভূতসংখ্যক। নারীর মুখে সুকুমার কমনীয়তা এবং বেশে ও কেশে সেকেলে রীতি। ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী ভগবানের মতো সর্বত্র অবস্থিত। চর ও চোর পবনের মতো অদৃশ্য বিহারী। মানুষের মতো ও মদের মতো মাটিও রঙিন মেঘও রঙিন। কোথাও স্রোতোবেগহীন নীলসলিল হ্রদের অঙ্কে সৌধশোভিত বিলাসদ্বীপ, হ্রদকে প্রায় বেষ্টন করেছে আল্পস্ পর্বতের শাখা প্রশাখা। কোথাও দিগন্তপ্রসারী সমতল শস্যক্ষেত্র, তিন হাজার বছরের পুরাতন জমি, তার উপর দিয়ে কত যুগ-যুগান্তরের সৈনিক জয়যাত্রায় গেছে ও তার নিচে কত নগরী প্রোথিত হয়েছে। কোথাও ভগ্ন ক্রীড়াস্থলী, ভগ্নাবশিষ্ট স্নানাগার, ভাঙা মঠ ভাঙা গির্জা। রাশি রাশি স্মৃতিচিহ্ন স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করছে। মানুষ তিন হাজার বছরের পাষাণময় চিৎকারে কর্ণক্ষেপ না করে একটা দু'দিনের পুরোনো হাল্কা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাজ করছে। লক্ষ লক্ষ প্রস্তর-মূর্তি দেশটাকে যেন মিউজিয়ামে পরিণত করতে চায়, কিন্তু দেশ তাদের প্রতি দৃক্‌পাত করছে না, বিদেশীরা করছে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইটালির ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সকলেই লক্ষ্য করেছেন। আজকের ইটালি দেখলে কালকের ভারতবর্ষ দেখা হয়। ইটালি যথাসম্ভব তার স্বধর্মের অনুসরণ করছে। সে যে ইংলণ্ড নয় ইটালি এ কথা যদি পদে পদে মনে রাখি তবে ইংরেজের চোখে ইটালি দেখার মতো ভুল দেখা ও ইংরেজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ইটালিকে বিচার করার মতো ভুল বিচার ঘটে না। ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ রোমান ক্যাথলিক চার্চের বংশে জন্মেছে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। একচ্ছত্র অধিনায়কের আজ্ঞাধীন অক্ষৌহিণী ইটালিতে নতুন নয়। সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টিকে বিলীন করা ইটালিয়ের চিরাভ্যাস। চার্চ যদি বহির্মুখীন না হতো তবে ইটালি গত সহস্র বৎসরে বহুধা বিভক্ত হতো না এবং আজ তার বিলম্বিত প্রতিকার স্বরূপ ফ্যাসিস্ট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করত না।

তা করুক, কিন্তু নিজের ঘরের বাইরে পরের ঘরে পদক্ষেপ করতে চায় কেন? বিশ্ব শুদ্ধ সবাই ফ্যাসিস্ট হতে যাবে কোন্ দুঃখে?

এর উত্তর, ইটালীয় চরিত্র বাঙালী চরিত্রের মতো কল্পনাকে খাটো করলে বল পায় না। মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো ভাণ্ডার। কিন্তু বাঙালী চরিত্রে যা নেই কিংবা অল্প আছে, ইটালির চরিত্রে সেই অভিনয় শীলতা বিদ্যমান। ইটালীয়রা অভিনয়ের পোষাক পরে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলতে ভালোবাসে। তাদের চুল ছাঁটা ও টেরি কাটা তাদের জুলপি ও ভুরু অভিনয়ের মেক্-আপ। তাদের মুখের মাত্রাহীন অত্যুক্তি তাদের নিজেদের কানে সুধাবর্ষণ ও প্রাণে আত্মপ্রসাদ বিতরণ করে। সত্যিই তারা জগৎ গ্রাসিতে আশয় করেনি, যদি বা করে থাকে তবে ও জিনিস তাদের ক্ষমতায় কুলাবে না এ তারা মর্মে জানে। তবু ও কথা থিয়েটারী ঢঙে না বলতে পারলে তারা নিজেদেরকে কাপুরুষ জ্ঞান করে।

বাষ্প থেকে জল হয়, জল থেকে হয় বরফ। বরফের অবয়ব বাষ্পের আদল খুঁজলে নিরাশ হতে হয়। তেমনি আধুনিক ইটালীয়ের চরিত্রে রোমক চরিত্রের আদল। সে ওজস নেই, সে ঋজুতা শুধু ইটালীয় চরিত্র থেকে কেন, সভ্যমানব চরিত্র থেকে গেছে, এবং সেই শাসন কৌশল ইংরেজ চরিত্র আশ্রয় করেছে। কিন্তু ততঃ কিম্? মাৎসিনি, গারিবাল্ডি, ক্রোচে ও দুজে (Duse)র জাতিও নানাগুণে ভূষিত। একটি বৃহৎ আদর্শবাদ ইটালীয় চরিত্রের কোথাও উহ্য আছে। তারই বলে ধীরে ধীরে ইটালি জগৎ সভায় আসন করে নিচ্ছে, কিন্তু এতটা ঢক্কানিনাদ সহকারে যে কান জানে ঢক্কাই সত্য।

যে ইটালি পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে সৌন্দর্যস্রষ্টারূপে শ্রেষ্ঠ এবং অমর সে ইটালি রোমক যুগের নয় আধুনিক যুগের নয়, সে ইটালি দান্তে পেত্রার্কা লেওনার্দো মিকেলাঞ্জেলোর মায়াময় যুগের, যে যুগে রোমান্স ছিল মানুষের জীবন বস্তু। শেক্স্পীয়রের নাটকে ও ব্রাউনিঙের কাব্যে আমরা তার আলেখ্য দেখেছি। একই মানুষ পাথর কেটে মূর্তি গড়ছে, প্রাচীরগাত্রে ছবি আঁকছে, শব ব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব চর্চা করছে, নগররক্ষী সৈন্যের নায়ক হচ্ছে, নির্বাসিত হয়ে নানা সঙ্কটের আবর্তে পড়ছে। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন'। এদের প্রেম কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি বীরত্বপূর্ণ তথা করুণ। আমাদের যুগে সৌন্দর্যসৃষ্টির স্রোত আবর্জনায় মন্থর, নানা কুটিল থিওরীর কচকচি শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্তিকে ব্যাহত করছে। মধ্যযুগের সহৃদয়তার পরিবর্তে আধুনিক যুগের সমস্তিষ্কতা হয়েছে শিল্পসৃষ্টির কষ্টিপাথর। মধ্যযুগে সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্ব ছিল শিল্পীমাত্রের কাম্য, আমাদের যুগের শিল্পী কেবলমাত্র শিল্পী হয়েই ক্ষান্ত। সেই জন্যে শিল্পে জীবনের সবটার ছাপ পড়ছে না, জীবনের সুগোল সুডৌল রূপটিকে শিল্পের খর্বক্ষীণ আলিঙ্গনে আঁটছে না।

মধ্যযুগের ইটালি ধর্মপ্রাণও ছিল। তার সাক্ষী ভারতবর্ষের মতো ইটালির সর্বঘটে। কিন্তু এই

ধর্মপ্রাণতা কেমন সঙ্কীর্ণ ছিল তার একটি নমুনা রোমে পাওয়া যায়। রোমক যুগের সরল উন্নত নিরীশ্বর মন্দিরগুলিকে ভেঙে তাদের থেকে পাথর খুলে নিয়ে ক্যাথিড্রাল নির্মাণ করা হয়। সে সব ক্যাথিড্রাল যদি সুন্দর হতো তবে এই অপরাধের মার্জনা থাকত. কিন্তু রোমের দুটি একটিকে বাদ দিলে বাকী সমস্ত গির্জা জাঁকজমকের জোরে দর্শককে পীড়ন করে এবং লক্ষ লক্ষ ধর্মভীরু তীর্থযাত্রীর মনে সম্ভ্রম জাগায়। ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রাল তস্করের নয় শিল্পীর কীর্তি। মিলানের ক্যাথিড্রাল বিরাট গম্ভীর বহুশীর্ষ বহুমুখ। ভেনিসের ক্যাথিড্রাল সাড়ম্বর প্রাচ্য-প্রভাব সম্পন্ন।

ভেনিসের গৌরবের দিনে ভেনিস ভাবীকালের জন্য এমন কিছু রেখে যায়নি যার জন্যে ভাবীকাল তার প্রতি সশ্রদ্ধ হতে পারে। তবে ভেনিস নিজেকে দিয়ে গেছে, সে দান সামান্য নয়। সমুদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সেই মাটির উপর ভেনিসের প্রতিষ্ঠা, তার পিছনে সাধনা ছিল এবং সাধনার সম্মান করতে হয়। চন্দ্রালোকিত ভেনিসের খালে খালে গন্দোলায় আন্দোলিত হয়ে আনন্দ আছে, কিন্তু দুর্গন্ধের ভয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ভেনিসের যৌবনকালে ভেনিস কেমন রঙ্গিনী ছিল অনুমান করতে পারি সুসজ্জিত গন্দোলায় নৃত্যগীতের আয়োজন থেকে ও গন্দোলার সঙ্গে গন্দোলার গতি-প্রতিযোগিতা থেকে। গন্দোলায় ক'রে এক বাড়ির থেকে আরেক বাড়িতে ও এক পাড়ার থেকে আরেক পাড়ায় যাবার মোহ উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি কলের গন্দোলা দেখা দিয়েছে। সে গন্দোলার চলায় ছন্দ নেই, ধীরতা নেই, গাম্ভীর্য নেই। ভেনিসের গন্দোলিয়েররা খাসা মানুষ। তাদের পেশা ও প্রকৃতি বদলালে ভেনিসের অঙ্গহানি ঘটবে। কিন্তু যে নগরী মৃতা তার অঙ্গহানি ঘটলেই বা কী না ঘটলেই বা কী!

ফ্লোরেন্স এখনো বেঁচে। এখনো সেখানে ও তার অনতিদূরে জীবন্ত শিল্পীরা বাস করে। কিন্তু মৃত শিল্পীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, কি, কতকটা তাদের নকল ও বাকীটা তাদের শ্রাদ্ধ করে? ফ্লোরেন্সের মাটির উপরে সৌন্দর্যের খনি। এক কালে এ নগরী কেমন 'পুষ্পিতা' ছিল, কল্পনা করেও আনন্দ, আবার তার এত কিছু স্মারক রয়েছে যে প্রত্যক্ষ করেও আনন্দ। পাছে জার্মানরা লুঠ করে নিয়ে যায় সেই ভয়ে মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা প্যারিস থেকে মোনা লিসা ও ভিনাস ডি মাইলোকে দক্ষিণ ফ্রান্সে সরিয়ে ফেলে। কিন্তু শত্রু যদি ফ্লোরেন্স আক্রমণ করে তবে তার আগে ফ্লোরেন্সের কয় সহস্র শিল্পসৃষ্টি সরানো সম্ভব হবে? বোধ করি তাই ভেবে সেকালের শিল্পীরা ফ্লোরেন্স রক্ষার জন্যে অস্ত্র হস্তে দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়াত।

রোমকে কেন Eternal City বলে তার অর্থ বুঝি, যখন জানিকুলাম পাহাড়ের পিঠে দাঁড়িয়ে রোমের ভিতর ও বাহির পরিক্রমা করি। অনেকগুলি পাহাড় পাহারা দিচ্ছে। কম নয়, তিন হাজার বছর ব্যাপী পাহারা। কত দিগ্বিজয়ের সংবাদ নিয়ে দূত এসেছে, তার পরে বীর এসেছে, নগরী উৎসব প্রমত্তা ও বিনিদ্রা হ'য়ে তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, এই প্রহরীদের স্মরণে সেসব যেন সেদিনের কথা। একদিন বিজেতারা কতগুলি খ্রীস্টান দাস নিয়ে এল। দাসদের ধর্মকে উপহাস করল। বাঘ সিংহদের সামনে দাসদের ছেড়ে দিয়ে তাদের মরণ তামাসা দেখল। ক্রমে একদিন সম্রাট হলেন খ্রীস্টান। রাষ্ট্র হলো খ্রীস্টান। রাজগুরুই হলেন রোমের মালিক। রোমকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর দূতেরা ইউরোপের সকল রাজ্যে চারিয়ে গেল, প্রথমে রাজন্যদের ও পরে প্রজাদের দীক্ষা দিল। এবার রোমের পর্বত প্রহরীরা দেখল আরেক রকম দিগ্বিজয়ের উৎসব। রোমের পোপ হলেন খ্রীস্টীয় জগতের পিতা। এককালে যেমন উচ্চাভিলাষীরা সীজার হবার জন্যে তপস্যা ও চক্রান্ত করত আরেক কালে তেমনি পোপ হবার জন্যে উঠে পড়ে লাগল। ইউরোপ উজাড় ক'রে যাত্রীরা চলল রোমের অভিমুখে। তাদের জন্যে ক্যাথিড্রাল খাড়া হলো, সহস্র সহস্র যুবক সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল। তাদের জন্যে মঠ তৈরি হলো। দাসদের যাজক প্রাসাদবাসী হয়ে বিস্তীর্ণ জমিদারীর উপর

রাজাগিরিও করলেন। ভাটিকানো অলঙ্করণ করতে বড় বড় শিল্পীরা নিমন্ত্রিত হয়ে এলো। রোমের প্রহরীরা আরেক রকম দিগ্বিজয়ীর সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হলো।

পোপ যখন থেকে কেবলমাত্র ইটালির না হয়ে খ্রীস্টীয় জগতের হলেন তখন থেকে ইটালির আত্মা প্রতিভূ হারিয়ে রোমের বাইরে ছোট ছোট নগরে ও প্রদেশে প্রতিনিধি খুঁজতে ও পেতে থাকল। যে ইটালি ধ্যানী ও প্রেমিকদের মনে আইডিয়ারূপে ছিল নেপোলিয়নের নিষ্ঠুর হস্ত ও কাভুরের চতুর মস্তিষ্ক তাকে মূর্তিমতী করল। মুসোলিনির কাণ্ড দেখে সন্দেহ হচ্ছে সে মূর্তি শিবানী না বানরী, কিন্তু মাৎসিনীর মানসী চিরকাল ভাবলোকে থাকবেন না, ভাবীকালের আদর্শবাদী এই অসম্পূর্ণ মূর্তিকে নিজের হাতের বাটালি দিয়ে কুঁদে তার মধ্যে সেই মানসীকে অবতরণ করাবে।

।। একুশ ।।

ইউরোপ থেকে বিদায়ের দিন নিকট হয়ে এল। দীর্ঘ দুই বছর পরে আমার বিরহী বন্ধুটি তার সুখ নীড়ে ফিরছে। ইউরোপ ছিল তার নির্বাসন ভূমি। তাই বিদায় দিনটি তার মুক্তির দিন। কিন্তু আমার?

ইউরোপকে আমি না দেখতেই ভালোবেসেছিলুম, দেখেও ভালোবাসলুম। ইউরোপ আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে এসেছে—অন্য কথায়, চিরকাল ভালোবেসে এসেছে। ইউরোপ থেকে বিদায় আমার পক্ষে বিরহের শেষ নয়, শুরু।

তাই কখনো চোখের পাতা আর্দ্র হয়, কখনো বুকের কাঁপন তীব্র হয়। মনটা বিশ্বাস করতে চায় না যে বিদায়ের দিন সত্যিই আসবে—'একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ।' বিদায়ের ভাবনা যথাসাধ্য ভুলে থাকলুম। তবু যখনি মনে পড়ে যায় তখনি আমার ইটালি বিহার করুণ হয়ে ওঠে। আহা, আবার কবে দেখব—যদি বেঁচে থাকি, যদি পাথেয় জোটে, যদি এই ভালোবাসা এমনি থাকে! এতগুলো যদির উপর হাত চলে না গো ইউরোপা। মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা ও দেশের সঙ্গে ভালোবাসা এ দুইয়ের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। তুমি যেখানে থাকলে সেইখানেই থাকলে। মানবী হলে নিশ্চয়ই আমার দেশে আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে। তা যখন তুমি পারবে না তখন আমাকেই আসতে হয়। অন্ততঃ বলতে হয় যে আবার আসব।

বললুম, আবার আসব, ভয় কী! কতই বা দূর! জলপথে পনেরো দিন, স্থলপথে বারো দিন, আকাশপথে সাতদিন মাত্র। কিছু না হোক, মনের পথে এক মুহূর্ত।

বললুম ওকথা। তবু জানতুম ওকথা মিথ্যা। জীবনে ফিরে আসা যায় না। একবার মাত্র আসা যায় এবং সেই আসাই শেষ আসা। আবার যদি আসি তবে দেখব সে ইউরোপ নেই। সেই পুরাতন পদচিহ্ন ধরে মার্সেল্‌স্‌ থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে লণ্ডন যাব। লণ্ডনের গলিতে গলিতে বেড়াব। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্সে ও সুইট্‌জারলণ্ডে, জার্মানীতে ও অস্ট্রিয়ায়, হাঙ্গেরীতে ও চেকো-স্লোভাকিয়ায় স্মৃতির দাগে দাগা বুলাব। ইটালি প্রদক্ষিণ ক'রে চেনা জিনিসগুলিকে খুঁজে বের করব। দুটি বছর কাটবে দুটি বছরের পুনরাবৃত্তি করতে। চাইনে নতুন দেখতে নতুন করে দেখতে। আমার তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের এই আমি আমার শ্রেষ্ঠ আমি। এই দুটি বছরে যা পেলুম তার বেশি এ জীবনে পাওয়া যাবে না। এই বা ক'জন পায়? এত জ্ঞান এত মান এত প্রীতি এত মমতা। চক্ষু যত দেখল

লেখনী তার ভাষা পায়নি, আভাস দেবার সাধনা করেছে। শ্রবণ যত শুনল স্মরণ রাখতে পারল না।

স্মৃতির দাগ আপনি মুছে যায়। স্মৃতির পথ বেয়ে কত পথিকের আনাগোনা, তাদের চরণতল মৃত্যুর মতো নির্দয়। তবু যদি স্মৃতির দাগ ধরে যাওয়া সম্ভব হয় তবে কোন্ ইউরোপকে দেখব? ইউরোপ তো শুধু স্থান নয়, দৃশ্য নয়, সে মানুষ—ইউরোপের মানুষ। সেই মানুষগুলি কি আমার অপেক্ষায় অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে অচঞ্চলভাবে আমার স্মৃতিনির্দিষ্ট স্থানে কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা টমটম হাঁকিয়ে কেউ বা ঠেলাগাড়ি ঠেলে কেউ বা বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে?

পদে পদে পরিবর্তনশীল ইউরোপ। ততোধিক পরিবর্তনশীল মানুষের জীবন যৌবন জীবিকা ও প্রেম। স্মৃতিতে যাদের যে সময়ের যে অবস্থার ফোটো রইল তারা যদি বা জীবিত থাকে তবু তাদের সে বয়স আর থাকবে না, তাদের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল তাদের নাম ঠিকানা আমি হাজার মাথা খুঁড়লেও পাব না। রাইন নদী চিরকাল থাকবে, স্টীমারও তাতে চলতে থাকবে। কিন্তু সেই যে মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী হয়েও মুখে রঙ মেখেছিল তাকে তার প্রেমিকের স্কন্ধলগ্নরূপে আর একটিবার দেখতে পাব কি? না যদি পাই তবে রাইনের উভয়তটের গিরিদুর্গ তেমন সুদৃশ্য বোধ হবে না। লোরলাইয়ের মায়া সংগীত শুনে নাবিকরা যেখানে প্রাণ দিত সেখানে আমার বুকের স্পন্দন হঠাৎ স্থির ও তার পরে প্রবল হয়ে উঠবে না।

এমনি কত দৃশ্য অঙ্গহীন মনে হবে। সেই জন্য কি মার্সেল প্রুস্ত্ বহির্জগতের প্রতি অন্ধ ও বধির হয়ে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে স্বেচ্ছাবন্দীরূপে অবস্থান করতেন? আমাকেও তাহলে শপথ করতে হয় যে আর ইউরোপে আসব না, পাছে প্রিয়বরাকে অঙ্গহীনা দেখি, পাছে পরিচিতাকে অপরিচিতা বলে ভুল হয়। সে ভুলের সংশোধন নেই। বিরহের পরে প্রত্যেক প্রেমিককে ভয়ে ভয়ে প্রিয়ার দিকে চাইতে হয়—সে মোটা বা রোগা হয়ে যায়নি তো: অপরে তার মন চুরি করেনি তো? নানা অভিজ্ঞতার চাপে পূর্বস্মৃতি কি তার মনে কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে?

একদিন ঘুম থেকে জেগে দেখলুম চারিদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের একটিমাত্র পরিচয় সে সমুদ্র। সে যে ভূমধ্য সাগর ও কথা তার গায়ে লেখা নেই। চীনের সাগরও হতে পারে, অস্ট্রেলিয়ার সাগরও হতে পারে।

মাটি যে আমাদের কত বড় আশ্রয়স্থল সমুদ্রের উপর অসহায়ভাবে ভাসমান না হলে হৃদয়ঙ্গম হয় না। সমুদ্রের কূলে বসে সমুদ্রকে দেখে এক মহান ভাবে আপ্লুত হই, কিন্তু দিনের পর দিন যখন দশদিকের নয়দিকে কেবল সমুদ্রই দেখি আর দশম দিকে দেখি সমুদ্র-দিগ্বলয়িত আকাশ তখন ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। তবু সঙ্গে লোকজন থাকে বলে ভরসা থাকে। বাইরে যত বড় বিপদ হাঁ করে থাকুক না কেন ভিতরে তাস খেলার বিরাম নেই, কখনো নাচ চলেছে কখনো বাজি রেখে নকল ঘোড়দৌড়। ঠিক যেন কোনো একটা হোটেলে বাস করছি, পরস্পরের অতি কাছাকাছি, অথচ কারো সঙ্গে কারো গভীর সম্বন্ধ নেই। খাচ্ছি দাচ্ছি গল্প করছি হাসি তামাসায় যোগ দিচ্ছি চটছি ও মনখারাপ করছি—তবু জানি এ দু'দিনের খেলা। একটা কৃত্রিম অবস্থার চক্রান্ত। ভূপৃষ্ঠে কেউ সমস্তক্ষণ হোটেলেও থাকে না, একাদিক্রমে এত রকম মানুষের সংস্রবেও আসে না, এদের সঙ্গে জীবনের অভিনয়ও করে না। ভূপৃষ্ঠে যা বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে অথচ অল্প সংখ্যক প্রকৃত বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে সত্য, জাহাজে তা সত্যের নকল। তাই জাহাজী সামাজিকতার কথা মনে পড়লে হাসি পায়, ও সম্বন্ধে অত সিরিয়াস না হলেই ঠিক হতো।

ইউরোপের অধিকার যখন ভূমধ্য সাগরের সঙ্গে শেষ হলো তখন ক্রমাগত মনে উঠতে লাগল ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের স্মৃতি সযত্নে ভুলেছিলুম, পাছে পুরাতনের মায়ায় নূতনকে

অবহেলা করি, অতীতের রোমন্থন করতে বর্তমানের স্বাদ না নিই। এখন তো ইউরোপ হলো অতীতের, এবং বর্তমানের জাহাজী জীবন বিস্বাদ লাগছে—এখন ভারতবর্ষ আমার সোনার ভবিষ্যৎ, আমি তারই ধ্যান করব।

ভারতবর্ষের এমন একটি মূর্তি দেখতে পেলুম যা একমাত্র আমার মতো মানুষই দেখতে পায়—আমার মতো যে মানুষ ভারতবর্ষকে জন্মসূত্রে ও ইউরোপকে প্রেমসূত্রে চিনেছে, যে মানুষের মন উভয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে উভয়ের যথার্থ পরিমাণ জেনেছে। সকল কলহ কোলাহলের ঊর্ধ্বে ভারতবর্ষ তাঁর যোগাসনে বসে আছেন, তাঁর নিমীল নেত্রে হাসির দ্যুতি, প্রাপ্তির আনন্দ তাঁর পার্থিব অভাবকে তুচ্ছ করেছে। সুন্দরী ইউরোপা তার যৌবনের ঐশ্বর্য নিয়ে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নূপুর বাজাচ্ছে, তাঁর মন পাচ্ছে না। পাবে, যদি পার্বতীর মতো তপশ্চারিণী হয়। ইউরোপকে ভারতবর্ষের যোগ্য হতে হবে। নইলে সে কেবল ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে বাঁধতে ও বিচার করতে থাকবে এবং সেই কল্পিত আত্মপ্রসাদে স্ফীত হতে থাকবে।

বম্বেতে যখন নামলুম তখন ভারি মিষ্টি লাগল মরাঠা কুলিদের কর্মকালীন গোলযোগ। যাই দেখি তাই মিষ্টি লাগে। গাছতলায় মানুষে গোরুতে ছাগলে মিলে শুয়ে আছে। হিন্দু নাপিত মাটিতে বসে মুসলমানকে ক্ষৌরি করে দিচ্ছে। কাছা-দেওয়া মরাঠা মেয়ে মাথায় বিরাট বোঝা ও বগলে শিশু নিয়ে দৃপ্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পথ চলছে। গুজরাটী মেয়ে ব্রীড়ায় ললিত গতি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের পুরুষ বম্বের রাজপথে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। সকলে সমান গম্ভীর, শান্ত, আত্মস্থ। ভারতবর্ষ এ কী নূতন রূপে দেখা দিল!

ভারতবর্ষে ফিরলুম, কিন্তু এ কোন্ ভারতবর্ষ! যাকে রেখে গেছলুম সে নেই। নবীন ভারতবর্ষ আমাকে না দেখে না জেনে আমার অভাব বোধ না ক'রে কোন্ ফাঁকে জন্মেছে ও বেড়েছে। না সে আমাকে চেনে, না আমি তাকে চিনি। তার সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে, পাছে তার আত্মাভিমানে ঘা দিয়ে ফেলি, তার কঠিন কথা শুনে মর্মাহত হলে চলবে না। ঘরে তোলার আগে আমাকে পরখ করার অধিকার তার আছে। আমি আগন্তুক। সে গৃহস্বামী।

পুরাতন বন্ধুরা বলে, 'কই, কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখছি না তো? যেমনটি ছিলে তেমনিটি আছ?'—যেন মস্ত একটা পরিবর্তন ওরা আমার আকৃতিতে ও আচরণে প্রত্যাশা করছিল; নিরাশ হলো। আমি বলি, 'তা হলে তো আমাকে গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে সহজ; আমি ভেবে মরছি কী করলে তোমাদের মন পাব।'

কিন্তু সত্যিই সহজ নয়। আমি তো জানি আমি সেই আমি নই। দুটি বছরে প্রত্যেক মানুষের জীবন এক থেকে আরেক হয়ে ওঠে, প্রতিদিন দেখি বলে কোনোদিন লক্ষ্য করি না। আমার সম্বন্ধে ওদের এবং ওদের সম্বন্ধে আমার ঐ প্রতিদিন দেখাটুকু ঘটেনি বলে অন্তরে অন্তরে আমরা পর হয়ে পড়েছি। দুটো মহাদেশের ব্যবধান সেই বিচ্ছেদকে ঘোরালো করেছে। দু'বছর চোখের আড়ালে বেড়েছি, এইটে প্রধান। দু'বছর বিলেতে থেকেছি, এটা অপ্রধান। কিন্তু ফট্ করে ওরা বলে বসে, 'একেবারে আহেল বিলেতী হয়ে ফিরেছ। আমাদের সঙ্গে মিলবে কেন?'

বিলেত ফের্তারা যে নিজেদের মধ্যে একটা সমাজ কিংবা সম্প্রদায় কিংবা আড্ডা রচনা করে সেটা এই দুঃখে। এরাও ভুলতে পারে না ওরাও ভুলতে পারে না, কয়েক বছর ও কয়েক হাজার মাইলের ব্যবধান। তার উপর বিলেত ফের্তারা সাধারণত ধনী কিংবা উচ্চপদস্থ হয়ে থাকে, অবস্থার ব্যবধান মানুষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে ভালোবাসে। বিলেতের সমাজেও ভারতফের্তাদের এককালে 'নবাব' বলা হতো। ইদানীং তাদের অবস্থার বিপর্যয় হয়েছে বলে তাদের এ্যাংলো-

ইণ্ডিয়ান বলে পরিহাস করা হয়। ক্রমশ ইঙ্গবঙ্গদের কপালেও পরিহাস জুটছে।

কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ইউরোপ। মাঝখানে আরব তুর্কী পারস্য আফগানিস্থান ইত্যাদি কত দেশ পড়ে রইল। বিধাতা কার সঙ্গে কাকে বেঁধে দিলেন। পরিহাসই করো আর নেতৃত্বই দাও আমাদের সংখ্যা ও প্রভাব বাড়তেই থাকবে। ভাবী ভারত ইউরোপে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ যুবক পাঠাবে ও তারা ফিরলে তাদেরকে ঘরে তুলবে। আমরাই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পূর্বপুরুষ। সেইজন্যে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকব। শুধু দু'তিন বছর ইউরোপে গিয়ে ফুর্তি ক'রে ফেরা নয়। আমাদের কাজ ইউরোপে ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষে ইউরোপকে প্রকৃত ও প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত করা। আমরা দুই মহাদেশের নুন খেয়েছি। দুই মহাদেশে কত লোক আমাদের প্রাণরক্ষা করেছে, আমাদের সেবা ক'রে মূল্য গ্রহণ করেনি, আমাদের পরমাত্মীয় হয়ে দান-প্রতিদানের উর্ধ্বে উঠে গেছে। আমরাও যেন নিন্দাবিদ্বেষ ঘৃণাঅবজ্ঞার উর্ধ্বে উঠে উভয় মহাদেশকে নিকট থেকে নিকটতর ক'রে বিধাতার অভিপ্রায়কে সফল ক'রে তুলি।

যেদিন আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম সেদিন শুধু দেশ দেখতে যাইনি। গেছলুম মানুষকেও দেখতে, মানুষের সঙ্গে মিশতে, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ পাতাতে। দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট সৌন্দর্যের চেয়ে দেশের মানুষ সুন্দর। মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর। দেশ দেখতে ভালো লাগে না, যদি দেশের মানুষকে ভালো না লাগে। কে যেন বলেছেন, 'এদেশের সব সুন্দর, কেবল মানুষ কুৎসিত।' তিনি দূর থেকে মানুষকে দেখে ও কথা বলেছেন, কাছে গিয়ে দেখেননি। যে দেশে যাও সেদেশে দেখবে মানুষের চেয়ে সুন্দর কিছু নেই, মানুষের সৌন্দর্যের ছোঁয়া লেগে বুঝি বাকী সব সুন্দর হয়েছে! প্রকৃতি মানুষের হাতে গড়া প্রতিমা না হোক মানুষের প্রাণের রসে রসায়িত এবং ধ্যানের দ্বারা প্রভাবিত। প্রকৃতি তো মানুষেরই প্রতিকৃতি। বিশেষ ক'রে ইউরোপে।

ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীর বলেছেন। ইউরোপকে আমি বলব মহামানবের মানস সরোবর। সাগরে যেমন সকল প্রবাহিণী মিলিত হয় মানস সরোবর থেকে তেমনি সকল প্রবাহিণী নির্গত হয়। ইউরোপের মানস থেকে যুগে যুগে কত ভাবধারা নিঃসৃত হয়ে পৃথিবীকে ভাবোর্বরা করেছে। পৃথিবী নিজেই তো পৃথিবীর প্রতি ইউরোপের দান, কারণ পৃথিবী ইউরোপের আবিষ্কার। কেই বা জেনেছিল আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকার অস্তিত্ব? পৃথিবীর আকার আকৃতি গতি ও অবস্থান ইউরোপই আমাদের জানালো। আমরা পরলোকের নাড়ী নক্ষত্র জানতুম কিন্তু যে লোকে জন্মেছি তার সম্বন্ধে বড় জোর এই জানতুম যে সেটাকে একটা সাপ নিজের ফণার উপরে অতি যত্নে ব্যালান্স ক'রে একটা হাতীর পিঠের উপর অতি কষ্টে টাল সামলাচ্ছে।

সত্যের একটি বিন্দুও নষ্ট হবার নয়। ইউরোপের সত্য ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতেই হবে, ভারতবর্ষের সত্য ইউরোপকে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মহামিলনের লগ্ন আসবেই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। আজো যা আসেনি কোনো একদিন তা আসবে বলেই আজ আসেনি। কিন্তু সে আমাদের সকলের ভাবনা, সকলের স্বপ্ন। আমার একার নয়। আমি ভাবি আবার কবে ইউরোপের সঙ্গে মিলিত হব, কথা রাখব!

দিনের পর দিন যায়, ইউরোপের স্মৃতি অস্পষ্ট হতে থাকে। সত্যি কি কোনোকালে ইউরোপে ছিলুম?

(১৯২৭-২৯)

—

ইউরোপের চিঠি

সূচী

সুইটজারল্যাণ্ড

সুইটজারল্যাণ্ড হচ্ছে ইউরোপের মধ্যপ্রদেশ। আমাদের যেমন বিন্ধ্য পর্বত, ওদেরও তেমনি আল্পস পর্বত। আল্পসের শাখা-প্রশাখায় দেশটা ছেয়ে গেছে, আর সেই সব শাখা-প্রশাখার মাঝে মাঝে এক একটি হ্রদ। দেশটি যেমন সুন্দর তেমনি স্বাস্থ্যকর। বৎসরের অধিকাংশ দিন বরফ পড়ে বা বরফ থাকে, পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘরের আশপাশ অবধি কেবল শাদা মখমলের মতো বরফ বিছানো। আমাদের দেশে যেমন 'চলতে গেলে দলতে হয় রে দূর্বা কোমল', ওদের দেশে তেমনি চলতে গেলে দলতে হয় দুগ্ধফেননিভ রাশি রাশি বরফ। রাস্তার ওপরে ধুলোর মতো বরফগুঁড়ো জমে রয়েছে, তার ওপরে পা ফেলতে মায়া হয়। চকখড়ির গুঁড়োর ওপর হাঁটবার সময় কেমন মনে হয় সেইটে একবার কল্পনা করো, কেমন মস্ মস্ মুড় মুড় শব্দ করতে থাকে। যে বরফ আমরা ঘোলের সরবতের সঙ্গে খাই এ বরফ তেমন নিরেট নয়। এ বরফ যখন পড়ে তখন পেঁজা তুলোর মতো খুব আ-স্তে আ-স্তে খুব মোলায়েমভাবে পড়ে, ভোরবেলাকার শিউলি ফুলের মতো নিঃশব্দে। বরফ পড়বার সময় বাইরে বেরিয়ে আরাম আছে, অবশ্য সর্বাঙ্গ গরম পোশাকে মুড়ে, পায়ে ডবল বুট চড়িয়ে এবং মাথায় টুপী পরতে না ভুলে। বৃষ্টিতে তো অনেক ভিজেছ, একবার যদি বরফে ভিজতে তো জানতে কেমন ফুর্তি! তবে মুশকিল এই যে পা পিছলে আছাড় খাবার সম্ভাবনা প্রতি পদেই। এ তো আর জল নয় যে মাটিতে পড়ে স্রোত হয়ে পথ কেটে বয়ে যাবে, দাঁড়াবে না। এ হচ্ছে বরফ, এ যেখানে পড়ে সেখান থেকে নড়বার নাম করে না, যতদিন না সূর্যের উত্তাপ লেগে গলে যায়। ঘরের জানালা খোলা রাখলে আর রক্ষে নেই, রাজ্যের বরফ এসে তোমারি ঘরে জড় হবে, তোমার ঘরে যদি খাবার জল থাকে তো সে জল জমে বরফ হয়ে যাবে, যদি দুধ থাকে তো দুধেরও সেই দশা! ঘরের দরজা-জানালা প্রায় সাবাক্ষণই বন্ধ রাখতে হয়, অবশ্য বাতাসের জন্যে ফাঁক রেখে। ঘরে সেন্ট্রাল হীটিং-এর ব্যবস্থা থাকে, তার মোটামুটি মানে এই যে ঘরটাকে কৃত্রিম উপায়ে গরম রাখা হয়। বিছানা খুব পুরু করে পাতা দরকার, লেপ-কম্বল এক দঙ্গল! ঘরে বসে জানালার কাঁচ দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে পারো—যতদূর চোখ যায় কেবল বরফ আর বরফ। 'কোথায় এমন তুষারক্ষেত্র আকাশতলে মেশে! ও সে মাটির উপর ঢেউ খেলে যায় বরফ কাহার দেশে!' সূর্যের আলো যখন সেই বরফের ওপর ঝকঝক করে সাত রঙে বিভক্ত হয়ে যায় আর চাঁদের আলো যখন সেই বরফের ওপর মুক্তোর মতো দাঁত বের করে হাসে, তখন সে যে কী অপূর্ব স্বপ্নের মতো মনে হয়, যেন দুধ-সাগরের কূলে এসে পৌঁছেছি, তার ওপরে রাজকন্যার ঘুমন্ত পুরীর দেউড়ীতে পর্বত পাহারা দিচ্ছে, পর্বতের পাগড়ীতে সাপের মাথার মণির মতো জ্বলছে আকাশের যত তারা! আঁধার রাত্রে সমস্ত খাঁ খাঁ করতে থাকে, আর বরফের ওপরে চোখ ফেললে মনে হয় যেন মড়ার মাথার খুলি! মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে কম্বলের ভেতর থেকে মুখ বের করে তাকাই আর জানালার সার্শীর ওপারের দৃশ্য চোখে পড়ে যায়। মা গো, সে কী ভয়ানক! কী নিঃঝুম? যেন জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুর বেলায় রোদ্দুর ডিসেম্বর মাসের রাত্রের বেলা বরফ সেজে এসেছে, যেন দ্বাপর যুগের পূতনা রাক্ষসী শাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে যোজন জুড়ে পড়ে রয়েছে, যেন হাজার হাজার জোনাকী তারার

মুখোস পরে অন্ধকারময় উড়ে বেড়াচ্ছে! তক্ষুনি চোখ বুজে মুখের উপর কম্বল টেনে দিই। তার পরে আবার যখন ঘুম ভাঙে, তখন শুয়ে শুয়ে ঘরের আয়নার দিকে চেয়ে দেখি ভোরের সূর্য আকাশ আলো করে পাহাড়ের শিয়রে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে বলছে —'জাগো'।

তখন দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বোতাম টিপে দিই; দাসীর ঘরে ঘণ্টা বেজে ওঠে, সে গরম জলের পাত্র নিয়ে দ্বারের ওপাশ থেকে টোকা দিলে ফরাসী ভাষায় বলি 'আঁত্রে' (প্রবেশ করতে পারো); ঘরে ঢুকে সে বলে 'বঁ ঝুর মঁশিয়ে' (সুপ্রভাত, মহাশয়); সে চলে গেলে মুখ ধুই, প্রাতঃকৃত্য করি, তারপর আবার বোতাম টিপলে সে এসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। ব্রেকফাস্ট সাধারণতঃ দুধ, রোল (রুটি), মাখন, জ্যাম। সুইটজারল্যাণ্ডের দুধ খেতে এত সুন্দর, তার একটা নিজস্ব সুগন্ধ আছে যা অন্য কোনো দেশের দুধে নেই, তার রঙটিও তার নিজস্ব। আর রোল শুকনো অথচ শক্ত নয়; চিমসে নয়, মুখে দিতে না দিতেই মিলিয়ে যায়, অনেকক্ষণ ধরে চিবোতে হয় না, জ্যাম না মাখালেও মিলিয়ে গিয়ে মিষ্টি লাগে। আর সুইটজারল্যাণ্ডের মাখনটিও খেতে এমন সুন্দর, পারী (Paris)র মাখনের মতো পানসে নয়, লণ্ডনের মাখনের মতো নোনতা নয়, যেন সদ্যোপ্রস্তুত টাটকা জিনিস, কৌটায় বন্দী বহুদূর থেকে আনীত নয়। সুইটজারল্যাণ্ডের হাওয়ার প্রভাবে বোধ হয় সব জিনিসই শুষ্কতাপন্ন; লণ্ডন পারীর হাওয়ার দোষে সব জিনিসই কতকটা স্যাঁতস্যাতে। তফাৎটা যেন ছোটনাগপুরের সঙ্গে বাংলাদেশের তফাৎ।

লণ্ডন থেকে সুইটজারল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রান্ত যেন কলকাতা থেকে কাশী। মাঝখানে ফরাসীদের দেশ ফ্রান্স। সুইটজারল্যাণ্ডে যেতে হলে পারী (Paris) হয়ে যেতে হয়, লণ্ডন থেকে পারী যাবার দু'টো উপায় আছে, একটা হচ্ছে ট্রেনে করে কিছুদূর, স্টীমারে করে কিছুদূর এবং আবার ট্রেনে করে বাকীটা; আরেকটা হচ্ছে এরোপ্লেনে করে সমস্ত পথ। পারী থেকে বরাবর ট্রেন। ইউরোপটা যেন আমাদের ভারতবর্ষেরই মতো, আর ইংলণ্ড যেন আমাদের সিংহল। ভারতবর্ষের আসাম থেকে গুজরাটে যাওয়া আর ইউরোপের স্পেন থেকে সুইডেনে যাওয়া একই রকম ব্যাপার—কেবল মাঝে মাঝে শুল্ক বিভাগের আমলারা এসে বাক্স খুলে দেখে কোনো রকম মাশুল দেবার মতন জিনিস লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি কি না আর পাস্‌পোর্ট পরীক্ষা করে দেখে বিদেশে ভ্রমণ করবার অনুমতি পেয়েছি কি না। এ সব ব্যাপার বড় অপ্রীতিকর, একবার নয় দু'বার নয় চার বার এই হ্যাঙ্গাম। আসাম থেকে গুজরাটে যেতে চাও তো আরামে যেতে পারো, কিন্তু স্পেন থেকে সুইডেনে যেতে চাইলে পাঁচ-সাত বার পাস্‌পোর্ট খুলে দেখাতে হবে, বাক্স খুলে দেখাতে হবে! ঝকমারি! মাশুল দেবার মতন জিনিস সব দেশে এক নয়, ইংলণ্ডে যা স্বচ্ছন্দে আনতে পারো ফ্রান্সে তা নিতে চাইলে মাশুল দিতে হবে। সুইটজারল্যাণ্ডে যাবার সময় যে কামরাটায় যাচ্ছিলুম সেই কামরাটায় একজনের সঙ্গে কিছু সিগার ছিল, সে সুইস্ সীমান্তে এসে সেগুলোর কিছু নিজের পকেটে, কিছু আলাপীদের পকেটে, কিছু সীটের নীচে, কিছু 'বাঙ্কে'র উপরে চটপট সরিয়ে ফেললে। শুল্ক বিভাগের আমলারা যখন এল তখন সে অম্লানবদনে বললে 'না, আমার কাছে নিষিদ্ধ কিছু নেই;' তারা চলে গেলে আলাপীদের পকেট থেকে সিগারগুলি উদ্ধার করে তাদের এক একটি খাওয়ালে, আর খুব একচোট হেসে নিলে। ফ্রান্সের ইতালীর সুইটজারল্যাণ্ডের লোক খুব আলাপী ও মিশুক প্রকৃতির। ইংরেজরা ওদের মতো ট্রেনে উঠে বকবক করে না।

সুইটজারল্যাণ্ডে পৃথিবীর সব দেশের লোক হাওয়া বদলাতে যায়, যক্ষ্মা রোগ সারাতে যায়, বরফের উপর শী খেলতে বা স্কেট করতে যায়। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ বিদেশী গিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডের হাজার হাজার হোটেল দখল করে বসে, তাদের দৌলতে সুইটজারল্যাণ্ডের মতো পাহাড়ী দেশের গরীব অধিবাসীরা বড়মানুষ হয়ে গেল। যেন সারা বৎসর মহোৎসব চলেছে,

দীয়তাং আর নীয়তাং, টাকাং দীয়তাং আর সেবাং নীয়তাং।

ব্রেকফাস্টের পরে কী হয় তোমাদের তা বলিনি। ব্রেকফাস্টের তিন ঘণ্টা পরে লাঞ্চ (মধ্যাহ্ন ভোজন)। ততক্ষণ সবাই নিজের নিজের কাজে বা খেলায় লেগে যায়। বরফ-ঢাকা রাস্তার ওপর দিয়ে কেউ বা যায় চাকাবিহীন 'স্লেজ্' গাড়ী পিছলিয়ে, কিংবা চাকাবিহীন 'লুজ'-পিঁড়ি পিছলিয়ে, রাস্তার একপাশ দিয়ে কেউ বা চলে স্নো-বুট পরা পায়ে হেঁটে। বরফ-ঢাকা মাঠের ওপরে খেলা জমে—মোচার খোলার মতো একপ্রকার সরঞ্জাম পায়ে বেঁধে শী*খেলা, উল্টোপাল্টা দু'খানা খড়মের মতো একরকম সরঞ্জাম পায়ে পরে স্কেট্ করা। আরো কত রকম খেলা আছে! ইউরোপের খোকাখুকী থেকে বুড়োবুড়ী পর্যন্ত সবাই খেলোয়াড়। আমার পাঁসিঅঁতে** দু'টি আমেরিকান মেয়ে ছিল, ওরা একা একা আমেরিকা থেকে জাহাজে চড়ে এসেছে, এসে ওদের মা'র সঙ্গে যোগ দিয়েছে, ওরা রোজ যেত শী খেলতে বা স্কেট্ করতে, পুরুষের মতো খেলার পোশাক পরে। শুধু আমেরিকান কেন, সব দেশের মানুষ সুইটজারল্যাণ্ডে দেখা যায়। আমার পাঁসিঅঁতে যারা থাকত তাদের সঙ্গে দেখা হতো লাঞ্চ খাবার ও ডিনার খাবার ঘরে। ডিনাব মানে রাত্রি ভোজন। তারপরেও কেউ কেউ সাপার খায়, কিন্তু সাধারণের পক্ষে ডিনারই শেষ খাওয়া। এক টেবিলে বসে অনেক জন মিলে লাঞ্চ বা ডিনার খায়, নানা দেশের লোক, জার্মান ফরাসী ইংরেজ ইতালীয়ান চেক্ হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোক কোনো দিন এক সঙ্গে খায় কি? তোমরা কি তোমাদের স্বদেশবাসী কানাড়ী মালয়ালী সিন্ধী নেপালীদের সঙ্গে বসে খেতে পাও! কিংবা তোমাদের আপন প্রদেশের বেনে বাগ্দী নমঃশূদ্রদের সঙ্গে সামাজিক ভোজে যোগ দিতে পাও? ইউরোপের লোক এক হবার যত সুযোগ পায় আমরা তত পাইনে।

লাঞ্চের পর আমরা পাহাড়ের উপর উঠে বনের ভিতর দিয়ে বরফের ওপর আছাড় খেতে খেতে অন্য গ্রামে বেড়িয়ে আসতুম। আমি যে গ্রামটাতে ছিলুম সেটার নাম লেজ্যাঁ। ইউরোপের গ্রামগুলো শহরগুলোর চেয়েও আরামের। শহরের সব সুবিধাই গ্রামে আছে। বেড়াতে বেড়াতে তেষ্টা পেলে কাফেতে বসে কাফীর ফরমাস করো, কাফীতে চুমুক দিতে দিতে দু'ঘণ্টা বসে থাকলেও কেউ কিছু বলবে না। কাফেটা হচ্ছে সাধারণ লোকের ক্লাবের মতো, সেখানে গিয়ে যতক্ষণ খুশি আড্ডা দাও, বই পড়ো, তাস খেলো, কাফীর জন্যে দু-চার আনা পয়সা ধরে দিলেই সাত খুন মাপ! চাষী মজুরেরাও দিনের কাজের শেষে খেয়ে দেয়ে কাফেতে গিয়ে মদের গ্লাস নিয়ে বসে, তাদের অবশ্য স্বতন্ত্র কাফে। ছাত্রেরা কাফেতে গিয়ে কাফীর পেয়ালার সামনে পাঠ্যপুস্তক খুলে বসে, তাদেরও তেমনি নিজেদের পৃষ্ঠপোষিত কাফে। কাফেতে নাচ-গানও হয়।

এতক্ষণ তোমাদের শুধু খেলার দিকটাই দেখিয়েছি, কাজের দিকটা দেখাইনি। দারুণ শীতের মধ্যেও মজুরেরা মাটি খুঁড়ছে, চাষারা চাষ করছে, দোকানীরা দোকান চালাচ্ছে। কাজের সময় অবিশ্রান্ত কাজ, খেলার সময় অবিশ্রান্ত খেলা। আমাদের সেই পাঁসিঅঁর দাসীটি ভোর থেকে মাঝ রাত অবধি কত রকমের কত খাটুনি যে খাটত দেখে অবাক হয়ে যেতুম, অথচ তার মুখে কথা নেই, বিরক্তির চিহ্ন নেই, হাসি লেগে রয়েছে। লেজ্যাঁতে যক্ষ্মারোগীদের যে সব ক্লিনিক আছে সেগুলিতে যে সব রোগী তিন বছর একই ভঙ্গীতে শয্যাশায়ীভাবে পড়ে আছে, তাদের দেখলে মনে হয় না যে তারা একটুও দুঃখিত বা চিন্তিত। জীবনটাকে খুব হালকা ভাবেই ওরা নিচ্ছে, যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। কয়েকটি ক্লিনিকে যক্ষ্মারোগী ছেলেমেয়েরা শয্যাশায়ী। নানা দেশের ছেলেমেয়ে—ফিনল্যাণ্ড থেকে পর্তুগাল অবধি ইউরোপের মানচিত্রে যতগুলো দেশ দেখছ সব

* "Ski" কথাটাব উচ্চাবণ, "শী"।

** "Pension" কথাটার উচ্চারণ, "পাঁসিঅঁ।" ওর মানে, একটু ঘরোয়া ধরনের হোটেল।

দেশের বালক বা বালিকা প্রতিনিধিরা সেখানে একজোট হয়েছে, এদের দিয়ে নতুন ইউরোপ এক হয়ে গড়ে উঠেছে। সুইটজারল্যাণ্ডে রুগ্‌ণ ছেলে-মেয়েদের জন্যে আন্তর্জাতিক স্কুল আছে, সূর্যালোক ও মুক্ত বাতাসের মধ্যে তারা স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও লাভ করে। ইউরোপের ইস্কুলগুলিতে লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজও শেখানো হয়, ড্রিল ইত্যাদি কসরৎ তো শেখানো হয়ই, গানের সাহায্যে বাজনার সাহায্যে নাচের সাহায্যে খুব লোভনীয়ভাবে শেখানো হয়। সেইজন্যে ইউরোপের ইস্কুলকে পাঠশালা বললে তার ঠিক পরিচয়টি দেওয়া হয় না। পাঠশালা তো বটেই নাটশালাও বটে, আবার কারু-শিল্পের কারখানাও বটে। ছেলেরা বাড়ীতে পড়ে না, যতটুকু পড়বার ততটুকু ইস্কুলে গিয়ে পড়ে। ছেলেরা ত কেবল মুখস্থ করবার যন্ত্র নয় যে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা কেবল ঐ কর্মই করবে! খেলাও ওদের একটা কর্ম, ওদের বয়সে খেলাটাই বরং মুখ্য, পড়াটা হচ্ছে গৌণ।

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফেরবার পথে একটি ইংরেজ বালকের সঙ্গে দেখা। সুইটজারল্যাণ্ডে শী খেলতে স্কেট্‌ করতে গিয়েছিল, সুইটজারল্যাণ্ডটা হচ্ছে ইউরোপের playground, বিশেষতঃ শীতকালে। ডোভারে ট্রেনে ওঠবার পর তার সঙ্গে আলাপ। বললে, 'চা খেয়েছেন? চা আনতে দেবো?' বললুম—'এই মাত্র খেয়ে এলুম, ধন্যবাদ।' সে ট্রেনের দেয়ালের বোতাম টিপতেই রেস্তরাঁ কারের ওয়েটার এল, তাকে নিজের জন্য চায়ের ফরমাস দিলে। ইতিমধ্যে এক ফরাসী যুবক এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'জায়গা হবে কি?' আমরা বলেছি, 'ঠিক একটি জায়গা খালি আছে, আপনাকে নিয়ে আমরা তিন জন হবো।' ফরাসীটি এসে বসবামাত্র তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলে, 'চা খেয়েছেন? আনতে দেবো?' তাঁর সম্মতি নিয়ে তার জন্যে চা আনতে দিলে, কিন্তু চা আর আসে না! নিজের চা'টা ভদ্রলোককে খেতে অনুরোধ করে সে একখানা বই খুলে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। অনেক দেরিতে চা যখন এল তখন নিজের টোস্ট নিয়ে তাঁকে খাওয়ালে। তারপর তিন জন মিলে গল্প। ছেলেটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে অনেক খবর জানতে চাইলে জানালুম; কিন্তু শেষকালে আমাকে বললে, 'আপনি আমাকে নিরাশ করলেন, আমি ভেবেছিলুম আপনি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন কিছু না হোক দু-চারটে ভেল্কি ভোজবাজি বলবা মাত্রই দেখাবেন। কিন্তু আপনি বলছেন ও সব কিছু জানেনই না; যদিও ইস্কুলে আমরা পড়েছি, আপনারা জানেন।' অগত্যা সে নিজেই আমাকে একটা সস্তা বিলিতী মজলিসী খেলা শিখিয়ে দিলে, কাগজে কলমে নক্সা কেটে খেলতে হয়। ফরাসীটিও দেশলাইয়ের ওপর দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে কী একটা কৌশল শেখাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে ট্রেন এসে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে থামল।

লণ্ডন,২৩ ফাল্গুন ১৩৩৪

আইল অফ্‌ ওয়াইট

ইংলণ্ডের দক্ষিণে এই যে দ্বীপটি, এটি আমাদের যে কোনো মহকুমার চেয়েও বোধ হয় ছোট; কিন্তু তোমাদের ক'জনই বা নিজের নিজের মহকুমা বা জেলা মোটামুটি রকম দেখেছ? এরা কিন্তু এরোপ্লেনেও যেমন ওড়ে পায়েও তেমনি হাঁটে। আমি এই চিঠি লিখছি আর আমার কাছে একটি ছোকরা বসে আগুন পোহাতে পোহাতে বই পড়ছে: সে লণ্ডন থেকে ব্রাইটন ২৫ মাইল ৮ ঘণ্টায় হেঁটে এসেছে, সে রাস্তাও আমাদের রাস্তার মতো সমতল নয়, পাহাড়ে। ব্রাইটন থেকে এখানে

জাহাজে করে আসা যায়, কিংবা রেলে করে পোর্টস্‌মাথে এসে সেখান থেকে জাহাজে করে এখানে আসা যায়। আমি লণ্ডন থেকে পোর্টস্‌মাথ রেলে এলুম, তারপর জাহাজে চড়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে পৌঁছলুম। এই দ্বীপটার আগাগোড়া রেল আছে, বাস আছে, জাহাজ আছে, ট্যাক্সি আছে, ঘোড়ার গাড়ী আছে, পায়ে হেঁটে সমস্ত দ্বীপটা দেখতেও বেশী সময় লাগে না। দ্বীপটাতে গোটা পাঁচ-ছয় শহর আছে, সেখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হাওয়া বদল করতে আসে। খুব ছোট ছোট শহর, কিন্তু চমৎকার পরিপাটি। রাস্তাঘাট ফিটফাট, বাড়ীঘর সারিবদ্ধ, দোকানে বাজারে ইংরেজসুলভ শৃঙ্খলা, কোনো রকম হট্টগোল, কোনো রকম দরকষাকষি, কোনো রকম ফেলাছড়া নেই। মেজের ওপরে হাঁটু গেড়ে ইংরেজ মেয়ে মেজে-দেয়াল নিকিয়ে চকচকে করছে। এমন দৃশ্য প্রতিদিন সকালবেলা দেখি। ঘর-সাজানো জিনিসটি ইংরেজরা যেমন বোঝে আমরা তেমন বুঝিনে। প্রত্যেকটি আসবাবের নির্দিষ্ট স্থান আছে, একস্থানে কিছুই জড় করা হয় না, নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোনো জিনিস এক ইঞ্চি সরে না। যেমন ঘরে তেমনি বাইরে। আমাদের ভালো ছেলেরা আঙুলে কালি মেখে চুল ঝোড়োকাকের মতো করে জামার আস্তিন খোলা রেখে চটি ফটফট করতে করতে হাঁটেন, অথচ তাঁদের মা-বোনদের এদিকে নজর দেবার ফুরসৎ থাকে না এবং তাঁদের বাপ-খুড়োদের মতে এই তো সুবোধ ছেলের লক্ষণ। ছেলে আমার লেখাপড়া ছাড়া আর কিছুতে মন দেয় না, এ কি কম সৌভাগ্য? ইংরেজ ছেলেদের মায়েরা কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে ছেলেকে ফিটফাট হতে শেখান, সেই জন্যে হাত-মুখ ধুয়ে মুছে মেজে ধবধবে তকতকে রাখাটা ভালো ছেলের পক্ষে লজ্জার কথা নয়, চুলে চিরুনি দিয়ে ব্রাশ লাগিয়ে ভদ্রগোছের একটা অতি সাদাসিধে টেড়ী কাটা স্বয়ং পণ্ডিত মশাইয়েরও নিত্যকর্মের অঙ্গ এবং খুব অল্পদামের পোশাকও নিজের হাতে ঝেড়ে কেচে পরিষ্কার রাখা সম্ভব।

এই বাড়ীতে একটি ছোট ছেলে তার বাবার সঙ্গে এসেছে; তার বাবার সঙ্গে তার যে রকম সম্বন্ধ তাকে আমরা বলতুম—'দোস্তি'। এরা যেন দু'টি বন্ধু ইয়ার, পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা করতে এদের একটুও বাধে না, পরস্পরের সঙ্গে খেলা করা তো তবু ভালো, পরস্পরের সঙ্গে বক্সিং লড়াটাও মাঝে মাঝে চলে! বাপ ছেলেকে 'Wild flowers' নামক একখানা উদ্ভিদ্‌বিদ্যার বই উপহার দিয়ে তার ওপরে লিখেছেন 'To Roy—Dad'। ছেলেটির নাম Roy. আমি এই চিঠি লিখছি, Roy পিয়ানো বাজাচ্ছে, তার বাবা এলেন! Roy বললে, 'বাবা, তোমাকে কত খুঁজলুম, তুমি কোথায় গিয়েছিলে!' বাবা বললেন, 'বাগানে ছিলুম।' ছেলে বাবার কাছে গিয়ে আনন্দে লাফ দিলে যেমন পোষা কুকুরে লাফায়; তারপর আবার গিয়ে পিয়ানোয় বসল, তার বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন। তার বাবা তাকে কোনো বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন না। তার দস্যিপনায় তিনি তার সর্বপ্রধান সাথী, দুরন্তপনায় তিনিই তার ওস্তাদ।

সেদিন সকালবেলা আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি, এমন সময় পেছন ফিরে দেখি একখানা ঘোড়ায়-টানা cart আসছে, আমাদের দেশের মোষে-টানা গাড়ীর মতো মাল-বোঝাই। গাড়ীটা আমার কাছে এসে থামল। গাড়ীর চালক আমাকে বললে, 'গাড়ীতে বসবেন?' আমি বললুম, 'বেশ তো।' তখন তার পাশে গিয়ে বসলুম। সে বললে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছিল! Sandown?' আমি বললুম, 'কোথায় যাবো ঠিক না করে বেরিয়েছি—পথ আমারে পথ দেখাবে এই জেনেছি সার।' সে বললে, 'আসুন তবে Sandown ঘুরে আসবেন, বেশি দূর না, লাঞ্চের আগেই ফিরতে পারবেন।' তারপরে যা ঘটল তার বিবরণ দিতে বসলে একখানা মহাভারত লেখা হয়ে যায়। সুতরাং সংক্ষেপে সারি। সে দিন বাসায় ফিরে লাঞ্চ খাওয়া তো ঘটলই না, বাসায় ফিরে চা খাওয়াও ঘটল না, এবং ডিনারের জন্যে ফিরতে দিতেও তার ইচ্ছা ছিল না। সে আমাকে তার

বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চের সময় lobster খাওয়ালে, তার এক বন্ধুর বাড়ীতে চায়ের সময় কাঁকড়া খাওয়ালে, এবং সারাদিন ধরে গাড়ীতে করে অনেক গ্রাম ও শহর তো দেখালেই, শেষকালে বাসায় এনে পৌছে দিলে। লোকটা হচ্ছে তার নিজের কথায় 'fisherman by trade', তার বয়স ৬৬ বৎসর, গায়ে ভীমের মতো জোর, বক্সিংএ নাকি এ দ্বীপে তার দোসর নেই। যুদ্ধের সময় submarine-এর ওপর নজর রাখবার জন্যে যে সব জাহাজ ছিল তাদের একটাতে সে কাজ করত। এই দ্বীপেই তার জন্ম, এইখানেই সে অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছে এবং এখনো তার ইচ্ছা আছে নানা দেশ ঘুরে আসবে, India দেখে আসবে। সে জিজ্ঞাসা করলে, 'India কত বড়? লণ্ডনের চেয়েও বড়!' তার জিওগ্রাফীর দৌড় লণ্ডন অবধি।

তার সঙ্গে Sandown গেলুম। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় সেই সেলাম করে। পাড়াগাঁয়ের লোক নতুন লোক দেখলেই শ্রদ্ধা জানায়। সুইটজারল্যাণ্ডের চাষারা রাস্তায় সেলাম করে বলেছে, 'Bon jour, monsieur.' এখানকার গেঁয়ো লোকেরাও দেখা হলেই বলে, 'Good morning, Sir!' লণ্ডনের মতো শহর জায়গায় নতুন লোকের সম্মান নেই, কারণ সেখানে তো নতুন লোকের ছড়াছড়ি। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হয় টেরি তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয়, জুড়ে দিয়ে শেষকালে বলে—'এই ছেলেটি এ অঞ্চলে নতুন এসেছে, একে দেশ দেখাতে নিয়ে চলেছি।' টেরির ইচ্ছাটা এই যে আমি যেন জানি, টেরি এ দ্বীপের একটা মাতব্বর লোক, সকলে তাকে চেনে ও ভালোবাসে। 'They all like me—don't they?' কথায় কথায় আমার ওপরে এই প্রশ্নবাণ। 'They all know me—I am known all over the Island—am I not?' আমি অগত্যা বলি, 'তা তো দেখছি।' তখন সে বলে,'When you go back to India, tell your father that you met Terry Kemp, the fisherman.' সে বেচারা জানে না যে India এখান থেকে আট হাজার মাইল দূরে, সে ভাবছে India বোধ হয় ফ্রান্সের মতো কাছাকাছি।

টেরির সঙ্গে সেদিন সমস্ত দিন বকেছি, কিন্তু ঐ একই কথা। 'Isn't that a good pony?' আমি বলি 'Certainly' 'Isn't that a lovely dog?' 'Oh, yes.' মোট কথা, টেরির যা কিছু সমস্ত ভালো। তার ঘোড়ার মতো ঘোড়া এ দ্বীপে নেই, তার কুকুরের মতো কুকুর এ দ্বীপে নেই। তার বাড়ী নিয়ে গিয়ে দেখালে তার মোটর বোট, তার ছোট ছোট নৌকা, তার ভাড়া দেবার চেয়ার, তার মুরগীর পাল—তার সমস্ত কিছু নতুন লোকের দেখবার মতো এবং বাবাকে লেখবার মতো। 'Well, you like it. Then write that to your father.' আমার বাবার প্রতি তার এই আকর্ষণটা বড়ই অযাচিত। আমার বাবার বয়স কত, তাঁর ক'টি ছেলেমেয়ে, তিনি কবে ইংলণ্ডে আসবেন, ইত্যাদি ঘরোয়া প্রশ্নের কথা তোমাদের নাই জানালুম। তোমরা শুধু জেনো, পাড়াগাঁয়ের লোক সব দেশেই সমান, সব দেশেই এদের স্নেহ-মমতা বেশী, অতি সহজে এরা মানুষকে আপন করে নেয়, বিদেশী লোককে সাহায্য করতে পারলে এরা কৃতার্থ হয়ে যায়। তবে গ্রামের মধ্যে এরাই যে মাতব্বর লোক, এদের যা আছে আর কারো যে তা নেই, এ কথাটা এরা পদে পদে জানিয়ে রাখে এবং কেবল তুমি জানলে হবে না, তোমার বংশসুদ্ধকে জানিয়ে দেওয়া চাই।

টেরির বাড়ী হয়ে Shanklin দেখতে এলুম। Shanklin বড় সুন্দর শহর। পাহাড় কেটে সমুদ্রের বাঁধ করা হয়েছে, যেন দেয়ালের মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেক উঁচুতে বাঁধের ওপরে বড় বড় সব হোটেল, কাফে, সিনেমা, নাচঘর। টেরি ওখান থেকে গাড়ী বোঝাই করে কাঁকড়া ও lobster সংগ্রহ করলে, ও সব সিদ্ধ করে অন্যত্র বিক্রি করে মুনাফা পাবে। Shanklin থেকে ফেরবার সময় দৈবাৎ তিনটি ভারতীয় তরুণীর সঙ্গে দেখা! ভদ্রতার ধার না ধেরে টেরি করলে কি না, আমার মত না নিয়ে তাঁদের ডেকে বললে, 'Ladies, here is a gentleman wishing to meet

you.' আমি অগত্যা নেমে পড়ে তাঁদের সঙ্গে দু-একটা শিষ্ট কথা বিনিময় করলুম। টেরির জ্বালায় শেষটা আমার দশা এমন হয়েছিল যে, মনে মনে বলতে লাগলুম, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। রাজ্যিসুদ্ধ সকলের সঙ্গে তার ভাব, সকলের সঙ্গে তার ঠাট্টা। এক তরুণ তার তরুণীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে ফিরছে—টেরি তাকে বললে, 'কি হে তুমি তোমার মেরীকে নিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি, আমাদেরও দিনকাল ছিল হে, আমাদেরও মেরী ছিল'—বুড়োর রসিকতায় তরুণীটির মুখ এমন রাঙা হয়ে উঠল আর তরুণটির হাসি এমন সঙ্কোচসূচক হলো যে, আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। অথচ এ ধরনের রসিকতা তো এই নতুন দেখলুম না, দেশেও দেখেছি পাড়াগাঁয়। এটা তাজা মনের, সুস্থ মনের লক্ষণ। দোষের মধ্যে এটা একটু ভোঁতা, একটু স্থূল।

তারপরেও এ রকম রসিকতা পদে পদেই চলল। পথে তরুণী দেখলেই বৃদ্ধের ঠাট্টা শুরু হয়। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে. 'এমন girls তোমার দেশে আছে?' কী আপদ! আমি বলি, 'হুঁ।' এর পরে টেরির বাড়ী এসে lobster সিদ্ধ করলুম তার সঙ্গে মিলে। তার মতো লোকের বাড়ীতেও কলের উনুন আছে, পয়সা ফেললেই গ্যাসের আগুন জ্বলে। ইউরোপের গরীব লোকেরাও খুব আরামে থাকে। তাদেরও স্বতন্ত্র বসবার ঘর, শোবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের ঘর—সাজ-সজ্জা বেশ ভালোই। তবে টেরির বাড়ীটা কিছু নোংরা ও এলোমেলো। কারণ টেরির বুড়ী মারা গেছে, ছেলে মারা গেছে। টেরি কোথায় খায়, কোথায় শোয়, তার ঠিক থাকে না, সে মাছ-কাঁকড়া ধরে ও বিক্রী করে গ্রামে গ্রামে বেড়ায়।

Lobster সিদ্ধ করতে বেশ সময় লাগে! কতগুলো জ্যান্ত lobster ডেকচিতে করে উনুনে চড়িয়ে দিয়ে আমরা চা খেতে বসলুম। Lobster গুলো সিদ্ধ হলে পর জ্যান্ত কাঁকড়া সিদ্ধ করার পালা। সে গেল ঘোড়াকে hay ঘাস খাওয়াতে, আমি রইলুম কাঁকড়ার তদ্বির করতে। কাঁকড়াও সিদ্ধ করতে সময় লাগে অনেক। কাঁকড়াগুলো সঙ্গে নিয়ে ও লবস্টার খেয়ে আমরা বেরুলুম সেন্ট হেলেন্স গ্রামের পথে রাইডের অভিমুখে।

পথে এক কৃষকের বাড়ী থেমে দেখলুম, কৃষক কোথায় গেছে, কেউ নেই বাড়ীতে। কৃষকের অনেকগুলি মুরগী আর গোরু আছে, আর তার পুকুরে অনেকগুলি হাঁস সাঁতার কাটছে। মুরগী এ দেশে সব গ্রাম্যলোকেই রাখে, তাতে খরচ কম, লাভ অনেক। আর একজন কৃষকের বাড়ী গেলুম, সে গরীব বলে তাকে টেরি গোটাকয়েক কমলালেবু দিলে, দয়া করে নিজের ইচ্ছায়। তার ছেলেমেয়েগুলি ঘরের জানালার ওপার থেকে হাত নেড়ে আমাকে ভালোবাসা জানাতে লাগল। টেরি একটি ফুল তুলে এনে আমাকে পরিয়ে দিয়ে গাড়ী চালাতে যাচ্ছে এমন সময় একটা মোটরকার কোত্থেকে ছুটে এসে বেচারী নেলী কুকুরটিকে মাড়িয়ে দিয়ে গেল! সৌভাগ্যক্রমে নেলী প্রাণে মরল না, কিন্তু তার মাথার এক জায়গা বিষম কেটে গেল। টেরি তো কিছুক্ষণ একেবারে থ' হয়ে রইল; বেচারার রসিকতা গেল কোথায়, কুকুরটিকে তুলে নিয়ে ঐ কৃষকের বাড়ী রেখে এসে সারাটা পথ কাঁদো-কাঁদো ভাবে বকতে লাগল, 'আমার কত সাধের কুকুর, তাকে আমি ৫ পাউণ্ড দামেও বেচতে চাইনি, তাকে কি না মাড়িয়ে গেল ঐ bloody মোটরকার! ইচ্ছা করলে কি থামতে পারত না? ড্রাইভার ব্যাটার কি চোখ নেই? মজা বের করে দিচ্ছি রোসো। আমি চিনেছি ঐ ড্রাইভারটা কে।'—তারপর ওর নামধাম, বংশপরিচয় দেওয়া চলল আর মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হতে লাগল, 'ইচ্ছা করলেই সে থামতে পারত। না?' আমার মনটাও বিস্বাদ হয়ে গেছিল। নেলীটা বড় নিরীহ কুকুর, বেচারা গাড়ীর আগে আগে সারাদিন ছুটেছে, চোখের সামনে কিনা তার এই দশা ঘটল। ভাবলুম, মানুষ কত সহজে বাঁধা পড়ে। যে মানুষের স্ত্রী মরেছে, ছেলে মরেছে, সে একটা কুকুরকে ছাড়তে পারে না, এত মমতা!

সমস্ত পথ টেরি মন খারাপ করে রইল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাকে একটা লবস্টার দিয়েছিলুম বাসায় নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখিয়ে খেতে, আনতে ভুলে যাওনি তো সেটা?' আমি বললুম, 'সেটা একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে দিয়েছি।' 'দিয়ে দিয়েছি—? তোমাকে খেতে দিলুম শখ করে আর তুমি করলে বিতরণ! নাম করো দেখি কোন ছেলেটাকে দিয়েছ, দেখে নেবো একবার তাকে।' আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আহা, রাগ করছ কেন? তোমার এমন সুন্দর লবস্টার একলা আমি খেলে কি ভালো হতো, অনেক জন খেয়ে তোমার সুখ্যাতি করবে এ কি তুমি চাও না?" কিন্তু যুক্তিটা তার মনঃপূত হলো না—গেঁয়ো যোগীকে ভিখ দিতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিংবা সেই দিত, আমি দেবার কে? ভাবটা বুঝে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাঁ, টেরি, তুমি কোন club-এ যাও?' টেরি উলটো বুঝলে। বললে 'কী বলছ? আমি crab রাঁধতে জানি কি না? আচ্ছা, তোমাকে একটা crab (কাঁকড়া) dress করে খাওয়াচ্ছি, দাঁড়াও।'

তখন এক মাঝির বাড়ী আমরা থামলুম। মাঝি তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে চায়ের টেবিলে বসেছিল, আমাকে বসিয়ে চা খাওয়ালে। মাঝির সাত ছেলে দুই মেয়ে—স্ত্রী নেই। ছেলেগুলি মাঝির নিজের কাছে মাঝিগিরির এপ্রেন্টিস্। তারা খাসা ছেলে, বেশভূষায় ভদ্র ঘরের ছেলের মতন, লেখাপড়া জানে, খবরের কাগজ পড়ে। ছোট খুকীটি বড় লাজুক, তাকে আমি কিছুতেই কথা কওয়াতে পারলুম না। সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, তার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তবু সে লজ্জায় খাচ্ছে না; শেষে আমি তার দিকে না তাকিয়ে মাঝির সঙ্গে কথা জুড়ে দিলুম, তখন খুকী তার চা-টুকু লুকিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিলে।

এতক্ষণ টেরি বসে কাঁকড়া dress করছিল। Dress-করা কাঁকড়া এনে আমার সামনে রেখে বললে, 'খাও'। সর্বনাশ! তার বাড়ীতে সে আমাকে পেট ভরে খাইয়েছে, শুধু চা'ই খাইয়েছে পাঁচ পেয়ালা, যদিও চা আমি কদাচ খাই। এই আমার ভাগ্য যে, টেরি আমাকে কিছুতেই সিগারেট খাওয়াতে পারেনি এবং মদ সে নিজেই খায় না। আগে নাকি খেত, তারপরে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বড় বেশী সিগারেট খায়। তাকে এক বাক্স সিগারেট কিনে দিলুম। আর দেশলাই তার কিছুতেই জোটে না। রাস্তায় একে তাকে থামিয়ে তাদের দেশলাই চেয়ে নিয়ে সিগারেট ধরায়। লোকটা দিব্যি দু'পয়সা রোজগার করে, তার বিশখানা আন্দাজ নৌকা আছে, শ'খানেক চেয়ার ভাড়া দেয়, কেউ নেই যে কারুর পেছনে খরচ করবে—তবু তার হাতে টাকা নেই, এমন দিন গেছে যে দিন তার হাতে এক পেনীও ছিল না। আসল কথা, লোকটা তার যন্ত্রপাতির যত্ন নেয়, পাঁচ বারের পুরোনো নৌকাকেও নতুনের মতো করে রেখেছে, তার পোনী ঘোড়াগুলোর পেছনে সে খরচ যত করে তাদের কাছ থেকে কাজ পায় না তত।

রাইড, ১৮ই চৈত্র ১৩৩৪

ছেলেমেয়েদের থিয়েটার

'Children's Theatre' নামে লণ্ডনে একটি ছোট্ট থিয়েটার আছে, কাল গিয়েছিলুম তার অভিনয় দেখতে। থিয়েটারটি লণ্ডনের Shaftesbury Avenueতে, ঐ রাস্তাটায় আরো অনেক থিয়েটার আছে, বড় বড় নামজাদা থিয়েটার। এই অঞ্চলটাকে বলা হয় London's Theatreland অর্থাৎ

লণ্ডন শহরের থিয়েটার পাড়া। কেবল থিয়েটার কেন, আরো অনেক রকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন এই অঞ্চলে আছে: বড় বড় সিনেমা, নাচঘর, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়াম, হোটেল, রেস্তরাঁ, সুইমিং বাথ সবই এর কাছাকাছি।

আমাদের 'Children's Theatre'টি ঠিক Avenueর ওপরে নয়, একটি গলির ভিতরে। প্রবেশ করবামাত্র চোখে পড়ে। ঘরটি ছোট, শ'খানেকের বেশী সীট নেই, সব সীট স্টেজের সামনের মেজেতে। লণ্ডনের বড় বড় থিয়েটারগুলোতে তলে ওপরে মিলিয়ে বসবার কায়দা অনেক রকম, বসবার মঞ্চ চার-পাঁচ তলা। তাদের বলে সার্কল, স্টল, পিট্, ব্যালকনী, গ্যালারী ইত্যাদি। টিকিট কেনবার সময় ফার্স্ট, সেকেণ্ড বা থার্ড ক্লাস বললে টিকিট পাবে না, বলতে হবে 'ড্রেস সার্কল' বা 'য়্যাম্ফিথিয়েটার স্টল' বা এমনি কোনো কথা। কিন্তু 'Children's Theatre'-এ ওসব বালাই নেই, ওখানে গিয়ে বলতে হয় আমি এত খরচ করতে রাজি, এই দামের একখানা টিকিট দিন। তখন যিনি টিকিট বিক্রী করেন তিনি সেই দামের টিকিট না থাকলে তার চেয়ে একটু বেশী দামের টিকিট কিনতে পারো কিনা জিজ্ঞাসা করেন ও আপত্তি না থাকলে দেন। টিকিট নিয়ে যেই ভিতরে ঢুকলে অমনি তোমাকে একজন কর্মচারিণী তোমার টিকিটের গায়ে লেখা সীটে নিয়ে বসিয়ে দিলেন ও তুমি দুই পেনী দাম দিলে একখানা প্রোগ্রাম দিলেন। বলতে ভুলে গেছি, টিকিটের দাম বড়দের পক্ষে ছয় পেনী থেকে পৌনে ছয় শিলিং অবধি (অর্থাৎ পাঁচ আনা থেকে সাড়ে তিন টাকা অবধি), ছোটদের পক্ষে তার অর্ধেক।

আমার সীটে গিয়ে বসলুম। এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি বুড়োবুড়ীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়, ছেলেমেয়ে আর বুড়োবুড়ী যেন দশ আনা ছয় আনা। তোমরা ভাবছ, ছোটদের থিয়েটারে বড়রা কী দেখতে যায়। বড়রা দেখতে যায় ছোটদের আনন্দ। এতগুলি ছোট ছেলেমেয়েতে মিলে যখন মৃদুকণ্ঠে কলরব করছিল, বারবার উঠছিল বসছিল, নিজের সীট ছেড়ে পরের সীটে যাচ্ছিল, ও শেষের সারিতে যারা ছিল তারা সীটের ওপর দাঁড়িয়ে দেখছিল—তখন তাদের সেই উন্মনা চঞ্চল ভাব বড়দের কত আনন্দ দিচ্ছিল তা কি তারা জানত? মেরী যখন তার সীট ছেড়ে আগের সারির একটা রিজার্ভ সীট দখল করে বসল, তখন পেছন থেকে তার বাবা ডাকলেন—'মেরী!' মেরী কি শুনল? মেরীর তখন কত আগ্রহ! কিন্তু রিজার্ভ সীটে যখন এক পঞ্চাশ বছরের ঠাকুমা বসলেন তখন বেচারী মেরীকে পুনর্মূষিক হতেই হলো।

এই থিয়েটারটি যেন একটি ঘরোয়া ব্যাপার। অরকেস্ট্রা ছিল না, ছিল একটি পিয়ানো। যিনি পিয়ানোতে বসেছিলেন তিনি বাজাতে বাজাতে যখন থামেন, তখন তাঁর একটু দূরে বসে থাকা খোকাখুকুদের আদর করেন। স্টেজটিও ছোট্ট, দর্শকদের খুবই কাছে, যাঁরা অভিনয় করছিলেন তাঁরা যেন দর্শকদেরই দলের লোক, তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিকট সম্বন্ধ। যাঁর বইয়ের অভিনয় হচ্ছিল তিনিও অভিনয়ে নেমেছিলেন, তাঁর নাম Margaret Carter. অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বয়স বেশী নয়, সংখ্যাও অল্প। সবসুদ্ধ নয় জন অভিনয় করেছিলেন।

এই থিয়েটারটি যাঁরা চালান তাঁরা ঠিক শখের খাতিরে চালান না, ঠিক লাভের খাতিরেও না। তাঁরা একটি বন্ধুমণ্ডলী—তাঁরা একটি সুন্দর আইডিয়া নিয়ে কাজে নেমেছেন, ছোটদের একটা বড় অভাব দূর করেছেন, একটি স্থায়ী থিয়েটারের অভাব। প্রত্যেক ইস্কুলে মাঝে মাঝে যে রকম থিয়েটার হয় তাতে ভালো অভিনয় সব সময় দেখা যায় না, তাতে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের অন্য কাজ আছে, তাঁরা অভিনয়কার্যে সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে দিতে পারেন না। কিন্তু এই থিয়েটারটিতে যাঁরা আছেন তাঁরা সব কাজ ছেড়ে এই কাজে নিপুণ হচ্ছেন, তাঁদের কেউ বা বই লেখেন, কেউ বা প্রোডিউস করেন, কেউ সীন আঁকেন, কেউ আসবাব তৈরী করেন, কেউ পোশাক

তৈরী করে দেন। অনুষ্ঠানটির সেক্রেটারী হচ্ছেন Margaret Carter. তিনি লেখেনও ভালো। স্কুলগুলির সঙ্গে এঁদের বন্দোবস্ত আছে, এঁরা স্কুলের ছেলেমেয়েদের দলবলকে সস্তায় থিয়েটার দেখান।

কাল কী কী অভিনয় হলো বলি এবার। প্রথমে 'আলফ্রেড ও পোড়া পিঠে' নামক সেই ইতিহাসের গল্পটা। অনেক শত বছর আগে রাজা আলফ্রেড তাঁর প্রজাদের সুখ-দুঃখ চোখে দেখবার জন্যে ছদ্মবেশে বেড়াতে বেড়াতে এক পল্লী-গৃহিণীর গৃহে বিশ্রাম করেন। সেই গৃহের উনুনের ধারে কয়েকটি পিঠে রেখে গৃহিণীর অল্পবয়সী দাসীটি খেলা করতে বেরিয়ে যায়। অতিথির অমনোযোগবশতঃ পিঠেগুলি পুড়ে যায়, গন্ধ পেয়ে গৃহিণী ছুটে এসে দেখেন দাসী নেই, পিঠেগুলি পুড়ছে। অতিথিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি মেয়েটির দোষ নিজের ওপর টেনে নিয়ে বলেন, 'একটা বিশেষ কাজে আমিই মেয়েটিকে বাইরে পাঠিয়েছি। আমারি দোষ।' তখন গৃহিণী ভীষণ চটে বললেন, 'তবে তার বদলে তুমিই বেত খাও।' এই বলে যেই তাঁকে মারা অমনি রাজার অনুচর এসে পড়ে বললে, 'করছ কী? ইনি যে রাজা!' তারপর গৃহিণী জানু পেতে মাপ চাইলেন, রাজা হেসে ক্ষমা করলেন এই শর্তে যে দাসীটিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, তাঁর একজন সভাসদের সঙ্গে তার ভালোবাসা আছে তিনি জেনেছেন, তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন। দাসীটি উচ্চবংশের মেয়ে, ভাগ্যদোষে দাসী হয়েছিল।

যে মেয়েটি বালিকা দাসী সেজেছিল তার বয়স বেশী নয়, চমৎকার অভিনয় করলে। রাজা আলফ্রেডের পোশাক সেকালের মতো গাম্ভীর্যময় হয়েছিল। সবচেয়ে ভালো হয়েছিল পল্লী-গৃহিণীর গৃহিণীপনা, যেমন তাঁর গলার জোর তেমনি তাঁর গায়ের জোর, যেমনি তিনি কড়া তেমনি তিনি ব্যস্ত। অন্য সকলে অভিনয়ই করছিল, তিনি সত্যি সত্যি রায়বাঘিনীগিরি করছিলেন। একেই বলে সেরা অভিনয়!

এর পরে একটি গীতাভিনয়। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে। একটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে, 'Soldier, soldier, won't you marry me?' সৈনিক উত্তর দিলে, 'তোমার মতো সুন্দরীকে বিয়ে করব, আমার জুতো নেই যে!' মেয়েটি নাচতে নাচতে জুতো কিনতে গেল। আরেকটি সুন্দরী মেয়ে নাচতে নাচতে এসে বললে 'Soldier, soldier, won't you marry me?' সৈনিক উত্তর দিলে, 'তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করব আমার কোট নেই যে!' সে মেয়েটিও নাচতে নাচতে কোট কিনতে বেরিয়ে গেল। প্রথম মেয়েটি জুতো এনে দিয়ে বললে, 'Soldier, soldier, won't you marry me?' সৈনিক উত্তর দিলে 'আমার টুপী নেই যে!' মেয়েটি টুপী আনতে গেল। দ্বিতীয় মেয়েটি কোট এনে দিয়ে বললে, 'Soldier, soldier, won't you marry me?' সৈনিক বললে, 'আমার দস্তানা নেই যে!' সে মেয়েটি দস্তানা আনতে গেল। প্রথম মেয়েটি টুপী এনে পরিয়ে দিলে। দ্বিতীয় মেয়েটি দস্তানা এনে পরিয়ে দিলে। দু'জনেই বললে, 'Soldier, soldier, won't you marry me?' সৈনিকের এবার চেহারা ফিরে গেছে। সে লাফ দিয়ে উঠে বললে, 'তোমাদের এখন কেমন করে আমি বিয়ে করি? আমার যে বৌ আছে, ছেলে আছে!' তখন একধার থেকে টুপীর পরে টান, আরেক ধার থেকে দস্তানার পরে টান, এক ধার থেকে জুতোর পরে, আরেক ধার থেকে কোটের পরে। নিধিরাম হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর গিয়ে নিজের আসনটিতে বসে পড়ল, মেয়ে দু'টি চলে গেল জুতো টুপী কোট দস্তানা নিয়ে নাচতে নাচতে।

এর পরে আরেকটি গীতাভিনয়—একটি প্রাচীন ছড়াকে দৃশ্যে পরিণত করা হয়েছে। একজন সেজেছিল জ্যাকেট, আরেকজন পেটিকোট। তাদের দড়ি দিয়ে রোদে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল, কুয়োয়

ফেলে দিলে, উদ্ধার করে আবার ঝুলিয়ে রাখলে। তারপর A. A. Milne-এর লেখা একটি কবিতার মূকাভিনয়—'The knight whose armour didn't squeak.' দুই নাইটের জন্যে দু'টি কাঠের ঘোড়া দেখা গিয়েছিল স্টেজে। একটি দম-দেওয়া কলের ঘোড়া ও ঘোড়-সওয়ার স্টেজের এ-পাশ থেকে ও-পাশে দৌড় দিয়েছিল। তার পরে দু'টি Sea Chantey অর্থাৎ জাহাজের নাবিকের গান গাওয়া হোল। বলতে ভুলে গেছি, স্টেজে যখন গীতাভিনয় বা গান ইত্যাদি হতে থাকে, তখন স্টেজের নীচে পিয়ানো বাজান হচ্ছিল।

এর পরে একটা খুব চমৎকার গীতাভিনয় হলো। বার্বারী উপকূলের জলদস্যুদের জাহাজের সঙ্গে ইংরেজদের জাহাজের লড়াই। বার্বারীদের জাহাজটা গোলা খেয়ে ডুবল ও জলদস্যুরা ডুবে মরবার সময় খুব অঙ্গভঙ্গীসহকারে ঘটা করে মরল। দর্শকরা তো প্রত্যেক অভিনয়ের শেষে ঘন ঘন করতালি দিচ্ছিলই, এই অভিনয়টার শেষে অনেকক্ষণ ধরে করতালি দিয়ে শেষাংশটুকু আরেক বার অভিনয় করিয়ে তবে ছাড়লে। বার্বারী জলদস্যুরা উত্তর আফ্রিকার মুর, তাদের কানে বড় বড় ring, তাদের গায়ের রঙ কালো।

এর পরে একটা 'Mime play' অর্থাৎ মূকাভিনয়। তিন বোনের এক খুড়ী তাদের পড়াতে এলেন, পড়াতে পড়াতে ঢুলতে লাগলেন, এই অবসরে তাদের বাড়ীর ছোকরা সহিসের (Stable boy) সঙ্গে তারা নাচতে শুরু করে দিলে। বাগানে যেখানটায় তারা নাচছিল সেখানে একটা মূর্তি ছিল, সেই মূর্তির নাম-অনুসারে নাটকটার নাম হয়েছে 'The Statue.' ঘা লেগে statueটার একাংশ ভেঙে যায়, তা দেখে নাচ তো গেল থেমে, ভয়ে সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। খুড়ীর যখন ঘুম ভাঙল, তখন তিনি দেখেন তিন ভাইঝি কাকে যেন আড়াল করছে, তিনি উঠে গিয়ে যার কাছে দাঁড়ান তারি পিছনে কে একজন লুকোয়, কিছুতেই ধরতে না পেরে তিনি আবার এসে একটু ঝিমুলেন। এই অবসরে মেয়ে তিনটি সেই ছেলেটাকে নিয়ে মূর্তির জায়গায় মূর্তির মতো ত্রিভঙ্গ করে দাঁড় করিয়ে দিলে। খুড়ী চোখ চেয়ে যেই তার কাছে যান অমনি সে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়, যেই ফিরে আসেন অমনি সোজা হয়ে দাঁড়ায়, অবশেষে খুড়ীর কেমন যেন সন্দেহ হলো, মূর্তিটা কি জ্যান্ত? সাহস করে তিনি যেই তার গায়ে হাত ছুঁইয়েছেন, অমনি সে শিউরে উঠে বললে, 'হুঁ!' ভূতের ভয়ে খুড়ীর মূর্ছা হয় আর কি!

এদের সকলেরই অভিনয় এমন হয়েছিল যে কথা না বলেও এঁরা অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যের দ্বারা গল্পটির কিছুই বোঝাতে বাকী রাখেননি। এঁদের পোশাক গত শতাব্দীর ধরনের—বেশ ঢিলেঢালা। নাচটাও হয়েছিল সেকালের মতো আয়েসপূর্ণ, একালের মতো তাড়াহুড়াময় নয়। নাচের বাজনা (পিয়ানো) নামজাদা সঙ্গীতকারদের সুরে বাজছিল—Brahms, Debussy, Chopin, Tchaikovsky. আজকালকার jazz band-এর মতো নয়। ছোটবেলা থেকে উঁচুদরের সঙ্গীতের সঙ্গে ও নাচের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে এঁরা শিশুদের রুচিকে ভালো দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন।

সবশেষে সবচেয়ে সফল অভিনয় Margaret Carter-এর নাটিকা 'The Dutch Doll' অর্থাৎ 'হল্যাণ্ড দেশের পুতুল।' সীন উঠতেই দেখা গেল একটা বুড়ো হ্যাঁ—চ্—চো করে হাঁচল। তার বুড়ী এসে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'এখন থেকে তিন বেলা খেতে দিতে পারব না, দু' বেলা খেতে হবে, আমরা বড় গরীব হয়ে পড়েছি' তাদের মেয়ে তাদের কাছে বিদায় নিতে এল, সে এক অভিনেত্রীর কাছে চাকরি পেয়েছে, তার আশা সেও একদিন অভিনেত্রী হয়ে উঠবে। তাকে বিদায় দেবার সময় বুড়োবুড়ী কেঁদে ফেললে, সে তাদের সান্ত্বনা দিয়ে খুশি মনে বিদায় হলো। একটু পরে একখানা চিঠি এল, বুড়োর আত্মীয় লিখেছে, 'আমি তোমার মেয়েটিকে দেখতে যাচ্ছি, যে কোন মুহূর্তে পৌঁছতে পারি, দেখব মেয়েটি লক্ষ্মী কি না, রাঁধতে-বাড়তে জানে কি না, আমার ছেলের

উপযুক্ত কি না।' বুড়ো বললে, 'সর্বনাশ, মেয়ে তো চলে গেল, আর মেয়ে তো রাঁধা-বাড়ার ক—খ—গ—জানে না, তার মন কেবল নাচ-গানে।' বুড়ী বললে, 'একটা বুদ্ধি এঁটেছি। যাও, ঐ ঘর থেকে ঐ পুতুলটাকে নিয়ে এসো, ওটাকেই মেয়ে বলে চালাতে হবে। তোমার আত্মীয় তো তোমার চেয়েও বুড়ো, চোখে দেখতে পায় না ভালো, কানে শুনতে পায় না ভালো, আজকের মতো ওকে রাতের আবছায়াতে ভোলাতে পারা যাবে।'

এ কথা বলতে বলতে দরজায় ঘা পড়ল। কে এল? এল আত্মীয় নয়, তাঁর ছেলে! বুড়ো তো তাকে বসিয়ে খাতির করছে, বুড়ী লেগে গেছে পুতুলটাকে নাইয়ে ধুইয়ে কাপড় পরাতে। শেষে পুতুলটাকে এনে এক কোণে দাঁড় করানো হলো। পুতুলটা কলের পুতুল, তার পিছনে দাঁড়িয়ে দড়ি টানলে সে হাত-পা নাড়ে, 'হাঁ' 'না' বলে ও নাচে। ছেলে যেই তার সঙ্গে করমর্দন করতে গেছে, তার হাত ধরেছে জাপটে। যেই জিজ্ঞাসা করছে, 'কেমন আছেন?' উত্তর দিয়েছে, 'না।' টেবিলে খেতে বসে পুতুলটা কেবলি দুই হাত মুখে তুলছে ও নামাচ্ছে দেখে বুড়ো যেই দড়িটাকে আরেক রকম করে টেনেছে, অমনি সে দুই হাত ঘুরিয়ে লাগিয়েছে পাশের লোককে দুই চড়। চড় খেয়ে ছেলে গেল ক্ষেপে। বুড়ো দেখলে ব্যাপার ভালো নয়, দড়িতে টান দিতেই পুতুল লাগল নাচতে, ছেলেটা দেখে এত খুশি হলো যে তখুনি বলে ফেললে, 'আমি একে বিয়ে করবই।' বুড়ী পুতুলটাকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে যাবার সময় ছেলেটা বিয়ে-পাগলার মতো ছুটতে চায় তার সঙ্গে, বুড়ো তাকে অনেক কষ্টে সে রাত্রের মতো বিদায় করে পর দিন আসতে বললে। কিন্তু রাত না পোহাতেই সে এসে দ্বারে দিয়েছে ধাক্কা। ইত্যবসরে বুড়োর মেয়ে ফিরে এসেছে নিরাশ হয়ে, অভিনেত্রী তাকে বলেছে, 'অভিনয় শিখতে চাও তো আগে রান্না করা, বাসন মাজা প্রাকটিস করো, তারপর স্টেজে নামবে।' বেচারী ও বিদ্যা জানে না, নাচ-গানের দিকে তার ঝোঁক, তাই সে রাগ করে ফিরে এল। তারপর সেই ছেলের সঙ্গে সকালবেলা তার দেখা। ছেলে বললে, 'কাল তুমি কী সুন্দর নাচলে। তুমি আমার বৌ হলে তোমাকে আর কিছুই করতে হবে না।' মেয়েটি তো ভারি খুশি হয়ে বিয়ে করতে রাজি হলো। বুড়োবুড়ীর ভারি আনন্দ! চার জনে মিলে খুব এক চোট নেচে নিলে। ছেলেটি বললে, 'দেখ, কাল আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল তুমি মানুষ নও, পুতুল।' মেয়েটি বললে, 'এতে আর সন্দেহ কী? মেয়েমানুষ মাত্রেই পুতুল থাকে, যতদিন না তাকে কেউ বিয়ে করে মানুষ করে দেয়।'—

খুব সুন্দর গল্প, খুব সুন্দর অভিনয়। গৃহসজ্জা বড় খাসা হয়েছিল, ঠিক একটি গরীবের কুঁড়ের মতো, দরজা-জানালা সত্যিকারের। এদিক থেকে ইউরোপের থিয়েটারগুলি আমাদের তুলনায় অশেষ উন্নতি করেছে, স্টেজের ওপরে সব রকম দৃশ্য দেখানো হয়ে থাকে। পারীতে (Paris) আমি সমুদ্রে সাঁতার, জাহাজডুবি, কামানের গোলার আগুন ইত্যাদি সত্যিকারের মতো দেখেছিলুম একবার। 'Children's Theatre's' এ অবশ্য অত আয়োজন সম্ভব নয়, ও সবের খরচ উঠবে না, তা ছাড়া ছোটদের কল্পনাশক্তি বড়দের চেয়ে ঢের প্রখর, তারা স্টেজের ওপরে অত কিছু না দেখলেও কল্পনায় দেখতে পারে; তাদের কল্পনাশক্তিকে সজাগ রাখতে হলে যত কম আয়োজন করা যায় তত ভালো।

যাঁরা কাল অভিনয় করেছিলেন, তাঁরা অভিনেতা-অভিনেত্রী নন, ম্যানেজার ও প্রোডিউসার। সুতরাং এঁদের কত খাটতে হয় আন্দাজ করতে পারো। সকলেরই অতিরিক্ত খাটুনি আছে। তা ছাড়া সকলেরই ঘর-সংসারের দায়িত্ব আছে। অল্পবয়সের মেয়ে এখন থেকেই অভিনয়ে দক্ষ হচ্ছে ও নিজের জীবিকা অর্জন করছে, এমনটি আমাদের দেশে হবার জো নেই। কাল যে সব খোকা-খুকীরা অভিনয় দেখে ফিরল তাদের কেউ কেউ একটু বড় হয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়ে উঠবে, Ellen

Terry যেমন আট বছর বয়স থেকে অভিনেত্রী হয়েছিলেন। এ দেশে বাপ-মা-ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই এক একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী, এমনও দেখা যায়; যেমন Forbes-Robertson পরিবার। নাচ করা, অভিনয় করা, গান করা, বাজনা বাজানো এ দেশে খুব প্রশংসার কাজ এবং তাই অনেকের জীবিকা। আমাদের দেশে একটি ভদ্রঘরের মেয়ে কেবল বেহালা বাজিয়ে টাকা রোজগার করছে, এমনটি দেখা যায় কি? এখানে তেমন মেয়ে অনেক। অনেক মেয়ে বায়োস্কোপের অভিনেত্রী হতে ছেলেবেলা থেকে শিক্ষা পায়, অনেক মেয়ে থিয়েটারে ঢোকে। তাদের কত সম্মান!

লণ্ডন, ১৩৩৫

জার্মেনী—সারল্যাণ্ড

বুস (Bous) বলে জার্মেনীর একটি গ্রাম, হাজার পাঁচেক লোকের বাসস্থান। কাছেই সার নদী। নামে নদী বটে, আসলে খাল, তবু এতে ছোট ছোট জাহাজ যাওয়া-আসা করে। নদীর ধারে মাঝারি গোছের নানা রকম ফ্যাক্টরী, অধিকাংশই লোহার। লোহা একটু দূর থেকে—আলসাস্ লোরেন থেকে আসে। কয়লা এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়। কারখানাগুলো আপাততঃ কিছুকাল ফরাসীদের দখলে। যুদ্ধের পরে এই অঞ্চলটা ফরাসীরা কিছুকালের জন্যে ভোগ করছে।

তা জার্মানরা যে মুখ শুকিয়ে মরে রয়েছে, এমন নয়। তারা ভীমের মতো খাটছে এবং খাটুনির ফাঁকে গান-বাজনায় মশগুল হচ্ছে। এই ছোট গ্রামটিতে যে সব লোক থাকে তারা অধিকাংশই মজুর। তারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি দল ৮ ঘণ্টা করে কারখানার কাজ করে। রাত দিন ২৪ ঘণ্টা কারখানার কাজ চলছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দলের দ্বারা। সকাল ছ'টায় যারা কাজ করতে যায় তারা বেলা দু'টোয় ফেরে। তার পরে অন্য একটা দল কাজে যায়। রাত দশটার সময় আবার দল বদল হয়। কারখানা থেকে ফিরে এরা কী করে বলতে পারো? এরা বাড়ীর কাজে লেগে যায়। নিজের নিজের বাড়ী এরা নিজেরাই তৈরী করেছে। সে সব বাড়ী তৈরী করবার সময় অবশ্য মিউনিসিপালিটির সাহায্য পায়।

বাড়ীগুলি কত সুন্দর, কত বড় ও কত সাজানো-গোছানো তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিনে। ইংলণ্ডের মজুরদেরও এমন বাড়ী নেই। আমি এই গ্রামে ডাক্তারের বাড়ীতে আছি। ডাক্তারের আয় মজুরদের চেয়ে অল্পই বেশী। তবু আমাদের দেশের গ্রাম্য ডাক্তারের সঙ্গে তুলনা না করে গ্রাম্য জমিদারের সঙ্গে তুলনা করলেও লজ্জিত হতে হয়।

সুন্দর একটি বাড়ী, তার সঙ্গে একটি বাগান। বাগানে বাড়ীর মালিক সারাক্ষণ কাজ করেন। সত্তর বছর বয়সের বুড়ো, এখন তাঁর প্র্যাকটিস তাঁর জামাইকে দিয়েছেন। জামাইও ডাক্তার। বুড়োর বড় ছেলে কাছের গ্রামের এক ফ্যাক্টরীর কর্তা, বয়স বেশী নয়, যোগ্যতার জোরে পদোন্নতি করেছেন। ছোট ছেলের বয়স বারো-চোদ্দ, কাছের গ্রামের এক Gymnasium এ পড়ছে, লেখাপড়ায় ভালো নয় বলে বুড়ো নিজেই তাকে সাহায্য করেন। কিন্তু চালাক ছেলে, মজবুৎ গড়ন, নানা বিষয়ে চোখ-কান খোলা রেখেছে, বড় হলে কোনো একটা বিষয়ে বিচক্ষণ হবেই। হবার উপায়ও আছে। কেন না আমাদের মতো এদের পরিবার বৃহৎ নয়, এবং পরিবারের ভার এদের বইতে হয় না।

Ernst যা ইচ্ছা তাই পড়তে পারে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এবং যত দেরিতে ইচ্ছা তত দেরিতে বিয়ে করতে পারে। বিয়ে করলেও ভয় নেই, কেন না এদেশের বৌদের পিতৃদত্ত সম্পত্তি যদি না থাকে তো নিজের হাত-পা থাকে; তারা সংসারের আয় বাড়াবার হাজারো সুযোগ পায়।

এদের বাড়ী আগাগোড়া আর্টিস্টিক। জানালা-দরজা-দেয়াল-আসবাব-বিছানা-আলো যেদিকে চোখ পড়ে সেদিকে দেখি রঙের বৈচিত্র্য, গড়নের কারুকার্য, সূচীশিল্পের নিদর্শন। প্রত্যেকটি ঘরের দেয়াল ভিন্ন ভিন্ন রঙের। এটি লেখবার পড়বার ঘর। এটির দেয়ালের রঙ বাসি রক্তের মতো লাল। দরজার সাইজ অস্বাভাবিক বড়, গড়ন সাদাসিধে, রঙ সবুজ। দরজায় ঠেলা দিলে দেয়ালে ঢুকে যায়। সীলিং শাদা। জানালা সবুজ। পর্দায় ছবি। দেয়ালে খানকয়েক পুরোনো ছবির প্রতিলিপি, খানকয়েক নতুন ছবি, এই বংশের এক তরুণ শিল্পীর আঁকা। একটি আলমারিতে কিছু জার্মান ও ফ্রেঞ্চ বই, নানা দেশের বইয়ের অনুবাদ। রবিবাবুর ফরাসী 'ফাল্গুনী' ও জার্মান 'ক্ষুধিত পাষাণ' আছে। ওপরের ঘরে জার্মান 'ভাগবদ্‌গীতা' দেখেছিলুম। কৌচ এবং সোফাগুলির ছবি এদের নিজেদের ফরমায়েসে আঁকা, টেবিলক্লথ ও পর্দা এদের নিজেদেরই বোনা। 'এদের' মানে Ernst-এর মা'র ও দিদির।

একটা ঘরের মোটামুটি বর্ণনা দিলুম, অন্যান্য ঘরের প্রত্যেকেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকেরই একটি প্রাণ আছে, প্রত্যেকেরই সাজসজ্জা ভিন্ন রকম। আসবাবপত্র প্রাচীন ও আধুনিক, ছবিগুলি বাছা বাছা, মেজে-দেয়াল-সীলিং সর্বত্র বাড়ীর লোকের আর্টিস্টিক রুচি-রীতির ছাপ। দেয়ালে এই যে রঙ দেখছি এ রঙ ওয়াল-পেপারের নয়। ইংলণ্ডের বাড়ীগুলোতে ওয়াল-পেপারের ছড়াছড়ি, তাতে একই রকম ছাপানো design. এদের মেজেতে কার্পেট না দিয়ে এরা ভালোই করেছে। পালিশ-করা কাঠের মেজে নিখুঁতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা ঢের সহজ।

এরা অত্যন্ত সঙ্গীতভক্ত। পিয়ানো ছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রও রাখে। প্রত্যেকেই গাইতে বাজাতে পারে। পরিবারের সকলেই এক সঙ্গে খায়, এক সঙ্গে গায়, এক সঙ্গে বাজায়, এক সঙ্গে খেলা করে। বয়স্ক ছেলের সঙ্গে বুড়ো বাপ-মার প্রাণখোলা হাসি-ঠাট্টা আমাদের দেশে দেখতে পাইনে। আমাদের ঠাকুরদা ও নাতি যেমন প্রাণ খুলে মিশতে পারে, এদের বাপ-ছেলেও তেমনি।

জার্মান জাতটাই সঙ্গীতভক্ত। কারখানার মজুরদের বাড়ীতেও বাদ্যযন্ত্র আছে, তারা সময় পেলেই সঙ্গীতচর্চা করে। পরশু আমি গিয়েছিলুম এক দর্জীর বাড়ী। দর্জীর ছেলে বেহালা শোনালে। আর একটি মেয়ে দিলে একটি ফুলের তোড়া উপহার। এদের জাতীয় সমৃদ্ধি যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হয়নি। কেন না যুদ্ধের দ্বারা এদের কর্মঠ প্রকৃতি ধ্বংস হয়নি। যখন যাকে দেখি তখন সে কিছু না কিছু কাজ করছে। রেলে বেড়াবার সময় মেয়েরা সেলাই করছে, কথা বলবার সময় বাড়ীর গিন্নী সেলাই করছেন, রান্না করবার সময় বাড়ীর ঝি খবরের কাগজ পড়ছে, কারখানার মজুরনী টিফিনের ছুটিতে স্টোভে রান্না চড়িয়ে কঠিন বৈজ্ঞানিক বই পড়ছে। অথচ খেলাধূলারও কমতি নেই, ছোটরা তো আমাদের দেশের মতো কত রকম খেলাধূলায় লেগে আছেই, বড়দের জন্যে টেনিস, ফুটবল ইত্যাদি ছাড়া একটা প্রকাণ্ড সুইমিং বাথ আছে, মিউনিসিপালিটির দ্বারা তৈরী। তাতে প্রতিদিন পালা করে মেয়েরা ও পুরুষেরা সাঁতার কাটে এবং তার একটা অংশ ছোটদের জন্যে অগভীর করে গড়া।

সেদিন সেই দর্জীর ছেলেদের আসতে বলা হয়েছিল আমাদের এখানে। কাল সন্ধ্যার পরে তারা আমাদের surprise দেবার জন্যে কখন এক সময় এসে বাগানে বাজনা শুরু করে দিয়েছে—বেহালা আর Zither. শেষোক্ত যন্ত্রটাতে অনেকগুলো তার, দুই হাতের দশ আঙুলে বাজাতে হয়। অনেকক্ষণ বাজনা চললো, মাঝে মাঝে বাড়ীর লোকেরা গান ধরলেন তার সঙ্গে।

বাড়ীর ঝিরাও এসে কর্তা-গিন্নীর কাছে চেয়ার নিয়ে বসলে এবং সকলের সঙ্গে গেলাস ছুঁইয়ে সরবৎ পান করলে। মদ না বলে সরবৎ বললুম এই জন্যে যে তাতে alcohol ছিল না এবং তা বাড়ীতেই তৈরী। কাল রাত্রের গান-বাজনার মজলিসে আমরা বয়সে ও পদমর্যাদায় ছোট-বড় সবাই ছিলুম—Ernst চোদ্দ বছর বয়সের ছেলে; কেবল Hermann ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার বয়স চার-পাঁচ বছর, সে বুড়োর মেয়ের ছেলে।

পরিবারের সকলে মিলে যখন রাইনল্যাণ্ডের স্থানীয় সঙ্গীত গাইছিল, তখন আমার বড় রোমান্টিক লাগছিল। বাজনাও চলছিল তার সঙ্গে মোহ মিশিয়ে এবং সরবৎ খাওয়া চলছিল তার সঙ্গে ঘোর লাগিয়ে। বৃহৎ বাগানের বড় বড় গাছগুলোর ওপরে তারায় ভরা আকাশ ঝুঁকে পড়েছিল। কেবল দূর থেকে আসছিল ফ্যাক্টরীগুলোর আওয়াজ। গান-বাজনার শেষের দিকে আমরা যখন শুতে গেলুম, তখন অল্পবয়সী ঝিরা নিজেদের মধ্যে একটু নাচলে আর তাদের আত্মীয় সেই দর্জীর ছেলেরা নাচের বাজনা বাজালে। নাচের আনন্দ থেকে আমাদের দেশ বঞ্চিত। কিন্তু এরা ছেলে-বুড়ো, ছোটলোক-বড়লোক সবাই নাচতে জানে, গাইতে জানে, বাজাতে জানে। রাত্রের খাওয়া শেষ হলে একটা-কিছু আমোদ করা এ সব দেশের পারিবারিক কর্তব্য। গান এদের পক্ষে তেমনি সহজ পাখীর পক্ষে যেমন। রেলে চড়ে ভিন্ গাঁয়ের মজুরেরা ফিরছে, তাদের সেই 4th class এর কামরা থেকে গান-বাজনার ধ্বনি আসছে। Ernst আর তার মা বাড়ী ফিরছেন, দু'জনে মিলে হালকা সুরের গান ধরেছেন। মা'র বয়স ষাট, কিন্তু দিব্যি জোয়ান আছেন দেহে-মনে।

আমার ধারণা ছিল জার্মানরা বড় গুরু-গম্ভীর জাত। কিন্তু দেখছি, যুদ্ধে হেরে তাদের ফুর্তি বেড়ে গেছে। তাদের দেখে কে বলবে এরা ধনে-প্রাণে অনেক লোকসান দিয়েছে, এখনো এদের ভয়ানক দেনা, এখনো এই সার অঞ্চলটা পরাধীন ও এর কারখানাগুলো ফরাসীরা দখল করে বসেছে? হাসি সকলের মুখে লেগেই আছে, বিশেষ করে যে সব বুড়োবুড়ীর ছেলে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে ও টাকা যুদ্ধে উড়ে গেছে সেই সব বুড়োবুড়ীর হাসি দেখে অবাক হতে হয়! এই বাড়ীতে ফরাসীরা আড্ডা গেড়েছিল। এই বুড়োর অনেক টাকা যুদ্ধে লোকসান গেছে!

আজ এক ছাপাখানায় গিয়েছিলুম। বিরাট ছাপাখানা। রঙীন বিজ্ঞাপন ও সিগারেটের বাক্স ইত্যাদি সব দেশের জন্যে তারা ছেপে দেয়। ছাপাখানার যারা মালিক তারা হাই স্কুলেও পড়েছে, অথচ তাদের অধীনে শ'দুয়েক মেয়ে খাটছে। পুরুষ সে কারখানায় অল্পই দেখলুম। বড় বড় কলগুলো অল্পবয়সী মেয়েরাই চালাচ্ছে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। জার্মান মেয়েদের ও পুরুষদের মুখ গোল ও নিটোল। মেয়েদের অনেকেরই কবরী আছে, অনেকের চুল ছোট করে কাটা। আর পুরুষদের অধিকাংশেরই মাথা মুড়ানো; কেবল কপালের উপরে দু'এক ইঞ্চি জায়গা চুলের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—সেই এক গোছা চুলে অতি অপরূপ টেড়ী! দেখলে মনে হয় লেস-বাঁধা ফুটবল! কিংবা কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি!

এখানে মোটরগাড়ী সংখ্যাতীত। তবু গোরুর গাড়ীও দেখছি। সে সব গাড়ীর কোনো কোনোটার গাড়োয়ান মেয়েমানুষ। ক্ষেতের কাজও মেয়েমানুষে করে। তা বলে তাদের ঘরকন্নার কাজ আকাশের পরীরা করে দিয়ে যায় না, কিংবা পুরুষমানুষে করে না, তারা নিজেরাই করে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে রান্না হয়, তাই বেশী সময় লাগে না।

ফ্যাক্টরী ঝাঁট দিয়ে যে সব আবর্জনা জড়ো করা হয় সেগুলো দিয়ে গোটাকয়েক কৃত্রিম পাহাড় তৈরী হচ্ছে, তার উপরে চারাগাছ পুঁতে জঙ্গল তৈরী হচ্ছে। এক আশ্চর্য দৃশ্য। আবর্জনাপূর্ণ গাড়ী চলেছে পাহাড়ের ওপরে লটকানো তার বেয়ে, বিদ্যুতের সাহায্যে। আবর্জনা উজাড় করে তার বেয়ে আপনিই নেমে আসছে। এই নকল পাহাড়-জঙ্গলগুলো দেখলে সত্যিকারের মনে হবে আর

বছর-কয়েক পরে।

মিউনিসিপালিটি থেকে যে স্কুল করা হয়েছে তাতে অন্ততঃ তিনটি বছর প্রত্যেক ছেলেকেই পড়তে হয়, হোক না কেন সে রাজার ছেলে। তেরো-চোদ্দ বছর বয়স অবধি এই স্কুলে বিনা পয়সায় পড়তে পারা যায়। Gymnasium এ পড়তে পয়সা লাগে। সেটা একটু উঁচুদের স্কুল। স্কুলের বাড়ী বড়, সাজ-সরঞ্জাম অশেষ রকম।

মিউনিসিপালিটি থেকে একটা বাড়ী বানিয়ে দিয়েছে, তাতে Nunরা থাকে। আর থাকে সেই সব বুড়োবুড়ীরা যাদের আশ্রয় নেই। এই সব Nunরা পরের ছেলে আগলায়, পরের বাড়ী গিয়ে শুশ্রূষা করে আসে, এবং গ্রামের মেয়েদের রান্না, সেলাই ও লেখাপড়া শেখায়। আর যে সব বুড়োবুড়ীরা তাদের আশ্রয়ে থাকে তাদের সেবা করে। এ সব দেশে পিতামাতাকে পালন করা সন্তানের কর্তব্য নয়। পিতামাতার যদি সঞ্চয় না থাকে বা pension কম হয় তো তাদের দুর্দশা মোচন করে সমাজ। আমাদের দেশে এমনি সব আশ্রয় হওয়া উচিত, সেখানে বিধবারা ভার নেবেন অনাথ শিশু ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধার।

একটি মজুর পরিবারে গিয়েছিলুম। অল্প কয়েকটি নিখুঁৎভাবে পরিচ্ছন্ন ঘর, তাতে অল্প কয়েকটি নিখুঁৎভাবে সাজানো আসবাব, সমস্তই বাড়ীর গিন্নীর কীর্তি। একটি রান্নাঘর—খাবার ঘর—ভাঁড়ার ঘর। একটি মা-বাবার ঘর। একটি খোকা-খুকীর ঘর। রান্না—খাবার—ভাঁড়ার ঘরে একটি কাবার্ডে আলাদা আলাদা এক সাইজের চক্চকে ঝক্ঝকে পাত্রে চিনি, চা, মাখন ইত্যাদির নাম লেখা। অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধে তেমনি সুব্যবস্থা; দরকারের সময় কোনো জিনিস খুঁজে নিতে এক সেকেণ্ডও লাগে না। শোবার ঘরের বিছানা ধবধবে, পুরু, রাজভোগ্য। ছেলেদের ঘরে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিছানা— তেমনি আরামের। আমি যখন গিয়েছিলুম তখন মজুর কারখানা থেকে ফিরে বাগানের মাটি কোপাচ্ছিল, শাকসজীর জন্যে তাকে বাজারে যেতে হয় না। মজুরনী বাড়ীর কাজ করছিল। তারা বাড়ীর কাজ করে, ফুরসৎ পেলে সেলাই করে। ইংলণ্ডের চেয়ে জার্মানীর মজুরদের অবস্থা ভালো। যাদের বাড়ী গিয়েছিলুম তারা গরীব মজুর। অন্যান্য মজুরদের বাড়ী আরো বড়, বাইরে থেকে দেখতে আরো সুন্দর!

এবার আমাদের এই বাড়ীর কথা বলে শেষ করি। এদের সঙ্গে আমার এমন আত্মীয়তা হয়ে গেছে যে ঠিক বাড়ীর মতো লাগছে। সকলেই যেন আপনার লোক—কর্তা, গিন্নী, তাঁদের মেয়ে, তাঁদের জামাই, তাঁদের ছেলে, তাঁদের নাতি, তাঁদের কুকুর। প্রথম প্রথম কুকুরটা আমার কাছে ছাড়া আর কোথাও যেত না, তার তাতে একটা স্বার্থও ছিল, কেন না আমার পকেট তখন বিস্কুটে ভরা ছিল। এখন কুকুর মশাইয়ের টিকিটিও দেখিনে, কিন্তু কুকুরের মালিক শ্রীমান এয়ার্ন্স্ট্ (Ernst) কুকুরের স্থান গ্রহণ করেছেন। দু'জনে মিলে দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছি। সে জানে দু-একটা ইংরেজী শব্দ, আমি জানি দু-একটা জার্মান শব্দ, আর দু'জনে জানি অল্পস্বল্প ফরাসী। তার দিদি খাসা ইংরেজী ও ফরাসী জানেন; সাহিত্য চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সমঝদার। বাপের বাড়ীর পাশাপাশি তাঁর বাড়ী। যুদ্ধের সময় এঁরা সকলেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ যোদ্ধারূপে, কেউ যুদ্ধ-ডাক্তাররূপে, কেউ যুদ্ধ-নার্সরূপে। কাছেই যুদ্ধ হচ্ছিল, অনবরত গোলা পডছিল, অনেক বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, আবার নতুন করে তৈরী হয়েছে।

Ernst-এর দু'খানা ঘর, বেশ বড় বড়। একটাতে সে শোয়, আর একটাতে পড়ে। পড়বার ঘরে তার গ্লোব, গ্রামোফোন, এয়ার গান, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ক্লক ঘড়ি, ক্যামেরা, ডাকটিকিট সংগ্রহের খাতা ইত্যাদি অনেক জিনিস থাকে। শোবার ঘরে তার আলনা, দেরাজ, মুখ ধোবার বাসন ইত্যাদি। কুকুরটা তার ঘরেই শোয়।

বুড়োবুড়ীর বসবার ঘরে একটা প্রাচীন কাঠের ক্লক ঘড়ি আছে, সেটাতে যখন একটা বাজে তখন একবার ও যখন বারোটা বাজে তখন বারো বার একটা কাঠের কুকু দরজা খুলে কুক্‌-উ করে ডাকে, ডাকা শেষ হলে দরজা বন্ধ করে গা-ঢাকা দেয়।

আজ দু'টো কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম। লোহার কারখানাটায় হাজার তিনেক মজুর খাটে, নিরেট লোহাকে আগুনে গরম করে কলে পুরে ফাঁপা করে পিঁপে বানানো হয়, গোটা দশেক কলের ভিতর দিয়ে লোহাখানাকে ক্রমান্বয়ে চালায়। ভারি চমৎকার লাগছিল, যদিও পুড়ে মরবার ভয় ছিল পদে পদে। কাঁচের কারখানায় মজুর ও মজুরনী মিলিয়ে শ' তিন-চার খাটে, কাঁচ গালিয়ে কারুকার্যময় মদের গেলাস, আতরের শিশি, আলোর ঝাড় ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। খুব অল্পবয়সী ছেলেরা কাজে লেগেছে, কারুর স্বাস্থ্য ভালো নয়, কিন্তু গরীবের ছেলে, রোজগার না করলে চলবে না। তা বলে ভেবো না তারা ছুটির সময় লেখাপড়া করে না কিংবা চিরকাল মূর্খ থেকে যায়। তাদের মাইনে মাসে পঞ্চাশ টাকা থেকে দেড়শো টাকা। তাদের উপরে অপরের ভার নেই, কেন না বাড়ীর সকলেই রোজগার করে,—বাবা ফ্যাক্টরীতে, মা ক্ষেতে, ভাইবোন ফ্যাক্টরীতে বা ক্ষেতে। এমন কি বুড়োবুড়ীরাও চুপ করে বসে মালা জপে না। আজ এক থুত্থুড়ে বুড়ী পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেড়াবার সময় ছুঁচ-সূতো দিয়ে জামা বুনতে বুনতে চলেছিল।

এয়ার্নস্ট্‌ আর আমি পাহাড়ে উঠেছিলুম—সত্যিকারের পাহাড়ে। পা পিছলে আলুর দম হবার ভয়ে বুট খুলতে হলো, খুব উঁচু না হলেও খুব খাড়া পাহাড়। একটা গুহা দেখলুম, ওখান থেকে ছেলেরা নীচের ছেলেদের উপরে নকল বোমা ফেলে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতো। যুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে এরোপ্লেন থেকে শত্রুরা বোমা ফেলে অনেক কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। তখন মেয়েরা মাটির নীচে গুহা করে লুকোতো আর সুযোগ পেলেই ওপরে উঠে যুদ্ধে-যাওয়া ছেলেদের জায়গায় ফ্যাক্টরী চালাতো।

এখানকার মজুরদের বাড়ীগুলোর প্রত্যেকটার স্বতন্ত্র ডিজাইন, দেখে আনন্দ হলো। ইংলণ্ডে এক একটা পাড়ার সব বাড়ী একই রকম দেখতে।

বুস, সারব্রুকেন (জার্মেনী), ১৩৩৫

জার্মেনী—রাইনল্যাণ্ড

আমি এখন রাইন নদীতে জাহাজে করে যাচ্ছি। রাইন নদী সুইটজারল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে জার্মেনীর ভিতর দিয়ে হল্যাণ্ডে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এই নদীটির জন্যে দেশে দেশে রেষারেষি, খুনোখুনি বড় অল্প হয়নি। ফ্রান্স বলে, 'আমি এই নদী নেবো।' জার্মেনী বলে, 'খবরদার।' রাইনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে আপন মনে আল্পস পর্বতের বার্তা নর্থ সী'র কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে অবিশ্রান্ত ছুটেছে। যে পথ দিয়ে সে ছুটেছে সে পথে ছোট-বড় অনেকগুলি শহর দাঁড়িয়ে গেছে, তারা দু'ধারে দাঁড়িয়ে দেখছে তার চলা। সবচেয়ে বড় শহরটির নাম কোলোন। সেইখান থেকে আজ রেলে চড়ে Bonnএ এলুম, বন থেকে জাহাজ ধরলুম। উজানে চলেছি, বন থেকে Bingenএ। জাহাজটা যাবে Mainz অবধি। এই সমস্ত অঞ্চলকে বলে রাইনল্যাণ্ড। এখনো রাইনল্যাণ্ডে ফরাসী, ইংরেজ ও বেলজিয়ান সৈন্য আছে, ট্রিয়ারের এক গির্জা দেখতে গিয়ে সেই গির্জার বুড়ীর কাছে শুনলুম। ট্রিয়ার অতি

প্রাচীন শহর, জার্মেনীর প্রাচীনতম। রোমানরা সেই শহরে দুর্গ প্রভৃতি তৈরী করেছিল, এখনো ভগ্নাবশেষ আছে। রোমানদের ভাঙা amphitheatre দেখে তখনকার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হয়। আমাদেরি মতো তারা খোলা জায়গায় 'যাত্রা' অভিনয় করতো, দর্শকেরা বসতো স্টেজকে ঘিরে বৃত্তাকারে।

এখানকার ট্রিয়ার শহরে মধ্যযুগের ক্যাথলিক গির্জাটি একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। ক্যাথলিকরা ইউরোপের হিন্দু অর্থাৎ পৌত্তলিক। তাদের গির্জার সর্বত্র সাধু ও সাধ্বীদের সুনির্মিত মূর্তি ও সুচিত্রিত জীবন-কাহিনী। ঘণ্টা বাজছে, প্রদীপ মিটমিট করছে, ভক্তেরা জানুপাতপূর্বক ইষ্টমূর্তির কাছে মনস্কামনা জানাচ্ছে। ধূপধুনার গন্ধও পাওয়া যায়। হিঁদুয়ানীর সমস্তই আছে, কেবল পাণ্ডা-পূজারীর হট্টগোলটুকু নেই। গির্জাগুলোর চূড়ো সংকীর্ণ হতে হতে আকাশে মিশে গেছে, কোনো কোনোটা দু'শো তিনশো বছর ধরে তৈরী, দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

ট্রিয়ার শহর মোজেল নদীর কূলে। মোজেল নদী Koblenz শহরে রাইন নদীর সঙ্গে মিলেছে। Koblenz-এর এক দিকে Bingen ও Mainz, অন্য দিকে Bonn ও Cologne. আমি ট্রিয়ার থেকে কোলোনে গিয়েছিলুম রেলে। রেল চলে নদীর ধারে ধারে, প্রথমে মোজেল নদীর ধারে, পরে রাইন নদীর ধারে। রেলের এক দিকে নদী, অন্য দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে দ্রাক্ষার (vine) চাষ। তা থেকে মদ প্রস্তুত হয়। রাইনল্যাণ্ড মদের জন্যে বিখ্যাত। দু'রকম মদ এদেশের লোকে খায়—রাইন মদ ও মোজেল মদ। তা ছাড়া বিয়ার অবশ্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পানীয়। কোনো একটা রেস্তরাঁতে গিয়ে জল চাইলে মুশকিলে পড়তে হয়, কেন না জল কেউ খায় না বলে কেউই রাখে না। খাবারের সঙ্গে এরা হালকা মদ খায়—বিয়ার কিংবা মোজেল মদ কিংবা রাইন-মদ। জল চাইলে সোডা-ওয়াটার এনে হাজির করে, Lemon squash গোছের কিছু আনতে বলতে হয়। যে রকম সরবৎ বুস-গ্রামে খেয়েছিলুম, সে রকম সরবৎ আপেল ফল থেকে ঘরে তৈরী করা। কাজেই হোটেলে সে জিনিস মেলে না।

কোলোনের গির্জা ইউরোপের একটি নামজাদা গির্জা। সেটি ছাড়া আরো পুরোনো গির্জা কোলোনে আছে। ক্যাথলিকরা যে কেমন সৌন্দর্যপ্রিয় তাদের গির্জায় গেলে তার পরিচয় পাই। গির্জাকে আশ্রয় করে ইউরোপের সঙ্গীত ও চিত্রকলা অভিব্যক্ত হয়েছে। গির্জার সমবেত সঙ্গীত ও সমবেত উপাসনা খ্রীস্টানকে যেমন ঐক্য দিয়েছে, হিন্দু তেমন ঐক্য কোনো কালে পায়নি।

কোলোনেও রোমান যুগের ধ্বংসাবশেষ আছে। সেটিও একটি প্রাচীন শহর। কিন্তু প্রাচীন হয়েও সেটি চির-আধুনিক। প্রতিদিন তার শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। এখন আন্তর্জাতিক প্রেস প্রদর্শনীর জন্যে একটি উপনগর তৈরী হয়েছে। সমগ্র উপনগরটি জুড়ে আন্তর্জাতিক প্রেস প্রদর্শনী বসে। তা দেখতে পৃথিবীর সব দেশের লোক আসে। প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের মাত্র দু'-চারখানা সংবাদপত্র দেখলুম। বড় দুঃখ হলো। চীনদেশ থেকে লোক এসেছে কাগজ তৈরী করে দেখাতে, আমেরিকার লোক এসেছে রঙীন ছবি ছেপে দেখাতে। জার্মেনীর লোক সংবাদপত্র মুদ্রণের আধুনিকতম কৌশল দেখায়। তিন-চার মাইল জুড়ে বিরাট প্রদর্শনী—তার মধ্যে একটা ছোট রেল লাইন পর্যন্ত আছে, তাতে চড়ে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া যায়।

জার্মান ছেলেমেয়েরা পিঠে একটা Knapsack বেঁধে দল করে বেড়ায়। খুব ছোট ছেলেমেয়েদের দলে একজন বয়স্ক গাইড থাকেন। বেশী বয়সের যুবক-যুবতীরাও খাকী পোশাক পরে ও পিঠে খাকী Knapsack বেঁধে বেড়ায়। পোশাকের বালাই জার্মেনীতে কম। এই চিঠি লিখছি আর নদীর এক ধারে এক দল ছেলেকে পোঁটলা, লাঠি ও পতাকা নিয়ে দল বেঁধে যেতে দেখছি। জার্মেনীর পথে-ঘাটে এই Wandervogel-এর দল। কোলোনে অতি ছোট বাচ্চাদের দল

দেখেছি। অগাধ কৌতূহল নিয়ে তারা দেশ দেখে বেড়ায়। কোলোনের ইস্কুলে পড়তে যে সব ছেলেমেয়ে যায় তারাও পিঠে একটা করে চামড়ার ব্যাগ বেঁধে যায়। জার্মেনীতে সকলেরই সাইকেল আছে, সাইকেলের ঝাঁক রাস্তা জুড়ে ওড়ে। অতি ক্ষুদ্র শিশু থেকে অতি বৃদ্ধ ঠাকুরদা পর্যন্ত সকলেই সাইকেল চালায়।

কোলোন থেকে বেরিয়ে বনে এলুম। বন ছোট শহর। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী-বিখ্যাত। সেইখানে Beethoven-এর জন্ম। Beethoven-এর বাড়ী দেখলুম। সেখানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন সংগৃহীত হয়েছে—তাঁর পিয়ানো, তাঁর কানে পরবার যন্ত্র, তাঁর হাতের লেখা. তাঁর ছবি। তাঁর ছবির মধ্যে তাঁর ঝড়ঝঞ্ঝাময় জীবনের ইঙ্গিত আছে। দেখলেই তাঁর সমস্ত জীবন মনে পড়ে যায়। কী কঠোর সাধনা, কী কঠিন দুঃখ! জগৎকে যিনি অমৃতময় সঙ্গীত দিয়ে গেলেন, নিজের সঙ্গীত তিনি নিজে শুনতে পেতেন না—তিনি হয়ে গিয়েছিলেন বধির। তাঁকে দেখবার সময় আমার মনে হলো—মহাপুরুষদের প্রতি আমাদের একটা ঋণ আছে, সে ঋণ শোধ করবার একমাত্র উপায় নিজে মহাপুরুষ হওয়া। হাত জোড় করে প্রণাম করা কাপুরুষতা, সম্মান দেখাতে যদি চাও তো সমকক্ষ হও।

বন থেকে জাহাজে চলেছি। নদীটি কিন্তু কলকাতার গঙ্গার চেয়ে চওড়া নয়। অথচ এই নদীকে নিয়ে কত গান, কত কাহিনী, কত যুদ্ধ! জাহাজ ও নৌকোয় নদীটি সব সময় সেজে রয়েছে। ফরাসী জাহাজ স্ট্রাস্‌বুর্গ্‌ যাচ্ছে, ওলন্দাজ জাহাজ রটারডাম যাচ্ছে, জার্মান জাহাজ হামবুর্গ্‌ যাচ্ছে। কত রকম নোকৌয় যুবক-যুবতী দাঁড় টেনে রোদ পোহাতে পোহাতে চলেছে, তাদের গা খোলা। সাঁতার দিচ্ছে ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী—একা কিংবা দলে দলে। জার্মেনীতে আজকাল সাঁতারের ধুম, নৌ-চালনার ধুম। যার শরীর আছে সেই শরীরচর্চা করে। যুদ্ধ হেরে জার্মানরা ঠিক করেছে এমন একটা দুর্জয় জাতির সৃষ্টি করবে যে জাতির সঙ্গে কোনো বিষয়ে কোনো জাতি পেরে উঠবে না। সে জাতি সৃষ্টি করতে হলে মেয়েদের সাহায্য চাই। তাই যেমন স্কুলে-কলেজে তেমনি মাঠে-নদীতে-আকাশে-সমুদ্রে মেয়েদের অবারিত দ্বার—অবাধ স্বাধীনতা। জার্মেনীর অন্যান্য অঞ্চলের কথা জানিনে, কিন্তু এই রাইনল্যাণ্ডের মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শ্রী দেখে অবাক হতে হয়।

নদীর দু'ধারেই রেলপথ, পাহাড়, ক্ষেত। স্থানে স্থানে গ্রাম বা নগর। কোনো কোনো প্রাচীন ধরনের বাড়ী দেখতে ছবির মতো। ফ্যাক্টরীও স্থানে স্থানে আছে—কদাকার। কোথাও কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। কোথাও কারা ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসেছে। আজ চমৎকার দিনটি! সূর্যের অসীম দয়া। আমাদের মতো অনেকেই জাহাজে করে বেরিয়েছিল, তারা ফিরছে, তাদের জাহাজ থেকে তারা হাত নেড়ে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে। যারা সাঁতার কাটছে তারাও হাত তুলে প্রীতি জানাচ্ছে। একটা নৌকোর উপরে একটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি করতে করতে ঘেউ ঘেউ করে আমাদের কেমন প্রীতি জানাচ্ছিল তার মর্ম সেই বোঝে! নদীর ধারে পাহাড়ের তলে ট্রামও চলেছে। পাহাড় ঘেঁষে উঠেছে প্রাচীন দুর্গ, Drachenfels। এর নামে কবি Byron-এর এক কবিতা আছে; পাহাড়ের মাথায় সেই ভাঙা দুর্গ। সর্বত্রই দেখছি হোটেল আর কাফে। আমেরিকানদের দৌলতে পৃথিবীর গরীব দেশগুলোর লোক হোটেল চালিয়ে বড়লোক হয়ে যাচ্ছে।

এখন আমাদের জাহাজ যেখান দিয়ে চলেছে সেখানটার প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। মনে হচ্ছে যেন একটা হ্রদের ভিতর দিয়ে চলেছি। পাহাড়ের পায়ের নীচেই নদী; নদীর পাড় ধরে ট্রেন চলেছে। পাহাড়ের উপর থেকে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছে কত লোক, দূরস্থিত ঘরের জানালা থেকে প্রীতি-সূচক হাত-নাড়া পাচ্ছি আমরা। ট্রেন থেকে, মোটর থেকেও রুমাল নেড়ে লোকে প্রীতি জানাচ্ছে। Bingenএ জাহাজ থেকে নেমে Frankfurt-এর ট্রেন ধরতে গিয়ে দেখি এক ঝাঁক Wandervogel

(উড়ো পাখী)। তারাও ট্রেনে উঠতে ছুটলো! চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলো—জার্মেনীর রেলে চতুর্থ শ্রেণী অবধি আছে। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর মতো জার্মেনীর Third ও Forth classএ কাষ্ঠাসন। এই Wandervogel-এর ঝাঁকটির একজনের একটি পা নেই, সে কাঠের পায়া বেঁধে পরম উৎসাহে ছুটছিল। ওরা নেমেছে ও সমবেত গান ধরেছে। কী মধুর শোনাচ্ছে ওদের সমবেত গান? কোথায় আমাদের মতো চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করবে, না, ওরা এমন মিষ্টি গান ধরেছে যে কী বলবো।

Frankfurt-on-Main

আজ সকালে রাস্তায় বেরিয়ে প্রথমে যাদের দেখলুম তারা একদল Wandervogel—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কারুর কারুর পিঠে রান্নার ডেকচি। আরেকটু পরে এক জন পথিককে দেখলুম, তার পিঠে পোঁটলা, কম্বল ও লাঠি একত্র বাধাঁ। দু'জন ছেলেকে দেখলুম রুটি চিবোতে চিবোতে পথ চলছিল! রাস্তায় যত ছেলেমেয়ে দেখি সকলের পিঠে একটি পোঁটলা বা ব্যাগ বাঁধা।

সাইকেল জার্মেনীর সব শহরে এত বেশী যে সাইকেলের চাপে মারা পড়বার ভয়। এক সঙ্গে পঞ্চাশ-ষাটখানা সাইকেলে সব বয়সের মেয়েপুরুষ রাস্তা জুড়ে চলে।

কোলোনের মতো এখানেও গীর্জা ও মিউজিয়াম অনেক। মিউজিয়ামে এত দেশের বড় বড় শিল্পীর ছবি থাকে যে কেবল একবার দেখে এলে কত শিক্ষা, কত আনন্দ হয়। যারা ভালো করে ছবি আঁকা শিখতে চায় তারা মিউজিয়ামের ছবির কাছে বসে ছবির নকলে আঁকে। অনেক বুড়ো-বুড়ীকে পর্যন্ত এই কাজ করতে দেখেছি লণ্ডনে ও প্যারিতে। বটানিক্যাল গার্ডেনে কন্‌সার্ট শুনলুম। অনেকে সেখানে টেনিসও খেলছিল! ছোট ছেলেমেয়েতে বাগানটা ভরে গিয়েছিল। একটা ছেলে মেয়েদের মতো shingle করেছে দেখে হাসি পেল। জার্মেনীতে এক কালে ছেলেরাও ঝুঁটি বাঁধতো। Beethoven ও Goethe ছেলে বয়সে ঝুঁটি বাঁধতেন। এখন কিন্তু জার্মানরা সাধারণতঃ নেড়া! তারা ক'বার বেলতলায় যায়? এই শহরেই Goetheর জন্ম। তাঁর বাড়ী দেখলুম বাড়ীটি সেকালের মতো করে সাজানো।

মেইন নদীর কূলে এই শহর। নদীর এক একটা অংশ ঘেরাও করে গোটাকয়েক swimming bath করা হয়েছে। তার দেয়ালগুলোতে ছবি আঁকা। তাতে সারাক্ষণ কন্‌সার্ট চলে। গান ও ছবির আবহাওয়ায় খোলা আকাশের তলে খোলা বাতাসে যারা সাঁতার কাটে, তাদের কেউ বা বৃদ্ধ, কেউ বা বালিকা। প্রায় সকলেরই গা খালি। সাঁতারের পরে তাদের কেউ কেউ skip করে, কেউ কেউ বল খেলে, কেউ কেউ কুস্তি লড়ে এবং অনেকে একখানা তক্তার উপরে শুয়ে রোদ পোহায়। এ সব swimming bath তৈরী করে দেওয়া হয়েছে মিউনিসিপালিটি থেকে।

জার্মেনীর মিউনিসিপালিটিগুলোর নিজেদের ট্রাম আছে। মিউনিসিপালিটির টাকায় অপেরা হাউস ও থিয়েটার চলে। মিউনিসিপালিটির বাড়ীর নীচের তলায় ভোজনাগার করে দেওয়া হয়েছে, তাতে সস্তায় ভালো খাবার দেওয়া হয়। এই সব ভোজনাগার দু'-তিনশো বছর ধরে চলে আসছে। আজ এক অন্ধকে দেখেছিলুম, তার সঙ্গে এক ক্রসচিহ্নিত কুকুর। সেই কুকুর তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

Heidelberg

হাইডেল্‌বার্গের বিশ্ববিদ্যালয় ৬৫০ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত। জার্মেনীতে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু হাইডেল্‌বার্গ সব চেয়ে রোমান্টিক। জার্মেনীর একটি প্রসিদ্ধ গানের প্রথম

কথা—'হাইডেল্‌বার্গে আমি হৃদয় হারিয়েছি।' নেকার নদীর কূলে দু'টি পাহাড়ের পাদদেশে এই ছোট শহরটির অবস্থিতি, পাহাড়ের উপরে এক বৃহৎ দুর্গ ও উদ্যান।

হাইডেল্‌বার্গেও দেখলুম তেমনি সুইমিংবাথ, তেমনি দাঁড় টানা, তেমনি ঘাসের উপরে খোলা গায়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যালোক অনুভব, তেমনি পক্ষী-পক্ষিনীদের দল (Wandervogel)। সারা জার্মেনী যেন ক্ষেপে গেছে! বুড়োবুড়ীরা বাধা দেবে কোথায়, না, বুড়োবুড়ীরাই অগ্রণী! দেশের দুঃখ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মর্মে বিঁধেছে। তরুণে প্রবীণে গালাগালি, দলাদলির অবসর নেই। দুর্গম পথে ছেলেদের নেত্রী হয়েছে এক বুড়ী, তার পিঠে বস্তা। পাঁচ বছরের খোকাখুকী নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গুরুজন দাঁড়িয়ে দেখছেন।

Wurzburg
৮ই সেপ্টেম্বর

এটি একটি প্রাচীন ছোট শহর। জার্মেনীর প্রত্যেক শহরের অধিকাংশ গ্রামে ট্রাম আছে। তোমরা যখন জার্মেনী আসবে তত দিনে সমস্তটা জার্মেনী ট্রামে করে ঘোরবার উপায় হয়ে থাকবে।

এখানকার জার্মানরা দেখছি পেয়ালা পেয়ালা নয়, গেলাস গেলাস নয়, ঘড়া ঘড়া বিয়ার খায়। জলও আমরা এত খেতে পারিনে, পেট ভরে যায়। এখানে সেকালের এক মোহান্ত মহারাজের (Prince Bishop) প্রাসাদ আছে, এখন সেটা জাতীয় সম্পত্তি। প্রাসাদটি মহারাজের সৌন্দর্যপ্রিয়তার নিদর্শন চিত্রে, ভাস্কর্যে, বাস্তুকলায় বহন করছে। এখানেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এটি চিকিৎসা-বিদ্যার জন্যে প্রসিদ্ধ।

এখানেও Wandervogel ও সাঁতার আর দাঁড় টানার রেওয়াজ। আরেকটা রেওয়াজ ছবি আঁকার। প্রৌঢ়া Nunরা পর্যন্ত কাগজ আর ক্রেয়ন নিয়ে বসে গেছেন।

একটা হাট দেখলুম। হট্টগোল বাদ দিলে ঠিক আমাদের হাট। শাকসব্‌জীওয়ালী বুড়ীদের কেউ কেউ শাকসব্‌জীর ঝুড়ি নিয়ে গির্জায় বসে মনস্কামনা জানাচ্ছিল। আরেকটি গির্জায় কতগুলি মনোযোগী বালক-বালিকা আচার্যের কাছে ধর্মশিক্ষা করছিল।

জার্মেনী—বাভেরিয়া

মিউনিক

যেখানে বসে লিখছি, সেটা একটা কাফে। ফ্রান্সের ও জার্মেনীর গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে কাফে আছে। যদিও সব সময় সেখানে চা কিংবা কফি কিংবা শোকোলা (Chocolat) কিংবা হালকা মদ খেতে পারা যায়, তবু বাড়ীতে কিংবা রেস্তরাঁয় রাত্রের খাবার শেষ করে কাফেতে এসে সন্ধ্যাবেলা সবাই বসে। তারপর এক পেয়ালা কফি কিংবা আর কিছু নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে, গল্প করে, দাবা খেলে, তাস খেলে, নাচে, গান ধরে, Concert শোনে। সব রকম লোকের জন্যে সব রকম কাফে আছে—ছাত্রদের কাফেতে তারা চা খেতে খেতে বই পড়তে পারে। অবশ্য কেবল বই পড়তে কেউ আসে না, মাঝে মাঝে ইয়ার্কি দিতে ও নাচতেও আসে। মজুরদের কাফেগুলিতে মহা হৈ-চৈ হয়, তারা দিনে খেটে খুটে এতটা শ্রান্ত হয়ে আসে যে ঘড়া ঘড়া বিয়ার খেয়েও তাদের

স্ফূর্তি থামে না। এখানে একটা প্রসিদ্ধ বিয়ার হল আছে—মিউনিসিপালিটি থেকে তৈরী করে দেওয়া। তার নীচের তলায় মজুর-মজুরনীদের আড্ডা, মাঝের তলায় ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাদের, শেষের তলায় কোনো উৎসব-রজনীতে সমবেত সাধারণের। বিরাট ব্যাপার, এক একটা ঘরে হাজার দু'হাজার বসবার জায়গা।

আমাদের এই কাফেটাতেও শ'দুয়েক লোকের উপযুক্ত চেয়ার-টেবিল। আমি যদি ইচ্ছা করি তো এখানে বসে চার ঘণ্টা ধরে চিঠি লিখতে পারি, Concert শুনতে পারি, অথচ এগারো-বারো আনার বেশী খরচ নাও করতে পারি। পারীর কাফেগুলো আরো অনেক সস্তা, তবে কন্‌সার্টওয়ালা কাফেতে খরচ আরো বেশীও হয়। পারীতে অসংখ্য কাফে—কত লোক সে সব কাফেতে কাজ করে খাচ্ছে। কাফেগুলোর দৌলতে কত গায়ক-বাদকের অন্ন হয় একবার ভেবে দেখো। এমন সব কাফে আছে যেখানে প্রধানতঃ আর্টিস্টরা যায়। সে রকম জায়গায় কত রকম ভাবের আদান-প্রদান হয়। এক একটা কাফে যেন এক একটা সভা-সমিতি। চাইলেই খবরের কাগজ পড়তে দেয়, কাজেই reading room বলতে পারো। আমাদের চায়ের দোকানগুলোকে কাফেতে পরিণত করলে বেশ হয়।

মিউনিককে জার্মানরা বলে ম্যুইনশেন্‌। এর কথা বলবার আগে তোমাদের বলি Dinkelsbuhl-এর কথা। ওটি এই বাভেরিয়ারই একটি ছোট্ট শহর। কিছু দিন আগে ওর সহস্র বার্ষিকী হয়ে গেল। এই এক সহস্র বৎসর ঐ ছোট শহরটিকে ঠিক একই রকম রাখা হয়েছে, ওর আশেপাশের কোনো জায়গার সঙ্গে আর ওর মেলে না। পুরোনো বাড়ী ভেঙে গেলে পুরোনো রীতিতে গড়ে দেওয়া হয়, পুরোনো রাস্তা মেরামত হয় পুরোনো পদ্ধতিতে। তবে জল-আলো স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি একালের মতো। ওখানে অনেকগুলি চার-পাঁচ তলা গম্বুজ (Tower) আছে, তাতে মানুষ থাকে। যে টাওয়ারটিতে উঠেছিলুম সেটির সব উপরের তলায় ছিল এক ছোট্ট খুকী আর তার মা-বাবা। মনুমেণ্টের মতো উঁচু টাওয়ার, কাজেই খুকীকে সাবধানে রাখতে হয়। নীচের একটি তলায় ছিল এক ভ্রাম্যমাণ আর্টিস্ট আর তার সঙ্গিনী। তারা বার্লিন থেকে ছবি আঁকতে আঁকতে দেশ দেখতে দেখতে এসেছে, Dinkelsbuhl-এর ছবি দু'জনে আঁকছিল। তাদের সম্বল মাত্র তাদের পিঠের পোঁটলা (জার্মান ভাষায় বলে rucksack)। তাদের খাওয়া-পরা খুব সাদাসিধে—মেয়েটির পরনে রঙীন খদ্দর আর ছেলেটির খাকী হাফ-প্যাণ্ট ও শার্ট। ইংলণ্ডে এ সব অচল।

Dinkelsbuhlএ যে হোটেলে ছিলুম সে হোটেলের মালিকের মতো আমুদে লোক অল্পই দেখেছি। লোকটি ইংলণ্ডে দশ-এগারো বছর ছিল, যুদ্ধের সময় তাকে Isle of Manএ অন্তরীণ করে রাখা হয়। যুদ্ধের পরে ছাড়া পেয়ে সে দেশে ফিরে হোটেল খুলেছে, কিন্তু যুদ্ধে তার যথাসর্বস্ব বিশ হাজার টাকা লোকসান যায় বলে এখনো একবার ইংলণ্ডে গিয়ে তার আধা-ইংরেজ মেয়েটিকে দেখে আসতে পারছে না। সে আমাদের রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত আর গান্ধীকেও খুব ভালোবাসে। কুস্তিগির গামা, ইমাম বক্স ও কার্‌লার সঙ্গে তার লণ্ডনে ভাব হয়েছিল। সে একবার ভারতবর্ষে যেতে চায়, কিছু টাকা জমলে পরে। লোকটি এমন চমৎকার গাইতে, বাজাতে ও আসর জমাতে পারে যে শুধু সেই জন্যই অনেক লোক তার ওখানে খেতে আসে, জার্মেনীর একালের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর পর্যন্ত।

মিউনিক বিয়ারের জন্যে, ছবির জন্যে ও আসবাবের জন্যে বিখ্যাত। শহরটি জার্মান ক্যাথলিকদের প্রধান আড্ডা। সুন্দর শহর। ক্যাথলিকরা সৌন্দর্যপ্রিয়।

মিউনিকের মিউজিয়ামগুলির একটির নাম Deutsch Museum অর্থাৎ জার্মান মিউজিয়াম।

ভালো করে সেটি দেখলে বিজ্ঞানের সব কথা চুম্বকে জানা যায়। আদিম মানুষ কী রকম ভাবে বাস করত সে কথা বোঝানো হয়েছে কৃত্রিম গুহা নির্মাণ করে ছবি এঁকে। কয়লা কেমন করে পাওয়া যায় সে জন্যে একটি আস্ত খনি তৈরী হয়েছে, সেই খনির ভিতরে নেমে গেলে মনে থাকে না যে এটা খনি নয়, মিউজিয়াম। কৃত্রিম লোহার কারখানা, কেমিস্টের ল্যাবরেটরী, এরোপ্লেনের ক্রমোন্নতি, ছাপাখানার ক্রমোন্নতি, রেডিয়ামের আলো, ইলেকট্রিসিটির লীলা, সেন্ট্রাল হীটিং কেমন করে হয়, কাপড় তৈরীর আদি-অন্ত, কলের সাহায্যে গো-দোহন, কোন খাদ্যে কত সার আছে, এই রকম কত ব্যাপার যে সে বৃহৎ মিউজিয়ামটাতে আছে তা দিনের পর দিন দেখলেও শেষ হয় না, সে কথা আমি লিখলেও শেষ হবে না।

এ সব দেখতে লাখ লাখ ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী যায়; nunরা পর্যন্ত মেয়ের দলকে Blast furnace-এর তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়; দেশের সকলকেই বিজ্ঞানের উন্নতিতে আগ্রহ দেখায়। আমরা যেমন হরিনাম জপ করি এরা তেমনি বিজ্ঞানের নাম জপ করে।

আরেকটা মিউজিয়ামে সেকালের পোশাক, আসবাব, অস্ত্র ইত্যাদি শতাব্দী অনুসারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর লোক কেমন ঘরে থাকতো, কেমন খাটে শুতো, কী কী পোশাক পরতো, কেমন তাদের গহনা, কেমন তাদের বর্ম—এ সব জানতে চাইলে এই মিউজিয়ামে যেতে হয়। থিয়েটারওয়ালারা এ সব দেখে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সেকালের মতো করে সাজায়। এ রকম মিউজিয়াম কোলোনেও আছে।

চিত্রশালা মিউনিকে অনেক। একটাতে প্রাচীনদের ছবি, আরেকটাতে আধুনিকদের ছবি। আরেকটাতে অত্যাধুনিকদের ছবি। প্রতি বছর প্রায় হাজার দু'তিন নূতন ছবি শেষোক্ত চিত্রশালাটিতে প্রদর্শিত হয়। এক মিউনিকেই এই। সমগ্র জার্মেনীর চিত্রকরেরা বছরে ক' হাজার ছবি আঁকেন? অসংখ্য লোক ছবি আঁকে, আরো অসংখ্য লোক প্রসিদ্ধ ছবি নকল করে। ছবি নকল করাও ভারি শক্ত কাজ, সে জন্যে তারা মজুরিও পায় যথেষ্ট, কেন না ধনীরা সে সব নকল ছবি কিনে নিয়ে ঘর সাজায়। ছবি নকল করার কাজে মেয়েরাই যায় বেশী। সেই তাদের জীবিকা।

মিউনিকে এখন একটি প্রদর্শনী বসেছে, শীঘ্রই একটা মেলা বসবে। প্রদর্শনীটি কোলোনের মতো বড় না হলেও বেশ বড়। এরও একটি ছোট্ট রেলগাড়ী, নাগরদোলা, খাবার ঘর, পুতুল-থিয়েটার ইত্যাদি আছে। প্রদর্শনীটি গৃহরচনাবিষয়ক। অল্প খরচে কত রকম বাড়ী তৈরী করতে পারা যায়, কী কী আসবাবে তাকে সাজাতে পারা যায়, ছেলের ঘর কেমন হবে, মেয়ের ঘর কেমন হবে, রোগীর ঘর কেমন হবে, খাবার ঘর কেমন হবে, এই সকলের নমুনা দেখানো হয়েছে। ইলেকট্রিক ঝাঁটা, ইলেকট্রিক উনুন, ইলেকট্রিক চিকিৎসা, স্নান-যন্ত্র, ডিম তাজা রাখবার যন্ত্র, খাবার তাজা রাখবার উপায়, শিশুর নতুন ধরনের খেলাঘর, সাদাসিধে অথচ নতুন ধরনের চেয়ার-টেবিল-খাট-বিছানা-কৌচ-দেরাজ, এমনি অনেক জিনিস সেখানে দেখে নিয়ে ব্যবহার লাগানো যায়। ঘর-সাজানো ইউরোপের একটা আর্টরূপে গণ্য। এ সম্বন্ধে অনেক মাসিকপত্র চলে। গৃহিণীরা তাই পড়ে কোন জিনিসটি কোন জায়গায় রাখতে হবে তাই শেখেন এবং আসবাবপত্র ফ্যাসান অনুসারে বদলান। এখন আন্দোলন চলছে আসবাবপত্র সাদাসিধে অথচ মজবুত এবং পরিপাটী করতে। একটা ঘরে গুনে গুনে মাত্র গোটাকয়েক আসবাব রাখতে হবে, ঘরে ঢুকলেই যেন মনে হয় এটা গুদাম নয়, এটা আলো-হাওয়ায় ভরা খেলার মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা। জার্মানরা এখন সূর্যোপাসক হয়েছে। সূর্যের উপরে লেখা মাসিকপত্র অনেক, তাতে সূর্যের আলো থেকে স্বাস্থ্য ও শক্তি সংগ্রহের কথা থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের এখন খালি পায়ে খালি গায়ে খেলতে দেওয়া হয়। খালি পায়ে জল ঘাঁটতেও অনেক ছেলেকে দেখেছি।

প্রদর্শনীতে দেখলুম সমগ্র জার্মেনীতে 'উড়ো পাখী'দের জন্যে প্রায় আড়াই হাজার বাসা আছে, সেখানে প্রায় পঁচিশ লাখ পক্ষি-পক্ষিনী রাত কাটাতে পারে। সারাদিন পায়ে হেঁটে বেড়াবার পর সন্ধ্যাবেলা একটা বাসায় উঠে রেঁধে খাওয়া, আর গান-গল্প-বিশ্রাম। ভোরে উঠে আবার অচিন বাসার অভিমুখে রওনা হওয়া। এমনি করে ছুটি কাটে। ছুটিতে কেউ বাড়ী থাকে না। এই সব বাসা যৌবন-আন্দোলনের কর্তৃপক্ষরা চালান। আমাদের যদি যৌবন-আন্দোলন করতে হয় তবে প্রথমে নিজের নিজের জেলার মধ্যেই করতে হবে। ধরো, একটা জেলায় যতগুলো ইস্কুল আছে প্রত্যেকের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত হবে যে কোনো একটা ইস্কুলের ছেলেরা বেড়াতে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা যে গ্রামে পৌঁছবে সেই গ্রামের ইস্কুলের মাঠে রান্না করবে ও ইস্কুলের বারান্দায় শোবে। সেই ইস্কুলের ছেলেরা যদি বাড়ী থাকে তো অভ্যাগতদের দেখবে শুনবে, সাহায্য করবে। দুই পক্ষে বন্ধুতা হবে। নিজের জেলার সকলের সঙ্গে ভাব হলে পর দেশের সকলের সঙ্গে ভাব। সেটাও যখন শেষ হবে তখন বিদেশের সকলের সঙ্গে ভাব।

মিউনিক, ১৩৩৫

হাঙ্গেরী

মিউনিকে কাফেতে যে চিঠি শুরু করেছিলুম সে চিঠি আজ বুডাপেস্টের কাফেতে বসে শেষ করছি। ইতিমধ্যেই ভিয়েনায় দিনকয়েক কাটিয়ে এলুম। ভিয়েনা খুব বড় শহর, আগে ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল, এখন চতুর্থ বৃহত্তম শহর। বলো দেখি, এখনকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর তবে কোনটি? প্যারিস। দ্বিতীয়? বার্লিন।

লোকসংখ্যা কমে গেছে, সে সমৃদ্ধিও আর নেই। বড় বড় প্রাসাদের মতো বাড়ী পড়ে রয়েছে, কিন্তু অত বড় পুরীতে মাত্র আঠারো লাখ লোক। আগে ভিয়েনা ছিল বিরাট অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের রাজধানী, এখন অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ভেঙে চারটে রাজ্য হয়েছে এবং আরো তিনটে রাজ্যকে ভাগ দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রিয়ার চেহারা এখন ভাঙা বাড়ীর মতো। এমন দেশে ভিয়েনাকে আর মানায় না।

রাজপ্রাসাদগুলোকে এখন মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। সবশুদ্ধ চল্লিশের বেশী মিউজিয়াম আছে ভিয়েনায়। স্টেট থিয়েটার আর স্টেট অপেরা আগের মতোই চলছে, আরো অনেক থিয়েটার, সিনেমা ও নাচঘরও চলছে। হোটেল, রেস্তরাঁ ও কাফে অনেক আছে, লোক হয় না বেশী। সেই জন্যে সেগুলো বেশ সস্তা। রান্নার জন্যে ভিয়েনা আগে যেমন অতুলনীয় ছিল এখনো তেমনি। অস্ট্রিয়ানরা এখন বেশীর ভাগ সোশ্যালিস্ট হলেও আগের মতো কায়দা-দুরস্ত ও জাঁকালো। পুলিশম্যানের সাজ যেন সেনাপতির সাজ, তরোয়ালটি কোমরে ঝুলছে। কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলেই সেলাম ঠোকে। এটা জার্মান পুলিশ মাত্রেরই স্বভাব। তারা ভারি বিনয়ী। অস্ট্রিয়ানরাও জার্মান। জার্মেনীতে সাধারণতঃ বাস নেই, ভিয়েনায় অল্প।

ভিয়েনার রাজবাড়ীগুলো চমৎকার। কয়েক বছর আগে যেখানে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ছাড়া আর কারুর পা পড়ত না এখন সে সব সকলেরই সম্পত্তি। সাম্রাজ্ঞীর বাগানবাড়ীতে এখন রাস্তার ছেলেমেয়েরা খেলা করতে যায়। বাগানবাড়ীর এক একটা ঘরে এক এক দেশের ছবি কাঁচের

দেওয়ালের ভিতর থেকে আঁটা। একটা ঘরে কেবল চীনা ছবি, একটা ঘরে কেবল জাপানী ছবি, এবং যে ঘরটা বানাতে দশ লাখ টাকা লেগেছিল সে ঘরটাতে হিন্দু-মুসলমান ছবি। এ সব দেড়শো বছর আগে সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার কীর্তি। ভিয়েনার সর্বত্র মেরিয়া থেরেসার প্রভাব। অস্ট্রিয়ার রাজবংশ ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বনেদী রাজবংশ। প্রায় সাতশো বছর ধরে তাঁরা ভিয়েনার শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন, গত মহাযুদ্ধে তাঁদের পতন হলো। এখন অস্ট্রিয়া গণতন্ত্র ও ভিয়েনার লোক সোশ্যালিস্ট। নতুন বাড়ীও তৈরী হচ্ছে, সে সব বাড়ী খুব নতুন ধরনের। তাদের দেওয়ালগুলো বইয়ের শেল্‌ফের মতো দেখতে। ইউরোপে প্রতি দিন নতুন ধরনের বাড়ী তৈরী, নতুন ধরনের বাড়ী সাজানো, নতুন ধরনের আলো-উত্তাপ-জলের ব্যবস্থা। ইউরোপ নিত্য নূতন। ভিয়েনাতেও একটা বাড়ী সাজানোর প্রদর্শনী চলছে। দেখ 'ধন্য' 'ধন্য' করতে হয় শিল্পীদের।

মিউনিকের রাজবাড়ীও এখন সাধারণের সম্পত্তি। রাজবাড়ীগুলোতে ছবি ও মূর্তি আছে অসংখ্য। রাজারা শিল্পদ্রব্যের কদর বুঝতেন। তাঁদের সংগৃহীত শিল্পদ্রব্য দেখতে দেশবিদেশের লোক আসে, কিন্তু তাঁরা আসতে পারেন না। মিউনিকের ও ভিয়েনার গড়ন ভারি সুন্দর, পারী ছাড়া খুব কম শহরের গড়ন এত ভালো। এও সেই রাজাদের গুণে। স্টেট অপেরা ও স্টেট থিয়েটারগুলোও তাঁদের সৃষ্টি।

ভিয়েনা শহরটি পাহাড়ে ঘেরা Danube নদীর কূলে। শহরের মাঝখানে বৃত্তাকার একটা রাস্তা। এই রাস্তাটাকে বলে 'Ring'। এমন সুন্দর ও এমন দীর্ঘ রাজপথ পৃথিবীর কোথাও নেই বোধহয়। রাজপথের দুই ধারে তরুবীথি। ফ্রান্সে ও জার্মেনীতেও এই রকম।

ভিয়েনাকে সেখানকার লোকে বলে ভিন্ (Wien) আর Danubeকে বলে ডোনাউ (Donau)। নদীটি ক্রমশঃ চওড়া হতে হতে এই Budapestএ কলকাতার গঙ্গার চেয়েও চওড়া হয়েছে। নদীর দুই ধারে শহর। মাঝখানে দ্বীপ। এক পাশে পাহাড়। পাহাড়ের উপর সুন্দর সুন্দর বাড়ী। রাস্তায় রাস্তায় গাছ। আমি একটা গাছের কাছে বসেই লিখছি, খোলা আকাশের তলে ফুটপাথের একাংশে। মেঘলা রাত।

হাঙ্গেরীর লোক ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকের থেকে জাতে পৃথক—এরা মঙ্গোলিয়ান বংশীয় ম্যাগিয়ার (Magyar)। কিন্তু হঠাৎ দেখলে বোঝা যায় না। খুব খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়ে—এদের চোখ ও ভুরু কতকটা চীনাদের মতো। কিন্তু নাক আর রঙ ইউরোপীয়দের মতো। হাঙ্গেরীর শহরের লোকেরা সব বিষয়ে ইউরোপীয় হয়েছে বটে, কিন্তু পাড়া-গেঁয়েরা এখনো মুসলমানদের মতো আছে। তাদের মেয়েরা ঘাগরা পরে, মাথায় রঙীন ওড়না বাঁধে। আর পুরুষেরা ঢিলে পোশাক পরে। হাঙ্গেরীর লোক তুর্কীর লোকের মাসতুতো ভাই, বহুকাল তুর্কীর অধীনেও ছিল। বোধহয় সেই সব কারণে এরা কতক বিষয়ে ইউরোপের লোকের উল্টো। এরা বলে 'রায় শঙ্কর অন্নদা', ১৯২৮, সেপ্টেম্বর, ১৮ই। *

হাঙ্গেরী এখন অস্ট্রিয়ার থেকে ভিন্ন হয়েছে, এটাও এখন গণতন্ত্র। তবে এখানে জমিদারদের প্রভাব বেশী।

বুডাপেস্টে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাটের প্রাসাদ আছে। বৃহৎ প্রাসাদ, পাহাড়ের উপরে। মিউজিয়াম যেমন সর্বত্র তেমনি এখানেও। স্টেট অপেরা ও স্টেট থিয়েটারও তেমনি। হাঙ্গেরিয়ানদের সঙ্গীত ইউরোপ-প্রসিদ্ধ। হাঙ্গেরিয়ানরাও ক্যাথলিক। এখানে তাদের অনেক প্রাচীন গির্জা আছে। হাজারখানেক বছর আগে হাঙ্গেরীর লোক খ্রীস্টান হয়ে যায়। যে দিন তারা খ্রীস্টান

* আমরা বলি ৭॥ টা (সাড়ে সাতটা)। এরা বলে $\frac{১}{২}$ ৮টা (আধ আটটা)।

হয়েছিল সেই দিনটার স্মৃতিউৎসব প্রতি বছর হয়। তখন তারা একটা ঘোড়া বলি দেয়।

ইংল্যাণ্ড থেকে যতই পূর্ব দিকে আসছি, ততই আমাদের দেশের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখছি। স্টেশনে হাঁক-ডাক, থিয়েটারে হৈ-চৈ, রাস্তায় সোরগোল ক্রমে বাড়ছে। পোশাকও সাদাসিধে—মজুরদের খালি গা, গরীবের ছেলেদের খালি পা। পিঠে ঘাসের বোঝা বা কাপড়ের বোঁচকা বেঁধে মেয়েরা চলেছে।

বুডাপেস্ট, ১৩৩৫

অস্ট্রিয়া

আবার ভিয়েনায় এলুম। ভিয়েনার মায়া কাটানো শক্ত। ও রকম একটি সুন্দর শহরে অন্ততঃ মাসতিনেক থাকতে হয়, তা নইলে অতৃপ্তি থেকে যায়। রাতের ভিয়েনা একটা দেখবার জিনিস। প্রত্যেক রাত্রেই দেয়ালী। ভিয়েনার কাছে ও দূরে অসংখ্য পাহাড়। সে সব পাহাড়ের কোথাও কোথাও পুরোনো তীর্থ আছে, সেখানে দিক্‌দিগন্তের যাত্রীরা এসে ধর্ণা দেয়, মানত করে। আগাগোড়া হিঁদুয়ানী। আধ্যাত্মিক বলে আমাদের ঐ অহঙ্কারটা এ সব দেখেশুনে রীতিমতো ঘা খায়। যদি আমেরিকায় যাও তো fundamentalistদের দেখে কখনো মনে হবে না যে ওরা কুসংস্কারে আমাদের গুরু হবার অযোগ্য। আমেরিকার এক জগদ্‌গুর্বী সম্প্রতি এই লণ্ডনে ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিয়ে পাপী-তাপীদের উদ্ধার করছেন—ভীষণ ভীড়। কাল Chaliapine-এর গান ও Rubinowitsh-এর বাজনা শুনে রয়াল এলবার্ট হলের বাইরে এসে দেখি, হাজার দশেক লোক স্বর্গে যাবার জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। হায়, হায়, তখন আমার এমন ক্ষিদে পেয়েছিল যে পকেট হাতড়ে এক-আধখানা চকোলেট বা টফী যদি পেতুম তবে ওদের দলে ভিড়ে যেতুম, এমন সুযোগ ছাড়তুম না।

ভিয়েনা থেকে অস্ট্রিয়ান টিরোল দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে আসি। টিরোলের মতো সুন্দর প্রদেশ ইউরোপে আছে কি না জানিনে। যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড় আর হ্রদ আর সমতল মাঠ। পাহাড়ে বরফ জমেছে, মেঘ ঘিরেছে, বৃষ্টি নেমেছে; হ্রদের জল স্বচ্ছ, একটি দু'টি নৌকা ভাসছে; মাঠের কোণে চাষার কুটীর, অচেনা ফুল, অজানা ফসল। চাষার মেয়েরা ট্রেনে উঠছে, ট্রেনে বসে গান ধরেছে, সেলাই করছে। চাষারা ট্রেনে উঠেই নমস্কার করছে সবাইকে, নেমে যাবার সময় নমস্কার পাচ্ছে সকলের কাছে। রেলের লোক টিকিট দেখবার জন্যে এসে কাছে বসে দু'দণ্ড গল্প করে যাচ্ছে, হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিচ্ছে। রেলও তেমনি দিলদরিয়া মেজাজে টুকটুক করে চলেছে, এমন সুন্দর পথটা সে এক নিঃশ্বাসে কাটিয়ে যেতে চায় না। তাড়া কিসের? এমন সুন্দর জগৎ, এখান থেকে পালিয়ে মরবো কোন স্বর্গে? টিরোলের ভিতর দিয়ে আসবার সময় একটুও ইচ্ছা করছিল না চোখ দু'টোকে নড়াতে কিংবা বুঁজতে।

যে গ্রামে সন্ধ্যা হলো সেই গ্রামে নেমে পড়া গেল। গ্রামটা বড়, নাম Bishopspofen। গোটা চার-পাঁচ হোটেল আছে, সিনেমা ও নাচঘর তো আছেই। পরিষ্কার মজবুত রাস্তা, বাড়ীগুলো ঘননিবিষ্ট। ইউরোপের গ্রামগুলো বাস্তবিক বড় আরামের। শহরের সব সুবিধার সঙ্গে গ্রামের সব

সুখ মিশিয়ে যা হয় তাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত—সেকেলে গ্রাম বা একেলে শহর কোনোটাই কাম্য নয়। ইলেকট্রিকের আলো ও উনুন, সেন্ট্রাল হীটিং, টেলিফোন ও রেডিও—ইউরোপে যে কোনো বড় গ্রামে এগুলি আছে। তারপর আছে কাফে, রেস্তরাঁ, যেমন সর্বত্র থাকে। মাঝে মাঝে গান-বাজনার সঙ্গত হয়, যাত্রা-পার্বণের বিজ্ঞাপনও চোখে পড়ল। গির্জা তো থাকবেই।

গ্রামটা পর্বতবেষ্টিত। ঐ অঞ্চলের সব গ্রামই ঐ রকম।

পরদিন ইন্‌স্‌ব্রুক দিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করলুম। সুইটজারল্যাণ্ডকে আর নূতন মনে হলো না। কেন যে লোকে অস্ট্রিয়ান টিরোল না গিয়ে সুইটজারল্যাণ্ডে ছোটে, ভেবে কারণ খুঁজে পেলুম না। সম্ভবতঃ লোকে এখনো অস্ট্রিয়ান টিরোলের স্বাদ পায়নি। এবং সম্ভবতঃ লোকে জনাকীর্ণ অঞ্চলে গিয়ে পরস্পরের সঙ্গ পেতেই বেশী ভালোবাসে। সুইটজারল্যাণ্ডে এখন হাট বসেছে, দুনিয়ার যে যেখানে ছিল সবাই এসে জুটেছে—কেউ স্বাস্থ্যের জন্যে, কেউ আমোদের জন্যে, কেউ জীবিকার জন্যে এবং কেউ শিক্ষার জন্যে।

সুইটজারল্যাণ্ডের লুসার্ন শহরটি ছোট, কিন্তু একখানি ছবির মতো সুন্দর। হ্রদের ধারে তার স্থিতি, সে হ্রদটি নদীর মতো আঁকাবাঁকা অথচ সমুদ্রের মতো দিগন্তজোড়া। হ্রদের চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বরফ। মেঘের ফাঁক দিয়ে যখন সূর্য উঁকি মারে, তখন পাহাড় আর হ্রদ কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবো ঠিক করতে পারিনে। জোর করে চোখ বুজে ধ্যানের মতো ভাবি, মায়া, সব মায়া।

লুসার্নের কাছটা নাকি অতীতকালে একটা সমুদ্র ছিল, পরে সমুদ্র সরে গেলে সেখানে বড় বড় সব glacier উঁচু থেকে নামত আর পাথরের ভিতরে গর্ত করে রেখে যেত। সেকালের সেই সব চিহ্ন লুসার্নের একটা জায়গায় আছে।

ইণ্টারলাকেনও একটা ছোট শহর, তার দু'পাশে দু'টো হ্রদ এবং চারিদিকে পাহাড়। শহরটা লুসার্নেরই মতো হোটেলে ভরা। সুইটজারল্যাণ্ডে হোটেল ছাড়া বড় কিছু নেই। সেই সব হোটেল চালিয়ে বিদেশীদের টাকায় সুইসরা বড়মানুষ। সুইসদের মধ্যে ভিখারী বা বেকার তো নেই-ই, খুব বড়লোকও নেই।

বার্ন শহরটি সুইটজারল্যাণ্ডের রাজধানী, তা তো জানোই। ঐ অঞ্চলে এক কালো ভালুক ছিল—সেই থেকে অঞ্চলটির নাম (জার্মান ভাষায়) 'ভালুক'। এখনো বার্নে গোটাকয়েক ভালুক আছে। শহরের সব জায়গায় ভালুকের মূর্তি বা ছবি দেখা যায়, পতাকাতেও ভালুক। বার্নের রাস্তাগুলোর দু'পাশে যে ফুটপাথ আছে সে ফুটপাথের ছাদ থাকায় বড় সুবিধা হয়েছে, রোদ-জলের ভয় নেই। বার্নের এটা বিশেষত্ব।

বার্নে এখন একটা প্রদর্শনী বসেছে, বৃহৎ প্রদর্শনী, কোলোনের 'প্রেসা'র চেয়ে কিছু ছোট। প্রদর্শনীতে সুইস মেয়েরা কত রকম কাজ করে থাকে তারই একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। বোঝা গেল, মেয়েরা ঘরের ও বাইরের কোনো রকম কাজে পেছপা নয়, তারা চাষও করে, বাগানও করে, কারখানাও চালায়, ডাক্তারখানাও চালায়। মেয়েরাও যে দেশে শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করে, সে দেশের শিল্প-দ্রব্য বিদেশে সস্তায় বিক্রী হতে পারে, সুতরাং বিদেশের বাজার দখল করে। যেমন, জাপান আমাদের বাজার দখল করেছে প্রধানতঃ মেয়েদের দ্বারা শিল্প-দ্রব্য উৎপন্ন করিয়ে। আমাদের মেয়েদেরকে দিয়ে কেবল রান্না করিয়ে আমরা ঠকে গেছি। গ্যাস ও ইলেকট্রিসিটির সাহায্যে ইউরোপে রান্না করতে অত্যন্ত কম সময় লাগে, তা ছাড়া এরা খায়ও অল্প—দু-তিন রকম তরকারি। বাড়ীর সবাই এক সঙ্গে বসে একই রকম তরকারি খায় বলে পাঁচ জনের জন্যে পাঁচ রকম রাঁধতে পাঁচবার কয়লা নষ্ট করতে হয় না, পাঁচবার খাবার জায়গা পরিষ্কার করতে হয় না, পাঁচবার বাসন

মাজতে হয় না, পাঁচবার পরিবেশন করতে হয় না। এমন করে সময় বাঁচে অনেক। তা ছাড়া মা-বাবা-ভাই-বোন মিলে গল্প করতে করতে পরস্পরকে সাহায্য করতে করতে খাওয়া কত বড় একটা আনন্দ!

বার্ন থেকে আসি প্যারিসে। ফ্রান্সে চড়াই-উৎরাই যদিও আছে তবু অস্ট্রিয়া বা সুইটজারল্যাণ্ডের মতো নয়। অস্ট্রিয়ার ও রাইনল্যাণ্ডের কত টানেলের ভিতর দিয়ে রেল যায়, সুইটজারল্যাণ্ডে কত উপত্যকার ভিতর দিয়ে। ফ্রান্স প্রধানতঃ সমতল বলে রেলের বেগ ভয়ঙ্কর বেশী। ফরাসীরা একটু বেপরোয়াও বটে। প্যারিসের মোটরওয়ালাদের দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই, তারা মোটর হাঁকায় যেন পুষ্পক-বিমান। তবু যে দুর্ঘটনা হয় না এটা ওদের চোখের ও হাতের গুণ। প্যারিসের রাস্তায় হাঁটবার সময় প্রাণের মায়া ছাড়তে হয়, রেলে চড়বার সময়ও তাই।

লণ্ডন থেকে প্যারিস যেন কলকাতা থেকে মধুপুর। মাঝখানে একটা চ্যানেল (সমুদ্র) থেকে সব মাটি করেছে। সেটুকু পারাপার করবার সময় বড্ড গা-বমি করে। ঐটুকুর ভয়ে বেশীর ভাগ ইংরেজ দ্বীপ থেকে বেরুতে চায় না, কুনো বলে তাদের সবাই ঠাট্টা করে।

ছবির আবহাওয়াটি প্যারিসের বিশেষত্ব, জার্মেনীর যেমন গানের আবহাওয়া। প্যারিসে যেখানে যাই দেখি কেউ না কেউ ছবি আঁকছে,—নদীর ধারে কেউ মাছ ধরছে, কেউ ছবি আঁকছে, কাফেতে বসে কেউ সরবৎ খাচ্ছে, কেউ ছবি আঁকছে, এমন কি রাস্তার ধারেও কেউ লোক-চলাচল দেখছে আর এঁকে নিচ্ছে। নানা দেশের চিত্রকর দেখি, চীনাম্যানও আছে। প্যারিসে ছবি ও মূর্তির ছড়াছড়ি—যাদুঘর ও চিত্র-প্রদর্শনী বাদ দিলেও মাঠে-ঘাটে যত চিত্র-ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখি তত কোথাও দেখিনি। অভিনয়কলাটাও প্যারিসের হাওয়াতে মিশে রয়েছে—পাঁচ বছরের যে কোনো একটি খুকীও এক নিপুণ অভিনেত্রীর মতো চলে ও কথা বলে। আর সেন নদীর ধারে পুরোনো বইয়ের দোকানও বড় কম নেই। ফরাসীদের খুব বই পড়ার শখ বলে ফরাসী বইগুলো সস্তাও খুব। ফরাসী খবরের কাগজও অসম্ভব সস্তা, যদিও বিজ্ঞাপন তারা কম ছাপে আমাদের চেয়ে। ফরাসীরা মোটে চার কোটি হয়েও কেন যে পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ জাতি তা' এর থেকে কিছু কিছু অনুমান করতে পারবে।

লণ্ডন, ১৩৩৫

আবার জার্মেনী

আইসেনাখ, জার্মেনী

তোমাদের জার্মেনীর মানচিত্রে বোধ হয় আইসেনাখ্‌কে খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই বলে দিচ্ছি, এটি ভাইমারের কিছু পশ্চিমে। জার্মেনীর এই অঞ্চলটিকে বলে ঠুরিঙ্গিয়া। যেখানে বসে লিখছি সেখান থেকে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড় আর ফার গাছের বন, উপত্যকা আর বিরল-বসতি গ্রাম। একটি ছোট পাহাড়ের ওপরে অতি প্রাচীন ভার্টবুর্গ্ দুর্গ; তার দ্বারদেশে মার্টিন লুথার তাঁর প্রোটেস্ট প্রচার করেন; সেই থেকে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ছেড়ে অনেক লোক বেরিয়ে যায়—তাদের নাম হয় প্রোটেস্ট্যাণ্ট। দুই দলে ত্রিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলে; শেষে একট আপোস হয়।

মার্টিন লুথারের ধর্মমত ছিল বড় নীরস—গান-বাজনা, ছবি ও মূর্তি ইত্যাদির তিনি ছিলেন

জাত-শত্রু। ক্যাথলিকেরা কতকটা সাকারবাদী; প্রোটেস্ট্যান্টরা ঘোরতম নিরাকারবাদী। ক্রমে ক্রমে প্রোটেস্ট্যান্টরাও গান-বাজনার অভাব বোধ করে; তখন তাদের মধ্যে এক মস্ত বড় গুণী লোকের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম বাখ্। বাখের পরে আরো অনেক সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছে—যেমন মোৎসার্ট, বেঠোভান, ভাগ্নার। কিন্তু অনেকের মতে বাখ্ হচ্ছেন সঙ্গীত-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। মার্টিন লুথারের মতো বাখ্ও এই আইসেনাখের লোক।

ফ্রান্সের প্রাণ যেমন প্যারিস, ইংলণ্ডের প্রাণ যেমন লণ্ডন, জার্মেনীর প্রাণ তেমন কোনো একটা স্থানে কেন্দ্রীভূত নয়, ছোট-বড় নানা গ্রামে ও শহরে ছড়ানো। তাই জার্মেনীকে জানতে হলে বার্লিনে কিংবা ভিয়েনায় বসে থাকলে চলে না। জার্মেনীর প্রায় প্রত্যেক জেলারই স্বতন্ত্র প্রাণ। জেলাগুলি এককালে স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাদের কোনোটার মালিক রাজা-রাজড়া, কোনোটার মালিক ধর্মযাজক, কোনোটার বা সর্বসাধারণ। তাদের আকার-আয়তনও অত্যন্ত অসমান। কোনোটা হয়তো মাত্র একটা শহর, কোনোটা বাংলাদেশের চেয়ে বড়।

নিজের দেশের স্বাভাবিক ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্যেই উড়োপাখীর ঝাঁক তীর্থ-যাত্রীর মতো বেরিয়ে পড়ে। Wandervogelদের কথা আমি আগেই লিখেছি—জার্মেনীর প্রত্যেক স্থানে এত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছেন যে বিদেশীর পক্ষেও জার্মেনীতে তীর্থ-পরিক্রমা করে আনন্দ আছে। জার্মেনীর সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়। কিছুকাল থেকে জার্মেনীতে বিদ্যাচর্চার চেয়ে অর্থচর্চা প্রবলতর হয়েছে। জার্মেনীর সর্বত্র এখন কারখানা। কারখানার কাজ শেখবার ইস্কুল-কলেজ প্রত্যেক শহরেই আছে, এবং শহর জার্মেনীতে অসংখ্য। গান-বাজনার শখ জার্মান মাত্রেরই দেখছি।

আইসেনাখে আসবার আগে ছিলুম ডার্মস্টাড্টে। ওটা ফ্রাঙ্কফুর্টের কিছু দক্ষিণে। সুন্দর শহর। ওর কাছাকাছি অনেক পাহাড়। পাহাড়ের ওপরে দুর্গ, পাহাড়গুলোতে কোনো রকম বুনো জানোয়ার নেই। বনগুলো সাধারণতঃ বীচগাছের, ফারগাছের বন। কাজেই তোমরা যেমন পার্কে হাওয়া খেতে যাও, জার্মানরা তেমনি পাহাড়ে হাওয়া খেতে যায়। পাহাড়গুলো পনেরো শো ফুটের বেশী উঁচু নয়।

ডার্মস্টাড্ট কতটুকুই বা শহর! তবু তাতে মিউজিয়াম, অপেরা হাউস ও চিত্রশালা আছে। এই আইসেনাখেও মিউজিয়াম আছে গুটি তিন-চার। সভ্যতার নিদর্শন আমাদের নেই কেন?

ডার্মস্টাড্টে আসবার আগে ছিলুম সারব্রুক্নের কাছাকাছি একটি ছোট গ্রামে। বুস তার নাম। আগে তার কথা লিখেছি। এবার সেখানে থাকবার সময় সেখানকার একটা পোড়ো-বাড়ীতে আগুন লাগে। গ্রামে এক ফায়াবব্রিগেড ছিল বটে, কিন্তু তারা এতই কর্মদক্ষ যে বাড়ীখানা তিন ঘণ্টা ধরে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার আগে তারা জলসেচ করবার সুবিধে করে উঠতে পারলে না। সারা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেরই ইচ্ছা যে পোড়ো-বাড়ীখানা পুড়ে ছাই হয়ে যাক, আমরা দেখি। বাড়ীতে জনপ্রাণী ছিল না, জিনিসও ছিল না কিছু।

বুসে যাবার আগে রাইন নদীর খানিকটা জাহাজে করে বেড়াই। কোব্লেন্স থেকে মাইন্স। মাইন্স শহরটার বয়স হাজার দুয়েক বছর। তার মালিক ছিলেন এক ধর্মযাজক। মাইন্সের গির্জা হাজার বছরের পুরোনো। মাইন্সের লোক এখনো খুব ধর্মপ্রবণ। গির্জাতে উপাসনার সময় স্থান ধরছিল না। রাস্তায় প্রায় দু-তিন হাজার বালিকা ধর্মপতাকা ধরে শোভাযাত্রায় চলেছিল। তাদের অনেকের হাতে বাদ্যযন্ত্র, অধিকাংশের কণ্ঠে গান।

কোলোনের গল্প আগে লিখেছি। কোলোনে আমি আসি আমস্টারডাম থেকে। আমস্টারডাম শহরটাতে রাস্তা আছে যত, কেনাল আছে তত। কেনালগুলো দিয়ে মাল আমদানি-রপ্তানি হয়। যাবতীয় ভারি ট্রাফিক জলপথগামী। ঐটুকু দেশ হল্যাণ্ড, তবু আমস্টারডাম বন্দরে জাহাজের সংখ্যা

নেই।

আমস্টারডামের বড় মিউজিয়ামটাতে দেদার ছবি আছে। হল্যাণ্ডের লোক ছবি-আঁকায় ওস্তাদ। হল্যাণ্ডের বাড়ীগুলোর গড়নেরও বিশেষত্ব আছে। অনেক বাড়ীর দেয়াল ঘেঁষে কেনাল গেছে। জানালা থেকে পা ঝুলিয়ে দিলে জলে পড়ে। কিন্তু কেনালের জলের গন্ধ তোমাদের নাকে সইবে না।

আমস্টারডামে জাভার লোক প্রায়ই দেখতুম। একটা মিউজিয়াম আছে, তাতে জাভা প্রভৃতি হল্যাণ্ড-শাসিত দেশের শিল্প-দ্রব্য সংগৃহীত হয়েছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখে বোঝা গেল জাভার হিন্দু সভ্যতা আমাদের থেকে খানিকটা ভিন্ন হ'লেও একেবারে ভিন্ন নয়। রামের রং শাদা, কৃষ্ণকে দেখতে দাঁতওয়ালা রাক্ষসের মতো, লক্ষ্মী আর সরস্বতীর ফুর্তিবাজ চেহারা; কেবল গণেশটিকে দেখে একটু গম্ভীর মনে হলো।

হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্ শহরটি সুন্দর আর ছোট। তার ভিতর দিয়েও কেনাল গেছে—কিন্তু আলপনার মতো। হেগ্-এ সবাই সাইকেলে চড়ে—এত সাইকেল আর কোথাও দেখিনি। পুলিশকেও সাইকেলে চড়ে পাহারা দিয়ে বেড়াতে আর কোথাও দেখেছ কি?

১৩৩৬

মধ্য জার্মেনী

ভাইমার, জার্মেনী

ভাইমার ছোট্ট একটি শহর। এখানে মহাকবি গ্যয়টে ছিলেন রাজমন্ত্রী। তাঁর বাড়ী ও বাগানবাড়ী এখানকার বিশিষ্ট সম্পদ। বাগানবাড়ীতে তিনি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে যেতেন; ছোট বাড়ী, বেশী কিছু সাজ-সরঞ্জাম নেই, খানকয়েক মানচিত্র ছাড়া। কিন্তু তাঁর আসল বাড়ীটা সত্যিই একটা মিউজিয়াম হবার উপযুক্ত! তাতে অজস্র ছবি ও মূর্তি, অসংখ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অনেক ভাষার অনেক বিষয়ের গ্রন্থ রয়েছে—সে সব গ্যয়টের নিজের সংগৃহীত, নিজের ব্যবহৃত। গ্যয়টেকে লোকে কেবল কবি ও ঋষি বলেই জানে; কিন্তু তিনি তখনকার কালের পক্ষে একজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিকও ছিলেন! পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, ধাতুবিজ্ঞান (metallurgy) প্রভৃতি অনেকগুলি বিজ্ঞান তার হাতে-কলমে জানা ছিল এবং চোখের সঙ্গে রঙের যোগাযোগ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব একটা থিওরী চলিত আছে। তাঁর ল্যাবরেটরী দেখে তাঁর বহুমুখী কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়। কত রকম প্রজাপতি ও শামুক তিনি সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন! এখনো সব রয়েছে।

মহাকবি শিলারও ছিলেন এই ভাইমার শহরে। একটি ছোট্ট শহরে দু'জন মহাকবির সমাবেশ যেন ঐক সঙ্গে সূর্য-চন্দ্রের উদয়।

বার্লিন থেকে লাইপ্‌ৎসীগ, জার্মেনী

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর বার্লিন আমার পছন্দ হয়নি। কেন হয়নি কারণ তার বলা শক্ত। তোমরা হয়তো চেপে ধরবে, বলবে—বাঃ রে, এমন সব চওড়া চওড়া রাস্তা, আলো-বাতাসের জন্য এত প্রচুর ফাঁক, এমন সব মজবুত অট্টালিকা, ভূমিকম্প হয়ে গেলেও যা টলবার নয়, এমন সব জবরদস্ত মানুষ, কাবুলীওয়ালার মতো চেহারা; তবু তোমার পছন্দ হলো না? আমি এর জবাবে বলবো — সব ঠিক, তবু শহরটা যেন কলের মতো চলছে। যেন প্রাণী নয়, যন্ত্র। অগুণতি

কলকারখানা তার দিকে দিকে, রাস্তায় রাস্তায় লরী ঘুরছে, মানুষগুলো যত পারে কলকে খাটিয়ে নিচ্ছে। পোস্টাফিসের চিঠি চালাচালি হয় এক নলের ভিতর দিয়ে। বড় বড় রাস্তাগুলোতে গাড়ী থামাবার জন্যে পুলিশ নেই, লাল-সবুজ-হলদে সিগনাল্ দেখে গাড়ীগুলো আপনি থামে, চলে মন্থর হয়ে। কোনো কোনো থিয়েটারের স্টেজ ঘূর্ণমান—অর্থাৎ একটা দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে সীন ফেলতে হয় না, সীন তুলতে হয় না, সমস্ত স্টেজটাই পাশ ফিরে দাঁড়ায়। তখন দেখা যায় যেখানে একটা চায়ের আড্ডা ছিল সেখানে একটা বৈঠকখানা। অভিনয় শুরু হবার আগে থেকেই গোটাকয়েক দৃশ্য স্টেজের এ-পিঠে ও-পিঠে সাজানো থাকে, অভিনয় হবার সময়ও উল্টো পিঠটাতে সাজানো চলতে থাকে।

বার্লিন হচ্ছে এরোপ্লেনের প্রধান আড্ডা। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় শঙ্খচিলের মতো এরোপ্লেন উড়ছে। এরোপ্লেনের আওয়াজ জেপ্‌লিনের আওয়াজের কাছে লাগে না। এরোপ্লেনের চেহারাও জেপ্‌লিনের মতো হাস্যকর নয়। জেপ্‌লিনটা একটা অতিকায় মাছের মতো দেখতে। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে হেলে-দুলে ধীরে-সুস্থে সাঁতার দেয়।

জার্মেনীর প্রত্যেক জায়গায়—বিশেষ করে বার্লিনে— অসংখ্য নাপিতের দোকান। যে কোন রাস্তায় পা দিলেই দেখা যায় —'নাপিত', 'নাপিত', 'নাপিত'......(friseur)। গ্রীষ্মকালটা প্রায় প্রত্যেক জার্মান পুরুষই মাথা মুড়োয়। আমার মাথায় চুল দেখে আমার বন্ধুরা ধরে বসেছিল—'মাথা মুড়োতে হবে। কেবল সামনের দিকে কাকাতুয়ার মতো ঝুঁটি রাখলেই চলবে।' তোমরা জার্মেনীতে এলে কাকাতুয়া সেজো। জার্মান মেয়েরা অন্যান্য ইউরোপীয় মেয়েদের মতো প্রায়ই চুল ছাঁটায়, কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম। তাই এত নাপিত।

বার্লিনের চিড়িয়াখানাটা দেখবার মতো। পশুপাখী যেমন সেব দেশের চিড়িয়াখানায়, তেমনি বার্লিনেও। কিন্তু পশুপাখীর থাকবার জন্যে এমন সুন্দর পাহাড়, গুহা, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদি কোথাও নেই। হাতিরা যেখানে থাকে সেটা একটা ভারতবর্ষীয় মন্দিরসমষ্টি। উটপাখী যেখানে থাকে সেটা প্রাচীন ঈজিপ্টের ধরনে তৈরী ও তার গায়ে প্রাচীন ঈজিপ্টের নক্সা। রেড ইণ্ডিয়ান ও চীনে ধরনের পশুপক্ষীশালাও আছে। জীবজন্তুর পাথরের গড়া মূর্তিও স্থানে স্থানে স্থাপিত।

নেলোর থেকে সংগৃহীত ভারতবর্ষীয় গাই, বাছুর ও ষাঁড় দেখে দেশের কত কথাই না মনে পড়ল! বার্লিনে ওরা অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে জন্তু; লোকে ওদের পাঁউরুটি ও চকোলেট ছুঁড়ে খাওয়াচ্ছে। আমাদের দেশে ওরা দেবতার মতো সেবা ও ভক্তি পায়; মায়ের মতো, ভাইয়ের মতো মমতা পায়। এখানে কেউ ওদের ঘাস খাইয়ে সুখ পায় না, সুখ দেয় না। দেশের জন্যে বেচারীদের মন কেমন করছে! খোলা মাঠের জন্যে, রাখালের গোষ্ঠের জন্যে।

জাগুয়ারেরা পরস্পর লেজ টানাটানি করে বেশ সুখে আছে। সিংহরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। ওদের বাচ্চাদেরকে একটা কুকুর মাই দেয় এবং ছোট ছেলেমেয়েরা কোলে নিয়ে ফোটো তোলায়। সিংহের বাচ্চারা খুব নিরীহ ও হাসি-খুশি। সুন্দরবনের বাঘটা বাংলাদেশ ছেড়ে এসে বড্ড একলা বোধ করছে, নিশ্চয় তোমাদের কথা ভেবে ওর কান্না পাচ্ছে। চিড়িয়াখানাতে থাকতেই সেদিন আমাদের দেশের হাতি-হাতিনীর এক বাচ্চা হয়েছে, ভারি চপল।

ড্রেস্‌ডেন

লাইপৎসীগ্ বার্লিনের মতো শিল্পবহুল হলেও বার্লিনের চেয়ে ফাঁকা। নতুন টাউন হল, নতুন থিয়েটার, নতুন রেলস্টেশন ইত্যাদি লাইপৎসীগের বাস্তু সম্পদ। গান-বাজনার জন্যে লাইপৎসীগের জগদ্‌ব্যাপী সুখ্যাতি। প্রায় প্রত্যেক কাফে আর রেস্তরাঁতে সঙ্গীতের আয়োজন।

ড্রেস্‌ডেন লাইপৎসীগের চাইতে, বার্লিনের চাইতে দেখতে সুন্দর; কিন্তু যত সুন্দর ভেবেছিলুম তত সুন্দর নয়, বড় আড়ম্বরসম্পন্ন। গির্জাগুলোর ভিতরে ও বাইরে রকমারি নক্সা—প্রাসাদগুলোর তো কথাই নেই। লক্ষ্ণৌয়ের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। ড্রেস্‌ডেনের রাজারা সিংহাসন ছেড়ে

চলে গেছে—প্রজারা নিজেরাই নিজেদের চালক। রাজাদের সঞ্চিত মণি-মাণিক্য এখন সবাইকে দেখানো হয়—হীরা, নীলা, হাতির দাঁত ও mother-o-pearl-এর কাজ। আমাদের মোগল বাদ্শাহের দরবারের একটা ছোট আকারের মডেল দেখলুম। সিংহাসনে সম্রাট বসেছেন, তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করছে কারা সব, হাতিতে চড়ে কারা সব এসেছেন; প্রহরী, সভাসদ্ ও ভৃত্যগণ নিজের নিজের স্থানে দণ্ডায়মান। সোনারূপার কাজ। একখানা হীরা সম্রাটের পায়ের কাছে।

ড্রেস্ডেনের চিত্রশালার দেশ-বিদেশে নাম আছে। তার সম্পদ Raphael-এর শ্রেষ্ঠ কীর্তি Sistine Madonna; তাই দেখতেই ড্রেস্ডেনে কত লোক আসে।

ড্রেস্ডেনের চিড়িয়াখানার প্রধান সম্পদটিকে তোমাদের দেখতে ভারি ইচ্ছা করবে। 'Charlie' কেবল যে সাইকেল চালায় তাই নয়, স্কেট করে, স্লেজে চড়ে, দড়ির ওপর হাঁটে, বলের ওপর দাঁড়িয়ে বলটাকে গড়াতে গড়াতে নিয়ে যায়, টেবিলে খায় ও তার মাস্টারকে খাওয়ায়। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ Charlie-কে দিয়ে বেশ রোজগার করিয়ে নেন; কেননা তাকে দেখতে আলাদা করে পয়সা দিয়ে অনেক লোক আসে ও হাসে। সেটি একটি শিম্পাঞ্জি।

১৩৩৬

চেকোস্লোভাকিয়া

চেকোস্লোভাকিয়া নামটি নতুন বলে দেশটি নতুন নয়। সেকালে যাকে বোহিমিয়া বলা হতো তারই সঙ্গে হাঙ্গেরীর উত্তরাংশ যোগ করে দুইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে চেকোস্লোভাকিয়া অর্থাৎ চেক্ ও স্লোভাক্দের দেশ।

প্রাহা বা প্রাগ্ এই দেশের রাজধানী। শহরটির বয়স পনেরো শো বছরের কিছু বেশী। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের দ্বিতীয় পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়। Vltava নদীর দু'ধারে শহর, নদীটি বেশ বড় ও কতকটা আঁকাবাঁকা। শহরের একদিকে পাহাড়। শহরটি উঁচুনীচু।

বৃহৎ শহর। সম্প্রতি লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে দশ লাখের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। লোকের ভিড়ে পথ-চলা দায়। পাথর-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দিনরাত ঘোড়ায় টানা গাড়ী চলেছে—তার শব্দে রাত্রে ঘুম হয় না। চেকোস্লোভাকিয়া আগে ছিল চাষাদের দেশ। এখন দিন দিন তার যন্ত্রশিল্পের উন্নতি হচ্ছে। তাই প্রাহার আয়তন দ্রুতগতিতে বাড়তেই লেগেছে। Vltava নদী Elbe নদীতে পড়েছে— Elbe নদী সমুদ্রে। বন্দর হিসেবে প্রাহা মন্দ নয়। এরোপ্লেনের চলাচল খুব বেশী।

প্রাহার প্রাচীন নগরগৃহের গায়ে একটি ঘড়ি আছে। বারোটা বাজলে বারো জন apostle ঘড়ির নীচে দু'টি জানালা খুলে সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে দর্শন দেন। হ্রাদচানী পাহাড়ের উপরে এক প্রসিদ্ধ গির্জা আছে—তাতে এই সময়টায় একটা উৎসব চলেছে; দেশের সব গ্রাম থেকে লোক আসে। তাই দেখতে গিয়ে দেখি, ভীষণ ভিড়। পুরীর মন্দিরের মতো। চেক্রা ধর্মপ্রাণ জাতি। এক প্রাহা শহরেই নাকি একশোটা গির্জা আছে। দেখি, সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে; সারি বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে গেছে; খোলা দরজা দিয়ে একটি একটি করে লোক ঢুকছে। আমাদের চেক্ বন্ধুনী পুলিশকে বললেন, 'ইনি ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। কাল চলে যাবেন। এঁর প্রবেশের সুবিধা করে দিন।' তখন পুলিশ একজন সরকারী কেরানীকে ও-কথা বললে। সে ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা আমার পিছু

পিছু আসুন, এখানে আপনাদের টিকিট দিলে লোকে ভাববে পক্ষপাত দেখাচ্ছি।' তাঁর সঙ্গে গিয়ে লুকিয়ে টিকিট কেনা গেল—তারপরে আমরা জনতার সারির ভিতরে এক জায়গায় একটু ফাঁক দেখে দাঁড়িয়ে গেলুম। ওটা অবশ্য অন্যায়, কেননা আগে থেকে যারা টিকিট কিনেছিল তাদের অনেকে রইল আমাদের পিছনে। একটু একটু করে এগিয়ে দরজার অনেকটা কাছে এসেছি এমন সময় দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা শ' তিন-চার লোক বাদ পড়ে গেলুম। সবাই মিলে বিষম প্রতিবাদ করতে লাগলো। বললে, 'আমরা তিনঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, সাত দিন আগে থেকে টিকিট কিনেছি।' দাঙ্গা বাঁধে আর কি? পুলিশরা বললে, 'আমরা কী করবো? হুকুম দিয়েছেন উপরওয়ালারা।' তখন জনতা বললে, 'ডাকো উপরওয়ালাদের। ওরা কেমন উপরওয়ালা একবার দেখে নিই।' বেশীক্ষণ ওদের দলে না দাঁড়িয়ে আমরা গির্জার অন্য একটা দরজার অভিমুখে চললুম। সেটিতে ঢুকতে গিয়ে শুনি, সেটা কেবল বড় বড় আমীর-ওম্‌রাহদের জন্যে। তখন কী করি? গির্জার একটা অংশে বিনা টিকিটে ঢুকতে দেয়। সেই অংশটা দেখলুম। যেখানটায় সেকালের রাজাদের রত্নময় মুকুট-দণ্ড ইত্যাদি রক্ষিত ছিল, সেখানটা কেবল আমীর-ওম্‌রাহরাই দেখতে লাগলো, বাইরে থাকলো প্রত্যাখ্যাত জনতা।

ঐ গির্জার অভ্যন্তরে সাধুদের মূর্তি আছে। প্রাহা নগরী এক কালে সাধুসন্তদের পীঠস্থান ছিল। প্রাহার সেকালের একজন পুণ্যবান রাজা খ্রীস্টীয় জগতের সর্বত্র প্রখ্যাত।

প্রাহাতে ইহুদীদের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার করা হতো। তাদের Ghettoর (ইহুদীপাড়ার) চারিদিকে পাহারা ছিল, অনুমতি না নিয়ে তারা পাড়ার বাইরে যেতে পারতো না এবং সন্ধ্যা হলেই ফিরে আসতে বাধ্য হতো। তারা বংশানুক্রমে সেই পাড়াটিতেই জন্মাতো এবং মরতো—এক-একটা ছোট ছোট ঘরে এক-একটা একান্নবর্তী পরিবার গোরু-শূওরের মতো থাকতো। তাদের গোরস্থানটাতে পনেরো শো বছর ধরে সত্তর হাজার শবদেহ প্রোথিত হয়েছে, একটির উপর একটি, একটির গায়ে আরেকটি—শেষে বাদ্‌শাহ দ্বিতীয় জোসেফ্ ইহুদীদের কতকটা স্বাধীনতা দেন। এবং পরে ক্রমে ক্রমে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়।

কত অত্যাচার সহ্য করে ইহুদীরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের অন্যতম হয়েছে! যত প্রসিদ্ধ লোকের নাম তোমরা শোন একটু খোঁজ নিলে জানবে তাদের অনেকেই ইহুদী। আমেরিকার ফিল্ম-স্টারদের অনেকেই যে ইহুদী শুনে হয়তো অবিশ্বাস করবে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসাদার ও ফিল্মস্টার—সব কাজেই ওরা হাত লাগায়।

প্রাহাতেও জার্মেনীর মতো সঙ্গীতের খুব আদর। জার্মানদের সঙ্গে চেক্‌দের বনিবনা নেই, কিন্তু জার্মান সঙ্গীতকে ওরা ছেড়ে থাকতে পারে না। অত্যন্ত বাদবিসম্বাদকে সঙ্গীতচর্চার ঐক্য কতক পরিমাণে লাঘব করেছে। আমার যে বন্ধুনীটির উল্লেখ করেছি তাঁর ছেলের বয়স সবে ষোলো বছর, সে জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী এই তিনটে বিদেশী ভাষা এক রকম শিখে নিয়েছে, সঙ্গীতে সে তার মায়ের শিক্ষা পেয়ে ইতিমধ্যেই ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। বেহালায় তার পাকা হাত। মহিলাটি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খবর রাখেন, তাই তাঁর ছেলে ভারতবর্ষে গিয়ে যোগীদের শিষ্য হতে চায়। সে-দিন উপনিষৎ পড়ছিল। প্রাহাতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার বক্তৃতা দিয়েছেন—শুনলুম তাঁকে দেখবার জন্যে লোকারণ্য হয়েছিল।

চেক্‌দের মাথার চুল কালো। রং খুব ফরসা নয়। রান্নাও তাদের কতকটা আমাদের রান্নার সঙ্গে মেলে। দই আমি ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জার্মেনীতে কত রকম খেয়েছি; কিন্তু দেশের দই খেলুম প্রাহাতে প্রথম। এক রকম মাছও খেলুম, নদীর মাছ—সেও আমাকে এই প্রথম দেশের মাছের স্বাদ মনে করিয়ে দিলো। চেকদের পোশাক এখন সাধারণ ইউরোপীয় পোশাক। কিন্তু স্লোভাক্‌রা এখনো

গ্রাম্য বলে তাদের পোশাক অভিনব। চেক্ ও স্লোভাক্ উভয়েই স্লাভবংশীয়।

ড্রেস্‌ডেন থেকে প্রাহা যাই এল্‌ব নদীর ধারে ধারে। ঐ অঞ্চলটি বড় সুন্দর। নদীর পাড় উঁচু হয়ে পাহাড় হয়ে গেছে—খাড়া পাহাড়, ভাঙা দুর্গের দেওয়ালের মতো দেখতে। প্রাহা থেকে নুর্নবার্গ চলেছি। প্রাহা থেকে বেরিয়েই একটা সুড়ং পড়লো (—তোমাদের এই কথা লিখতে লিখতে আরো একটা সুড়ং!)—সুড়ংটা ভয়ানক লম্বা! মিনিট পাঁচেক অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আলোকে চললুম। এ অঞ্চলটাও বিলক্ষণ পার্বত্য।

এইবার তোমাদের কিছু চেক্ ভাষা শিখিয়ে দিই। চেক্‌রা প্রাগ্‌কে বলে প্রাহা, কার্লস্‌বাডকে বলে কার্লোভীভারী, বোডেন বাখ্‌কে বলে পোড়্মোকলী। জার্মান ভাষার সঙ্গে চেক্ ভাষার এতই তফাত! যতগুলো চেক্ কথা শিখেছিলুম ভুলে গেছি—কেবল মনে আছে যে চেক্ ভাষায় স্বরবর্ণ বাদ দিয়ে বা অল্প মিশিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের শব্দই অনেক। 'তোমার আঙুলটা তোমার গলার ভিতরে ঢোকাও'—এর চেক্ ভাষান্তর হলো, 'strc prst skrc krk.' মুরগীকে ওরা বলে Slepicka (স্লপিচ্‌কা)।

১৩৩৬

[উপরে যে উৎসবের নাম করেছি সেটা পুণ্যবান রাজা Wenceslas-এর সহস্রতম সাম্বৎসরিক। গির্জাটার নির্মাণ বহু শতাব্দীর পরে সে দিন সমাপ্ত হয়েছে।

ইংরাজীতে একটি Christmas Carol (আমাদের যেমন আগমনী গান) আছে, সেটি চেক্‌দের পুণ্যবান রাজা Wenceslas কে নিয়ে। 'Good King Wenceslas looked out on the Feast of Stephen.' রাজা একটি দরিদ্রকে অন্ন দেবার জন্যে শীত-কুয়াশা-বরফ তুচ্ছ করে তার কুটীর অবধি হেঁটে যান। Carolটি ইংরেজ ছেলেমেয়েদের ভারি প্রিয়।]

শেষ জার্মেনী

নুর্ন্‌বার্গ দেখে তৃপ্তি হলো। সম্প্রতি যতগুলি শহর দেখেছি নুর্ন্‌বার্গই সবচেয়ে সুন্দর। পুরোনো শহরকে ঘিরে একটা নতুন শহর গড়ে উঠেছে—পুরোনো শহরটারও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তবু মোটের উপর পুরোনো শহরটি পুরোনোই রয়েছে। তার চারিদিকে প্রাচীর, প্রাচীর-তোরণ ও প্রাচীর-গম্বুজ। প্রাচীরের ওপারে পরিখা। পুরোনো শহরটি উঁচুনীচু—একটা দিক তো রীতিমতো পাহাড়ে। রাস্তাগুলোর একটার থেকে আরেকটায় যেতে হলে অনেক সময় সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয়। খুব সরু সরু রাস্তা, অনেক সময় কোণাকুণি। নদী একটি শহরের মাঝখানে এঁকেবেঁকে গেছে। নালার মতো ছোট ও অগভীর। নদীর পুল অনেক। নদীর ধারে ধারে বাঁধের মতো দাঁড়িয়েছে। সেকেলে ছাঁদের বাড়ী।

নুর্ন্‌বার্গে জার্মেনীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ডুরার (Durer) বাস করতেন। ডুরারের বাড়ী এখনো তেমনি আছে—যদিও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ। ডুরারের খানকয়েক ছবির অরিজিন্যাল এখনো ঐ বাড়ীতে আছে।

জার্মান সঙ্গীতকার ভাগ্‌নার 'মাস্টার সিঙ্গার্স্' বলে একখানা অপেরা রচনা করেন। ঐ অপেরার ঘটনাস্থল নুর্ন্‌বার্গের মুচিরা সেকালে একটা কবিওয়ালার দল করেছিল। দলের নাম

'মাস্টার সিঙ্গার্‌স্' বা 'ওস্তাদ গাইয়ে'! মুচিরা সত্যি সত্যিই গানের ওস্তাদ ছিল বলে তাদের গান শুনতে দেশবিদেশের লোক আসতো। একবার তাদের এক কবির লড়াই হয়। সেই লড়াইয়ের দ্বারা স্থির হয় দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কে একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবে। যিনি বিচার করে স্থির করেন সেই মুচিটির নাম হান্‌স্ সাখ্‌স্ (Hans Sachs)। তাঁর বাড়ী এখনো আছে।

নুর্ন্‌বার্গের কয়েকটা গির্জা বাইরে থেকে তথা ভিতর থেকে দেখতে সুন্দর। একটা গির্জার নাম Frauen Kirche বা জননী মেরীর গির্জা। আরেকটার নাম Lorenz Kirche বা সেণ্ট্ লরেন্সের গির্জা।

জার্মান ন্যাশনাল মিউজিয়াম নুর্ন্‌বার্গের গৌরব। মিউজিয়ামের নীচের তলাটা বোধ হয় এককালে একটা মঠ ছিল। গথিক ছাঁদের সীলিং ও খিলান। অনেক খ্রীস্টীয় মূর্তির ভিড়। উপরের তলায় ডুরার প্রভৃতি চিত্রকরের চিত্রপট। পাশের ঘরগুলিতে সেকেলে পোশাক, সেকেলে পুঁথি। গোলোকধাঁধার মতো বৃহৎ ব্যাপার—একবার ঢুকলে বেরুবার পথ পাওয়া কঠিন। মিউজিয়ামের বাড়ীটার ছাদের গড়নের বিশিষ্টতা আছে।

নুর্ন্‌বার্গ থেকে আসি Wurzburg-এ, শুধু রাতের বেলাটা সেখানে শুয়ে কাটাতে। Wurzburg -এর গল্প আগে লিখেছি। Wurzburg থেকে চলেছি Frankfurt হয়ে রাইন নদীর ধারে কোলোন ও কোলোন থেকে আখন (Aachen) হয়ে ব্রাসেল্‌স্। হয়তো আজ আখনে রাত কাটাতে পারি। ট্রেনে ঘুম হয় না, নইলে এতবার এখানে ওখানে নেমে হোটেল খুঁজে সময় ও অর্থ নষ্ট করতে হতো না। ট্রেনেতেই খাবার গাড়ী আছে—কোনোটা Mitropa কোম্পানীর, কোনোটা Wagon Lits কোম্পানীর। এদের খাবার গাড়ী কন্টিনেণ্টের প্রায় সব দেশেই এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে থাকে। ইংলণ্ডের খাবার গাড়ীগুলো রেল কোম্পানীদের নিজেদের সম্পত্তি, যেমন আমাদের দেশেও।

এই মাত্র Wiesbaden-এ আমাদের ট্রেন থেমেছে।

প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে বিশ-পঁচিশ জন লোক বিয়ার টানছে আর গান জুড়ে দিয়েছে। গানটা বোধহয় তাদের জাতীয় সঙ্গীত কিংবা তেমনি কিছু যা সবাই একসঙ্গে গাইতে জানে। বিয়ার ও গান—এ দু'টো জার্মান মাত্রেই টানে ও জানে। যেখানে যাও সেখানেই বিয়ার পান ও বাদ্যগান।

ব্রাসেল্‌স্ থেকে লণ্ডন

জার্মেনী থেকে বেলজিয়ামে ঢুকতেই দেখি, ঘন সবুজ ঘাসে মোড়া অত্যন্ত অসমতল ভূমি। রেলপথ গেছে এতগুলো ছোট-বড় সুড়ং দিয়ে যে মাটি আর আকাশ এই দেখা যায় তো এই দেখা যায় না।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, কলকারখানায় ভরা অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চল। তারপরে ব্রাসেল্‌স্। অন্ধকার রাত্রে আলোকসজ্জিত ব্রাসেল্‌সে যেন দেয়ালীর উৎসব চলছিল। শনিবারের রাত। অসংখ্য কাফেতে অগুণতি লোক বসে। বিয়ার খাচ্ছে। জার্মেনীতে কাফে আছে বটে, কিন্তু এত নয়। বেলজিয়াম মনে-প্রাণে ফরাসী। তবে বেলজিয়ামের অর্ধেক লোক ফ্লেমিশ। ওরা জার্মান ও ওলন্দাজদের সগোত্র। দেখা গেল, ব্রাসেল্‌সের সব জায়গায় দু'টো ভাষায় বিধি-নিষেধ ও পথঘাটের নাম লেখা রয়েছে। একটা তো ফরাসী, আরেকটা জার্মান ভাষার অপভ্রংশ এবং ওলন্দাজ ভাষার মতো। যথা, Bruxelles ও Brussels, Rue ও Straat. ব্রাসেল্‌সের প্রায় সকলেই ইংরেজী জানে।

আজ রবিবার। সকালে উঠে দেখি, সৈন্যেরা শোভাযাত্রায় বেরিয়েছে—সবটা রাস্তা জুড়ে। ভারি হৈ-চৈ—মিলিটারি বাজনা। ব্রাসেল্‌সের প্রসিদ্ধ ক্যাথিড্রালে গিয়ে দেখি অর্চনা চলেছে, ভক্তেরা নম্র হয়ে যোগ দিচ্ছেন। অনেক কালের গির্জা। ভিতরের মূর্তিগুলোকে নির্জীব ও নূতন মনে হলো বাইরের মূর্তিগুলোর তুলনায়।

ব্রাসেল্সের টাউন হলও প্রাচীন মূর্তিবহুল। বোধহয় ব্রাসেল্সে সবচেয়ে উঁচু তার চূড়া!

হাতে সময় ছিল না বলে কোনো মতে 'নমো' 'নমো' করে ঐ দু'টো দর্শনীয় দেখলুম। ট্রেনের যে গাড়ীটাতে উঠি সেটাতে জনকয়েক লোক দু'টো বড় বড় খাঁচায় দু'রকম দু'ঝাঁক পাখী নিয়ে উঠল। বোধহয় বিক্রী করতে নিয়ে গেল। ওরা নামল ইংরেজীতে যাকে বলা যায় Ghent সেইখানে। ফরাসী নাম Gand (গঁ)। ফ্লেমিশ্ নাম Gent.

১৩৩৬

ইটালী

ইউরোপ ছেড়ে এসেছি, ভারতবর্ষে ভিড়িনি, অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মতো। এখন এটা লোহিত সাগর। তোমরা ভাবছো, সমুদ্রের জল নিশ্চয়ই লাল। আমি দেখছি, ঘন নীল। সব সমুদ্রের রং এক—তবু নাম তো দিতে হবে একটা।

মার্সেল্সে জাহাজ ধরবার আগে আমি কিছু দিন ইটালীটা ঘুরে আসি। লণ্ডন থেকে উত্তর ফ্রান্স ও সুইটজারল্যাণ্ডের বার্ন ও ইটালীর ডোমোডসোলা কেবল সুড়ং আর সুড়ং। কিন্তু ভারি সুন্দর! ইটালীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা হলো সৌন্দর্যের সূত্রে। উত্তর ইটালীর হ্রদগুলি কী সুন্দর! হ্রদের মাঝখানে দ্বীপ; দ্বীপে যাদের বাড়ী তারা কী ভাগ্যবান!

মিলান ইটালীর সবচেয়ে বড় শহর, কলকারখানায় ভরা। তবু তার থেকে আল্পস পাহাড় দেখা যায় ও তার চারিদিকে বন। মিলানের বড় গির্জা (Cathedral) যেমন বৃহৎ তেমনি বিচিত্র। মিলানের একটি পুরাতন মঠে প্রসিদ্ধ চিত্রকর লেওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা যীশু খ্রীস্টের 'শেষ ভোজন' নামক প্রসিদ্ধ প্রাচীর-চিত্র আছে। ছবিখানার নকল তো আমরা কত দেখেছি, তোমরাও দেখেছ, কিন্তু আসলটির তুলনা হয় না! সামান্য একটা দেয়াল, তার দিকে তাকালে মনে হয়, সত্যিকার একটা ঘরে জলজ্যান্ত মানুষ। সমতলকে অসমতলের মতো করে দেখানো লিওনার্দো ও মিকেলাঞ্জেলোর বিশেষত্ব। ছবি দেখে মনে হয়, ছবি নয়—মূর্তি, চিত্র নয়—ভাস্কর্য।

ভেরোনা শহরটি ছোট হলেও খুব পুরোনো। ইটালীর প্রায় সব শহরই অতি প্রাচীন। ভেরোনায় রোমান আমলের amphitheatre (সার্কাস-ঘর) আছে। সরু সরু গলি দেখলে কাশী মনে পড়ে। ভেরোনায় বড় গির্জায় খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পাথরে খোদাই-করা মূর্তি দেখলুম। তাকে বলে Byzantine যুগের শিল্প।

ভেনিস্ শহরের বর্ণনা তোমরা কত পড়েছ। শহরটার আর প্রাণ নেই, তার প্রাণ ছিল তার অধুনালুপ্ত বাণিজ্য। বিদেশীরা যায় গঁদোলায় চড়ে তার ধ্বংসাবশেষ দেখতে। 'দুয়ার খোলা পড়ে আছে কোথায় গেল দ্বারী।' ঘুমন্তপুরীর মতো নিঃশব্দ তার অট্টালিকাগুলো। তার জলময় পথগুলো ছলাৎ ছল করছে।

রোম ইটালীর রাজধানী হয়ে অবধি আবার জেগে উঠেছে। আগে ছিল পোপের রাজধানী, তার আগে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইটালী আর রোমান সাম্রাজ্য এক নয়, পোপের রাজ্য তো একেবারে আলাদা জিনিস। পোপ হচ্ছেন দুনিয়ার যেখানে যতো ক্যাথলিক আছে সকলের 'বাবা'। পোপ কথাটার অর্থই হচ্ছে বাবা। বাবাজী এখন রোমের মালিক নন, রোমের এক কোণে

তাঁর মঠবাড়ীতে তিনি মনের দুঃখে থাকেন। তাঁর মঠবাড়ীর নাম 'ভাটিকান'। তার অনেকগুলো ঘরে বড় বড় শিল্পীদের আঁকা অনেক প্রসিদ্ধ চিত্র আছে। মিকেলাঞ্জেলো একটা ঘরের সীলিংকে এমন চেহারা দেন যে মনে হয় একটা অর্ধচন্দ্রাকার খিলান। রাফেলের আঁকা প্রাচীর-চিত্র তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের অমর কীর্তি।

ভাটিকানের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গির্জা 'সেণ্ট পিটার'। সব হিন্দুর যেমন কাশী বিশ্বনাথ, সব ক্যাথলিকের তেমনি সেণ্ট পিটার। মরার আগে একবার দেখা চাই। রোমে আরো তিনটে বড় বড় গির্জা আছে—সেণ্ট জন্, সেণ্ট মেরী, সেণ্ট পল্। একটা ছোট অথচ সুন্দরতর গির্জাতে আছে মিকেলাঞ্জেলোর মোজেস-মূর্তি। ক্রুদ্ধ মোজেস দাড়ি ছিঁড়ছেন—তাঁর চোখ জ্বলছে, দেহের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠছে ও প্রত্যেকটি শিরা দেখা যাচ্ছে! মর্মর পাথরে এমন করে জীবন্যাস করতে ক'জন পেরেছে?

রোমানদের রোমের ধ্বংসাবশেষ তাদের কলোসিয়াম, সেটাও একটা সার্কাস-ঘর, সেখানে রোমান রাজারা খ্রীস্টানদের সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে ছেড়ে দিতো। আন্দ্রোক্লিস্ ও সিংহের গল্প তো তোমরা জানো। রোমানদের চণ্ডীমণ্ডপ, অর্থাৎ যেখানে তারা আড্ডা দিতো, সেখানটাকে বলে 'ফোরাম'। সেখানে কয়েকটা ভাঙা স্তম্ভ আছে—সুদীর্ঘ, সতেজ, গম্ভীর। শনি মন্দিরের কয়েকটা স্তম্ভ এখনো খাড়া রয়েছে।

রোমে দেখবার মতো জিনিস আছে রাশি রাশি, সব দেখতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন লাগে। তিন হাজার বছর ঐ শহর পতন ও অভ্যুদয়ের দ্বারা ইতিহাসকে কত অমূল্য কীর্তি দান করেছে।

ফ্লোরেন্স কিছুকাল ইটালীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের মিলনস্থান হয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের পীঠস্থান। আমাদের উজ্জয়িনীর মতো ফ্লোরেন্স ছিল নবরত্নের মেলা। দান্তে, পেত্রার্কা, বোকাচিও, সাভোনারোলা, মিকেলাঞ্জেলো, লেওনার্দো, রাফেল ইত্যাদি কেউ বা ওখানে জন্মান, কেউ বা ওখানে গিয়ে বাস করেন। গত শতাব্দীতে ইংরেজ কবি ব্রাউনিং ও তাঁর স্ত্রী—তিনিও কবি—দু'জনে মিলে ফ্লোরেন্সে পালিয়ে যান। ফ্লোরেন্সকেও ভালো করে দেখতে বছরখানেক লাগবার কথা, তোমরা দেখো। ইউরোপের অসংখ্য তীর্থ তোমাদের পথ চেয়ে রয়েছে।

নারকুণ্ডা জাহাজ, ১৩৩৬

মিলানোতে মিলন

কথা ছিল, মিলানোতে আমাদের দেখা হবে। বন্ধু আসবেন ভিয়েনা থেকে। আমি যাবো লণ্ডন থেকে। মিলানো ইটালীর সবচেয়ে বড় শহর, সেখানে আমরা কেউ কোনো দিন যাইনি, তবে কেমন করে দেখা হবে বলো তো? ছোট শহর হ'লে রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দেখা হতো, কিংবা কোন একটা গির্জেতে।

বন্ধু লিখেছেন, মিলানোর হোটেলগুলোর নাম তুমিও জানো না আমিও জানিনে। কিন্তু স্টেশনে নিশ্চয়ই রেস্তোরাঁ থাকবে। সেই রেস্তোরাঁতে অমুক তারিখের সন্ধ্যায় আমি তোমাকে খুঁজবো, তুমিও আমাকে খুঁজবে। কেমন?

আমি ভাবছি, বাঃ মিলানোতে যদি একই স্টেশনে লণ্ডনের গাড়ী ও ভিয়েনার গাড়ী না

দাঁড়ায়! কাশীর গাড়ী ও ঢাকার গাড়ী কি কলকাতার একই স্টেশনে দাঁড়ায়? আর রেস্তোরাঁতে দেখা হবার কথা যে লিখেছেন, ধরো, যদি আমি দুপুর বেলা পৌঁছাই আর তিনি পৌঁছান রাত্রি দশটায়, তবে কি আমি আট ঘণ্টা রেস্তোরাঁতে বসে থাকবো না কি? আর নেহাৎই যদি তিনি ট্রেন ফেল করেন তবে রেস্তোরাঁতে ঘুমুতে দেবে না কিন্তু। এদিকে আমি ইটালিয়ান ভাষায় বিদ্যাসাগর। এত বড় পণ্ডিত যে, নিজের মতো পণ্ডিত ছাড়া যার-তার সঙ্গে কথা বললে মান যায়। ইতর-সাধারণের সঙ্গে আমি ইংরেজীতেই কথা কইব স্থির করেছি।

বন্ধুকে চিঠি লেখবার সময় ছিল না। টাইম-টেবল দেখে 'তার' করে দিলুম। মিলানোতে পৌঁছাবো সন্ধ্যা ছ'টায়।

তারপরে লণ্ডনে সেই আমার শেষ দিন। বন্ধু-বান্ধবের কাছে বিদায় নিতে নিতে ও বাজার করতে করতে এত দেরি হলো যে বাধ্য হয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশন পর্যন্ত ট্যাক্সি করতে হোলো। ট্যাক্সিতে বসে টাইম-টেবলটা আরেকবার উল্টে দেখছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, আছে, আরো একটা ট্রেন আছে। সেটা ছাড়ে তিন ঘণ্টা পরে, পৌঁছোয় তিন ঘণ্টা আগে, কিন্তু যায় অন্য একটা লাইন দিয়ে।

তখন স্টেশনের Enquiry Office-এ গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ ট্রেনটা যদি হারাই তবে অন্যটাতে জায়গা পাবো কি না। ওরা বললে, নিশ্চয়। আমি বললুম, ওটা এত ভালো ট্রেন যে ওতে সকলেই যাবে, আগে জানলে রিজার্ভ করতুম। ওরা বললে, ভয় নেই। আজকাল খুব বেশী লোক ইটালী যাচ্ছে না।

ভীষণ খিদে পেয়েছিল, লাঞ্চ খাবার সময় হয়নি। স্টেশনের রেস্তোরাঁতে গিয়ে ঢুকলুম। এদিকে আমার কোনো কোনো বন্ধু প্ল্যাটফর্মে আমাকে বিদায় দিতে আসবে, কথা ছিল। সেই জন্যে খুব তাড়াতাড়ি যা পাওয়া গেল তাই খেয়ে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে ছুটলুম। কেননা যে ট্রেনে আমার যাবার কথা সে-ট্রেন ছেড়ে গেলে ওরাও নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে, ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে এমন সময় হাঁফাতে হাঁফাতে আমি হাজির! ওরা আমার সুটকেস হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে চায়—বোধ করি আমাকেও চ্যাংদোলা করে ট্রেনে চাপিয়ে দেবে, এমন সময় আমি বললুম, বন্ধুগণ, দু'ঘণ্টা পরে একটা উঁচুদরের ট্রেন আছে, সেইটাতেই আমি যাবো। ওরা তো চটে লাল! বললে, তোমার জন্যে আমরা ততক্ষণ ঘাস কাটি আর কী! আমি বললুম, তোমরা তো বেশ বন্ধু হে! একটা লোক লণ্ডন থেকে ইটালী হ'য়ে ভারতবর্ষে চলে যাচ্ছে, তোমরা ভাবছ গেলে বালাই যায়, না?

ওরা ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললে, তোমার জন্যে আমাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়নি, কলেজে যাওয়া হয়নি—এমনি কত কথা। আমি বললুম, এসো তোমাদের খাওয়াই আগে। ওরা খেল, কিন্তু আমার খরচে না। আমি বললুম, ভগবান যখন তোমাদের সুমতি দিয়েছেন তখন আমি পীড়াপীড়ি করবো না। আমার পকেট খালি। মিলানোতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা যদি কাল না হয় তবে টাকার জন্যে একটা তার করবার সঙ্গতিও আমার থাকবে না।

ওদের কেউ কেউ দয়া করে আমাকে খুচরো দু'-তিনটে পাউণ্ড ধার দিলে। আমি ওদের নামে চেক লিখে দিলুম। বললুম, চেক এখন ভাঙাতে গেলে ব্যাঙ্কে তোমাদের গলাধাক্কা দেবে। কেননা ব্যাঙ্কে আমার টাকা জমতে আরো সাত-আট দিন দেরি। তখন যেয়ো।

ওরা বললে, এসো তাস খেলা যাক। আমি বললুম, বহুৎ খুব। কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ওয়েটিং-রুমটা যে এমন বাজে তা কি কেউ ভাবতে পেরেছে? টেবিল আছে বিরাট একটা। চেয়ার মাত্র গোটাকয়েক, সেও পরের দখলে। তাস খেলা হলো না। তখন একজন বন্ধুকে বললুম, এসো,

আমার কয়েকটা জিনিস কেনবার আছে, কিনে দাও।

চারটের সময় ট্রেনে বসিয়ে দিয়ে বন্ধুরা হাঁফ ছাড়লে। ঘন ঘন রুমাল নাড়তে নাড়তে দু'পক্ষের বিদায়! ট্রেন সোঁ সোঁ করে ছুটে চলল। ভাবলুম, লণ্ডন ছেড়ে যাচ্ছি হয়তো চিরকালের মতো। লণ্ডনের জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলি। কিন্তু মনের ওপর পাষাণের মতো চেপে রয়েছে মিলানোতে মিলনের চিন্তা। সেই ভীষণ চিন্তা আমার সকল চিন্তা চাপা দিলে। কখন যে Dover এসে পড়ল খেয়ালই ছিল না।

আমার কামরাতে মোটে একটি সহযাত্রী। তিনি বললেন, এরোপ্লেনে গেলে আমার গা-বমি-বমি করে, সেই জন্যে আমি স্টীমারে চ্যানেল পার হবো। আর স্টীমারে চ্যানেল পার হ'লে আমার স্ত্রীর গা-বমি-বমি করে, সেই জন্যে তিনি লণ্ডন থেকে প্যারিস এরোপ্লেনে যাচ্ছেন।

ডোভারে ট্রেন থেকে নেমে তিনি ও আমি ভিড়ের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলুম। স্টীমারে আমার প্রায়ই গা-বমি-বমি করে। এবার করলো না। সমুদ্র এবার খুব ঠাণ্ডা ছিল। আমি ভাবলুম, ইংলণ্ড আমাকে স্নেহের সঙ্গে বিদায় দিচ্ছে।

ক্যালেতে দু'টো ট্রেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একজন কর্মচারী জিজ্ঞাসা করল, কোন ট্রেন খুঁজছেন? আমি বললুম Bale-এর ট্রেন। সে দেখিয়ে দিল। Douane (Customs House)-এর ভিতর দিয়ে যেতে হলো না এবার। আমি খুশি হয়ে খুব তাড়াতাড়ি একটা জায়গা দখল ক'রে বসলুম। আগের বারে একটু দেরি করে পস্তাতে হয়েছে।

এবার আমাদের বরাত ভালো—এক বুড়ী এসে হাকলে, রাতের কম্বল? রাতের বালিশ? আমার সঙ্গে বিছানা ছিল না। কারুব সঙ্গে থাকে না। আমি বললুম, দাও। বুড়ী দু'শিলিং আদায় করলে। আমি কতকটা দিলদরিয়া মেজাজেই ছিলুম। আগের বারগুলোতে অনেক খোঁজ করেও কম্বল-বালিশ পাইনি।

আমার কামরায় আরো দু'টি কি তিনটি মানুষ ছিল। অন্যান্য কামরা খালি যাচ্ছে খবর পেয়ে তারা সকলেই আমাকে ছাড়লে, কেবল একজন ছাড়া। সেও যাচ্ছিল মিলানো—ইংরাজীতে যাকে বলে Milan।

দু'জনে দুটো বার্থ দখল করে পা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজলুম। তখন ট্রেন Laon ছুঁয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য ট্রেন Paris ছুঁয়ে যায়। যে ট্রেনটাতে আমার যাবার কথা ছিল, সেটাও Paris ছুঁয়ে যেতো। সেটা ইটালীতে ঢুকতো Mont Cenis দিয়ে। ইটালীতে ঢোকবার আরো অনেকগুলো রাস্তা আছে। একটা Ventimiglia দিয়ে। একটা Como দিয়ে। আমরা যাবো Domodossola দিয়ে। এগুলো হলো লণ্ডন থেকে যারা যায় তাদের ঢোকবার রাস্তা আর যারা ভিয়েনা থেকে যায় তারা ঢোকে Brenner Pass দিয়ে কিংবা Tarvisio দিয়ে কিংবা Trieste-এর কাছ দিয়ে। প্রত্যেকটা রাস্তাই সুন্দর।

ভোর হলো Bale-এ। তারপরে এলো Berne। সেখান থেকে শুরু হলো Bernese Oberland—পাহাড়ের দেশ। অনেকগুলো সুড়ং। কোনোটার ভিতর দিয়ে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে, কোনোটাতে এক মিনিটের কম।

রাত্রে কিছু খাইনি। সকালে সুইটজারল্যাণ্ডের ধরনের ব্রেক্‌ফাস্ট খেলুম। বেলা বারোটায় ইটালীর ধরনের লাঞ্চ। Domodossola-য় ইটালীর আরম্ভ। আমাদের দেশের মতো উজ্জ্বল উত্তপ্ত রৌদ্রকে স্নিগ্ধ করছিল পাহাড়, ঝর্ণা ও তরুবীথি। Stresa-র কাছে Maggiore হ্রদের দ্বীপগুলিতে কত লোক বাড়ী করে বাগান করে বাস করছে। তারা কী সুখী!

আমাদের কামরায় দু-একজন ইটালীয় উঠল। কিন্তু তাদের সঙ্গে আলাপ করা আমার বিদ্যেয়

কুলোল না। আমার সহযাত্রী ইংরেজটি আরো বিদ্বান। আসছে ম্যান্‌চেস্টার না লিভারপুল থেকে ব্যবসা-সংক্রান্ত কারণে। মিলানোতে কে একজন তাকে নিতে আসবে। পথঘাট, ভাষা ও হোটেলের নাম জানে না।

পৌনে-তিনটের সময় ট্রেন দাঁড়ালো মিলানোর সেন্ট্রাল স্টেশনে। কখন টিকিট দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়লুম। সুটকেসটা হাতে করে বেড়ানো যায় না। সেই জন্যে সেটাকে স্টেশনে Cloak room-এ (যাকে এদেশে Lift Luggage Office বলে, সেইখানে) জমা দিয়ে একটা রসিদ নিলুম।

তারপর সাহসে ভর করে বেরিয়ে পড়লুম শহর দেখতে। সঙ্গে একখানা ছোট মানচিত্র ছিল শহরের। তাকেই গুরু করে পথ চিনতে চিনতে 'কুক'-এর দোকানে পৌঁছলুম। তারা আমার কাছ থেকে কিছু ইংরেজী মুদ্রা নিয়ে আমাকে ইটালীয় মুদ্রা দিলে। ইটালীয় মুদ্রার বিশেষ দরকার ছিল। ট্রেনে ইংরেজী মুদ্রাতেও কাজ চালানো যায়। কিন্তু ইটালীর দোকানে বা রেস্তোরাঁতে ইংরেজী মুদ্রা দিলে কেউ নেবে কেন? এমন কি প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কিনে বন্ধুকে খুঁজতে স্টেশনের ভিতর যাই যদি, তাহলেও ইটালীয় মুদ্রা লাগে। কাজেই কুকের দোকানে গিয়ে আমি খুব ভালো কাজ করেছি।

কুকের দোকান থেকে ডাকঘরে গেলুম। সেখানে হাত নেড়ে ও ফরাসীর সাহায্যে পোস্টকার্ড কিনে চিঠি লিখলুম লণ্ডনে। তারপর অনেক ঘুরে-ফিরে স্টেশনে পৌঁছলুম। পথে ক্যাথিড্রেলটাও চিনে রাখলুম। দু-একটা হোটেলও যে চোখে পড়ল না তা নয়। কিন্তু আমি না হয় ঘর নিলুম। তারপর বন্ধুকে যদি না দেখতে পাই তবে দু'জনার ঘরের দাম আমাকে দিতে হয়। আর বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে নিজের জন্যে ঘর নিয়েছি শুনলে তিনি ভাববেন, স্বার্থপর!

খিদে পেয়েছিল। স্টেশনের কাছে একটা কাফেতে গিয়ে কিছু কেক ও দুধ চাইলুম। কিন্তু ওরা ইংরেজীও বোঝে না, ফ্রেঞ্চও বোঝে না। তখন যে দু-একটা জার্মান কথা শিখেছিলুম তাই বলায় কতকটা ঠাহর করল।

স্টেশনে ফিরে যেখানে টাইম-টেবল আঁটা থাকে সেখানে গিয়ে ভিয়েনার ট্রেন কখন পৌঁছায় তাই খুঁজতে লাগলুম। ইউরোপের একটা মস্ত সুবিধা এই যে রাশিয়ান ছাড়া অন্য সব ভাষার হরফ একই রকম। কাজেই ইটালিয়ান নামগুলো পড়তে কিছুমাত্র কষ্ট হলো না—কষ্ট হতো তামিল কিংবা গুজরাটী পড়তে।

আমি ধরে নিয়েছিলুম, আমার বন্ধু Brenner Pass-এর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পার্বত্য পথ দিয়ে আসবেন, Verona-তে চেঞ্জ করে। সাড়ে ছ'টায় একটা ট্রেন ছিল। সেইটের জন্যে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট কিনতে গেলুম। কিন্তু প্ল্যাটফর্মকে ইটালিয়ান ভাষায় কী বলে জানতুম না। কাজেই টিকিট উইণ্ডোতে না গিয়ে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট সাধারণতঃ যে যন্ত্রে থাকে সেই রকম একটা যন্ত্রে মুদ্রা ফেললুম। তাতে উঠল কিন্তু টিকিট নয়, চকোলেট।

তখন আমি প্ল্যাটফর্মের প্রবেশ-দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। নজর রাখলুম যারা প্ল্যাটফর্মে ঢুকতে পাচ্ছে তারা কোত্থেকে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট সংগ্রহ করছে। অল্প সময়ের মধ্যে ধরে ফেললুম তারা প্ল্যাটফর্মের অদূরস্থিত একটা যন্ত্রে বিশেষ মুদ্রা ফেলছে। সেই মুদ্রার একটি ছিল আমার কাছে। সেইটি ফেলে প্ল্যাটফর্ম-টিকিট পেলুম।

প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার আগে একবার ওয়েটিং-রুমগুলো ভালো করে দেখলুম। যদি বন্ধু ইতিমধ্যেই এসে থাকেন। তারপরে মনে হলো, যদি বন্ধু আজ আসবেন না বলে তার করে থাকেন আমাকে এই স্টেশনের ঠিকানায়? অসম্ভব নয়—কেন না Brenner Pass-এর লাইনে ঠিক সময় কনেক্‌শন পাওয়া যায় না। ট্রেন ফেল করা সহজ।

তখন গেলুম Enquiry Office-এ। ইংরেজীতে বললুম, আমার নামে কোন টেলিগ্রাম আছে?

যে ছোকরাটি ছিল সে ইংরেজী বোঝে না। বললে ফ্রেঞ্চ জানেন? ফ্রেঞ্চে যা বললুম তার অর্থ অন্য রকম। সে বললে, এটা টেলিগ্রাফ অফিস নয়; তার করতে চান তো বাইরে গিয়ে করতে হবে। আমিও নড়ি না, সেও বোঝে না। তখন হঠাৎ আমার কোটের পকেটে ইটালিয়ান Word Book-খানা আবিষ্কার করলুম। সেইখানা তার সামনে খুলে ধরলুম। তখন সে একটা লোককে খবর নিতে বললে—সে লোকটা নাকি ইংরেজি জানে। কিন্তু ও হরি! সেও দু'টো কথার বেশী জানে না। সে আমাকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল। তখন তার মনে পড়ল, স্টেশনে একটি হোটেলের লোক ইংরেজী বোঝে।

সে বললে, কী স্যার? কী ব্যাপার? আমি যেন বন্ধু পেয়ে গেলুম। বললুম, আমার নামে যদি কোনো টেলিগ্রাম এসে থাকে খবর নিতে চাই। সে বললে, আপনার পাস্‌পোর্টখানা আমার হাতে দিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।

টেলিগ্রাফ অফিসে কত লোকের নামে টেলিগ্রাম ছিল, কিন্তু আমার নামে ছিল না।

তখন সেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হলো। সে বললে, আমাদের হোটেলে উঠবেন? বললুম, কী রকম দর? সে বললে, বেশী নয়, আঠারো লিরা। লিরা যে এক শিলিঙের চার ভাগের এক ভাগ—একথা আমার মনে এলো না। একরাত্রি থাকবো, তার জন্যে আঠারো শিলিং চায়। বললুম, খাবার সমেত? সে হেসে বললে, তা কী করে হবে? তখন তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, দেখ, আমার বন্ধুকে আনতে প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি। তিনি যা বিবেচনা করবেন তাই হবে।

এবার প্ল্যাটফর্মের টিকিট দিতে গিয়ে দেখি, একই টিকিটে দু'বার ঢুকতে দেয় না। নতুন টিকিট কেনবার মতো খুচরো মুদ্রা ছিল না। নোট ভাঙাতে হবে। তখন আবার সেই মানুষটির শরণাপন্ন হলুম।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে পায়চারি করছি, এমন সময় পকেট হাতড়ে দেখি, সুটকেসের রসিদটা গেছে হারিয়ে। মাথায় বাজ পড়ল। সুটকেস ফিরে পাবো না, বন্ধুও আসবেন না, রাত্রে হোটেল যদি-বা পাই আঠারো শিলিং দিয়ে—শোবো কী পরে?

কাঁদো-কাঁদো হয়ে পায়চারি করতে লাগলুম। ট্রেন কিছু বিলম্ব করে এলো। একবার চোখ বুলিয়ে গেলুম—কেউ নেই। হতাশ হয়ে প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে যাচ্ছি—দূরে কে আসছে ও? বন্ধু?

ছুটে গিয়ে আশ্চর্য হবার সময় না নিয়ে কাঁধে হাত রাখলুম। বললুম, বন্ধু, আগে আমাকে বাঁচাও। আমার সুটকেসের রসিদ গেছে হারিয়ে।

বন্ধু কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনিও রাত জেগে চব্বিশ ঘণ্টা এক ট্রেনে বসেছিলেন। এসেছেন Brenner Pass দিয়ে না, Tarvisio ও Venice দিয়ে। ভয়ানক ক্লান্ত।

তারপর সুটকেশ কেমন করে উদ্ধার করা গেল সে অনেক ব্যাপার। হোটেলের সেই মানুষটি সাহায্য করেছিল। তার হোটেলে উঠলুম—ততক্ষণে বুঝেছি সাড়ে চার শিলিং বাস্তবিক বেশী ভাড়া নয়। রাত্রে খেয়ে দাম দেবার সময় পকেট হাতড়ে দেখি—সুটকেসের রসিদ।

১৩৩৭

দেশে

আমার জাহাজ যখন বম্বের ব্যালার্ড পীয়ারে ভিড়ল তখনো আমি ঘুমিয়ে। উত্তেজনায় অর্ধেক রাত ঘুম হয়নি। যেই ভোর হয়েছে অমনি স্টুয়ার্ড এসে জাগিয়ে দিয়ে বললে, বম্বে এসেছে। ক্যাবিনের পোর্টহোল দিয়ে দেখলুম নানা রঙের কাপড়-পরা দেদার লোক জাহাজ থেকে ডাক নামাচ্ছে আর বিষম গোলমাল করছে। এতকাল পরে দেশের মাটি দেখে যদি বা আনন্দ হলো, দেশের লোকের মুখরতা যেন আমার কান মলে দিলে।

পনেরো দিন জাহাজে বন্দী থেকে পা দিয়ে ভূঁই ছুঁইনি। জাহাজ থেকে প্রাতরাশ সেরে যেই নেমেছি, ইচ্ছা করল বুনো হরিণের মতো আগে খানিকটা দৌড়াদৌড়ি করি। বরাত এমনি মন্দ যে আমার সবচেয়ে বড় ট্রাঙ্কটাকে নীচে নামাতে বলেছিলুম, তাকে নীচে খুঁজে পেলুম না। তাই বারংবার জাহাজের উপর-তল করতে করতে একটা ম্যারাথন দৌড় হয়ে গেল।

একজন বন্ধু আমাকে নিতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গিয়ে বললেন, এবার বাঙালী-বাবুটি সেজে কলতলায় স্নান করে এসো।

খালি পায় আর খালি গায় এমন আরাম লাগছিল স্নান করে উঠে! ঠাণ্ডা লাগবার ভয় একটুও ছিল না ইউরোপের মতন। বন্ধু ডাল-ভাত-মাছের ঝোল-দই-সন্দেশ-রসগোল্লা ইত্যাদির আয়োজন করেছিলেন। আমি লোভ সংবরণ না করতে পেরে খুব কম করেই খেলুম, কিন্তু তার পরিণাম যে কী হবে তা অনুমান করতে পারিনি। বিদেশী খাবার খেতে খেতে পেটটা যে বিদেশী হয়ে গেছে তা কেই বা মনে রেখেছিল।

একদিন বম্বেতে থেকে পদে পদে ভারতবর্ষকে ভালো মনে হতে লাগল। এমন শান্তি কোথায়! পশুপাখী মানুষের সঙ্গে নির্ভয়ে বাস করছে, ছাগলছানা আর মানবশিশু গাছতলাতে এক সঙ্গে শোয়াবসা করছে— এ কি ইউরোপে দেখবার জো ছিল! কেমন গভীর মৃদুগতি নম্র মেয়েগুলি, কত রকমের পাগড়ি বাঁধা মারাঠা, গুজরাতী, কাবুলী, মাদ্রাজী, পারসী, মাড়োয়ারী ইত্যাদি পুরুষ! এত জাতের মানুষকে নিজের ছেলে বলবার অধিকার ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের আছে! দেশের সব কিছু আমার মিষ্টি লাগছিল। আমাদের গোরুগুলি যেন আরেকটা জাতের জীব। ইউরোপের গোরুর থেকে এত আলাদা রকম এদের ভাবময় চাউনি, এদের মানুষের সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার, এদের ক্ষুদে ক্ষুদে গড়ন। ইউরোপের গোরুগুলো রাক্ষুসে জানোয়ার। মানুষের সঙ্গে ওদের এমন মৈত্রী নেই বলেই ওদের মাংস খেতে মনে লাগে না।

ট্রেনে উঠে কলিক আরম্ভ হলো। সারা রাত সারা দিন পেটের ভিতর সমুদ্র-মন্থন চলল। জানালা দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখে তৃপ্তি হচ্ছিল না। মাঠ, পাহাড়, চেনা গাছ, গোরুর গাড়ী, কৃষাণ, সন্ন্যাসী, গরম চা-ওয়ালা, প্রচুর রৌদ্র, তারাময় রাত, হিন্দী গান, ওড়িয়া কথা, বাংলার ধানভরা ক্ষেত, কলকাতা।

তারপর মুখ দিয়ে বেফাঁস ইংরেজী বুলি বেরিয়ে যায়। পায়ে পা লেগে গেলে 'সরি' বলে ফেলি। কিছু একটা চাইতে গেলে 'এক্সকিউজ্ মি' ও পেলে 'থ্যাঙ্ক ইউ'। কিন্তু দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে গেল। বাবার সঙ্গে খাবার সময় ছুরিকাঁটার অভাবে হাত সুড়সুড় করছিল না এবং জল দিয়ে হাতমুখ ধোবার সময় অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল না। কেবল কষ্ট হচ্ছিল মেজের উপর আসন পেতে বসতে।

এখন ইউরোপকে মনে পড়ে কি না? খুব মনে পড়ে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে ফিরে যাই।

এবার তো পথঘাট জানি। ক'দিনেরই বা পথ! Cook-এর দোকানে টিকিট কিনে কলকাতা থেকে বম্বে, বম্বে থেকে মার্সেল্‌স্, মার্সেল্‌স্ থেকে যেখানে খুশি। পৃথিবীটা ছোট মনে হচ্ছে। সব যেন নখদর্পণে।

এখন মনে হচ্ছে ইউরোপে গিয়ে আর য়্যাড্‌ভেঞ্চার নেই। য়্যাড্‌ভেঞ্চার আমার এই জেলায়। এখানে কথায় কথায় ট্রেন, ট্যাক্‌সি, বাস পাওয়া যায় না, এমন রাস্তাও আছে যাতে সাইকেল চলে না, এমন জায়গাও আছে যেখানে গোরুর গাড়ীও যায় না। পায়ে হাঁটার মতো য়্যাড্‌ভেঞ্চার এ যুগে আর কী আছে!

আমার ঘরের সামনে একটা চতুষ্কোণ মাঠ। তাতে গোরু, বাছুর, ছাগল, ছাগলছানা, গাধা ও ভেড়ার ভিড। শালিক, টিয়া, কাক, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, ফিঙে, চড়ুই, মুরগী, চিল, দিন-রাত কাছে কাছে ঘুরছে ও গলা সাধছে। অসংখ্য ফুল ও আমের মুকুল এমন সুগন্ধ দেয় যা ইউরোপে কখনো পাইনি। 'যে যায় সে গান গেয়ে যায়' আমার ঘরের পালের রাস্তায়। সুখে আছি।

তবু ইউরোপের জন্যে মন কেমন করে। ওখানে যে আমার কত প্রিয়জন আছে!

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩৬

—

জাপানে

॥ এক ॥

কিয়োতোর উপকণ্ঠে উদ্যানবেষ্টিত তেনরিয়ুজি মন্দির। সার বেঁধে আসন পেতে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসেছি আমরা নানান দেশের শ' দুই লেখকলেখিকা। ভোজ নয় তো ভোজবাজি। সৌন্দর্যের ভোজ। সবাই আমরা অভিভূত।

আমার দক্ষিণ পার্শ্ববর্তিনী পাকিস্তানী লেখিকা তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী ফরাসী লেখকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। লেখক তথা বৈজ্ঞানিক। মধ্যবয়সী। গম্ভীর। জানতে চাইলুম জাপান কেমন লাগছে। সাধারণ শিষ্টাচারী প্রশ্ন। প্রত্যাশা করিনি অসাধারণ কোনো উত্তর। কিন্তু উত্তর যা পেলুম তা চমকে দেবার মতো।

ভদ্রলোক মুখ বাড়িয়ে আমার চোখে চোখ রাখলেন। আবেগে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়েছিল। বন্দী স্বরকে মুক্ত করে উচ্ছ্বসিত ইংরেজীতে বললেন, 'I don't know why I have been wasting my life in Paris. It is so stupid.'

তার পর শেষের শব্দটির উপর ঝোঁক দিয়ে আবার বললেন, 'সো স্টুপিড।'

শুনুন কথা! এ কালের কামরূপ যে প্যারিস, যেখানে যাবার জন্যে দুনিয়ার লোক সতৃষ্ণ, সেই প্যারিসের ভাগ্যবানকেও জাদু করেছে জাপান। আমি তো তাঁর মতো কপাল নিয়ে জন্মাইনি। কী আর কহিব আমি!

আমারও চোখে মায়াকাজল লেগেছে। তা বলে আমি আবেগভরে বলব না যে জাপানে না থেকে আমার জীবন অপচয় করছি। এই আট ন' দিনে আরো অনেকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি যে প্রতীচ্যতমের উপর প্রাচ্যতমের আকর্ষণ তীব্রতম। এক কালে তো পশ্চিমের লোকের ধারণা ছিল নীতির দিক দিয়ে নিপ্পন নাকি ইউরোপের য়্যান্টিপোডিস। ভলতেয়ার সে ধারণা খণ্ডন করলেও এখনো সেটা নির্মূল হয়নি।

তা ছাড়া যার চোখ আছে তার চোখে পড়বেই জাপান হচ্ছে সৌন্দর্যের দেশ। সৌন্দর্যের সাক্ষ্য অশনে বসনে আসনে বাসনে গৃহসজ্জায় গৃহনির্মাণে পথে ঘাটে দোকানে পসারে উদ্যানে উপবনে পাহাড়ে হ্রদে নিসর্গে। জাপানীদের সৌন্দর্যসাধনা কেবল চারুকলায় ও কারুকলায় নিবদ্ধ নয়। সেইজন্যে কলাবতীর দেশ না বলে সৌন্দর্যের দেশ বললুম।

তবে এ কথাও ঠিক যে প্রতীচ্যের অঞ্জনরঞ্জিত নেত্রে প্রাচ্যের এই সুচিরলুক্কায়িত দ্বীপপুঞ্জ কলাবতীর দেশই বটে। গেইশা শব্দের আক্ষরিক অর্থ কলাবতী। কলাবিদ্যাধরী। সে কালের রেশ এ কালেও পুরো মিলিয়ে যায়নি।

এই কলাবতীর দেশে ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছি আমরা ভিন দেশের সাহিত্যকলাবন্ত আর প্রথমে ঠেকেছি তোকিয়োর বিমানঘাটে। তার সাত আট দিন পরে কিয়োতো স্টেশনে। গোড়ায় আমাদের সংখ্যা ছিল এক শ' ছেষট্টি জন পরদেশী, তার সঙ্গে এক শ' তিরাশি জন জাপানী। সবসুদ্ধ প্রায় সাড়ে তিন শ' প্রতিনিধি নিয়ে আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. কংগ্রেস। আহ্বায়ক জাপানের পি. ই. এন. ক্লাব। এর আগে ইউরোপে ও আমেরিকায় বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছে যুদ্ধের সময়টা বাদ দিয়ে

আটাশ বার। এটা হলো ঊনত্রিংশ অধিবেশন। এশিয়ায় প্রথম।

পরদেশীদের মধ্যে সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী ফরাসীরা। ছেচল্লিশ জন। তার পর মার্কিনরা। আঠারো জন। তার পর ইংরেজরা। তেরো জন। তার পর আমরা ভারতীয়রা। ন'জন। কোরীয়রাও ন'জন। অন্যান্যদের সংখ্যা আরো কম। পাকিস্তান থেকে তিন জনের আসার কথা ছিল। এসেছেন দু'জন। তাঁদের একজন বাঙালী মুসলমান। বাঙালী হিসাবে আমার দোসর। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত যোগ দিয়ে তাঁদের দুইকে তিন করলেন। অতএব বলা যেতে পারে ভারতপাকিস্তান উপমহাদেশ থেকে আমরা বারো জন।

ফরাসীরা কেবল যে দলে ভারী তাই নয়, আমাদের সভাপতি স্বয়ং ফরাসী আকাদেমির সদস্য আঁদ্রে শাঁসঁ (Andre' Chamson)। ইনি মিস্ত্রালের প্রদেশ প্রোভাঁসের সন্তান। কবিতা লেখেন স্বভাষায়। উপন্যাস লেখেন ফরাসীতে। দৈবাৎ বেলজিয়ামের একখানি কবিতাপত্রিকায় এঁর ফোটো দেখেছিলুম জাপান যাত্রার মুখে। তাই চিনতে পারলুম মানুষটিকে যেই দেখলুম ইম্পিরিয়াল হোটেলের লবিতে। বললেন, 'এইমাত্র এসে পৌঁছেছি। এখনো মাথা ঘুরছে। সব কিছু ঘুরছে।'

ওঁরা ফরাসীরা আকাশ থেকে নামলেন আমাদের পরের দিন তোকিয়োর হানেদা বিমানবন্দরে। আস্ত একখানা বিমান চার্টাব করে এলেন ওঁরা। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন অন্য কোনো কোনো দেশের প্রতিনিধিদের। ফরাসীদের এক রাত আগে এসে আমরা ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছিলুম। আমার তো আশঙ্কা ছিল সী সিকনেসের মতো এয়ার সিকনেস হবে। হলো না। শুনেছিলুম কানে তালা লাগবে। লাগল না। পথে টাইফুন আসবে। এলো না। এয়ার পকেটে পড়ে বিমান হাজার হাজার ফুট নামবে আর উঠবে। নামল আর উঠল এক বার কি দু'বার।—কলকাতা থেকে তোকিয়ো চার হাজার মাইল আকাশ পথ সাড়ে সতেরো ঘণ্টায় পার হলুম। যেন ভেসে গেলুম নিস্তরঙ্গ স্রোতে। সাধারণত বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের সুপারকনস্টেলেশন। ভারতের পয়লা নম্বর পাইলট। নাম শুনেই ভয় ভেঙে যায়। গিলডার একটি মনে রাখবার মতো নাম। পার্শী। শুনেছি মন্ত্রীপুত্র। মন্ত্রীপুত্র না হলে রাজপুত্রদের কলাবতীর দেশে ভেলায় করে নিয়ে যাবে কে!

শরমের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে এরোপ্লেনে উড়তে আমার ভয় করত। না করবেই বা কেন? কথায় কথায় দুর্ঘটনা। আমি যেদিন দমদম থেকে উড়ি সেই দিনই সিউড়ির কাছে কোথায় দুর্ঘটনা ঘটে আর আমি সে খবর শুনেই বিমানে উঠি। তার দু'দিন কি তিন দিন পরে দমদম বিমানঘাটেই ঠায় বসে দু' দু'জন আরোহী প্রাণ হারান। আন্তর্জাতিক পেন কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান ও কলাবতীর দেশে ভেলায় চড়ে ভেসে যাবার ভেসে আসবার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য তাই আমাকে উল্লসিত বা উদ্যত করেনি। তা ছাড়া আমার নিয়ম নয় হাতের কাজ ফেলে রেখে কোনো কিছু গ্রহণ করা। তা সে যত বড় সম্মান বা সুযোগ হোক না কেন। 'রত্ন ও শ্রীমতী' মাঝখানে অসমাপ্ত রেখে স্বর্গে যেতেও আমার ঈপ্সা ছিল না। তাই জাপানের মতো ভূস্বর্গে যাবার নিখরচার নিমন্ত্রণ নিতেও কুণ্ঠিত হয়েছি।

তবু যেতে হলো সোফিয়া ওয়াডিয়ার টানে ও লীলা রায়ের ঠেলায়। লীলা রায়ের মতে এরোপ্লেনে না উঠলে আমার এরোপ্লেনে ওড়ার ভয় ভাঙবে না। তাঁর সে ভয় ছেলেবেলা থেকে নেই। আমার কেন থাকবে? ভেবে দেখলুম স্ত্রীর চোখে কাপুরুষ কিংবা না-পুরুষ হওয়া ভালো নয়। তার চেয়ে আসমানে ওড়া শ্রেয়। আর সোফিয়া ওয়াডিয়ার মতে আমাকে বাদ দিয়ে প্রতিনিধিমণ্ডলী পূর্ণ করা যায় না। এটা হয়তো তাঁর অন্ধবিশ্বাস। বিশ বছরের উপর একসঙ্গে পেন ক্লাবের কাজ করে আসছি। সুতরাং মায়া মমতাও হতে পারে। মনকে বোঝালুম সোফিয়া ওয়াডিয়া ও কমলা

ডোঙ্গরকেরী অত দূর দেশে যাচ্ছেন। তাঁদের একজন এস্‌কর্ট চাই। নিয়তিও বোধ হয় এই চায়। পরে বোঝা গেল নিয়তি কী চেয়েছিল। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আসল কথা 'রত্ন ও শ্রীমতী'র তৃতীয় ভাগ নিয়ে এমন সমস্যায় পড়েছিলুম যার সমাধান তিন মাস ভেবেচিন্তেও পাইনি। এক এক সময় মনে হচ্ছিল দিই ঘোষণা করে যে দ্বিতীয় ভাগেই সমাপ্তি। এ রকম একটা সন্ধিক্ষণে জাপানযাত্রার নিমন্ত্রণ হয়তো বিধাতার ইঙ্গিত। জীবনের আরো কয়েকটা মাস ও ভাবে মাটি না করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করা সঙ্গত। লেখার পক্ষে দেখাও তো দরকারী। ত্রিশ বছর আগে সেই যে ইউরোপে যাই তার পর ভারতের বাইরে আর কোথাও পা দিইনি। সিংহল বাদ। অথচ বাল্যকাল থেকে বরাবর আমার বিশ্বাস দেশে দেশে আমার ঘর আছে, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয় আছে। একবার বেরোতে পারলেই হয়। জাতি বা বর্ণ, ভাষা বা ধর্ম, কিছুই আমার কাছে বাধা নয়। আমি যে কেবল ভারতের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছি তাই নয়, ধরিত্রীর কোলে জন্মেছি। জন্মস্বত্বে গোটা পৃথিবীটাই আমার আপনার। তাকে বুঝে নেব কী করে, যদি দেশান্তরে না যাই?

যখন মনঃস্থির করলুম যে যাব তখন কংগ্রেসে কী বলব তা ভাবতে ও লিখতে সময় দিলুম। পনেরো মিনিটের বক্তৃতা। তার জন্যে পনেরো দিনের খাটুনি। নইলে ভারতের আজকের দিনের মনের ছবি ঠিক ঠিক আঁকা যেত না। পেন কংগ্রেসের জন্যেই আমার জাপানযাত্রা। যার জন্যে যাওয়া তার জন্যে প্রস্তুতি আগে। তার পরে জাপানের জন্যে প্রস্তুতি। ফলে জাপানী ভাষা একেবারেই শেখা হলো না। সেটা সাংঘাতিক ক্রটি। ইংরাজী দিয়ে কাজ চলে যায় বটে, কিন্তু ভাব করা যায় না সকলের সঙ্গে। বিশেষত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। এমন কি অসাধারণদের সঙ্গেও।

হাতে যে'কটা দিন ছিল জাপান সম্বন্ধে পড়ে কাটিয়েছি। রাতের পর রাত জেগেছি। বেশীর ভাগ বই জোগাড় করে দিলেন শান্তিনিকেতনের জাপানী অধ্যাপক শিনিয়া কাসুগাই। আমার চেয়ে তাঁরই উৎসাহ বেশী। পেন কংগ্রেসের দশদিন পরে আমার দশহরা হবে এটা তিনি শুনতে নারাজ। আমাকে থাকতেই হবে আরো দশ দিন বা পুরো এক মাস। বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে না সে কথা শুনলেও তিনি মানবেন না। জাপানীরা আমার ভার নেবেন, আমাকে বক্তৃতার বিনিময়ে সম্মানী দেবেন। দেখলুম ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। এক মাসের ভিসা চাইলুম। কনসাল জেনারেল তাকানো মহাশয় দিলেন ছ'মাসের ভিসা। ওঁদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো ওঁরা আমাকে সহজে ফিরতে দেবেন না। দ্বিতীয় মাসের জন্যে একটা নিমন্ত্রণও এসে পৌঁছল। কী করে বলি যে অক্টোবরস্য ষষ্ঠ দিবসে কোনো বছরই আমি মেঘদূতের যক্ষ হতে রাজী হইনি! তার আগেই আমাকে রামগিরি থেকে অলকায় ফিরতে হবে। শান্তিনিকেতনের শিনিয়া কাসুগাই ও শোগো কোয়ানো মহাশয়রা আমার জন্যে প্রোগ্রাম তৈরি করতে বসলেন। কলকাতার দুই জাপানী প্রধান আমার খাতিরে চা পার্টি দিলেন।

বিদেশযাত্রাকে যথাসম্ভব অপ্রীতিকর করা এখনকার সরকারী রীতি। সে সব কথা সকলেই জানেন। কে না ভুক্তভোগী! যদি বাইরে গিয়ে থাকেন বা যেতে চেয়ে থাকেন। ভাগ্যক্রমে আমার পাশপোর্ট আগে থেকে করা ছিল। সেইজন্যে আমার ঝঞ্ঝাট অল্পের উপর দিয়ে গেল। তা হলেও শেষ দিনটি পর্যন্ত জানতুম না হাতে কত টাকা নিয়ে যাব। তার আগের দিন পর্যন্ত জানতুম না আমার টিকিট হয়েছে কি না। বিমানে স্থান পাব কি না। একটার পর একটা ভাবনা ঘুচল। না ঘুচলে খুব আফসোস করতুম না। বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচতুম যে যাওয়া হলো না। আমাকে সারা দিন এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে যাত্রার দিন আমি ভাববার অবকাশ পাইনি সত্যি যাওয়া হচ্ছে কি না। দমদমের পথে রওনা হয়ে লিণ্ডসে স্ট্রীটে পাওয়া গেল নতুন সুট। না গরম না ঠাণ্ডা। ও সুট না

পরলে আমি জাপানে কষ্ট পেতুম।

অগাস্টের শেষে কেউ জাপান যায় কখনো? যেতে হয় মে মাসে চেরিফুলের মরসুমে। অথবা অক্টোবর মাসে চন্দ্রমল্লিকার মরসুমে। মাঝখানের চার মাস চতুর্মাস্যা। আমাদের দেশেরই মতো বৃষ্টি বাদল। তার উপর টাইফুন। তা ছাড়া হপ্তায় হপ্তায় ভূমিকম্প তো আছেই। সেটা অবশ্য যে কোনো মাসে হতে পারে। 'ও কিছু নয়। একটু নড়ে চড়ে বসবেন।' আশ্বাস দিয়েছিলেন জাপানী বন্ধুরা। তবে টাইফুনের বেলা যা বলেছিলেন তাতে আশ্বাসের চেয়ে বিশ্বাস বেশী। একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারাই ত্রাণ পাওয়া যায়। নইলে আমাদের বিমানের সাধ্য কী যে চীন সাগরের টাইফুনের সঙ্গে কুস্তি লড়ে! নিরাপদে তোকিয়ো পৌছনোর পর ইম্পিরিয়াল হোটেলের ভূমিকম্পরোধী দালানে বসে নিশ্চিন্ত আরামে খবরের কাগজ খুলে দেখি টাইফুন রওনা হয়েছে। ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে গত বারের টাইফুনের নামকরণ হয়েছিল A দিয়ে। এবারকার টাইফুনের নামকরণ B দিয়ে। মেয়েলি নাম হওয়া চাই। তাই কাগজে লিখেছে 'Bess' আসছে। দিনের পর দিন ঐ আসছে। ঐ আসছে। তোকিয়োতে সাত দিন থেকে কিয়োতো যাই। সেই দিন ভাবগতিক দেখে মনে হলো, ওমা, এলো বুঝি! পরের দিন কাগজে দেখি এসে চলে গেল নামমাত্র বুড়ি ছুঁয়ে। কোথায় যেন ঘরবাড়ি উড়ে গেছে, মানুষ মারা গেছে। ভাগ্যিস আমাদের বিমান তার পথে পড়েনি।

বিমানের নাম 'রানী অফ ইন্দ্।' বম্বে থেকে এলেন সোফিয়া ওয়াডিয়া, কমলা ডোঙ্গরকেরী, ইংরেজী। তাঁদের সঙ্গে উমাশঙ্কর জোশী, গুজরাতী। বিনায়ক কৃষ্ণ গোকক (Gokak), কন্নাড। এম আর জম্বুনাথন, তামিল। কলকাতায় যোগ দিলুম আমি। আমার সঙ্গে কে আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ইংরেজী। ইউনেস্কো থেকে নিমন্ত্রিত। হংকং-এ উঠলেন সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন, হিন্দী। তোকিয়োতে অপেক্ষা করছিলেন প্রভাকর পাধ্যে, মরাঠী। এমনি করে আমরা হলুম ন'জন। আগে থেকে স্থির হয়েছিল দু'জনকে দেওয়া হবে সম্মানিত অতিথির মর্যাদা, দু'জনকে দেওয়া হবে অফিসিয়াল প্রতিনিধির মর্যাদা এবং অন্যান্য দেশের সম্মানিত অতিথি ও অফিসিয়াল প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র রাখা হবে ইম্পিরিয়াল হোটেলে। অবশিষ্টরা থাকবেন অবশিষ্টদের সঙ্গে দাই'ইচি হোটেলে ও শিবা পার্ক হোটেলে। সুতরাং তোকিয়োতে গিয়ে আমরা ছত্রভঙ্গ হলুম। একসঙ্গে রাত কাটানো শুধু আকাশপথে। পাশাপাশি আয়েঙ্গার ও আমি। সামনের সারিতে গোকক ও জম্বুনাথন। কয়েক সারি সামনে সোফিয়া ওয়াডিয়া ও কমলা ডোঙ্গরকেরী। যাতায়াতের পথ ছেড়ে দিয়ে সেই সারিতেই উমাশঙ্কর। সবাই আমরা টুরিস্ট। প্লেনে আরো অনেকে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মার্কিন মহিলা ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড। জাপান থেকে ইনি শান্তিনিকেতন হয়ে সিংহলে গেছলেন। কলকাতা হয়ে জাপানে ফিরছেন। এই আমাদের দ্বিতীয় দর্শন।

বিমানে উঠে আমি নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যের খবরদারি করছি দেখে তিনি ছুটে এলেন। আমাকে ধরে এনে বসিয়ে দিলেন আমার আসনে। চামড়ার পটি দিয়ে বাঁধলেন। প্লেন যখন ভূঁই ছেড়ে আসমানে হাউইয়ের মতো ওঠে তার আগে কিছুক্ষণ উটপাখীর মতো দৌড়য়। সেই অবসরে আপনার আসনের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে না বাঁধলে কে যে কার গায়ে ছিটকে পড়বে তার ঠিক নেই। ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড আমাকে শাসন না করলে সেদিন হয়তো আমি আচমকা বলের মতো লাফিয়ে হাত পা ভাঙতুম, শুধু নিজের নয় পরেরও। কিন্তু কেমন করে যে আমার ভয়ডর চলে গেল, প্লেন ষোল সতেরো হাজার ফুট উচ্চে স্থির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দেখা গেল ফরফর করে বেড়াতে। ভিতর থেকে বোঝবার উপায় নেই কত উর্ধ্বে আমরা। প্রেসারাইজ্ড প্লেন। মনে হচ্ছে যেন দমদমেই বসে আছি। কাঁপছে না, দুলছে না, টলছে না, চলছে কি চলছে না। উড়ছে যে সে বোধটাই নেই। অথচ তার গতিবেগ ঘণ্টায় আড়াই শ' মাইলের মতো। চার চারটে ইঞ্জিন মিলে

তাকে ঝড়ের মতো ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। ঝড়ের মতো গর্জন আসছে কানে। তাই তুলো গুঁজতে হচ্ছে। তা হলে আর গল্প করে সুখ নেই। রাত দশটার সময় কেই বা চাইবে গল্প করতে!

আর কাউকেই তেমন উৎসাহী পেলুম না যে আসমানে আড্ডা দিয়ে নিশিপালন করবে। ওটা কোজাগরী পূর্ণিমাও নয়, শিবরাত্রিও নয়। তা ছাড়া অমন করে টহল দিয়ে ফেরাটা সৎ দৃষ্টান্ত নয়। সবাই যদি অনুসরণ করে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য। ওটা জাহাজের ডেক নয়। ক্যাবিন। শান্ত হয়ে বসে বাইরে চেয়ে দেখলুম দমদমের লাল আলো নীল আলো কখন মিলিয়ে গেছে। মিটি মিটি শাদা আলো কলকাতা সূচনা করছে। আকাশেও মিটি মিটি তারা। বিরাট এক বিহঙ্গ পক্ষবিস্তার করে উড়ে চলেছে আকাশে। বহু দূরে বহু পেছনে বহু নিম্নে পড়ে আছে কলকাতা। কয়েক মিনিট পরে সেও হারিয়ে গেল আঁধারে। একটু একটু করে মনে পড়তে থাকল যাঁরা আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁদের এক এক জনকে। স্ত্রীকে আর ছোট ছেলেকে আর ছোট মেয়েকে ওরা ঢুকতে দিয়েছিল ভিতরে। কিন্তু বিমানের থেকে থাকতে বলেছিল তফাতে। তাদের দিকে শেষ চাউনি ফেলে হন হন করে যখন এগিয়ে গেলুম তখন ব্যথাবোধ আমার ছিল না। একটু একটু করে জাগল। দিনের পর দিন কেটে গেছে প্রস্তুতিতে। মাশুলঘর থেকে ছাড়া না পাওয়া তক ঝামেলার অন্ত হয়নি। একটার পর একটা বাধা এসেছে, আর মিটে গেছে অল্প আয়াসে। কিন্তু কল্পনা করেছি সব চেয়ে মন্দটা। কত খারাপ হতে পারে সেইটেই ভেবেছি। বৃথা ভেবেছি। অকৃপণ আনুকূল্য পেয়েছি অজানা অচেনার। মাশুলঘরেও আমার বন্ধুর অভাব হয়নি। আর যাঁরা কষ্ট করে দমদম অবধি এসেছিলেন তাঁদের প্রীতি আমার পাথেয়। দুর্গাদাসবাবু, গোপালদাসবাবু, কানাই, সাগর, সুরজিৎ এবং আরো কয়েকজন বান্ধব। তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

যে যার আসনটাকে পিছনে ঠেলে নামিয়ে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে শুলেন ও কম্বল মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা চাপলেন। এয়ারকণ্ডিশনড ক্যাবিন, তবু শীতের আমেজ ছিল। ইতিমধ্যে গরম জলে ভেজানো তোয়ালে দিয়ে গেছে, তা দিয়ে হাত মুখ মুছে সাফসুতরো হয়ে নেওয়া গেছে। জিব শুকিয়ে যাবে বলে চিবোতে দিয়েছে লবঙ্গ এলাচ দালচিনি লজেঞ্জ চিউয়িং গাম যার যা রুচি। কফি বা শীতল পানীয় দিয়েছে গলা ভিজিয়ে নিতে। আলো নিবিয়ে দিয়ে ঘরটা অন্ধকার করে নিদ্রার আয়োজন করা গেল। মনে হলো সকলেরই ঘুম এলো। এলো না শুধু আমার। নতুন জায়গায়, লোকজনের মেলায়, চলন্ত যানে, অবিরাম আওয়াজে এমনিতেই আমার ঘুম আসে না। রাত্রে স্নান না করলে কিছুতেই আসে না। প্লেনে তার উপায় ছিল না। অন্তত টুরিস্ট শ্রেণীতে। তা ছাড়া অর্ধশয়ান হয়ে নিদ্রিত হওয়া আমার তো অসাধ্য। পরের দিন শুনলুম ফ্রাঙ্গেস ক্যাসার্ড মেজের উপর চাদর পেতে শুয়েছিলেন। প্রথম সারির সামনে ততখানি জায়গা ছিল।

রাত তিনটের সময় ব্যাঙ্কক। প্লেন থেকে নামিয়ে দিল যারা নামতে চায় তাদেরকে। যারা নামতে চায় না তাদেরকেও। আমার তো সবে ঘুম লেগে আসছিল। লাগতে না লাগতে ভাঙল। বিমানবন্দরে তখন তেজালো আলোর রোশনাই। রাতকে দিন করেছে। পাশপোর্ট জমা দিয়ে রেস্টোরাণ্টে বসে চা খেয়ে পাশপোর্ট তুলে নিয়ে বেশ কিছু হাঁটাহাঁটি করে আবার ওঠা গেল বিমানে। হলো একরকম পরিবর্তন। বোধ হয় এর দরকার ছিল। আবার উটপাখীর দৌড়। ঈগলপাখীর উড়ন। আমাদের বন্ধন ও বন্ধনমোচন। বলতে ভুলে গেছি যে প্লেন যখন ব্যাঙ্ককে নামল ও থামল তখন আরেক দফা বাঁধন পরা ও বাঁধন খোলা হয়েছিল। ক্রমে এটা গা সওয়া হয়ে এলো। চেপে বসে থাকলেই যথেষ্ট হতো। চামড়ার পটি পড়ে থাকত। যাক, ব্যাঙ্কক ছেড়ে যে যার জায়গায় আবার ঘুম জুড়ে দিলেন। আমার ভাঙা ঘুম আর জোড়া লাগল না। মাঝখান থেকে আমার ঠাণ্ডা লেগে সর্দি। ব্যাঙ্ককের হাওয়ায় কি না কে জানে। পরের দিন সর্দির চিকিৎসা করলেন

ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড। আমার গৃহিণী নাকি তাঁকে বলেছিলেন আমাকে দেখতে শুনতে।

ভোর হলো। কখন এক সময় হোঁশ হলো সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছি। অতিক্রম করেছি ইন্দোচীন। এবার আসছে হংকং। চেয়ে দেখলুম সমুদ্রের জল বিশ হাজার ফুট নিচে শান্ত নিথর। ঢেউ খেলানো নয়, চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো চুল। সমান। সমতল। সমুদ্রের ফেনার মতো রাশি রাশি শাদা মেঘ জলের উপর ভাসছে। যেন ব্যবধান নেই। আবার বিমানের সমান্তরাল সমোচ্চ মেঘও ছিল নভস্তলে। সুদূর দিগন্তে। যোজনের পর যোজন জল আর মেঘ ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই। আর কিছু থাকে তো সূর্য। অত উঁচুতে পাখী কোথায়।

ব্যাঙ্ককের মতো হংকং-এও নামতে হলো। দিনের বেলা বলে শহর ও তার আবেষ্টন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। পাহাড় আর সমুদ্র মিলে হংকংকে পরম সুদৃশ্য করেছে। আমাদের কিন্তু সময় ছিল না যে বিমানবন্দরের বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে আসি। বুদ্ধিমানের মতো মুদ্রা বিনিময় করে নেওয়া গেল। বিধিনিষেধ নেই। তবে হিসাবে ঠকতে হয় না যে তা বলা কঠিন। অল্প কিছু মুখে দিয়ে সাড়ে এগারোটা নাগাদ আবার উড্ডয়ন। উড়তে উড়তে স্বস্থানে বসে ইতিপূর্বে প্রাতরাশ করা গেছে। এবার মধ্যাহ্নভোজন। বনভোজনের মতো আকাশভোজন। সমুদ্র দেখতে দেখতে।

ম্যাজিক কার্পেটে বসে আরব্য উপন্যাসের মতো চলেছি। এত ধীরে ধীরে যে চলার মতো লাগছে না। লাগল কখন? না যখন ফরমোজার অরণ্য উপকূল একটু একটু করে নজরে এলো আর নজর থেকে সরে যেতে থাকল। এর পরে আসবে জাপান। মাঝখানে ছোটখাট কয়েকটা দ্বীপ। তেমন একটা দ্বীপে দেখলুম জনমানব নেই, গাছপালা নেই। খাঁ খাঁ করছে। দ্বীপ অদৃশ্য হলো। আবার সেই অকূল পাথার। এক আধ বার এক আধটা জাহাজ চোখে পড়ল। বেচারি জাহাজ! বেচারা জাহাজের যাত্রী! এরই মধ্যে আমি বিমানের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলুম। আমার চিরপ্রিয় জাহাজের উপর আমার অনুরাগ শিথিল হয়েছিল।

বিমানে বসেই সকালবেলার তাজা খবরের কাগজ পেয়েছিলুম। হংকং-এর দৈনিক। এ ছাড়া পড়তে পাওয়া যায় বাঁধানো সাপ্তাহিক ও মাসিক। নানা দেশের। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে লিখিত বার্তা আসে। আমরা এখন কোথায়? কত উঁচুতে। টেম্পারেচার কত? এমনি যত রকম জ্ঞাতব্য। চোখ বুলিয়েই হস্তান্তর করতে হয়। কানে তুলো গুঁজলেও কানাকানি ক্রমে সুগম হয়ে আসছিল। সহযাত্রীর সঙ্গে তো গল্প করা চলছিলই, কোথাও কোনো আসন খালি দেখলে সেখানে গিয়ে আড্ডা দেওয়াও চলছিল। ঠাঁই বদল করতে করতে হঠাৎ এক সময় শুনতে পাই, ফুজি পর্বত।

জাপানের দেবতাত্মা ফুজি। সামনের ক্যাবিন থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বসলুম আমি সেখানে গিয়ে। দর্শন করলুম দেবতাত্মাকে। আমার জাপানদর্শন ফুজিদর্শনে শুরু হলো। ফুজির ছবি কত বার দেখেছি। জাপানীরা ফুজি আঁকতে অক্লান্ত। সেই ফুজি আমার নয়নে উদিত। সেও ধীরে ধীরে অস্ত গেল। অস্ত গেল তিরিশে অগাস্টের সূর্য। ঈষৎ অন্ধকারে দৃষ্টি নত করে দেখি জাপানের উপকূল। অসমতল। বন্ধুর। অনাবাদী। বন্য। তার পর মিটি মিটি আলো দেখা গেল। গ্রাম। উপনগর। অবশেষে তোকিয়োর সীমানা। হানেদা বিমানবন্দর। নীল লাল আলো। বিরাট ক্ষেত্রায়তন। এশিয়ার বৃহত্তম। নামতে নামতে দৌড়তে দৌড়তে আমাদের কলপাখী থামল। আমার প্রাণপাখী গুঞ্জন করে উঠল, বেঁচে আছি।

॥ দুই ॥

আমার ঘড়িতে তখন তিনটে বেজে কয়েক মিনিট। আর জাপানের ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা বেজে কয়েক মিনিট। আমার সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় চুরি গেছে। চুরি আরম্ভ হয়েছে ব্যাঙ্কক থেকে। ব্যাঙ্ককে যখন নামি তখন ভারতে রাত তিনটে নয়, দেড়টা। তেমনি হংকং-এ যখন নামি তখন ভারতে বেলা সাড়ে দশটা নয়, সাতটা। মধ্যাহ্নভোজন যখন করি তখন ভারতে দুপুর বারোটা নয়, সকাল সাড়ে আটটা। আর আসমানে বসে শেষবার যখন চা পান করি তখন ভারতে বিকেল চারটে নয়, সাড়ে বারোটা। শুক্রবার।

মায়া শতরঞ্চ থেকে বাস্তব রাজ্যে ফিরে আসতে খুব যে ভালো লাগছিল তা নয়। আকাশেরও একটা আকর্ষণ আছে। প্রবল আকর্ষণ। তা নইলে পাখী নিত্য নিত্য ওড়ে কেন? মানুষ কতকাল ধরে আকাশচারী হবার স্বপ্ন দেখে এসেছে। এতকাল পরে সে স্বপ্ন সত্য হলো। বিমানবিহার যখন নিরাপদ হবে, ব্যাপক হবে, সাধ্যে কুলোবে তখন আমিও পাখী হব। বিমানে ওড়ার পর জাহাজে চড়তেও মন যায় না, রেলে চড়তে তো রীতিমতো অনিচ্ছা জাগে। হাওড়া স্টেশন থেকে রেলপথে রওনা হয়ে থাকলে পৌঁছে থাকতুম আমি হানেদায় নয়, বিন্ধ্যাচলে। তোকিয়োতে নয়, এলাহাবাদে। ধুলোতে আর ধোঁয়াতে আর ঝাঁকানিতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে থাকত। তবে অনবরত গর্জন শুনে কান অতিষ্ঠ হতো না। আরব্য উপন্যাসের মায়া শতরঞ্চে এ বালাই ছিল না।

তাই মাটিতে পা দিতে আরো ভালো লাগছিল। এলেম নতুন দেশে। তারও ছিল এক দুর্বার উত্তেজনা। কবে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি তার নাম। রুশজাপানী যুদ্ধ যে বছর হয় সেই বছর আমার জন্ম। জাপানের জয়গরবে আমরাও গরবী হয়েছিলুম। দেখছ তো! এশিয়া হারিয়ে দিল ইউরোপকে! হুঁ হুঁ! ইঙ্গমহাপ্রভু! তোমারও দিন আসছে। হারবে একদিন আমাদের হাতে। আমার প্রিয় কুকুরছানার জাপানী নাম রাখা হয়েছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জাপানী ফানুষ' পড়ে মোহ লেগেছিল। আর মায়া লেগেছিল সেই মা হারা মেয়েটির উপর যে আয়নায় তার মায়ের মুখ দেখেছিল। বড় হয়ে আমার মেজ ভাই জাপানে গেল শিক্ষার্থী হয়ে। ফিরে এসে জাপানের প্রশংসায় গদগদ হলো। বড় হতে হতে আমি কিন্তু পুবমুখো না হয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে উঠি। তখন আমেরিকার কথা ভাবি, ইউরোপের কথা পড়ি। পুবদিকে তাকাইনে। শিষ্য যদি হতে হয় তবে জাপান যার শিষ্য হয়েছে তারই শিষ্য হব, জাপানের নয়। তার পর যখন দেখলুম জাপান ফাসিস্টদের সঙ্গে জুটেছে তখন মন বিগড়ে যায়। যখন পার্ল হারবারে হানা দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে তখন শিউরে উঠি। যখন বর্মা অবধি আসে তখন ভয় পাই। যখন পরমাণু বোমার মার খায় তখন তার জন্যে কাতর হই, বোমারুকে অভিশাপ দিই। সে বোমা আমাদেরও গায়ে লাগে। সে মার আমাকে পশ্চিমের প্রতি বিরূপ করে। ওরা কি মানব না দানব!

পরমাণু বোমার মার খেয়েও জাপান হার মানবে না, এই ছিল আমার প্রার্থনা ও বিশ্বাস। আমি সে সময় সারাদিন কেবল জাপান সম্বন্ধে পড়েছি আর তার অপরাজেয় আত্মা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছি। বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেছি, জাপান কখনো রণে ভঙ্গ দিতে পারে না। ওরা তেমন জাতই নয়। বন্ধু ব্যঙ্গ করে বললেন, পরমাণু বোমার সঙ্গে চালাকি! যেদিন খবর এলো জাপান বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছে সেদিন আমারও মাথা হেঁট হয়ে গেল। ছিল এশিয়াতে একটিমাত্র সত্যিকার স্বাধীন দেশ। সেও পরাধীন হলো। পরে ভেবে দেখেছি যে দেশ স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যবাদী হয়েছে,

পররাজ্য গ্রাস করেছে, বিনা যুদ্ধঘোষণায় পার্ল হারবার ধ্বংস করেছে ধর্ম তার পক্ষে নয়। সে লড়ে যাবে কিসের জোরে! যুদ্ধ তো শুধু গায়ের জোরে হয় না। তার সঙ্গে ন্যায়ের জোর থাকা চাই। জাপানের মরাল কেস দুর্বল ছিল। নয়তো সে মারে মারে জর্জর হতো, তবু পরাজয় স্বীকার করত না।

'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।' রবীন্দ্রনাথ তার ঘরে গিয়ে তাকে ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে এসেছিলেন। সে কর্ণপাত করেনি। যা হবার তা তো হবেই। আমি তাই পশ্চিমের দিকে পিঠ ফেরালেও জাপানের দিকে মুখ ফেরাইনি। কেবল ভারতের কথাই ভেবেছি, ধ্যান করেছি। সদ্য স্বাধীন এই দেশটির পুনর্গঠনে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছি। বিদেশে যাবার ইচ্ছা আমার হয়নি। আগে পরিচয় দেবার মতো গর্ব করবার মতো কিছু হোক। যে দেশ এখনো দুই খণ্ডে বিভক্ত ও ছিন্নমস্তার মতো আপনার রক্ত আপনি পান করতে উন্মুখ তাকে দুই নামে নামাঙ্কিত করলেই কি সে দুই আত্মার অধিকারী হবে? যতদিন না সে একাত্ম হয়েছে ততদিন আমাদের বাইরে না যাওয়াই ভালো, যদি যাই তবে হৈ চৈ না করাই কর্তব্য।

তবু দেখছি কেমন করে এসে পড়লুম জাপানে। হানেদার বিমানবন্দরে। একটার পর একটা বেড়া টপকিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে ঠেকে গেলুম যেখানে সে হলো মাশুলঘর নয়, টীকা নিয়েছি কি না পরখ করার ফাঁড়ি। ভিড় আর কিছুতেই সরে না। কী ব্যাপার! আমাদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেত্রী সোফিয়া ওয়াডিয়াকে ওরা আটক করেছে। তিনি বসন্তের টীকা নেননি। তাঁর বিবেকে বাধে। নিরীহ প্রাণীকে যন্ত্রণা না দিলে পীড়িত না করলে তো টীকা তৈরি হয় না। গান্ধী যে কারণে টীকাবিরোধী ছিলেন তিনিও সেই কারণে। আমাদের মতো সার্টিফিকেট না দেখিয়ে তিনি দেখালেন ভারত সরকারের একখানা তার। তাতে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। জাপানীরা সেটা মানবে কেন? বসন্তের সংক্রামণ থেকে তাদের দেশ তাতে বাঁচবে না।

নেত্রীকে ত্যাগ করে আমরা না পারি এগোতে না পারি পেছোতে। ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলে থাকার অনুভূতি হলো অন্নদাশঙ্করের। ওদিকে আমাদের নিতে জাপান পেন ক্লাব থেকে যে বন্ধুরা এসেছিলেন তাঁরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁদের সম্মানিত অতিথিকে ফেলে তাঁরাও তো ফিরতে পারেন না। অনুমতি মিলল। আমাদের কাফেলা চলল।

এই যে ঘটনাটুকু ঘটে গেল এর গুরুত্ব আমি ভুলিনি। পরে একদিন জাপানীদের সভায় আমাদের দেশের দোটানার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এর সাহায্য নিয়েছি। বসন্ত যখন সংক্রামক আকারে দেখা দেয় তখন আমাদের সরকার না পারে জোর করে সবাইকে টীকা দিতে, না পারে প্রজাদের মরতে দিতে। আধুনিকতা বলে, বিবেকের প্রশ্ন অবান্তর। মানুষের প্রাণ বা দুর্ভোগ বাঁচাতে যদি বাছুরের বা গিনিপিগের পীড়া হয় যন্ত্রণা হয় তবে হোক তার পীড়াযন্ত্রণা। অপর পক্ষে অহিংসা বলে, বিবেকের প্রশ্নটাই আসল। মানুষ বেঁচে থেকে বা দুর্ভোগ এড়িয়ে করবে কী, যদি নির্বিবেক হয়, যদি আর একটি প্রাণীর দুঃখে অসাড় হয়! গান্ধীজীর দেশ সাহস করে আধুনিক হতে পারছে না, আবার তার সাহস নেই যে পুরো পথটা গান্ধীজীর সঙ্গে যায়।

যাক, সোফিয়া ওয়াডিয়ার সঙ্গে পুরো পথটা যাওয়া আমার বরাতে ছিল। একযাত্রায় পৃথক ফল হলো উমাশঙ্করের, গোককের, জম্বুনাথনের, বাৎস্যায়নের। ওঁরা চললেন দাই'ইচি হোটেলে। আর সোফিয়া ওয়াডিয়া, কমলা ডোঙ্গরকেরী, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে। হানেদা থেকে তোকিয়োর ডাউন টাউন বারো মাইল রাস্তা। ঋজু ও প্রশস্ত পথ। দু'ধারের বাড়িঘর সাধারণত কাঠের। বেশীর ভাগ একতলা। গায়ে গায়ে জড়িয়ে নয়। ফাঁক ফাঁক। বোধ হয় ভূমিকম্পের ভয়ে কাঠ আর আগুনের ভয়ে ফাঁক। ডাউন টাউন যতই নিকট হয়ে এলো ততই

দালানের সংখ্যা বাড়তে লাগল। নানা রঙের আলোকসজ্জা। নিওন বাতি। চীনা অক্ষর উপর থেকে নিচে। ছবির মতো দেখতে। রঙিন অক্ষর। আলোকিত অক্ষর। যেন রংমশাল জ্বলছে।

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন বাস্তুশিল্পী ফ্র্যাঙ্ক লয়েড রাইট পঁয়ত্রিশ বছর আগে ইম্পিরিয়াল হোটেলের অভিনব সৌধ পরিকল্পনা করেন। ইষ্টকনির্মিত এই অট্টালিকা নাকি জাপানের প্রথম ভূমিকম্পসহ ইমারৎ। আশে পাশে কংক্রিটের দালান উঠছে ও আরো উঁচুতে মাথা তুলেছে। তাই পঁয়ত্রিশ বছরেই এর গায়ে পুরাতনত্বের ছাপ লেগেছে। হোটেলটি তার চেয়েও বনেদী। প্রায় সত্তর বছর আগে এর প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্য অতিথিদের জন্যে। এখনো এটি পাশ্চাত্য পরিব্রাজকদের তীর্থ। পৃথিবীর সর্বত্র প্রসিদ্ধ হোটেলগুলির অন্যতম। পরিচালকরা জাপানী, কিন্তু পরিচালনা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য মতে। ঝি চাকররাও ইংরেজী বলে। ঠিক পশ্চিমের ঝি চাকরদের পোশাক পরে। অবিকল তাদেরই মতো চালচলন। মনে হয় পুব দেশ থেকে পশ্চিম দেশে এসেছি। হোটেল তো ভারতেও আছে। পাশ্চাত্য ধরনের হোটেল। পাশ্চাত্য পরিচালিত। কিন্তু এ বিভ্রম এইখানেই সম্ভব। এদের গায়ের রং আমাদের চেয়ে ফরসা বলে কি? না এদের মনেও পশ্চিমের রং ধরেছে? পরে একদিন একটি কলেজের মেয়ে আমাকে কী একটা উপহার দিয়েছিল আমার বক্তৃতার শেষে। মোড়কের উপর লিখেছিল, 'To Orient'। হয়তো ওর মানসিক ভূগোলে জাপান ভারতের পুব দিকে নয়, ভারত জাপানের পুব দিকে। বাস্তবিক, জাপানের অন্তরে এখন অহর্নিশ দ্বন্দ্ব চলেছে। জাপান কি পূর্ব গোলার্ধের পুব দিকের দেশ না পশ্চিম গোলার্ধের পশ্চিম দিকের দেশ? তার অবস্থান কি এশিয়ায় না ইউরামেরিকায়?

আকাশে অবগাহনের সুযোগ পাইনি। কোনো মতে গা মুছেছিলুম। তাই হোটেলে আমার ঘরে গিয়ে গরম জলে শুয়ে থাকলুম পরম হরষে। তত ক্ষণে ন'টা বেজে গেছে। ডিনার পরিবেশন করবে না। চললুম আমি বাইরে কোথাও খেতে। আমার সঙ্গে দেখা করতে একটি জাপানী ছেলে এসেছিল, সে বলেছিল সামনেই রেস্টোরাণ্ট আছে। তাই পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম। ভারতের ঘড়িতে তখন ছ'টা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে তখনো আমি দক্ষিণ কলকাতা থেকে নিষ্ক্রমণ করিনি। আর সেই আমি কিনা চব্বিশ ঘণ্টা যেতে না যেতে তোকিয়োর রাস্তায় দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছি। অদম্য, অক্লান্ত, উত্তেজনায় চঞ্চল, ক্ষুধায় ক্ষিপ্র। ভাবতে অবাক লাগে। চৌরঙ্গী অঞ্চলের মতো অনেকটা। একদিকে সৌধ, অন্যদিকে হিবিয়া পার্ক, প্রসাদভূমি। যেমন আমাদের গড়ের মাঠ। তার পরে গড়খাই। তার পরে সম্রাটের প্রাসাদ। যেমন আমাদের ফোর্ট উইলিয়াম। কিন্তু অত দূর যাইনে। দিগ্‌ভ্রমের ভয়ে দিক্‌পরিবর্তন করিনে। রেস্টোরাণ্টের নিশানা খুঁজে না পেয়ে হোটেলে ফিরে আসি। জাপানীকে ধরে ইংরেজীতে শুধাতে সঙ্কোচ বোধ করি রেস্টোরাণ্ট কোথায়। ভাবি আমার কপালে ছিল অভুক্ত থাকা। রাত সাড়ে দশটার সময় কে আমাকে খেতে দেবে! তবু একবার কপাল ঠুকে জানতে চাইলুম হোটেলের ব্যুরোয় ইংরেজীনবিশ যুবকদের কাছে, হালকা সাপার কোথায় পেতে পারি?

উত্তর পেলুম, নিজের ঘরে রাত বারোটা অবধি। বেল টিপতেই মেড ছুটে এলো। পাওয়া যায় স্যাণ্ডউইচ। বেশ, তাই সই। তার সঙ্গে দুধ। দিয়ে গেল মেড। সেই যে আসমানে বসে চা পান করেছি তার প্রায় সাত ঘণ্টা পরে জমিনে বসে সাপার খেয়ে শুতে গেলুম। একরাত্রের নিদ্রা বকেয়া ছিল। পরের দিন ঘুম ভাঙল বেলা করে। আমার ঘড়িতে তখন ছ'টা। ভাবলুম দেশে যে সময় ঘুম ভাঙে বিদেশেও সেই সময় ভেঙেছে। মুখ হাত ধুতে সংলগ্ন স্নানের ঘরে গেছি, টেলিফোন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। শয্যাপার্শ্বে ফিরে গেলুম। এত সকালে কে আমাকে স্মরণ করল? তুলে নিয়ে শুনি নারীকণ্ঠের ভর্ৎসনা। 'মনে নেই সাড়ে ন'টায় বেরোতে হবে? দূতাবাসের গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে

বাইরে। আর আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি লবিতে।' কেমন করে বলি যে এইমাত্র ভাঙল আমার ঘুম। হোঁশ হলো ঘড়ির কাঁটা ঘোরাইনি। রাখতে চেয়েছি ভারতের সঙ্গে তাল। তার পরিণাম এই!

পাঁচ মিনিট সময় ভিক্ষা করে নিয়ে ক্ষৌরি হয়ে দৌড় দিলুম লবিতে। পথে পড়ল পেন কংগ্রেসের ব্যুরো। দেখলুম লেখকলেখিকারা ঢুকছেন আর কী হাতে করে বেরিয়ে আসছেন। আমাকেও দেওয়া হলো আমার নাম-ছাপানো কার্ড আঁটা ব্যাজ, কার্ড আঁটা প্ল্যাস্টিকের ব্রীফকেস। তার সঙ্গে বইয়ের মতো করে ছাপা প্রোগ্রাম, তোকিয়োর মানচিত্র, তোকিয়োর সচিত্র গাইড, জাপানী লেখকলেখিকাদের পরিচিতি পুস্তক, পরদেশী লেখকলেখিকাদের পরিচিতি পুস্তক। মানচিত্রে প্রত্যেকটি দূতাবাসের অবস্থান চিহ্নিত। যে যেমন খাদ্য পছন্দ করে তেমন খাদ্য যেখানে-যেখানে পাওয়া যায় তার তালিকা ছিল গাইডে আর নির্দেশ ছিল মানচিত্রে। ফরাসী ইটালিয়ান জার্মান রাশিয়ান মার্কিন মঙ্গোলিয়ান বিলিতী মেক্‌সিকান চীনা জাপানী সব রকম রেস্টোরান্টের নাম দেখলুম। দেখলুম না কেবল ভারতীয়।

রাষ্ট্রদূত আমার কলেজ জীবনের সতীর্থ চন্দ্রশেখর ঝা। একই সার্ভিসের লোক। বন্ধুপ্রতিম। গোপালদাসবাবু দমদমে আমার হাতে যে সন্দেশের বাক্‌স দিয়েছিলেন বিমানে সেটি খুলিনি। হোটেলেও না। রাষ্ট্রদূতকে সেটি নজরানা দিলুম। রাষ্ট্রদূত হলেন রাজপ্রতিনিধি। দিতে গিয়ে মনে পড়ল যে সকাল বেলা পেটে কিছু পড়েনি। এক পেয়ালা চা পর্যন্ত না। হোটেলে ওরা ন'টার পর প্রাতরাশ পরিবেশন করে না। চিনির বলদ আমি। সন্দেশ থাকতে উপবাসী। রাষ্ট্রদূত যদি আমাদের কফি না খাওয়াতেন তা হলে সেদিন নির্জলা একাদশী চলত মধ্যাহ্ন অবধি। চ্যান্সেলারির নিজের বাড়ি নেই, নাইগাই বিলডিং-এর একাংশে স্থিতি। কিন্তু চমৎকার অবস্থান। একদিকে তোকিয়োর গড়ের মাঠ, অন্যদিকে কয়েক পা যেতেই তোকিয়ো স্টেশন। আশে পাশে ব্যাঙ্ক, আফিস, স্টোর। সিনেমা, থিয়েটার। তোকিয়োর ব্রডওয়ে গিন্‌জা। আমি যে একমাস জাপানে ছিলুম আমার ঠিকানা ছিল ভারতীয় দূতাবাস। চিঠির জন্যে প্রায়ই যেতে হতো সেখানে।

হোটেলে ফিরে দেখি লোকে ভরে গেছে। এক কোণায় আমাদের আন্তর্জাতিক সভাপতি আঁদ্রে শাঁসঁ। তাঁর কথা আগে বলেছি। সৈয়দ আলী আহ্‌সানকে আমি চিনতুম না, তিনিও চিনতেন না আমাকে। নাম জানাজানি ছিল। আলাপ হলো। করাচীতে বাংলা অধ্যাপনা করেন। বাংলাসাহিত্যের উপর এমন একখানি ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করেন যার তুলনা বাংলাদেশেও নেই। আমরা দুই বাঙালী ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম কে কোন্ রাষ্ট্র থেকে এসেছি। বাংলা ভাষা শোনা গেল তোকিয়োর ইম্পিরিয়াল হোটেলে। করাচী থেকে আরো একজন প্রতিনিধি উপস্থিত। কুরাতুলাইন হায়দর ইংরেজীতে লেখেন। উত্তরপ্রদেশেই এঁদের বাড়ি। দেশবিভাগের দরুন বাস্তুহারা। সে দুঃখ এখনো ভুলতে পারেননি। কেমন এক বিষাদ এঁর বদনে লেখা। পাকিস্তানে গিয়ে জীবিকার প্রশ্ন মিটেছে, কিন্তু জীবনের প্রশ্ন মেটেনি। লক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানকে করাচী বা লাহোরে থাকতে বলা যেন কলকাতার বাঙালীকে বাঙাল মুলুকে বাস করতে বাধ্য করা। ধরুন, যদি পশ্চিমবঙ্গের লোক বাস্তুহারা হয়ে ঢাকায় চাটগাঁয় শরণার্থী হতো তা হলে জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও জীবনে সুখী হতো কি? এই কন্যাটির কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অভিমান। যেন আমিই দেশবিভাগের জন্যে দায়ী। যেন আমার জন্যেই এঁকে বনবাসে যেতে হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর সোফিয়া ওয়াডিয়াকে ইণ্টারভিউ করতে এলেন জাপানী মেয়েদের একটি পত্রিকার তরফ থেকে দু'টি মহিলা। সঙ্গে একটি ফোটোগ্রাফার। দু'জনের মধ্যে যিনি প্রবীণা তিনি দোভাষীর কাজ করলেন। যিনি নবীনা তিনি লিখে নিলেন। প্রবীণার পরনে ইউরোপীয় পোশাক, নবীনার পরনে চীনা পোশাক। প্রবীণার কেশ এমন কিছু খাটো নয়, নবীনার কেশ বালকের

মতো ছাঁটা। সোফিয়া ওয়াডিয়াকে সাহায্য করতে কমলা ডোঙ্গরকেরী ছিলেন। আমাব সেখানে থাকার কথা নয়। কিন্তু থাকতে হলো, প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো, ছবি তোলাতে হলো। পরে একদিন দেখি এক উপহার। উপহার দিতে জাপানীদের জুড়ি নেই। তেমনি ফোটো তুলতেও। হানেদা বিমানবন্দরের ফোটো এরই মধ্যে কাগজে বেরিয়েছে। রাত্রে হোটেলের কক্ষে সেই যে জাপানী ছেলেটি দেখা করতে এলো তার সঙ্গেও দেখি গুটি দুই ছেলে। ফোটো তুলতে চায়। কে যে খবরের কাগজের লোক, কে যে নয়, তা গোড়া থেকে বোঝা যায় না। একদিন এক প্রদর্শনীতে ঘুরে ঘুরে দেখছি, হঠাৎ পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'আপনার ফোটো তুলতে পারি?' যেই ফোটো তোলা হয়ে গেল অমনি নোটখাতা বেরোল। 'আমি অমুক পত্রিকার সংবাদদাতা। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?' প্রশ্ন শেষপর্যন্ত এসে ঠেকবে বারো বছর আগেকার সেই পরমাণু বোমা সম্বন্ধে আমার কী মত, সেইখানে কিংবা 'মিশ্র সন্তান'দের সম্বন্ধে আমার কী বক্তব্য, এইখানে। এ রকম অনেক বার হয়েছে।

সেদিন আমাদের কংগ্রেসের অধিবেশন ছিল না। হাতে সময় ছিল। দূতাবাসের পরামর্শ শুনে আমরা গেলুম লোকশিল্প প্রদর্শনী দেখতে মিৎসুকোশি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে। জাপানের এইসব ডিপার্টমেন্ট স্টোর শিল্পীদের প্রদর্শনীর জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়। সেদিন কিন্তু তেমন কোনো প্রদর্শনীর সন্ধান মিলল না। বেড়াতে বেড়াতে এক কোণে জনাকয়েক বাস্তুশিল্পীর সঙ্গে আলাপ হলো। দেখি এক পাশে একটা কুটীর। বা কুটীরের বড় মাপের মডেল। তাঁদের একজন সেটা ডিজাইন করেছেন। ভারতবর্ষে এ হেন স্টোরও নেই, শিল্পীদের প্রতি এ হেন দাক্ষিণ্যও নেই। এ হেন দর্শনীয়ও নেই। চমৎকৃত হলুম। জাপানের মতো ডিপার্টমেন্ট স্টোর এশিয়ার আর কোথাও আছে বলে শুনিনি। একই ভবনে সর্বপ্রকার পণ্য সুসজ্জিত। এমন কি ফলমূল মাছ তরকারিও। তাই লোকে লোকারণ্য। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম কে কী পরেছে, কার কেমন চেহারা। যারা বেচছে তারা বেশীর ভাগ তরুণ তরুণী। পাশ্চাত্য পোশাক পরিহিত। যারা কিনছে তারা সব বয়সী নরনারী। কারো পাশ্চাত্য পোশাক, কারো প্রাচ্য। কেউ খড়ম পায়ে দিয়ে খট খট করে হাঁটছে। কারো পিঠে বোঁচকার মতো করে বাঁধা ওবি। আমিও কিনলুম য়ুকাতা আর ওবি। স্টোরে উপর তল করতে চলন্ত সিঁড়ি ছিল। কত কাল পরে এস্‌ক্যালেটরে চড়ে ওঠানামা করতে কী যে মজা লাগছিল। যেন বয়স কমে গেছে ত্রিশ বছর।

হোটেলে ফিরতেই প্রভাকর পাধ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি দিনকয়েক আগে এসেছেন। তাঁদের কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম জাপানেও শাখা মেলেছে। জাপানী কেন্দ্র থেকে সন্ধ্যাবেলা পার্টি দেওয়া হচ্ছে। আমরাও নিমন্ত্রিত। গিয়ে দেখি মস্ত পার্টি। পেন কংগ্রেস থেকে, ইউনেস্কো থেকে নিমন্ত্রিত নানা দেশের অতিথি। কালচারাল ফ্রীডম কংগ্রেস থেকে নিমন্ত্রক বহুতর জাপানী। একটি জাপানী সরাইয়ের সংলগ্ন ভূমিতে এঁদের সমাবেশ। পাশে সরাই। চার দিকে উদ্যান। জাপানী ধরনের সরাই। জাপানী ধরনের উদ্যান। এখন এই যে শতাধিক নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রক এঁদের ভোজ্য প্রস্তুত হচ্ছিল জাপানী মতে সকলের সামনে কাঠকয়লার উনুনে। সদ্য ভর্জিত মৎস্যাদি তৎক্ষণাৎ পরিবেশিত হচ্ছিল পাতে পাতে। আপনার ইচ্ছা হয় আপনি উঠে গিয়ে নিয়ে আসতে পারেন রাঁধুনিদের কাছ থেকে। রাঁধুনিরা পুরুষ। নয়তো বসে থাকুন আপনার জায়গায় বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করতে থাকুন। আপনাকে ভোজ্য দিয়ে যাবে একটি মেয়ে, পানীয় দিয়ে যাবে আরেকটি মেয়ে। এরা খুবই কমবয়সী। পরনে রঙচঙে জাপানী পোশাক। কিমোনো। ওবি। মাথার চুল মুকুটের মতো উঁচু করে বাঁধা। ছবির বইয়ে যাদের দেখেছি তারাই কি এরা? কলাবতী? গেইশা? কই, ছবির সঙ্গে মিলছে না তো? এরা বোধ হয় গৃহস্থের কন্যা, কুমারী কন্যা। বড় নিরীহ। বড়

লক্ষ্মী।

তার পর এক সময় দেখি এরাই নাচগান আরম্ভ করে দিয়েছে স্বতন্ত্র এক স্থলীতে। এদের সঙ্গে সামিসেন বাজাচ্ছেন এক প্রবীণা। আরো দু'একজন ছিলেন, তাঁরা নবীনাও নন প্রবীণাও নন। তাঁরা গানের দলে। সামিসেন-বাদিনীর গান শুনে মনে হলো এতো আমার চেনা গান, এ তো আমার চেনা কণ্ঠ। বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ডে শোনা। শান্তিদেবের রেকর্ড। কিন্তু নাম স্মরণ ছিল না বলে জিজ্ঞাসা করিনি কাউকে। এর পর খুব একটা মজাদার মুখোশ এঁটে একটি মেয়ে কমিক নৃত্য করল। মাঝখানে কিছুক্ষণ নাচগানবাজনার বিরাম। স্টীফেন স্পেণ্ডারের ভাষণ। মজলিস থেকে উঠে এসে সেই সব মেয়েরাই ভোজ্যপানীয় পরিবেশন করল।

এবার কিন্তু আমার মনে খটকা বেধেছিল। এরা কারা?

'ওরা একপ্রকার বেশ্যা'। বললেন মৃদুহাসিনী স্বল্পভাষিণী তাইকো হিরাবায়াশি। 'আমি এর বিরুদ্ধে লিখে আসছি।'

আলাপের সময় জানা ছিল না এঁর জীবনকাহিনী। ইনি আমার সমবয়সিনী। স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে ইনি তোকিয়োতে এসে টেলিফোন অপারেটর হন। তার পরে দোকানে কর্মচারী। কোথাও টিকতে পারেন না। ক্রমে ক্রমে ইনি সমাজসচেতন হয়ে ওঠেন। প্রোলিটারিয়ান সাহিত্য ও রাজনীতি করতে গিয়ে পীপ্‌লস্ ফ্রন্ট মণ্ডলীর সঙ্গে ইনিও গ্রেপ্তার হন। কঠিন অসুখে পড়ে আট বছর কেটে যায় বিছানায় শুয়ে। গত মহাযুদ্ধের পর আবার যখন লিখতে বসলেন তখন দেখা গেল ইনি আরো গভীর ভাবে জীবনকে অনুভব করেছেন, এঁর দৃষ্টি আরো প্রসারিত হয়েছে, এঁর স্টাইল আরো পরিণত হয়েছে। ইনি শ্রেণীবোধের উর্ধ্বে উঠেছেন। উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় ইনি শ্রুতকীর্তি। সামাজিক সমালোচনায় অনলস।

পরে শুনেছি জাপান স্থির করেছে আগামী এপ্রিল থেকে বেশ্যাবৃত্তি উঠিয়ে দেবে। এত বড় বিপ্লবের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলুম না সেদিন। যাঁরা কালচারাল ফ্রীডম নেই বলে রুশচীনের ছিদ্র ধরেন তাঁরা কি জানেন না যে রুশচীনে বেশ্যাবৃত্তি নেই? পার্টিতে ভদ্রমহিলারাও আসবেন, আবার বাঈজীরাও আসবেন, এ প্রথা বার বার লক্ষ করতে হয়েছে আমাকে। আমাদেরও এক কালে বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে বাঈনাচ না হলে চলত না। সে রেওয়াজ আর নেই বলে আমরা আমাদের স্ত্রীকন্যাদের পার্টিতে নিয়ে যেতে পারছি। যারা বেশ্যাদের সঙ্গে মেশে তারা ভদ্রাদের সঙ্গে মিশবে এটা আমরা সইতে পারতুম না। জাপানীরা বড় বেশী দিন সহ্য করেছে। বাঈজীর নাচগান পরিবেশন বিনা এখনো ওদের পার্টি জমে না। কখনো জমবে কি? তবু বলতে হবে জাপানের বিবেক সজাগ হয়েছে। তাইকো হিরাবায়াশির কণ্ঠে সেই বিদ্রোহী বিবেকের মৃদু প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শুনলুম।

॥ তিন ॥

সে রাত্রে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন সোফিয়া ওয়াডিয়ার এক মার্কিন অধ্যাপক বন্ধু। ভারতভক্ত। তাই অকালে ফিরতে হলো হোটেলে। সেখান থেকে আমাদের তুলে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক মূর তোকিয়োর বিখ্যাত উদ্যানভোজনাগার চিন্‌জান্‌সো'তে।

চিন্‌জান্‌সো, তার মানে ভিলা ক্যামেলিয়া, গোড়ায় ছিল তিনটি পাহাড় ও দুটি উপত্যকা। তাকে উদ্যানের রূপ দেন মেইজি যুগের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিক প্রিন্স আরিতোমো য়ামাগাতা। তাঁর

মালঞ্চের মালাকর ছিল সেকালের সবার সেরা মালী কাৎসুগোরো। গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকে আগুন লেগে প্রায় সমস্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। ছ'বছর লাগে নতুন করে বানাতে। আট হাজারের উপর গাছপালা লাগানো হয়। ঘরবাড়ি আবার তৈরি হয়। এবার একটি সমিতি সংগঠিত হয়। চিন্‌জান্‌সো সংরক্ষিণী সমিতি। স্থির করা হয় এখন থেকে উদ্যানটি হবে উদ্যানভোজনাগার।

এখানে আছে একটি তিনতলা প্যাগোডা। এগারো শ' বছর আগে মহাকবি ওনোনো তাকামুরা এটি করান। তেত্রিশ বছর আগে হিরোশিমা অঞ্চল থেকে এটিকে এখানে সরিয়ে আনা হয়। আর-একটি পাঁচতলা প্যাগোডা আছে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সরানো। নারা থেকে অপসারিত একটি পাথরের কুণ্ড ও একটি পাথরের লণ্ঠনও আছে। এমনি আরো অনেক কীর্তি স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এসেছে। একটা আস্ত মন্দিরকেও কিয়োতো অঞ্চল থেকে আনয়ন করা হয়েছিল, আগুনে পুড়ে না গিয়ে থাকলে সেটি হতো একটি 'জাতীয় সম্পদ'। কোনো প্রাচীন কীর্তিকে 'জাতীয় সম্পদ' আখ্যা দিলে বুঝতে হবে যে তার সংরক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়েছে।

তার পর আছে একটি পাইন তরু। ফুজি পাহাড়ের মতো দেখতে। তাই তার নাম ফুজি মাৎসু। গাছকে রকমারি আকৃতি দেওয়া জাপানী মালাকরদের কৃতিত্ব। পরে অন্যত্র লক্ষ্য করেছি কেমন করে কচি বয়স থেকে গাছকে যা খুশি আকৃতি দেওয়া হয়। বামন করে রাখতে তো যেখানে সেখানে দেখেছি। সে-সব বামনের বয়সের গাছ হয়তো বনস্পতি হয়েছে। একটা বনস্পতি হবে আরেকটা বামন হবে, এটা বোধ হয় ন্যায়বুদ্ধি নয়। খোদার উপর খোদকারী করতে গিয়ে মানুষ এ ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি মানেনি।

চিন্‌জান্‌সোতে পৌঁছতে প্রায় ন'টা বেজেছিল। বলে কী না আমাদের দেরি হয়ে গেছে। খেতে দেবে না। পরেও একদিন এক রেস্টোরাণ্টে দেখেছি ন'টা বাজল কি খাওয়ানোর পাট চুকল। তবে খুঁজে নিতে হয় কোথায় গেলে খেতে পাওয়া যায়। তার সন্ধানে যাই যাই করছিলুম, এমন সময় ভারতীয় অতিথিদের খাতিরে চিন্‌জান্‌সো তার নিয়ম ভঙ্গ করল।

চিন্‌জান্‌সো থেকে ফেরার পথে অধ্যাপককে বললুম গিন্‌জা ঘুরে যেতে। তোকিয়োর ব্রডওয়ে। কলকাতায় এর মতো কী আছে? না, চৌরঙ্গী নয়। বিস্তীর্ণ ঋজু রাজপথ। দু'ধারে মাথা উঁচু দালান। দোকান আফিস থিয়েটার সিনেমা রেস্টোরাণ্ট। নানা রঙের আলোর বন্যা। আলোকিত রঙিন নিম্নগতি অক্ষরচিত্র। এই গিন্‌জাতেই আমরা এসেছিলুম দিনের বেলা ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে। তখন একে চিনতেই পারিনি।

সোফিয়াদি'কে বলেছিলুম আমার ঘুম-ভাঙার কাহিনী। কে জানে পরের দিন যদি জাগতে সেই রকম দেরি হয় তা হলেই হয়েছে আমাদের কামাকুরা যাওয়া! মহাবুদ্ধ দেখতে। জাপানের খোঁজখবর আর সকলের চেয়ে বেশী রাখি বলে আমাকে তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন, 'তুমি আমাদের ম্যানেজার। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে যাব।' আপাতত কামাকুরা নিয়ে যাবার কল্পনা ছিল। কিন্তু সময়মতো যদি ঘুম না ভাঙে! কে হবে আমার ঘুম-ভাঙানিয়া! তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমি তো খুব ভোরে উঠি। আমি তোমাকে টেলিফোনে জাগাব। ক'টায় চাও, বল?' আমি বললুম, 'আমি যদি আপনা থেকে জেগে না থাকি তা হলে সাতটায়।'

এর পর থেকে রোজ তিনি আমার বৈতালিক হতেন। কিন্তু কোনো কোনো দিন আমি টেলিফোন বেজে ওঠার আগেই বিছানা ছেড়ে থাকতুম। কোনো কোনো দিন আবার এত খারাপ লাগত স্বপ্নের মাঝখানে জাগতে। কোনো কালেই আমার সুনিদ্রা হয় না। যেটুকু হয় সেটুকু ভোরের দিকে। তাই বাড়িতে আমাকে কেউ তুলে দেয় না। কিন্তু বিদেশে যদি দেরি করে উঠি প্রাতরাশ তো হারাবই, যাঁদের ম্যানেজার হয়েছি তাঁদের আস্থাও হারাব। তা ছাড়া তোকিয়োর জীবনযাত্রা শুরু

হয়ে যাবে আমার জন্যে সবুর না করে। কত কী হারাব। ব্যর্থ হবে এত দূর দেশে আসা।

রবিবার সকালে কিন্তু কামাকুরা যাওয়া হলো না। সেইদিনই বিকেলে আমাদের আন্তর্জাতিক কর্মসমিতি একত্র হবে। দুর্লভ সৌভাগ্য আমার, আমিও একজন সদস্য। কমলা ডোঙ্গরকেরীও। আর সোফিয়াদি'কে তো যেতে হবেই। তিনি আমাদের নেত্রী। তার আগে সেদিনকার আলোচনায় আমরা কী লাইন নেব সেটা ঠিক করে ফেলা দরকার। প্রধান বিতণ্ডার বিষয় হাঙ্গেরী। সেখানকার পেন ক্লাবের সভ্যেরা নাকি অত্যাচারে যোগ দিয়েছেন। তা বলে তাঁদের কেন্দ্রটাও সাজা পাবে এটা আমার মতে অবিচার। নাম যদি কেটে দিতে হয় সভ্যদের নাম কাটা হোক, কিন্তু কেন্দ্র বহাল থাক। তদন্ত? হাঁ, তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্ত যতদিন চলছে ততদিন সাস্‌পেন্সন? না, সেটা উচিত নয়।

শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হলো। আমি কিন্তু উপস্থিত থাকিনি। কারণ আমি জানতে পেরেছিলুম যে এক-একটি দেশের প্রতিনিধি যদিও দু-দুটি ভোট কিন্তু এক-একটি। সেটি যে-কোনো একজন দিলেই চলে। সে জন আমি না হয়ে কমলাবোন হলেও একই কথা আর বিতর্কে অংশ নেবার জন্যে পলিসি নির্ধারণের জন্যে সোফিয়াদি তো রইলেনই। আমি ছুটি নিলুম। রবিবারে রাষ্ট্রদূতকে তাঁর ভবনে পাওয়া যাবে। তাঁর গৃহিণীকেও। সামাজিক 'কল' দিতে হলে অপরাহ্নটা হাতে রাখা চাই। রাত্রে চিন্‌জান্‌সো'তে পেন কংগ্রেসের সম্বর্ধনা। সেটা বাদ দিলে লেখক মহলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে না।

বস্তুত, হাঙ্গেরীর জন্যে ও ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। রুশপ্রভাবিত দেশগুলিতে পেন কেন্দ্র এখনো দু'চারটি আছে। সেই সূত্রে চেকোস্লোভাকিয়া থেকে, পোলাণ্ড থেকে, বুলগারিয়া থেকে প্রতিনিধি এসেছেন। হাঙ্গেরী থেকেও আসতেন, যদি ওখানকার কেন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হতো। কিন্তু পলাতক লেখকসভ্যেরা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন আর কেন্দ্র তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। আমরা যদি অনুসন্ধান না করে পক্ষ নিই তা হলে হাঙ্গেরীর কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তার ফলে হয়তো বুলগারিয়ার চেকোস্লোভাকিয়ার পোলাণ্ডের কেন্দ্রগুলির সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটবে। তখন আমরা কোন্ মুখে বলব যে পি. ই. এন. হচ্ছে বিশ্বলেখকসঙ্ঘ? পোয়েট এসেয়িস্ট নভেলিস্টদের এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম মহাযুদ্ধের পর লণ্ডনে কাজ শুরু করে। এর প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস ডসন স্কট ও প্রথম সভাপতি জন গলসওয়ার্দি এটিকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর মতো এটিও একটি বিশ্বপরিকল্পনা। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।'

অপর পক্ষে একথাও ঠিক যে লেখকের স্বাধীনতায় যাঁদের বিশ্বাস নেই, যাঁরা রাষ্ট্রের কথায় ওঠেন বসেন নাচেন মাতেন তাঁরা কোন্ মুখে পি. ই. এন.-এর চার্টারে সই করবেন? যদি করেন সেটা অসাধুতা। সুতরাং তাঁদের স্থান পেন ক্লাবে নয়। মূলত এটা একটা ক্লাব। ক্লাবে সকলের প্রবেশ নেই। কেবল তাঁদেরি আছে যাঁরা ক্লাবের নিয়মকানুন মানতে রাজী ও সমর্থ। পেন কংগ্রেসের পূর্বতন বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে এ নিয়ে দারুণ তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। এবারেও হবে। এমনতর অপ্রীতিকর কার্যে যোগ দিতে আমার অস্পৃহা। কে জানে হয়তো দেখব অধিকাংশের ইচ্ছা হাঙ্গেরীব সঙ্গে বিচ্ছেদ। তার পরিণাম অর্ধেক বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। সুখের বিষয় আমাদের সভাপতি আঁদ্রে শাঁসঁ ছিলেন মধ্যপন্থী। কোনোরূপ চরমপন্থাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। হাঙ্গেরী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত যা হলো তা অর্ধেক বিশ্বের গ্রহণের অযোগ্য হয়নি, অথচ তাতে চার্টারের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়নি। হাঙ্গেরীর পলাতক লেখকদের খুশি করতে গেলে পোলাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়া বুলগারিয়ার প্রতিনিধিরা উঠে চলে যেতেন। সেই সব দেশের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যেত। জানতে পেতুম না আমরা তাদের ভিতরের খবর। পরের দিন কংগ্রেসের উদ্বোধনের সময় পোলাণ্ডের

সম্মানিত অতিথি স্লোমিনস্কি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি শুনতে না পেলে আমরা এমন কিছু হারাতুম যার প্রতিপূরণ নেই। পোলাণ্ডের লেখকরাও স্বাধীনচেতা। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার জন্যে লেখকদের যে আকুতি তা তথাকথিত স্বাধীন বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়, তা সারা দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয়। চার্টার যাঁরা সই করেছেন তাঁদের অসাধুতার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। কোনো এক রাষ্ট্রের সঙ্গে সে রাষ্ট্রের লেখকদের একাকার ভাবাটাই ভুল। পেন্ কংগ্রেসের এবারকার অধিবেশনে সে ভুলের অবসান হলো। আমরা যদি আর কিছু না করে থাকি তবে অন্তত এইটুকু যে করতে পেরেছি এর জন্যে সুখী। নইলে গোটা অধিবেশনটাই মাটি হতো। জাপানীরা দুঃখ পেত। ক্রমেই আমরা বুঝতে পারছিলুম কী পরিমাণ তারা খেটেছে, ত্যাগ করেছে, এর সাফল্যের জন্যে।

রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের পর চললুম আমরা সাঙ্কেই কাইকান। সেই বৃহদায়তন সৌধের পাঁচ তলায় কোকুসাই হল। সেখানেই আন্তর্জাতিক কর্মসমিতির বৈঠক। তার বাইরে চা-কফির কাউন্টার, বসে খাবার ও আড্ডা দেবার জায়গা, চিঠিপত্র লেখার টেবিল, চিঠিপত্র ডাকে দেবার আগে রকমারি ডাকটিকিট কেনার ও পেন কংগ্রেসের ছাপ মারার ব্যবস্থা, চিঠিপত্র বিলি করার জন্যে খুঁজে পাবার জন্যে যার যার নামের লেবেল-আঁটা পায়রার খোপ, চেক ভাঙাবার জন্যে ব্যাঙ্ক, দেশদর্শনের জন্যে জাপান টুরিস্ট ব্যুরোর আফিস, পেন কংগ্রেসের নিজের ব্যুরো, কর্মকর্তাদের ঘর, কেরানীস্থান, ফোটো তোলানোর ফোটো কেনার বন্দোবস্ত, এমনি কত কী! আগন্তুকদের প্রত্যেকের স্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছিল জাপানী ধরনে তুলি দিয়ে। আমি নাম লিখলুম একবার বাংলায়, একবার ইংরেজীতে। কিন্তু বৈঠকে গেলুম না। রাষ্ট্রদূতের ভবনে চা খেতে যাবার আগে আমার হাতে যে সময়টা ছিল সেটা খরচ করতে ইচ্ছা ছিল লোকশিল্প প্রদর্শনীতে। কিন্তু কেউ আমাকে বলতে পারল না কোথায় সেটা হচ্ছে। হচ্ছে আর একটা প্রদর্শনী। সেটা ক্যালিগ্রাফীর। হস্তাক্ষরশিল্পের। হচ্ছে পেন কংগ্রেসের অনুষঙ্গে। পাশের ঘরেই। তখন সেইখানেই ভিড়ে গেলুম।

জাপানীরা প্রধানত লেখে চীনা অক্ষরে। আর চীনা অক্ষর হলো ভাবচিত্র। কয়েক হাজার ভাবচিত্র সবাইকে শিখতে হয়। প্রায় ছবি আঁকার মতো। তার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। অনেক রকম ছাঁদ। কেউ ধরে ধরে লেখে। কেউ টান দেয়। কেউ জটিলকে সরল করে আনে। এমনি করে একই ভাবচিত্রের একাধিক রূপ প্রবর্তিত হয়েছে। লেখা মানে তুলির আঁচড়। কত রকম তুলি যে ব্যবহার করা হয়। কত রকম লাইন যে টানা হয়। বৈচিত্র্য নির্ভর করে তুলির গতিবেগের উপর, ঝোঁকের তারতম্যের উপর। ছবির কথা বলেছি। ছবি কিন্তু বস্তুর ছবি নয়। একটি মানুষ এঁকে দিলে মানুষের ভাবচিত্র হবে না। ছবি এখানে মানুষের প্রতীক, মানুষ নামক একটা আইডিয়ার প্রতীক। লিখছে বা আঁকছে যে সে যেন বিশুদ্ধ রূপের জগতে ফর্মের জগতে বিহার করছে। তার কারবার বিমূর্ত নক্শা নিয়ে। জাপানে সুন্দর হাতের লেখাও একটি আর্ট। চিত্রকলার দাসী নয়, স্বসা। কেবল তুলি নয়, কাগজ ও কালি তার উপযুক্ত হওয়া চাই। এর পিছনে রয়েছে দু'হাজার বছরের একটানা সাধনা। বড় বড় সাধক তাঁদের সিদ্ধির পদচিহ্ন রেখে গেছেন। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উত্তরসাধকরাও অগ্রসর হচ্ছেন।

আমার হাতে সময় অতিপরিমিত। ঘুরে ফিরে দেখলুম বহুসংখ্যক উদাহরণ। এক দল নতুন কিছু করতে ব্যগ্র। এঁদের স্কুলকে বা কলমকে বলা হয় 'জেন-এই'। আর একটি দল আধুনিক সাহিত্যের বাছা বাছা কবিতা বা গদ্যাংশ নিয়ে কাজ করেন। এঁদের স্কুলকে বলা হয় 'শোদো'। চীনা অক্ষরের বদলে জাপানী 'কানা' অক্ষর বহু স্থলে প্রচলিত। এক-একটি সিলেবল এক-একটি রেখায় সূচিত। এরও নানা শৈলী। এ ছাড়া ছিল ঐতিহ্যবাহীদের নূতন ও পুরাতন স্কুল বা কলম। এক-একখানি চিত্রপট আপনাতে আপনি সমাপ্ত একটি কবিতা বা গদ্যাংশ বা আইডিয়া বা খেয়াল বা

হেঁয়ালি বা নিছক ধোঁয়া। এক জায়গায় দেখলুম নাম দেওয়া হয়েছে 'টমাস মান্-এর শেষ উক্তি'। আমার প্রদর্শিকা তরুণী তার অর্থ কী যে বলেছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না, মুদ্রিত প্রতিরূপ দেখে অধ্যাপক কাসুগাই বলছেন, 'আমার চশমা কোথায়?' এই সামান্য কথা ক'টি বোঝাতে এতগুলো আঁচড় লাগল। চোখে আঁধার নামছে এই ভাবটা অবশ্য অসামান্য।

পায়ে হেঁটে না বেড়ালে শহর দেখা হয় না। প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করলুম। শেষে ট্যাক্সি নিলুম। তোকিয়োর রাস্তাগুলোর আগে কোনো আধুনিক নাম ছিল না। মার্কিনরা নাম রাখে 'এ আভিনিউ', 'বি আভিনিউ,' 'সি আভিনিউ' ইত্যাদি ও তার শাখা-প্রশাখা 'ফার্স্ট স্ট্রীট', 'সেকেণ্ড স্ট্রীট,' 'থার্ড স্ট্রীট' প্রভৃতি। মানচিত্রে দেখানো রয়েছে সে সব। কিন্তু কেউ জানে না, কেউ বোঝে না। ট্যাক্সিওয়ালাকে মুখে বলা বৃথা। মানচিত্র খুলে দেখাতে হয়। সেইজন্যে কেউ যদি নিমন্ত্রণ করেন তো চিঠির সঙ্গে একখানা ছোট মাপের মানচিত্র পাঠিয়ে দেন। সেটা ট্যাক্সিওয়ালাকে দিলে সে দিব্যি পড়তে পারে বা বুঝতে পারে। সামনে রেখে মোটরের স্টীয়ারিং হুইল ঘোরায়। খটকা বাধলে নেমে গিয়ে পুলিস বক্স-এ জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিসের ঘাঁটি এখানকার পথেঘাটে। সঙ্গে যদি মানচিত্র না থাকে তা হলে 'এল আভিনিউ' বা 'থার্টিয়েথ স্ট্রীট' বিশেষ কাজে লাগবে না। তার চেয়ে কার্যকর হবে সেকেলে ধরনের নাম। প্রথমে বলতে হবে কোন্ 'কু'। তার পরে কোন্ 'চো'। তার পরে কোন্ 'মাচি'। তার পরে কোন্ 'চোমে'। তার পরে কোন্ নম্বর। সাধারণত নম্বর থাকে না। বর্ণনা দিতে হয় বাড়ির। কাছাকাছি কী আছে তার? এই যেমন আমাদের ভবানীপুরের পদ্মপুকুর বা টালিগঞ্জের নাকতলা বলে তার পর বলতে হয় রাস্তার নাম। কিন্তু মানুষের নাম অনুসারে রাস্তার নাম ওদের দেশে হয় না। তিনি যত বড় মানুষ হোন না কেন। তাই রাস্তার নাম পালটায় না। মার্কিনরাই যা আভিনিউ বা স্ট্রীট নামকরণ করেছে।

শহরের নাম কিন্তু জাপানীরা নিজেরাই বদলেছে। নব্বুই বছর আগে এর নাম ছিলো এদো বা য়েদো। রাজধানী যখন কিয়োতো থেকে এখানে উঠে এলো তখন এর নতুন নাম রাখা হলো তোকিয়োতো বা পূর্বদিকের রাজধানী। সংক্ষেপে তোকিয়ো। অবশ্য কিয়োতো কয়েক শ' বছর থেকে সত্যিকার রাজধানী ছিল না। ছিল সম্রাটের বাসস্থান। গবর্নমেণ্ট পড়েছিল শোগুন বা সেনাপতিদের হাতে। তাঁরা থাকতেন এদোতে। এই দ্বৈততন্ত্রের অবসান ঘটল প্রায় নব্বুই বছর আগে, সম্রাট মেইজি যখন শোগুনের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এদোর দুর্গ থেকে তাঁদের সরিয়ে তাকেই রাজপ্রাসাদ করলেন। যেখানে রাজপ্রাসাদ সেখানে রাজধানী। এবারকার রাজধানী পূর্বদিকে। এমনি করে এদো হলো তোকিয়ো। দিনে দিনে বাড়তে থাকল। বাড়তে বাড়তে এখন যা হয়েছে তা এক অতিকায় নগর। সাত শ' ছেআশি বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে কী কী আছে, শুনুন। তেইশটি ওয়ার্ড, আটটি উপনগর, তিনটি জেলা, সাতটি দ্বীপ। গত পয়লা জানুয়ারিতে এর লোকসংখ্যা ছিল তিরাশি লাখ। এ নাকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। একজন বললেন, 'উঁহু। আপনি জানেন না। ইতিমধ্যে আবার গুনতি হয়েছে। এবার অদ্বিতীয়।'

চুলচেরা হিসাবে তোকিয়োর কেন্দ্র হচ্ছে গিন্জা সরণির নিহমবাশি সেতু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোকিয়োর কেন্দ্রস্থল রাজপ্রাসাদ। চার দিকে পরিখা। তাতে হাঁস সাঁতার কাটে। মাঝে মাঝে পুল। পরিখার ওপারে প্রাচীর ও বনানী। তারই অভ্যন্তরে কয়েকটি বাড়ি। শুনেছি আসল বাড়িটি ভেঙে গেছে যুদ্ধের সময়। প্রজাদের অবস্থা ভালো না হলে সম্রাট নতুন বাড়ি বানাতে দেবেন না। তবে পশ্চিমে বাস্তুশিল্পী পাঠানো হয়েছে। তাঁরা পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত দেখছেন। ফিরে এসে তাঁদের পরিকল্পনা পেশ করবেন। পরিখার এপারে ময়দান ও রাজপথ। পুব থেকে উত্তরে গিয়ে শিন্তোদের য়াসুকুনি পীঠস্থান ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে গেলে তাকাতানোবাবা রেলস্টেশনের একটু এদিকে ভারতীয়

রাষ্ট্রদূতের বাসগৃহ।

বহু দিন পরে বহু দূর দেশে দেখা। চন্দ্রশেখর ও তাঁর সহধর্মিণী লক্ষ্মীদেবী আমাকে চা খেতে বললেন। গল্প আর ফুরায় না। ওদিকে চিন্‌জান্‌সোতে জাপান পেন ক্লাবের তরফ থেকে আন্তর্জাতিক পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা। সময় উত্তীর্ণপ্রায়। একদিন দুপুরে নানা দেশের লেখকলেখিকাদের বাছা বাছা জনকয়েকের নামে লাঞ্চনের নিমন্ত্রণলিপি পাঠাতে চন্দ্রশেখরের বাসনা। যাতে ভারতীয়দের সঙ্গে অভারতীয়দের মেলামেশা সুগম হয়। তিনি একটা তালিকা এরই মধ্যে করে রেখেছিলেন। আমি তাতে আরো দু'একটি বিদেশী নাম জুড়ে দিই। কিন্তু পাকিস্তানীদের ডাকতে তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বিশ্বের সকলেই আমাদের মিত্র। অমিত্র কেবল পাকিস্তান। ঘরে বাইরে স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে সর্বত্র তার সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিবিরোধ। ভাগ্যিস আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে উঠেছি। নইলে পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমার সেটুকুও ঘনিষ্ঠতা হতো না।

চিন্‌জান্‌সোতে পৌঁছে দেখি বাইরে গাড়ির ভিড়, ভিতরে মানুষের। শ'দুই জাপানী ও শ'দেড়েক বিদেশী লেখকলেখিকা প্লেট হাতে চলমান দণ্ডায়মান বকবকায়মান। বুকে আঁটা ব্যাজ দেখে চিনে নিতে হয় ইনি কিনি। কোন্ দেশবাসী বা বাসিনী। আগের দিন জাপানী সরাইখানায় যাঁদের দেখেছিলুম তাঁরা তো ছিলেনই, ইতিমধ্যে সমাগত যাঁরা তাঁরাও আজকের এই মিলনদিনে অনুপস্থিত থাকেননি। পেন কংগ্রেসের অধিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে এমনি কয়েকটি মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। কোনোটি মধ্যাহ্নে, কোনোটি সন্ধ্যায়, কোনোটি রাত্রে। সেদিন লেখকলেখিকার জনতায় আমি হারিয়ে গেলুম। কেউ একদিনের পুরোনো আলাপী, কেউ হালফিল নতুন।

লক্ষ্য করলুম এখানেও সেই একই পরিবেশিকার দল। গেইশা। চিন্‌জান্‌সোর নিজের ওয়েটার ওয়েট্রেস নয়। বোধ হয় তাদের সংখ্যা প্রয়োজনের অনুপাতে কম। কিংবা এমনও হতে পারে যে তাদের তেমন শিক্ষাদীক্ষা ভব্যতা বা হ্লাদিনীশক্তি নেই। গেইশাদের অল্পবয়স থেকে কঠোর ট্রেনিং দেওয়া হয়। পার্টিকে প্রাণবন্ত করতে তারা প্রাণপণ সাধনা করে। তাদের হাবভাবে আমি কুরুচির বা যৌন আবেদনের নামগন্ধ পাইনি। তাদেরও একটা মহত্ত্ব বা ডিগনিটি আছে। আগের দিনের সেই সামিসেনবাদিনীর প্রতি সেদিন আমার অন্তরে উদয় হলো শ্রদ্ধা ও কারুণ্য। আমি কে যে আমি ওদের দোষ ধরব! বেশ্যা কি সাধ করে কেউ হয়! হলে ক'জন হয়! হয় প্রাণের দায়ে। হতে বাধ্য হয়। অনেক সময় গুরুজনের নির্বন্ধে। বাল্যবিবাহিতার মতো বালবেশ্যারও স্বাধীনতা নেই। জাপানে তো বাপকাকারাই বেচে দেয় বা দিত। ঘৃণা যদি করতে হয় বিক্রেতাদের করব, ক্রেতাদের করব, কিন্তু ক্রীতদের নয়। গান গেয়ে বা সামিসেন বাজিয়ে বা পরিবেশন করে যে অর্থাগম হয় তাকে পাপের উপার্জন বলতে পারিনে। বরং এই উপার্জন না থাকলে ওই উপার্জন আবশ্যক হয়। তা ছাড়া দেশের নৃত্যকলা সঙ্গীতকলা এতদিন বাঁচিয়ে রাখার ভার তো এই কলাবতীরাই বহন করেছে। আমাদের বাঈজীদের মতো।

আমার পূর্বদিনের বিরক্তি এমনি করে ক্ষীণ হয়ে এলো। তা সত্ত্বেও মনটা বিগড়ে রইল। পেন কংগ্রেসের পার্টিতেও গেইশা! জাপান পেন ক্লাবও কি প্রথার অনুসরণ করবে গড্ডলিকার মতো? না নতুন প্রথা প্রবর্তন করবে? পশ্চিমের দৃষ্টান্ত দেখে। পার্টি তো পশ্চিমেও হয়। পেন কংগ্রেসের ঐতিহ্য মেনে চলা কি জাপানে বা এশিয়ায় অসম্ভব? এই প্রথম এশিয়ার মাটিতে পেন কংগ্রেস বসছে। সব রকমে নিখুঁৎ হওয়া চাই। জাপানীরা এ বিষয়ে সজ্ঞান। আমরাও। তা হলে এইটুকু খুঁৎ থেকে যায় কেন? পরে এ রকম পার্টি আরো দেখেছি। ইহাই নিয়ম। জাপানী মন এর মধ্যে অন্যায় বা অশোভন কিছু পায় না। পঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয় মনও পেত না। বাঈজী না হলে আমাদের অভিজাতদের পার্টি জমত না। বিবাহ ইত্যাদিতে বাঈনাচ দেখতে ইতরভদ্র সবাই ছুটত। ভারতের

ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে এক কদম বেশী এগিয়েছে। সংস্কৃত বা ফার্সী শিক্ষিত হলে মনোভাব জাপানের অনুরূপ হতো। সংস্কৃত সাহিত্যেব বসন্তসেনা এরা। এরা না থাকলে সংস্কৃতি অপূর্ণ থাকে। জাপানী সাহিত্যে সঙ্গীতে নৃত্যকলায় চিত্রকলায় গেইশা না থাকলে নয়। আধুনিক পুরনারী যতদিন না কলাবিদ্যার ভার নিচ্ছে ততদিন এদের কাজ আছে।

চিন্‌জান্‌সোতে ঢুকতেই দেখি পাশাপাশি তিন জন দাঁড়িয়ে। আবার বেরোবার সময় দেখি তাঁরাই। পর পর করমর্দন করলেন আমার সঙ্গে। জাপান পেন ক্লাবের সভাপতি য়াসুনারি কাওয়াবাতা। সহসভাপতি সুএকিচি আওনো। অপর সহসভাপতি কোজিরো সেরিসাওয়া সমসাময়িক জাপানী সাহিত্যের তিন দিক্‌পাল। আশা করেছিলুম সানেআৎসু মুশানোকোজি নাওইয়া শিগা, জুন্‌ইচিরো তানিজাকি ও হারুও সাতোকেও দেখতে পাব। কিন্তু হারুও সাতো পেন ক্লাবের সভ্য নন। অন্য ক'জন সভ্য হলেও কেন জানিনে যোগ দেননি। কোনো দিন না। আমরা কত দূর দেশ থেকে এঁদের দেখতে এসেছি আর এঁরা তোকিওতে বা কাছাকাছি থাকলেও আসবেন না, এটা বিস্ময়কর ও দুঃখকর। তবে দেশে বসেই শুনেছিলুম যে জাপানে পেন কংগ্রেস ডাকা নিয়ে অনেক সাহিত্যিকের অমত ছিল। তাঁদের মতে সময় হয়নি। কিন্তু অধিকাংশের মত ছিল। তাঁরা অধিবেশনের সাফল্যের জন্যে প্রাণপাত করেছেন। তিন দিক্‌পালের সঙ্গে নাম করতে হয় সাধারণ সম্পাদিকা য়োকো মাৎসুওকার। অর্গানাইজ করতে এঁর জুড়ি নেই। কী জাপানে কী ভারতে।

॥ চার ॥

একবার কল্পনা করুন দৃশ্যটা। ভোর হলো, সবাই এক এক করে জাগল, যে যার কাজে বেরিয়ে পড়ল। উঠল না কেবল একজন। সে তার ঘরের জানালা দরজা বন্ধ করে শুতে গেছে। ঘরে আলো ঢোকে না। তাই ভাবছে এখনো রাত আছে। আর একটু ঘুমোনো যাক। এমন সময় টেলিফোন ঝঙ্কার দিল। আঃ! দিল মাটি করে ঘুমটা।

কিন্তু যার কথা বলছি সে আমি হলেও আমি এখানে প্রতীক। লোকটার নাম জাপান। আধুনিক যুগ শুরু হয়ে গেছে কোন্ প্রত্যুষে। এক এক করে ঘটে গেল ইটালীর রেনেসাঁস, জার্মানীর রেফরমেশন, ইংলণ্ডের রাজায় প্রজায় যুদ্ধ, আমেরিকা বলে এক জোড়া মহাদেশ আবিষ্কার ও তাতে উপনিবেশ স্থাপন, সেখানেও রাজায় প্রজায় যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, শিল্পবিপ্লব, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, নিউটন থেকে ডারউইন, সাহিত্যের যুগযুগান্তর, চিত্রকলার রূপরূপান্তর, দর্শনে ঈশ্বরবাদ থেকে মানববাদ। এমনি করে এলো ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। জাপান তখনো কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে। টেলিফোন বেজে উঠল কমোডোর পেরির জাহাজের গর্জনে।

তার পর ঘটনার স্রোত জলপ্রপাতের মতো লাফিয়ে চলল। জাপান সংকল্প করল আধুনিক হবে। চার শতাব্দীর পথ সে চার দশকে অতিক্রম করল। রুশজাপানী যুদ্ধে সে দুনিয়াকে দেখিয়ে দিল যে আধুনিকতার দৌড়ে সে রুশকেও ছাড়িয়ে গেছে। আরো তিন দশক পরে সে তিন মহাশক্তির অন্যতম হলো। তার সামনে রইল দুটিমাত্র ঘোড়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন। আর এক দশক পরে তাকে ঘায়েল করতে পরমাণু বোমার সাহায্য নিতে হলো। ঘটনাচক্রে সেটা মার্কিনরা উদ্ভাবন করেছিল। জাপানীরা করে থাকলে কী ঘটত তা ভাববার কথা। কেননা সে বিষয়ে

তাদের বিবেকের বাধা ছিল না।

যুদ্ধশেষের পর আরো এক দশক কেটে গেছে। ইতিমধ্যেই জাপানের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এত সত্বর আরোগ্য একমাত্র পশ্চিম জার্মানীর বেলা সম্ভব হয়েছে। ফ্রান্সের বেলা ইটালীর বেলা হয়নি। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর পরে জাপানেরই নাম করতে হয় আজকের দুনিয়ায়। তবে নব্য চীন এখন জাপানের চেয়েও দ্রুত বেগে ধাবমান। ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন বোমা ও রকেট পড়ে কার কী দশা হয় কে জানে। জাপান কিন্তু যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে না। সে যুদ্ধ চায়ও না। জনমত যুদ্ধবিরোধী। এটা সুলক্ষণ। পরমাণু বোমা পড়ে এইটুকু মঙ্গল হয়েছে যে যুদ্ধজ্বর সেরে গেছে। চিরতরে না হোক, বহুকাল তরে।

কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রা দিলে কুম্ভকর্ণের মতো খিদে পাবেই। জাগৃতির পর জাপানের ক্ষুধা কেবল সাম্রাজ্যের বা শক্তির ক্ষুধা ছিল না। ছিল জ্ঞানেরও। প্রগতিরও। ইউরোপের দিকে আড়াই'শ বছর মুখ ফিরিয়ে থাকার পর ইউরোপকেই সে গুরু করল। ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইটালিয়ান রাশিয়ান ভাষা শিখে সে-সব সাহিত্য থেকে সরাসরি তর্জমা করল রাশি রাশি গ্রন্থ। যা আমরাও করিনি। শুধু গল্প উপন্যাস নয়, কাব্য নাটক প্রবন্ধ ধর্মতত্ত্ব দর্শন বিজ্ঞান কলাবিধি যেখানে যা কিছু মূল্যবান মনে হলো। জাপানীরা বইয়ের পোকা। কেউ নিরক্ষর নয়, কিনে পড়ার অভ্যাস আছে বাড়ির ঝি'রও। জাপানী বই লাখো লাখো বিক্রী হয়। এই তো সম্প্রতি একটি মেয়ে একখানি উপন্যাস লিখেছে। এরই মধ্যে দু'লাখ কেটেছে। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা স্তাঁদাল মোপাসাঁ টলস্টয় ডস্টইয়েভ্স্কি এখন জাপানী ভাষার ক্লাসিক হয়ে গেছে। খুব কম জাপানী বইয়ের জনপ্রিয়তা এসব ক্লাসিকের চেয়ে বেশী।

অতি দীর্ঘকাল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা জাপানের ভাগ্যে যেমন ঘটেছে তেমন চীনের বা ভারতের ভাগ্যেও নয়। এই যে আইসোলেশন এর প্রভাব মানুষের মনের উপরও পড়েছে। একটি নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে থাকতে কারই বা ভালো লাগে! জাপান তাই চায় নিজের খোলার বাইরে আসতে। দুনিয়ার সঙ্গে মিশতে। নিতে আর দিতে। এই আকাঙ্ক্ষা থেকে এলো জাপানের মাটিতে পেন কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা। উদ্বোধনের দিন সাঙ্কেই হলে প্রতিনিধি ও দর্শকের লোকারণ্য। কাওয়াবাতা তাঁর অভ্যর্থনাভাষণে গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন যে পৃথিবীর এতগুলি দেশের এত জন সাহিত্যিকের এক ঘরে মেলা হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে জাপানে বা আর কোনো প্রাচ্য দেশে আর কখনো হয়নি। আমারও মনে হচ্ছিল যে একটি ছাদের তলে একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মানব পরিবারকে। যেন একটি ছোটখাটো ইউনাইটেড নেশনস। সাহিত্যের ক্ষেত্রে। এই অধিবেশনে ইউনেস্কোরও সাহচর্য ছিল। পরে যে সিম্পোজিয়ম হলো সেটার আয়োজক পেন তথা ইউনেস্কো।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক সাহিত্যিকের আসার কথা ছিল। আসা হয়নি। তাই দেখতে পাওয়া গেল না মোরিয়াক বা মোরোয়া বা সিলোনে বা রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে। আসতে পেরেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিলেন আঁদ্রে শাঁর্স, জন স্টাইনবেক, জন ডস পাসস্, এলমার রাইস, আলবের্তো মোরাভিয়া, স্টীফেন স্পেণ্ডার, জাঁ গেনো। শেষের জন রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ও রম্যাঁ রলাঁর বন্ধু। আর ছিলেন হেলমুথ ফন গ্লাসেনাপ। ভারতবন্ধু। আমার পুত্রের শিক্ষাগুরু। টিউবিঙ্গেনের অধ্যাপক। স্টাইনবেক তো সেই একদিন দেখা দিয়েই অদর্শন হলেন। তাঁরই ভক্ত সংখ্যা সব চেয়ে বেশী।

উদ্বোধনের দিনটিতে 'ভারত', 'পাকিস্তান', 'ইটালী', 'ফ্রান্স' প্রভৃতি নামাঙ্কিত বিভিন্ন ভুক্তি ছিল না। আমরা যে যার খুশিমতো যেখানে সেখানে বসেছিলুম। একজনের খুশির সঙ্গে

আরেকজনের খুশি মিলতে মিলতে এমন হলো যে পাশাপাশি আসন নিলুম সৈয়দ আলী আহ্‌সান, কুরাতুলাইন হায়দর, কমলা ডোঙ্গরকেরী ও আমি। আমার পাশে জম্বুনাথন। পাকিস্তান ও ভারত একাকার হয়ে গেল। ওই একটি দিনের জন্যে। সোমবার দোসরা সেপ্টেম্বর আমার কাছে এই একটি কারণে স্মরণীয়। ভারতে যা সম্ভব হলো না, পাকিস্তানে যা সম্ভব হলো না, জাপানে তা সম্ভব হলো। কুরাতুলাইন হায়দর আমাকে তাঁর একখানি বই পড়তে দিয়েছিলেন পরে একদিন। দেশবিভাগের দুঃখ তাঁর অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত। সমস্যার সমাধানটা কী হলো, শুনবেন? হিন্দু-মুসলমান বন্ধুবান্ধবীরা ভারত ছেড়ে পাকিস্তান ছেড়ে মিলিত হলেন গিয়ে লণ্ডনে। ইংরেজকে তাড়াতে গিয়ে নিজেরাই তাড়িত হলেন ইংরেজের বিবরে। মিলনের আর কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া গেল না। কিন্তু সুখী তাঁরা কেউ নন। প্রত্যেকেই অসুখী। সে অসুখ যে সারবে তারও কোনো অঙ্গীকার নেই। বিষাদ। কালিমা। অন্তহীন নৈরাশ্য।

শুনছিলুম কাওয়াবাতার পর ফুজিয়ামার ভাষণ, তার পর আঁদ্রে শাঁসঁর অভিভাষণ। ফুজিয়ামা মহোদয় হলেন জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। ইংরেজী বলেন চমৎকার। পোশাকে ও চালচলনে মার্কিন বা ইংরেজের মতো। যেন তাদেরই একজন! দেখতেও ভালো। তাঁর নিজের একটি চিত্রসংগ্রহ আছে। কলারসিক। সারস্বত না হলেও সরস্বতীর একজন ভক্ত। গুণী না হলেও গুণগ্রাহী। আর আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির ছবি আঁকা নাকি তাঁর হবি।

একটা নতুন কথা শোনালেন ফুজিয়ামা মহোদয়। সুকিয়াকি ও তেম্পুরা জাপানীদের প্রিয় ব্যঞ্জন। সকলে জানে জাপানের বিশেষত্ব। কিন্তু আসলে তা নয়। পাশ্চাত্য ব্যঞ্জনের জাপানী প্রতিযোজন। জাপানীরা আধুনিক ইউরোপের কাছে আমেরিকার কাছে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত শিখেছে, শিল্পেরও চরম দেখেছে, পোশাক তো নিয়েছেই, খানাপিনাও নিয়েছে, নিয়ে বদলে দিয়েছে। তবে এ কথাও বললেন ফুজিয়ামা যে পশ্চিমারাও জাপানীদের কাছ থেকে নিতে কসুর করেনি। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইউরোপীয় ইম্‌প্রেশনিস্ট চিত্রীরা জাপানী উডব্লক চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত। আব আজকের দিনের পাশ্চাত্য বাস্তুশিল্পের ভিতর জাপানের চা-পানকক্ষের ও কিয়োতোর কাৎসুরা প্রাসাদের লাবণ্য প্রবেশ করেছে। পরে একজন মার্কিন প্রধানের কাছে এই ধরনের কথা শুনেছি। জাপান কেবল নিচ্ছে না, দিচ্ছেও। তার পর ফুজিয়ামা মহোদয় এ কথাও বললেন যে তাঁর আধুনিক পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিত্রের গভীর তলদেশে এমন কিছু লুকোনো আছে যা নির্ভুল জাপানী।

পেন কংগ্রেস যদিও লেখকদের সংগঠন তবু অন্যান্য বছর দেখা গেছে লেখকদের যত মাথাব্যথা রাজনীতি নিয়ে। এবারকার অধিবেশনেও রাজনীতির ছায়া পড়েছিল। ইউরোপ, আমেরিকা থেকে অনেক কষ্ট করে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলেন নির্বাসিত হাঙ্গেরিয়ান লেখকপ্রতিনির্ধিরা। কোনো সন্দেহ নেই যে হাঙ্গেরীতে লেখকের স্বাধীনতার দীপ নিবে গেছে। কিন্তু ভিন দেশের লেখকেরা কেমন করে সে দীপ জ্বালাবেন বা জ্বালাতে সাহায্য করবেন, যদি গোড়া থেকেই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যান? নিজেদের সঙ্ঘকে দ্বিখণ্ডিত করে সোভিয়েটের যাত্রাভঙ্গ করাই কি হাঙ্গেরীতে দীপ জ্বালানোর প্রকৃষ্ট উপায়? শাঁসঁ তাঁর অভিভাষণে হাঙ্গেরীর উল্লেখ না করে সাধারণভাবে মূলনীতি ব্যাখ্যান করলেন। ফরাসী থেকে এক দফা ইংরেজী হয়েছে, তার থেকে বাংলা করলে জোর থাকবে না। তাই ইংরেজী থেকে তুলে দিচ্ছি কয়েকটি অংশ। বলা বাহুল্য এ ইংরেজী অনুবাদকের কাঁচা হাতের ইংরেজী।

'We all know that in this world which has been at the mercy of disorder and injustice nothing is easier then opposing one another. We all know the questions tending to separate us in two camps, making us deaf and blind. It is for this reason

that I want to affirm, above all, that we have not made such a long journey, that we have not crossed so many skies and that we have not come to your islands so full of human virtues that we can learn here what divides us. We are not here to solve political problems on which we shall never come to agreement and which is not our field of activity, but to render service to those human values which are our common heritage, even when we are separated from one another by the confusion of events and by the political structure, by ideologies and by myths...The President of the P.E.N. ought not to behave like a man of politics—a man of politics devoid of all powers who is destined to serve those who are truly powerful, but he ought to behave as a writer...I did my best only to be a writer who represents the writers of all parts of the world and I have never taken any particular position toward various events except when the liberty and even the life of some of our collegues seemed to be in danger...The liberty of spirit is an eternal conquest. It is not within our capacity to maintain this against all the dangers, but we nevertheless have the duty to protest each time certain people among us are exposed the danger merely because of their saying what they believe just. It is the menace of the sword which indicates the moment for us to be up and in action...We should, in fact, be capable of maintaining our unity and maintaining this unity, we may have to accomplish certain duties...'—(Andre' Chamson)

লেখনীর প্রতাপ নাকি খড়্গের চেয়ে জোরালো। তাই যদি হবে তবে লেখকরা তো কলম দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতেন, তাঁদের একদলকে দেশ ছেড়ে দৌড় দিতে হতো না, আরেক দলকে জেলখানায় পচতে হতো না, কয়েকজনের প্রাণদণ্ড হতো না। তা হয় না বলেই আন্তর্জাতিক লেখক সঙ্ঘের কণ্ঠক্ষেপের প্রয়োজন হয়। এবং এই কণ্ঠক্ষেপ কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়। তার প্রমাণ আমাদের অধিবেশনে যোগ দিতে এসেছেন ইন্দোনেশিয়ার কারাগার থেকে সদ্যমুক্ত সুতান তাকদির আলীশাবানা। আমরা কোনো কোনো লেখকের প্রাণদণ্ড মকুব করাতে সমর্থ হয়েছিও। এইপর্যন্ত আমাদের সাধ্যের সীমা। এ সীমা লঙ্ঘন করতে গেলে ওজন হারাব। আর এইপর্যন্ত যে সাধ্যে কুলিয়েছে এটা আমাদের সংগঠনের ঐক্যের গুণে, প্রতিপত্তির গুণে। সংগঠন যদি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়, এক শিবির যদি অপর শিবিরকে বিতাড়ন করে তবে আমাদের পক্ষে বলা কঠিন হবে যে আমরা বিশ্বের লেখক, আমাদের কণ্ঠস্বর বিশ্বের কণ্ঠস্বর।

শাঁসঁ এসব কথা বেশ স্পষ্ট করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, তাই অপরাহ্নের সিদ্ধান্তটা প্রাজ্ঞের মতো হলো। কিন্তু এই সভাপতি যদি ইউরোপের তপ্ত আবহাওয়ায় এসব তত্ত্ব বপন করতেন সেটা হতো বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো। বেশীর ভাগ লেখকই আসতেন ঘরের কাছ থেকে। দূরে আসার দুঃখ পোহাতে হতো না বলে দায়িত্ববোধটাও ঢের কম হতো। সুতরাং সভাপতিকে সাহায্য করেছে সভার দূরত্ব। জাপান আমাদের আহ্বান করে আমাদের সংহতি রক্ষা করেছে। আমরা রাজনীতির বি-টীম নই। আমরা সাহিত্যের এ-টীম। আমরা যদি নিজেদের স্বাধীনতা রাজনীতিকদের পায়ে বিকিয়ে না দিই তা হলে আমাদের সমানধর্মাদের স্বাধীনতার জন্যে এ-টীমের খেলোয়াড়ের মতো খেলতে পারব। লেখকেরা আপনাদের মর্যাদা রেখেছেন। এটা শুভ।

দুপুরে জাপান পেন ক্লাবের নিমন্ত্রণে ইণ্ডাসট্রিয়াল ক্লাবে লাঞ্চন। জীবনে কখনো আইসল্যাণ্ডের লোক দেখিনি। আমার বাঁ পাশে জলজ্যান্ত আইসল্যাণ্ডের মানুষ। টোমাস গুডমুণ্ডসন। ভদ্রলোক খেতে খেতে হঠাৎ উঠে গেলেন। আর ফিরলেন না। পরে আবার দেখা হয়েছিল। বললেন সারা রাত ঘুম হয়নি, তাই অসুস্থ বোধ করছিলেন। এক ট্যাক্সিতে যেতে যেতে

আইসল্যাণ্ড সম্বন্ধে কথাবার্তা হলো। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ এঁদের রচনা ওদেশের লোক পড়ে। ওদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর দৃষ্টান্ত ওদের প্রেরণা জুগিয়েছে। কোথায় ভারত আর কোথায় আইসল্যাণ্ড! এক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অপর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক হলো গান্ধীজীর কল্যাণে। পরের দিন কোকুসাই হলের সিম্পোজিয়মে দেখলুম 'আইসল্যাণ্ড'-এর পাশেই 'ইণ্ডিয়া'।

সন্ধ্যায় আবার ইণ্ডাসট্রিয়াল ক্লাবে নিমন্ত্রণ। এবারকার নিমন্ত্রক সস্ত্রীক পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আইইচিরো ফুজিয়ামা ও মিসেস ফুজিয়ামা। প্রধান মন্ত্রী কিশি স্বয়ং অলঙ্কৃত করেছিলেন। নানা দেশের রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের সহধর্মিণীরাও শোভাবর্ধন করেছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে টেবিল থেকে তুলে নিয়ে পানভোজন। সান্ধ্য পার্টি, অথচ গেইশা নেই। মহিলাদের সংখ্যা অধিক। তাঁদের কারো কারো স্বামী জাপানের রাষ্ট্রদূত বা কনসাল হয়ে ইউরোপ আমেরিকায় কাজ করছেন, তাই তাঁদেরও সেসব দেশে বাস করা হয়েছে। হয়েছে উচ্চতর সমাজে চলাফেরা। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে আলাপ হলো। আর হলো খোদ ফুজিয়ামার সঙ্গে। আকৃতি আর প্রকৃতি দুই অতি যত্নে মার্জিত।

মঙ্গলবার সিম্পোজিয়ম শুরু। এবারকার অধিবেশনের প্রধান অবলম্বন একালের ও ভাবীকালের লেখকদের উপরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের পারস্পরিক প্রভাব। জীবনধারায় তথা নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যনির্ণয়ে। ইউনেস্কো থেকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে বহু বিশেষজ্ঞ নানা দেশ থেকে সমাগত হয়েছিলেন। সকালবেলাটা দেওয়া হলো তাঁদের কয়েকজনকে। কিছু না কিছু ভাববার কথা প্রত্যেকের ভাষণে ছিল। লক্ষ করে আনন্দিত হলুম যে আমাদের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সকলের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। কিন্তু পোলাণ্ডের আণ্টনি স্লোনিমৃস্কি (Antoni Slonimski) যেমন দাগ কাটলেন তেমন আর কেউ নয়। গভীর বেদনা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত যে উক্তি তার কি কোনো তুলনা হয়! বলতে বলতে তিনি একসময় আত্মহারা হয়ে যা বলে বসলেন তার জন্যে হয়তো দেশে ফিরে গিয়ে তাঁকে দণ্ড পেতে হবে। আর কেইবা নিয়েছে এমন ঝুঁকি! তিনি বললেন,

'The Communism of the Stalin era created many myths. Recent times have seen life itself, and personal freedom, dependent on the sentence of a powerful deity and on the whim of a galaxy of vindictive demons. We have no certainty that the era will not be repeated. How, then, shall we give battle to such resurgent demons? Apt here is the well-known answer of Confucius to disciples who questioned him concerning the roles of deities and demons : 'Have as little to do with them as possible. First study how you may live with your fellow men in peace, justice and love.' When asked what he would do first for the people, he replied, 'feed and enrich them'; what next, he replied, 'educate them.' This rationalistic programme, which exercised an important influence on eighteenth century Europe, is today acquiring a new actuality. On whether victory goes to the old deities and demons of totalitarianism, or to free, rationalistic human thought, depends not only the immediate fate of many Chinese and Polish intellectuals—but also the future of the ideology of socialist humanism.'—(Antoni Slonimski)

সেই দিন বিকেলে আমার পালা। সে সময় সভা দু' ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগের আলোচ্য জীবনধারা। অপর ভাগের বিবেচ্য নন্দনতাত্ত্বিক মূল্য। আমি বেছে নিয়েছিলুম জীবনধারা। লিখে নিয়ে গেছলুম ইংরেজীতে। মনে মনে আশঙ্কা ছিল আন্তর্জাতিক লেখকদের সভায় যদি সপ্রতিভভাবে

বলতে না পারি, যদি কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেলি, যদি আসল বক্তব্য ভুলে যাই, যদি লাজে ভয়ে হতবাক্ হই তা হলে হংসোমধ্যে বকোযথা হয়ে মুখ দেখাব কী করে! পরে শুনলুম সভাপতির আসন থেকে সোফিয়াদি বলছেন, অবিকল ভারতের মনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। স্বস্থানে ফিরে যেতেই কমলাবোন বললেন, বাচন ত্রুটিহীন হয়েছে। বাংলা না করে ইংরেজী থেকেই তুলে দিচ্ছি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি।

'We found it impossible to reject the Gandhian way. We also found it impossible to reject the modern or, for that matter, the western. Did this mean that we accepted what we could not reject? That was also impossible. For one thing we were disenchanted with the modern West, disillusioned after World War I, sickened after World War II. For another we were not sure that in following the Gandhian way we would not undo a century and half of evolution and return to the Middle Ages. There are wild men in India who care nothing for Non-violence and Truth and whose one object is to restore the good old days of the privileged castes of India. Modernisation is therefore a stern necessity and it must be carried out with a firm hand. But the means towards this end should not be unfair or evil. Enforced modernisation cannot lead to a flowering of the spirit... We are passing through much inner travail. We have the feeling that in the process of modernisation we are moving further and further not only from our enemy, medievalism, but also from our friend, Gandhism...Great masses of men have been enfranchised. If they, in their impatience, throw to the winds their traditional reverence for life and respect for truth, ceasing to distinguish between right and wrong, their country's modernisation will only land it in greater disaster. Their rulers should be well-advised to guard against disaster by ruling out violent and untruthful means. On the other hand there should be no undue delay in the evolution of the country. Rapid evolution is the only substitute for revolution. While we must not lose our soul for the world we should not lose the world for the sake of the soul. For a disinherited people long exploited by foreign and indigenous elements this is also necessary. I have tried to give a picture of what is in the mind of the writers of India at the present day A struggle is in progress in that mind between the modern, the traditional and the Gandhian ways of life. A satisfactory ***modus vivendi*** may be worked out some day but what we have today is an unreal compromise not worthy of serious scrutiny. There can be no great art or literature unless a solid foundation is laid in truth and love...India's age-old preoccupation with the eternal verities, with the first and the last things, will never take a secondary place or fade away. The best that is in her is permanently attuned to these verities...The inherent contradictions between the modern way and the Gandhian way will increasingly come to the fore. Writers will perhaps be forced to make a choice between the two and it will be an agonising choice to make either way. Western writers have no such agony ahead of them. Here we have to carry the masses with us one way or the other or become completely inconsequential.'—(Annada Sankar Ray)

এবার আমার ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গেল। আমি হালকা বোধ করতে থাকলুম। কখন এক সময় উঠে গেলুম বাইরে গলাটা ভিজিয়ে নিতে। কফি কি চা দিয়ে। আড্ডা জমানোর জন্যে সেখানে কোনো সময় লোকের অভাব হতো না। নানা দেশের লেখক। জাপানী দর্শনার্থী। অটোগ্রাফপ্রার্থী। ফোটোগ্রাফগ্রহণেচ্ছু।

আমার নাম লেখা পায়রার খোপে হাত দিয়ে দেখি একতাড়া কাগজপত্র। পুস্তিকা। চিত্র। প্রায়ই এ রকম থাকে। কেবল পেন কংগ্রেসের নয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেওয়া। হোটেলেও আমার ঘরে পড়ে থাকে এমনি কত রকম উপহার। ফুলের তোড়া, প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ, ক্যালপিস নামক পানীয়, গল্পের বই, কবিতার বই, প্রবন্ধের বই। কোথায় যে রাখব এসব। টেবিল চেয়ার যে ভরে উঠল। স্ত্রী সঙ্গে নেই, তবু তাঁর জন্যে একটি শয্যা ছিল। সেটিও বইপত্রের বাহন হলো।

সন্ধ্যাবেলা ব্রিটিশ কাউন্সিলে ককটেল পার্টি। ডক্টর ফিলিপ্‌সের নিমন্ত্রণ। ভাবলুম শেরোয়ানি পায়জামা পরে যাওয়া যাক। জাপানীর কাছে আমি পাশ্চাত্য সাজতে পারি, ইংরেজের কাছে আমি প্রাচ্য। পায়জামা পরতে গিয়ে দেখি ফিতে নেই। যাঁর উপর গোছানোর ভার ছিল তিনি পরখ করেননি কোমরে জড়ানোর ফিতে আছে কি না। চুড়িদার। পায়জামা। পরতেও কষ্ট, খুলতেও কষ্ট। সময় নেই যে দ্বিতীয়বার কষ্ট করব। চললুম তাই পরে, একটা সেফটিপিন এঁটে, সামলাতে সামলাতে। দুই হাতে পায়জামা আঁকড়ে ধরে পার্টিতে খাবার হাতে নেবার জন্যে তৃতীয় একখানা হাত পাই কোথায়? চতুর্থ হাতেরও দরকার হলো পানীয় যখন এল। না, না, কক্‌টেল নয়। রামচন্দ্র! আমার দৌড় ঐ কমলালেবু বা পাতিলেবুর শরবত অবধি। বড়জোর বিলিতী বেগুনের রস। যা বলছিলুম। অবস্থাটা সোফিয়াদিকে খুলে বলতে হলো। আর একটা সেফটিপিন তাঁর কাছেও ছিল না। দিলেন কুরাতুলাইন হায়দর।

ককটেল পার্টিতে ভারতফেরতা ইংরেজদের সঙ্গে জমে গেল। জাপানে তাঁরা খুব সুখী নন। ইংরেজের সে প্রতিপত্তি আর নেই। লক্ষ্য করেছি পেন কংগ্রেসের ইংরেজ প্রতিনিধিদের দিকে কেউ বড় একটা ঘেঁষে না। তাঁদের চেয়ে মার্কিনদের ও ফরাসীদের ঘিরে ভিড় বেশী। এর কারণ কি জাপানীদের প্রতিবাদসত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষণ? আমাদের আসার আগে এই নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন বসেছিল জাপানে। তাতে ভারত নিয়েছিল জাপানের পক্ষ। জাপানীরা এর জন্যে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতার পাত্র হলুম আমরাও। কিন্তু ইংরেজ বেচারাদের চেহারা যতবার দেখেছি ততবার মনে হয়েছে জাপানে তাঁরা ভিজেবেড়াল।

রাত্রে ভারতীয় দূতাবাসের হেজমাডি আমাদের কর্ণাটী খানা খাওয়ালেন। আমাদের মানে আমাদের তিনজনকে। সোফিয়াদি, কমলাবোন ও আমি তাঁদের ম্যানেজার মিলে তিন।

।। পাঁচ ।।

স্বনামা পুরুষো ধন্য পিতৃনামা চ মধ্যমঃ। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর টিউবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেলমুট ফন গ্লাসেনাপ (Helmuth von Glasenapp) মহাশয়কে যখন পরিচয় দিলুম তখন আমি পুত্রনামাঃ। ফুজিয়ামার পার্টিতে তিনি পার্শ্ববর্তী অন্য একজন জার্মানকে অধমের সম্বন্ধে রসিকতা করে বললেন, 'এঁর ছেলে আমার ছাত্র। এঁকে কিন্তু ওর দাদার মতো দেখায়।'

বুধবার প্রাচ্য পাশ্চাত্য সিম্পোজিয়মের জের টানা হলো। আরম্ভ করলেন ফন গ্লাসেনাপ! যা বলে আরম্ভ করলেন তা আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো।

'India has lavished the treasures of her literature on all the countries of Southern

and Eastern Asia. From Siberia to Indonesia and from Afghanistan to Japan, Buddhist missionaries have spread the knowledge of the sacred writings of their faith. And, together with Buddhist legends and poems, they have made known to the Eastern world Hindu thought and Hindu art, so that not only Buddhist narratives but also many other Indian tales and stories have found their way to China, Japan, Tibet and many other regions. The Buddha Jayanti Festivals in Delhi (1956) have shown how much all nations of Asia feel themselves indebted to India and how inspiring and stirring the idea of San-go-ku still is in our time, the idea that the three countries India, China and Japan have much in common because of their Buddhist heritage.'—(Helmuth von Glasenapp)

এর পর তিনি প্রতীচীর উপর ভারতের প্রভাব আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। আশ্চর্যের কথা বুদ্ধকে নায়ক করে অপেরা রচনা করেছিলেন Max Vogrich ও Adlof Vogl আর স্বয়ং Richard Wagner একটি অপেরাতে বৌদ্ধ কিংবদন্তী ব্যবহার করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর সেই অপেরা Die Sieger (বিজয়ীরা) শেষ করে যেতে পারেননি। শুনে মুগ্ধ হলুম বুদ্ধ সম্বন্ধে এক শ' বছর আগে লেখা তাঁর বাণী।

'Buddha's teaching calls for such a grand view of life that every other doctrine must seem rather small when compared with it. In this wonderful and incomparable conception of the world the most profound of philosophers, the most magnificently successful of scientists, the most extravagantly imaginative artist an the man whose heart is most widely open to all that breathes and suffers can find an abiding place.'

আধুনিক বা সমসাময়িক ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যাপক তেমন ওয়াকিবহাল নন মনে হলো। তার প্রভাব কি পাশ্চাত্য সাহিত্যে পড়েনি? কেন তবে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করলেন না তিনি? আমার অন্তরে খেদ রাখলেন না সেদিনকার শেষ বক্তা ফরাসী সাহিত্যিক জাঁ গেনো (Jean Guehenno)। তাঁর শেষ উক্তি রবীন্দ্রনাথের উক্তি। কিন্তু তার আগে ইটালীর প্রখ্যাত লেখক আলবের্তো মোরাভিয়া কী বললেন তা শুনুন। সবটা নয়, একটুখানি।

'Finally a word on what Italy may have to offer to the East. The world view dominant in Italy is that of Renaissance humanism. It is a view which puts at the centre of the world not religion, an ideology of the state of society but Man, and which helps man to stand above any oppression or domination. The Italian Renaissance concerned of man as the most beautiful plant in nature not to be limited by any outward force and to be left to grow according to his own genius, with all its contradictions, deficiencies and qualities. This view is found in all the masterpieces of Italian literature and also, perhaps more humbly, yet in a clear enough way, in the film and in contemporary literature and thought.'(Alberto Moravia)

জাঁ গেনো প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন কুণ্ঠার সঙ্গে। তখন ১৯১৬ সাল। তাঁর বন্ধুরা নিহত।

'All of Europe had fallen into that folly where to live, one often lost every reason to live. I was in a state of despair. Chance put before me a lecture delivered by a Hindu writer in Japan. It was the message to Japan of Sir Rabindranath Tagore.'

কল্পনা করুন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কবিগুরুর নাম শুনে কেমন চমক লাগল আমার চিত্তে। কেমন দুলে উঠল আমার বুক যখন শুনলুম জাঁ গেনো আবৃত্তি করছেন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির...।' তার পর বলছেন,

'Then, I submit, we prayed the same prayer for our country. Such is what is called 'influence.' I can evaluate to this day what at that moment in my life, in 1916, where what Tagore called the 'counsels of one man to another.'—(Jean Guehenno)

সেদিনকার বৈঠক সেইখানেই শেষ। আমার স্মরণে তখনো ঘুরছিল জাঁ গেনোর কথা, 'Allow me to evoke memory of a personal debt to the Orient for having helped me back on the path of Man.' হায়! যে বাণী জাপান থেকে ফ্রান্সে গিয়ে ফরাসীকে মানবতার পথে ফিরে যেতে সাহায্য করল সে বাণী জাপানীদের ভালো লাগল না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'জাপানে আসিবার সময় যাঁহাকে সমগ্র জাতি অভ্যর্থনা করিয়াছিল—তাঁহাকে বিদায় দিবার ক্ষণে জাহাজঘাটে কোনো জনতার ভিড় হয় নাই—একমাত্র হারাসান তাঁহার অতিথিকে বিদায় দিবার জন্য উপস্থিত হন।'

সেদিন আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সাঙ্কেই কাইকানেরই ন'তলায়। শিনতোকিয়া রেস্টোরান্টের হল-ঘরে। নিমন্ত্রণকর্তা জাপানের শিক্ষামন্ত্রী তো মাৎসুনাগা এবং ইউনেস্কোর জাপান ন্যাশনাল কমিশনের সভাপতি তামোন মাএদা। আমাকে যেখানে আসন দেওয়া হয়েছিল সেটা প্রধানত ফরাসীদের টেবিল। দুই পাশে দুই ফরাসী লেখিকা, আনি ব্রিয়ের (Annie Brierre) আর ওদেৎ দ্য সাঁ-জুস্ত (Odette de Saint-Just)। পুরোপুরি ফরাসী পদ্ধতির রন্ধন পরিবেশন। ওয়েটারদের সাজপোশাক পাশ্চাত্য। মনে হলো ইউরোপের কোনোখানে বসে খাচ্ছি আর গল্প করছি। যত রাজ্যের গল্প।

আনি ব্রিয়েরকে জিজ্ঞাসা করলুম রবীন্দ্রনাথের আর রম্যাঁ রলাঁর লেখা আজকের ফ্রান্সে কেমন চলে। উত্তর পেলুম, বেশী নয়। তবে তিনি স্বীকার করলেন মানুষ হিসাবে উভয়ের মহানুভবতা। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যোগ করলেন, 'He is one of the great poets of the world.' পরে একদিন জাঁ গেনোকে হাতের কাছে পেয়ে একই প্রশ্ন করেছিলুম। অনুরূপ উত্তর পেয়েছিলুম। রলাঁ তাঁর বন্ধু। রলাঁর জার্নালে আমার উল্লেখ আছে। সেই সূত্রে আলাপ জমে। তিনি যা বললেন তার মর্ম, তখনকার দিনে রলাঁ ছিলেন সত্যি বড়। সেসব দিনও তো আর নেই। লোকে যদি না পড়ে কী আর করা যাবে!

একালের ফরাসীরা যাঁর লেখা এত বেশী পড়ে সেই ফ্রাঁসোয়াস্ সাগাঁ (Francoise Sagan) সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসা হেসে উড়িয়ে দিলেন ওদেৎ দ্য সাঁ-জুস্ত। কন্যাটির সাহিত্যিক গুণপনা তিনি মানতেই চাইলেন না, কিন্তু একটি গুণের কথা বললেন যা সব গুণের চেয়ে দুর্লভ গুণ। ফ্রাঁসোয়াস্ সাগাঁ গরিবের দুঃখ সইতে পারেন না। লক্ষ লক্ষ টাকা পান, সমস্ত বিলিয়ে দেন। নিজের জন্যে রাখেন না। মনে মনে নমস্কার করলুম তাঁকে। আমার কেমন একটা ধারণা জন্মেছিল 'Bonjour Tristesse' যাঁর লেখা তিনি উত্তর জীবনে রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনী হবেন। তার আংশিক সমর্থন মিলে গেল।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আজকের দিনের ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে বাংলার নাম রেখেছেন কে, বলব? সুধীন ঘোষ। আনি ব্রিয়েরের বহুকালের বন্ধু। ঘোষের সুযশ আমি অনেক পূর্বে অবগত ছিলুম। কিন্তু সে যশ যে কত ব্যাপক তা সেই দিন প্রত্যয় হলো। তখন আমি কেমন করে জানব যে রবীন্দ্রনাথের স্থান থেকে সুধীন্দ্রনাথের প্রস্থানটা সোফোক্লিসের ট্র্যাজেডীর মতো অনিবার্য হবে। কুকুরকে ফাঁসীতে লটকাতে হলে বদনাম দিতে হয় তার আগে। কিন্তু মানুষকে মেরে খেদিয়ো দিয়ে অপঘোষণা করতে হয় তার পরে। যাতে গেঁয়ো যোগী আর ভিখ না পায় স্বদেশে। ফাঁসী নয়, দ্বীপান্তর।

আহারের পর আমরা সদলবলে স্থানান্তরিত হলুম কান্‌জে কাইকান ওমাগারিতে। সেখানে নো (Noh) নাট্যাভিনয় দেখতে। নো আর কাবুকি হলো জাপানী নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য। পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের একদিন নো দেখানোর একদিন কাবুকি দেখানোর বন্দোবস্ত ছিল। অতিথি হিসাবে। নো আর কাবুকি দুই পুরাতন, দুই ক্লাসিকাল। নো আরো বেশী। তার উৎপত্তি প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বে। তখনকার দিনের দু'শ' চল্লিশখানা নাটক এখনো অভিনয় করা হয়। তার কতক কান-আমি'র রচনা। বাদবাকী তাঁর পুত্র জে-আমি'র লেখা বা পুনর্লিখন। এত কাল পরেও তার ভাষা অবিকৃত রয়েছে। কিন্তু তার ফলে একালের লোকের দুর্বোধ্য হয়েছে। নো নাটকের আদর্শ ছিল সেকালে 'যুগেন' বা রহস্যময় তিমির। অথচ তার ভিত্তি ছিল বাস্তববাদ। সঙ্গীত আর নৃত্য তার অঙ্গ। আদিতে তা ছিল মন্দিরের বা পীঠস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত। পরে শোগুনদের আনুষ্ঠানিক বিনোদনে পরিণত হয়। এমনি করে ক্রমে মার্জিত হয় তার রূপ।

নো নাটকের রঙ্গমঞ্চ প্রেক্ষাগৃহের এক কোণ জুড়ে। একটি পাইন তরু আঁকা পশ্চাৎপট। ডানদিকে দেয়াল ঘেঁষে যাতায়াতের পথ সাজঘর থেকে মঞ্চে বা মঞ্চ থেকে সাজঘরে। মঞ্চের সঙ্গে সমতল। বলতে পারেন মঞ্চের একটি বাহু। একে বলে হাশিগাকারি। অভিনেতারা অভিনয় করতে করতে সেই পথ দিয়ে আসেন, অভিনয় করতে করতে সেই পথ দিয়ে যান। সেইখানে দাঁড়িয়েও অভিনয় করেন। দর্শকদের আসন মঞ্চের সামনে ও ডান দিকে বাহুর কাছে। অভিনেতারা সকলেই পুরুষ। নারীচরিত্রের অভিনয়ে নারীর স্থান নেই। মুখে মুখোশ এঁটে সাজপোশাক পরলে চিনতে পারা শক্ত নারী না নারীবেশী পুরুষ। তরুণীর ভূমিকা সব চেয়ে কঠিন বলে সেটি নেন সব চেয়ে বৃদ্ধ ওস্তাদ। তাঁরই পদক্ষেপ ও গমনভঙ্গী সব চেয়ে শরম-নম্র, শ্রীময়। মেয়েরাও নাকি তা দেখে মেয়েলিপনা শেখেন।

অভিনেতা না হলে নাটক হয় না। কিন্তু অর্কেস্ট্রা না হলে নো নাটক হয় না। পশ্চাৎপটের সামনে কিছু ফাঁক রেখে অভিনেতাদের পেছন জুড়ে বসে থাকেন একদল বাদক। তিনটি তিন রকম ঢাক ও একটি বাঁশি নিয়ে। তাঁদের দলপতি মুখ দিয়ে অদ্ভুত সব আওয়াজ করেন। সেসব উঠে আসে বুক থেকে। একে বলে 'আত্মার আবাহন'। এভাবে আবহ সৃষ্টি না করলে অভিনয় জমাট হয় না। নো নাটক যেন এক এলিমেণ্টাল ব্যাপার। ভিত্তি হয়তো বাস্তব, কিন্তু অভিনয় প্রতীকধর্মী, প্রযোজনা সঙ্কেতময়। পাপপুণ্যের বা ভালোমন্দের দ্বৈরথ চলেছে জগৎ জুড়ে। নো নাট্যভূমি তারই সংক্ষিপ্তসার। পাত্রপাত্রীরা কেউ ব্যক্তিরূপে রূপবান বা মূল্যবান নন। তাঁদের একজন হলেন শিতে বা উত্তমপক্ষ। একজন ওয়াকি বা মধ্যমপক্ষ। আর দুজন দুই পক্ষের জুরে বা সমর্থক। এ ছাড়া থাকে জি বা কোরাস। এই নিয়ে নো নাটকের কাঠামো। কোনো কোনোটাতে লোকসংখ্যা বেশী থাকে। কোনোটাতে কম। নো নাটক মাত্রেই পদ্য-নাটক। ছোট ছোট দু'খানা নাটকের মাঝখানে একটা তামাশা থাকে, তাকে বলে কিয়োগেন। সেটা গদ্য। মঞ্চের কোনখানে শিতের আসন কোনখানে ওয়াকির আসন তাও প্রথানির্দিষ্ট। তাঁরা থাকেন কোনাকুনি।

সেদিন আমাদের দেখানো হলো দুটি নো আর তাদের মাঝখানে একটি কিয়োগেন। প্রথম নাটকটির নাম 'ফুনাবেঙ্কেই' বা নৌকাপথে বেঙ্কেই। কামাকুরার শোগুন বা মহাসেনাপতি অন্যায় করে তাঁর ভাই মিনামোতো নো য়োশিৎসুনেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। য়োশিৎসুনে তাই পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করছেন। যাবার আগে তিনি বিদায় নিচ্ছেন তাঁর সুন্দরী প্রিয়া শিজুকার কাছ থেকে। শিজুকার মনে দুঃখ। প্রিয়তমের অনুগত অমাত্য বেঙ্কেরই অনুরোধে তিনি বিদায়নৃত্য নাচলেন। যাতে যাত্রা শুভ হয়। য়োশিৎসুনে কি সহজে যেতে চান! ওদিকে নৌকা তৈরি। দুর্যোগের দোহাই দিয়ে যাওয়া পেছিয়ে দিতেন য়োশিৎসুনে, কিন্তু বেঙ্কেই তা হতে দিলেন না। বড় শক্ত লোক! নৌকা ভাসল

দরিয়ায়। হঠাৎ আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। দুলতে লাগল নৌকা। সামাল! সামাল! য়োশিৎসুনে যাদের নৌযুদ্ধে ধ্বংস করেছিলেন সেই তায়রা বংশের যোদ্ধাদের প্রেতাত্মারা সামনে দাঁড়িয়ে। য়োশিৎসুনে তাঁর অনুচরদের বললেন, শান্ত হও।

আবির্ভূত হলো তায়রা নো তোমোমোরির ভূত। বলল, আমাকে যেমন করে মেরেছ তোমাকেও তেমনি করে মারব। সমুদ্রের অতলে টেনে নামাব তোমাকে।

চলল দুই পক্ষের লড়াই। ঢেউয়ের উপরে ভূত। নৌকার উপরে মানুষ। য়োশিৎসুনে চালালেন তলোয়ার। আর বেঙ্কেই গড়ালেন জপমালা, যা দিয়ে বৌদ্ধ মন্ত্র জপতে হয়। তলোয়ার কী করতে পারে ভূতের! জয়ী হলো মন্ত্রশক্তি। প্রার্থনার শক্তি। ভূতের দল হটে গেল ঢেউয়ের ঠেলা খেয়ে। ক্রমে মিলিয়ে গেল।

এই হলো প্রথম নাটকের গল্প। এ গল্পের নায়ক অবশ্য য়োশিৎসুনে, কিন্তু তাঁর অংশ অপ্রধান। প্রধান হলেন উত্তমপক্ষ আর মধ্যম পক্ষ, শিতে আর ওয়াকি। এখানে শিতে হচ্ছেন শিজুকা আর ওয়াকি হচ্ছেন বেঙ্কেই। আর নোচি-শিতে বা প্রতিপক্ষ হচ্ছেন তায়রা নো তোমোমোরির প্রেতাত্মা। এই সম্প্রদায়ের ওস্তাদ কিতা মিনারু স্বয়ং সেজেছিলেন সুন্দরী প্রিয়া শিজুকা। ভদ্রলোকের বয়স সাতান্ন। তার পর সেই তিনিই সাজলেন ভয়ঙ্কর ভূত তায়রা নো তোমোমোরির প্রেতাত্মা। নাচ আর নাচন দুটোতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ও সিদ্ধপদ। তিনি 'শিতে' ভূমিকাতেই নামেন বলে তাঁকে বলা হয় 'শিতে অভিনেতা'। এমনি একজন 'শিতে অভিনেতা' কানজে য়োশিয়ুকি। বয়স পঞ্চান্ন। এঁকে দেখতে পাওয়া গেল দ্বিতীয় নাটকে। এঁর পরে যাঁর স্থান তাঁর নাম হোশো য়াইচি। বয়স ঊনপঞ্চাশ। ইনি 'ওয়াকি অভিনেতা'। ইনিই সেজেছিলেন বেঙ্কেই।

এই সম্প্রদায়ের এঁরাই তিনজন বড় অভিনেতা। এঁরা ভেনিসে গিয়ে নো নাটক অভিনয় করে এসেছেন। কিন্তু এঁদের চেয়ে কম যান না এঁদের সম্প্রদায়ের সঙ্গীতনায়ক কো শোকো। ইনিও ভেনিসফেরতা। কিন্তু এঁকে সেদিন দেখতে পাওয়া গেল না। এঁর পরবর্তী য়োশিমি য়োশিকি অধিনায়কত্ব করলেন যন্ত্র-ও-মন্ত্রসঙ্গীতে। চৌষট্টি বছর বয়স। অমন করে বার বার উউউ উউউ করতে থাকলে ঝড় উঠবেই, ভূত নামবেই। বাপ রে! সে কী হাড়-কাঁপানো পিলে-চমকানো গা-শিউরানো আওয়াজ!

নো নাটকে পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার আছে, কিন্তু মঞ্চসজ্জার বালাই নেই। দৃশ্যটা কল্পনা করে নিতে হয় কথা শুনে ও সঙ্কেত দেখে। ভূতের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধটাতে বেঙ্কেইকে দেখা গেল বীররূপে। মালা গড়াচ্ছেন না পার্থসারথির মতো সুদর্শনচক্র ঘোরাচ্ছেন? বাজনা এমন ভাবে বাজতে লাগল যে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে চরমে ঠেকল। তার পর আস্তে আস্তে থামল যখন ভূত একটু একটু করে হটে গেল মঞ্চের বাইরে যাতায়াতের পথ ধরে সাজঘরের দিকে। ওই বাহুটা যে কেন দরকারী তা বোঝা যায় বিলম্বিত প্রস্থান দেখে। শিজুকা যখন বিদায় নিচ্ছিল তখন তার পা সরছিল না। তাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল মঞ্চের বাইরে যাতায়াতের পথে একটু একটু করে পেছিয়ে যেতে।

নো নাটকের প্রাণ হচ্ছে টেনসন। আগাগোড়া একটা সংঘর্ষের ভার থাকে তাতে। দৈবী শক্তির সঙ্গে আসুরী শক্তির সংঘর্ষ। আর কিয়োগেন হলো নৈতিক তামাশা। ছোটভাইকে পেঁচায় পেয়েছে। বড়ভাই এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বলছে ভূত ঝাড়তে। ছোটভাইকে ঝাড়তে ঝাড়তে বড়ভাইকেও পেঁচায় পেল। পেঁচো নয়, পেঁচা। পেচকের আত্মা। সাধুজী তা দেখে আরো জোরসে মালা গড়াতে লাগলেন। জপতে থাকলেন, 'বোরোন!' 'বোরোন!' আর ওদিকে ভাই দুটো চেঁচাতে থাকল পেঁচার মতো। 'হু!' 'হু!' শেষকালে সাধুকেও পেঁচায় পেল। রোজার ঘাড়ে ভূত। কে কাকে সারাবে!

এর পরে দ্বিতীয় নাটক, 'শাক্কিয়ো' বা পাথরের পুল। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী। তাঁর দুই সিংহ। শাদা কেশর, লাল কেশর। বোধিসত্ত্বকে দেখা গেল না, তাঁর বার্তাবহ দুই সিংহ এসে পুলের ধারে ফুলবাগিচায় নৃত্য জুড়ে দিল। বোধিসত্ত্বের শান্তিপূর্ণ চিরন্তন রাজত্বের সম্মানে এই নৃত্য। প্রজ্ঞার বোধিসত্ত্ব ইনি। এঁর রাজত্ব প্রজ্ঞার রাজত্ব। শ্বেত কেশরী হচ্ছে রক্ত কেশরীর পিতা। দুজনেই বোধিসত্ত্বের নিত্যসঙ্গী। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীতও ছিল। প্রখর সঙ্গীত।

এইসব দেখতে-শুনতে ঘন্টা দুই লাগল। হোটেলে ফিরে দেখি সময় বেশী নেই। যেতে হবে তোকিয়ো নগরশাসনের গবর্নর সেইইচিরো য়াসুই মহাশয়ের পার্টিতে। সুমিদা নদীর অপর পারে কিয়োজুমি উদ্যানে। আবার সেই কালো শেরোয়ানি, কিন্তু এবার আর শাদা চুড়িদার নয়। সেফটিপিন দিয়ে ফিতের কাজ হয় না। সাতপাঁচ ভেবে ট্রাউজার্সই পরা গেল তার বদলে। গ্রে-ব্লু রঙের ডেক্রন মন্দ মিশ খেল না। বেরিয়ে পড়েই ভাবলুম, যাই ফিরে। বদল করি। কিন্তু বাস তো আমার জন্যে দাঁড়াবে না। উঠে বসতে হলো।

উদ্যান না বলে উপবন বলাই সঙ্গত। শ'তিনেক বছর আগে এর পত্তন হয় দেশের চার দিক থেকে অসাধারণ সব পাথরমাটি আনিয়ে। পাথুরে লণ্ঠন, হাতমুখ ধোবার পাথুরে বেসিন, যেখানে সেখানে কুঞ্জ, কোথাও উপত্যকা, কোথাও অধিত্যকা, কোথাও হ্রদ, কোথাও হ্রদের উপর বিশ্রামগৃহ, সংকীর্ণ পায়ে চলার পথ—এমনি কত রকম বৈশিষ্ট্য। তোকিয়ো শহরের ভিতরে থেকেও বাইরে চলে যাবার মতো লাগে। মনে হয় না যে শহরেই আছি।

যেখানে অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্যে বিশেষ আয়োজন ছিল সেখানে না গিয়ে আমি চলে গেলুম ঝোপঝাড় পেরিয়ে উপবন-পরিক্রমায়। দেখলুম একটু দূরে খাবারের স্টল। পানীয়সমেত জাপানী খাদ্য। তেম্পুরা এরই মধ্যে আমার রসনাহরণ করেছিল। চিংড়িমাছের তেম্পুরা। সেইখানেই তৈরি হচ্ছে, সেইখানেই হাতে হাতে ঘুরছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি আমরা। এর পর আর-একটি স্টল। তাতে সমুদ্রের আগাছা। তার পর আরো একটি। সেখানে মুরগী। এক এক করে পরখ করছি। কেউ ছাড়তে চায় না। খাওয়াবেই। এমন সময় আলাপ হয়ে গেল এক জাপানী অধ্যাপকের সঙ্গে। প্রবীণ বয়সী। তাঁর সঙ্গে এক কালো কিমোনো পরা জাপানী তরুণী। আর্টিস্ট।

অধ্যাপক বললেন, 'আপনি হিন্দু। শুনেছি হিন্দুধর্মের সঙ্গে শিন্তোধর্মের মিল আছে। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আমরা কয়েকজন শিন্তো ইনটেলেকচুয়াল মিলিত হচ্ছি আজ এক জায়গায়। আপনাকেও নিয়ে যাব সেখানে। কেমন, রাজী? তা হলে গেটে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন ন'টার একটু আগে।'

এই বলে তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর আমি ঘুরতে ঘুরতে ফিরে গেলুম অভ্যর্থনাস্থলে। যেতে যেতে দেখি একটি বেষ্টনীতে গেইশারা হাসাহাসি করছে। একটু পরে তারাই দেখা দিল নাচের আসরে। কোনো বার ছাতা হাতে নিয়ে, কোনো বার পাখা হাতে নিয়ে মুক্ত আকাশের তলে ঘন ঘাসের উপরে চরণ ফেলে নাচতে লাগল সেই অপ্সরার দল। আর মাটিতে বসে বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন নানা দেশের দেবদেবীর দল।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একজন জাপানী লেখক। বেশ বয়স হয়েছে। কৃতার্থ হয়ে আমাকে বললেন, 'এঁরা হলেন উচ্চতম শ্রেণীর গেইশা। এমন কি আমিও কোনো দিন এঁদের চোখে দেখবার সুযোগ পাইনি। আপনাদের কল্যাণে আজ প্রথম দর্শনলাভ হলো।'

মধ্যযুগের ভারত গত শতাব্দীতে শেষ হয়ে না গেলে আমরাও আমাদের দেশে এর অনুরূপ দেখতে ব্যাকুল হতুম। রাণী ভিক্টোরিয়া জাপানে রাজত্ব করলে জাপানেও সেই সময় এর অবসান ঘটত। ওরা বেঁচে গেছে না আমরা বেঁচে গেছি বলা সহজ নয়। আমার ইচ্ছা করছিল আর একটু

দেখতে। কিন্তু মায়াললনারা সহসা মিলিয়ে গেল।

তার পর আতশবাজি ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে ন'টার একটু আগে গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। এক এক করে সবাই গিয়ে বাসে উঠল, বাস ছেড়ে দিল। অধ্যাপক নিরুদ্দেশ। অনেকক্ষণ পরে দেখি তিনি আসছেন, সঙ্গে এক ইংরেজ লেখিকা। বললেন, 'ফরাসী লেখকের খোঁজ পাচ্ছিনে। আবার যাচ্ছি।' যা হোক গল্প করার জন্যে সাথী পাওয়া গেল। তারপর ভদ্রলোক এক জার্মানকে এনে হাজির করলেন। আর তিনি দিলেন তাঁর গাড়িতে আমাদের লিফ্‌ট।

জার্মান বললেন, 'কোথায় যেতে হবে?' জাপানী বললেন, 'গিন্‌জা।' চললুম আমরা তোকিয়োর পিকাডিলি অঞ্চলে। পথে যেতে যেতে অধ্যাপক একতরফা বকে যেতে লাগলেন। একবার শুনি তিনি বলছেন, 'ওঃ। এই ছিল কপালে! বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ!' তার পর বলছেন, 'হবে না কেন? জাপানের হয়েছিল মেগালোমেনিয়া। আমি, মশায়, স্পষ্টভাষী। দেশের লোককেও হক কথা শুনিয়ে দিতে ডরাইনে।' তার পর বলছেন, 'ভালোই হয়েছে। দুনিয়াকে হারিয়ে জাপান তার আত্মাকে ফিরে পেয়েছে। এবার সে আধ্যাত্মিক অর্থে মহান হবে।' কখন একসময় শুনি,'কোথায় যেন পড়েছি একটা ইঁদুরও কায়দায় পেলে একটা হাতীকে হারিয়ে দিতে পারে।'

ভদ্রলোকের মর্মবেদনায় সমবেদনা অনুভব করছিলুম আমি। কিন্তু সায় দিতে পারছিলুম না। আর দু'জনও আমারি মতো চুপ। অধ্যাপক বললেন, 'দুনিয়া তো অনেকবার ঘুরে দেখলুম। এবার যেতে ইচ্ছা করে ব্রেজিল।' ব্রেজিলের কথা আমি পরে অন্যান্য জাপানীদের মুখেও শুনেছি। একমাত্র সেইখানেই জাপানীরা উপনিবেশ গড়তে পায়। দেশের বাইরে আর কোনোখানেই ঠাঁই নেই তাদের। ' তার পর ভাবি আর কেন এ বয়সে বিদেশে যাওয়া! ব্রেজিলও তো বিদেশ!' বুঝলুম ভদ্রলোকের অবস্থাটা ন যযৌ ন তস্থৌ। পরে শুনেছিলুম তিনি বারোটা ভাষা অনর্গল বলতে পারেন। গিন্‌জার চীনা রেস্টোরাণ্টে ফরাসী ও জাপানীরা অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ক্রমাগত ফরাসী ও জার্মান চালালেন। জার্মানকে দিলেন জার্মানভাষায় লেখা তাঁর বই।

জাপানী কক্ষে তাতামি মাদুরের উপর কুশন পাতা ছিল। আমরা বিদেশীরা বসলুম পদ্মাসনে। আর জাপানীরা বসলেন বজ্রাসনে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেই তরুণীটি। অধ্যাপক আমাকে ছেড়ে দিলেন তাঁর হাতে ও তাঁর আর্টিস্ট বন্ধুদের সাথে। তাঁরা সকলেই পিকাসোর শিষ্য। তাঁদের একখানা শিল্পপত্রিকাও দেখলুম। তেমনটি আমাদের দেশে নেই।

সামনে রিভল্‌ভিং টেবিল। খাবার জড়ো করা হয়েছিল তাতে। ঘোরালেই যেটা চান চলে আসে হাতের নাগালে। তুলে নিতে হয় প্লেটে। চপ স্টিক দিয়ে তুলতে হয় মুখে। সমস্ত জাপানী খাদ্য। জমকালো কিমোনো-পরা পরিবেশিকারা আরো দিয়ে যাচ্ছিল।

রাত হলো। উঠলুম আমরা। বিদায় নিতে গিয়ে দেখি কোথায় সেইসব কিমোনো-পরা তরুণী পরিবেশিকা! ফ্রক-পরা এক ঝাঁক মেড সম্ভ্রমে নত হয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বলছে, সায়োনারা! সায়োনারা! যদি বিদায় নিতেই হয় তবে নেওয়া যাক। 'যদি!' 'যদি!'

॥ ছয় ॥

পথে কুড়িয়ে পাওয়া ক্ষণিকের অতিথি আমি। কেই বা জানে আমার পরিচয়! আমিই বা চিনি কাকে! প্রথম দেখাই যেখানে শেষ দেখা সেখানে বিদায় নিতে দ্বিধা, দিতে দ্বিধা। বোন ছাড়বে না ভাইয়ের হাত, ভাই ছাড়বে না বোনের। মিনিটের পর মিনিট কেটে যায়। মুখ বলে, 'সায়োনারা! সায়োনারা' মুঠি বলে, 'না। না।'

নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়ালুম আমরা। ইংরেজ ফরাসীরা ট্যাক্‌সি ধরে উধাও হলেন। জার্মানটি ডাক্তার, তিনি যাচ্ছেন তাঁর নিজের মোটরে উঠতে। রাত তখন এগারোটা। তোকিয়োর পক্ষে কিছু নয়, আমার পক্ষে অনেক। আমিও যাবার কথা ভাবছি, অধ্যাপক আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আসবেন না?'

জানতে চাইলুম, 'কোথায়?'

তিনি বললেন, 'কফিখানায়'।

সারাদিন মিটিং করে নাটক দেখে পার্টিতে যোগ দিয়ে আমি ক্লান্ত। আর কফি খেলে আমার ঘুম আসে না। বোকার মতো বললুম, 'আমাকে মাফ করবেন।' এই বলে ডাক্তারের গাড়িতে উঠে বসলুম। তিনি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবার ভার নিলেন।

অধ্যাপক বোধ হয় মনে করেছিলেন যে রাত এমন কী বেশী হয়েছে, এই তো হিন্দু ধর্মের সঙ্গে শিন্তো ধর্মের মোকাবিলার সময়। আর এর উপযুক্ত স্থান কফিখানা। একটু নিরাশ হলেন। তার পর পায়ে হেঁটে চললেন সদলবলে। কফিখানা অভিমুখে। লক্ষ করলুম তাঁদের সকলেরই কেমন এক অস্থির অশান্ত ভাব। সকলেই শিন্তো। সকলেই জাপানী। সকলেই আধুনিক মার্গের শিল্পী বা অধ্যাপক। তিনটের মধ্যে কোন্ স্রোতটা এঁদের এমন অস্থির করেছে? অশান্ত করেছে?

কিন্তু আমি কেন বোকার মতো কফিখানায় যাবার সুযোগ হারালুম সে কথা আগে বলি। কফিখানা শুধু এক পেয়ালা কফির জন্যে নয়। সেখানে কফি ও কেক খেতে দেয় বললে সামান্য বলা হয়। তোকিয়ো শহরে কফিখানা ক'হাজার আছে, জানেন? ছ'হাজার। তাদের অধিকাংশই মার্কিনদের নাইটক্লাবের মতো করে সাজানো। ক্লাসিকাল সঙ্গীত, জ্যাজ বাজনা, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফ্যাশন প্রদর্শনী, চিত্র প্রদর্শনী, খেয়ালী ছবি আঁকার ব্ল্যাকবোর্ড। এমনি অনেক কিছু পাবেন কফিখানায়। আর পাবেন—ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি—রূপবতী বালা। যার সঙ্গে কফি খেয়ে সুখ।

ভোগবতীর বন্যা বয়ে চলেছে তোকিয়োর পথে ঘাটে। নানা রঙের আলো, নানা রঙের কাগজের লণ্ঠন। প্রতি রাত্রেই এই। রাত বারোটার সময় অন্য একদিন দেখেছি দোকানপাট কতক বন্ধ কতক খোলা। কখন যে ওরা শুতে যায় কে জানে! তবে আলোকসজ্জা ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। ক্ষীণ হয়ে আসে যানযন্ত্রের গর্জন। যানযন্ত্র না বলে যানোয়ার বললে কেমন হয়? রাস্তার যানোয়ার তো মোটর। কিন্তু মাথার উপর দিয়ে আরেক প্রস্থ সড়ক গেছে। রেল সড়ক। কলকাতায় সে রকম নেই। পায়ের তলার মাটি খুঁড়েও আরো এক প্রস্থ সড়ক। রেল সড়ক। ভারতে সে রকম নেই। তাই তোকিয়োর যানোয়ারের সঙ্গে তুলনা দিতে পারছিনে।

এখন ফিরে যাই অধ্যাপকের অস্থিরতার প্রসঙ্গে। মনে হলো তিনি কোনো মতেই বাস্তবকে মেনে নিতে পারছেন না। ভুলে থাকতে চাইছেন। আপনাকে ভোলাতে চাইছেন। বৌদ্ধদের

খ্রীস্টানদের আরো অনেক দেশ আছে, কিন্তু শিন্তোদের ওই একটিমাত্র দেশ, ওই একটিমাত্র সভ্যতা। হিন্দুদের যেমন 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার' শিন্তোদেরও তেমনি পূর্বপুরুষ জন্মভূমি ও সম্রাট। এর কোনো একটির উপর বিশ্বাস হারালে শিন্তো আর মনে জোর পায় না। কোনো দুটির উপর বিশ্বাস হারালে তো রীতিমতো দুর্বল বোধ করে। গত শতাব্দীর নব জাগরণ শিন্তো ধর্মের মর্মে আঘাত হানেনি। বরং শিন্তোকে করেছিল রাষ্ট্রধর্ম, সম্রাটকে দিয়েছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা, জন্মভূমিকে রাঙিয়েছিল অপূর্ব মহিমায়, পূর্বপুরুষের প্রতি আনুগত্য অটুট রেখেছিল। আধুনিকতা জাপানকে মহাশক্তির আধার করেছিল, কিন্তু আধারটা আধুনিকতার পূর্ব হতেই বিদ্যমান ছিল। সেটা আধুনিকতার সৃষ্টি নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের ফলে সেই সুপ্রাচীন আধারে ভাঙন ধরেছে। ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গড়াও চলেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রজাশক্তি এই প্রথম রাজ্যভার নিল। মিলিটারির পিঠে সিভিল এই প্রথম ঘোড়সওয়ার হলো। সিভিল লিবার্টি এই প্রথম অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেলো। নরনারী সমান অধিকার এই প্রথম ঘোষিত হলো। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা যুদ্ধবিগ্রহ এই প্রথম বর্জিত হলো। জাপানের কোনো আর্মি নেভী বা এয়ারফোর্স নেই। যা আছে তার নাম আত্মরক্ষাবাহিনী। সৈন্য হয়তো আবার হবে, কিন্তু সামন্ত আর হবে না। সামুরাই বলে সেই যে দুর্ধর্ষ শ্রেণী ছিল ইতিহাস জুড়ে তার ইজ্জৎ গেছে, সে আর মুখ দেখাতে পারে না লজ্জায়। জাপান নতুন অর্থে নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে। বড় বড় মনোপোলিও ভেঙে দিয়ে গেছেন নয়া মেইজি ম্যাকআর্থার। ১৯৪৫ জাপানকে ১৮৬৮-র পর বড় এক কদম এগিয়ে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার আবার সাঙ্কেই কাইকানের কোকুসাই হলে পেন কংগ্রেসের সাহিত্য অধিবেশন। এবার যাঁকে সভাপতির আসনে দেখা গেল তিনি ইন্দোনেশিয়ার সদ্যোমুক্ত লেখক সুতান তাকদির আলীশাবানা। পরে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম তাঁর বন্দিশার কারণ। তিনি বলেছিলেন তিনি প্রত্যেক প্রদেশের জন্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চান, যেটা ভারতবর্ষে কবে থেকে আছে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় নেই। এর জন্যে তিনি আবার জেলে যাবেন, তবু এ দাবী ছাড়বেন না। ও দেশে হয়েছে এই যে জাভার লোক ক্ষমতা হাতে পেয়ে আর সকলের উপর সর্দারি করছে, তাই আর কারো আন্তরিক সহযোগিতা পাচ্ছে না। অন্য পক্ষের কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে অপ্রতিহত ক্ষমতা না দিলে দেশ ভেঙে যেতেও পারে, দেশীবিদেশী কুচক্রীর তো অভাব নেই।

এই সভায় স্টীফেন স্পেণ্ডার একটা মনে লাগবার মতো উক্তি করলেন। পূর্বদিকে বিপ্লব হয়েছে, রূপান্তর হয়নি। গোকক করলেন এর প্রতিবাদ। আমি সে সময় উপস্থিত ছিলুম না, কার কী যুক্তি তা অনুধাবন করিনি। এখন পূর্বদিক বলতে বোঝায় রাশিয়া ও চীন। ভারত ও জাপান নয়। স্পেণ্ডার বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন এই যে কমিউনিস্টরা বিপ্লব ঘটালে কী হবে, রূপান্তর ঘটানো অত সোজা নয়। আমি রুশ চীনে যাইনি, রূপান্তর সত্যি কতটুকু হয়েছে জানিনে, তবে এটা বেশ বুঝি যে বিপ্লব ও রূপান্তর একই কথা নয়। তা যদি হতো তবে লেনিনের দেশের চিত্রকলা ভিক্টোরিয়ার দেশের মতো লাগত না। পরে একদিন রুশ দূতাবাসে ককটেল পার্টিতে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখে ভাবনায় পড়ি। এ কোথায় এলুম! ব্রিটিশ দূতাবাসের পুরোনো বাড়ি নয় তো? ছবিগুলো সরায়নি, যাদুঘরের মতো রেখে দিয়েছে বুঝি! আরে না, না। তা নয়। এ হলো সোভিয়েট চিত্রকলা।

সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে। শিন্‌জুকু অঞ্চলে। ভারতীয় লেখকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্যে অন্যান্য দেশের লেখকদের থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে আমন্ত্রণ করেছিলেন চন্দ্রশেখর ও তাঁর সহধর্মিণী। জাপানীদের অনেকে কিন্তু কথা

দিয়েও কথা রাখেননি। এমন হবে জানলে আমরা তাঁদের বদলে অন্যদের আহ্বান করতুম। জাপানীদের জন্যে বহুদেশের লেখক বাদ গেলেন। আমাদের পার্টি জমল না। তবে আঁদ্রে শাঁসঁ, মাদাম শাঁসঁ, স্টীফেন স্পেণ্ডার ইত্যাদি ছিলেন বলে আমাদের রাষ্ট্রদূতের মুখরক্ষা হলো। পরে এসে হাজির হলেন কাওয়াবাতা। তাঁকে বসিয়ে খাওয়ানোর ভার পড়ল আমার উপরে। পাশে বসলেন মাদাম তোমি কোরা। রবীন্দ্রনাথের পরম একনিষ্ঠ ভক্ত।

কথাপ্রসঙ্গে মাদাম কোরা বললেন, 'বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তিন শ' বছর আমরা মাংস খাইনি। গত শতাব্দীর নব জাগরণের পর আধুনিক হতে গিয়ে আমরা মাংসাহারী হই। আমাদের জেনারেশনে আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে মাংস খেতে আরম্ভ করি।'

আমি তো অবাক। আধুনিকতা দেখছি মদ্যমাংসের প্রবর্তনা দিয়েছে একাধিক দেশে। গান্ধীজীর ছেলেবেলায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বোঝাত ইংরেজের মতো মাংস না খেলে ইংরেজকে গায়ের জোরে হারাবে কী করে? সে যুক্তি তাঁকে পথভ্রষ্ট করেছিল, কিন্তু অল্পদিনের জন্যে। জাপানে অবশ্য মৎস্যাহার চিরদিন ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে রহিত হয়নি। বাঙালীরা যেমন মাছে ভাতে বাঙালী জাপানীরাও তেমনি মাছে ভাতে জাপানী।

মাদাম কোরা প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। 'জাপানের বিস্ময়কর প্রগতির প্রকৃত সঙ্কেত কিন্তু সুবিদিত নয়। আসল কারণ হলো মেইজি আমলের গোড়ার দিক থেকে প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে যেতে বাধ্য করা। প্রথম প্রথম চার বছরের জন্যে। তার পরে ছ'বছরের জন্যে। ক্রমে ক্রমে ন'বছরের জন্যে। শতকরা আটানব্বই জন লিখতে পড়তে জানে।'

এর একটা উলটো দিক ছিল, মাদাম কোরা দেখাননি। পরে অবগত হয়েছি। রাষ্ট্র যাঁদের হাতে পড়েছিল তাঁরা জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে গিয়ে একান্ত বশংবদ করে তুলেছিলেন। ছেলেবেলা থেকেই তারা পোষ মেনেছিল। তার চেয়ে ভালো ছিল বৌদ্ধদের মন্দিরসংলগ্ন পাঠশালা বিদ্যালয়। এখন তো মন্দিরের সঙ্গে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধ ব্যবস্থাও জনশিক্ষার ব্যাপকতার জন্যে ধন্যবাদযোগ্য। তবে ধর্মনিরপেক্ষ নয়। এখনকার রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা গণতন্ত্রী তথা ধর্মনিরপেক্ষ।

তবে মেইজি আমলের ব্যাপক জনশিক্ষা লেখকদের বাঁচিয়েছে। বই বিক্রী হয় লাখে লাখে হাজারে হাজারে। তাই বই লিখে সংসার চালানো যায়, পরের চাকরি করতে হয় না। বড় বড় লেখকদের তো দু'তিনখানা করে বাড়ি। একখানা তোকিয়োতে, একখানা সমুদ্রের ধারে, একখানা গ্রামে। পেন ক্লাবের মতো বহু ক্লাব আছে লেখকদের। এক পেন ক্লাবেরই আট শ' জন সদস্য। কাওয়াবাতা তাঁদের সভাপতি।

য়াসুনারি কাওয়াবাতার বয়স আটান্ন। একহারা চেহারা। সিংহের কেশরের মতো চুল। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর সিংহ। গম্ভীর চিন্তাকুল মুখ। জাপানের আত্মসমর্পণের পর তিনি সঙ্কল্প করেন শোকগাথা ছাড়া আর কিছু লিখবেন না। অবশ্য কথাসাহিত্যরূপে। তাঁর লেখা চিরদিন গীতকবিতাধর্মী তথা মরমী তথা ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক। যুদ্ধ ও তার লজ্জাকর পরিণাম তাঁকে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নির্লিপ্ততায় পৌঁছে দিয়েছে। যেখানে পৌঁছলে সৌন্দর্য আর মৃত্যু একাকার হয়ে যায়। সুন্দর শৈলীর জন্যে তাঁর অসামান্য খ্যাতি। বিচিত্র আঙ্গিক। ছাব্বিশ বছর বয়সে 'ইজুর নর্তকী' লিখে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন তখন থেকেই তাঁকে গণ্য করা হয় ইন্দ্রিয়তান্ত্রিক বলে। তারপর বাইরের অলঙ্কার একে একে খুলে ফেলে ভিতরের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করেন। পরিণত বয়সের উপন্যাস 'তুষারভূমি' সম্প্রতি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। এর বেশীর ভাগ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে লেখা। যুদ্ধোত্তর উপন্যাস 'সহস্র সারস' জাপানের আর্ট আকাডেমির পুরস্কার পেয়েছে।

আগেকার দিনের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মুসানোকাজি ও শিগা এখনো বেঁচে, কিন্তু সক্রিয় নন। সুতরাং কাওয়াবাতার চেয়ে প্রভাবশালী ঔপন্যাসিক বলতে তাঁর চেয়ে বয়সে বড় তানিজাকি।

খাওয়াদাওয়ার পর কাওয়াবাতা আমাকে তাঁর মোটরে করে হোটেলে পৌঁছে দিলেন। পথে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনি কি বৌদ্ধ?' উত্তর পেলুম, 'হাঁ।' তিনি যে সত্যিকারের বৌদ্ধ তার প্রমাণ মিলে গেল হাতে হাতে। শুনেছেন কখনো একজন লেখককে অন্য একজন লেখকের প্রাণখোলা প্রশংসা করতে? বিশেষত সেই অন্য জন যদি হন তাঁর চেয়ে বিখ্যাত ও সাংসারিক অর্থে সফল? কাওয়াবাতা আমাকে তাজ্জব বানালেন। ইংরেজী তর্জমায় আমি 'Shunkin' পড়েছি শুনে তৎক্ষণাৎ বললেন, 'তানিজাকির ওই কাহিনীটিই আধুনিক কালের জাপানী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনী।'

নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি একটি উক্তিও করলেন না। যদিও আমি তাঁকে বলেছিলুম যে আমি তাঁর 'আসাকুসা কুরেনাইদান' উপন্যাসটির গল্পাংশ জানি। মোটর যেই ডাউন টাউনের নিকটবর্তী হলো তিনি বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'তোকিয়োর এই গোলমাল আপনার বরদাস্ত হয়? আমি তো এখানে একরাত্রিও টিকতে পারিনে। পেন কংগ্রেসের জন্যেই এখানে থাকা। না, তোকিয়োতে আমার লেখা আসে না।'

পরে একদিন কামাকুরা যাই বুদ্ধমূর্তি দেখতে। সেখানে শুনি কাওয়াবাতার বাসস্থান সেইখানেই। আগে থেকে খবর দিইনি, সময়ও ছিল না হাতে, নইলে আলাপ করে আসা যেত তাঁর সঙ্গে। তবে ইতিমধ্যে হয়েছিল আরো কয়েকবার সাক্ষাৎ। একবার তো আমিই বয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে আসি আমাদের তিনজনের স্মৃতি-উপহার।

দুটি জাপানী ছেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আকিরা ওগাওয়া ও তার ভাই। কাবুকি থিয়েটারে যাব শুনে ওরা বলল, 'চলুন, পায়ে হেঁটে যাওয়া যাক।' আমিও তাই চাই। পায়ে না হাঁটলে শহর দেখা হয় না। শখ ছিল মাটির তলার ট্রেন দেখার। পায়জামার ফিতে কেনার গরজও ছিল। পেন কংগ্রেস থেকে জানিয়েছিল ছ'টার থেকে আমাদের জন্যে ব্যবস্থা। কাবুকির নিয়ম হচ্ছে বেলা সাড়ে আটটায় আরম্ভ হয়, রাত সাড়ে ন'টা অবধি চলে। একটার পর একটা পালা দেখানো হয়। যার যখন খুশি টিকিট কিনে ঢুকতে পারে। যদি জায়গা খালি থাকে। আগে থেকে রিজার্ভ করতে পারা যায়। কম সময়ের জন্যে টিকিট কাটলে আংশিক মূল্য। গবর্নরের অতিথি আমরা। আমাকে দেওয়া হলো হাজার ইয়েন দামের টিকিট। তার মানে তেরো টাকা পাঁচ আনা দামের। মনে হলো সারা দিনের টিকিট। থাকতে পারতুম সাড়ে ন'টা অবধি। কিন্তু আটটার সময় কোসিরো ওকাকুরার সঙ্গে এনগেজমেন্ট। ভারতবন্ধু কাকুজো ওকাকুরার পৌত্র। জাপানের শিল্প-ইতিহাসে কাকুজো ওকাকুরার নাম তেনশিন ওকাকুরা।

যা বলছিলুম। পায়ে হেঁটে চললুম তোকিয়োর পথে দু'ধারের দোকানবাজার দেখতে দেখতে। লোকে লোকারণ্য। পোশাকের দোকানে শ্বেতাঙ্গিনীদের ডামি। যদিও যাদের জন্যে দোকান তারা পশ্চিমের লোকের চোখে পীতাঙ্গিনী। পোশাকে পরিচ্ছদে কিন্তু কোনো তফাৎ নেই। পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল দুটি মেয়ে, মুখ দেখিনি। পিছনে থেকে দেখা যায় তাদের বব-করা চুল। চুলের রং কটা বা সোনালী। ফ্রক বা স্কার্ট পাশ্চাত্য ফ্যাশনের বই দেখে কাটা। হাই হীল জুতো পায়ে খটখট করে হাঁটা। বিভ্রমটা সম্পূর্ণ বিলিতী। কী সব স্মার্ট মেয়ে! হাসির ফোয়ারা। আবার কিমোনো-পরা মহিলারাও চলেছেন। পিঠে বোঁচকার মতো ওবি বাঁধা। পায়ে খড়মের মতো জোরি। মাথায় নানারকমের খোঁপা। কারো কারো পিঠে ছোট ছেলে চেপেছে। এরা গরিবের বৌ। সব চেয়ে মজা লাগে যখন দেখি একটি যুবক সাহেবী পোশাকের সঙ্গে জাপানী খড়ম পায়ে দিয়ে খটাস খটাস করে হাঁটছে।

গিন্‌জা সরণি কেটে জেড আভিনিউ গেছে। তার পর জেড আভিনিউ কেটে টেন্‌থ্‌ স্ট্রীট গেছে। মোড়ের মাথার কাবুকি-জা। আমার পথপ্রদর্শকদ্বয় বিদায় নিল। বিরাট থিয়েটার। রাজপ্রাসাদের স্টাইলে নির্মিত। নির্মাণকাল ১৮৮৯ সাল। পুনর্নির্মাণ ১৯৫০! থিয়েটারের সঙ্গে আহারের স্থান। যাতে খাবার জন্যে বাইরে যেতে না হয়। সারি সারি দোকানও সেই সঙ্গে। কত কী কিনতে পাওয়া যায়। ভিতরে গিয়ে দেখি বিশাল প্রেক্ষাগৃহ। আসন সংখ্যা তিন হাজার। বৃহৎ মঞ্চ। মঞ্চের থেকে দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসেছে একটি দীর্ঘ বাহুর মতো হানামিচি। অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের যোগসূত্র। সেই পথ বেয়ে দর্শকদের দু'পাশে রেখে তাঁরা অভিনয় করতে করতে আসেন বা যান। তা ছাড়া প্রবেশ ও প্রস্থানের গতানুগতিক পথ তো আছেই। অভিনেতা বলেছি। অভিনেত্রীর ভূমিকায় মুখোশপরা পুরুষদেরই অধিকার? তিন শ' বছর আগে কাবুকির সূত্রপাত কিন্তু করে ইজুর এক নর্তকী। ওকুনি তার নাম। নৃত্য থেকে বিবর্তিত হলো নাট্য আর নারীর যোগদান হলো নিষিদ্ধ। সে নিষেধ আজো বলবৎ রয়েছে। নো যেমন ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাবুকি তেমন নয়। কাবুকি শিক্ষা দেয় না, বিনোদন করে। জনসাধারণ এর সমজদার।

যবনিকা উঠতেই দেখা গেল পাইন গাছের ছবি আঁকা পশ্চাৎপট। তার সামনে উচ্চাসনে বসে আছে এক সার গায়ক বা আবৃত্তিকারক। তাদের দৃষ্টি পুঁথির উপর নিবদ্ধ। তাই দেখে তারা নাটকের কাহিনীটা সুর করে গেয়ে যায়। তার পর এক সার বাদক। তাদের প্রত্যেকের হাতে সামিসেন। মঞ্চের আড়ালেও বাদক ও বাদ্য থাকে। মঞ্চের উপর রকমারি স্টেজ প্রপার্টি। সেসব কিন্তু বাস্তবধর্মী নয়। যদিও নো'র মতো অনাড়ম্বর নয়। অভিনেতা ব্যতীত আরো কতক লোক ছিল রঙ্গভূমিতে। তারা হাঁটু গেড়ে বসেছিল একটু সরে। একজন অভিনেতার হয়তো হাতিয়ার চাই, অমনি হাতিয়ার নিয়ে এল হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হেঁটে। হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়েছে। অমনি হাত থেকে নিয়ে রেখে দিতে চলল। একটি লোক কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। কী যে তার কাজ বোঝা গেল না। পরে বন্ধুদের কাছে শুনলুম সে হলো প্রম্পটার। লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ছিল আর চুপি চুপি কথা বলছিল। আর একটা লোক মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে যবনিকার এক প্রান্তে বসেছিল। হঠাৎ শুনি খটখট করে কে যেন কাঠের করতালি দিচ্ছে। চেয়ে দেখি ওই লোকটা। ওর কাজ হলো দর্শকদের মনোযোগী করা। আরে, মশাই, মন দিয়ে দেখুন এইবার কী ঘটছে। জাপানীদের প্রয়োজনকৌশল অতুলনীয়। অভিনেতাদের পোশাক যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি সুদর্শন তাঁদের দেহের গড়ন।

একটিমাত্র পালা আমি পুরো দেখতে পেরেছি। নাম 'ৎসুচিগুমো।' ইংরেজীতে 'আর্থ স্পাইডার' বলতে কী বোঝায় আমার তো বুদ্ধির অগম্য। অভিজাতবংশীয় মিনামোতো য়োরিমিৎসুর অসুখ করেছে। রাজঅন্তঃপুরিকা সুন্দরী কোচো তাঁর সান্ত্বনার জন্যে একটি মনোরম নৃত্য প্রদর্শন করে গেলেন। একটু পরে এসে হাজির হলো এক ভ্রাম্যমাণ সাধু মঞ্চবাহু দিয়ে। নাচল এক ভীষণ কঠিন নাচ। অকস্মাৎ মাকড়শার জাল ছুঁড়ে জড়াতে চাইল য়োরিমিৎসুকে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ তরবারি দিয়ে এমন এক খোঁচা দিলেন যে সাধুবেশী মাকড়শা অমনি উধাও। সোরগোল শুনে ছুটে এলেন এক বীরবর। রাক্ষুসে মাকড়শার রক্তের দাগ ধরে চললেন য়োরিমিৎসুর সঙ্গে দূর পর্বতে, যেখানে মাকড়শার বাসা। এবার আর সাধুর বেশে নয়, নিজ মূর্তিতে দেখা গেল পিশাচকে। বাপস্‌। কী ভয়ঙ্কর চেহারা ও সাজ! সে তার ঢিবি থেকে বেরিয়ে এল হাতিয়ার হাতে। ঢিবিতে থাকে বলেই কি সে 'আর্থ স্পাইডার?' লড়াইটা যা জমল তা কি শুধু মঞ্চের উপর! ঐ এলো রে আমাদের দিকে হানামিচি বেয়ে! দর্শকদের মাঝখানে! ভয় নেই। আবার ফিরে চলল। টেনসনে ফেটে পড়বে আকাশ। বাজনাও টেনসন গড়ে তুলছে। কী হয়। কী হয়! কে হারে! কে মরে!

মাকড়শা হটতে হটতে ঢিবিতে কোণঠাসা হয়ে মারা গেল।

এই নাটিকাটি একটি নো নাটিকার কাবুকি সংস্করণ। নো নাটিকামাত্রেই প্রায় ছ' শতাব্দী আগে লেখা। তখনকার দিনের মানুষ দেব দৈত্য পিশাচ ভূতপ্রেত প্রভৃতিকে প্রকৃতির শক্তির মতো মেনে নিত। মেনে নিয়ে তার উপর জয়ী হবার সঙ্কেত শিখত। এখনকার মানুষের চোখে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, সুতরাং মূল্য যদি থাকে তবে শুধু আর্টের রাজ্যে। শুধু আর্ট বা সুদ্ধ আর্ট হিসাবে নো নাটিকার বিচার হয় না। তার অনেকখানিই মন্ত্রতন্ত্র। যেমন অথর্ব বেদের। কাবুকি কিন্তু মোটের উপর আর্টের খাতিরে আর্ট। কিন্তু স্টাইলাইজড্।

এর পরে যে পালাটি হলো তার নাম 'শুজেনজি মোনোগাতারি।' তার প্রথম অভিনয় বিংশ শতাব্দীতেই। ১৯১১ সালে। গল্পটা কিন্তু শোগুনশাসিত জাপানের। মুখোশনির্মাতা য়াশাও শাসকসেনাপতি য়োরিইয়ের মুখোশ গড়তে বসে কিছুতেই নিখুঁৎ মুখোশ গড়তে পারে না। শোগুন শেষকালে বিরক্ত হয়ে খুঁৎওয়ালা একটা মুখোশ কেড়ে নিয়ে যান। সেইসঙ্গে নিয়ে যান মুখোশনির্মাতার কুমারী কন্যা কাৎসুরাকে। ওটা ছিল মৃত্যু মুখোশ। শিল্পীর দুর্নাম হবে বলে শিল্পপ্রাণ য়াশাও রাগ করে নিজের তৈরি যতগুলো মুখোশ ছিল সব ভেঙে ফেলে। জীবনে আর মুখোশ গড়বে না। ওদিকে শোগুনের শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত। সেই মুখোশটা পরে তাঁর প্রিয়া কাৎসুরা শোগুন সাজে। শোগুন বলে ভ্রম করে তাকেই মারে শত্রুরা। শুজেনজি থেকে সে পালিয়ে আসে বাপের কাছে। বাপ কোথায় শোক করবে, না মৃত্যুর আলোয় উপলব্ধি করে তার মুখোশ গড়া সার্থক। সে যেমনটি গড়েছে তেমনিটি ঘটেছে। সুতরাং তুলি হাতে নিয়ে বসল সে মরা মেয়ের মুখ এঁকে নিতে। আবার গড়বে সে মুখোশ। সে শিল্পী।

এ নাটিকা দেখতে আমার সময় ছিল না। উঠতে হলো ওকাকুরার সঙ্গে মিলতে। তবু এর উল্লেখ করলুম এইজন্যে যে কাগুকির প্রধান অবলম্বন এইসব উপাখ্যান বা মোনোগাতারি। তা সে বিশ্বাসযোগ্য হোক বা না হোক। জাপানের সাধারণ লোক সব দেশের সাধারণ লোকের মতো সেণ্টিমেণ্টাল কাহিনী ভালোবাসে, তার সঙ্গে একটা লড়াই থাকলে তো সোনায় সোহাগা। আর থাকবে নাচ গান রঙের বাহার রূপের হিল্লোল। কাবুকির শিল্পপরিকল্পনায় সৌন্দর্যের স্থান আছে, কিন্তু সত্যের জন্যে আকুলতা নেই। আর্ট কি কেবল সৌন্দর্যগতপ্রাণ? সত্যই তার লবণ, যা না থাকলে সবকিছু আলুনি। এই তিন শ' বছরে বিশ হাজার কাবুকি পালা লেখা হয়েছে; তার থেকে এখনো শ' পাঁচেক পুরোনো পালা বেঁচে আছে। আমার নিজের ধারণা কাবুকির চেয়ে নো উচ্চাঙ্গের আর্ট। জীবনের সত্য সেখানে শিল্পপ্রতিমার জীবন্যাস করেছে। জনতাকে সেই ঊর্ধ্বে উঠতে হবে।

॥ সাত ॥

দেশ ছাড়ার কিছু দিন আগে কলকাতার এক জাপানী ভদ্রলোক আমাকে চা পানের জন্য বাড়িতে ডেকেছিলেন। গিয়ে দেখি বসবার ঘরের দেয়ালের ধারে এক পূজাবেদী। আলো জ্বলছে। ধূপ পুড়ছে। আমার দেওয়া পদ্মফুলের তোড়া এক দারুমূর্তির চরণে রেখে হাত জোড় করে প্রণত হলেন কনিজুকা মহাশয়। বললেন, 'ইনিই আমার ভগবান। বৈশ্রবণ কুবের। হিন্দু দেবতা। হাজার বছর আগে চীন থেকে জাপানে যান। দ্বার রক্ষা করেন। জাগ্রত দেবতা। মহাশক্তিসম্পন্ন। সিদ্ধিসৌভাগ্যদাতা।'

অবিকল হিন্দু মনোভাব। জাপানে এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই যাত্রা করেছিলুম তবু আশ্চর্য হলুম যখন ওকাকুরা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনাজুর এবং ইনি আমার হাতে দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মচরিত। কিজো ইনাজু একটি বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত। অধিকন্তু তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। উপরন্তু 'জাপান বিশ্বপরিষদ্'-এর পরিচালক। পুরোহিতেরও পরিধানে পাশ্চাত্য পোশাক। কিন্তু মনটা পুরোদস্তুর প্রাচ্য। ভারতবর্ষে যাননি, কিন্তু মনেপ্রাণে আমাদেরই একজন। জাপানী ভাষায় মহর্ষির আত্মচরিত অনুবাদ করে ইনি ক্ষান্ত হননি, তার সঙ্গে সংযোগ করেছেন মহর্ষির বংশলতা। কে যে মহর্ষির কে হন তা ইনি মুখে বলতে পারেন। বেদ উপনিষৎ ব্রাহ্মমত এঁকে আকর্ষণ করেছে।

এঁদের সঙ্গে ছিলেন মাগোইচিরো চাতানী। ভারত-প্রত্যাগত সওদাগর। আর য়োশিএ হোত্তা। ভারত-প্রত্যাগত লেখক। গত বছর দিল্লীতে এশিয় লেখক সম্মেলনে এঁকে আমি দেখেছিলুম, কিন্তু সে সময় পরিচয় হয়নি। চার জনে মিলে কাবুকি-জা থেকে বেরিয়ে চললুম কাছাকাছি একটি রেস্টোরাণ্টে। মালিক জাপানী। খানা পশ্চিমী।

এঁরা সবাই চান যে আমি জাপানে দু'একমাস থাকি, দেখি শুনি আলাপ করি। কিন্তু সামনেই আমার পেন কংগ্রেসের বিজয়া দশমী। সেপ্টেম্বরের দশ তারিখেই দশাহ শেষ। কিয়োতোতে দশহরা। সেখান থেকে যে যার দেশে ফিরে যাবে। আমি আরো কিছু দিন কিয়োতো অঞ্চলে কাটিয়ে আবার তোকিয়ো আসব ও দিন দশেক থেকে আটাশের প্লেন ধরব, যদি পকেটে টাকা থাকে। নয়তো আরো আগে উড়তে হবে আকাশে। বন্ধুরা আমাকে অভয় দিলেন যে টাকার কথা ভেবে স্থিতি সংক্ষেপ করতে হবে না, আতিথেয়তার আশা আছে, বরং থাকার মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে পারি। তা কি হয়! অক্টোবরস্য ষষ্ঠ দিবস লঙ্ঘিত হবে! কেবল গৃহলক্ষ্মী না, সরস্বতীও অভিমান করবেন।

প্রায় প্রতিটি দিন আমি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছি। আমার উপন্যাসের নায়কনায়িকাকে নিভৃতে বসিয়ে রেখে আমি পালিয়ে এসেছি জাপানে। কেন? কোন্ কাজে? পেন কংগ্রেসের কাজ তো দশ দিনের বেশী নয়। তা হলে কেন আমি সোফিয়াদির সঙ্গে দশ তারিখে ফিরে যাইনে। কেন কমলাবোনের সঙ্গে চোদ্দ তারিখে ফিরে চলিনে? জন-দুই বাদে আমাদের দলের সবাই ফিরে যাচ্ছেন ওই দুই ক্ষেপে। সে দু'জনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই। আর ক'দিন পরে দলচ্যুত একক লেখককে কেই বা পুঁছবে! কেই বা পার্টিতে ডাকবে! দেশ দেখাবে!

তার পরে মনে আশ্বাস পেয়েছি যে আছে আমার কাজ। সে কাজ এখনো স্পষ্ট নয়। ক্রমে স্পষ্ট হবে। জাপান আমাকে চায়। প্রতিদিন তার প্রমাণ মিলছে। কেন চায় তা কিন্তু জানিনে। এমন করে আর কোনো দেশ কখনো আমাকে চায়নি। সেতু বাঁধতে হবে ভারতের সঙ্গে জাপানের, বলেছিলেন আমাকে শিনিয়া কাসুগাই। সেতু বাঁধতে পারব না হয়তো, কিন্তু রাখী বাঁধতে পারব।

পরের দিন শুক্রবার। তোকিয়োতে পেন কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন। সেদিন এক ভাষার গ্রন্থ অপর ভাষায় অনুবাদ করা নিয়ে আলোচনা সাঙ্গ হলো; প্রস্তাবও গৃহীত হলো। আমি উপস্থিত ছিলুম না। পাশের একটি কক্ষে জাপানী উডব্লক প্রিণ্ট প্রদর্শনী। সেখানে না গেলে আমার শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যেত। সময়ও ছিল না আর।

জাপানী ভাষায় ওকে বলে উকিয়োএ। উকিয়ো মানে ভাসমান পুরী তারই চিত্রণ উকিয়োএ। ভাসমান পুরী বলতে কী বোঝায়? আমোদপ্রমোদের স্থান। যথা? যথা, কাবুকি রঙ্গালয় ও গেইশাগৃহ। জাপানে এর জন্যে পৃথক পল্লী ছিল। এখনো আছে। যেমন তোকিয়োর আসাকুসা। কিয়োতোর গিয়ন। প্রাচীন ভারতেও এর অনুরূপ ছিল। আধুনিক ভারতে যদি কোথাও থাকে তবে

তা অতীতের ছায়া। অতীতের কায়া আছে জাপানে।

ভারতের মতো জাপানও ছিল প্রকারান্তরে বর্ণাশ্রমের দেশ। অভিজাতরা বর্ণের শ্রেষ্ঠ। তার পরে ক্ষত্রিয় বা সামুরাই। শিল্প যা ছিল তা এঁদেরই ঘিরে। আর ধর্মমন্দিরকে জড়িয়ে। বৈশ্য-শূদ্রের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ছিল না তাতে। তাদের এত পয়সাও ছিল না যে ঝুলন্ত পট কিনতে পারে বা সরন্ত দরজায় আঁকিয়ে নিতে পারে বা ঘরের দেয়ালকে সচিত্র করতে পারে। টাকা জমতে শুরু করল ষোড়শ শতাব্দীতে। সে ব্যবসাবাণিজ্যের যুগসন্ধি। যেমন আমাদের কোম্পানীর আমল। আমোদপ্রমোদ আগেকার দিনে যা ছিল তা সাধারণের রুচির ঊর্ধ্বে। এইবার পত্তন হলো পুতুলনাচের থিয়েটার। কাবুকি থিয়েটার। গেইশাগৃহের ছড়াছড়ি। ছবি আঁকা হলো কাবুকি অভিনেতাদের, রূপসী গেইশাদের। সাধারণের জীবনযাত্রার প্রতিফলন হলো ভাঁজ-করা পর্দায় বা চিত্রিত দেয়ালে। কিন্তু প্রত্যেক গৃহস্থের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না এ সব কেনার বা করানোর। তাই আবিষ্কার করা হলো কাঠের ব্লকের ছাপা। এক-একখানি ছবির হাজার হাজার প্রতিলিপি নয়, হাজার হাজার মূল ছবি। ক্রেতাদের প্রত্যেকে জানবে যে তার খানাই মূলছবি বা তার খানাও মূল ছবি। আজব এক পদ্ধতির দ্বারা এমনটি সম্ভব হয়। দামও শস্তা। অথচ শস্তা বলে খেলো নয়। বিখ্যাত শিল্পীদের বিখ্যাত সব ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ফুল পাখী প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়েও উকিয়োএ সৃষ্টি করা হয়। লোকরুচি প্রসারিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এর বিকাশ। তার পরে মেইজি আমলের সূর্যোদয় আর উডব্লক প্রিন্টের সূর্যাস্ত।

উকিয়োএ তুলির কাজ নয়। চাকুর কাজ। ধারালো চাকু দিয়ে কাটা কাটা আঁকাবাঁকা লাইন টানতে হয়। গোড়ার দিকে ছাপা ছবিতে তুলি দিয়ে রঙিন করা হতো, কিন্তু পরে এমন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয় যাতে তুলির সাহায্য লাগে না, রেখার সঙ্গে রং আপনি ফোটে। একরঙা থেকে দোরঙা, তার পরে দশরঙা; তার পরে বহুরঙা, এই বিবর্তনের ইতিহাস বিচিত্র ও বহুকালব্যাপী। পৃথিবীর আর কোনো দেশ এর খবর রাখত না, রাখলেও এর ধারেকাছে যেত না। এটা জাপানীদের একচেটে। ছাপার সঙ্গে কাগজের সম্বন্ধ আছে। যেমন-তেমন কাগজে ছাপলে ছবি ওতরাবে না। হোশো বলে একরকম মোটা নরম কাগজ আছে, তাতে রং ভিজে অপূর্ব সুন্দর হয়। চিত্রকরের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে হয় খোদাইকারকে ও মুদ্রাকরকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ছবির গায়ে তিনজনের স্বাক্ষর বা নামাঙ্কন থাকত। কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

উকিয়োএর প্রধান কেন্দ্র শোগুন যুগের এদো। প্রধান পটভূমি এদোর প্রমোদপল্লী য়োশিওয়ারা। প্রথম অধ্যায়ের প্রধান পুরুষ মোরোনোবু। দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিন প্রধান হারুনোবু, উতামারো, শারাকু। শারাকুর কবে জন্ম, কোথায় জন্ম, কবে মৃত্যু, কোথায় মৃত্যু, কেউ আজ পর্যন্ত জানে না। মাত্র দশটি মাস তাঁকে ছবি তৈরি করতে দেখা গেছল। দশ মাসে এক শ' চল্লিশখানা ছবি। জাপানীরা তাঁকে বেবাক ভুলে যায়। আস্ত একটা শতাব্দী চলে যায়। ১৯১০ সালে মিউনিকের এক জার্মান তাঁকে আবিষ্কার করেন। এখন তিনি বিশ্ববিখ্যাত। কাবুকি অভিনেতাদের ক্ষণিকের রঙ্গীভঙ্গী ও মুখভাবকে তিনি সর্বকালের করে দিয়েছেন। ধরে রেখেছেন তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের চরিত্র। এইজন্যেই নাকি তারা তাঁর উপর ক্ষেপে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের দুই প্রধান হোকুসাই ও হিরোশিগে। এঁরা কাবুকি অভিনেতা আর সুন্দরী গেইশা ছেড়ে রঙ্গিণী প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরান। হোকুসাই তাঁর নব্বুই বছরের আয়ুষ্কালে ত্রিশ বার নাম বদলান ও তেত্রিশ বার বাসা বদলান। ফুজি পর্বতের রহস্যের তিনি অন্ত পান না, তার রঙ্গীভঙ্গী ও মুখভাবকে নানা স্থান থেকে নানা কোণ থেকে নিরীক্ষণ করেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর

বীক্ষণের ধারা আত্মগত নয়, বস্তুগত। ভাবপ্রভব নয়, যুক্তিপ্রভব। হিরোশিগের বেলা বিপরীত। ঝড় বৃষ্টি বরফ কুয়াশার কবিত্বময় বর্ণনা তাঁর জাপানী প্রকৃতিকে যতখানি ব্যক্ত করে বহিঃপ্রকৃতিকে ততখানি নয়। এই পর্যন্ত এসে উকিয়োএ অস্ত গেল। শুধু সে নয়। গোটা শোগুন যুগটা।

নতুন জাপান ইউরোপের কাছে শিখল লিথোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফি, ও তামার ফলকে ছাপার কৌশল। উকিয়োএর চেয়ে আরো শস্তায়, আরো বেশী সংখ্যায়। জনগণের প্রয়োজন আরো সহজে মিটল। আর সেকালের সেইসব প্রমোদস্থলী থেকে জীবনের স্রোত অনেকদূর সরে এসেছিল। আধুনিক যুগ তাকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে চলল। জনগণের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হলো। ভারতের সাধারণ লোকও কি আর কালীঘাটের পট কিনতে চায়? কোম্পানীর আমলের পর মহারানীর আমলে সকলেরই রুচি বদলে যায়। যেমন শিক্ষিত মহলে তেমনি অশিক্ষিত স্তরে। ইতিমধ্যে সেটা আরো প্রকট হয়েছে। রুচিবদল বললে রুচির উন্নতি বোঝায় না কিন্তু। শিল্পকাজের উৎকর্ষও না। উকিয়োএ সেকেলে হলেও একালের চিত্রকর্মের চেয়ে কম চিত্তাকর্ষক নয়। ইউরোপেও তার প্রভাব পড়েছে। দেখতে দেখতে মনে হয় কী মায়াবী দেশ ছিল জাপান! ভানুমতীর নিজের রাজ্য। ইচ্ছা করে মায়াশতরঞ্চে বসে উড়ে যেতে এক যুগ থেকে আরেক যুগে। এ যুগ থেকে ও যুগে। পাগল করে দেয় অজ্ঞাতনামা শিল্পীর সৃষ্টি কাম্বুন আমলের নৃত্যপরা সুন্দরী। কী অপূর্ব তার ভঙ্গী, তার গতিবেগ, তার অঙ্গবাস, তার হাতে ধরা পাখা, তার টানা টানা চোখ, তার নাসা আর কেশ আর মুখ।

জাপান যে নতুন করে সভ্য হলো তা নয়। সে সভ্য ছিল, কারো কারো মুগ্ধ নেত্রে সভ্যতর ছিল। পূর্বযুগের মায়া-অঞ্জন যারই চোখে লেগেছে তারই সে বিভ্রম জাগবে। আমিও মাঝে মাঝে ভেবেছি কী এমন ক্ষতি ছিল জাপান যদি চিরকাল মধ্যযুগের মায়াপুরী হয়ে আর সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে যেত! তা হলেই আর সকলে তার ধনে ধনী হতো। কিন্তু ও ভাবনা ভুল। আমার সহজ বোধ আমাকে সজাগ করেছে, এই রাজ্যের উপর কী যেন একটা অভিশাপ আছে। কোথায় কী যেন একটা গলদ। সেইজন্যে ত্যাগ আর বীর্য আর শ্রম আর সৌন্দর্য আর বুদ্ধি আর বিবেক থেকেও ঠিকমতো মিশ্রণ হয়নি।

এশিয়া ফাউণ্ডেশনের মার্কিন ও জাপানী বন্ধুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত মধ্যাহ্নভোজন। ভারতীয়দের খাতিরে। খেতে খেতে দেরি হয়ে গেল। বাস ছেড়ে দিল পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নিয়ে গবর্নরের অনুগ্রহে তোকিয়ো শহর ঘুরিয়ে দেখাতে। বাস কোন্‌খানে দাঁড়াবে তার নাম যোগাড় করে ট্যাক্‌সি ডেকে বলা হলো, চালাও জলদি। ট্যাক্‌সিতে জনা দুই মহিলা, জনা দুই পুরুষ। বাইরে লেখা আছে—আশি ইয়েন। জাপানের এটি একটি উত্তম প্রথা। বড় ট্যাক্‌সি একশ' ইয়েন। মেজ ট্যাক্‌সি নব্বুই ইয়েন। সেজ ট্যাক্‌সি আশি ইয়েন। ছোট ট্যাক্‌সি সত্তর ইয়েন। প্রথম দুই কিলোমিটার এই ভাড়ায় যায়। তার মানে সওয়া মাইল। এ হলো তোকিয়োর হার। অন্যান্য শহরে অন্যান্য হার। এখানে বলে রাখি যে জাপানীরা সংখ্যা লেখে ইংরেজদের মতো আরব্য পদ্ধতিতে। মুদ্রায়, নোটে, টিকিটে—সর্বত্র ঐ পদ্ধতি। রোমক লিপির ওয়াই কেটে ইয়েন সূচনা করা হয়।

তা আমাদের সেজবাবু তো আমাদের নিয়ে চললেন। জোয়ান মদ্দ। গুণ্ডার মতো চেহারা। যাকে দেখে তাকেই শুধায়, আরে ভাই এই প্রাসাদটা কোথায়? শুনে নিয়ে আমাদের দিকে বীরদর্পে তাকায় আর একগাল হাসে। আর সবজান্তার মতো বলে, 'হাই।' তার পর হাওয়ার মতো ছোটে। আর হঠাৎ ব্রেক টিপে ধরে যাকে পায় তাকে ডেকে আবার শুধায়, আরে ভাই। রাস্তায় সে কী ভিড়? যানে-মানুষে টানাটানি। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেজবাবু বলছেন, আরে ভাই। তার পর হেঁকে উঠছেন, 'হাই।' আর ধাঁই করে চালিয়ে দিচ্ছেন শ্বাস-কেড়ে-নেওয়া বেগে। জাপানী জানিনে,

তাই বলতে পারছিনে, আরে ভাই, থাম। অমন করে ধনেপ্রাণে মেরো না। আমরা নেমে যাই। আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাই যে আর কাজ নেই চালিয়ে। কিন্তু উল্‌টো বুঝলি রাম। কী! এত অবিশ্বাস! আমি জানিনে রাস্তা! আরো জোরসে চালায়। আমরা চোখ বুজে ইষ্টদেবতা স্মরণ করি। সোফিয়াদি, কমলাবোন, এঁদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। আমারও।

ডাকু কিন্তু ঠিক পৌঁছিয়ে দিল আমাদের। বকশিশ চাইল না। ইউরোপ হলে চাইত। লোকটা সত্যি খুব ভালো। মন্তব্য করলেন সোফিয়াদি। আমিও স্বীকার করলুম যে ওর ওই হাসি দিলখোলা সরল প্রাণের হাসি। 'আরিগাতো গোজাইমাসু' বলে ধন্যবাদ দিলুম ওকে। দেখলুম যেখানে এনেছে সেটা একটা প্রাসাদ। পুরোনো এক সম্রাজ্ঞীর। এখন সেখানে রেশমের গ্যালারি হয়েছে। 'সিল্ক রোড সোসাইটি' বলে রেশমশিল্পের উন্নতিকামীদের একটি প্রতিষ্ঠান ওর পরিচালক। রেশম কিনলুম আমরা। মেয়েরা রেশম বয়ন করছিল। রকমারি তাঁত। সংলগ্ন উদ্যানে গিয়ে পায়চারি করলুম। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম যে তোকিয়ো শহরে আছি।

তার পর চল চল রব। এবার সদলবলে বাসযোগে নগরপরিক্রমা। তোকিয়োর নয়ী দিল্লী। যত রাজ্যের সরকারী বিভাগ। তার পর যেতে যেতে সম্রাটের প্রাসাদভূমির সীমানা। সীমানার বাইরে পরিখা। বাসে আমাদের গাইড ছিল একটি মেয়ে। সে বলল, 'তোকিয়ো শহরের এই একমাত্র ঠাঁই যার জন্যে আমি গর্বিত।'

তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার দিয়ে বাস চলল উএনো অঞ্চল ছাড়িয়ে। শিনোবাজু পুষ্করিণী। রাশি রাশি পদ্মপত্র। ফুল দেখলুম না একটিও। আমার ধারণা ছিল জাপানে পদ্ম নেই। সেটা ভুল। আমাদের ইম্পিরিয়াল হোটেলের সামনেই তো পদ্মপুকুর। বুদ্ধমূর্তিরও পদ্মাসন জাপানে।

আসাকুসায় কান্নন বোসাৎসুর মন্দির। কান্নন হলেন অবলোকিতেশ্বর। বোধিসত্ত্ব। বোসাৎসু। বোধিসত্ত্বরা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন। খ্রীস্টানদের এন্‌জেলদের মতো তাঁরা নরনারীভেদের উর্ধ্বে। কিন্তু চীনদেশে ওরা অবলোকিতেশ্বরকে নারীরূপে কল্পনা করে। তাই জাপানেও অবলোকিতেশ্বর হলেন নারী। নামকরণ হলো কান্নন। বিদেশীরা ভুল বুঝে দেবতা বলেন। 'Goddess of Mercy.' বুদ্ধের পরেই কান্ননের জনপ্রিয়তা। এমন-কি বুদ্ধের চাইতেও বেশী প্রভাব। যেমন শিবের চেয়ে শক্তির।

এই মন্দিরকে সেন্‌সোজি বলা হয়। এর অধিষ্ঠাত্রী কান্নন বোসাৎসু, তাই লোকমুখে এর পরিচয় কান্নন বোসাৎসুর মন্দির। এর প্রতিষ্ঠাকাল ৬২৭ সাল। তার মানে তেরো শ' বছর আগে। তা বলে বর্তমান মন্দিরগৃহটি তত পুরাতন নয়। জাপানে অগ্নিদেবতার প্রতাপ সব দেবতার চেয়ে বেশী। সেইজন্যে প্রাচীন মন্দিরগৃহ বড় একটা দেখা যায় না। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষভাগে সারা আসাকুসা অঞ্চলটাই ধ্বংস হয়ে যায়। দশ বছরের মধ্যেই মন্দিরের প্রধান মহল পুনর্নির্মিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ ভক্তের চেষ্টায়। এখনো অন্যান্য অংশের পুনর্নির্মাণ বাকী।

এই মন্দিরের বিশেষত্ব প্রকাণ্ড একটি লাল কাগজের লণ্ঠন। গেইশাদের উপহার। আর-এক বিশেষত্ব মন্দিরে যাবার দীর্ঘ সরণির দু'ধারে দু'সারি বিপণি। একে বলে নাকামিসে। সপ্তদশ শতকের স্মারক। তোকিয়োতে এত বেশী কেনাবেচা খুব কম বাজারে হয়। শস্তায় কিনতে চাও তো নাকামিসে যাও। নিকটেই গেইশাপল্লী। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল।

বাস থেকে নেমে দেখি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন একটি অভ্যর্থক মণ্ডলী। মন্দিরের তরফ থেকে। মণ্ডলীর ওরাও আমাদের প্রায় সমসংখ্যক। বেশীর ভাগই অল্পবয়সী মেয়ে। আমার অনুমান কুমারী মেয়ে। কেশবিন্যাসের স্টাইল থেকে আর কোনো অনুমান আমার মনে জাগেনি। ফুটফুটে লক্ষ্মী মেয়ে, যেমন কচি তেমনি নিরীহ। আহা! কেমন ভক্তিমতী। তীর্থঙ্করদের

স্বাগত জানাতে এসেছে।

সদলবলে নাকামিসের ভিতর দিয়ে চলেছি। দোকানদাররা হাঁ করে দেখছে নানা দেশের লেখকলেখিকাদের। আমরাও হাঁ করে দেখছি দোকানে সাজানো শিল্পজাত সামগ্রী। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আমাদের স্বাগতকারিণীর দল। এমন সময় কে একজন কর্তাব্যক্তি আমাদের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হাত ধরাধরি করে চলুন। জোড়ে জোড়ে চলুন।' যেন আকাশবাণী হলো।

আমার পাশে পাশে চলছিল একটি ষোল-সতেরো বছর বয়সী স্বাগতকারিণী। একটু ইতস্তত করে তার হাতে হাত মেলালুম। সে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে আমার হাতে হাত রাখল। স্মিত হেসে বলল, 'ইঙ্গিরিশি নো।' বুঝতে সময় লাগল যে ও বলছে, ইংরেজী জানিনে। কথাটি না বলে হাতে হাত দিয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, কই, আর কেউ তো আমার মতো আকাশবাণী মানছে না। তবে কি—

দেখে নিশ্চিন্ত হলুম যে আরো একজন আমারই মতো হাতে হাত রেখে চলেছেন। ফরাসী কি ইটালিয়ান। তবু মনটা সায় দিল না। ভাবলুম কী করে হাত ছাড়ি। ছাড়লে কি মেয়েটির মনে লাগবে না! তা বলে কাঁহাতক সোয়া মাইল পথ পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটা যায়। এমন সময় দেখি মেয়েটি আপনা থেকে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে তার সখীর সঙ্গে একত্র হলো। আমিও আমার স্বদলের সঙ্গে এক হয়ে গেলুম।

সেন্‌সোজির পুরোহিত আমাদের আদর করে এক-একটি উপহার দিলেন। আমরাও তুলি দিয়ে নাম সই করলুম। দিব্যি ভিড়। ভক্তজন হাত জোড় করে দাঁড়িয়েছেন, মাথা নোয়াচ্ছেন, ভিক্ষাধারে মুদ্রা নিক্ষেপ করছেন। আসল মূর্তিটি দেখতে দেওয়া হয় না। শুনেছি সেটি ছোট্ট একটি সোনার বিগ্রহ। তেরো শ' বছর আগে তিনটি জেলে সেটি সুমিদা নদীতে জাল ফেলে মাছের সঙ্গে পায়। মহারানী সাইকোর রাজত্বে।

ফিরতি পথে কেউ আমাদের পার্শ্বচর হলো না। দলটাও ছত্রভঙ্গ। বৃষ্টি পড়ছিল। কাপড়চোপড় বাঁচিয়ে দৌড়তে দৌড়তে বাসে গিয়ে উঠি। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আবিষ্কার করি যে ওই মেয়েগুলি গেইশা। গেইশার হাত ধরে প্রকাশ্য রাজপথে চলেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই আমার বলতে ইচ্ছা গেল, মা ধরণী দ্বিধা হও।

আমাদের গাইড মেয়েটি বেশ ইংরেজী বলে। পরনে গাইডের ইউনিফর্ম। খোঁপার উপর ক্যাপ। একটুখানি বেঁকানো। প্রাণোচ্ছলা। রসিকা। বাস চলতে আরম্ভ করলে তারও মুখ চলতে শুরু করল। 'এই রাস্তায় ওই যে সব বাড়ি দেখছেন ওখানে কারা থাকে, জানেন? গেইশারা। গেইশা কাদের বলে, জানেন? যারা প্রোফেসনাল এন্টারটেনার।'

কথাটা আরো দু-এক জায়গায় শুনেছি। সেকালে এর জন্যে লজ্জাবোধ ছিল না। একালে জগৎ এসে হাজির হয়েছে জাপান দেখতে। তার ভালোমন্দের নিরিখ অন্যরকম। তাই তাকে বোঝাতে হয়, বুঝ দিতে হয়, এরা প্রোফেসনাল এন্টারটেনার!

মেয়েটি আরো বলল, 'দি গেইশা ইজ এ প্রাউড পার্সন। সে কারো অনুকম্পা চায় না।' জাপানের গেইশাদের ঐতিহ্য সেইরকম বটে। তাদের ত্যাগ তাদের মহত্ত্ব দেশবিশ্রুত। অনেকেই তারা মা-বাপের দুঃখ দেখতে না পেরে গেইশা হয়ে অর্থ সাহায্য করে। অনেকেই শিক্ষিতা, বিদ্যাবুদ্ধিতে পুরুষের সমকক্ষ। কেউ কেউ সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়, কেউ কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেলে বিয়েও করে। লাফকাডিও হার্ন আই বলে যে মেয়েটির কাহিনী লিখেছেন সে ভালোবাসা পেয়েছিল, ভালো বর পেয়েছিল, ভালো ঘর পেয়েছিল, শ্বশুর-শাশুড়ীরও মত ছিল, কিন্তু বিয়ে না করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, বহুকাল পরে জানা গেল সে সর্বস্ব ত্যাগ করে বুদ্ধের শরণ নিয়েছে। কেন?

তার ঔচিত্যবোধ তাকে নিবর্তন করেছিল। 'তোমার স্ত্রী হয়ে আমি তোমার লজ্জার কারণ হব না।'

যেতে যেতে আমাদের গাইড বলল, 'আচ্ছা, আপনারা কি কখানো জাপানী গান শুনেছেন? শোনাব একটা?' গাইড হতে হলে ও বিদ্যাও শিখতে হয়, তার পরিচয় দিল। স্বদেশপ্রেমের গান কি নিছক প্রেমের গান ঠিক মনে পড়ছে না। তারিফ করলুম আমরা! তখন সে আরো একটা গান গেয়ে শোনাল। চলন্ত বাসে। শহরের মাঝখানে।

এর পরে গাইড বলল, 'আমাদের জাপানীদের জীবনে চারটি পরম আতঙ্ক। একটি হলো ভূমিকম্প। জানেন তো ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পে এই তোকিয়ো শহরটাই ধ্বংস হয়? দ্বিতীয়টি হচ্ছে আগুন। আগুন যে-কোনো দিন যে-কোনো জায়গায় লাগতে পারে। তৃতীয়টির নাম টাইফুন। এই তো তার সময়। আর চতুর্থটির নাম?'

ভেবেছিলুম এর পরে আসছে পরমাণু বোমা। মেয়েটি একগাল হেসে আমাদের মাথায় পরমাণু বোমাই ফেলল। 'হাজব্যাণ্ড! হাজব্যাণ্ড ইজ দি গ্রেটেস্ট টেরর অফ জাপান।' তারপর আশ্বাস দিল, 'তবে আর বেশী দিন নয়। জমানা বদলে যাচ্ছে। আর এক পুরুষ বাদে স্বামীমহাপ্রভুদের এত তেজ থাকবে না।'

॥ আট ॥

টাইফুন! টাইফুন! এই তার সময়। আরো একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন কাওয়াবাতা। এবার তোকিয়ো কাইকানের নৈশ ভোজে। তিনি অবশ্য চান না যে টাইফুন আসে, কিন্তু তাঁর কথাবার্তার ধরন থেকে মনে হলো তিনি ওই অভিসারিকার পায়ের ধ্বনি শুনতে না পেয়ে একটু যেন নিরাশ হয়েছেন। ওদিকে খবরের কাগজে রোজ লিখছে, 'তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি? সে যে আসে, আসে, আসে।'

সেই বিরাট ভোজনকক্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পানাহার গল্পগুজব ও বক্তৃতা একসঙ্গে চলছিল। ফরাসীদের দলে আমিই একমাত্র অরসিক যে সোমরসে বঞ্চিত। কিন্তু পানে আমার বিতৃষ্ণা থাকলেও আহারে অগ্নিমান্দ্য ছিল না। জাপানীরা রাঁধে ভালো, খাওয়ায় ভালো আর ক্ষুধাও অত ঘোরাঘুরি করলে ভালোই পায়। তা সত্ত্বেও আমার মুখের খাদ্য মুখে রুচল না যখন শুনলুম কাওয়াবাতা বলছেন, পেন কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্যে জাপানীরা মুক্ত হস্তে চাঁদা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বড়লোক মাঝারি লোক তো আছেনই, আর আছেন স্কুলকলেজের ছাত্র, কলকারখানার মজুর, এমন কি যক্ষ্মানিবাসের রোগী। সারা জাপান সাড়া দিয়েছে।

সত্যি! লেখক হয়ে এমন সম্মান আর কোথাও পাইনি। যেখানেই যাই পেন কংগ্রেসের লেখক বলে লোকে দু'বার চেয়ে দেখে। কোথাও পেন কংগ্রেসের নাম-লেখা লাল শালু, কোথাও পেন কংগ্রেসের নাম-আঁকা আতশবাজি। যেন আমরা কৃতার্থ করে দিতে এসেছি। সুধীন ঘোষ আমাকে আগেই বলেছিলেন, দেখবেন জাপানীরা খুব খাতির করবে। ওরা ইংরেজদের মতো লেখকদের সম্বন্ধে উদাসীন নয়।

এসব ভোজসভার অবলম্বন অবশ্য পানাহার, কিন্তু উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক পরিচয়। আমার টেবিলে এক ফরাসী মহিলা বসেছিলেন, কী একটা কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বললুম, 'কিন্তু

মার্কিনরা তো ফ্রান্সকে ভালোবাসে।'

ভদ্রমহিলা শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'হুঁ! ভালোবাসে! গ্রাস করতে ভালোবাসে!' এর পর তিনি যা বললেন তার অর্থ মার্কিনের ভালোবাসা রাহুর প্রেম।

'কিন্তু ইংরেজরা অমন নয়। ফ্রান্সকে ওরা আপনার মনে করে।'

'হাঁ, হাঁ! আপনার মনে করে! আপনার সম্পত্তি কিনা! যাকে খুশি বিলিয়ে দেবে!'

'তা হলে, মাদাম, কারা আপনাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু?'

ভদ্রমহিলা আমাকে বিমূঢ় করলেন। 'কেন? জার্মানরা!'

শুনুন। শুনুন। ফরাসীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু জার্মানরা। কালে কালে কত শুনবেন। হয়তো শুনবেন জাপানীদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু মার্কিনরা। মার্কিনদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু রুশেরা।

'কিন্তু, মাদাম, ওরা যে আপনাদের ঠেঙিয়ে টিট করে দিল বার বার। এই সেদিনও কী মারটাই না মারল! এত কাল শুনে এলুম জার্মানরা ফরাসীদের জাতশত্রু।'

ভদ্রমহিলা আমাকে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, 'জার্মানরা মানুষ ভালো। যুদ্ধের সময় কত কী খারাপ কাজ করতে হয়। কে না করে? তা বলে কি মানুষ খারাপ হয়ে যায়? জার্মানদের অনেক সদ্‌গুণ আছে। ওদের সঙ্গে আমাদের কিসের ঝগড়া?'

আসলে জার্মানদের সঙ্গে ফবাসীদের আর কোনো স্বার্থের সংঘাত নেই। ওরা তো আলজিরিয়ায় ফরাসীনীতি নিয়ে উচ্চবাচ্য করছে না। অস্ত্র পাঠাচ্ছে না টিউনিসিয়ায়। নয়তো ভদ্রমহিলার মুখে ওদের নিন্দাবাদও শোনা যেত। তা ছাড়া ফরাসী জার্মান ওলন্দাজ বেলজিয়ান ইটালিয়ান মিলে নতুন একটা সমবায় গড়ে উঠছে। 'লিটল ইউরোপ।' এই বছরের প্রথম দিন থেকেই ওদের মাঝখানে আমদানি-রপ্তানির মাশুল উঠে গেল, যেতে আসতে বিধিনিষেধ থাকবে না। জাতীয়তাবাদের উপরে উঠতে চেষ্টা করছে পশ্চিম ইউরোপের লোক। কবে কে কাকে ঠেঙিয়ে টিট করে দিয়েছে সেসব কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। ভারত পাকিস্তানের লোকেরও।

তোকিয়োতে পেন কংগ্রেসের এইখানেই যবনিকা। এর পরের অঙ্ক কিয়োতো। কিন্তু অনেকেরই সেখানে যাওয়া হবে না। সুতরাং এই দেখাই শেষ দেখা। বিদায়ের সুর বাজছিল বক্তৃতায়, কথাবার্তায়। অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ। সেখানে নানা দিগ্‌দেশাগত পক্ষী একরাত্রের জন্যে একত্র হয়। ভোর হলে কে কোথায় উড়ে যায়। তবু তো পরের দিন আবার তারা উড়ে আসে। সবাই নয় যদিও। আমাদের উড়ে আসার সুদূরতম সম্ভাবনা নেই। এতগুলি পাখীর তো নয়ই।

এই ক'দিনে অনেকের সঙ্গে মুখচেনা হয়েছিল। কতকের সঙ্গে চেনাশোনা। তাই ক্ষণকালের জন্যে হলেও একটা বিষাদের ছায়া পড়ল মুখে যখন এলমার রাইস বললেন তিনি আমাদের সঙ্গে কিয়োতো আসছেন না, ফিরে যাচ্ছেন আমেরিকায়। একবার কী একটা প্রসঙ্গে আমি তাঁর শ্রবণে বলেছিলুম, 'আমেরিকানরা স্বামী হয় ভালো।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি পালটা জবাব দিলেন, 'কিন্তু ঘন ঘন স্ত্রী বদলায়।' নাট্যকারের উপযুক্ত ডায়ালগ। লোকটি নিরহঙ্কার। স্নেহশীল।

জাপানে রওনার আগে আমার বৈরাগ্য উদয় হয়েছিল। গৃহিণীকে বলেছিলুম মাছমাংস ছেড়ে দেব। তা শুনে তিনি বলেছিলেন, ছাড়তে চাও ফিরে এসে ছেড়ো। স্ত্রীবুদ্ধি শুভঙ্করী। নইলে সে রাতের সেই বিদায়ভোজে আমাকে প্রায় অভুক্ত থেকে যেতে হতো। সোফিয়াদির মতো তাঁকে বসিয়েছে সম্মানিত অতিথির টেবিলে, কিন্তু ভুলে গেছে যে তিনি বা তাঁর মতো অনেকে নিরামিষাশী। একই ব্যাপার হলো পরের দিন কিয়োতোর সেনবংশের চা-অনুষ্ঠানে। সে কথা যথাকালে।

পরের দিন ভোরে উঠে তৈরি হয়ে নিয়ে প্রাতরাশ ও তার পরে হোটেল থেকে তোকিয়ো স্টেশন। হিবিয়া থেকে মারুনৌচি। এ পাড়া ও পাড়া! মিনিট পাঁচেকের বাস-দৌড়। মালপত্র কতক রেখে গেলুম হোটেলে, কতক একদিন আগে থাকতে দিতে হয়েছিল টুরিস্ট ব্যুরোর হেফাজতে, তারা পৌঁছে দেবে কিয়োতোর মিয়াকো হোটেলে। সঙ্গে ছিল ছোট একটি ব্যাগ আর শান্তিনিকেতনের ঝোলা।

কিয়োতো পড়ে ওসাকার পথে। ওসাকাগামী ট্রেনের নাম 'সাকুরা'। চেরীফুল। কী সুন্দর নাম! জাপানের লিমিটেড এক্স্প্রেস ট্রেনগুলির নামগুলি এমনি কবিত্বময়। যেটিতে কিয়োতো থেকে ফিরি সেটির নাম 'ৎসুবামে'। সোয়ালো পাখী। এগুলি অত্যন্ত দ্রুতগামী। পথে খুব কম জায়গায় দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। বিদ্যুৎ দিয়ে চলে অবশ্য জাপানের সব ট্রেনই আমাদের এই পথে। তবে সব ট্রেন সমান চঞ্চল নয়। সমান পরিষ্কারও নয়। ভাড়ার তারতম্য আছে একই শ্রেণীতে। টিকিট আমাকে কাটতে হলো না, ওরাই কাটল, কিন্তু তার পদ্ধতিটা বেশ মজার। একখানা হলো মূল টিকিট। তোকিয়ো থেকে কিয়োতো। তার উপর আর একখানা এক্স্প্রেস ট্রেনের। তার উপর আরো একখানা লিমিটেড এক্স্প্রেস ট্রেনের বা সংরক্ষিত আসনের।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ভারতের রেলপথের দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই একই শ্রেণী। আসনগুলো গদিমোড়া, ঠেলা দিলে নেমে যায়, আরাম কেদারার মতো। সকলের মুখ ইঞ্জিনের দিকে। এক এক সারিতে দু-দু জোড়া আসন। মাঝখানে চলাফেরার পথ। সে পথ সারা ট্রেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত চলে গেছে। এক কামরা থেকে গিয়ে আরেক কামরায় আড্ডা দিয়ে আসা যায়। তৃতীয় শ্রেণীও বেশ আরামের। সেখানেও আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট। গদিমোড়া আসন। তবে অল্পস্বল্প তফাৎ আছে।

বিমানে বসেছিলুম আমরা আটজন ভারতীয় লেখক। একজন লেবাননবাসী লেখকও। আর ট্রেনে বসলুম আমরা পাঁচ মহাদেশের শ' দুয়েক লেখক। এক ট্রেনে এতসংখ্যক লেখক কখনো কোথাও ভ্রমণ করেছেন কি? বলতে গেলে আস্ত একটা কংগ্রেস চলেছে এক ট্রেনে। সাত ঘণ্টার পথ।

ট্রেন চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তোকিয়ো শহরও চলেছে। সে যেন ফুরোবার নয়। সে যদি বা সাবা হলো শুরু হলো য়োকোহামা। দেখতে দেখতে ক্রমে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কে একজন বলে উঠলেন, 'বুদ্ধ। বুদ্ধ।' প্রকাণ্ড এক বিগ্রহ আকাশতলে উপবিষ্ট। একটু যেন সামনের দিকে ঝুঁকে। একটু যেন সবুজ বরণ। এই কি সেই কামাকুরার বুদ্ধ? পরে জেনেছিলুম এটি আমাদেরি কালের এক শিল্পীর অসমাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি। করুণার দেবী কান্নন। কামাকুরার বুদ্ধমূর্তির মতো ব্রঞ্জনির্মিত নয়। আধুনিক উপকরণে গঠিত।

কখন এক সময় দেখি সমুদ্র। এই সেই প্রশান্ত মহাসাগর যার উপর দিয়ে উড়ে এসেছি। বালুকাময় বেলাভূমি দেখতে পেলুম না। এক জায়গায় পাথরের উপর বসে ছেলেরা মাছ ধরছে। সমুদ্র ধীরে ধীরে অদর্শন হয়ে গেল। বিরলবসতি বনের ভিতর দিয়ে চলেছি। আবার এলো সমুদ্র। এবার দেখতে পেলুম সমুদ্রের ধারের ছোট ছোট শহর। জাপানের রিভিয়েরা। স্বাস্থ্যের জন্যে যেখানে যায়। উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করে। ওদাওয়ারা। আতামি। আতামির কথায় মনে পড়ল তানিজাকি এখানে থাকেন। কিয়োতো থেকে ফিরে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আতামি আসা যাবে।

এর পরে এলো সুড়ং। বেশ দীর্ঘ। তার পর আবার সমুদ্রকূল। ক্রমে তাও মিলিয়ে গেল। পাহাড়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে শহর। ছোট ছোট কারখানা। বড় বড় কারখানারও বাড়িঘর ভারী নয়।

তার পর এলো বৃহৎ নগর নাগোইয়া। চিমনীতে চিমনীতে ছেয়ে গেছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মলিন। প্ল্যাটফর্মে নেমে পায়চারি করলুম। লোকের ভিড়, কিন্তু হৈচৈ হাঁকডাক নেই। কেবল সুর করে বিড়বিড় করছে ফিরিওয়ালা। সিগারেট চকোলেট পত্রিকা ইত্যাদি তার ডালায়; রকমারি জাপানী খাবার প্যাকেট বেঁধে বিক্রী হয়। অনেকের মধ্যাহ্নভোজন সেইভাবে হয়।

জাপান টুরিস্ট ব্যুরো আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছে। তারাই দিয়ে গেল আমাদের আসনে লাঞ্চ খাবার প্যাকেট। খুলে দেখি পাশ্চাত্য পদ্ধতির। সঙ্গে দিয়েছে ছুরি কাঁটা। কিসের তৈরি মনে পড়ছে না। প্ল্যাস্টিকের না বাঁশের। তাই দিয়ে মুরগী খাওয়া গেল। কিন্তু গলা ভেজাবার জন্যে জল কোথা পাই? বলে কোনো ফল হলো না। অগত্যা আমার প্রতিবেশী আর আমি চলন্ত ট্রেনে টলতে টলতে চললুম ডাইনিং কারে জল খেতে। ছোট এতটুকু ডাইনিং কার। সামান্য জনকয়েকের আয়োজন। আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা হয় না। বোঝা গেল লাঞ্চ প্যাকেট কিনে খাওয়াই রীতি। জলও দিয়ে যায় করিডোর দিয়ে দুটি মেয়ে। চা ইত্যাদি পানীয় তাও বেচতে আসে করিডোরে।

হাঁ, ডাইনিং কার থেকে ফিরে আসার সময় দেখা ডাক্তারের সঙ্গে। সেই যে জার্মান ডাক্তার যিনি আমাকে সেদিন রাত্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর মোটরে করে আমার হোটেলে। তিনিও চলেছেন কিয়োতো, আমাদেরই দলে। জাপান পেন ক্লাবের তিনিও একজন সদস্য কিংবা বন্ধু। জাপান পেন ক্লাবের সদস্যতালিকায় দেখেছি বিদেশীদেরও নাম। অন্য ভাষার লেখককেও তাঁরা সদস্য করে নেন। এই উদারতা অনুকরণযোগ্য।

কথায় কথায় ডাক্তার বললেন, 'মেয়েটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু এরই মধ্যে ওর উপন্যাসটির ছ'লাখ কেটেছে। শোনেননি নাম? 'বাঙ্কা'। সিনেমা হয়েছে। সেদিন দেখে এলুম। হারাদা। য়াসুকো হারাদা লেখিকার নাম।'

জাপান পেন ক্লাব আর ইউনেস্কোর জাপানী ন্যাশনাল কমিশন মিলে চমৎকার একখানি 'Who's Who' সংকলন করেছেন। তাতে জাপানের ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য লেখকলেখিকার কমবেশী পরিচিতি আছে। শেষের দিকে দেখা যায় বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের নাম। এবং বিচিত্র পুরস্কারের তালিকা। তারই এক জায়গায় দেখি নারী সাহিত্যিক সমিতির পুরস্কার পেয়েছেন য়াসুকো হারাদা। পুরস্কারের উপলক্ষ 'বাঙ্কা'। প্রাপ্তির সাল ১৯৫৭। পূর্ববর্তী সালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্যে। তাঁর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত হয়েছেন তোমি ওহারা। তাঁর উপন্যাসটির নাম 'স্ট্রেপ্টোমাইসিন থেকে বধির'।

এই যেমন নারী সাহিত্যিক সমিতি উপন্যাসের জন্যে পুরস্কার দেন তেমনি জাপান সাহিত্য উন্নয়ন সমিতি থেকে আকুতাগাওয়ার নামে পুরস্কার দেওয়া হয় সাহিত্য জগতে নতুন নতুন লেখকদের পরিচয় ঘটানোর জন্যে। ১৯৫৫ সালে এঁরা পুরস্কার দেন শিন্তারো ইশিওয়ারাকে। এই ছেলেটি এখন জাপানের সব চেয়ে জনপ্রিয় লেখক। এঁর উপন্যাস 'সৌর ঋতু' একালের ছেলেমেয়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জীবনবেদ। তার থেকে চলতি হয়েছে একটা বক্রোক্তি—'সৌর পরিবার'। অর্থাৎ গোল্লায় যাওয়া উত্তরপুরুষ।

চলন্ত ট্রেনে হৈ হৈ করে বেড়িয়ে সুখ আছে। কিন্তু পাশাপাশি বসবার জায়গা তো পাওয়া যায় না। সব গোনাগুনতি। করিডোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আড্ডা দেওয়া যায়! দুটো-একটা কথা অনেকের সঙ্গেই হলো। বিশেষ করে আঁদ্রে শাঁসঁর সঙ্গে। তিনি প্যারিসেই বাস করেন, তবে তাঁর আসল বাড়ি হলো দক্ষিণ ফ্রান্সে। প্রোভাঁসে। প্রায়ই সেখানে গিয়ে থাকেন। 'প্রোভাঁসের ভাষা তো ফরাসীরই একটি উপভাষা?' আমার অজ্ঞতা দেখে শাঁসঁ কী মনে করলেন, তৎক্ষণাৎ বললেন,

'না, না, স্বতন্ত্র ভাষা।' তিনি তাঁর মাতৃভাষায় কবিতা লেখেন। আর উপন্যাস লেখেন ফরাসীতে।

সেই দিন কি অন্য কোনো দিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আন্তর্জাতিকতা ভালো জিনিস বইকি। ও না হলে দুনিয়া বাঁচবে না। আবার জাতীয়তাও ভালো জিনিস। এ না হলে না হবে কাব্য, না হবে আর্ট না হবে সঙ্গীত। চাই সামঞ্জস্য।'

কখন এক সময় দেখি হ্রদ। চোখ জুড়িয়ে গেল নীলাঞ্জন মেখে। কাচের জানালার ধারে বসে আছি। ফ্রেমে বাঁধছি এক-একখানি ছবি। দিনটা গরম, যদিও মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। আরাম কেদারায় ঠেস দিয়ে তন্দ্রার ভাব আসছে। একা আমার নয়। ট্রেন চলেছে পশ্চিম মুখে হন্‌শু দ্বীপের বুক চিরে। এই দ্বীপটিই আসল জাপান। বাকী তিনটি দ্বীপের নাম কিয়ুশু, শিকোকু, হোক্কাইদো। শেষেরটি একটু স্বতন্ত্র।

যতই পশ্চিমে যাচ্ছি ততই জাপানের সভ্যতার আদিভূমির দিকে যাচ্ছি। তারও পশ্চিমে কোরিয়া ও চীন। প্রাচীন জাপানের উপর তাদের প্রভাব ততখানি আধুনিক জাপানের উপর ইউরোপ ও আমেরিকার প্রভাব যতখানি। মাঝখানের কয়েক শতাব্দী জাপান সেকালের পশ্চিম ও একালের পশ্চিম দুই পশ্চিমের প্রভাবকে দূরে রেখেছিল। এমনি করে এলো তার চরিত্রে দ্বৈপায়নতা। সেটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি।

সেই দ্বৈপায়ন যুগেও কিছুকালের জন্যে পর্তুগিজ সংস্পর্শ ঘটেছিল। ওদের কায়দা হচ্ছে প্রথমে কতক লোককে দীক্ষা দিয়ে খ্রীস্টান করবে, তার পরে শেখাবে বিদ্রোহ করে দেশের একটি খণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে। ধর্ম্ম ও রাজনীতি ওদের কাছে একে অপরের সোপান। এই কায়দাটার কথা জাপানীরা গোড়ায় জানত না। পরে কেমন করে জানতে পারে। বৌদ্ধরাও রাজনীতির খেলায় মন্দ খেলোয়াড় ছিল না। আর-কেউ তাদের খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চাইলে তাদেরই বা সেটা সইবে কেন? পর্তুগিজরা উড়ে এসে জুড়ে বসতে না বসতে আবার উড়তে বাধ্য হলো। মাঝখান থেকে কাটা পড়ল কয়েক হাজার জাপানী খ্রীস্টান। এর পরে জাপানীরা পাশ্চাত্যদের কাউকেই ঢুকতে দিল না, ইতিমধ্যে আর যারা ঢুকেছিল তাদের একে একে তাড়াল। থাকতে দিল শুধু ওলন্দাজদের। তাও দেশের এক কোণে নাগাসাকিতে।

জাপানকে ঠিকমতো চিনতে হলে চীন ও কোরিয়া দেখা উচিত তার আগে। তার পরে দেখতে হয় নারা ও কিয়োতো, তার পরে ওসাকা ও তোকিয়ো। অতীত থেকে বর্তমানে আসতে হলে পশ্চিমদিক থেকে পুবদিকে আসাই সঙ্গত। তা না করে আমরা চলেছি পুবদিক থেকে পশ্চিমদিকে। তোকিয়ো থেকে কিয়োতোয়। বর্তমান থেকে অতীতে। কিয়োতো থেকে যাব নারায়। আরো অতীতে। এমন করে ইতিহাস পড়া হয় না। কিন্তু একদা আমার নিজের একটা থিয়োরি ছিল যে এমনি করেই ইতিহাস পড়া উচিত, গল্প বলা উচিত। তার পরীক্ষা করেছিও।

কিয়োতো। কিয়োতো। শুনিয়ে দিয়ে গেল রেলের লোক। জাপানের একটি উত্তম প্রথা। যে স্টেশনে গাড়ি থামবে সে স্টেশনে তো নামঘোষণা করবেই, আগে থেকেও নামজপ করবে, 'পথে পড়বে অমুক অমুক স্টেশন।' তা ছাড়া প্রত্যেক স্টেশনের গায়ে সেই স্টেশনের নাম যেমন লেখা থাকে তেমনি লেখা থাকে একটি ফলকের গায়ে সেই স্টেশনের আগের স্টেশন ও পরের স্টেশনের নাম। ধরুন, বোলপুর স্টেশনের ফলকে বোলপুরের একদিকে থাকবে কোপাই, অন্যদিকে ভেদিয়া। যাতে দিগভ্রম না হয়।

কিয়োতো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দারুণ ভিড়। জনতাকে আরো জনাকীর্ণ করেছিল আমাদের স্বাগতকারী দল। যথারীতি পতাকা ছিল, ক্যামেরা ছিল, মালা ছিল। কোনো রকমে পাশ কাটিয়ে বেরোতে গিয়ে দেখি আমাকে খুঁজছে শান্তিনিকেতনের বিবলি, যার ভালো নাম সন্দীপ ঠাকুর।

বেঘোরে বেহারে বাঙালীর মুখ দেখতে পেয়ে আমি তো বর্তে গেলুম। ওর সঙ্গে ছিল ওর এক বন্ধু। জাপানী।

মিয়াকো হোটেলে পেন কংগ্রেসের বাস থামল। আমার ঘরের চাবি নিয়ে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল হোটেলের বয়। যেমন ঢাউস চাবি তার চেয়ে ঢাউস তার সঙ্গের কাঠ। ঘর খুলে দিতে দেখি আমার সুটকেস আগেই গৃহপ্রবেশ করেছে। ওই যেটিকে তোকিয়োতে হস্তান্তর করে অবধি মনে মনে শঙ্কিত ছিলুম। এমন তো হতে পারত যে আমি পৌঁছলুম একদিন আগে আর আমার সুটকেস একদিন পরে। তা হলে কী বিপদেই না পড়তুম! অন্য হোটেলে চালান যেতেও তো পারত।

পেন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের এক হোটেলে রাখা এখানেও সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া আমাদের অনেকে আবার চেয়েছিলেন জাপানী সরাইতে উঠতে। জাপানী সরাই সম্বন্ধে লোভ ছিল আমারও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও ছিল যে স্নানের টাবের একই গরম জলে একসঙ্গে গা ডোবাতে হবে চেনা-অচেনা অনেকের সঙ্গে। কিংবা একে একে নামতে হবে জল না পালটিয়ে। আগেকার দিনে তো স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ছিল না। শুনেছি এখনো নেই গ্রাম অঞ্চলে। নেই শুনেছি আতামি প্রভৃতি শৌখীন এলাকাতেও। সেখানে নাকি স্নানের সাথী হয় গেইশারা।

সোফিয়াদিকে কিন্তু তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বে এক জাপানী সরাইতে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। এ বিভ্রাটের জন্যে যিনিই দায়ী হোন না কেন হোটেল-সরাই পরিবর্তনের পক্ষে বড় বেশী বিলম্ব হয়ে গেছে। তিনি তো চোখে আঁধার দেখলেন। স্নান বন্ধ করে দিলে বাঁচবেন না, আবার প্রাণ গেলেও অমনভাবে স্নান করবেন না। জাপানী সরাই সম্বন্ধে জাপানীদের যা গর্ব স্নানাগারের প্রসঙ্গ তুললে ওরা অত্যন্ত অপমান বোধ করবে। তাই বলতে হলো তিনি নিরামিষাশী মানুষ, খান পাশ্চাত্য রীতির রান্না। তাতে ফল হলো। তাঁকে জাপানী সরাইতে যেতে হলো না। মিয়াকো হোটেলে তাঁরও ঠাঁই হলো। নইলে তোকিয়োর মতো কিয়োতোয় আমার ঘুমভাঙানী দিদি হবে কে?

গত শতাব্দীর বনেদী হোটেল। এর বিশেষত্ব এর পাহাড়ে উদ্যান। ইচ্ছা করলে এখানে জাপানী ধরনে সাজানো ঘরও পাওয়া যায়। আমরা চাইনি। আমাদের ঘরগুলো পশ্চিমী ধরনে সাজানো। আমারটাতে আমি একা। পাশের বিছানা খালি। দেয়ালজোড়া কাচের জানালা দিয়ে দূর দিগন্তের পর্বত দেখা যায়। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে। ছবির মতো প্রসারিত শহর আমার দৃষ্টির তলে। ঘরে বসেই নগরদর্শন। এমনটি তোকিয়োতে ঘটেনি। আমি তো ঘর থেকে নড়তে চাইনে। বিবলি এসে পড়ল। তার সঙ্গে তার জাপানী বন্ধু। নিচে এসে বসে আছেন কাসুগাই মহাশয়ের বন্ধু তোদো মহাশয় ও তোরিগোএ মহাশয়। এবং আরো কেউ কেউ।

একটি কাগজের জন্যে কবিতা লিখে দিতে হবে, আর একটি কাগজের জন্যে প্রবন্ধ। এ-সব একদিন অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু ইণ্টারভিউটা আজ এখনি হওয়া চাই। লোক জানতে চায় জাপান আমার কেমন লাগছে, মিশ্র সন্তানদের সম্বন্ধে আমার মত কী, এমনি কত রকম প্রশ্ন। এতদিনে আমার দুরস্ত হয়ে এসেছিল কী বলতে হয়, কতখানি বলতে হয়।

চারটের সময় পৌঁছেছি। ছ'টার সময় বেরোতে হবে। উরাসেন্‌কে প্রতিষ্ঠানে 'চা-নো-য়ু'। চা অনুষ্ঠান। নিমন্ত্রণ করছেন গ্র্যাণ্ড মাস্টার। আমাদের সবাইকে। হোটেলে বন্ধুদের নিয়ে ঘরোয়া একটু চা পান করা গেল। তারপর তাঁদের বিদায় দিয়ে সদলবলে বাসে উঠে বসলুম। বাস চলল কন্নিচিয়ান। সেনবংশের বাড়ি। সেনবংশ? ওমা, জাপানেও সেন! চীনেও সেন, কোরিয়াতেও সেন, নরওয়েতে ডেনমার্কেও সেন। ওর মতো আন্তর্জাতিক পদবী আর একটিও নেই। সেনদের প্রতি আমার পক্ষপাতের কারণ আমার পিতামহী সেনদুহিতা। তাই গ্র্যাণ্ড মাস্টার সোশিৎসু সেনকে দেখে পর মনে হলো না। এঁর পূর্বপুরুষ সেন-রিকিয়ু ষোড়শ শতাব্দীতে জাপানের চা-পানের নীতি ও পদ্ধতি বেঁধে দেন। পরে শেখাতে গিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। একটি উরাসেন্‌কে। সেনবংশের গুরুগিরি

চোদ্দ পুরুষ ধরে চ'লে এসেছে। উরাসেন্‌কের শাখাপল্লব এখন আমেরিকাতেও ছড়িয়েছে।

এখানে বলে রাখি যে আমাদের যেমন নাম আগে পদবী তার পরে জাপানীদের তেমন নয়। বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেনকে ওরা হলে বলত সেন বল্লাল, সেন লক্ষ্মণ। এতক্ষণ যে বলে এলুম য়াসুনারি কাওয়াবাতা ওটা জাপানী পদ্ধতি নয়। ওরা হলে বলত কাওয়াবাতা য়াসুনারি, তানিজাকি জুন্‌ইচিরো, মুশাকোজি বা মুশানোকোজি সানেআৎসু। তেমনি সেন রিকিয়ুর চতুর্দশতম উত্তরপুরুষ সেন সোরিৎসু। আমাদের সেন মহাশয়।

॥ নয় ॥

সেদিন কিয়োতোর ভিতর দিয়ে কন্নিচিয়ান যেতে যেতে আমরা হৃদয় হারালুম। সেই যে জার্মানদের একটা গান আছে, 'হাইডেলবার্গে হৃদয় হারিয়েছি।' তেমনি আমাদেরও অন্তর গান গেয়ে উঠতে চায়, 'কিয়োতোয় হৃদয় হারিয়েছি।'

কিন্তু নাগরীর কাছে নয়, নগরীর কাছে। নগরী নিজেই যেন নাগরী। কী তার রূপ আর কুহক! সাধে কি তার দ্বারে পাঁচ হাজার শিল্পী ধর্না দিয়ে পড়ে আছে বলে শুনি। শিল্পে আর সৌন্দর্যে সে মুনিরও মন ভোলায়। তা হলে আমাদের দোষ কী, যদি বলে থাকি, 'তোকিয়োতে না করে কিয়োতোয় পেন কংগ্রেস আহ্বান করলেই হতো! কী আছে তোকিয়োতে! কিয়োতোর কাছে তোকিয়ো!'

দেখা গেল মানুষ কত সহজে নিমকহারাম হয়। তোকিয়োর অত যে লাঞ্চন আর ডিনার আর ব্যাঙ্কেট সব একবেলার মধ্যে ভুলে গেল। কিসের জন্যে? না সৌন্দর্যের জন্যে। শিল্পের জন্যে। আপ্যায়নে মানুষকে বশ করা যায় না। সে অমৃতের পুত্র। অমৃতের জন্যে তৃষিত। কিয়োতোয় কংগ্রেস ডাকলে অত আপ্যায়নের আবশ্যক হতো না।

আমার তবু সান্ত্বনা ছিল যে পেন কংগ্রেস ভাঙবার পরেও আমি কিয়োতোয় থেকে যাচ্ছি আরো দিন কয়েক। কিন্তু শনিবার বিকেলে এসে রবিবারটা কিয়োতোয় কাটিয়ে সোমবার সারা দিন নারা বেড়িয়ে রাতের ট্রেনে যাঁরা তোকিয়ো ফিরে যাচ্ছেন ও মঙ্গলবার আকাশে উড়ছেন কী তাঁদের সান্ত্বনা! একটা কি দুটো দিন কিয়োতোর পক্ষে কিছুই নয়। এই নগরী বা নাগরী অত অল্প পরিচয়ে অবগুণ্ঠন খোলে না। হায়, হায়! কেন আমরা আরো আগে কিয়োতো আসিনি! তোকিয়ো? তোকিয়ো আমাদের সময় হরণ করেছে। আর কিয়োতো করেছে মনোহরণ।

কন্নিচিয়ান পৌঁছতে না পৌঁছতে বর্ষণ শুরু। একেবারে মুষলধারে বর্ষণ। বাস থেকে নামতে দেবে না। নেমে বেশ কিছু দূর হেঁটে যেতে হয়। যেন পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটা। সেনমহাশয়েরা একদল ছাতাবরদার পাঠিয়ে দিলেন। জাপানী ছত্র। চললুম ছত্রপতি শিবাজীর মতো ছত্রধারী সমভিব্যাহারে। উপবনপথ দিয়ে যেতে হয়। যেতে যেতে সংসারের চিন্তা পিছনে রেখে মনটাকে শান্ত করে নিতে হয়। সম্মুখে শান্তিপারাবার। চা-পানগৃহ যেন তার মাঝখানে একটি দ্বীপ। সেখানে এপারের ময়লার প্রবেশ নেই। জাপানের চা-পানতন্ত্রের মূলকথা হলো বহির্জগতের থেকে বিচ্ছিন্নতা। চা-শিৎসু বা চা-পানগৃহ যেন একটি নিভৃত উপাসনাস্থলী।

সত্যিকার একটি চা-অনুষ্ঠান চার ঘণ্টা ধরে চলে। তার এতরকম কায়দাকানুন যে জাপানের

চা-অনুষ্ঠানের চেয়ে ভারতের বিবাহ-অনুষ্ঠান বরং সোজা। আদিতে এটা ছিল ধ্যানী বা জেন (Zen) বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাধুদের নিঃশব্দ একাগ্রতার সহায়। একটি হাতলহীন পেয়ালায় সুরভিত সবুজ চায়ের মিহি গুঁড়োর উপর গরম জল ঢেলে নেড়েচেড়ে একই পেয়ালা থেকে একে একে পাঁচজনে চুমুক দেওয়া। জেন সাধুরা সেইভাবে নিজেদের মধ্যে একটা সাযুজ্য বা কমিউনিয়ন বোধ করতেন। তাঁরা ছিলেন সৌন্দর্যপ্রিয়, ধর্মের সঙ্গে নন্দনতত্ত্ব মেশাতে জানতেন। সরঞ্জামগুলি স্বল্প হলেও সুন্দর হবে, সরল হবে। সেবার পদ্ধতি হবে আর্টের মাপকাঠিতে মাপা। আবার আর্ট হবে প্রকৃতির সঙ্গে সুসমঞ্জস। ফুল থাকবে, ছবি থাকবে, তা রাখার জন্যে তোকোনোমা থাকবে। শিল্পের পিছনে থাকবে জীবনশিল্প। জীবনের একটি বিশেষ আদর্শ ও ধারা।

পরে এই অনুষ্ঠান মন্দিরের বাইরে এসে অন্য আকার নেয়। হিদেয়োশি প্রভৃতি সেনাপতি বা শাসকরা হন এর পক্ষপাতী। এঁরা সংসারী লোক। চার ঘণ্টা যদি সংসার ভুলে থাকতে পারেন তা হলে আত্মা শান্ত হয়। তারপর আবার নতুন উৎসাহে শাসনকার্য বা যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। এই সূত্রে একটা সাযুজ্য ঘটে বন্ধুবান্ধব বা অনুগতদের সঙ্গে। হিদেয়োশি নিম্নস্তরের লোকদেরও ডেকে এনে সঙ্গে বসাতেন। জননায়কের পক্ষে সেটা নেতৃত্বের অঙ্গ ও সিদ্ধির শর্ত। চা-অনুষ্ঠান ক্রমে সমাজের উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কেতা হয়ে দাঁড়ায়। মহিলাদের চা-কেতাদুরস্ত হতে হয় বিয়ের আগে থেকেই। তখন এটা হয়ে যায় এটিকেটের শামিল। সঙ্গে সঙ্গে স্টাইলাইজড হয় আমাদের দক্ষিণী নৃত্যকলার মতো। তবে ধর্ম আর শিল্প থেকে দূরে সরে যায় না। মধ্যযুগে সেটা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু জেন সাধুদের কাছে যা ছিল দারিদ্র্যের মহিমাদ্যোতক তাই হয়ে দাঁড়াল দরিদ্রের সাধ্যাতীত।

একালে চা-অনুষ্ঠান সমাজের মধ্যস্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে, কিন্তু অত সময় কে দেবে, আর সংসারকে ভুলে যাওয়া কি এত সহজ! এখন এটি একটি রক্ষণযোগ্য সুন্দর প্রাচীন প্রথা। জাপানের বিশেষত্ব। আর মেয়েদের পক্ষে একটি উপাদেয় শিক্ষা। সম্ভ্রান্ত পরিবারে তো নিশ্চয়ই। যারা সম্ভ্রান্ত বলে গণ্য হতে চায় তাদের পরিবারেও। উরাসেন্‌কে একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। এর আস্তানা কন্নিচিয়ান এখন মস্ত বাড়ি, যদিও গোড়ায় ছিল একটি ছোট্ট কুটির। কন্নিচিয়ান কথাটির অর্থ 'অদ্য কুটির।' সেনবাড়ির প্রতিনিধিরা আমাদের অভ্যর্থনা করে সোজা নিয়ে তুললেন দুটি কি তিনটি বড় বড় ঘরে। জাপানী ধরনে তাতামি মাদুর দিয়ে মোড়া তার মেজে। ঘরের আকার অনুসারে মাদুরের সংখ্যা কম বেশী। আবার মাদুরের সংখ্যা অনুসারে ঘরের বর্ণনা। ছ'মাদুরি, আট মাদুরি, বারো মাদুরি। এ ছাড়া একেকটি ঘরের একেকটি নাম। কোনো একখানি ঘরে আমাদের সকলের ধরে না বলে বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন দলের স্বতন্ত্র চা-অনুষ্ঠান হলো। পাঁচজনকে নিয়ে সত্যিকার অনুষ্ঠান। পাঁচজনের জায়গায় আমাদের ঘরে আমরা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন। মানুষ বেশী, সময় কম, চার ঘণ্টার পাঠ আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টায় সারতে হবে।

আমরা বসেছি মাদুরের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে দেয়াল ঘেঁষে তিন দিকে। এক দিকের এক প্রান্তে জ্বলন্ত উনুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছেন কিমোনো পরা অনুষ্ঠানকর্তা সেনবংশের এক যুবক। তাঁর আশেপাশে বিবিধ সরঞ্জাম। জলের পাত্র থেকে হাতায় করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে তিনি উনুনের উপর চাপানো কেটলিতে ঢালছেন, তার থেকে গরম জল নিয়ে ঢালছেন গুঁড়ো চায়ের পাত্রে। ঢালার আগে চায়ের ভাঁড় থেকে চা তুলে নিয়েছেন বাঁশের চামচে দিয়ে, নিয়ে চায়ের পেয়ালায় রেখেছেন। ঢালার পর বাঁশের একটা বুরুশের মতো জিনিস দিয়ে চা ঘুঁটছেন। চায়ে জলে মিশে গাঢ় হচ্ছে। গৃহস্থের বাড়ির চা পাতলা হয়। অনুষ্ঠানের চা গাঢ় হয়। ঐ একই পেয়ালা পাঁচজনের ভোগে লাগার কথা। কিন্তু আমরা বিদেশী মানুষ, আমাদের রীতি আলাদা, তাই

আমাদের জন্যে একটির পর একটি পেয়ালায় চা তৈরি হচ্ছে। হয়ে বাইরে চালান যাচ্ছে। বাইরে থেকে আসছে একেকটি মেয়ের হাতে একেকটি পেয়ালা। বাড়ির মেয়ে বা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী। চিত্রল কিমোনো পরা।

সমস্ত ব্যাপারটা স্টাইলাইজড। অনুষ্ঠানকর্তার প্রত্যেকটি ক্রিয়া একান্ত ধীরে ও সন্তর্পণে সম্পন্ন হচ্ছে এমন একটি ঢঙে যাকে নিন্দুকরা বলবে ওস্তাদী। কিন্তু এই হলো ওঁদের ঘরানা ঢং। শুদ্ধভাবে একেকটি কর্ম সম্পাদন করছেন আর একবার করে আমাদের দিকে সহাস্যে তাকাচ্ছেন। যেন বলতে চান, 'কেমন? দেখলেন তো? এই হলো পানপাত্রে বারিনিক্ষেপণং। যথাশাস্ত্র করেছি কি না বলুন।' বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য অনুসারে এ যেন একটা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর ওই যে একেকটি মেয়ে আসছে দিচ্ছে আর যাচ্ছে ওদের আসা দেওয়া চলে যাওয়াও স্টাইলাইজড। মনে করুন আপনি একজন দেবতা। আপনাকে দেওয়া হচ্ছে চা নয় নৈবেদ্য। যে মেয়েটি এলো সে আপনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কোমর থেকে মাথা নত করে প্রণাম করল। তার পর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার পর আবার নত হয়ে নৈবেদ্য স্থাপন করল। তার পর আবার মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল। তার পর আবার নত হয়ে প্রণাম করল। তার পর ধীরে ধীরে উঠে পিছু হটে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার এসে তথাবিধি নিবেদন করে গেল মিষ্টান্ন। আপনার খাওয়া সারা হলে আবার এসে তেমনি প্রণামাদি করে নিয়ে গেল শূন্য পাত্র। আপনি তারিফ করতে করতে চা সেবা করলেন, মিষ্টান্ন সেবা করলেন।

এর পর ষাট মাদুরি ঘরে নৈশভোজন। জলচৌকির মতো নিচু টেবিলের দু'ধারে নানা দেশের শ'দুই লেখকলেখিকা পঙ্ক্তি ভোজনে বসেছেন। ঘুরে ফিরে তদারক করছেন স্বয়ং সেন মহাশয়। পরিবেশনের ভার নিয়েছে বাড়ির মেয়েরা বা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা। পুরুষরাও। প্রত্যেকের সম্মুখে রাখা হলো এক-একটি থালী। গোল না চৌকোণা মনে পড়ছে না। ধাতুনির্মিত নয়, যত দূর মনে পড়ে ল্যাকারের তৈরি। তার কানা বেশ উঁচু। তাতে ছিল রকমারি খাবার। আমিষ ও নিরামিষ দুই। জাপানী পদ্ধতির ভোজ। যথারীতি চপ স্টিক ছিল তার সঙ্গে। তা দিয়ে তুলে নিয়ে মুখে দিতে হয়।

আমার পিছন দিকে ছিল খোলা জানালা। তাকে ইচ্ছামতো সরানো যায়। কখন এক সময় দেখি প্রবল বৃষ্টির ছাঁটে পিঠ আমার ভিজে যাচ্ছে। দারুণ হাওয়া। এই কি সেই টাইফুন? এলো এতদিন পরে? কাঁপিয়ে দিচ্ছিল বাড়িটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে। উঠে বন্ধ করে দিলুম জানালাটা। দেখি হাত গুটিয়ে বসে আছেন একা জম্বুনাথন। ওদিকে অন্যদের অর্ধেক খাওয়া সারা। কী ব্যাপার! তিনি যে নিরামিষাশী। তাঁর মুখে দেবার মতো কী আছে বুঝতে পারলে তো মুখে দেবেন! এক কোণে ভাত ছিল। জাপানী মতে প্যাকেটে মোড়া। 'নির্ভয়ে খান। ভাত খেতে আপত্তি কিসের?' পরামর্শ দিলুম বৃদ্ধ তামিল ব্রাহ্মণকে। বেচারা অনশন ভঙ্গ করলেন। পরে যখন নিজের মুখে তুলি তখন আমার রসনা যেন আমিষের আস্বাদ পেলো। হুঁ হুঁ! আপনাদের বলব না ভাতের সঙ্গে কী মেশানো ছিল। বলতে পারলে তো বলব। আমার যত দূর মালুম হলো ওটা কাঁচা মাছের কুচি নয় সিদ্ধ মাংসের কীমা। অধ্যাপক কাসুগাই কিন্তু বিশ্বাস করবেন না যে চা অনুষ্ঠান-শেষে আমিষ ভোজ কখনো সম্ভবপর। তাঁর মতে ওটা সোয়াবীনেরই রকমফের। আশা করা যাক জম্বুনাথন সেদিন নিরামিষ তণ্ডুল ভক্ষণ করেছেন। তবে তিনি বা আমি কেউ 'বীয়ারু' কিংবা 'সাকে' পান করিনি। কমলালেবুর রস আনিয়ে পিপাসা মিটিয়েছি।

ভোজনের পর সেন মহাশয় আমাদের কত রকম উপহার দিলেন। দক্ষিণা বলা যেতে পারে। তাঁকে সপরিবারে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে করমর্দন করলুম। বললুম, 'আপনারা সেন। আমার দেশেও সেন আছেন। আনন্দ হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে মিলে।' সেনের বয়স হলো ষাটের উপর। পরিধানে

কিমোনো। বেশ লাগে তাঁকে, তাঁর গৃহিণীকে, তাঁর বড় ছেলে সোকোকে। ঘুরেফিরে শিল্পসংগ্রহ দেখলুম। আকাশের সুমতি না হলে তো বাসে উঠতে পারিনে! একটু যেন ধরল বৃষ্টিটা। তখন আমরা আবার সাবধানে পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে জুতো বাঁচিয়ে বাসে গিয়ে উঠলুম। ওহো, বলতে ভুলে গেছি যে জাপানীদের ঘরে ঢুকতে হলে জুতো খুলে কাপড়ের চটি পায়ে দিতে হয়। ওঁরাই যোগান।

বাসে দু'জন দু'জন করে বসে। আমার পাশের আসন খালি ছিল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'বসতে পারি?' রাঙা কিমোনো-পরা জাপানী মহিলা। বয়স কত হবে? মেয়েদের বয়স অনুমান করা অভদ্রতা। বলা যেতে পারে তরুণী নন, মধ্যবয়সীও নন, হতে দেরি আছে। পরিষ্কার ইংরেজী বলেন। উচ্চশিক্ষিতা নিশ্চয়। জাপানী মহিলাদের অঙ্গে পাশ্চাত্য পোশাক এত বেশী দেখেছি যে চোখ জুড়িয়ে গেল এঁর সুন্দর কিমোনো দেখে। আবহাওয়ার উপর বলার যা ছিল তা যখন ফুরিয়ে এলো তখন শুনিয়ে দিলুম কিমোনোর প্রশংসা। ভদ্রমহিলা খুশি হয়ে বললেন, 'কিমোনো পরতেই আমি ভালোবাসি, কিন্তু কখন পরি, বলুন? রোজ আপিসে যেতে হয় যে!'

তোকিয়োর কোনো এক ব্যাঙ্কে কাজ করেন। পেন কংগ্রেসের সঙ্গে কিয়োতো এসে শনিবারটা কাটালেন। কাল রবিবার বিকেলে ওসাকা যাচ্ছেন। সেইখানেই বাড়ি। সোমবারের দিনটা ছুটি নিয়েছেন। আমি যেদিন ওসাকা যাব সেদিন তিনি সেখানে থাকবেন না বলে দুঃখিত। তোকিয়ো ফিরে গিয়ে আমি যেন তাঁদের মহিলাসমিতির সভায় যাই। নিমন্ত্রণ রইল। ডায়েরি খুলে দেখলুম যে পরের রবিবার আমার তোকিয়ো ফেরা সম্ভব হবে না। ভদ্রমহিলা দুঃখিত হলেন। বললেন, 'তা হলে আজকেই আপনার হোটেলে আসব, যদি বলেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে ইচ্ছা। মেয়েদের পত্রিকায় লিখি কিনা।'

মেয়েদের পত্রিকা আমাদের দেশে ক'খানাই বা আছে! জাপানে এন্তার। মজা এই যে পত্রিকা যদিও মেয়েদের জন্যে সম্পাদক হয়তো অ-মেয়ে। জাপানের অনেক লেখক মেয়েদের লেখক। আমার প্রতিবেশিনী জাত-মেয়ে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম তিনি কী লেখেন। 'কী লিখি?' তিনি সরলভাবে বললেন, 'মেয়েদের যতরকম প্রশ্ন তার উত্তর দিই। এইজন্যেই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করা এত বেশী দরকার। হদ্দ হয়ে গেলুম ওদের প্রশ্ন শুনতে শুনতে।'

'কী রকম প্রশ্ন?' জেরা করলেন ভূতপূর্ব বিচারপতি। পূর্বজন্মের জাতিস্মর।

ভদ্রমহিলা এর উত্তরে বললেন, 'আমি ওদের হাজার বার বোঝাই, ফিফটি ফিফটি। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ক ফিফটি ফিফটি। কেমন? ঠিক কি না?'

তখনো আমি অন্ধকারে। ভাবছি ফেমিনিজমের কথা হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে নরনারীর সমান অধিকার। তা নয়। এর তাৎপর্য অন্যরকম। ধরুন, দুটি মানুষ রেস্টোরান্টে একসঙ্গে খাচ্ছে। বিল মিটিয়ে দেবার সময় ফিফটি ফিফটি। আধাআধি। সমান সমান। কেউ কারো কাছে ঋণী নয়, কেনা নয়। নইলে আত্মমর্যাদা থাকে না।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মেয়েদের কি আত্মমর্যাদা নেই? কেন তা হলে ওরা নিজেদের অমন করে খেলো করতে যায়?'

আমি ভালো করে না বুঝেই সায় দিয়ে চললুম। ওদিকে বাসও চলতে থাকল হোটেলের পথে। ভদ্রমহিলা উঠেছিলেন আর একটু দূরে জাপানী সরাইতে না কোথায়।

'আমাদের দেশে ত্রিশ লক্ষ বিবাহযোগ্যা কুমারী অতিরিক্ত। যাদের সঙ্গে বিয়ে হতো তারা মহাযুদ্ধে নিহত।' করুণকণ্ঠে বলে চললেন প্রতিবেশিনী। 'এর ফলে জাপানের ঘোরতর নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। না, নীতি বলতে বিশেষ কিছু বাকী নেই। দেয়ার ইজ নো মরালিটি।'

আমি এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। বললুম, 'আমাদের দেশে মেয়েরা অতিরিক্ত নয়। মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কম। সেইজন্যে এ সমস্যা ভারতে নেই।'

'সেই ভালো। সেই সবচেয়ে ভালো। মেয়েদের সংখ্যা কমতির দিকে থাকলেই মঙ্গল। তা হলে তো সব সমস্যাই মিটে যায়।' ভদ্রমহিলা যেন মুশকিল-আসান পেয়ে গেলেন। 'সেইজন্যেই তো আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছা। তবে আজ বোধ হয় হয়ে উঠবে না। কাল সকালে হবে।'

আমি কিন্তু কথা দিতে পারছিলুম না। যদিও আমারও ইচ্ছা ছিল আলাপের। এর পর ভদ্রমহিলা আর একটু ভেঙে বললেন, 'ঐ একমাত্র টেস্ট। নীতির আর কোন টেস্ট নেই। বিশ্বস্ততা। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের। পুরুষের প্রতি স্ত্রীর।'

এতক্ষণে বোঝা গেল ফিফটি ফিফটির মর্ম কী। বললুম, 'আপনি তা হলে মেয়েদের এই উপদেশ দিচ্ছেন। শুনছে কেউ আপনার উপদেশ?'

'শুনছে কোথায়! ভদ্রমহিলা আর্তকণ্ঠে বললেন, 'কেউ শুনছে না। না শুনুক, আমি আমার কর্তব্য করে যাচ্ছি।'

জাপানে বহুবিবাহের চল নেই। মেয়েরা সব সহ্য করবে, কিন্তু সতীন সহ্য করবে না, তার চেয়ে আত্মহত্যা করবে। তা হলে ঐ ত্রিশ লাখ অতিরিক্ত অনূঢ়াকে বলতে হয় আজীবন ব্রহ্মচারিণী হতে। তাই বলছেন আমার প্রতিবেশিনী। কিন্তু ভবী ভুলছে না।

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না। ভাবনায় পড়েছিলুম। ভদ্রমহিলা কিন্তু একালের মেয়েদের উপর লেখনীহস্ত হয়ে রয়েছিলেন। তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে তিনি আইন করে নীতি সংস্থাপন করতেন। বললেন, 'জাপানের আইন কোন্‌খানে কড়া, জানেন? যেখানে দু'পক্ষই পুরুষ। কিংবা দু'পক্ষই নারী।'

এমনি করে আমার নীতিশিক্ষা আইনশিক্ষা হলো। বাকী ছিল ডাক্তারিশিক্ষা। ভদ্রমহিলা বললেন, 'প্লাস্টিক সার্জারিতে দেশটা ছেয়ে গেছে। মেয়েদের নাক কি তাদের জন্মগত? মুখ কি তাদের প্রকৃতির হাতে গড়া? অস্ত্রোপচার করে মুখের চেহারাটাই বদলে দেয়। আপনাদের দেশেও কি এসব হয়?'

না। ফেস লিফটিং এখনো আমাদের দেশে চলতি হয়নি। তাই কথাটা আমার কাছে ভারী নতুন লাগল। ছোট ছেলের কাছে নতুন একটা খেলা যেমন লাগে। এর পরে জাপানে যে ক'দিন ছিলুম টিকল নাক দেখলেই মনে মনে বলতুম, 'বুঝেছি, প্ল্যাস্টিক সার্জারি।' মুখের চেহারা আর্য ধাঁচের হলেই আমার মুখে মুচকি হাসি ফুটত। 'ফেস লিফটিং জানিনে? বুদ্ধের দেশ থেকে এসেছি বলে কি আমি একেবারেই বুদ্ধু!' আসলে জাপানীরা মিশ্র জাতি। ওদের মধ্যে এমনিতে যথেষ্ট আকৃতিগত বৈচিত্র্য। তার জন্যে অস্ত্রোপচার অনাবশ্যক। প্রাচীন ছবিতেও চোখ নাক আর্যের মতো দেখা যায়।

আমার প্রতিবেশিনীর উক্তিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেদিন 'সায়োনারা' বলে নেমে গেলুম আমি আমার হোটেলে। 'সায়োনারা' বলে সেই বাসে চললেন প্রতিবেশিনী।

পরের দিন উঠে দেখি প্রখর সূর্যালোক। কোথায় টাইফুন! প্রাতরাশের পর আবার আমরা উঠে বসলুম বাসে। এবার যাচ্ছি তেনরিয়ুজি। জেন বৌদ্ধ মন্দির। যেতে যেতে মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকলুম নগরীকে। সৌন্দর্য এর ঐশ্বর্য। সৌন্দর্যের পরিচয় সর্বাঙ্গে। হেইআন-কিয়ো ছিল এর আদি নাম। অষ্টম শতাব্দীর শেষপ্রান্তে পত্তন। একটি বৃহৎ চতুষ্কোণকে সমান্তরাল সরল রেখা দিয়ে কাটাকুটি করে আশিটির উপর ছোট বড় মাঝারি চতুষ্কোণ বানালে যেমন দেখায় হেইআন-কিয়োর

মানচিত্র ছিল তেমনি দেখতে। পরে প্রচুর ভাগবিভাগ ও সংযোজন ঘটেছে। তা হলেও আদি পরিকল্পনা সুবক্ষিত। কিয়োতোর রাস্তা বাঁকাচোরা নয়। সরু সরু নয়। সোজা আর চওড়া। আদি থেকে আধুনিক। তাতে প্রাচীন পদ্ধতির বাড়িই বেশী। কিন্তু গাড়ি বেবাক মডার্ন। আর পাশ্চাত্য পোশাক থেকে নাগরিক তো নয়ই, গ্রাম্য নরনারীও মুক্ত নয়। তেনরিয়ুজি যেতে শহর হয়ে গেল গ্রাম। যদিও শহরের শামিল।

বারো লাখ লোকের দানাপানির জন্যে মিল ফ্যাক্টরিও জুটেছে। চীনামাটি, ল্যাকার, রেশম ও সূচীশিল্পের জন্যে কিয়োতোর খ্যাতি আছে। তোকিয়ো, ওসাকা, নাগোইয়ার পর কিয়োতোর বাণিজ্য। সেদিক থেকে সে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। কিন্তু যেদিক থেকে সে প্রথম সেটা চতুর্বর্গের দ্বিতীয় বর্গ নয়, বাকী তিনটি। দেড় হাজার বৌদ্ধমন্দির কি পৃথিবীর আর কোথাও আছে? তাদের মধ্যে তিরিশটি হচ্ছে তিরিশটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদর। তার পর শিন্তোদেরও দু'শটির উপর পীঠস্থান। এই যেমন গেল ধর্মের জয়জয়কার তেমনি কামেরও কামরূপ গিয়ন। জাপানের গেইশাকেন্দ্র। ছ' ছ'টি থিয়েটার আছে, তাদের বলা হয় কাবুরেন্‌জো বা গেইশা রঙ্গালয়। আর মোক্ষ? শিল্পীর মোক্ষ শিল্পে। শিল্প যারা ভালোবাসে তাদেরও। সকলের মোক্ষ সৌন্দর্যে। সৌন্দর্যসাধনায় কিয়োতো চিরদিন অনলস ও অগ্রগণ্য। মন্দিরে পীঠস্থানে বিপণিতে বাসগৃহে উদ্যানে উপবনে সর্বত্র তার প্রকাশ।

ক্রমে ক্রমে এলো তেনরিয়ুজি। নব্বুই একর জমি জুড়ে সুরম্য উদ্যান। মাঝখানে মন্দির, সরোবর, কমলবন। চতুর্দশ শতাব্দীর কীর্তি। মহাসেনাপতি আসিকাগা তাকাউজি এর প্রতিষ্ঠাতা। জেন সম্প্রদায়ের সাধু সোসেকির জন্যে এর প্রতিষ্ঠা। মহাসেনাপতিরা ছিলেন জেন বৌদ্ধ ধর্মে নিষ্ঠাবান। তাঁরাই দেশের প্রকৃত শাসক। তাই জাপানের শাসনব্যাপারের উপর জেন সাধুদের পরোক্ষ প্রভাব ছিল। যে পাঁচটি জেন মন্দিরের সাধুরা কিয়োতোর এই সব শোগুনদের রাজনৈতিক পরামর্শ দিতেন তেনরিয়ুজি সেই পাঁচটির একটি। বৃহৎ পঞ্চকের একতম। সেকালের রাজনৈতিক গুরুত্ব একালে নেই। তবু মহিমা আছে। কিয়োতোর গবর্নর তোরাজো নিনাগাওয়া, মেয়র গিজো তাকায়ামা ও চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি তানেইচিরো নাকানো মিলিত হয়ে ওইখানে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করেছেন।

পৌঁছতেই আমাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন মন্দিরের সাধুরা। জুতো খুলে নিয়ে কাপড়ের চটি পরিয়ে দিতে হাত বাড়ালেন। সব কাজে হাত লাগানোই তাঁদের নীতি। কায়িক শ্রমকে তাঁরা পারমার্থিক মর্যাদা দেন। মেথরের কাজও তাঁদের কাছে শুচি। কোনো মানুষকেই তাঁরা তাঁদের চেয়ে খাটো মনে করেন না। তা বলে একজন সাধু হাঁটু গেড়ে বসে আমার জুতোর ফিতে খুলবেন এ আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব কী করে? সাধুজী জুতো খোলার পুণ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। তখন তাঁর পুণ্যসঞ্চয়ের উপায় হলো জুতো তুলে নিয়ে গিয়ে একত্র রাখা। আমাকে দিলেন একটা চাকতি; আমার জুতোর নম্বর।

তার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো অভ্যন্তরে। একটার পর একটা চত্বর আর প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে যেখানে উপনীত হলুম সেটা একটা তিন দিক খোলা মণ্ডপ। মাদুরের উপর সারি সারি কুশন। চতুর্থ দিকে মুখ করে নামাজীদের মতো বসতে হয়। কোথায় আসন নেব ভাবছি এমন সময় দেখি আমার সেই প্রতিবেশিনী। তেমনি রাঙা কিমোনো পরা। সাধারণ জাপানী মেয়ের তুলনায় লম্বা। বিশিষ্ট মহিলা, সন্দেহ নেই। কুশলবিনিময় করা গেল। তার পর আবার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনী হওয়া গেল। তাঁর অন্য পাশে বসলেন এক অবসরপ্রাপ্ত জাপানী বিচারপতি। যথারীতি কার্ডবিনিময় করা গেল। লক্ষ করলুম তাঁরা বসেছেন হাঁটু গেড়ে। বজ্রাসনে। আমাকেও তা হলে

তাই করতে হয়। তা দেখে প্রতিবেশিনী বললেন, 'না, না। আপনার কষ্ট হবে। আপনি আপনার দেশের প্রথায় বসুন।' তখন আমি বসলুম পদ্মাসনে। এটা জাপানীদের অভ্যস্ত না হলেও অজানা নয়। জাপানেও বুদ্ধের পদ্মাসন।

পেন কংগ্রেসের সেই শেষ অধিবেশন। আঁদ্রে শাঁসঁ, য়াসুনারি কাওয়াবাতা প্রভৃতির প্রান্ত ভাষণ। বিদায়ের ব্যথা সকলের অন্তরে। কারো কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আবার এ জীবনে ঘটলেও ঘটতে পারে, কিন্তু অধিকাংশের সঙ্গে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত।

॥ দশ ॥

প্রশান্তদা (মহলানবিশ) নয়া চীন দেখে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন, ভাবী ভারতের রূপ দর্শন করে এলুম। কিয়োতো দেখে তেনরিয়ুজি দেখে আমিও তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখতে পারতুম, প্রাচীন ভারতের রূপ অবলোকন করলুম।

কোথায় এসেছি আমি! কোন্‌খানে বসেছি! এ যে প্রাচীন ভারতের মহাযানবৌদ্ধ মন্দির! দেশান্তরিত ও কালান্তরিত হয়ে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। তেনরিয়ুজি। ধ্যানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রিন্‌জাই উপসম্প্রদায়ের পঞ্চ মহামন্দিরের অন্যতম মহামন্দির। এক টুকরো ভারত। এক রত্তি পালযুগ। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে আসতে কয়েক শতাব্দী সময় নিয়েছে। তার পর জাপান নামক দ্বীপের দ্বৈপায়নতার কল্যাণে অবিকৃতভাবে বিরাজ করেছে।

জাপানে বৌদ্ধমন্দিরের নামের অন্তে 'জি' থাকে লক্ষ্য করেছি। এটাও কি ভারতের স্মারক? জানিনে। ছেলেবেলায় শুনেছি, 'বলদেবজী যাচ্ছি।' তার মানে বলরামের মন্দিরে যাচ্ছি। কানটা এ রকম প্রয়োগে অভ্যস্ত। জাপানীরা তাদের ভাষায় 'তেনরিয়ুজি মন্দির' বলে না। শুধু 'তেনরিয়ুজি' বললেই তেনরিয়ুজি মন্দির বোঝায়। তেমনি হোরিয়ুজি, তোদাইজি, হোঙ্গানজি। 'তেন' মানে স্বর্গ। 'রিয়ু' মানে ড্রাগন। 'জি' মানে মন্দির।

মণ্ডপে বসে প্রান্তভাষণ শুনতে শুনতে এদিকে আমাদের গলা কাঠ আর পা ঝিমঝিম। ছাড়া পেয়ে আমরা কোনো মতে গাত্রোত্তলন করলুম। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড্ডা জমালুম! প্রত্যেকের হাতে চাওয়ান বা চায়ের পেয়ালা। হাতলহীন। তাতে সবুজ চা। সফেন। তিক্তস্বাদ। মিষ্টি মুখের জন্যে জাপানী কেক এলো। কাঠি বেঁধা। কাঠি ধরে তুলে নিয়ে মুখবিবরে পুরে কাঠি খুলে নিতে হয়। চায়ে চুমুক দিতে আপনি বাধ্য, কিন্তু খেয়ে শেষ করতে বাধ্য নন। গল্প করতে করতে চা খাওয়া জাপানী মতে বারণ। ওরা খায় তারিফ করতে করতে। কিন্তু আমরা হলুম বর্বর। আমাদের আশা ওরা ছেড়ে দিয়েছে। আমরাও তাই প্রাণ ভরে আলাপ করে নিচ্ছি। আবার যে কোনো দিন এমনি, জমায়েৎ হব সে ভরসা তো নেই। পরের দিন সন্ধ্যায় আমাদের ছাড়াছাড়ি। আর ত্রিশ ঘণ্টা বাকী। এখন থেকেই ঘণ্টা গুনছি। মিলনের স্বাদ তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদন করছি।

মন্দিরের এক স্থানে দেখি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ। চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন সর্বজীবের মিত্র। সর্বজীব এসেছে তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে। যেমন গান্ধীকে দেখতে গেছল দিল্লীর সর্বজন। এসেছে দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ মানব। এসেছে পশুপাখীসরীসৃপ। সবাইকে আমার স্মরণ নেই। মনে

আছে বেচারা সাপকে আর বেচারি কচ্ছপকে। মিতা চলে গেলেন, আর কে ভালোবাসবে! তারাও শোকে মুহ্যমান।

বৌদ্ধমন্দিরে আমিষ একেবারে অচল। কিন্তু সাকে বা সোমরস নিষিদ্ধ নয়। সেটা অবশ্য সোম থেকে তৈরি হয় না। হয় তণ্ডুল থেকে। চীনামাটির ছোট্ট একটি বাটিতে ঢেলে দিয়ে যায়। গরম গরম চুমুক দিতে হয়। এত দিন এড়িয়ে এসেছি। এবার নিয়মভঙ্গ করলুম। দিয়ে যাচ্ছেন কারা? গেইশা নয়, গৃহস্থকন্যা নয়, স্বয়ং স্বামীজীরা। এখানে বলে রাখি যে বহু শতক আগে এক স্বামীজী বিবাহপূর্বক স্বামী হলেন। তাঁকে একঘরে করে যা হলো তা তো রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে বলে গেছেন। 'পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কী, সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়িয়ে।' যিনি ভস্ম করেছিলেন তিনিও তো পরে বিবাহ করলেন। তেমনি যাঁরা একঘরে করেছিলেন তাঁরাও। তখন থেকে জাপানের বৌদ্ধ স্বামীজীরা স্বামী হতে আরম্ভ করেন। সবাই না, অনেকেই বিবাহিত। তা কিন্তু তাঁদের মুণ্ডিত মস্তক ও ভেক দেখে বোঝা কঠিন।

স্বামীজীরা আমাদের নিরামিষ খেতে দিলেন, আমিষ নয়। কিন্তু সে খাদ্য এত চমৎকার আর তার পাত্র এমন মনোহারী আর তার সঙ্গে যে ন্যাপকিন আর তোয়ালে ছিল তাও শিল্পের দিক থেকে এরূপ মূল্যবান যে আমরা সাধুদের সাধুবাদ দিতে দিতে পঙ্ক্তিভোজনে বসে দেশকাল ভুলে গেলুম। জলচৌকির মতো নিচু টেবিল জুড়ে জুড়ে লম্বা করলে যেমন দেখায় তার দু'ধারে দু'সার অতিথি। পর পর অনেকগুলি সারি। আড়ালে বুদ্ধমূর্তি। তখন লক্ষ করিনি। পরে গিয়ে প্রণাম করে এলুম।

ভেবেছিলুম আমার জাপানী প্রতিবেশিনীর প্রতিবেশী হব আবার, কিন্তু তা হলে আমার সহযাত্রীরা ভাবতেন, তাই তো! কিয়োতোয় এসে হৃদয় হারানোর তাৎপর্য কী। তা ছাড়া নতুন কিছু শোনবার ছিল না তাঁর কাছে। সমস্যা তো সব দেশেই আছে, কেন তা নিয়ে আলোচনা করে দুর্লভ সময় অপচয় করি! সেই সময়টুকু বরং যাঁরা আমাকে চান তাঁদের দেওয়া যাক। আমি না হলে ভারত পাকিস্তানের মাঝখানে মধ্যস্থ হবে কে? শেষে কি আবার একটা কুরুক্ষেত্র বাধবে? আর আজ বাদে কাল পাকিস্তানকে কাছে পাচ্ছি কোথায়? কান মলে দিতে হলেও তো এই তার সুযোগ। বসলুম আমার দুই বোনকে দু'পাশে বসিয়ে। গরম তোয়ালে তুলে নিয়ে হাত মুছলুম, মুখ মুছলুম। ঐ ভাবেই হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেল। তারপর ন্যাপকিন সরিয়ে রেখে চপ স্টিক ডান হাতে নিলুম।

একটু পরে কুরাতুলাইন হায়দর আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর অপর পার্শ্ববর্তী ফরাসী লেখকের সঙ্গে। অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্ছ্বাস মিশিয়ে যা বললেন ভদ্রলোক তার বাংলা হলো, 'জানিনে কেন যে আমি প্যারিসে আমার জীবনপাত করছি। এমন বেকুব কেউ হয়! এতখানি বেকুব!' তা শুনে আমার মুখের গ্রাস মুখেই রইল। উত্তর দেব কী করে! উত্তর দেবার আছেই বা কী! হৃদয় তো আমরা সবাই হারিয়েছি। কেউ কম কেউ বেশী।

গল্প করতে করতে আনমনা ছিলুম। লক্ষ করিনি কখন এক সময় বাবাজীরা এসে বাসন তুলে নিয়ে গেছেন। পড়ে আছে সাকের পাত্র, সাকের আধার। সুশ্রী চীনামাটির কাজ। পড়ে আছে বাঁশের [illegible], ফুল রাখার চাঙাড়ি। বিশ্বকর্মার আপন হাতের তৈরি। পড়ে আছে নক্‌শী ন্যাপকিন, সেটা ঠিক হাত মোছার জন্যে নয়, খাবার ঢাকা দেওয়ার জন্যে। হাত মোছার জন্যে ছিল সুচারু কাগজের সার্ভিয়েট। হঠাৎ দেখি হরির লুট। যে যার ব্যবহৃত অব্যবহৃত সরঞ্জাম নিয়ে ছাঁদা বাঁধতে যাচ্ছেন। সাধুজীরা বলছেন, 'নিন। নিন। যেটা খুশি নিয়ে যান। যতগুলো খুশি নিয়ে যান।'

জাপানের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে প্রস্থান করলুম আমরা। কারো কারো বোঁচকা ফুলে ঢোল। অতঃপর চটি ছেড়ে জুতো পায়ে দেওয়া। ইয়া ইয়া 'জুতোর চামচ' নিয়ে এলেন স্বামীজীরা। যাকে

আমরা বলি শু-হর্ন। আকারে আমাদের শু-হর্নের তিন চার গুণ। জুতো খুঁজে পেতে এক মিনিটও লাগল না। চাকতি দেখাতেই জুতো হাজির। তার পর জুতো পায়ে বাগানের এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে বাসে উঠে বসা।

সন্ধ্যায় নোমুরা ভিলায় নিমন্ত্রণ। পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্রাবলোকন। কী জানি কেন এই পূর্ণিমাটিতেই চাঁদ দেখার উৎসব অনুষ্ঠিত হয় জাপানের সবখানে। ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতিথি। কী ভাগ্যি টাইফুন আসেনি। দিনটি পরিষ্কার। হাতে তিন ঘণ্টা সময়। বাস চলল আমাদের নিয়ে নগর পরিক্রমায়। কিয়োতোর কয়েকটি বিখ্যাত কীর্তি দেখাতে। সব ক'টির জন্যে তিন ঘণ্টা কেন তিন মাসও যথেষ্ট নয়। প্রথমে কাৎসুরা বিচ্ছিন্ন প্রাসাদ। সোজা বাংলায় রাজকুমারের বাগানবাড়ি। তার পরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদ। এখনো সেখানে নতুন সম্রাটের অভিষেক হয়। নয়তো শূন্য পড়ে থাকে। তার পরে কিন্‌কাকুজি বা সোনার মণ্ডপ। আসল নাম রোকুওনজি মন্দির। এই তিনটি ছাড়া ছাড়া জায়গায় যেতে যেতে থামতে থামতে সবাইকে কুড়িয়ে বাসে ওঠাতে ওঠাতে পাঁচটা বেজে গেল।

কাৎসুরা বাগানবাড়ির বৈশিষ্ট্য তার বিচিত্র উদ্যান ও সুকিয়া শৈলীর গৃহ। কাজ আরম্ভ হয় ১৫৯০ সালে। কিছু কম চার শ' বছর আগে। পরিকল্পনাটা শোনা যায় কোবোরি এন্‌শু নামক প্রখ্যাত বাস্তুশিল্পীর। তিনি ছিলেন চা-অনুষ্ঠানেরও ওস্তাদ। বাগানবাড়ির পরিবেশ শান্ত ও সুন্দর। শহরের বাইরে। সেখান থেকে আরাশিয়ামা ও কামেয়ামা পাহাড় দেখা যায়। কোন এক শাহজাদার জন্যে এটি নির্মিত হয়েছিল। আমাদের শাহজাদাদের মতো জাঁকালো রুচি ছিল না তাঁর। ছোট ছোট গুটি তিনেক কাঠের তৈরি বাংলা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। জাপানী ধরনের বাংলা। ভিতরে মাদুরে মোড়া মেজে। কাগজের দেয়াল। আসবাব বলতে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু রূপে আর সুষমায় অনুপম। উদ্যানের তো কথাই নেই।

উদ্যানের মাঝে মাঝে সরোবর। পাথরের লণ্ঠন। জায়গায় জায়গায় বর্ষাকালের ঝরনার ধারা পার হবার জন্যে গোল গোল পাথরের পৈঠা। পা ফেলে পা তুলে হুঁশিয়ার হয়ে হাঁটতে হয়। মনে হয় বনস্থলীর ভিতর দিয়ে চলেছি। জাপানের উদ্যানশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইংরেজীতে একে বলে ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেন। প্রকৃতির রচিত বন যেমন মানুষের রচিত উপবন তেমনি। অনুকৃতি নয়, বিকৃতি নয়, প্রকৃতির ভাবে বিভোর হয়ে প্রকৃতির প্রকৃতি অবগত হয়ে আয়ত্ত করে প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের মানস কৃতি। জাপানের উদ্যানশিল্পীরা ধ্যানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের না হলেও তাঁদেরি স্বজাতি। এ ক্ষেত্রেও এস্থেটিক ও আধ্যাত্মিক এক হয়ে গেছে, যেমন চা অনুষ্ঠানে। সেইজন্যে বাগানবাড়ি বলে এর পরিচয় না দেওয়াই ভালো। তাতে ভুল ধারণা জন্মায়। এ হয়েছে তাদের জন্যেই, যারা সংসার ছাড়বে না সাধুদের মতো, অথচ সংসার করবে না বারো মাস অষ্টপ্রহর। সদর থেকে অন্দরে যাবার মতো সংসার থেকে প্রকৃতির কোলে যাবে ও সংসার ভুলে খোলা চোখে ধ্যানস্থ হবে। পরজন্ম ও পরকালের জন্যে নয়, আত্মজ্ঞানের জন্যে।

মূল রাজপ্রাসাদের থেকে বিচ্ছিন্ন এই প্রাসাদ দেখে রওনা হলুম আমরা মূল রাজপ্রাসাদের দিকে। শহরতলী থেকে শহরে। অষ্টম শতাব্দীর শেষপ্রান্তে সম্রাট কাম্মু যেখানে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন এখানকার প্রাসাদ সেখানে নয়, তার পুবে। এই প্রাসাদও বার বার পুড়ে যাওয়ার পর পুনর্নির্মিত হয়েছে এক' শ' বছর আগে। বাদশাহী প্রাসাদ বললে আমাদের কল্পনায় যে দৃশ্য পরিস্ফুট হয় এ দৃশ্য তেমন নয়। কাঠের তৈরি, টালি দিয়ে ছাওয়া। ভূমিকম্পের দেশে তখনকার দিনে এরই উপর কারিগরি ফলানো হতো। ছবি টানিয়ে দেওয়া হতো। সমস্ত ঘুরে দেখার সময় ছিল না, চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। সুরম্য উদ্যান। প্রশস্ত অঙ্গন। তবে তোকিয়োর মতো চার দিকে পরিখা নয়, প্রাচীর শুধু।

কিন্‌কাকুজি মাত্র দু'বছর আগে পুনর্নির্মিত হয়েছে। সাত বছর আগে পুড়ে যায়। আসল মণ্ডপটি চতুর্দশ শতাব্দীর কীর্তি। আশিকাগা য়োশিমিৎসু নামক শোগুন সেটি নির্মাণ করেছিলেন ভোগের জন্য। সোনা দিয়ে মোড়া হয়েছিল এর দেয়াল, এর মেঝে এর থাম। সেইখানে বসে তিনি চা খেতেন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃৎ সে-আমির সঙ্গে। নো নাটক রচয়িতা সে-আমি। জাপানের রাণার সঙ্গে নাট্যকারের বন্ধুতা। কেমন নাটকীয় শোনায়! ধ্যানী বৌদ্ধ রণপতি চা সেবার সঙ্গে সৌন্দর্য উপভোগ মিলিয়ে ধর্মসাধনার উপযোগী পরিবেশ পেতেন যেখানে এখন সেখানে ধ্যানী বৌদ্ধ মন্দির তথা সরোবর ও উদ্যান। ঘুরে ফিরে দেখলুম কেমন করে গাছকে কচি বয়স থেকে তালিম করা হয়। মানুষের হাতে গড়া গাছ আকারে প্রকারে অন্য গাছের মতো নয়। পাইন তরু হয়েছে নৌকার মতো।

কিন্‌কাকুজিতে লোকের ভিড়। তাই তার বহির্দ্বারে স্মারকচিহ্নের দোকান। কেক বেচতে এসেছিল গ্রামের মেয়েরা। পরনে রঙচঙে আঞ্চলিক পরিচ্ছদ। কিমোনো নয়। মোম্পে নয়। চৈনিক বা পাশ্চাত্য নয়। বিনা প্রয়োজনে জাপানী কেক কিনলুম এক শ' ইয়েন দিয়ে। শুধু তাদের হাসির ভাগ নিতে। তকতকে কাগজ মোড়া। মাছি বসে না। ধুলো লাগে না। গ্রামের মেয়েদেরও স্বাস্থ্যবোধ আছে। রুচিবোধের তো কথাই নেই।

নোমুরা ভিলায় যাবার আগে হোটেলে গিয়ে কাপড় ছেড়ে সান্ধ্য পোশাক পরতে হলো। তার মানে কালো শেরোয়ানি। এটা সঙ্গে এনে বুদ্ধিমানের কাজ করেছি। অচেনারাও এসে আলাপ জমায়। তবে ওটা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। ওই যে বলে, সুন্দর দেখায়। তরুণ দেখায়। তা নয়। আমি স্বদেশের খাতিরেই স্বদেশী সাজি। কিন্তু চুড়িদারকে নিয়ে জ্বালাতন হওয়া আমার ঘুচল না। ফিতে যদি বা কিনতে পাওয়া গেল ছুঁচ সুতো কিনতে উৎসাহ নেই। সেলাই খুলে গেলে আমি অপ্রস্তুত ও অসহায়। ট্রাউজার্সের উপর শেরোয়ানি পরতে আমার বিবেকে বাধে। অগত্যা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হয়। শেরোয়ানি দিয়েই পায়জামার ফাঁক। একটু সচেতনভাবে চলাফেরা করতে হয়।

নোমুরা ভিলার চারদিকে বিস্তৃত জাপানী উদ্যান। চার একর জমি জুড়েছে শহরের মাঝখানে। আর কোনো বড়লোক হলে বাগানের বদলে ম্যানসন তৈরি করে ভাড়া দিতেন। কিন্তু নোমুরা ছিলেন বড়লোকদের মধ্যেও বড়লোক। জাপানের দশরত্নের দশম রত্ন। জাইবাৎসুর নাম শুনেছেন? মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো, য়াসুদা। এঁরা হলেন জাপানের চার মহাশ্রেষ্ঠী। অর্থনৈতিক সম্রাট চতুষ্টয়। এঁদের পরে আরো ছ'টি এমনিতর পরিবার। আয়ুকাওয়া, আসানো ফুরুকাওয়া, ওকুরা, নাকাজিমা, নোমুরা। ম্যাকআর্থার এঁদের মৌচাক ভেঙে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এঁরা আবার জমিয়ে বসেছেন। মার্কিনদেরই পৃষ্ঠপোষকতায়।

তোকুশিচি নোমুরা এখন জীবিত নেই। চল্লিশ বছব আগে তিনি এই উদ্যান আরম্ভ করেন। ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনের জন্যে প্রথমে বেছে নিতে হয় এমন একটি স্থল যেখানে প্রকৃতি স্বয়ং সুন্দরী। প্রকৃতির সোনার সঙ্গে আর্টের সোহাগা মেশাতে যারা জানে তারাই জাপানের মালঞ্চের মালাকর হয়। বাগানে যে বাড়ি থাকে তাতে মেশাতে হয় সরলতার সঙ্গে মহত্ত্ব। আর নানা দুর্গম স্থান থেকে স্থানান্তরিত করে নিয়ে আসতে হয় দুর্লভ দুর্মূল্য পাথরের লণ্ঠন, পাথরে গড়া হাত ধোবার কুণ্ড, শিলা, তরু ইত্যাদি। এসব তো ছিলই। আর ছিল সরোবর ও হংস। এক সন্ধ্যার জন্যে আমরা এখানে স্বচ্ছন্দচারী স্বেচ্ছাগতি।

প্রবেশ করতেই অভ্যর্থনা করলেন নোমুরা কারবারের একজন কর্তাব্যক্তি। ঢুকে দেখি প্লেটের গায়ে অতিথিদের বলা হচ্ছে ছবি আঁকতে। তুলি আর রং মজুত। গোল বা চার কোণা প্লেট। গ্লাসও ছিল। ছবি আঁকতে না জানলে নাম লিখতে পারেন, কথা লিখতে পারেন। পরে গ্লেজ করা হবে।

ছিল। ছবি আঁকতে না জানলে নাম লিখতে পারেন, কথা লিখতে পারেন। পরে গ্লেজ করা হবে। যে যার প্লেট বা গ্লাস পাবেন। একে বলে রাকুয়াকি। কিয়োতোর একটি বিশিষ্ট শিল্প। আমিও একটি নাম লিখলুম। আমার বড়মেয়ের নাম। তার পর কয়েক পা যেতেই দেখি তুলি দিয়ে কবিতা লেখা হচ্ছে। তার জন্যে লম্বা মোটা রঙিন একরকম কাগজ থাকে। সোনার জল বা রুপোর জল মাখা। আমিও একটি কবিতার কয়েক ছত্র লিখলুম। আমারি পুরোনো লেখা। এটা কিন্তু ওঁরাই রাখবেন। অতিথির স্মৃতিচিহ্ন। বাংলা হরফের বাংলা ভাষার নিদর্শন।

দীঘিটি গোলও নয়, চৌকোণও নয়, অনেকটা কৃষ্ণসাগরের মতো আকৃতি। তার কিনারে কিনারে বা দক্ষিণের রাস্তার ধারে ধারে চা কফি বীয়ার সুশি তেম্পুরা মুরগী সোবা ককটেল স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদির আড্ডা। দীয়তাং নীয়তাং। দীয়তাং বলার আগেই নীয়তাং। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাইয়তাং পীয়তাং। ডালায় করে পানীয় নিয়ে ঘুরছিল অল্পবয়সী মেয়েরা। তাদের একদলের সাজ পশ্চিমের ব্যালেরিনার মতো। ফুরফুরে মিহি শাদা কটিবাস। বব করা চুল। তখন আমি জানতুম না, পরের দিন শুনলুম যে ওরা মডার্ন গেইশা। চাঁদ দেখতে গেছি আমরা। দেখি চাঁদের হাট।

উত্তর কিনারে একটি যাদুঘরের মতো ছিল। সেখানে নো নাটকের অতি পুরাতন সাজপোশাক। ভীষণ মূল্যবান। তেমনি জমকালো। তার পাশে ছিল নো নাটকের মঞ্চ। নাটক দেখার আগে আমরা দেখা করলুম গৃহকর্ত্রী নোমুরা ঠাকুরানীর সঙ্গে। অনাড়ম্বর নিরহঙ্কার ভদ্রমহিলা। কিমোনো পরিহিতা বৃদ্ধা। আমাদের দেশের গিন্নীবান্নী মানুষ।

নো নাটক পুরুষরাই করে! কিন্তু আমরা যা দেখলুম তা পুরুষবর্জিত সংস্করণ! নো নয়। কিয়োমাই! নাটক নয়, নৃত্যনাট্য! প্রথম নাট্যে অংশ নিল কিয়োতোর নাম-করা নটীরা, যাদের বলে মাইকো। দ্বিতীয় নাট্যে কেবল একজনের ভূমিকা। ইনি জাপানের বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী য়াচিয়ো ইনোউএ! চার পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর ধরে ইনি এই নাট্যপ্রকরণের সনাতন ধারার শুদ্ধি রক্ষা করে আসছেন। এসব ক্লাসিকাল নৃত্যের মর্ম আমাকে বুঝিয়ে দেবে কে? তবু বুঝতে পারলুম যে এর পিছনে রয়েছে কঠোর সাধনা। শুনলুম বড় বড় পরিবারের নিজেদের স্থায়ী নো মঞ্চ থাকে! বৃত্তিভোগী অভিনেতা বা নর্তকী সম্প্রদায় থাকে।

সরসীর অন্য প্রান্তে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে গাগাকু সঙ্গীতের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ঘোরাঘুরি করে গানবাজনা শুনতে না পেয়ে মন দেওয়া গেল পানভোজনে! তার চেয়ে বড় কথা চন্দ্রাবলোকনে। মাটির চাঁদ নয়, আকাশের চাঁদ। জলে হাঁস, ডাঙায় মানুষ, দূর পাহাড়ের চূড়ায় আগুন কি আলোকমালা! কানে এলো একপ্রকার সঙ্গীত। কিন্তু তার সন্ধানে যেতে না যেতে মিলিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখি গাগাকু মঞ্চ থেকে কারা সব অপরূপ পোশাকে বেরিয়ে যাচ্ছে। জলের ধারে কান পেতে বসলুম! যদি আবার আসে। না। আর এলো না। জ্যোৎস্নায় দশদিক ভেসে যাচ্ছে। আমরাও ভেসে গেলুম জনতা থেকে বিজনতায়। দ্বিজনতায়।

হোটেলে ফিরে মোরাভিয়াকে দেখি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে। এই ক'দিনে কত লেখকের সঙ্গে মুখ চেনা হয়েছে। দুটি একটি কথাও। ইংরেজ লেখক আলেক ওহ্ (Alec Waugh) থাকেন জাপানী সরাইতে। তিনি যা বর্ণনা দিলেন তা শুনে আমারি আফসোস হলো কেন হোটেলের বদলে সরাই মনোনয়ন করিনি! এক একটি অতিথির জন্যে এক একটি পরিচারিকা। সাহেব আছেন রাজার হালে। আমার অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন কিছুকাল আগে তো ইংলণ্ডেও স্বতন্ত্র স্নানাগার পাওয়া যেত না। হয় একটু অসুবিধা। তা সেটা সহনের অতীত নয়। ইন্দোনেশিয়ার লেখক আলীশাবানাও থাকেন জাপানী সরাইতে। হোটেল তো আজকাল সব দেশে। জাপানী সরাই কেবল জাপানেই। এটা এমন একটা অভিজ্ঞতা যা হারালে পরে পশতাতে হবে। যারা য়্যাডভেঞ্চারের

জন্যে বেরিয়েছে এটাও তাদের একটা য়্যাডভেঞ্চার বলে ধরে নিলেই হয়।

এয়ারকণ্ডিশনের একটা যন্ত্র ছিল আমার ঘরে। কেমন আরাম! দেয়াল-জোড়া কাচের জানালা। ঘরে বসেই পাহাড় দেখতে পাই। পাহাড়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলার আত্মীয়তা। ঘবের সঙ্গেই সংলগ্ন স্নানাগার। যখন খুশি গরম জল। আমিই বা কোন্ [illegible] থেকে থেকে আফসোস জাগে। আরে, এ তো সব দেশে পাওয়া যায়! এর জন্যে এত দূর আসা! পরে এমন কত হোটেলে বাস করব। কিন্তু জাপানী সরাই পাব কোথায়? তার জন্যে আবার কি আসতে হবে জাপানে? নাঃ! ভুল করেছি জাপানী সরাইয়ের জন্যে নাম না দিয়ে। হতে হতো দলচ্যুত। না হয় হওয়াই গেল। কিন্তু অমন একটা অভিজ্ঞতা হেলায় হারালুম। কেবল স্নানাগারের কথা ভেবে। অশুচিতার ভয়ে। কোথায় গেল আমার রোবাস্ট ভাব! নীতিবাইগ্রস্ত শুচিবাইগ্রস্ত হয়ে উঠেছি! আমি কি শিল্পী? না সম্ভ্রান্ত লোক?

কংগ্রেসের শেষে কিয়োতোয় দিন কয়েক থেকে আরো দেখার প্রোগ্রাম তৈরি করে দিয়েছিলেন কাসুগাই-সান। যোগবিয়োগ করেছিলেন তোদো-সান। আমি তাতে সন্নিবেশ করতে চাইলুম জাপানী সরাই। বেশী নয়। এক দিন। তোদো-সান বললেন, আচ্ছা। তিনিই ভার নিলেন সব ঠিকঠাক করার। (আমরা যেমন বলি গান্ধীজী, নেহরুজী, নেতাজী জাপানীরা তেমনি 'জী'র জায়গায় 'সান' যোগ করে সম্মান দেখায়। 'সামা' যোগ করা হয় বিশেষ সম্মানার্থে।)

পরের দিন বিবলি এসে এক মজার গল্প বলল। সে একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখকের ভক্ত। তাঁর অটোগ্রাফ আদায় করে দেবার জন্যে আমাকে ধরেছিল। আমি বলে রেখেছিলুম তাঁকে। সকালবেলা কার মুখ দেখে উঠেছিল বিবলি, ভদ্রলোকের ঘরের দরজায় টোকা দিতেই ভিতর থেকে দরজা খুলে গেল, দেখা গেল স্বনামধন্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছেন। মানুষপ্রমাণ আয়নায় আদি মানুষের ছবি। বাবা আদমের তবু একটা ডুমুরের পাতা ছিল। শিল্পীগুরুর তেমন কোনো পত্রাচ্ছাদন ছিল না। কোথায় অপ্রতিভ হয়ে গাউন-টাউন একটা কিছু কুড়িয়ে নিয়ে জড়াবেন! তা নয়। সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ভাবে দাড়ি কামাতে কামাতে আয়না থেকে মুখ না ফিরিয়ে বললেন, 'এই যে। এস। বস। তোমার কথা আমি মিস্টার রায়ের কাছে শুনেছি।'

সেই দিন পেন কংগ্রেসের লেখকদের নারা দর্শনের পর শেষ বিদায়। কারো উপর রাগ করা উচিত নয়। কে যে কোথায় চলে যাবে তার পর আর হয়তো এ জীবনে সাক্ষাৎ হবে না। তা ছাড়া অত বড় একজন খ্যাতিমানের সঙ্গে আমি বিবলির জন্যে ঝগড়া করতে যাব নাকি! বললুম, 'আর্টিস্টরা ও রকম খেয়ালী হয়েই থাকে। খুব সম্ভব হাতের কাছে ড্রেসিং গাউন ছিল না। তোমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাও অভদ্রতা হতো। অন্যমনস্ক ছিলেন, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, ভিতরে আসুন। ভেবে দেখ কত বড় সৌভাগ্য তোমার যে ঘরে ঢুকে তাঁর মতো লোকের অটোগ্রাফ আদায় করে আনতে পারলে! আর কেউ হলে পারত?'

সেদিন আমরা সদলবলে নারা চললুম বাস-যোগে। প্রাতরাশের পর। বাসে যেতে যেতে কেবলি মনে হচ্ছিল আর দেখা হবে না, আর দেখা হবে না। আজকেই সন্ধ্যাবেলা আমাদের শেষ বিদায়। কাল সকাল পর্যন্ত জন কয়েক থাকবে আমার মতো। তারা নিঃসঙ্গ। কেমন করে তাদের ভালো লাগবে নিঃসঙ্গ বিচরণ!

কিয়োতোর আদি নাম ছিল হেইআন-কিয়ো। ৭৯৪ সালে রাজধানী সরে আসে সেখানে। সরে আসে নারা থেকে। নারাতেও রাজধানী এক শতাব্দীর চেয়ে অল্পকাল ছিল। দুই রাজধানীর তখনকার দিনের মানচিত্র দেখলে বিস্মিত হতে হয়। যেন দু'খানি শতরঞ্চের ছক। সরল রেখার সঙ্গে সরল রেখা কাটাকুটি করে জ্যামিতিক চতুষ্কোণ রচনা করেছে। উত্তর দিকের মাঝের চতুষ্কোণটি

রাজপ্রাসাদ। একালের মানচিত্রে অনেক অদলবদল হয়েছে। তবু মোটের উপর তেমনি দাবাখেলার ছকের মতো দেখতে। পৃথিবীর সব চেয়ে আধুনিক শহরের নক্শা কি এর চেয়ে আধুনিক? সেকালের জাপানের এই নগরবিন্যাসের রীতি এসেছিল সাগরপারের কন্টিনেন্ট থেকে। ইংরেজদের কাছে কন্টিনেন্ট মানে অবশিষ্ট ইউরোপ। জাপানীদের কাছে কন্টিনেন্ট মানে অবশিষ্ট এশিয়া। বিশেষ করে কোরিয়া ও চীন। তথা ভারত। এই দুটি শহরের সমবয়সী সে-সব দেশে থাকলেও এরূপ নগরবিন্যাস এখনো আছে কি না আমার জানা নেই। জাপানে কিন্তু যাদুঘরের মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে, সুরক্ষিত রয়েছে, এই দুটি যাদু শহর।

॥ এগারো ॥

টাইফুন অন্য দিক দিয়ে ছুঁয়ে গেল, এমন কিছু ক্ষতি করে গেল না। আমরা যা পেলুম তা ঝড় নয়, জল। ভিজতে ভিজতে নারা হোটেলে উঠলুম। তীর্থদর্শন পরে হবে, আগে তো একটু চাঙ্গা হয়ে নেওয়া যাক। চা! চা! কোথায় চা! খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করা গেল একটা ঘর, সেখানে চা কফির আড্ডা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান করলুম আমরা ক'জন আবিষ্কারক। চায়ের স্বাদ এত ভালো এর আগে পাইনি। তোকিয়োতে। কিয়োতোয়। নারার উপর পক্ষপাত জন্মাবে না? তখনো তাকে দেখিনি যদিও।

তা ছাড়া আমরা ভারতীয়রা এমনিতেই নারার পক্ষপাতী। ভারতের প্রভাব যদি কোথাও থাকে জাপানের তবে তা এইখানে। আমাদের দেশে যখন গুপ্তযুগ তখন কোরিয়া থেকে জাপান সম্রাটের কাছে ৫৩৮ সালে উপঢৌকন-রূপে এলো বৌদ্ধমূর্তি, সূত্র ও ভাষ্য। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সদ্ধর্ম। নারার কাছাকাছি আসুকা ছিল জাপানের রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক আবহাওয়া ছিল ধর্মের পক্ষে ও শিল্পের পক্ষে অনুকূল। মন্দির আর মূর্তি নির্মাণ শুরু হলো। ৬০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো হোবিয়ুজ মন্দির। নারার আরো কাছে। ৭১০ সালে রাজধানী স্থানান্তরিত হলো নারায়। নামকরণ হলো হেইজোকিয়ো। আরো কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ৭৫২ সালে উন্মোচন করা হলো তোদাইজি মন্দিরের বিশ্ববিখ্যাত বৈরোচন বুদ্ধবিগ্রহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন ভারত থেকে আগত মহাশ্রমণ। গৌড়ে তখন পালযুগ সবে আরম্ভ হচ্ছে। বঙ্গ আর জাপান দুই তখন বৌদ্ধ। মহাযান দুই দেশের সেতুবন্ধ। মহাশ্রমণ কি তিব্বত চীন অতিক্রম করে কোরিয়া হয়ে জাপানে গেলেন? না তাম্রলিপ্ত থেকে জাহাজে করে উপকূল ধরে সরাসরি সমুদ্রপথে? কে জানে! হয়তো গান্ধার থেকে খাসগড়ের রাস্তায় মঙ্গোলিয়া ঘুরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রেশম মার্গে।

ক্রমে রাজদরবারের উপর বৌদ্ধ মঠগুলির প্রভাব বাড়তে বাড়তে এমন হলো যে নারা নগরীর পাঁচ লক্ষ অধিবাসীকে পরিত্যাগ করে সম্রাট তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিলেন ছাব্বিশ মাইল দূরে ৭৯৪ সালে হেইআন-কিয়ো শহরে। রাজনীতির উপর ধার্মিকদের হস্তক্ষেপ সমসাময়িক খ্রীস্টান ও মুসলমানদেরও রীতি ছিল। তার দরুন রাজারা রাজধানী পবিবর্তন করেছেন বলে শুনিনি। মনে হয় অন্য কোনো কারণ ছিল। যা হোক বৌদ্ধরা অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। কিয়োতো ভরে গেল বৌদ্ধ মঠে ও মন্দিরে। এক একজন সাধু চীনদেশে যান, সদ্ধর্ম শিখে আসেন

ও এক একটি সম্প্রদায় স্থাপন করেন কিয়োতোয় বা তার আশেপাশে। নারার কপালে সায়োনারা। প্রভাব কাটিয়ে যাওয়া কেবল নারার থেকে নয়। ভারতের থেকেও। নারার বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি যতখানি ভারতীয় কিয়োতোর নববৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি ততখানি নয়। তারা ততোধিক চৈনিক কিংবা স্বদেশী।

আমাদের বাস চলল নারা পার্কের ভিতর দিয়ে। বারো শ' একব জমি জুড়ে পার্ক। আট মাইল রাস্তার এক ধারে ময়দান, আরেক ধারে বন ও শৈল। বনে থাকে নানা জাতের গাছপালা পশুপাখী। তাদের মধ্যে শ' ছয়েক হরিণ। হরিণ আছে বলে নারা পার্কের অপর নাম ডিয়ার পার্ক। বুদ্ধদেবের মৃগদাব নয় তো? হরিণকে পবিত্র প্রাণী জ্ঞানে সযত্নে রক্ষা করা হয়। হরিণহত্যা মহাপাপ তো বটেই, দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। হরিণরা শহরের পথেঘাটেও ঘুরে বেড়ায়। লোকে আদর করে খেতে দেয়। ভাবলে অবাক হতে হয় যে হাজার দেড়েক বছর ধরে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃগযূথও জাপানের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়েছে। শিন্তোরাও হরিণ ভালোবাসে তার প্রমাণ পেলুম নারা পার্কেরই অন্যতম দ্রষ্টব্য কাসুগা পীঠে। এটা কি নারার ঐতিহ্যগুণে না হরিণের নিজগুণে? কিন্তু শিন্তো তীর্থের কথা পরে।

ভিজতে ভিজতে নামলুম তোদাইজি মন্দিরে। ছত্র যোগালেন মন্দিরের সাধুজীরা। বিরাট এক পুরীর মহলের পর মহল পেরিয়ে অবশেষে উপনীত হলুম মহাবুদ্ধের দারুময় মন্দিরগৃহে। পদ্মের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধ। ব্রঞ্জ দিয়ে তৈরি বিশাল বিগ্রহ। উপবিষ্ট অবস্থাতেই দেহের উচ্চতা তিপ্পান্ন ফুট ন' ইঞ্চি। মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য ষোল ফুট, প্রস্থ ন' ফুট পাঁচ ইঞ্চি। এক একটি চোখের দৈর্ঘ্য তিন ফুট ন' ইঞ্চি। এক একটি কানের দৈর্ঘ্য আট ফুট পাঁচ ইঞ্চি। দুই কাঁধের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত আটাশ ফুট সাত ইঞ্চি। তা হলে অনুমান করুন বাকী সব। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিগ্রহ ঢালাই করতে লেগেছিল ৪৩৮ টন তামা, ৮ টন শাদা মোম, ৮৭০ পাউণ্ডের মতো সোনা, ৪৮৫৫ পাউণ্ডের মতো পারা। তখনকার দিনের জাপানীরা বুদ্ধকে কী পরিমাণ ভক্তি করত এ যেমন সেই ভক্তির অভিব্যক্তি তেমনি তাদের শিল্পকলার জীবনীশক্তিরও। তার পর আরো শুনুন। যে পদ্মের উপর বুদ্ধ বসেছেন সেও মানুষসমান উঁচু। তার নিচে বেদী। বেদী আর পদ্ম আর বিগ্রহ মিলিয়ে উচ্চতা সাড়ে একাত্তর ফুট। বিশালকে রাখতে আরো বিশাল গৃহ। তার উচ্চতা এক শ' ছাপ্পান্ন ফুট। বেড় পুবে পশ্চিমে এক শ' অষ্টাশি ফুট, উত্তরে দক্ষিণে এক শ' ছেষট্টি ফুট। পৃথিবীতে এত বড় ব্রঞ্জমূর্তিও নেই, এত বড় দারুমন্দিরও নেই। মন্দির নাকি আরো উচ্চ ছিল পুড়ে যাওয়ায় পুনর্নির্মাণ কালে এক-তৃতীয়াংশ খাটো হয়েছে।

জাপানের সেই যে আতঙ্কের কথা গাইড মেয়েটি বলেছিল তার বারো আনা সত্যি। প্রথম নির্মাণের এক শ' বছর যেতে না যেতেই ভূমিকম্পে ভেঙে যায় বুদ্ধমূর্তির মাথাটি। সেটি যদি বা জোড়া গেল দ্বাদশ শতাব্দীর যুদ্ধে মন্দির গেল পুড়ে আর বিগ্রহের হলো ক্ষতি। এক শ' বছর লাগল পুনরুদ্ধার করতে। ষোড়শ শতাব্দীতে আবার যুদ্ধ। আবার তেমনি পুড়ে গেল মন্দির, জখম হলো বিগ্রহ। পুনঃসংস্কার হতে হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর আদ্য। এইসব কারণে বিগ্রহটির উত্তমাঙ্গ অষ্টাদশ শতাব্দীর, মধ্যমাঙ্গ দ্বাদশ শতাব্দীর, অধমাঙ্গ মূল অষ্টম শতাব্দীর।

সম্রাট শো-মু এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। একে বলা হয় তেম্পিয়ো যুগের প্রতীক। এ মন্দির কেগন সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ মহামন্দির। এর অধীনে বহু মন্দির। উপদেশ দিতে তন্ময় মহাবুদ্ধ আমাদের চিরপরিচিত হয়েও অপরিচিত। চিরপরিচিত ভাব ভঙ্গী মুদ্রা আসন। অপরিচিত নাম। বৈরোচন বুদ্ধ। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম বুদ্ধদেবের নাম যেমন গৌতম বা সিদ্ধার্থ বা শাক্যসিংহ বা তথাগত তেমনি বৈরোচন। তা নয়। তা নয়। ইনি গৌতম বুদ্ধই নন। জাপানীরা তাঁকে বলে

শাক্যমুনি বুদ্ধ। ইনি বৈরোচন বুদ্ধ। অবতংসক ও ব্রহ্মজাল সূত্র পড়েছেন? আমি পড়িনি। তাতে নাকি লিখেছে বৈরোচন বুদ্ধের আসন সহস্রদল পদ্ম! প্রত্যেকটি পাপড়িতে লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড। প্রত্যেকটি ব্রহ্মাণ্ডে একটি করে শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমরা সেদিন একমাত্র বৈরোচনকেই দেখে বন্দনা করেছি, সন্ধান নিইনি সহস্রগুণিত লক্ষ কোটি শাক্যমুনির। আমরা যাঁকে দর্শন করলুম তাঁর কেশে ৯৬৬ সংখ্যক গ্রন্থি বা জট।

জাপানে না গেলে এ শিক্ষা আমার হতো না যে বুদ্ধ বলতে কেবল গৌতম বুদ্ধ বা তাঁর জন্মজন্মান্তর বোঝায় না। জাপানে ওরা শাক্যমুনিকে যেমন মানে তেমনি আরো কয়েকজন বুদ্ধকেও মানে। এঁরাও বুদ্ধ হয়েছেন বা হয়ে উঠছেন। আমরা মনে করি অমিতাভ বুঝি সিদ্ধার্থেরই অন্য এক নাম। উঁহু। সুখাবতীব্যূহ সূত্র পাঠ করেছেন? করেননি। আমিও করিনি। তাতে নাকি লিখেছে সেকালে এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম লোকেশ্বররাজ। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ধর্মাকর নাম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের সাক্ষাতে তিনি আটচল্লিশটি ব্রত নেন। ব্রতসিদ্ধির ফলে তিনিও বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তখন তাঁর আখ্যা হয় অমিতাভ। আর তাঁর লোক হয় সুখাবতী। পশ্চিম স্বর্গ। শুদ্ধ স্বর্গ। সদ্ধর্মপুণ্ডরীক নামক গ্রন্থেও নাকি তাঁর উল্লেখ আছে। মহাযান বৌদ্ধদের এমনি অনেক গ্রন্থ দেশান্তরিত হয়েছে, তাই কোথায় কী আছে তা বিদেশীয়রাই জানে। অমিতাভকে আবার বলে অমিতায়ু। যাঁর আয়ু অমিত। জাপানের লোক তাঁকেই চেনে বেশী। জাপানী অপভ্রংশ অমিদা।

মৈত্রেয় বুদ্ধের নাম আমরা সকলে শুনেছি। বুদ্ধ আবার আসবেন মৈত্রেয় রূপে, এ ধারণা কিন্তু ভুল। যিনি আসবেন তিনি বারাণসীর এক ব্রাহ্মণসন্তান, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে মৈত্রেয় নাম নিয়েছিলেন। তিনি এখন মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব রূপে তুষিত স্বর্গে বাস করছেন। শাক্যমুনির নির্বাণের পর পাঁচ শ' ছেষট্টি কোটি বছর অতীত হলে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব লাভ করে মর্ত্যে আবির্ভূত হবেন। এখন তো মাত্র আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং একটু দেরি হবে। বর্তমান কল্পের তিনি কিন্তু শেষ বুদ্ধ নন। তিনি সহস্রের মধ্যে পঞ্চম। প্রথম বুদ্ধের নাম ক্রকুচ্ছন্দ। দ্বিতীয়ের নাম কনকমুনি। তৃতীয়ের নাম কাশ্যপ। চতুর্থের নাম শাক্যমুনি। তা হলে দেখা যাচ্ছে চতুর্থ ও পঞ্চমের মাঝখানে পাঁচ শ' পঁয়ষট্টি কোটি নিরানব্বুই লক্ষ সাতানব্বুই হাজার পাঁচ শ' বছর ব্যবধান। জাপানীদের মধ্যে যাঁরা অমিতাভ বুদ্ধের উপাসক তাঁরা বলেন, শাক্যমুনি তো অতীতের বুদ্ধ আর মৈত্রেয় তো ভবিষ্যতের, বর্তমানকালের বুদ্ধ কে হবেন, কাকে আমরা ডাকব! অমিতাভকে। তিনিই বর্তমানকালের বুদ্ধ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা হয়তো বলবেন, কই, চতুর্থ ও পঞ্চমের মাঝখানে তো আর কোনো নাম নেই? থাকতেও তো পারে না? যাক, ওসব তর্ক আমাদের জন্যে নয়। আমরা জেনে আশ্চর্য হচ্ছি যে অমিতাভ বুদ্ধের উপাসনা ও বৈরোচন বুদ্ধের উপাসনা একদা ভারতেও প্রচলিত ছিল।

এই কি সব? না, আরো আছেন। ভৈষজ্যগুরুবৈদূর্যপ্রভাস। ইনিও একজন বুদ্ধ। অমিতাভ যেমন পশ্চিম স্বর্গের ইনি তেমনি পূর্ব জগতের। যে জগৎ বিশুদ্ধ মরকতের। অন্যান্য বুদ্ধের মতো এঁরও সেই একই প্রকার মূর্তি হয়। শুধু বামহস্তের করতলে থাকে একটি ভেষজ পাত্র বা মণি। এঁর পরেও আছেন বুদ্ধ প্রভূতরত্ন। সাধারণত ইনি শাক্যমুনির পাশাপাশি বসেন। স্বতন্ত্র উপাসনার রীতি নেই। চতুর্থ বুদ্ধ ও পঞ্চম বুদ্ধের মাঝখানে এতগুলি বুদ্ধের অস্তিত্ব যে জাপানের উদ্‌ভাবন নয় তা তো সংস্কৃত নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকেও নাকি বুদ্ধ প্রভূতরত্নের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষেই এঁরা ছিলেন। ইতিহাসে না কল্পনায় তা পণ্ডিতেরা বলবেন।

বৌদ্ধেরা দেবদেবীর উপাসনা করেন না। কিন্তু দেবদেবীরা বুদ্ধের উপাসনা করেন। সেইজন্যে বৌদ্ধ মন্দিরে দেবদেবীও দেখা যায়। তাঁরা প্রধানত ভারতীয়। তবে তাঁদের ডাক নাম জাপানী। হিন্দু

দেবদেবীর মধ্যে সব আগে নাম করতে হয় শক্রের। ইন্দ্রের। ইনি বাস করেন সুমেরুশিখরে। তেত্রিশ প্রাসাদের মধ্যে একটি এঁর। সেটি কেন্দ্রস্থলে। সুমেরুশিখর থেকে অর্ধেক পথ নেমে আসতে পথে পড়ে চার রাজার রাজবাড়ি। চার দিক্‌পাল। পূর্বে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূধক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ, উত্তরে বৈশ্রবণ। এঁদের মধ্যে বৈশ্রবণই শ্রেষ্ঠ। ইনি মাসের মধ্যে ছ'টি দিন লোকের ঘরে ঘরে গিয়ে সুখ বিতরণ করেন। এঁর পত্নীর নাম শ্রীমহাদেবী। জাপানী ডাকনাম কিচিজো-তেন।

তেমনি সূর্য, চন্দ্র, স্কন্দ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এঁরাও এক একটি দেব। মহেশ্বরের পুত্র গণপতিও। যমরাজকেও পাওয়া যাচ্ছে। আর দেবীদের মধ্যে সরস্বতীকেও। ইনিও বীণাবাদিনী। অভাবে কোতোবাদিনী। এঁর জাপানী নাম বেনজাই-তেন বা বেন-তেন। সরস্বতী নামক একটি হারিয়ে-যাওয়া নদীর ইনি দেবীরূপ। সেই কারণে এঁকে স্থাপন করা হয় সরসী বা সরোবর তটে। ইনি সাতজন সুখের দেবতার একজন। বাকী ছ'জনের মধ্যে আরো একজন ভারতীয়। আরেক বৈশ্রণ। তিনজন চীনা। দু'জন জাপানী।

সরস্বতী বেচারির স্বর্গে ঠাঁই হলো না, এ কি কম আফসোসের কথা! কিন্তু হবে কী করে! সুমেরু শিখরের চূড়ায় তো মাত্র তেত্রিশটি দেবতার জন্যে তেত্রিশটি প্রাসাদ! তাঁদের মধ্যমণি শক্র। তেত্রিশ কোটি নয়, লক্ষ নয়, হাজার নয়, শ' নয়। নিতান্তই তেত্রিশ। প্রাসাদগুলির আটটি পুবে, আটটি পশ্চিমে, আটটি উত্তরে, আটটি দক্ষিণে, একটি কেন্দ্রস্থলে। কেমন সুন্দর পরিকল্পনা! রাষ্ট্রপতিভবনকে ঘিরে যেমন মন্ত্রীভবন রাজ্যমন্ত্রীভবন উপমন্ত্রীভবন সচিবভবন। তার পর সুমেরুর ঠিক শিখরে নয় অর্ধশিখরে চার রাজার চার রাজবাড়ি। এঁরা যেন রাজ্যপাল। এঁদের অঞ্চলটাও স্বর্গের এলাকায় পড়ে। মর্ত্যের এলাকায় নয়। তা হলে এক সুমেরু পর্বতেই গোটা দুই স্বর্গ।

সুমেরুর চেয়ে আরো উঁচুতে আরো চারটি স্বর্গ। তাদের মধ্যে যেটি উচ্চতম সেটির একমাত্র অধিকারী কে, জানেন? বাজি রেখে বলতে পারি জানেন না। বোধিদ্রুমের তলায় সিদ্ধার্থকে যিনি পরীক্ষা করেছিলেন সেই যে মার তাঁকেই দেওয়া হয়েছে এই স্বর্গ। মার পাপীয়স। লীডার অফ দি অপোজিশন। উচ্চতম স্বর্গের অধিকারী হলে কী হবে, শেখ আবদুল্লার চেয়েও একা। নিজের সঙ্গে নিজেই রাজনীতির দাবা খেলুন বসে। চক্রান্তের জন্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি তাঁকে দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় উচ্চতম স্বর্গ। তাঁর নাম মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব। তাঁর স্বর্গের নাম তুষিত। তুষিত আর সুমেরুর মাঝখানে আরো দুটো স্বর্গ আছে। সবশুদ্ধ ছ'টি স্বর্গ আর একটি মর্ত্য এই সাতটি মিলে একটি ভুবন। তার নাম কামনার ভুবন। কাম ধাতু।

কামনার ভুবনের ঊর্ধ্বে রূপের ভুবন, রূপ ধাতু। রূপের ভুবনের ঊর্ধ্বে অরূপের ভুবন, অরূপ ধাতু। এক এক করে তিনটি ভুবন। কামনার ভুবনে যেমন ছ'টি স্বর্গ রূপের ভুবনে তেমনি আঠারোটি আর অরূপের ভুবনে চারটি। অরূপের চারটিতে কেউ বাস করেন না। রূপের আঠারোটিকে আবার চারটি ধ্যানলোকে বিভক্ত করা হয়েছে। উপরের দিকের এক ভাগের ছ'টি স্বর্গ। নিচের দিকের তিন ভাগে ন'টি স্বর্গ। এক এক ভাগে তিন তিনটি করে। নিচের দিক থেকে প্রথম ধ্যানলোকের প্রথম স্বর্গে ব্রহ্মা। চতুর্থ ধ্যানলোকের নবম স্বর্গে মহেশ্বর। অর্থাৎ ব্রহ্মা সকলের নিম্নে, মহেশ্বর সকলের ঊর্ধ্বে। তা হলে দাঁড়ায় এই যে মহেশ্বর হলেন মহত্তম ধ্যানী। তা হলেও রূপের ভুবনেই তাঁর স্থিতি। অরূপের ভুবনে নয়। আরো উপরে উঠতে হলে তাঁকেও আরো চার চারটে সিঁড়ি ভাঙতে হবে। নিরাকার সিঁড়ি। তারও উপরে ত্রিভুবনের উপরে স্বর্গমর্ত্যের উপরে কে? বুদ্ধ।

বোধিসত্ত্বরা বুদ্ধ নন। বুদ্ধ হওয়ার পথে। জাপানে মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের প্রভূত সম্মান। কিন্তু প্রভাব সব চেয়ে বেশী অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের। কান্নন নামে নারীরূপেই এঁর আরাধনা।

সাধারণের কাছে বুদ্ধ অনেক দূর আর কান্নন অনেক আপন। কান্ননের প্রতিমা কিন্তু বুদ্ধের মতো একই পদ্ধতির নয়। সহস্রভুজ সহস্রনেত্র অবলোকিতেশ্বর বা সেন্‌জু কান্নন যিনি তাঁর হাজারটি হাত বড় একটা দেখা যায় না, সচরাচর বিয়াল্লিশটি দিয়ে হাজারের কাজ সারতে হয়। হয়গ্রীব অবলোকিতেশ্বর বা মেজু কান্নন যিনি তাঁর মাথাটি ঘোড়ার মাথা কিংবা তাঁর মাথার উপরে ঘোড়ার মাথা। একাদশমুখ অবলোকিতেশ্বর বা জুচিমেন কান্ননের একাদশ আনন। তিনটি সামনে, তিনটি ডাইনে, তিনটি বাঁয়ে, একটি পিছনে, একটি মাথার উপরে। চিন্তামণি অবলোকিতেশ্বর বা নিয়োইরিন কান্নন ষড়্‌ভুজ। ডাইনে তিনটি, বাঁয়ে তিনটি। এঁর একটি মণি আছে। অমোঘপাশ অবলোকিতেশ্বর বা ফুকু কেন্‌জাকু কান্নন বোধিসাগর তীরে নৈশ্চিত্যের ছিপ দিয়ে দেবমানবের জন্যে মাছ ধরেন। এমনি আরো কয়েকটি রূপ আছে অবলোকিতেশ্বরের। নারীরূপ। লোকচক্ষে দেবীরূপ।

মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের নাম করেছি। আর একজনের নাম করতে হয়। ইনি ক্ষিতিগর্ভ। জাপানী নাম জিজো। আর সব বোধিসত্ত্বের কেশবেশ মুকুট অলঙ্কার রাজারাজড়ার মতো, আর এ বেচারার সাধুসন্ন্যাসীর মতো। মুণ্ডিত মস্তক। চীবর জড়িত অঙ্গ। জিজোরও নানা রূপ, রূপ অনুসারে নাম। এম্‌মেই জিজো দেন দীর্ঘ জীবন। আর কোয়াসু জিজো ছোট ছেলেদের নরক থেকে বাঁচান। হাঁ, নরকও আছে। স্বর্গ থাকবে, নরক থাকবে না? ছোট ছেলেরা পুণ্য কর্ম করে সদ্‌গতি লাভের আগেই যদি দুষ্টুমি করে মারা যায় তবে তো তাদের যেতে হয় ছোটদের নরকে। যার নাম সাই নো কাবারা। কী উপায়? উপায় কোয়াসু জিজোর আরাধনা। মা-ষষ্ঠীর মতো কোয়াসু জিজো ঘরে ঘরে বা গ্রামে গ্রামে।

নরকের প্রসঙ্গ উঠল। স্বর্গে যেমন দেবগণ মর্ত্যে যেমন মানবগণ পাতালে তেমনি যক্ষ রক্ষ প্রেত পিশাচ নাগ পূতনা কুষ্মাণ্ড। তা ছাড়া স্বর্গে মর্ত্যেও দেবমানব ভিন্ন আরো অনেক শ্রেণী আছে। তাদের মধ্যে গন্ধর্ব। সমুদ্রেও তেমনি দানো আছে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম জাপানে যাবার সময় ভারত থেকে এসব নিয়ে গেছে। পথে চীন থেকে কিছু কুড়িয়ে পেয়েছে। জাপানে পৌঁছে কিছু জুড়েছে। দেবতার চেয়ে অপদেবতার সংখ্যা আর গুরুত্ব কম নয় বললে কম করে বলা হয়। হারিতী নামে যে যক্ষিণী নিজের হাজারটি শিশুকে খাওয়ানোর জন্যে মানুষের শিশুদের হত্যা করে বেড়াত বুদ্ধের কাছে অনুতপ্ত হয়ে সেই হলো জাপানে গিয়ে কিশিমোজিন। তার মানে 'শয়তান মা দেবী।' শিশুদের সে বিপদ থেকে রক্ষা করে।

অষ্টম শতাব্দীর মহাযানবৌদ্ধ মন্দির পরিক্রমা করে অনেক রকম মূর্তি দেখা গেল। তাদের কতক আদি কালের, কতক পরবর্তী সংযোজন। দেবরাজ বলতে ওরা বোঝে দিক্‌পাল রাজা। মন্দিররক্ষী! এক জোড়া সিংহ দেখলুম। পাথরের সিংহ। সিংহকে নাকি আগেকার যুগে কুকুর বলে ভুল করা হয়েছিল।

মন্দির মেরামতির জন্যে এক জায়গায় দেখলুম টালি জড় করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে তার একটিতে নিজের নাম লেখা যায় তুলি দিয়ে। দান করতে হয় এক শ' ইয়েন। এক টাকা সাড়ে পাঁচ আনা। ভক্তরা নাম লিখে গেছেন নানান অক্ষরে। আমি লিখলুম বাংলায়। তার পর ইংরেজীতে। খুব সস্তায় নাম রেখে এলুম বলতে হবে। কেবল আমি নয়, আমরা।

তার পর তোদাইজি থেকে গেলুম কাসুগা পীঠস্থানে। শিন্তোরা মন্দির বলে না। প্রথমেই দেখি এক পাল হরিণ। এদের না খাইয়ে পীঠস্থানে প্রবেশ করলে পুণ্য হবে না। দিলুম কিনে বিস্কুট! নিজের হাতে খাওয়ালুম। চোখ দেখে এমন মায়া হয়। কিন্তু খিদে কি এদের কিছুতেই মিটবে? গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। আদর করি। কিন্তু খোরাক যেই ফুরোল অমনি চঞ্চল আর কারো কাছে।

এক ভদ্রমহিলা তো হরিণ নিয়ে ফোটো তোলালেন শকুন্তলার মতো। ভুল করে সামনে গিয়ে পড়লুম তো শুনিয়ে দিলেন দশ কথা বিশুদ্ধ ফরাসীতে। তাঁর হরিণটা সেই যে সরে গেল তার পর অরণ্যে রোদন।

ওদিকে কাসুগা পীঠস্থানের শিন্তোরাও দাবী করছে যে হরিণ হলো ওদেরই দেবতার বাহন। ওদের জনশ্রুতি হচ্ছে চার ধাম থেকে চার দেবতা এসেছিলেন কাসুগা পীঠে। এঁরা সব শিন্তো দেবতা। বৌদ্ধ দেবতার মতো স্বর্গবাসী নন। একজন থাকতেন কাশিমায়। একজন কাতোরিতে। দু'জন হিরাওকায়। বলা যেতে পারে গ্রামদেবতা। এঁরা এখন কাসুগায় বিরাজ করছেন। এঁদের মধ্যে সেই যিনি কাশিমা থেকে এসেছিলেন তাঁকে বহন করে এনেছিল একটি হরিণ। সেই থেকে কাসুগা হলো হরিণেরও আস্তানা।

শিন্তো পীঠের তোরণ দেখলেই চেনা যায়। ল্যাকারের কাজ। সিঁদুরে রং। ইংরেজী 'এইচ' লিখতে গিয়ে পেট না কেটে গলা কাটলে ও মাথায় বাংলা হরফের মতো লাইন টানলে যেমন দেখায় তেমনি দেখতে। আরো খুঁটিনাটি আছে। তোরণ পার হয়ে সুরম্য উপবন-পথে পদব্রজে চললুম আমরা। তার পর দখিন দুয়ার। নান-মন? দারুময় সিন্দূরবর্ণ জমকালো হর্ম্য। অভ্যন্তরে যাবার করিডোরের দু'ধারে ব্রঞ্জনির্মিত বহুতর লণ্ঠন। তা ছাড়া শিলালণ্ঠন তো সংখ্যায় আঠারো শ'। ভক্তদের দান। বছরে দু'বার জ্বালানো হয়। কতকটা তাঁবুর মতো দেখতে চারখানি অপূর্ব ঘর নিয়ে মূল পীঠ। ভিতরে যাইনি। সেদিকে যাবার আগে যেতে হলো যেখানে নাটশালা। শিন্তোরা দেবস্থানেও নাচে। সেটাও তাদের ধর্মের অঙ্গ। সেইখানে আমাদের বসতে দেওয়া হলো কাষ্ঠাসনে। পাখা হাতে নাচছিল লোহিতবর্ণ তলবসনের উপর শুক্ল বাস পরিহিত ভেস্টাল ভার্জিন। উৎসর্গ-করা কুমারী। তাদের সে নাচ তালে তালে। ফিরে ফিরে। মার্চ করে এগিয়ে যাওয়া পেছিয়ে আসার মতো কতকটা। পাখা ছেড়ে তারা ঝুমঝুমির মতো একরকম বাজনা হাতে নিল। তাতে একরাশ ঘণ্টি লাগানো। নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে চকিতের মতো বাজায়। বাজনা থামে। নাচ চলে! একে বলে কাগুরা নৃত্য! অবর্ণনীয় ভাবগর্ভ দেবনৃত্য বিনোদনের জন্যে নয়।

একই মানুষ একই সঙ্গে শিন্তো হতে পারে, বৌদ্ধ হতে পারে। একই পরিবারে শিন্তো আর বৌদ্ধ দুই আছে। তত্ত্বের দিক থেকে বিরোধ থাকতে পারে, কার্যত তেমন কোনো বিরোধ নেই। বেশ মিলেমিশে আছে শিন্তো আর বৌদ্ধ। বৌদ্ধ মন্দিরের যেমন লেখাজোখা নেই শিন্তো পীঠেরও তেমনি লেখাজোখা নেই! গাছতলাতেও শিন্তো পীঠ। প্রকৃতির সর্বত্র ছড়ানো। এঁদের সর্বপ্রধান দেবতা সূর্য। তিনি কিন্তু দেব নন, দেবী। তাঁরই বংশধর জাপানের সম্রাট। কাসুগা পাহাড় অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেবতাদের নিবাস বলে বিদিত। এখানকার পীঠস্থানের প্রতিষ্ঠা ৭৬৮ সালে। লণ্ঠনগুলির কতক চতুর্দশ শতাব্দীর। এর মতো প্রসিদ্ধ ও পুরাতন পীঠ জাপানে বেশী নেই। প্রখ্যাত ফুজিওয়ারা বংশের স্মৃতিবিজড়িত। ফুজি বা উইসটারিয়া পুষ্পসমাকীর্ণ।

কাসুগা পীঠ থেকে আমরা ফিরে চললুম নারা হোটেলে। নারা পার্কের ভিতর দিয়ে। দারুণ বৃষ্টি। সে বৃষ্টিতে বাস থামিয়ে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দেওয়া হলো বনস্থলীর হরিণদের। এরা কোন্ সুদূরে ছিল, দলে দলে দৌড়তে দৌড়তে এলো, বেড়া টপকাতে টপকাতে এলো। ছেলে বুড়ো মদ্দা মাদী। দেখতে দেখতে হরিণের জনতা। যতগুলি মানুষ নয় ততগুলি হরিণ। এই জনতাকে খাওয়াব কী! ধারে কাছে দোকান কোথায় যে কিনে খাওয়াব! সঙ্গেও তো কিছু আনিনি। বৃষ্টিতে নামতে স্পৃহা ছিল না। বসে রইলুম বাসে। লক্ষ্য করলুম নেমে গেলেন আঁদ্রে শাঁস। মাদাম শাঁস। ধন্য তাঁদের জীবে দয়া। কে একজন দয়ালু ফিরিওয়ালাও কেমন করে জুটে গেল। ইচ্ছা থাকলে উপায়ও থাকে। হরিণভোজনের জন্যে বিস্কুট মিলে গেলে। হরিণকে ভোজন করার জন্যে নয়। ভোজন

করানোর জন্যে। যেমন ব্রাহ্মণভোজন। এরা পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল কি না জানিনে, কিন্তু এদের পূর্বপুরুষ যে ভারতীয় ছিল এটা ধ্রুব। তাই বসে বসে আফসোস হচ্ছিল, পুণ্য করলেন আঁদ্রে শাঁসঁ। আর সুযোগ হাতছাড়া করলুম আমি।

নারা হোটেলে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন। এবার হরিণের নয়, মানুষের। পুণ্য করলেন নারার গভর্নর ও মেয়র। লেখকভোজন তো দিনের পর দিন দেখলুম, কিন্তু এর মতো কোনোটা নয়। তেনরিয়ুজিরটা সাত্ত্বিক। এটা রাজসিক। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। পেন কংগ্রেসের লেখকদের মধুরেণ সমাপয়েৎ করালেন নারার দুই প্রধান। ভোজসভায় ভাষণের প্লাবন হলো। না, আর কিছুর প্লাবন নয়।

নারা হোটেলেই খান কয়েক বই কিনেছিলুম আমি। তার একখানা কাওয়াবাতার 'তুষারভূমি'র ইংরেজী অনুবাদ। বাসে উঠে তাঁকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিলুম। আর দু'খানা উপহার দিলুম। কাকে কাকে বলব না। বিদায় আসন্ন। কিছু ভালো লাগছিল না। কিন্তু তখনো আমাদের দেখার বাকী এ যাত্রার বৃহত্তম বিস্ময়। হোরিয়ুজি। বাস চলল সপ্তম শতাব্দীতে। অতীত থেকে আরো অতীতে। আরো এক পা ভারতের দিকে।

॥ বারো ॥

অনেক বছর আগে এক ফরাসী পরিব্রাজক হোরিয়ুজি মন্দির দেখে অভিভূত হয়ে স্বগতোক্তি করেন, 'আমি কি তবে ভারতবর্ষে!'

তাঁর সেই স্বগতোক্তি আমারও। আমি কি তবে ভারতবর্ষে! ভারতবর্ষের সপ্তম শতাব্দীতে! এমনি সব মহাযানবৌদ্ধ মন্দির ছিল পালযুগের মগধে ও গৌড়ে। হর্ষবর্ধনের আর্যাবর্তে। অজন্তার অদূরে দক্ষিণাপথে। আজ তার ধ্বংসাবশেষ নেই। তবে তার মোটামুটি একটা ছাঁচ আছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গেলে যেমন দেখতে পাই প্রথমেই এক বিরাট সিংহদ্বার, চার দিকে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টনী, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিপুলায়তন পুরী, একটি মহামন্দিরকে ঘিরে বহুসংখ্যক মন্দির বা মণ্ডপ বা সৌধ, হোরিয়ুজিও কতকটা সেই ধরনের ব্যাপাব। তার চেয়েও প্রাচীন। তার চেয়েও সুন্দর। বনজঙ্গলের মাঝখানে অবস্থিত মায়াপুরী।

পুরীর মন্দির তো যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে, পরিবর্ধিত হয়েছে, কিন্তু হোরিয়ুজি সেই সপ্তম শতাব্দীতে যেমনটি ছিল তেমনিটি আছে, তার জীর্ণ সংস্কার হয়েছে, কিন্তু পরিবর্তন হয়নি। রূপকথার ঘুমন্ত পুরীর মতো যে যেখানে ছিল সে সেইখানে আছে। কালান্তরের ছাপ পড়েনি। মন্দিরের বিরাট চত্বর। চকবন্দী। চার দিকে বেড়ার মতো করিডোর। দোচালা। ঘেরা জায়গায় প্রায় চল্লিশটি বাড়িঘর। সারা পৃথিবীতে নাকি এত পুরোনো কাঠের বাড়ি নেই। বাড়িগুলি এলোমেলোভাবে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠেনি, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছবির মতো সাজিয়ে গড়া। সাম্রাজ্ঞী ছিলেন সুইকো। তাঁর হয়ে রাজ্য চালাতেন রাজকুমার শোতোকু। জাপানের ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ। তাঁরই আদেশে নির্মিত হয় হোরিয়ুজি। যার জন্যে হয়েছিল সেই সানরন সম্প্রদায় এখন অবলুপ্ত। হস্সো বলে অপর এক সম্প্রদায় এখন বাঘের ঘরে ঘোগ হয়ে বসেছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ভারতে তখনো গুপ্তযুগ শেষ হয়নি। কোরিয়া থেকে জাপানে প্রবেশ

করল বৌদ্ধধর্ম বা সদ্ধর্ম। প্রথম সত্তর বছর শিন্তো ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলির অবকাশ মেলেনি। যেই একটু দাঁড়াবার ঠাঁই মিলল অমনি আরম্ভ হলো সম্প্রদায়ভেদ। একে একে চীন থেকে আমদানি হলো সানরন, জোজিৎসু, হস্সো, কুশা, কেগন ও রিৎসু। জাপানের ইতিহাসে তখন আসুকা যুগ গিয়ে নারা যুগ আসছে। তাই এই ছয় সম্প্রদায়কে নারা সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা হয়। তা বলে এদের একের সঙ্গে অপরের মিল খুব বেশী নয়। এক একটির ঝোঁক এক একটি তত্ত্বের বা নীতির উপরে। কোনো কোনোটা থেরবাদী বা হীনযান মার্গের। বেশীর ভাগই মহাযান মার্গের। এখন আর থেরবাদী বলতে কেউ নেই। সানরনের মতো জোজিৎসু আর কুশা অদৃশ্য। হস্সো, কেগন ও রিৎসু এখনো অস্তিত্ব রক্ষা করছে, তবে তাদের চেয়ে প্রতাপ এখন পরবর্তী যুগের তেন্দাই, শিন্গন, জেন, জোদো আর নিচিরেন সম্প্রদায়ের। এদের প্রত্যেকেরই আবার একরাশ উপসম্প্রদায়। যার যার নিজের নিজের মন্দির, মঠ, পাঠশালা, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। এমন কি প্রচারকর্মের জন্যে সিনেমাবাহিনী। একেকটি মন্দিরের অধীনে একেক প্রস্থ উপমন্দির, তার অধীনেও তেমনি উপোপমন্দির।

জাপানে বৌদ্ধ মন্দির বলতে বোঝায় বেশ খানিকটা ঘেরা জায়গা। মাঝখানে বুদ্ধগৃহ। সেখানে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব ও দেবগণের মূর্তি। তার সঙ্গে সম্প্রদায় প্রবর্তকের বা সন্তগণের মূর্তি। যার যার নিজের সন্ত। ল্যাকারের পাত্রে সদ্ধর্মের সূত্র। ধূপধুনো। ঘণ্টি। তা ছাড়া সময় নির্দেশ করার জন্যে প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা। আলাদা ঘণ্টাঘর। ছাদ থেকে ঝুলন্ত সেই ঘণ্টার ওজন এত বেশী যে হাত দিয়ে তাকে নড়ানো যায় না। তা হলে সে বাজবে কী করে? আচ্ছা, ছাদ থেকে ঝুলতে থাকা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ঘণ্টার দিকে মুখ একটা কড়িকাঠের এক প্রান্ত ধরে জোরসে টেনে রাখুন। তার পর তাকে ছেড়ে দিন। ছাড়া পেয়ে সে লড়ুয়ে ষাঁড়ের মতো এগিয়ে গিয়ে ঘণ্টার গায়ে ঢুঁ মারবে এমন এক জায়গায় যেখানকার ধ্বনি সব চেয়ে গম্ভীর, সব চেয়ে বেশীক্ষণ অনুরণিত। এসব ঘণ্টার নির্মাণকৌশল নির্মাতারাই জানতেন। এক একটা ঘণ্টার বয়সের গাছপাথর নেই। ঘণ্টাঘর ছাড়া আরো অনেক রকম ঘরবাড়ি থাকে প্রত্যেক মন্দিরে। একটি তো প্যাগোডা। শুনেছি প্যাগোডা হচ্ছে স্তূপেরই বিবর্তন। স্তূপও থাকে। ভারতের মতো। কিন্তু আকারে ছোট। আর যা যা থাকে তার সংখ্যা মন্দিরভেদে কমবেশী। মন্দিরের অবস্থাভেদে। হোরিয়ুজি মন্দিরে যখন চল্লিশটি বাড়িঘর ও পূর্ব পশ্চিম দুই স্বতন্ত্র অঞ্চল তখন তার অবস্থা খুব ভালো বলতে হবে। হস্সো সম্প্রদায়ের হর্ষবর্ধন করবার মতো।

যেমন তোদাইজিতে তেমনি হোরিয়ুজিতে আমাদের অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছিলেন সাধুরা। হোরিয়ুজিতে শুধু অভ্যর্থনা নয়, সেইসঙ্গে আপ্যায়ন। জাপানী সবুজ চা! জাপানী পিঠে! খেয়ে আমাদের হর্ষ। খাইয়ে মোহন্ত মহারাজের হর্ষ। এর পর আমরা সহর্ষে ঘুরে দেখতে লাগলুম। কেউ ছত্র মাথায়। কেউ নাঙা শিরে! বৃষ্টিও আমাদের খাতিরে বিরাম নিয়েছিল। সিংদরজা নিজেই একটা দ্রষ্টব্য। জাপানে দ্বারকে বলে 'মন'। একেক দ্বারের একেক নাম। হোরিয়ুজির দক্ষিণ দ্বারের নাম নান্দাইমন। যেমন আকুতাগাওয়ার সেই বিখ্যাত কাহিনীর কুরোসাওয়া-কৃত ফিল্মের নাম 'রাশোমন'। সিংদরজা থেকে বুদ্ধগৃহ 'কন্দো' অভিমুখে চলেছি তো চলেছি। পথ আর ফুরোয় না। এত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। চলতে চলতে কাছাকাছি আঁদ্রে শাঁর্স আর আমি।

তিনি বললেন, 'খ্রীস্টান সহস্র তপস্যা করলেও খ্রীস্ট হতে পারে না, কিন্তু বৌদ্ধ একদিন না একদিন বুদ্ধ হতে পারে। ভগবানের পুত্রের সঙ্গে মানুষের তফাত কোনো দিন ঘুচবে না, যদিও মানুষমাত্রেই ভগবানের পুত্র। কিন্তু বুদ্ধের সঙ্গে মানুষের তেমন কোনো তফাত নেই।' স্মৃতি থেকে লিখছি। উক্তি না হোক যুক্তি।

হিউমানিস্টদের পক্ষে বুদ্ধকে গ্রহণ করা যত সহজ খ্রীস্টকে গ্রহণ করা তত সহজ নয়, কারণ মানবজাতির অনন্ত বিকাশের অসীম সম্ভাবনা মেনে নিলে প্রতি মানব বুদ্ধ হতে পারে, কিন্তু কোনো মানব খ্রীস্ট হতে পারে না। তা হলে বলতে হয় অনন্ত বিকাশ অনন্ত নয়, অসীম সম্ভাবনা অসীম নয়। হিউমানিস্টদের চক্ষে এটা স্বতোবিরুদ্ধ। তাই ইউরোপের মনীষীরা খ্রীস্টকে নিয়ে দোটানায় পড়েছেন। গ্রহণ করতেও বাধে, আবার বর্জন করতেও মন সরে না। দু'হাজার বছরের আত্মীয়তা। এই দোটানার ফাঁকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পশ্চিমের মনীষী মহলে ক্রমে বাড়ছে। বলা বাহুল্য সে ধর্ম ভারতের আদিবৌদ্ধ ধর্ম। যে ধর্ম সম্প্রদায়ভেদের পূর্বে ও উর্ধ্বে। হীনযান বা থেরবাদ নয়। মহাযান নয়। জাপানের মাটিতে পুনরায় রোপণের পরবর্তী শাখাপ্রশাখা নয়।

কন্দো নামক বুদ্ধগৃহে তখন দিব্যি ভিড়। বাইরে থেকে একদল ছাত্রছাত্রী এসেছে। ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে ঠেলাঠেলি করতে কেমন ভালো লাগে। কিন্তু ঠেলাঠেলি খেতে তেমন ভালো লাগে না। কিছুদূর চালিত হয়ে আবার পিছু হটলুম। অবশেষে ঢোকা গেল ভিতরে। মাঝখানে শাক্যমুনি বুদ্ধ! দু'পার্শ্বে দুই বোধিসত্ত্ব। ভৈষজ্যরাজ ও ভৈষজ্যসমুদ্গত। ব্রঞ্জ দিয়ে গড়া শাক্যত্রয়ী। রাজকুমার শোতোকু যখন রোগশয্যায় তখন নাকি তাঁর আরোগ্যের আশায় এই দুই ভীষক্ বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হয়। আর কোথাও নাকি এঁরা বুদ্ধের পার্শ্বচর নন। অন্যত্র তাঁর পার্শ্বরক্ষা করেন মঞ্জুশ্রী ও সমন্তভদ্র। মঞ্জুশ্রী আবার একা থাকবেন না। সঙ্গে থাকবে তাঁর বাহন। প্রজ্ঞার বাহন কিনা সিংহ। মঞ্জুশ্রী একালে আমাদের মেয়েদের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার দিনে ছিল পুরুষদের। তবে বোধিসত্ত্বরা যখন পুরুষও নন নারীও নন তখন একজনকে পুরুষ বলে দাবী করলে আরেকজনকে নারী বলে দাবী করাই ন্যায়সঙ্গত। তবে জাপানীরা একমাত্র অবলোকিতেশ্বরকেই নারী ভাবে।

ট্র্যাজেডী আর বলে কাকে! যে চিত্রসম্পদ তেরো শ' বছর ধরে ঝড় ভূমিকম্প আগুন এড়িয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরমাণু বোমাকেও এড়াতে পেরেছিল তারই অনেকাংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেল ১৯৪৯ সালে কেমন করে আগুন লেগে। একটি দিনে ধ্বংস হয়ে গেল তেরো শ' বছরের সঞ্চয়। সুখের বিষয়, সব ভস্ম হয়নি। তবে যা বেঁচেছে তাকে কোথায় যেন সরিয়ে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে আছে আমাদের অজন্তার অনুরূপ মুরাল চিত্র। সে সময় আমার খেয়াল হয়নি, হলে আমি আবদার ধরতুম আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখাতে। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে লিখেছে আমি পশ্চাদ্বুদ্ধি। পরে যখন মনে পড়ল তখন আমি নিরুপায়। প্রতিলিপি দেখে বোঝা যায় আঁকিয়েরা ছিলেন ভারতীয় কিংবা ভারতীয় ভাবাপন্ন। চিত্রার্পিতের মুখ চোখ চেহারা অবিকল ভারতীয়। জাপানের আর কোনোখানে এর দোসর নেই। এও যে আছে, সে আমাদের অশেষ ভাগ্য। আছে বলেই বুঝতে পারছি অজন্তার যুগ একটা অখণ্ড যুগ। দেশ যাকে খণ্ডিত করেনি। আধুনিক যুগের প্রবাহ যেমন ইউরোপে আরম্ভ হলেও ইউরোপেই আবদ্ধ নয় তেমনি অজন্তার যুগ ছিল ভারত থেকে শুরু করে এশিয়ার উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে প্রসারিত, কিন্তু পশ্চিমে সীমান্বিত। আমরা যারা শুধু ভারতের ইতিহাস পড়তে অভ্যস্ত তারা একটি সূত্রের একটি প্রান্তই দেখি। আর বলি বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে বাইরে চলে গেল। ভাবনাকে দেশকেন্দ্রিক না করে যুগকেন্দ্রিক করলে অন্য সিদ্ধান্ত সম্ভব। যুগটা কয়েক শতাব্দী ধরে এশিয়াময় ব্যাপ্ত ছিল। তারপর পশ্চিম এশিয়া হারালো, কিন্তু পূর্ব এশিয়া পেলো। পরে ভারতকেই হারালো, কিন্তু থেরবাদ বা হীনযান রূপে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এবং মহাযান রূপে উত্তরপূর্ব এশিয়ায় স্থিতিবান হলো। অন্তত কয়েক শতাব্দীর জন্যে ভারত তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া কোরিয়া জাপান একসূত্রে গ্রথিত ছিল। সে সূত্র মহাযান বৌদ্ধধর্মের 'সূত্র'। যথা, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র। অবতংসক সূত্র। গন্ধবিহূল সূত্র। সুবর্ণপ্রভাস সূত্র। সুখাবতীব্যূহ সূত্র। এমনি কতরকম সূত্র, ভারতে যার আর নামগন্ধ

নেই।

অজন্তা যখন দেখি তখন আমাদের মনে থাকে না যে এর পিছনে ছিল একটা জীবনদর্শন। যে দর্শন ঠিক থেরবাদী জীবনদর্শন নয়। কারণ অজন্তা ও মহাযান সমসাময়িক। মহাযানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধারণত দেবদেবী দেখে। শাস্ত্র পড়ে নয়। শিল্পের সঙ্গে শাস্ত্রের সম্পর্ক স্পষ্ট না হলেও অনস্বীকার্য। সেইজন্যে শাস্ত্রেরও খোঁজখবর নিতে হয়। এখন এই যে হোরিয়ুজি মন্দির এ হলো সানরন সম্প্রদায়ের কল্পনা। একে চিনতে হলে সানরন সম্প্রদায়ের বক্তব্য জানতে হয়। হোরিয়ুজি মন্দির আকারে সে কী বাণী শোনাতে চেয়েছিল? 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' বলে ডাক দিয়ে সে যা প্রকাশ করতে চেয়েছিল তার মর্ম নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন। 'সানরন' কথাটির অর্থ হলো 'তিন শাস্ত্র'। তিনখানির প্রথমখানির নাম মাধ্যমিক শাস্ত্র। দ্বিতীয়খানির নাম শতশাস্ত্র। দু'খানিই নাগার্জুনের রচনা। তৃতীয়খানির নাম দ্বাদশনিকায়শাস্ত্র। শাস্ত্রকারের নাম দেব। সম্ভবত নাগার্জুনের এক শিষ্য। সানরন সম্প্রদায়ের আদিগ্রন্থ বলতে বোঝায় এই তিনখানি সংস্কৃত পুঁথি। নাগার্জুনের শিক্ষাদানের অবলম্বন ছিল প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থমালা। তার সংক্ষিপ্তসার হলো প্রজ্ঞাপারমিতা-হৃদয়সূত্র আজও সুদূর প্রাচ্যের সহস্রাধিক বিহারে বা বৌদ্ধমঠে প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র প্রত্যহ আবৃত্তি করা হয়। একদা ভারতেরও সহস্রাধিক বিহারে মহাযান বৌদ্ধদের এই সর্বস্বীকৃত সূত্র নিত্য আবৃত্তি করা হতো। এর সার কথা রূপমাত্রেই অসার। এ উপলব্ধি যার হয়েছে তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ ভিত্তির উপর আচার্য নাগার্জুন যে বিশেষ তত্ত্বটিকে স্থাপন করেছিলেন সেই মাধ্যমিক এখন আর কোনো এক সম্প্রদায়ের জীবনদর্শন নয়। সানরন আর নেই।

নাগার্জুনের মতো অত বড় দার্শনিক বৌদ্ধ জগতে আর হননি। ভারতেও খুব কম হয়েছেন? তাঁর মাধ্যমিক দর্শনে তিনি এক এক করে যাবতীয় বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। নেই। নেই। নেই। কোনো কিছুই নেই। তার পর নেইকেও তিনি অস্বীকার করলেন। অস্তিত্বের মতো অনস্তিত্বকেও অস্বীকার করে যেখানে গিয়ে তিনি শেষে দাঁড়ালেন তারই নাম মধ্যপন্থা। জন্ম নেই। জন্মের বিপরীত হলো মৃত্যু। মৃত্যুও নেই। স্থিতি নেই। স্থিতির বিপরীত হলো বিনাশ। বিনাশও নেই। এক নেই। একের বিপরীত হলো বহু। বহুও নেই। আগমন নেই। আগমনের বিপরীত হলো গমন। গমনও নেই। এই যে একেক জোড়া 'নেই' এরই মাঝখানে আছে রিয়ালিটি। মাঝখানের এই রিয়ালিটিই মাধ্যমিক। নাগার্জুনকে আমরা ভুলে গেছি। তাঁর মতবাদ আমাদের অজানা। তাই শূন্য বলতে আমরা ভাবি অনস্তিত্ব। তা নয়। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যার্থীরা সমবেত হয়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে শিক্ষা পেয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে ও এমনি যতসব তত্ত্ব বয়ে নিয়ে গেছে।

কালক্রমে সানরন সম্প্রদায়ের বিলুপ্তির পরে হোরিয়ুজি যাদের হাতে পড়ে সেই হস্‌সো সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক শাস্ত্রের সারসংগ্রহ হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি শাস্ত্র। হস্‌সো কথাটি এসেছে 'যোগ' বা 'যোগাচার্য' থেকে। 'যোগাচার্যে'র অপর নাম 'ধর্মলক্ষণ'। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু এর প্রতিষ্ঠাতা। হস্‌সো সম্প্রদায়ের মতে কামধাতু বা কামনার জগৎ, রূপধাতু বা রূপের জগৎ, অরূপধাতু বা অরূপের জগৎ, এই তিনটি জগতেরই অস্তিত্ব কেবল চিন্তায়। চিন্তার বাইরে ত্রিজগতের অস্তিত্ব নেই। সাত রকম চিন্তা আছে। তাদের সকলের গোড়ায় অষ্টম এক চিন্তা। বিশুদ্ধ আর আদিম। একে বলে আলয়বিজ্ঞান। স্বচ্ছ পর্দার উপর ছায়াপাত করে এই অষ্টম চিন্তা। আর সেই যে ছায়ার মায়া যার আদৌ কোনো অস্তিত্ব নেই তাই হলো রূপ, বর্ণ, ধ্বনি, আইডিয়া, হৃদয়াবেগ।

সানরন, হস্‌সো, কুশা (সর্বাস্তিবাদী), জোজিৎসু (সত্যসিদ্ধি), রিৎসু (বিনয়) ও কেগন

(অবতংসক) সম্প্রদায় যে কালে জাপানে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব সংস্কৃত পুঁথির সাহায্যে ব্যাখ্যান করে সে কালে ভারতেও বৌদ্ধযুগ সহর্ষে বিদ্যমান। হর্ষবর্ধনের যুগ। তা হলে বৌদ্ধধর্ম কোন্ দুঃখে দেশান্তরী হবে! এ-দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ও-দেশে গেল এ ধারণা তথ্যের সঙ্গে মেলে না। এ-দেশ থেকে মিশন নিয়ে ও-দেশে গেল এই বরং সত্য। তার পরে আরো চার পাঁচ শতাব্দী কাটে। তীর্থঙ্কররা আসছে, যাচ্ছে স্মারক নিয়ে। মিশনারীরা যাচ্ছে পুঁথি নিয়ে। কেউ গান্ধার ও খাসগড়ের পথে। কেউ নেপাল ও তিব্বতের পথে। কেউ শ্যাম ও চীনের পথে। কেউ মালয় ঘুরে সমুদ্রপথে। সদ্ধর্ম যদি ভারতে তার পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে থাকে তবে তার কারণ এ নয় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাকে বেদখল করেছে। অথবা আত্মসাৎ করেছে। জাপানে তার মহিমা দেখে এই কথাই মনে হয় যে এশিয়ার উপর দিয়ে একটা প্লাবন বয়ে গেছে এক প্রান্ত থেকে আর সব প্রান্তে। মূলপ্রান্তে নিঃশেষ হয়েছে।

রাজকুমার শোতোকুর নাম কেবল হোরিয়ুজি মন্দিরে নয়, জাপানের ইতিহাসে চিরস্থায়ী। তাঁর মৃত্যুর শত খানেক বছর পরে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে হোরিয়ুজি প্রাঙ্গণেই একটি অষ্টকোণ ভবন রচিত হয়। তাকে বলে য়ুমেদোনো বা স্বপ্নপুরী। এমন সুন্দর বাড়ি নাকি সারা জাপান মুলুকে নেই। পরিক্রমা করলুম আমি একা। কখন এক সময় চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। আমার দল চলে গেছে আমাকে ফেলে। দৌড়। দৌড়। অবশেষে দেখা মিলল কয়েক জনের। করিডোর দিয়ে চলেছেন মন্দিরের অপর অঞ্চলে। যেখানে কান্নন বোধিসত্ত্বের প্রতিমা। উমাশঙ্কর বলেন করুণাদেবী। ওটা পাশ্চাত্য বর্ণনার সংস্কৃত অনুবাদ। আসলে ইনি আমাদের অবলোকিতেশ্বর। কিন্তু মুখ চোখ চেহারা ভারতীয় ধাঁচের নয়। মনে হলো আবার আমি জাপানে। কিন্তু অজন্তার যুগের জাপানে। না, জাপানে নয়। কোরিয়ায়। এই কান্নন মূর্তিকে বলে কুদারা কান্নন। কুদারা ছিল কোরিয়ার অন্তর্গত একটি রাজ্য। বৌদ্ধধর্ম জাপানে আসে কুদারা হয়ে। ৫৩৮ সালে।

এটি দারুমূর্তি। এমনি শ'তিনেক 'জাতীয় সম্পদ' সুরক্ষিত হয়েছে হোরিয়ুজি মন্দিরে। একবার চোখ বুলিয়ে যেতেও সময় লাগে। আমাদের ওই জিনিসটিরই অভাব। দুয়ারে প্রস্তুত যান, বেলা ত্রিপ্রহর। সময় থাকলে পার্শ্ববর্তী চুগুজি কন্‌ভেণ্টে গিয়ে দেখে আসা যেত নিয়োইরিন কান্নন মূর্তি। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্যে প্রখ্যাত। নিয়োইরিন কান্নন হলেন চিন্তামণি অবলোকিতেশ্বর। কিন্তু পণ্ডিতরা বলছেন মূর্তিটি তাঁর নয়, মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের। এত কাল লোকে জানত, এখনো বলে, নিয়োইরিন কান্ননের। যাক, নামটা যাঁরই হোক প্রশংসাটা পৌঁছচ্ছে ঠিক জায়গায়। ভাস্করের পরলোকগত আত্মার সকাশে। যদি আত্মা থাকে।

এর পর আমরা নারা ফিরে চললুম। আবার সেই নারা হোটেল। সেখান থেকে বাস চলল কিয়োতো। এবার আমি মিনিট গুনতে লাগলুম। আর একটু পরে আসবে কিয়োতো স্টেশন। সেখানে নেমে যাবেন সোফিয়াদি, আয়েঙ্গার, জম্বুনাথন, গোকক। ইচ্ছা করছিল ওঁদের সঙ্গে আমিও নেমে যাই। ওঁদের তুলে দিই তোকিয়োর ট্রেনে। কিন্তু ওদিকে যে আমার হোটেলে গাড়ি পাঠাবেন মার্কিন অধ্যাপক তথা বৌদ্ধ সাধু আইডম্যান। তা ছাড়া আবার পড়ছিল বৃষ্টি। মুষলধারায়। বাস থেকে নামতে চায় কে? যার ট্রেন সে। অন্যমনস্ক ছিলুম। কখন এক সময় দেখি বন্ধুরা উঠে বিদায় নিচ্ছেন। হাতে হাত রাখলুম। বললুম, 'কে জানত এমন অকস্মাৎ ছাড়াছাড়ি হবে!' বাস দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ছেড়ে দিল। ফরাসীরা সবাই নেমে গেছেন। অন্যদেশীরা অনেকেই। বাস প্রায় খালি। পাশে কমলাবোন। তিনি যাবেন পরের দিন সকালে। ওসাকা। চার দিন পরে তোকিয়ো হয়ে আকাশপথে ভারতে। দেশের জন্যে তাঁর মন কেমন করছে। আর আমার মন কেমন করছে আমার ম্যানেজারি ঘুচে গেল বলে। দশটা দিনের ম্যানেজারি।

আইডম্যান নিজে এসে নিয়ে গেলেন আমাকে তাঁর বাড়ি। বাড়িটি নিশি-হোঙ্গানজি মন্দিরের শামিল। মন্দির বলতে জাপানে সাধুদের বাসস্থানও বোঝায়। আর সাধু বলতে বোঝায় গৃহস্থ। আইডম্যান বিবাহ করতে পারতেন। জোদো-শিন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শিনরান স্বয়ং বিবাহ করেছিলেন। এঁদের সম্প্রদায়ে মাছ মাংস বারণ নয়। এঁরা অমিতাভবুদ্ধের উপাসক।

জাপানী ধরনে সাজানো ঘর। ঘরের মেজে তাতামি মাদুর দিয়ে মোড়া। চেয়ার টেবিল নেই। আসবাবের মধ্যে একটা জলচৌকির মতো ছোট নিচু চতুষ্পদ। তার একধারে বসলেন আইডম্যান। একধারে আমি। সামনাসামনি দু'জনে বসে গল্প করা চলল। প্রৌঢ়া পরিচারিকা এসে জাপানী মতে চা পরিবেশন করে গেল। তার পরে এলো জাপানী সাপার। চপ স্টিক দিয়ে খাওয়া। পাশে বসে খেলা করছিল আইডম্যানের জাপানী পোষ্যপুত্র। ছেলেটির বাপ মা হিরোশিমায় পরমাণুবোমার মার খেয়ে মারা যান। আইডম্যান তাকে মানুষ করেছেন জাপানী প্রথায়। তার জন্যে নিজে জাপানী বনেছেন কিন্তু তাকে মার্কিন বানাননি। বছর দশেক বয়স।

আলাপ আলোচনা যখন আর একটু অন্তরঙ্গ স্তরে পৌঁছল তখন আইডম্যান বললেন তাঁকে তাঁর ছেলের খাতিরেই জাপান ছাড়তে হবে। তাকে তিনি যেভাবে মানুষ করতে চান সেভাবে আর সম্ভব নয় এ রাজ্যে। অথচ তাকে আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে মার্কিন সভ্যতার ছাঁচে ঢালাই করতেও তাঁর অনিচ্ছা। তাই তিনি ভাবছেন তাকে নিয়ে ভারতে আসার কথা। হিন্দী ও বাংলা দুই ভাষার খবর তিনি রাখেন। পরে তাঁর বাড়িতে একখানা বৌদ্ধ গ্রন্থ দেখেছিলুম। বাংলা ভাষায় লেখা, বাংলা হরফে ছাপা। ছেলেটির শিক্ষাদীক্ষা ভারতীয় ভাষায় হবে।

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম তাঁকে, 'আচ্ছা, গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানীদের মধ্যে এমন কোনো বৌদ্ধ কি ছিলেন যিনি যুদ্ধবিরোধী, যিনি যুদ্ধপ্রতিরোধী?'

এর উত্তরে তিনি যা বললেন তা আমার কানে সুধা বর্ষণ করল। সারা জাপানের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সম্প্রদায়ের গ্রামবাসী চাষীরা মিলিটারিস্টদের হুকুমের অবাধ্য হয়। তাদের বলা হয় বাদশাহী ফার্মান বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখতে ও মানতে। রাজার জন্যে লড়তে হবে, দেশের জন্যে মরতে হবে ইত্যাদি অনুজ্ঞা ও উপদেশ। আর সবাই মাথা পেতে ঘরে নিয়ে গেল। নিল না কেবল জোদো-শিন সম্প্রদায়ের প্রজারা। প্রত্যেকে বলল, 'মুই একটা বোকা হাঁদা মুরুক্ষু মনিষ্যি। মোর একটা সামান্যি কুঁড়েঘর। সেখানে থাকবেন বাদশাহী ফার্মান! ওরে বাপ রে বাপরে বাপ! পড়বে কেটা। যদি পুড়ে যান তবে মোর পরাণডা যাবে। ওই যে শিন্তো ভাইদের পীঠস্থান আছে। ওইখানে থাকুন। আমরা পেন্নাম করে আসব। হুজুর মা বাপ। মুই রাখতে নারব।' মিলিটারিস্টরা হদ্দ হলেন তর্ক করে, কিন্তু বেটারা একদম অবুঝ। অথচ অসম্ভব নম্র।

বাইরের লোকের ধারণা জাপানীরা জাতকে জাত মিলিটারিস্ট। সামরিকতার প্রতিবাদ করতে তাদের দেশে একজনও নেই। এ ধারণা সত্য হলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরিণামকে তাদের স্বখাতসলিল বলে পরমাণুবোমার ব্যবহারকেও অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। আইডম্যানের কাছে যা শোনা গেল তা একটিমাত্র সম্প্রদায়ের নিচের তলার মনোভাব। এ মনোভাব কি সেই একখানেই নিবদ্ধ? না। পরে আমার জ্ঞান আরো বাড়ল। দেখলুম জাপানে সামরিকতা যেমন ছিল তেমনি তার প্রতিবাদও যে না ছিল তা নয়। জাপানের বিবেক রণতন্ত্রের দ্বারা অভিভূত হয়নি। তবে এ কথাও ঠিক যে সত্তর বছরব্যাপী অপ্রতিহত সামরিক সাফল্য তার অবিবেকীদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

পরের দিন প্রাতরাশ খেতে গিয়ে দেখি হোটেল প্রায় ফাঁকা। কুরাতুলাইন হায়দর তখনো ছিলেন। আমাদের টেবিলেই বসলেন। তিনি ও কমলাবোন দু'জনেই সুন্দর ছবি আঁকেন। তাঁরা

তাঁদের ছবি আঁকা প্লেট পেয়ে খুশি। আর আমি আমার মেয়ের নাম লেখা প্লেট না পেয়ে নিরাশ। তার পর আমরা যে যার ঘরে গিয়ে তৈরি হতে লাগলুম। অনেকেই যাচ্ছেন ওসাকা। সেখান থেকে কেউ কেউ যাবেন হিরোশিমা। আমিও যেতে পারতুম। গেলুম না। ওসাকা অন্য একদিন যাব। হিরোশিমা কেন যাব তার কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। পরমাণুবোমা যখন পড়েছিল তখন হয়তো যাওয়া উচিত ছিল মানুষের প্রতি মানুষের আপৎ কর্তব্য করতে। এক যুগ কেটে গেছে। তেমন কোনো কর্তব্য নেই। অপর পক্ষে আরো তো কত দ্রষ্টব্য আছে। আর্টিস্টের দ্রষ্টব্য।

দেখতে দেখতে বিবলি এসে পড়ল। আমার জিনিসপত্র গোছানোর দায় নিল। কেউ একজন সে দায় না নিলে আমি একেবারে অসহায়। কোট কী করে ভাঁজ করতে হয়, শার্ট কী করে পাট করতে হয়, সুটকেসে কী করে আঁটাতে হয়, এসব বিদ্যা তো আমি কবে ভুলে গেছি। খাটপালং আলমারি সব আমার কাছে সমান। আমি সমদর্শী। টাই কলার গেঞ্জি মোজা সর্বত্র ছড়ানো। আর জাপানীরা তো আমাকে উপহার দিতে মুক্তহস্ত। সেসব না হয় টেবিলে স্তূপাকার করে রাখলুম, কিন্তু বয়ে নিয়ে যাব কী করে। ওদিকে অধ্যাপক কিয়োশুন তোদো মহাশয় এসে বসে আছেন। তাঁকে তো অন্তহীন কাল অপেক্ষা করতে বলা যায় না। তাই মালপত্তর অগোছালো বা আধগোছালোভাবে কতক সুটকেসে কতক ব্যাগে কতক ঝোলায় কতক পোঁটলায় কতক বগলে ও হাতে করে নিয়ে গিয়ে চাপিয়ে দেওয়া গেল ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল তোদো মহাশয়ের বাড়ি। এ বাড়িটিও একটি বৌদ্ধমন্দিরের শামিল। বিবলি এখানে থেকে লেখাপড়া করে। তোদোগৃহিণী আমাকে স্বাগত জানাতে না জানাতেই লটবহর তাঁর হেফাজতে দিয়ে আমরা ট্যাক্সি নিয়ে উধাও। স্টেশনে গিয়ে কোনো মতে টিকিট কেটে দৌড়তে দৌড়তে লাফ দিয়ে উঠলুম ছাড়ন্ত ট্রেনে।

॥ তেরো ॥

নারা। নারা। গুনগুনিয়ে উঠল রেলের লোকটি আমাদের কামরার মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে। কামরাটা লম্বা। মাঝখানে করিডোর। এসব লোকাল ট্রেনে আরাম করে বসার আয়োজন নেই। দূরের পাল্লা তো নয়।

নেমে আমরা ট্যাক্সি করলুম। তোদো বললেন, জোদাইজি। আগের দিন যেখানে মহাবুদ্ধ দেখে এসেছি। নারার প্রধানতম আকর্ষণ। এবার আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা গেল। ইনি গৌতমবুদ্ধ নন, বৈরোচনবুদ্ধ। যিনি সূর্যের মতো সর্বত্র জ্যোতি বিকীরণ করছেন। বৈরোচন অর্থ সাবিত্র, সৌর। পৌরাণিক বিরোচনপুত্র নয়। কেগন সম্প্রদায় বৈরোচনবুদ্ধের উপাসক। শিন্‌গন সম্প্রদায় মহাবৈরোচনবুদ্ধের উপাসক। মহাবৈরোচনের মূর্তি বৈরোচনের মতোই মোটামুটি, কিন্তু কেশবিন্যাস চিনিয়ে দেয় কে বৈরোচন, কে মহাবৈরোচন। মহাবৈরোচনের মাথায় বোধিসত্ত্বদের মতো মুকুট থাকে, কেশও গৃহস্থসুলভ। আর বৈরোচনের চুল জটা-জটা। তিনি সন্ন্যাসী।

কেগন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম। বয়স বেশী। প্রভাব আরো বেশী। বিশেষ করে যে তত্ত্বের উপর এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা তার সার নিহিত রয়েছে অবতংসক সূত্রে। কারো কারো মতে এটি একটি প্রেমের কবিতা। নিখিল বিশ্বের প্রতি বুদ্ধের প্রেম। অবতংসক সূত্রের জাপানী নাম

কেগনকিয়ো। তার থেকে কেগন সম্প্রদায়। অর্থাৎ অবতংসক সম্প্রদায়। এঁদের বিশ্বাস বুদ্ধের চিন্তা আপনাকে প্রতিফলিত করছে পুনরাবৃত্ত করছে সীমাহীনভাবে নিরবধিকাল সর্বজগতে ও সর্বজীবে। এমন কি ধূলিকণার মধ্যেও। সমগ্রের প্রতিফলন প্রত্যেকটি পরমাণুতে আর প্রত্যেকটি পরমাণুর প্রতিফলন সমগ্রে। এক একটি ধূলিকণাও এক একটি জগৎ। এক একটি জগতে এক একটি বুদ্ধ। সে বুদ্ধ অতীতে ও বর্তমানে ও ভবিষ্যতে প্রজ্ঞা বিকীরণ করেছেন, করছেন ও করতে থাকবেন। সে বুদ্ধের প্রত্যেকটি চিন্তাই সমগ্র সত্য। একই চিন্তাই একই কালের চিন্তা করছেন সব ক'জন বুদ্ধ। সে চিন্তা যে বস্তুর উপরেই পড়ে বুদ্ধ সেই বস্তুতেই প্রতিবিম্বিত হন। বিশ্বময় বুদ্ধের আলোকবিম্ব। কোনোখানে এমন একটিও বস্তুকণা নেই যাতে বুদ্ধের কল্যাণকর্মের প্রকাশ নেই। বলা বাহুল্য এ বুদ্ধ ইতিহাসের পুরুষ নন, শাক্যমুনি বুদ্ধ নন, ইনি বৈরোচন, ইনি কেবলমাত্র জ্যোতি, ইনি শুদ্ধসত্ত্ব।

ধারণাটি এত বিশাল যে একে ব্যক্ত করতে হলে এমনি বিশাল বিগ্রহের পরিকল্পনা করতে হয়। কে জানে হয়তো ভারতেও একদা এর অনুরূপ মহাবুদ্ধ বিগ্রহ নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে বা পুঁথি ঘেঁটে তার প্রমাণ মেলেনি। অথচ বহু সহস্র ক্রোশ দূরে জাপানে রয়েছে ভারতীয় ধারণার পরিপূর্ণ রূপায়ণ। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি। জাপানীরা তখনো কত দূর সভ্য ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য।

সহস্রদল পদ্মের চার দিক পরিক্রমা করলুম। এক একটি দল দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় বিপুল। কে একজন নাকি অঙ্ক কষে হিসাব করে বলেছেন যে এই বুদ্ধবিগ্রহ যদি জীবন্ত হয়ে নারা থেকে তোকিয়ো পদযাত্রা করতেন তা হলে সেখানে পৌঁছতে তাঁর সময় লাগত সাত ঘণ্টা। অর্থাৎ তিনি এক্সপ্রেস ট্রেনকেও হার মানাতেন।

এই মূর্তি ঐতিহাসিক বুদ্ধের না হলেও ঐতিহাসিক বুদ্ধই এর মডেল। এ যেন বলতে চায় মানুষ সাধনা করলে কত বড় হতে পারে। আকারে আয়তনে নয়। সেটা প্রতীক। আত্মায়। অন্তঃকরণে। বৌদ্ধদের বুদ্ধ ভগবান নন, বিষ্ণু নন, বিষ্ণুর অবতার নন। হিন্দুরাই তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বলে আপনার করে নিতে গেছেন। উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তাতে করে বুদ্ধকে বড় করা হয়নি, মানুষকে বড় করা হয়নি। বড় করা হয়েছে দেবতাকে। বৌদ্ধরা কিন্তু কোনো দেবতাকেই বুদ্ধের চেয়ে বড় বলে স্বীকার করবে না। আর বুদ্ধ যেহেতু তুমি আমি হতে পারি সেহেতু ব্রহ্মাবিষ্ণুকেও তোমার আমার চেয়ে—তোমার আমার বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে—বড় বলে স্বীকার করবে না। বিষ্ণুর অবতার বললে বোঝায় বিষ্ণুই আগে, তাঁর পরে তাঁর অবতার, বিষ্ণুই বড়, তাঁর চেয়ে ছোট তাঁর অবতার। বৌদ্ধরা বলবে বুদ্ধই আগে, বুদ্ধই বড়। সুতরাং ওই যে অবতারের তালিকায় বুদ্ধকে স্থান দিয়ে সমন্বয় ঘটানোর সাধু অভিপ্রায় ওটা ব্যর্থ হয়েছে ও হবে। অতিবড় নির্বোধ না হলে কেউ বলতে পারে না যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অঙ্গ। সহ-অবস্থান আর শামিল হওয়া কি এক? হিন্দু বৌদ্ধের বিভেদ আজো অমীমাংসিত। ঝগড়া নেই, কিন্তু বোঝাপড়াও নেই।

বেলা হয়ে গেছল। তোদাইজির সংলগ্ন শোসোইন ভবনে যেতেই মধ্যাহ্নভোজন জুটে গেল। অধ্যক্ষ আমাদের আপ্যায়িত করে ভিতরে নিয়ে দেখালেন পুঁথিপত্র প্রাচীন সম্পদ। সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়ে থাকার এহেন নিদর্শন জাপানে দূরের কথা এশিয়াতে নেই। এমন সব পুঁথি আছে এখানে, যার মূল হারিয়ে গেছে চীন থেকে, ভারত থেকে। অধ্যক্ষ আমাকে দেখালেন গন্ধবিহুল সূত্র। নাম শুনিনি কখনো। চীনা ভাবচিত্রে লেখা কতক অংশ পড়ে শোনালেন। হাজার বছরের পুরোনো। আর একখানা পুঁথি দেখালেন, সেটাও হাতে লেখা। কিন্তু কোন্ ভাষার জানিনে। তিনিও ঠিক বলতে পারলেন না। মনে হলো মঙ্গোলিয়া কি খাসগড় কি সেইরকম কোনো

জায়গার হবে। রঙিন ছবি ছিল তাতে। ভারতীয় বর্ণমালার অপভ্রংশ বলে অনুমান হলো। ভারত এককালে সারা এশিয়ায় ব্যাপ্ত হয়েছিল। একটি মধুর সৌরভের মতো। কেমন করে হারালো সে তার সুগন্ধ। তার মৈত্রীসাধনা। তার অহিংসা। তার প্রেম। রইল যা তা বাইরের লোক সাদরে বরণ করে নিল না। নেবার মতো হলে তো নেবে। ভারত হলো বৃহত্তর ভারত থেকেও বিচ্ছিন্ন। ভরা নদী হলো মরা গাঙ। কিন্তু তার দু'কূল ছাপানো জল তখন থেকে রক্ষিত হয়ে এসেছে শোসোইন ভবনে।

অষ্টম শতাব্দীতে তৈরি এই বাড়িটি নিজেই একটি দেখবার জিনিস। জানালা নেই, খুঁটি নেই, মাটির দেয়াল নেই। তিনকোণা কাঠের তক্তা একটার উপর একটা চাপিয়ে সমস্তটা গড়ে তোলা হয়েছে। একটাও পেরেক লাগেনি। মেজে মাটি থেকে ন'ফুট উঁচুতে। আশ্চর্য এই যে আগুন কী জানি কেন আজ পর্যন্ত এর গায়ে জিভ বুলিয়ে দেয়নি। ভারতের বিদ্বজ্জনের কাছে আমার নিবেদন, কোনদিন কী ঘটে বলা যায় না, কাঠ যখন কাঠ আর আগুন যখন আগুন তখন বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে সময় থাকতে ভারতীয় পুঁথিপত্রের মাইক্রোফিল্ম আনিয়ে রাখা। আর ওই যে হোরিয়ুজি মন্দিরের অজন্তাসদৃশ চিত্রাবলী তারও প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়ে ভারতবর্ষে রক্ষা করা উচিত। এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি, নয়তো পরে বলতে ভুলে যাব, রবীন্দ্রনাথের চিরভক্ত মাদাম তোমি কোরা জাপান থেকে ফোটোগ্রাফার পাঠিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর চিত্রাবলীর ও আচার্য নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা প্রাচীরচিত্রের রঙিন ফোটো তোলাতে উদ্‌গ্রীব। তাঁর ধারণা এখন না তোলালে পরে হারিয়ে যেতে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যতদূর জানি জাপানীরা নিজেদের খরচে এসব করবেন। কেন? সৌন্দর্য যে দেশেই সৃষ্ট হোক না কেন সারা বিশ্বের সম্পদ।

এর পর তোদো মহাশয় আমাদের নিয়ে গেলেন ঘণ্টাঘরে। ঘণ্টা তো নয়, মহাঘণ্টা। মহারাজাধিরাজের মতো মহাঘণ্টাধিঘণ্টা। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি। ব্রঞ্জনির্মিত। এত পুরাতন ঘণ্টা তামাম জাপানে নেই। বারো শ' বছর ধরে এ ঘণ্টা সমানে বেজে এসেছে প্রার্থনার সময় জানাতে। অবিকল একই ধ্বনিতে। উচ্চতা সাড়ে তেরো ফুট। ব্যাস ন' ফুট এক ইঞ্চি। ওজন আটচল্লিশ টন। এ হেন ঘণ্টা বাজাবে কে? আমি একবার ঘণ্টাপেটা ঝুলন্ত কড়িকাঠটাকে জোরসে টেনে ছেড়ে দিলুম। ঘণ্টার গায়ে হাতুড়ির মতো ঠক করে লাগল। কিন্তু আনাড়ির চাঁটি খেয়ে খোলের বোল খুলল না। আরেক জন মারলেন। আর অমনি আওয়াজ হলো গুম্‌ম্‌ম্...ম্...ম্...ম্। অনেকক্ষণ চলল তার অনুরণন। ঘণ্টা নড়ল না, চড়ল না, স্থির থাকল। আর তার বোল চলল কে জানে কত দূর অবধি। তখন আমি প্রাণপণে কড়িটাকে টেনে য়্যায়সা পিটুনি দিলুম যে ঘণ্টা এবার সুর ছাড়ল ওঁ...ম্...ম্...ম্।

দু-দু'বার মেরেছি। এক একবারের জন্যে মাশুল লাগবে দশ ইয়েন করে। বিশ ইয়েন বের করে ধরে দিতেই ঘণ্টাবতী বললেন, আপনার কাছ থেকে কিছু নেব না। এই বলে কী হাসি! কিনতে হলো একটা খেলনা ঘণ্টা। সেই ঘণ্টারই বামন অবতার। লাটিমের মতো সেটাকে ঘোরাতে হয়। তা হলেই সে ঘুর ঘুর করে আর ভোমরার মতো ভোঁওওওও করে। ঘোরাতে কি আমি জানি! আমাকে শেখাতে হলো হাতেখড়ির মতো। ফী বার আমি হারি আর হাসি যোগাই। হাসি যোগানোর দরুন আমার পাওনা বিশ ইয়েন। দেনাপাওনা শোধবোধ হয়ে গেল।

অদূরে পাইন বন। তার কোলে কাইদানইন দেউল। নিভৃত নির্জন স্থান। কী আছে এখানে দেখবার? বুদ্ধমূর্তির চেয়ে দর্শনযোগ্য চার দেবরাজ মূর্তি। সেই যাঁদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢক, বিরূপাক্ষ, বৈশ্রবণ। এঁদের কাজ হলো চার দিকে দাঁড়িয়ে চার দিক পাহারা দেওয়া। এঁরা বুদ্ধের দেহরক্ষী। দেহরক্ষীরা দুর্ধর্ষ ও করাল হয়েই থাকে। যে মন্দিরেই যাই সে মন্দিরেই এঁদের দেখি।

কী ভয়াবহ মুখচোখ। দেখলেই আশঙ্কা হয় মারবে নাকি! তা বলে এঁরা লোক মন্দ নন। পরম ধার্মিক এবং বিজ্ঞ। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি।

আরো কিছু দূর হাঁটতে হলো। এর নাম সংগৎসু-দো। তৃতীয় চাঁদের মন্দির। চাঁদের মানে কি চান্দ্রমাসের? জাপানে আগে চান্দ্রগণনা ছিল। নারা নগরীর প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অন্যতম এটি। আগুন এর গায়ে আঁচড়টি দেয়নি। এখানকার অধিষ্ঠাত্রী ফুকু কেন্‌জাকু কান্নন। সংস্কৃত নাম অমোঘপাশ অবলোকিতেশ্বর। বোধিপয়োধি তীরে নিশ্চিতির ছিপ দিয়ে ধরেন মানুষদের ও দেবতাদের। এই বিগ্রহের পদতলে পদ্ম। ইনি তার উপর দণ্ডায়মান। পশ্চাতে ডিম্বাকার আভামণ্ডল। দুটি হাত জোড় করেছেন। আরো চারটি হাতে কী সব ধারণ করেছেন। অষ্টম শতাব্দীর কীর্তি। শুষ্ক ল্যাকারের কাজ।

কান্ননের দুই পাশে নিক্কো আর গাক্কো। চন্দ্রকিরণ আর সূর্যকিরণ। জোড় হাতে দাঁড়িয়ে আছেন দুই সুন্দর পুরুষ। চন্দ্রকিরণই সুন্দরতর। আশেপাশে আরো কয়েকটি মূর্তি।

চন্দ্রকিরণ ও সূর্যকিরণ মৃন্ময়। অন্যগুলি শুষ্ক ল্যাকারের। সমস্ত অষ্টম শতাব্দীর। জাতীয় সম্পদ বলে চিহ্নিত হয়ে জাপান সরকারের দ্বারা সুরক্ষিত। নারা যুগের সভ্যতা কত ঊর্ধ্বে উঠেছিল তার সাক্ষী। চীন ও ভারতের সংস্পর্শে এসে সহসা পুষ্পিত হয়েছিল জাপানের দেহলতা। নারা-যুগ অষ্টম শতাব্দীতে আরম্ভ হয়ে অষ্টম শতাব্দীতেই শেষ হয়। কিছু কম এক শ' বছর তার আয়ুষ্কাল। তার পরে বৌদ্ধ যুগ থাকে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভা ক্ষীণ হয়ে আসে। ভারতের বাইরে এই যে ছোট এক টুকরো ভারত জাপান একে আজো ভুলতে পারেনি।

নারা! নারা! সায়োনারা! আবার উঠে বসলুম ট্যাক্সিতে।

আর কত দূরে নিয়ে যাবেন মোরে, হে তোদো-সান! তোদো বললেন, তেনরি। সে কোন্ ঠাঁই? নারা থেকে বেশ কিছু দূরে নতুন এক ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে। বৌদ্ধ নয়, শিন্তো নয়, খ্রীস্টান নয়, অথচ তিন ধর্মেরই 'অবদান' নিয়ে চতুর্থ এক ধর্ম। তার নাম তেনরি-কিয়ো। পণ্ডিতদের মতে এটা শিন্তো ধর্মেরই অন্যতম সম্প্রদায়, যেমন হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু তেনরিতে পৌঁছে প্রশ্ন করে উত্তর পেলুম, 'না, সম্প্রদায় নয়, স্বতন্ত্র একটা ধর্ম।' এক কালে শোনা যেত কেশবচন্দ্রের নববিধানও তাই। তেনরিকিয়োর ইংরেজী হচ্ছে 'Heavenly vision.'

ভগবানকে কেউ পিতারূপে কল্পনা করে, কেউ মাতারূপে। কিন্তু তেনরির এঁরা বলেন ভগবান মা-বাপ। ইংরেজীতে 'God the Parent.' জাপানের এক সংকৃষককন্যা মিকি নাকায়ামা যখন একচল্লিশ বছর বয়সের মাঝামাঝি পৌঁছন তখন ১৮৩৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'God the Parent took Her as His living Temple.' তাঁর পরমায়ু নির্দিষ্ট হয়েছিল এক শ' পনেরো বছর। কিন্তু সেটাকে তিনি স্বেচ্ছায় পঁচিশ বছর কমিয়ে এনে নব্বুই বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর আত্মা জীবিত রয়েছে তাঁর আদিনিবাসে। এই তেনরিতেই। ঘরটি আমাদের দেখানো হলো, বাইরে থেকে। লোকে সেখানে তাঁকে ভোগ দিয়ে যায়। এই স্থানটিতে একদা মানবজাতির উদ্ভব হয়েছিল। সুতরাং এটি মানবজাতিরও আদিনিবাস। এই পবিত্র স্থানটিকে জাপানী ভাষায় বলা হয় তেনরি-ও-নো-মিকোতো। ভগবান-মা-বাপকে প্রার্থনা করার সময় ডাকতে হয় তেনরি-ও-নো-মিকোতো।

তেনরিকিয়োর কেন্দ্রীয় উপাসনালয় একটি প্রাসাদ বললেও চলে। এর মহলের পর মহল। একটি বৃহৎ হলঘরে সকলে জমায়েত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসেন ও বুকের উপর হাত রেখে কী সব গুনগুনিয়ে বলেন। তার পর হাত চিত করে কী যেন ছড়িয়ে ফেলে দেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন, 'ভক্তরা বলছেন, মিকি নাকায়ামা, তুমি আমাদের পাপতাপের ময়লা ধুলো

ঝাঁট দিয়ে সাফ কর। আমাদের পবিত্র কর।' এঁদের মতে পাপতাপ হচ্ছে ময়লা ধুলো। কুভাবনাও তাই। প্রতিদিন ঝাঁট দিয়ে সাফ না করলে জমতে জমতে আঁস্তাকুড় হবে। তাতে শরীরমন উভয়ের অসুখ। মলিন ধুলো সাফ করলে মানুষ সুখী হয়। ভগবানের বাৎসল্য স্নেহ তাকে সর্বদা ঘিরে রয়েছে। তিনি তো তাকে সুখী দেখতেই চান। প্রতিদিন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে, তাঁর জন্যে করতে হবে ভক্তিমূলক কাজ। পরোপকার। পরদুঃখ মোচন। সেবাকর্ম। কায়িক শ্রম। আমরা স্বচক্ষে দেখলুম ভক্তরা সত্যি সত্যি ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, ময়লা সাফ করছেন। ঝি-চাকরের কাজ, মেথরের কাজ। বিনোবাজী যাকে বলছেন শ্রমদান তাই দিয়ে তৈরি হয়েছে এত বড় কাঠের দালান। সমস্তটা চকচক করছে।

শ্রমদানটা জেন বৌদ্ধদেরও আইডিয়া। তেমনি নৃত্যগীত হচ্ছে শিন্তো ধর্মের অঙ্গ। দেখলুম নাচের জন্যে চমৎকার মেজে। তেনরির এঁরাও মাঝে মাঝে নৃত্যোৎসব করেন। ওটা এঁদের ধর্মেরও শামিল। এই ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য নরনারীর সাম্য। তা তো ভগবানকে মা-বাপ বলার মধ্যেই উহ্য রয়েছে। মেয়েদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা এঁরা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। গাইড মেয়েটি বলল, 'আমিও একদিন আচার্য হতে পারি।' দেশে বিদেশে তেনরিকিয়োর প্রায় বারো হাজার উপাসনাগার। তার মধ্যে সাড়ে পাঁচ শ' বিদেশে। আমেরিকায় এঁদের এক মস্ত আড্ডা। মেয়েটি আমেরিকায় জন্মেছে, মানুষ হয়েছে। ইংরেজী বলে, পোশাক পরে মার্কিন মেয়েদের মতো।

বলতে ভুলে গেছি, যাঁরা প্রার্থনা করছিলেন তাঁরা থেকে থেকে আচমকা একবার কি দু'বার করতালি দিচ্ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, করতালি কেন? উত্তর পেলুম, যাঁকে তাঁরা ডাকছেন তিনি শুনছেন কি না কে জানে! তাই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। তখন আমার মনে পড়ে গেল কাবুকি রঙ্গমঞ্চে দর্শকের বা শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে কাঠের করতাল! আর এ হলো হাতের করতাল। তেনরিকিয়োর উপাসনালয় সারাদিন সারা রাত খোলা থাকে। যার যখন প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হয় সে গিয়ে মনের মলিনতা ঝাঁট দিয়ে সাফ হয়ে আসতে পারে।

বেড়াতে বেড়াতে আমরা গেলুম তেনরিকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দেখতে। চমৎকার ব্যবস্থা। পুস্তক সংগ্রহও কয়েক লাখ। তার মধ্যে ভারতীয় বিষয়েও বই আছে। কিন্তু যার জন্যে আমাদের সব চেয়ে আগ্রহ তা হচ্ছে নেপোলিয়নের আমলের মিশরের বিবরণ! চিত্রবিচিত্র। বহুখণ্ড। বৃহৎ। ফরাসী পণ্ডিতদের জ্ঞানপিপাসা প্রাচীন ও আধুনিক মিশরের সর্বপ্রকার তত্ত্ব আহরণ করে লিপিবদ্ধ করেছে। কেন? কোনো প্রাকটিকাল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে? না। তেমন কোনো কাজ হাসিল করার জন্যে নয়। মানুষকে জানবার জন্যে। জগৎসংসারকে জানবার জন্যে। নইলে আপনাকেও জানা যায় না। বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানে তেনরিকিয়োরও উৎসাহ আছে।

দুষ্প্রাপ্য ভৌগোলিক মানচিত্র দেখতে দেখতে দর্শন লাভ ঘটল তেনরিকিয়োর ধর্মগুরু তথা সর্বাধ্যক্ষের। তাঁকে ইংরেজীতে বলা হয় প্যাট্রিয়ার্ক। মিকি নাকায়ামার সাক্ষাৎ বংশধর শোজেন নাকায়ামা। সুশিক্ষিত সুমার্জিত পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে সজ্জিত আধুনিক রুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক। গোঁফদাড়ি কামানো। আমাদেরি মতো ছাঁটা চুল। প্যাট্রিয়ার্ক বললে যে চেহারা মনে জাগে সে চেহারা নয়। এঁর তুলনা খুঁজতে হলে বাহাইদের কাছে যেতে হয়। তেনরিকিয়োর উচ্চাভিলাষ বাহাই ধর্মের মতো দিগ্‌বিজয়ের। পশ্চিমকে ও আধুনিককে স্বীকার করে জয় করার। দীক্ষিত করার। নানান পাশ্চাত্য ভাষা শেখানো হয় এদের মিশনারীদের। এঁরা বিশ্বাস করেন যে ইহকালেই ও ইহলোকেই মানুষ দেহমনের অসুখ কাটিয়ে উঠে সর্বতোভাবে সুখী হতে পারে। কিন্তু স্বার্থত্যাগ না করে পরকে সুখী না করে নিজে সুখী হওয়া যায় না। তাই ঝোঁকটা সর্বসেবার উপরে। এঁরা হাসপাতাল, যক্ষ্মানিবাস ইত্যাদিও চালান। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়।

এমন হালফিল নতুন ধর্ম জাপানে এই একটি নয়। শুনলুম হাজার কি বারো শ' নতুন ধর্ম উদয় হয়েছে। যুদ্ধে বিগ্রহে আঘাতে অভাবে রোগে শোকে মানুষ আকুল হয়ে সান্ত্বনা খুঁজছে। তাই তাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে এই সব ধর্ম। বেশীর ভাগই শিন্তোভিত্তিক, বৌদ্ধপ্রভাবিত, খ্রীস্টানুসারী। আগেকার দিনের জাপান সরকার বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ব্যতীত আর সব ধর্মকেই শিন্তো ধর্মের সম্প্রদায় বলে রেজিস্ট্রি করতেন, নয়তো প্রচার বন্ধ করে দিতেন। তাই শিন্তো ধর্মের এক-একটি সম্প্রদায় বলে পরিচয় দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল তেনরিকিয়ো প্রভৃতি অভিনব ধর্ম। এখনকার জাপান সেক্যুলার স্টেট। হাজার নয়া ধর্ম প্রবর্তন করলেও রাষ্ট্রের আপত্তি নেই।

'হিন্দু' এই নামটি যেমন মুসলমানদের দেওয়া 'শিন্তো' এই নামটিও তেমনি বৌদ্ধদের দেওয়া। অন্যের দেওয়া নামকে আপন করে নিয়ে গর্ব বোধ করা দেখছি আমাদের একচেটে নয়। শিন্তো কথাটার অর্থ দেবতাদের ধারা। দেবযান। দেবমার্গ। দেবতারা না থাকলেও বৌদ্ধধর্ম থাকে। কিন্তু দেবতারা না থাকলে শিন্তো ধর্ম থাকে না। শিন্তোদের দেবতারা খাঁটি স্বদেশী দেবদেবী। ভিন দেশের সঙ্গে তাঁদের ঠিক মেলে না। তাঁদের দেবতা বলাটাও ঠিক নয়। তাঁরা হলেন 'কামি' অর্থাৎ 'উপরওয়ালা'। অতি প্রাচীনকালে প্রাণী-অপ্রাণী-নির্বিশেষে যে-কোনো পদার্থকে 'কামি' বলা হতো, সে যদি হতো উপরিতন, রহস্যময়, ভয়ঙ্কর, প্রবল বা অবোধগম্য। কামিরাই পূর্বপুরুষ। অথবা পূর্বপুরুষরাই কামি। তাঁরা মৃত হলেও জীবিত। এই যেমন মিকি নাকায়ামা।

'কোজিকি' নামে একটি পুরাণ ও 'নিহোঙ্গি' নামে একটি মহাভারতজাতীয় মহাজাপান এই দুটি আদি গ্রন্থে শিন্তো ধর্মের তত্ত্ব নিহিত। প্রলয় থেকে সৃষ্টি যখন হয় তখন ছিলেন তিন দেবদেবী। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁর নাম ছিল আমে-নো-মিনাকানুশী। আর দু'জনের মধ্যে যিনি পুংশক্তি তাঁর নাম তাকামি মুসুবি। আর যিনি স্ত্রীশক্তি তাঁর নাম কামি মুসুবি। এঁরা চীনদেশী বলে ক্রমেই শিন্তো পার্বণ থেকে অপসৃত হন। তাঁদের পরে যাঁরা তাঁদের স্থান নেন তাঁদেরও অপসরণ ঘটে। অবশেষে দেখা দেন ইজানাগি ও ইজানামি। নিমন্ত্রক ও নিমন্ত্রিকা। মর্ত্যলোক এঁদেরই প্রজনন। এঁরাই জন্ম দেন বাতাসকে, জলকে, কুয়াশাকে, খাদ্যকে, পর্বতকে, আর সব প্রপঞ্চকে। জনকজননীর মতো ওরাও দেবতা হয়ে গেল। সকলের পরে জন্মালেন সূর্যদেবী আমাতেরাসু ওমিকামি, চন্দ্রদেব ৎসুকি-য়োমি এবং সাহসী দ্রুতগামী ঝড়ের মতো বীর তাকেহায়া-সুসানোবো। সূর্যদেবীর রাজ্য হলো স্বর্গ আর মর্ত্য। চন্দ্রদেবের রাজ্য হলো রাত্রি। আর বলীর রাজ্য হলো পাতাল। এই তিনজন প্রধান। এ ছাড়া অসংখ্য দেবদেবী।

ধীরে ধীরে সূর্যদেবীই হন একচ্ছত্র দেবতা। তাঁরই বংশধর জাপানের সম্রাট! জাপানীরা সবাই তাঁরই বংশ। শিন্তোদের চোখে সূর্যদেবীর চেয়ে বড় দেবতা নেই। সম্রাটের চেয়ে বড় মানব নেই। মানব হলেও তিনি দেবতাবিশেষ। আর কোনো মানুষ তেমন নয়। তারপর জাপানীরা জাতকে-জাত দেব অংশে জন্মেছে। আর কোনো জাত তেমন নয়। এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি সূর্যদেবীর একচ্ছত্র রাজত্ব। স্বর্গে তথা মর্ত্যে। সূর্যদেবী যদি কোনো দিন নিতান্তই একটি জড়পদার্থে পর্যবসিত হন তা হলে শিন্তো ধর্মের মূল স্তম্ভ ভেঙে পড়বে। অথবা যদি বিজ্ঞানের বিচারে হেরিডিটি তার মহিমা হারায় তা হলেও শিন্তো ধর্মের তাসের কেল্লা ধসে পড়বে। যেমন পড়েছে বর্ণাশ্রমীদের তাসের দেশ। তার পরেও শিন্তো ধর্ম থাকবে, কারণ তার চিরন্তন মূল্য যাবার নয়। তার জন্যে আরো গভীরে যেতে হয়।

জাপানে এসে আমি প্রথমে পড়েছিলুম পেন কংগ্রেসের লেখকদের হাতে। তার পরে পড়ি বৌদ্ধদের হাতে। শিন্তোদের হাতে পড়তে পাইনি। পড়লে হয়তো বলতে পারতুম শিন্তো ধর্মের চিরন্তন মর্মবাণী কী। তেনরিকিয়ো যদি শিন্তো ধর্মের সংস্কৃত রূপ হয়ে থাকে তবে এক কথায়

বলতে পারি, আনন্দময় জীবন। নাচ গান পালপার্বণ শিন্তোদের মতো বৌদ্ধদের নেই, খ্রীস্টানদের নেই, আছে বোধ হয় শুধু হিন্দুদের। শুনেছি জাপানীরা মৃত্যুর সময় বৌদ্ধদের ডাকে। আর জন্মের সময় বিবাহের সময় অন্যান্য সংস্কারের সময় ডাকে শিন্তোদের। শিন্তো আর বৌদ্ধ মিলে জীবনমরণ ভাগ করে নিয়েছে। হাজার বছর ধরে সমন্বয়ের চেষ্টাও চলেছে। শিন্তো দেবদেবীরা নাকি বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব। সূর্যদেবী আর বুদ্ধ নাকি এক ও অভিন্ন।

তেনরিকিয়োর অতিথিশালায় রাজার হালে রাত কাটিয়ে রাত থাকতে উপাসনায় যোগ দিয়ে পরের দিন কিয়োতো ফিরতে বলা হয়েছিল আমাকে। রাজী হয়ে গেলে পারতুম। কিন্তু আমার প্রাণে ভয় জাপানী স্নানাগারকে। ওই যে ওরা একসঙ্গে একই চৌবাচ্চায় দিগম্বর হয়ে নামে। আছে হয়তো এর মধ্যে একটা কমিউনিয়নের বা সাযুজ্যের ভাব, কিন্তু আমার যে গা ঘিন ঘিন করে। বলি, লণ্ডনে কি সাত দিন অন্তর এই কর্মটি তুমি করনি? তফাতের মধ্যে ওটা ছিল বড় আকারের সুইমিং বাথ। আর এটা হলো ছোট মাপের বাথ। গায়ে গা ঠেকে যায় না ওতে। ঠেকে যাবেই এতে। তবে আগে থেকে বলে রাখলে ওরা আলাদা স্নানের ব্যবস্থা করে দেয়। জাপানীরা গরম জলে স্নান করতে অভ্যস্ত। জল গরম করতে বেশ খরচ পড়ে। প্রত্যেকে যদি জেদ ধরে যে আলাদা গরম জলে স্নান করবে তা হলে গৃহস্থ ফতুর হবে। আমরা বিদেশী বলেই আমাদের আবদার সহ্য করতে হয়। গরম জলের কুণ্ডে দেহনিমজ্জনের পূর্বেই ওরা বাইরে বসে ঠাণ্ডা জলে সাবান দিয়ে গাত্রমার্জনা করে নেয়। তার মানে স্নানের পর অবগাহনের জন্যেই জাপানী বাথ। আমি ভুল বুঝেছিলুম। ঠিক বুঝলুম অধ্যাপক তোদোর অতিথি হয়ে।

সন্ধ্যার ট্রেনে আমরা কিয়োতো ফিরি ও সটান তোদো মহাশয়ের বাড়ি যাই। তাঁর গৃহিণী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বারান্দায় পা দেবার আগে উঠোনে জুতো খুলে রাখলুম। পায়ে দিলুম কাপড়ের চটি, এ চটিও বদলাতে হয়, যখন শৌচাগারে যেতে হয়। তখন খড়ের চটি। মাদুর দিয়ে মেজে মোড়া প্রত্যেকটি ঘরের। কাগজের দেয়াল। সরন্ত দরজা। সামান্য আসবাব। খাট নেই, মেজের উপর পুরু বিছানা পেতে শুতে হয়। সে বিছানা আসে দেয়ালের পিছনের ফাঁক থেকে। ফাঁপা দেয়াল। একখানি বড় ঘর বা হল-ঘর দেখলুম। বন্ধ ঘর। বেদীতে বুদ্ধ অমিতাভ। সামনে সকলের জমায়েত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসবার জায়গা। তোদো-সান প্রণাম করলেন। তিনি শুধু অধ্যাপক নন, তিনি পুরোহিত। পাশ্চাত্য পোশাক ছেড়ে কিমোনো পরে এসে উপাসনায় বসলেন। ভারতের বুদ্ধ। জাপানের বৌদ্ধ।

॥ চোদ্দ ॥

পরের দিন বেলা করে ঘুম ভাঙল। ঘুমের ঘোরে কানে বাজছিল ঠক ঠক ঠক ঠক আওয়াজ। তার সঙ্গে মন্ত্রের মতো ধ্বনি। ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।

আমি কোথায়? হোটেলে? ও কি টেলিফোন বাজছে? আমার ঘুমভাঙানী দিদি আমাকে জাগাচ্ছেন? না। তা তো নয়। আমি শুয়ে আছি ঢালা বিছানায়। জাপানী ধরনের কক্ষে। তোদো মহাশয়ের গৃহে। এখানে টেলিফোন নেই। তা হলে কী আছে?

একটু একটু করে ঠাহর হলো বুদ্ধঘরে প্রাতঃকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়ে গেছে। যন্ত্রের ঝঙ্কার

নয়। ছন্দোবদ্ধ ওঙ্কার। শয্যা ছেড়ে উঠলুম। যুকাতা আর ওবি খুলে রেখেছিলুম। আবার জড়ালুম ও বাঁধলুম। পুরুষদের ওবি বন্ধন নীবিবন্ধন নয়। ভুঁড়ি বন্ধন। বোধ হয় ভুঁড়ির বহর বাড়তে না দিতে। মেয়েদের ওবি বন্ধনও নীবিববন্ধন নয়। ওঁরা বাঁধেন বুকের নিচে। বোধ হয় সুমধ্যমা হতে। উদ্বৃত্ত অংশ পিঠে পাট করে পোঁটলার মতো বয়ে বেড়ান।

সরন্ত কপাট ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখি তোদো মহাশয় অগ্রণী হয়ে বুদ্ধবেদীর সম্মুখে বসেছেন। দূরত্ব রক্ষা করে তাঁর পশ্চাতে এসে বসলেন একে একে তাঁর গৃহিণী, তাঁর পুত্রকন্যা, তাঁর অসুস্থা বৃদ্ধা জননী। সকলেই বজ্রাসন। সকলেই যুক্তকর। তোদো মহাশয় গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন, 'নমু অমিদা বুৎসু! নমু অমিদা বুৎসু। নমু। নমু। নমু। নমু।' নমো অমিতাভ বুদ্ধ। নমো অমিতাভ বুদ্ধ। নমো। নমো। নমো। নমো।

ওই যে তিনটি শব্দ 'নমু অমিদা বুৎসু' ওকে বলা হয় নেম্‌বুৎসু। আমাদের যেমন হরিনাম। যেমন 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।' হরিনাম করলে যেমন নারায়ণের অধিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠধামে গতি তেমনি নেম্‌বুৎসু উচ্চারণ করলে অমিতাভ বুদ্ধের অধিষ্ঠিত পশ্চিমস্বর্গে গতি।

সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা চাই। শিন্তোদের মতো হাতে হাত চাপড়িয়ে দু'বার কি তিন বার করতালি বাজালে চলবে না। একটি ছোট দণ্ড হাতে নিয়ে ঠক ঠক ঠক ঠক করে সমস্তক্ষণ তালে তালে আঘাত করতে হবে যার উপর সেটা কাঠের তৈরি একটা নাকড়া-জাতীয় বাদ্য। তার নাম মোকুগিয়ো। গাছ মাছ। গাছের সঙ্গে মাছের কী সম্পর্ক? বোধ হয় কুণ্ডলী-পাকানো মাছের সঙ্গে গাছের অর্থাৎ কাঠের গঠনসাদৃশ্য।

আর সেই দণ্ডটিকে বলে বাই। তোদো মহাশয় বাই দিয়ে মোকুগিয়োকে তালে তালে আঘাত করছিলেন এক হাতে। আর মুখে উচ্চারণ করছিলেন নেম্‌বুৎসু। আগে মনোযোগ আকর্ষণ। পরে মন্ত্রোচ্চারণ বা নামকীর্তন। আমরা যেমন খোল বাজাতে বাজাতে হরিনাম করি। আর যাঁরা সে ঘরে ছিলেন তাঁরা নির্বাক নিষ্ক্রিয়। বোধ হয় মনে মনে জপ করছিলেন আমার মতো। আমারও ইচ্ছা করছিল তাঁদের পিছনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে। বুদ্ধের দেশের ছেলে আমি। আমারি তো সকলের চেয়ে বেশী কর্তব্য। কিন্তু সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। চোখে মুখে জল দিইনি। শুচি হইনি। গেলুম শুচি হতে। ফিরে এসে দেখি উপাসনা সাঙ্গ। উপাসকরা অদৃশ্য। মনে একটা খেদ রয়ে গেল।

তোদোসানের ওকুসান (গৃহিণী) এসে বিছানা তুলে লুকিয়ে রাখলেন ডবল দেয়ালের মাঝখানকার ফোকরে। মেজের উপর আর কোনো আসবাব থাকবে না, থাকবে শুধু একটি নিচু টেবিল। আমাদের জলচৌকির মতো নিচু, কিন্তু আকারে আরো বড়। তারই উপর বই রেখে পড়াশোনা, কাগজ রেখে লেখাপড়া, ছবি আঁকা। খাবার রেখে খাওয়া। শোবার ঘরই হয়ে যায় কাজ করবার ঘর। খাবার ঘর! প্রাতরাশ বয়ে নিয়ে এলেন তোদোজায়া ও তাঁর বোন। রাখলেন সেই নিচু টেবিলের উপর। কুশন পেতে দু'ধারে বসলুম বিবলি আর আমি। একটু দূরে বসে আমাদের যত্ন করে খাওয়ালেন তোদোজায়া। ইলেকট্রিক টোস্টার দিয়ে রুটি টোস্ট করে দিলেন। এটা জাপানী রীতি নয়। আমাদের খাতিরেই অত কষ্ট করা।

দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত ঘুরে আমি যেন অবশেষে একটি নীড় পেয়েছি। বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না। বৃষ্টি। হাতে কিছু কাজও ছিল। পরের দিনের বক্তৃতার জন্যে প্রস্তুতি। যুকাতা না ছেড়ে জাপানীর গৃহে জাপানী সেজে গল্প করি। তার পর যে যার কাজে চলে গেলে লিখতে বসি। শেষপর্যন্ত দেখি সদরের ঘরগুলিতে দুই মূর্তি একা। বুদ্ধঘরে অমিতাভ বুদ্ধ। বৈঠকখানা ঘরে আমি। একই ঘরের দুই অংশ। আমার শোবার ঘরের সংলগ্ন।

দশ রাত দশ দিন জাপানে থেকে জাপানে থাকিনি। থেকেছি একটা আন্তর্জাতিক

লেখকমণ্ডলীতে। ফরাসী, মার্কিন, ইংরেজ, ভারতীয়দের সঙ্গে। জাপানীদের সঙ্গেও কিন্তু বিশেষ করে তাঁদের সঙ্গে নয়। জাপানকে দেখেছি সদলবলে, সাড়ে তিন শ' থেকে কমতে কমতে দেড় শ' জনের দলবল নিয়ে। চোখ জোড়া অবশ্য আমার নিজের। কিন্তু দ্রষ্টব্যের উপর আমার কোনো হাত নেই। যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে গেছি, ইচ্ছামতো যাবার অবসর পাইনি। এইবার আমি স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র বলেই শঙ্কিত। কেই বা আমাকে চেনে! কাকেই বা আমি চিনি! ভাষাও বুঝিনে। বোঝাতে পারিনে। কিন্তু এক রাত্রি এক দিন জাপানী গৃহস্থের অতিথি হয়ে জাপানী গৃহে কাটিয়ে আমার শঙ্কা দূর হলো।

না। ভাষা একটা বাধা নয়। দেশ একটা বাধা নয়। জাতি একটা বাধা নয়। ধর্ম একটা বাধা নয়। বর্ণ একটা বাধা নয়। হৃদয় যখন হৃদয়কে টানে তখন মুহূর্তে সব বাধা সরে যায়। জাপানকে আমি ভালোবেসেছি, জাপান আমাকে ভালোবেসেছে। ভোজবাজির মতো সব কেমন করে ঘটে গেছে। যেন আগে থেকে সব সাজানো ছিল।

যে পাড়ায় তোদো মহাশয়ের বাড়ি কাসুগাই মহাশয়ের বাড়িও সেই পাড়ায়। পাড়াটি পাড়াগাঁয়ের মতো। কাছেই পাহাড়। অদূরে বাজছিল মন্দিরের ঘণ্টা। মন্দিরের নাম চিওঁইন। এই মন্দিরের ঘণ্টা কিয়োতোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ধ্বনি সব চেয়ে শুনতে ভালো চেরিফুলের মরসুমে ভোরের কুয়াশা যখন এলিয়ে থাকে কামো নদীর বুকের উপর সাম্বোঙ্গি নামক স্থানে। তখন তো চেরিফুলের মরসুম নয়, চন্দ্রমল্লিকার মরসুমও শুরু হয়নি। তবে দুটি-একটি দেখতে পেয়েছি মরসুমের অগ্রদূতী চন্দ্রমল্লিকা। আর যেখানে বসে ঘণ্টাধ্বনি শুনছি সেখানটা কামো নদীর ধারে নয়, খাস চিওঁইন মন্দিরের পাশে।

নারা থেকে কিয়োতোয় রাজধানী সরে আসে অষ্টম শতাব্দীর শেষে। শোনা যায় সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল নারার বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির রাজনৈতিক প্রভাব এড়ানো। কিন্তু কিয়োতো রাজধানী হবার পরে পুরোনো সম্প্রদায়গুলির প্রভাব খর্ব হলেও বৌদ্ধধর্মের গৌরব ক্ষীণ হয় না। নতুন নতুন সম্প্রদায় প্রবর্তিত হয়। নবম শতাব্দীর আদ্যে সাইচো আর কুকাই নামে দুই সাধু ফিরলেন চীন থেকে। সাইচো নিয়ে এলেন তেন্দাই পন্থ। আর কুকাই নিয়ে এলেন শিন্‌গন পন্থ। যদিও চীন থেকে আমদানি, চীনে আবার ভারত থেকে আমদানি, তবু এই দুই সাধুর নীতির গুণে অপেক্ষাকৃত জাপানী। এঁদের নীতি হলো যুগধর্মের সঙ্গে দেশসত্তার যোগাযোগ সাধন। দেশকে, তার মাটিকে উপেক্ষা করে যুগকে ও তার হাওয়াকে একান্ত করলে যা হয় নারার সম্প্রদায়গুলি তার দৃষ্টান্ত। তেন্দাই আর শিন্‌গন তার থেকে শিক্ষা পায় যে দেশের মন পেতে হবে।

শিন্‌গন তো সোজাসুজি শিন্তোর সঙ্গে সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বার করল। যিনিই বুদ্ধ তিনিই সূর্যদেবী। তেন্দাইও সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল। আগেও যে সে রকম চেষ্টা একেবারে হয়নি তা নয়। তবে তেন্দাই ও শিন্‌গন—বিশেষ করে শিন্‌গন—শিন্তোর সঙ্গে একদিল হয়ে যায়। এর ফলে তেন্দাই ও শিন্‌গনের দেশীয়তা, দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা। সেই অনুপাতে চীনের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে ব্যবধান।

এর পরে চীন থেকে এলো জেন পন্থ। এরও আদিপর্ব ভারতে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে বোধিধর্ম নামে এক সাধু ভারত থেকে চীনে গিয়ে ধ্যান মার্গ প্রদর্শন করেন। ধ্যান হলো চীনাদের মুখে চান ও জাপানীদের মুখে জেন (Zen)। চীন থেকে জাপানে এলো একটির পর একটি ঢেউয়ের মতো। প্রথম ঢেউ দ্বাদশ শতাব্দীতে। রিন্‌জাই সম্প্রদায়। দ্বিতীয় ঢেউ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। সোতো সম্প্রদায়। তৃতীয় ঢেউ সপ্তদশ শতাব্দীতে। ওবাকু সম্প্রদায়। তেন্দাই ও শিন্‌গনের মতো এঁরা শিন্তোর সঙ্গে সমন্বয় খুঁজলেন না, কিন্তু জাপানের আত্মার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক পাতালেন।

সৌন্দর্যবোধ, বীরত্ব, কর্মপ্রতিভার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করলেন। জেনও হলো জাপানী। জাপানের আত্মা। চীনের সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে ব্যবধান বাড়ল। জাপানের যোদ্ধারা ও শিল্পীরা ধ্যানমার্গী বৌদ্ধ। জেন ডিসিপ্লিন মানুষকে যোদ্ধাও করতে পারে, শিল্পীও করতে পারে।

জেন যেমন ধ্যান মার্গ তেমনি শিন্‌গন হচ্ছে তন্ত্রমন্ত্র বা শক্তি মার্গ। আর তেন্দাই হচ্ছে ভক্তি মার্গ। আমাদের দেশে ভক্তি মার্গ সাধারণত বিষ্ণুকে ও আর তাঁর অবতার রামকে বা কৃষ্ণকে অবলম্বন করে। জাপানে অমিতাভ বুদ্ধকে। ইনি শাক্যমুনি বুদ্ধ বা শাক্য বুদ্ধ নন। অথবা নন বৈরোচন বুদ্ধ। বৈরোচন সম্বন্ধে যত দূর জানি তিনি ব্যক্তিবিশেষ নন। তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, নির্বাণলাভ করেননি। তিনি তত্ত্ববিশেষ। আর অমিতাভ বুদ্ধ যদিও এখন তত্ত্ববিশেষ তবু আদিতে ছিলেন লোকেশ্বররাজ বা ধর্মাকর নামক ব্যক্তিবিশেষ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নির্বাণের ফল ইচ্ছা করলে একাই ভোগ করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর শরণাগতদের নির্বাণ লাভ না হলে নিজের করতলগত নির্বাণ গ্রহণ করবেন না বলে তাঁর দুর্জয় সংকল্প বা হোঙ্গান।

ভারতবর্ষের মহাযান বৌদ্ধরা অমিতাভ বুদ্ধের উপাসক ছিলেন বলে শুনিনি। একজন পণ্ডিতের মুখে শুনেছি যে অমিতাভ বুদ্ধ ভারতের নন, মধ্য এশিয়ার কল্পনা। অপর একজন পণ্ডিত কিন্তু বলেন যে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মথুরায় তাঁর উপাসনা প্রচলিত ছিল। তৃতীয় একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'সংস্কৃত সূত্রে অমিতাভ বুদ্ধের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত সূত্র গেছে ভারত থেকে। অতএব অমিতাভ বুদ্ধ গেছেন ভারত থেকে।' ভারত বলতে সেকালে আফগানিস্তানও বোঝাত। এখনো সেখানে বহু বৌদ্ধ কীর্তি অবিকৃত রয়েছে। যদি সংস্কৃত সূত্রগুলি সেই অঞ্চল থেকে গিয়ে থাকে তা হলে অমিতাভ বুদ্ধ সেই অঞ্চলের উপাস্য ছিলেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলের লোক আমরা অত দূরের খবর রাখতুম না। মহাযান বলতে আমরা জানতুম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। তন্ত্রমন্ত্র বা শক্তি মার্গ। এ মার্গ পূর্বভারত থেকে তিব্বত হয়ে চীন হয়ে জাপানে প্রসারিত। জাপানের ভাষায় শিন্‌গন। আর ভক্তি মার্গ উত্তর-পশ্চিম ভারত বা বৃহত্তর ভারত থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে চীন হয়ে জাপানে প্রলম্বিত। জাপানের ভাষায় তেন্দাই। ধ্যান ম্যার্গ যে ভারতের কোন্ প্রান্ত থেকে কেমন করে চীনে যায় তার সন্ধান মেলেনি। কোনো কোনো পণ্ডিতের অনুমান দক্ষিণ ভারত থেকে সমুদ্রপথে।

তেন্দাই যদিও ভক্তিমার্গ তবু তা নিম্ন অধিকারীর পক্ষে দুরূহ। তাকে স্ত্রী শূদ্র পাপীতাপী খেটে-খাওয়া অবসর না-পাওয়া আপামর সাধারণের কাছে সহজ করে আনলেন সন্ত হোনেন। জোদো সম্প্রদায়। আরো সহজ করলেন তাঁর শিষ্য শিন্‌রান। ইনি সাধু হয়েও বিবাহ করে আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখালেন। জোদো-শিন সম্প্রদায়। পরে জোদো-শিনেরও শাখাপ্রশাখা গজায়। হোঙ্গানজি। তার থেকে নিশি হোঙ্গানজি ও হিগাশি হোঙ্গানজি। এমনি সব শাখাপ্রশাখা সমেত জোদো-শিনই জাপানের বৌদ্ধদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তেন্দাই এখন সংখ্যালঘু। শিন্‌গন ও জেন জোদোশিনের ঠিক পরে তার স্থান সংখ্যাগুরুত্বের দিক থেকে। এ ছাড়া নিচিরেন বলে একটি বৌদ্ধ পন্থ আছে। জাপানের দেশজ। নিচিরেন ছিলেন সংস্কারক। ইনি শাক্য বুদ্ধকেই মানতেন। আর কোনো বুদ্ধকে নয়।

গত শতাব্দীর শেষভাগে যখন হিগাশি হোঙ্গানজির পুড়ে-যাওয়া বাড়ি নতুন করে তৈরি হয় তখন পাহাড় থেকে গাছ কাটিয়ে টেনে আনার জন্যে শক্ত মোটা দড়ির দরকার হয়। তখন হাজার হাজার ভক্তিমতী আপন আপন কেশ দেন, আর সেই কেশ দিয়ে দড়ি পাকানো হয়, আর সেই দড়ি দিয়ে গাছ টেনে আনা হয়, আর সেই গাছের কাঠ দিয়ে মন্দির গড়া হয়। কিয়োতোর

হিগাশি হোঙ্গানজি আমি দেখিনি, কিন্তু তোকিয়োতেও এঁদের একটি মন্দির আছে, সেখানে দেখেছি অজন্তার মতো প্রবেশদ্বার। কিন্তু প্রাচীন নয়, আধুনিক।

নিশি হোঙ্গানজির বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম রিয়ুকোকু। সেইখানেই আমার বক্তৃতা। তারই জন্যে প্রস্তুতি আমাকে দুপুরবেলা ব্যাপৃত রাখল। বিকেলের দিকে তোদো অধ্যাপনা সেরে ফিরতেই বেরিয়ে পড়া গেল একসঙ্গে। কিয়োতো শহরে বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়। বিবিধ শিক্ষাসত্র। সব চেয়ে বড় যেটি সেটির নাম কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়। এটি জাপানের দ্বিতীয় পুরাতনতম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এরই বিজ্ঞান ফ্যাকালটির অধ্যাপক হিদেকী য়ুকাওয়া জাপানের অদ্বিতীয় নোবেল প্রাইজ বিজেতা। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সাহিত্য ফ্যাকালটিতে। অধ্যাপকরা একটি ঘরে মিলিত হয়ে আমার সঙ্গে বসে ভারতপ্রসঙ্গ আলোচনা করলেন। জাপানীরা সাধারণত সন্ধ্যার পূর্বেই আহারের পাট চুকিয়ে দেয়। সেদিন আমাকে যা খেতে দেওয়া হলো তাকে চা না বলে হাই টী বলাই সঙ্গত।

তার পর তোদো-সান আমাকে পৌঁছে দিলেন জেন বৌদ্ধদের রিন্‌জাই সম্প্রদায়ের মুখ্যমন্দির মিয়োশিন্‌জিতে। পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন। একরাত্রের জন্যে অতিথি আমি প্রধান পুরোহিত য়ামাদা মহাশয়ের। তিনি আবার হানোজোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিন রীতি। ভাইসচ্যান্সেলার নয়, প্রেসিডেণ্ট। দুর্ভাগ্য আমার, যাঁর অতিথি আমি তিনি সেদিন ছিলেন না। হঠাৎ বার্তা পেয়ে চীনদেশে চলে গেছলেন। গৃহকর্তা যেখানে অনুপস্থিত সেখানে অতিথি হওয়া বিড়ম্বনা। তার থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন প্রতিবেশী সুগিও তোরিগোএ। আসাহি পত্রিকার সাংবাদিক বলেই তাঁকে আমি জানতুম। দেখা গেল তিনি কিমোনো পরে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। তিনিও একজন জেন সাধক।

ঘরের দেওয়ালে লম্বমান একটি পট। তাতে চীনা ভাবচিত্র আঁকা। জিজ্ঞাসা করলুম, কী লেখা আছে চীনা লিপিতে? উত্তর পেলুম, 'সান জেন সেকাইনো হারু।' তার অর্থ? 'তিন সহস্র জগৎ বসন্তময়।' তোরিগোএ-সান ব্যাখ্যা করলেন, 'আমার মনে যখন বসন্ত আসবে তখন সারা বিশ্বে বসন্ত আসবে। আমার মন যখন পুষ্পিত হবে সারা বিশ্ব পুষ্পিত হবে।'

এই বলে তিনি একটি নক্‌শা এঁকে দেখালেন। উপরের স্তরে সহজ প্রবৃত্তি। মাঝখানকার স্তরে বুদ্ধি। তলার স্তরে গভীরতম মন। যার নাম গভীরতম মন তারই নাম জগৎ নিজে। তাকেই বলে ধর্মধাতু। সেই হচ্ছে বসন্তকাল। বুদ্ধির স্তর ভেদ করে, সহজ প্রবৃত্তির স্তর ভেদ করে সেইখান থেকে উঠে আসবে পূর্ণ বিকশিত জীবন। চিরন্তন। শান্তিতে ভরপুর। প্রেমে পরিপূর্ণ। তারই ইশারা করছে ওই পট। 'সান জেন সেকাইনো হারু।'

চতুর্দশ শতাব্দীর কীর্তি এই মিয়োশিন্‌জি মন্দির ও মঠ। এর অধীনে সাড়ে তিন হাজার মঠমন্দির, সাত হাজার কর্মী, তেরো লাখ শিষ্য। রিন্‌জাই জেনদের এ রকম পনেরোটি ঘাঁটি। তার একটি তেনরিয়ুজি। কোনোটি মিয়োশিন্‌জির মতো গরিষ্ঠ নয়। এখানে একরাত্রি কাটানো কি কম ভাগ্যের কথা! তাও প্রধান পুরোহিতের ঘরে। কিন্তু শুতে যাবার আগে মনে পড়ে গেল যে স্নান করা হয়নি আজ। তা শুনে তোরিগোএ-সান বললেন তাঁর ওখানে চলতে। চললুম তাঁর সঙ্গে য়ুকাতা গায়ে, খড়ম পায়ে, ভিজতে ভিজতে। স্নান তো পথে যেতে যেতেই হয়ে গেল বৃষ্টির জলে। মন্দিরের এলাকা পার হতে বড় কম সময় লাগে না।

ছোট কাঠের বাড়ি। আধুনিক ধরনে তৈরি। সাজসজ্জা নিপুণ হস্তের। তোরিগোএ-সান তাঁর নিপুণিকার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর কিশোরী ও বালিকা দুটি কন্যার সঙ্গেও। তপ্ত জলের কুণ্ডে নিভৃতে অবগাহন করে জাপানী বাথের ভয় ভেঙে গেল আমার। আবার য়ুকাতা পরে ওবি

বেঁধে বসবার ঘরে এসে নিচু একটি চৌকো টেবিলের এক ধারে বসলুম মেজের উপর কুশন পেতে। টেবিলের দু'ধারে তোরিগোএ আর তাঁর গৃহিণী। আমার ডান দিকে আর বাঁ দিকে। সামনে কী একটা খাবার।

ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে গিয়ে হাতে করে নিয়ে এলেন ছোট একটি বোতল, তিনটি পানপাত্র। আমাকে অভয় দিলেন যে ওতে য়্যালকোহল নেই। পোর্ট ওয়াইনে য়্যালকোহল নেই কে এ কথা বিশ্বাস করবে! হুঁ, আছে, কিন্তু অতি সামান্য। পড়েছি মোগলের হাতে। পিনা পি'তে হবে সাথে। একবার ঠোঁটে ছুঁইয়ে রাখলুম।

মোগলের কাছে জানতে চাইলুম, জেন সাধন সম্বন্ধে কী কী বই পড়ব? উত্তর পেলুম, বইটই পড়ে হবে কী! পড়তে চাই তো একঘর বই আছে। কিন্তু পণ্ডশ্রম। চাই অভ্যাস। অভ্যাসে মিলয়ে জেন, পাঠে বহুদূর। ধ্যানে বসতে হয়। ধ্যান করতে হয়। এর পরের প্রশ্ন, তিনি নিজে কতদূর এগিয়েছেন? তাঁর উত্তর, তিনি গত বছর গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ধারে একদিন আশ্চর্য এক সুগন্ধ পান। জানেন না কোথাকার সুগন্ধ। কিসের সুগন্ধ। সে সুগন্ধ মিলিয়ে যাবার নাম করে না। দিনের পর দিন নাসায় লেগে থাকে। মাসখানেক চলল তার জের! জগৎ সুগন্ধময়।

একটু অন্তরঙ্গ স্বরে সুধালুম, 'আপনার ইনিও কি ধ্যান অভ্যাস করেন?'

'আরে না, না। উনি যে খ্রীস্টান।' তোরিগোএ আমাকে চমকে দিলেন। তার পর আমার কবিতার জাপানী অনুবাদ যে কাগজে ছাপা হয়েছিল সে কাগজ আমাকে দিলেন। 'পুব আকাশের তারা।' কিয়োতোয় এসে লেখা। হাইকুর মতো সতেরো সিলেবলের কবিতা নয়, তান্‌কার মতো একত্রিশ সিলেবলের কবিতা নয়, জাপানী পদ্ধতিরই নয়, শুধু ছোট।

ওটি একটি মনে রাখবার মতো রাত। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের ধ্যানীবৌদ্ধ মন্দির। প্রধান পুরোহিতের শয়নকক্ষ। মাদুরে মোড়া মেজের উপর পরিচ্ছন্ন পুরু বিছানা। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় দেয়ালে লম্বমান ভাবচিত্রের পট। 'সান জেন সেকাইনো হারু।' তিন সহস্র জগৎ বসন্তবিহ্বল। চোখ মেলে দেখি আর চোখ বুজে ধ্যান করি। আমারও তো জীবনের ধ্রুবপদ ওই। সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্য সত্ত্বেও নিখিল বিশ্বে চিরবসন্ত। প্রতিকূল সাক্ষ্যই দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাই দিনের বেলা নজরে পড়ে না। রাত্রে যখন শুতে যাই, মাঝরাত্রে যখন ঘুম ভেঙে যায়, আবার যখন ঘুমিয়ে পড়ি, তখন চিরন্তনকে আমি যে ভাবে ও যে ভাষায় স্মরণ করি তাকে রসে গলিয়ে নিলে যা হয় তা ওই 'সান জেন সেকাইনো হারু।' ফাগুন লেগেছে ভুবনে ভুবনে।

সকালবেলা উঠে দেখি দেরি হয়ে গেছে। আমার শয্যার পাশে আর একটি শয্যা ছিল। সেটি নেই। আমার ছাত্র-প্রদর্শক কাওয়ানামি আমাকে জাগিয়ে দেয়নি, তার সঙ্কোচে বেধেছে। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে প্রাতঃকালীন উপাসনা। যেখানে সকলে সমবেত হন। ছেলেটি কখন থেকে তৈরি হয়ে যাই যাই করছিল। আমি তাকে ধরে রাখলুম না। নিজে তৈরি হবার জন্যে সময় নিলুম। ততক্ষণে উপাসনা শেষ।

হায়! হায়! কী হারালুম! যার জন্যে জেন মন্দিরে রাত কাটানো সেই জিনিসটি হলো না। আমাকে পই পই করে বলে রাখা হয়েছিল যে ভোরবেলা উপাসনা। তবু আমার হোঁশ হয়নি। না বড়াই করবার মতো মুখ নেই। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মিয়োশিন্‌জিতে একরাত্রি যাপন করেছি, সে আমার ভাগ্য। কিন্তু আমি আমার ভাগ্যের যোগ্য নই।

ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পায়চারি করতে লাগলুম। এক মহল থেকে আরেক মহলে যাবার করিডোর। মাঝখানে উঠোন। বাগান। পাথরের কুণ্ড থেকে হাতা দিয়ে জল তুলে নিয়ে মুখ হাত ধোয়া গেল। একটু পরে তোরিগোএর প্রবেশ। তিনি আমাকে মন্দিরের বিভিন্ন

অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখালেন। একবার প্রাতরাশের পূর্বে। একবার প্রাতরাশের পরে। প্রাতরাশ দিয়ে গেলেন সাধুরা। তাঁদেরি শ্রীহস্তের রান্না। বিশুদ্ধ স্বদেশী ও নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন। ভাত। সোয়াবীন। সবজি। সবুজ চা। মন্দিরেই উৎপন্ন। সাধুদের শ্রমজাত। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন কিয়োদা। তাঁর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে তিনি বড় বড় ভারী ভারী পাথর ভেঙে নিজের হাতে মন্দিরের ভিতরের রাস্তা বানিয়েছিলেন। বোধ হয় তাঁরই শান্‌বাঁধানো সরণি দিয়ে আমি খটখট করে খড়ম চালিয়েছি। সাধুর পুণ্য না আমার পুণ্য কার পুণ্য হলো কে জানে! গান্ধীজীর মতো জেন গুরুদেরও শিক্ষা ব্রেড লেবার বা অন্ন-শ্রম। অন্য এক মন্দিরের জেন গুরু হিয়াকুজো বৃদ্ধ হয়েছেন বলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁর বাগানে কাজ করার হাতিয়ার লুকিয়ে রাখে। তখন হিয়াকুজো আহার ত্যাগ করে বলেন, 'নেই শ্রম তো নেই আহার।'

জেনদের সকালবেলার ধ্যানটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী। আসল ধ্যান সন্ধ্যায়। তিনঘণ্টার মতো। এ ছাড়া মাসে এক সপ্তাহ দিবারাত্র ধ্যান হয়। ধ্যান ছাড়া আর কিছু হয় না সে সময়। আসল ধ্যানের জন্যে আলাদা একটি ঘর আছে। তার নাম জেন্‌দো। সেখানে কিন্তু সকলের প্রবেশ নেই। শুধু প্রথম শ্রেণীর সাধুদের। অন্যেরা মন্দিরে বসে ধ্যান করেন। জেন্‌দোতে যাঁরা প্রবেশ পান তাঁরা ধ্যানাসনে বসেন। আমাদের যেমন যোগাসন। আসনশুদ্ধির উপর ধ্যান নির্ভর করে। কেন্দ্রস্থলে আসন নেন গুরু বা প্রধান। ধ্যানকে তিনি একটা নির্দিষ্ট অবলম্বন দেন। গোটাকতক প্রশ্ন করেন। এই যেমন, 'আত্মন্ কী?' 'ব্যক্তিগত ধর্ম কী?' 'বুদ্ধের বিশুদ্ধ তত্ত্ব কী?' 'মানুষের মূলপ্রকৃতি কী?'

এসব প্রশ্নের উত্তর সাধুরা একে একে দেন যে যার অন্তর অন্বেষণ করে। অপরকে স্বমতে আনার জন্যে নয়। কাউকে হার মানাবার জন্যে নয়। সত্যকে আবিষ্কার করার জন্যে। প্রত্যেকের আপনার ভিতরেই আলো জ্বলছে। চেতনা সেই আলোর সন্ধান করছে। সাধুদের উত্তর শুনে গুরু কয়েকটি কথা বলেন। সেসব কথা যুক্তিতর্কের ভাষায় নয়। গুছিয়ে বুঝিয়ে বলা নয়। সাধনায় যাঁরা অনুমগ্ন তাঁরাই অনুধাবন করতে পারেন তার মর্ম। একটা হদিস পাওয়া গেল ভেবে থেমে যান না তাঁরা। বরং আরো উদ্দীপনা পান ব্যক্তিগত প্রয়াসের জন্যে। সে প্রয়াস ইনটুইশন মার্গী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে ইনটুইশন দিয়ে অন্তরে জ্বলতে থাকা আলোর সন্ধান। ধ্যান অন্তর্মুখী। পদ্ধতিটা দ্বান্দ্বিক নয়। নেতি নেতি করে নয়। গুরুবাক্য মেনে নিয়ে নয়। 'বিশ্বাসে মিলয়ে সত্য' নয়। চেতনার সঙ্গে আলোকের সংযোগ।

এক-একটি বিষয়ে ধ্যান যে কতকাল ধরে চলে তার ঠিকঠিকানা নেই। সেকালে নাঙ্গাকু বলে একজন সাধক ছিলেন তাঁর নাকি আট বছর লেগেছিল এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করতে : 'ও কে আমার দিকে হেঁটে আসছে?' যে সমাধানটা তিনি বহু কষ্টে আয়ত্ত করলেন সেটা এই : 'এমন কি যখন কেউ বলে যে এখানে কিছু আছে তখন সে সমগ্রকে বাদ দেয়।' কোহো বলে আর একজন সাধক ছিলেন। একদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল এই প্রশ্নটির উপরে : 'সব জিনিসই ফিরে যায় একের মধ্যে, কিন্তু এই শেষ জিনিসটি ফিরে যায় কোন্‌খানে?' তিনি আহারনিদ্রা ভুলে গেলেন, পূর্ব-পশ্চিম চিনতে পারলেন না, সকালসন্ধ্যার তফাত বুঝলেন না। অন্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাঁর কাছে বিলুপ্ত। শেষে তাঁর মধ্যে এক আকস্মিক জাগরণ ঘটল। তাঁর পূর্ব-গুরুর প্রশ্ন 'কে তোমার প্রাণহীন দেহ বহন করছে' তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ঝলসে উঠল। অসীম শূন্য খুলে গেল। আয়নার মতো আর এক জগৎকে তিনি প্রতিফলিত করলেন।

জেনরা যাকে সাতোরি বলেন সে একপ্রকার বিশ্বরূপদর্শন। সহসা দৃষ্টি উন্মীলিত হয়, বিশ্বের অভ্যন্তর পর্যন্ত দেখা যায়। সেইভাবে আত্মদর্শন ঘটে।

॥ পনেরো ॥

ভক্তিমার্গী আর ধ্যানমার্গীদের সঙ্গে অল্পস্বল্প পরিচয় হলো। হলো না শক্তিমার্গী বা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সঙ্গে। আমিও চেষ্টা করিনি। তাঁরাও আমার খবর পাননি। তাঁদের বিশ্বাস নিখিল বিশ্ব হলো মহাবৈরোচনের কায়া। প্রত্যেকটি ধূলিকণাও তাঁর কায়ার অঙ্গ, সুতরাং তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের শরিক। মানুষ মাত্রের যেমন কায়া আছে, মন আছে, বাক্য আছে তেমনি প্রাণীমাত্রের অপ্রাণীমাত্রের অণুপরমাণুমাত্রের আছে কায়া, আছে মন, আছে বাক্য। এই তিনটি গুহ্য রহস্য যদি কেউ ভেদ করতে পারে তবে এই জন্মেই বুদ্ধের সঙ্গে এক হবে। এর জন্যে চাই আঙুল দিয়ে তান্ত্রিক মুদ্রাবিন্যাস মুখ দিয়ে জাদুমন্ত্র উচ্চারণ, চিত্ত দিয়ে ধ্যান। গুহ্যতত্ত্বে দক্ষতা জন্মালে সেই শক্তির অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে দেবদেবীদের আবাহন করে আদায় করতে পারা যায় ধনসম্পদ আরোগ্য প্রচুরবর্ষণ প্রভূতশস্য ও অন্যবিধ পার্থিব কল্যাণ। শিন্‌গন বা তান্ত্রিক বৌদ্ধরা মণ্ডল ব্যবহার করেন। মণ্ডল মানে এক জোড়া বিশ্বচিত্র। বিশ্ব যা হওয়া উচিত। বিশ্ব যা হয়ে উঠছে। আদর্শ বনাম বাস্তব।

সেদিন মিয়োশিন্‌জি থেকে তোরিগোএ-সান আমাকে নিয়ে গেলেন রিয়োআনজি। সেখানে একটি উদ্যান আছে, তাতে গাছপালা নেই, ঘাস আগাছা নেই, উদ্ভিদ্ মাত্রেই নেই। তা হলে আছে কী? আছে বালুকাময় সমতলভূমির পাঁচ জায়গায় পাঁচ পুঞ্জ পাষাণ। পাথরের সংখ্যা পাঁচ, দুই, তিন, দুই, তিন। এর ইংরেজী নাম রক গার্ডন নয়। স্টোন গার্ডন নামটা জাপানী ইংরেজী। আমরা হলে একে উদ্যানই বলতুম না। এ হচ্ছে মানুষের হাতে গড়া সংক্ষিপ্ত সাগরতীর। সাধুদের হাতে গড়া। এখানে বসে তাঁরা অনুভব করেন, সম্মুখে শান্তিপারাবার। আর ওই যে পাথরগুলি ও গুলির আকৃতি নাকি আপনা থেকে বদলায়। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও নাকি বদল হয়। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলে বিভ্রমও লাগে যে ওরা সচল। ওই যে বাঘ তার বাচ্চাকে নিয়ে পার হচ্ছে। মিয়োশিনজির প্রখ্যাত উদ্যানের মতো এটিও ধ্যানী বৌদ্ধদের ধ্যানের আনুষঙ্গিক। তাঁদের ধ্যান কেবল আসন করে নয়, ঘোড়ার পিঠে বা তুলি হাতে বা খুরপি কোদাল কাঁচি নিয়ে।

এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এক সন্ন্যাসিনীর দেওয়া চা সেবা ও পিষ্টক আস্বাদন করা গেল। জাপানে একবার সন্ন্যাসিনী হলে আর বিবাহ করতে পারা যায় না। অথচ সন্ন্যাসী হয়েও বিবাহ করা যায়, সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দেওয়া যায়। এটা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের না হোক জাপানী বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব।

তোরিগোএ-সান আমাকে রিয়ুকোকু বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন। ভারত প্রসঙ্গে আমার বক্তৃতা। তার পর প্রেসিডেন্ট মোরিকাওয়া ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বসে দুপুরের খাওয়া। ল্যাকারের পাত্রে পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জনে চপস্টিক লাগিয়ে মুখের গ্রাস মুখে তুলব এমন সময় কানে এলো, 'কাঁচা মাছ।'

কাঁচা মাছ খেয়েছেন? খাননি। আমিও খাব না বলে পণ করেছিলুম। কাঁচা মাছ? কক্ষনো না। কাঁচা মাছ? কভি নেহি। কাঁচা মাছ? নেভার। এগারো দিন পণরক্ষার পর বারো দিনের দিন আমি পড়ে গেলুম সঙ্কটে। জাপানীরা সদ্য-ধরা তাজা মাছ স্যালাডের মতো কাঁচা খায় সোয়া সস্ সহযোগে। একে বলে সাশিমি। ভাতের সঙ্গে ডেলা পাকিয়ে খেলে তাকে বলে সুশি। আঁশটে গন্ধ থাকে না। আপনি কী করে টের পাবেন যে ওটা মাছ? দেখতে স্যালাডের মতো। ধরে নিন

একরকম স্যালাড। মনে করুন সেলেরি। মাছ বলে নাই বা জানলেন। বলে না দিলে আমিও কি জানতুম!

একটুখানি মুখে দিয়ে আস্বাদন করলুম। আঁশটে বা পচা গন্ধ নেই। নাক বিমুখ নয়। জিবকে সোয়া সস্ ঘুষ দিলে সেও ভোলে। যেখানে নীতির প্রশ্ন নয়, রুচির প্রশ্ন, সেখানে বিবেকেও বাধে না। মাছ খাব অথচ কাঁচা মাছ খাব না, এর মধ্যে বিবেককে টেনে আনা কেন? জার্মানরা তো শুনেছি কাঁচা মাংসও খায়। আধসিদ্ধ আধকাঁচা মাংস খেতে ইংরেজরাও পারে। তার পর কাঁচা হলেও জীবন্ত তো নয়। পশ্চিমের শৌখীনরা যে জ্যান্ত অয়স্টারকে আস্ত গিলে খায় তার বেলা? কাঁচা 'তাই' মাছ কিন্তু সে পর্যায়ে পড়ে না।

যাক। আমার সংস্কার সায় দেয়নি। একটুখানি মুখে দিয়েই আমি সহভোজীদের মুখ রক্ষা করেছি। দ্বিতীয়বার ও রকম সঙ্কটে পড়তে হয়নি। তবে জোর করে বলতে পারব না যে সুশিয়াতে পরে একদিন যা দিয়েছিল তাতে কাঁচা মাছ মেশানো ছিল না। পদে পদে জাত বাঁচাতে গেলে দেশ দেখা হতে পারে, কিন্তু জাতির জীবন দেখা হয় না। আর জাপানের জাতীয় জীবনে সুশিয়ার মাছভাত আমাদের ডালভাতের মতো।

রিয়ুকোকু বিশ্ববিদ্যালয় হলো নিশি হোঙ্গানজি মন্দিরের বিশ্ববিদ্যালয়। যেমন ওতানী বিশ্ববিদ্যালয় হলো হিগাশি হোঙ্গানজি মন্দিরের। এক কালে একটাই হোঙ্গানজি ছিল। মোহন্ত মহারাজ তাঁর ছোট ছেলেকে গদি দিয়ে যাওয়ায় বড় ছেলের দলবল আলাদা হয়ে যায়। আলাদা গদির নাম হয় হিগাশি। যেহেতু সেটা পুব দিকে। তখন পুরোনো গদির নাম হয় নিশি। যেহেতু সেটা পশ্চিম দিকে। জাপানে মন্দির পুড়ে যাওয়া, সরে যাওয়া লেগেই থাকে। নিশি হোঙ্গানজির বর্তমান মন্দিরের স্থাপনা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে। যে জমিখানার উপর অবস্থান সেখানা ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান পুরুষ হিদেয়োশির দান। চাষীর ছেলে থেকে সামুরাই আরো কেউ কেউ হয়েছিলেন, কিন্তু হিদেয়োশির মতো সর্বেসর্বা আর একজনও না। এই মহাসেনাপতি তথা মহামন্ত্রীর অনুগ্রহে ভূমিলাভ, তাই এঁকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে মন্দিরের বড় একটি হল ঘরে ও মন্দিরসংলগ্ন চা অনুষ্ঠান গৃহে।

'এইখানে বসে হিদেয়োশি মন্ত্রণা করতেন।' 'এইখানে বসে তিনি চা পান করতেন।' পুনঃপুনঃ এরূপ উক্তি শুনে আমার ধারণা জন্মেছিল যে মহাপুরুষ তা হলে মন্দিরের জন্যে জমি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, নির্মাণের পর এই স্থলে এসে মন্ত্রণা করতেন, এই স্থানে বসে চা সেবা করতেন। তা নয়। স্বকীয় প্রাসাদে বসে তিনি মন্ত্রণা করতেন, সপার্ষদে চা অনুষ্ঠান করতেন। সে প্রাসাদের নাম ফুশিমি প্রাসাদ বা দুর্গ। কিয়োতোর দক্ষিণে মোমোয়ামা অঞ্চলে ছিল এর স্থিতি। সেইখান থেকে শহরের মধ্যভাগে শিমোগিয়ো অঞ্চলে উঠিয়ে আনা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাগার আর চা অনুষ্ঠান গৃহ। গন্ধমাদন উত্তোলনের মতো।

চা-গৃহটি শাদাসিধে। পাঁচজনের বসবার মতো। সুতরাং ছোট। কিন্তু মন্ত্রণাকক্ষটি যেমন বিশাল তেমনি জমকালো। জাপানে তো আয়তন পরিমাপ করা হয় মাদুরের সংখ্যা দিয়ে। এটি হলো আড়াই শ' মাদুরি ঘর। মাদুরের আকার ছ' ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া। তা হলে অঙ্ক কষে বুঝুন কত বড়। এত বড় একটি ঘরের সমতল ছাদকে মাথায় করে রাখার জন্যে অনেকগুলো থাম। তাতে ল্যাকারের কাজ। একরাশ সরন্ত কপাট বা ফুসুমা। তাতে সেই মোমোয়ামা যুগের কানো কলমের চিত্রকরদের আঁকা ফুল, পাখী, মেঘ, ঢেউ প্রভৃতি। রঙের বাহার আর জোরালো তুলির টান হলো কানো কলমের চিত্রকরদের বৈশিষ্ট্য। কানো নামের চিত্রকর ছিলেন দু'জন। কানো এইতোকু। কানো সানরাকু। তাঁদের নামে নামকরণ হলেও অপর কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিত্রীকেও এই

কলমের চিত্রী বলা হয়।

এসব ছবিকে বলে ফুসুমা ছবি। এমনি সব ছবি শুধু একখানি কক্ষে নয়। মন্দিরের অন্যান্য কক্ষেও। এক-একটি কক্ষের এক-একটি নাম। একটির নাম চন্দ্রমল্লিকা কক্ষ। তা বলে সে ঘরে কেবল যে চন্দ্রমল্লিকারই ছবি আছে তা নয়। আছে রকমারি ছবি, কিন্তু সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে চন্দ্রমল্লিকা। তেমনি আর একটি কক্ষের নাম অরণ্যমরাল কক্ষ। ঘরের পর ঘর দেখতে হলে দিনের পর দিন দিতে হয়। আমার কি অত সময় আছে? এক জায়গায় মেরামতের কাজ চলেছে দেখে জানতে চাইলুম, খরচ যোগাচ্ছে কে? জবাব পেলুম, গৌরীসেন দিচ্ছেন শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ। কেন? কারণ এ যে 'জাতীয় সম্পদ'!

আমাদের যেমন প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ আইন জাপানের তেমনি একটি আইন আছে। সেই অনুসারে প্রাচীন কীর্তিকে 'জাতীয় সম্পদ' বলে গণ্য করা হয় ও তার মালিকদের অর্থসাহায্য করা হয়, যাতে 'জাতীয় সম্পদ' সুরক্ষিত হয়। কয়েক বছর আগে আইনের সংশোধন হয়েছে, তার ফলে 'জাতীয় সম্পদে'র সংজ্ঞা আরো ব্যাপক হয়েছে। ধরুন, নো নাটক যখন জাপানের সাংস্কৃতিক সম্পদ তখন তার ধারক ও বাহক যেসব অভিনেতা ও বাদক তাঁরাও কেন সাংস্কৃতিক সম্পদ হবেন না? যাকে রাখ সে-ই রাখে। তাঁরা না বাঁচলে কি নো নাটক বাঁচবে? নো নাটকের মতো রক্ষণযোগ্য জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ নাকি আছে এক শ' বারো প্রকার। যাঁরা আছেন বলে এইসব লোক-কলা আছে তাঁদের একটা আজব কোঠায় ফেলা হয়েছে। তাঁরা হলেন 'Intangible Cultural Properties'-এর শামিল 'Human National Treasures.' এইসব রত্নের রক্ষণের জন্যে গৌরীসেনের তহবিল থেকে টাকা আসে।

সব সময়ই চায়ের সময় জাপানে। ভাত খেতে বসেও লোকে চা খায়। জাপানী সবুজ চা। নিশি হোঙ্গানজিতে চা সেবা করা গেল সপার্ষদে। হিদেয়োশির মতো সপার্ষদে বলব না। সারি বেঁধে মেজেতে বসে। দেখলুম পুকুরপাড়ে চা গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের লোককে চায়ের জন্যে চা-বাগানে বা চা-দোকানে যেতে হয় না। শুনেছি বসন্তকালের সাতাত্তর দিনের চা পাতা তত কড়া নয় বলে অতিথির জন্যে তুলে শুকিয়ে টিনবন্দী করা হয়। পরবর্তী ঋতুর চা-পাতা নিজেদের ভোগে লাগে।

এর পর মেয়েদের কলেজে গিয়ে দেখি কলেজ, স্কুল আর শিশুবিভাগ তিন মিলে প্রতিষ্ঠান। একটি ঘরে পিআনো বাজিয়ে গান শেখানো হচ্ছে স্কুলের মেয়েদের। গানটা জাপানী, সুরটা পশ্চিমী। শেখাচ্ছেন জাপানী মহিলা। পাশ্চাত্য পোশাক। আর এক জায়গায় আরো গোটা কয়েক পিআনো পিটিয়ে চলেছে আরো বড় বড় মেয়েরা। পশ্চিমী সুর। পশ্চিমী গান। এসব পিআনোর দাম বেশী নয়। ওসাকায় তৈরি কটেজ পিআনো।

তার পর ছেলেদের হাই স্কুল। আগের দুটি প্রতিষ্ঠানের মতো এটিও সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা এর অঙ্গে লেখা নেই, আধুনিকতাই সর্বাঙ্গে। কুস্তির আখড়ায় গিয়ে জুদো দেখলুম। বাহুবলের জিত হবে বলে ধরে নিলে ভুল করবেন। জিত হবে আকস্মিক কৌশলের। যে লোকটা আক্রমণ করে সেই লোকটাই ভূমিসাৎ হয়। মেজেটা এমন করে বানিয়েছে যে আছাড় খেলেও গায়ে লাগে না। ওরকম একটা মেজে না হলে ওরকম একটি বিদ্যা শেখানো যায় না। নইলে আছাড়ের ভয়ে ছেলেরা ভাগবে।

সন্ধ্যায় প্রিন্সিপাল ফুজিওয়ারার আমন্ত্রণে রেস্টোরান্টে গিয়ে জাপানী ধরনের ভোজনকক্ষ অধিকার করে সবান্ধবে চার দিক ঘিরে মাদুরের উপর বসা। পাশ্চাত্য পোশাকের ক্রীজ মাটি। হলো না কেবল একজনের। তিনি বিশিষ্ট আর্ট ক্রিটিক রিয়ুগেন ওগাওয়া। ইনি কিমোনো পরে এসেছিলেন আমারি খাতিরে। তাই পরের দিন আমিও শেরোয়ানি পরি এঁরই খাতিরে। তখন এঁর

কী আনন্দ! কিন্তু পরের দিনের কথা পরে।

রেস্টোরাণ্ট থেকে বেরিয়ে শুনি তোদো মহাশয়ের বাড়ি অদূরে। পায়ে হেঁটে যেতে যেতে একসময় লক্ষ করি তোদো হাঁটছেন জোর কদমে। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বিবলি। হঠাৎ এই ম্যারাথন হণ্টনের তাৎপর্য? এর জবাব একটি কথায়। 'গিওন'। তখন আমারও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হলো। বড় রাস্তা থেকে ছোট ছোট গলি বেরিয়ে সোজা চলে গেছে পরীর রাজ্যে। এ জগৎ থেকে রূপকথার জগতে। পথিককে পরীতে ধরে নিয়ে যায়।

তোদো মহাশয়ের বাড়ি পা দিতেই আইডম্যানের গাড়ি এসে তুলে নিয়ে গেল তাঁর বাড়ি। সেখানে রাত্রিবাস। তার আগে জাপানী বাথ। কেমন করে তার আয়োজন হয় সেটা এত দিনে জানলুম। নিচে আগুন জ্বলে। জ্বাল দিয়ে তপ্ত করা হয় স্নানের জল। যাতে তপ্ত করা হয় সেটা গোলাকার একটা কুণ্ড। নিচের আগুন উপর থেকে দেখা যায় না। যথাকালে নিবিয়ে দেয়। সেই তপ্ত জলের কুণ্ডে প্রবেশ করার আগে শীতল জলে সাবান মেখে গা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে সাফ-সুতরো হতে হয়। তেল মাখা বারণ। কাপড় পরা বারণ। আমি বসে থাকতে আর কেউ ঢুকতে পারেন। সুতরাং তাঁর খাতিরে জলটাকে নির্মল রাখতে হবে। এ বাড়িতে সে ভয় ছিল না বলে আমি স্থির হয়ে জলে পড়ে থাকতে পারতুম, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তখনো আগুন জ্বলছে আর আমি ডাইনীবুড়ীর তপ্তকটাহে সিদ্ধ হচ্ছি। তাই অস্থির হয়ে একবার নামি, আবার ঢুকি, ঠাণ্ডা জল মেশানোর উপায় খুঁজি, ব্যর্থ হই, পালাই।

কাগজে পড়েছিলুম আটাশ হাজার জাপানী মেয়ে মার্কিন বিয়ে করেছে। সেদিন আইডম্যানের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হলো। ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো। পরে আরো অনুসন্ধান করেছি। বিয়ের আইনে বাধা নেই, কিন্তু ন্যাশনালিটির আইনে বাধা। মার্কিন বিয়ে করলেই সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন প্রজা হওয়া যায় না। স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যেতে হলে জাপানী প্রজারূপেই যেতে হয়। তার মানে জাপানী পাশপোর্ট নিয়ে। জাপানী কর্তারা কিন্তু পাশপোর্টে লিখবেন না যে মেয়েটি বিবাহিতা। তাঁদেরি দেশে তাঁদেরি আইন বলছে বিবাহিতা, তবু পাশপোর্টের বেলা কুমারী। কেন এই অসঙ্গতি বা অন্ধতা?

ব্যাপারটার নিদান মধ্যযুগের নিয়ম। ছেলেমেয়ে জন্মালেই পুলিশ নবজাতকের নামে একটি নথি খোলে। সে যদি আশি বছর বাঁচে তবে আশি বছর ধরে তার পাপপুণ্যের খবর টোকা হয়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তার নথি বাপের বাড়ির থানা থেকে শ্বশুরবাড়ির থানায় বদলি হয়। তখন থেকে নথি রাখে শ্বশুরবাড়ির থানাদার। মেয়ে যদি মার্কিন বিয়ে করে সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন প্রজা বনে যেত তা হলে তার নথি সেইখানেই শেষ হতো, কিন্তু সে যখন জাপানী প্রজাই রয়ে যাচ্ছে তখন তার বাপের বাড়ির থানাদার কার কাছে পাঠাবে তার নথি? শ্বশুরবাড়ি তো জাপানের অধীন নয়। তবে কি নথি সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে? তা তো নিয়ম নয়। তাসের দেশের পদে পদে নিয়ম। বিদেশীর সঙ্গে তাসবংশের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বলে চিত্রগুপ্তের দপ্তর থেকে নাম কেটে দিতে হবে? উঁহু! চিত্রগুপ্তের চোখে ও মেয়ে কুমারী।

পরের দিন আইডম্যানের বাড়ি থেকে বিদায় নিচ্ছি এমন সময় তিনি বললেন, 'যাবার আগে কুকুরটিকে দেখে যান।' হঠাৎ কেন ইচ্ছা হেন? 'কাসুগাইর মেয়ে আসাকাকে বলবেন তার ছেড়ে-যাওয়া কুকুরছানাটি এখন কত বড় হয়েছে, কেমন আছে।' সানন্দে। কুকুর কিন্তু আমাকে দর্শন দিতে চায় না। ঘেউ ঘেউ করে। তাড়া করে আসে।

এলুম ফিরে তোদো মহাশয়ের বাড়ি। মনে পড়ছিল আইডম্যানের একটি উক্তি। জাপানীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের কোনো য়্যাফিনিটি নেই। অপর পক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রচুর

য়্যাফিনিটি আছে। কথাটা কি সত্যি? কথাটা কি সত্যি নয়? বিপরীতের প্রতি বিপরীতের যে আকর্ষণ তাকে য়্যাফিনিটি বলা চলে না। জাপানীদের প্রতি পাশ্চাত্যদের ও পাশ্চাত্যদের প্রতি জাপানীদের আকর্ষণ বিপরীতের প্রতি বিপরীতের। ইংরেজরা ও আমরা বিভিন্ন, কিন্তু বিপরীত নই। বিভিন্নতা সত্ত্বেও বহু বিষয়ে অন্তঃসাদৃশ্য আছে।

তোদো আমাকে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী চিওঁইন মন্দিরে। কিয়োতোর বৃহত্তম, জাপানের অন্যতম বৃহত্তম মন্দির ও মঠ। ছত্রিশ একর জমি জুড়ে। পাহাড়ের ঢালু দিকে। আস্তে আস্তে উঠতে হয়। ধাপে ধাপে। জোদো সম্প্রদায়ের যখন এত রকম ভাগ-বিভাগ ছিল না তখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অধিকাংশ বাড়ি উঠেছে সপ্তদশ শতাব্দীতে। জোদোর বিশেষত্ব সন্ত হোনেনের শিক্ষা। অমিতাভ বুদ্ধের উপাসনা তাঁর পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল, সুতরাং যাত্রীরা মন্দিরে আসে বুদ্ধবিগ্রহের টানে ততটা নয়, যতটা সন্তমূর্তির টানে। বুদ্ধবিগ্রহের হোনেন-মূর্তির কাছেই জনসমাগম বেশী।

সন্ত হোনেনকে ভক্তি না করে পারা যায় না। এমন অপূর্ব মুখশ্রী, এমন অকপট সাধুতা ও করুণা! একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, 'জাপানীর হিয়া অমিয় মথিয়া হোনেন ধরেছে কায়া।' জাপানের সামরিক দিকটাই আমাদের চোখে পড়ে। কিন্তু চাঁদের উলটো পিঠের মতো তার জীবে দয়া, নামে রুচি, পাপীতাপী ও দীনহীনের জন্যে দরদ। গেইশাদের অনেকেই বিপন্ন পিতামাতা ও ভ্রাতাভগিনীর দুঃখমোচনের জন্যে দেহবিক্রয় করে। এ যেন পরহিতে প্রাণদান। নীতিবোধ সায় দেয় না, তাই পাপকে ঘৃণা করতে হয়, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করতে মন ওঠে না। তাকে তার উদ্ধারের উপায় বলতে হয়। জোদো হলো সর্বশ্রেণীর সব অবস্থার লোকের ত্রাণমার্গ।

হোনেন তাঁর দেহত্যাগের কিছু আগে এক তা কাগজে তাঁর অন্তিম বাণী লিপিবদ্ধ রেখে যান। তাতে তিনি পরিষ্কার করে বলেন যে ধ্যানমার্গ বা জ্ঞানমার্গ তাঁর বা তাঁর শিষ্যদের মার্গ নয়। অমিতাভ বুদ্ধ তাঁর পশ্চিম স্বর্গের নির্মল ভূমিতে তাঁদের ঠাঁই দেবেন এই যে বিশ্বাস এই তাঁদের ত্রাণের নিশ্চিতি। অভ্যাস বলতে একটিই যথেষ্ট। ভক্তিভরে নামজপ। যাঁরা বিস্তর পড়াশুনা করে শাস্ত্রী হয়েছেন তাঁরা যেন নিজেদের অজ্ঞ বলেই বিবেচনা করেন। অশিক্ষিতরা যেমন তাঁরাও তেমনি। একই বিশ্বাস সবাইকে সমান করেছে। সে বিশ্বাস অমিতাভ বুদ্ধের কারুণিকতায় বিশ্বাস। যাদের তত্ত্বজ্ঞান নেই তাদের সঙ্গে এক হয়ে বিজ্ঞজনের মতো ধ্যানধারণার পরোয়া না রেখে হৃদয় ঢেলে দিতে হবে অমিতাভ-নামকীর্তনে।

অধ্যাপক কাসুগাই এই সন্তবাণীকে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করেছেন। তাঁর রোমক লিপিতে লেখা সংস্কৃত আমাকে পড়তে দিয়েছেন। আমি বাংলা লিপিতে অন্তরিত করে কতক অংশ নিচে তুলে দিচ্ছি। ভুল থাকলে আমারি ভুল।

'ত্রীণি চিত্তানি চতস্রো ভাবনা ইতি মতে সতি অপি নিয়তং নমো অমিতবুদ্ধায়েতি অনেন উপপৎস্য ইতি মননে সর্বং পরিগৃহীতম্ অস্তি এব। ইতোঽপি যদি গম্ভীরতরং মতম্ অবগচ্ছামি, (তদা) দ্বয়োর্ ভগবতোঃ করুণায়া পতিতঃ পূর্বপ্রণিধানাৎ পরিভ্রষ্টঃ চ ভবিষ্যামি, বুদ্ধানুস্মৃতিং শ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ ভগবতো ধর্মং সুনিপুণং শিক্ষয়ন্তোঽপি অক্ষরানভিজ্ঞামূধায়মনঃ সন্তাঃ, অজ্ঞানবহুলভিঃ ভিক্ষুণীভিঃ ভিক্ষুভির্ বা সমানাঃ জ্ঞানী বাচরণমনাচরন্তো ভবেয়ুঃ ইতীয়ম্ এবাকান্ততো বুদ্ধানুস্মৃতিঃ।'

ওদিকে কিন্তু ধ্যানী বৌদ্ধ বা জেনপন্থীদের পরকালে বিশ্বাস নেই। স্বর্গ আবার কী! স্বর্গ হচ্ছে এই জগৎটাই। স্বর্গেই আমরা রয়েছি। যেহেতু এইখানেই পাওয়া যায় বুদ্ধের অন্তঃসার। আর কোনো পরলোক নেই। এর পরে বা এর বাইরে কিছু থাকতে পারে সে ভরসা নেই। বুদ্ধের

জীবনটাই সর্ব জীবের জীবন। মৃত্যু হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বুদ্ধশরীরে প্রত্যাবর্তন। বুদ্ধ যেমন স্থিতিশীল তেমনি গতিশীল। সর্বক্ষণ তাঁর সৃষ্টিক্রিয়া চলেছে, কল্যাণকর্ম চলেছে। জীবন বিচিত্ররূপে বিবর্তিত হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন তো তাঁরই জীবনের রূপরূপান্তর, তাঁরই ক্রিয়াতৎপর জীবন। নিজেদের স্বতন্ত্র ভেবে স্বর্গের কল্পনায় অমিতাভ বুদ্ধের নামকীর্তন করতে জেনদের বাধে। একই বৌদ্ধধর্ম। অথচ উত্তরমেরুর সঙ্গে দক্ষিণমেরুর মতো বৈপরীত্য। দ্বৈতবাদ বনাম অদ্বৈতবাদ। ইহলোক-পরলোক বনাম একই লোক।

বৌদ্ধমন্দিরে প্রার্থনা সব সময় করা যায়, রাত্রে যতক্ষণ না মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হয়। উপদেশ দিনের মধ্যে কয়েকবার দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সূত্র পাঠ করা হয়। বাতি জ্বলতে থাকে অষ্টপ্রহর। ধূপ জ্বলতে থাকে অনবরত। ফুল দিয়ে যায় লোকে। দক্ষিণা রেখে যায় পাত্রে। ঘুরে দেখতে দেখতে সাধ গেল মোকুগিয়ো বাজাতে। ঠক ঠক ঠক ঠক। কিন্তু উচ্চারণ করতে সাহস হলো না, নমু অমিদা বুৎসু, নমু অমিদা বুৎসু।

প্রধান পুরোহিত শিন্‌কো কিশি মহাশয়ের দর্শন লাভ হলো। ভারত সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হলো। কেমন করে তাঁর ধারণা জন্মেছে বর্তমান ভারতেও বৌদ্ধরা নিপীড়িত। তাঁকে ভেবে দেখতে বললুম, সারনাথের ধর্মচক্র যাদের জাতীয় পতাকায় প্রবর্তিত হয়েছে, অশোকের সিংহচতুষ্টয় যাদের রাষ্ট্রীয় লাঞ্ছন হয়েছে, তারা কি বৌদ্ধদের কম ভালোবাসে না বেশী ভালোবাসে? যারা স্বেচ্ছায় আড়াই হাজার বছর পরে বুদ্ধজয়ন্তীর অনুষ্ঠান করেছে তারা কি বুদ্ধকে কম ভালোবাসে না বেশী ভালোবাসে? এই যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু একদিনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিল, অন্যান্য হিন্দুরা বাধা দিল না, এ কি বিদ্বেষের পরিচয় বহন করে? না ঔদার্যের? প্রধান পুরোহিত আশ্বস্ত হলেন।

তবে দেশে ফিরে যা শুনেছি তাতে আমি নিজে আশ্বস্ত হইনি। যারা বৌদ্ধ হয়েছে তারা গ্রামের লোকের চোখে সেই হরিজনই রয়ে গেছে, বৌদ্ধ বলে নতুন কোনো মর্যাদা পায়নি। তাদের কাছে মর্যাদার প্রশ্নটাই বড়। যার জন্যে তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। সে প্রশ্নের উত্তর রাষ্ট্র দিতে পারে না। দিতে পারে গ্রাম। গ্রামবাসী সাধারণ। তার দেরি আছে। অথচ আর দেরি তাদের সইবে না। তারা যে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে এসেছে। জাতের নিপীড়নকে তারা ধর্মের নিপীড়ন বলে আর্তনাদ করবেই, সে নাদ বৌদ্ধ দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনি তুলবেই। ভারতের নাম খারাপ হবেই। 'আপার্টহাইড্' কি শুধু দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে?

মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে করিডোর দিয়ে যাচ্ছি। অকস্মাৎ গান গেয়ে উঠল জাপানী বুলবুল উগিউস্। কোথায় পাখী? কোথাও নেই। মেজে এমন কৌশলে তৈরি করা হয়েছে যে তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলেই বুলবুল গেয়ে চলে সঙ্গে সঙ্গে। এটা চিওঁইন মন্দিরের বিশেষত্ব। সেই সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। আর চিওঁইন মন্দিরের ঘণ্টা হলো অপর বিশেষত্ব। তার কথা আগে বলেছি। ঘণ্টা প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, ঘণ্টা কেবল সময় জানাবার জন্যে নয়। ঘণ্টা বলে, 'মন্দ থেকে ভালোয় ফিরে চল। দুঃখকে সুখে পরিণত কর। অজ্ঞতার সুপ্তি থেকে প্রজ্ঞার আলোকে জাগরিত হও।' বলে যায় ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কিবা রাত্রি কিবা দিন।

মধ্যাহ্নভোজনের পর যাই বুক্কো সেণ্টার বলে বৌদ্ধ ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানে। সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলি। সেখানে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন আর্ট ক্রিটিক রিয়ুগেন ওগাওয়া মহাশয়। আমাকে নিয়ে গেলেন যাঁর সকাশে তিনি কিয়োতোর তথা জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পী। চীনামাটির কারিগর বা জাদুকর। কানজিরো কাওয়াই।

এই একজন মনের মানুষ। কী সেন্‌সিটিভ চেহারা ও হাত! ইনি যে আর্টিস্ট তা কি কেবল

চেহারায় ও হাতে! তা এঁর চেতনায় ও ধ্যানে। কিমোনো-পরা সহজ মানুষটি। বাড়িতে বসেই কাজ করেন। ইংরেজী বলতে পারেন না, জাপানী বলেন মিষ্টি করে। চা খাওয়ালেন, কাজ দেখালেন, উপহার দিলেন একটি অপরূপ ছাইদানী। অতি মূল্যবান।

কাছেই এক রাকুয়াকির দোকান। চীনামাটির পিরিচ চিত্রিত করা হয়। কাঁচা থাকতে এক পিঠে বা দু'পিঠে ছবি আঁকতে বা নাম লিখতে পারা যায়। তুলি আর রং ওরাই যোগায়। যার যে রং খুশি। পরে পুড়িয়ে গ্লেজ করে আধ ঘণ্টার মধ্যে ডেলিভারি দেয়। অবিকল সেই নক্‌শা, সেই রং। আমি কয়েকটিতে আমার হাতের কাজ দেখে চমৎকৃত হলুম।

তার পর তোদো মহাশয়ের বাড়িতে নিশিযাপন। জাপানী বাথ। নিদ্রা। নিদ্রাভঙ্গ। চোদ্দই সেপ্টেম্বর সকালে ওসাকা যাত্রা। -

॥ ষোল ॥

কিয়োতো থেকে ওসাকা যেতে রেলপথে লাগে এক ঘণ্টারও কম। আর মানসপথে? হয়তো এক শতাব্দীরও বেশী। ওসাকা হচ্ছে তোকিয়োর চেয়েও আধুনিক। কিয়োতোর তুলনায় অত্যাধুনিক। কিয়োতো থেকে ওসাকা যেন প্যারিস থেকে নিউইয়র্ক।

বৃহৎ রেলস্টেশন। একান্ত মডার্ন। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন বুঙ্কো য়োকোয়ামা, বৌদ্ধ সাধু। আর হ্যারি শেপ্‌হার্ড, মার্কিন অধ্যাপক। আমার ছাত্র-প্রদর্শক হোজুন কিকুচি বা আমি তাঁদের চিনতুম না। তাঁরাও চিনতেন না আমাদের। কিন্তু বর্ণনা তো জানা ছিল। চিনতে দেরি হলো না। তখন আমরা সবাই মিলে চললুম সোজেন্‌জি মন্দিরে। ভূমিকম্পকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আকাশের দিকে তর্জনী বাড়িয়েছে কত যে মার্কিনতর ইমারত। ছোটখাটো স্কাইস্ক্রেপার। ওদিকে রাজপথ বলছে, আমায় দ্যাখ। আমার নাম বুলভার। ফরাসী আখ্যা। তার পর ক্যানাল বলছে, আমায় দ্যাখ, আমি ভেনিস না হই আমস্টারডাম তো হতে পারি।

বিশ বার বোমাবর্ষণে নাকি শহরের শরীরে আর পদার্থ ছিল না। এখন এমন চেকনাই হয়েছে যে বোমাবর্ষণের কোনো চিহ্নই নেই। আধুনিকতার এইটেই আসল কারণ। পুরাতন ধ্বংস হয়েছে বলেই তার জায়গায় নতুনকে আনতে হয়েছে। আনকোরা নতুন। আমেরিকার পক্ষেও নতুন। ওসাকা শহর জাপানের প্রাচীনতম শহরগুলোর তালিকায় পড়ে। আবার আধুনিকতমদের পর্যায়েও পড়ে। কী করে এটা সম্ভব হলো? তার উত্তর ওসাকার শিল্পবাণিজ্য ও সমুদ্রবন্দর। একইকালে দু'লাখ টন মালবাহী জাহাজ এই বন্দরে মাল খালাস ও মাল বোঝাই করে। এই শহরে পঁচাশি হাজার স্টোর আছে। বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলো তোকিয়োকেও হার মানায়। তাদের ছাদগুলো এত বড় যে সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের প্লেগ্রাউণ্ড। শহরে ও তার আশেপাশে ত্রিশ হাজার ছোট বড় কারখানা। বেশীর ভাগই কাপড়ের।

ওসাকায় কি আমি এইসব দেখতে এসেছি নাকি? না। এসেছি আমি বুনরাকু বা পুতুলের থিয়েটার দেখতে। ওসাকা ভিন্ন আর কোথাও নিয়মিত অভিনয় হয় না, যখন ইচ্ছা দেখা যায় না। কিন্তু আমার বন্ধুরা আমাকে সোজা সেখানে নিয়ে গেলেন না। প্রথমে নিমন্ত্রণ ছিল সোজেন্‌জি নামক ধ্যানীবৌদ্ধ মন্দিরে। সেখানে চা অনুষ্ঠান। তার পর নিপ্পন জীবনবীমা কোম্পানীর আফিসে।

সেখানে বক্তৃতা।

ওসাকার আধুনিক অঞ্চল দিয়ে যেতে হলো পুরাতন অঞ্চলে। যেখানে সোজেন্‌জি মন্দির। অপেক্ষা করছিলেন, অভ্যর্থনা করলেন প্রধান পুরোহিত সোগাকু নিশিওকা মহাশয়। তাঁর সহধর্মিণীর সঙ্গেও পরিচয় হলো। পুত্রের সঙ্গেও। মন্দিরটি বড় ছিল। বোমার মারে বেশীর ভাগ নেই। অনেক দিনের পুরোনো মন্দির। জাপানের আদি খ্রীস্টানদের একজনের—এক গভর্নরের—কবর আছে এর বাগানে।

জেন পন্থের তিন শাখা। রিন্‌জাই, সোতো, ওবাকু। এদের মধ্যে রিন্‌জাই সব চেয়ে পুরোনো, আর সোতো সব চেয়ে জনপ্রিয়। ওসাকার সোজেন্‌জি সোতো সম্প্রদায়ের মন্দির। রিন্‌জাই জেনরা পুঁথিগত জ্ঞানকে গুরুত্ব দেন না। সোতো জেনরা মনে করেন তারও মূল্য আছে, তাতে ধ্যানের সহায়তা। রিন্‌জাইদের বোধিলাভ হঠাৎ একদিন ঘটে। মন এক নিমেষে আলো হয়ে যায়। সোতাদের বোধি ক্রমে ক্রমে মেলে। মন একটু একটু করে আলোকিত হয়। ওবাকুদের খবর আমার জানা নেই।

সেদিন পৌঁছতে না পৌঁছতে অমনি চা অনুষ্ঠান। সত্যিকার চা অনুষ্ঠান প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে। আমার জন্যেও সেই রকম ঠিক ছিল। তাই যদি হলো তবে বুনরাকু দেখব কখন? ওসাকা ঘুরব কখন? সন্ধ্যাবেলা কিয়োতো ফিরে আসব কী করে? তাই অনুষ্ঠানটা সংক্ষেপিত হলো। আমি প্রধান অতিথি। আমাকে বসানো হলো তোকোনামার সব চেয়ে কাছে। তোকোনামা? তোকোনামার মতো আমাদের দেশে কিছু নেই, তুলনা দিয়ে বোঝানো শক্ত। জাপানী গৃহস্থের বাড়িতে বা সরাইতে প্রধান বৈঠকখানার এক কোণে মেজেটা একটু উঁচু হয় আর দেয়ালটা একটু পেছিয়ে যায়। দেয়ালে একটি পট ঝোলানো থাকে। ছবি বা ভাবচিত্র। উঁচু জায়গায় থাকে ফুলদানী।

এবার দেখি যিনি চা প্রস্তুত করছেন তিনি প্রবীণা মহিলা। আনুষ্ঠানিক কিমোনো পরিহিতা। পরিবেশিকারা আগের বারের মতো অর্থাৎ সেনবাড়ির মতো তরুণী। তেমনি রংচঙে কিমোনো পরা। ফুল আঁকা কিমোনো। এবার আমরা জনা পাঁচেক অভ্যাগত। তাও অখণ্ড মনোযোগের অধিকারী। প্রথম ও পঞ্চম বা শেষতম অতিথির মান বেশী। প্রত্যেকেরই আলাদা পেয়ালা। শেপ্‌হার্ড আর আমি যে বর্বর। সকলের সঙ্গে এক পেয়ালার শরিক হতে যে আমাদের শিক্ষার অভাব। তারিফ করতে করতে চা পান করি। সঙ্গে পিষ্টকও ছিল। আনুষ্ঠানিক চা পানের সময় গল্প করা বা আড্ডা দেওয়া অসভ্যতা। আমরা অসভ্য।

অনুষ্ঠান শেষে আমাদের পরখ করতে দেওয়া হলো এক এক করে ল্যাকারের তৈরি চা পাতার আধার, বাঁশের চামচ ইত্যাদি। এগুলি বহুকালের উত্তরাধিকার। পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত ও ব্যবহৃত। দেখতেও সুন্দর। যত্নের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে মাথা নেড়ে ও মুখ ফুটে প্রশংসা করলুম। তার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো অন্য একটি কক্ষে। সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন। চমৎকার আয়োজন। শেপ্‌হার্ড ছিলেন আমার পাশে। বীয়ার খাচ্ছিনে দেখে তিনি বললেন, 'আহা! খেলেনই বা একদিন এক চুমুক। সাধুরা সাধছেন।' অগত্যা আস্বাদন করা গেল। সাকের মতো বীয়ার এখন জাপানীদের নিজস্ব হয়ে গেছে। তেমনি নির্দোষ। লোকচক্ষে সুরার পর্যায়ে পড়ে না।

সহভোজীদের মধ্যে ছিলেন নিপ্পন জীবনবীমা কোম্পানীর দুই বন্ধু। তাঁরা আমাকে সদলবলে নিয়ে গেলেন তাঁদের আফিসে। সেখানে আমার বক্তৃতা। দিনটা শনিবার। ওদেশেও আধা ছুটি। যে যার ঘরমুখো। আমার বক্তৃতা শুনছে কে? তবু দেখলুম হলঘর একটু একটু করে আধাআধি ভরে উঠল। বেশীর ভাগই আফিসের মেয়ে। ভীষণ সীরিয়াস। আর সামনের সারিতে বৌদ্ধ সাধু ও সুধীবৃন্দ। আমার অগ্নি পরীক্ষক। বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে, 'ধর্ম, সৌন্দর্য ও প্রেম।' বললুম, 'ধর্মের

আমি কী জানি! প্রেম সম্বন্ধেই দু'চার কথা বলি। বলতে বলতে সৌন্দর্য সম্বন্ধেও বলা হয়ে যাবে।' ধার্মিকদের এড়িয়ে গেলুম।

কিয়োতোর প্রথম সন্ধ্যার প্রতিবেশিনী আমাকে যা বলেছিলেন তা মনে ছিল। তা ভেবে ওসাকার মেয়েদের কানে দিয়ে গেলুম আমার বাণী। যাতে ওরা জীবনে সুখী হতে পারে। আর নয়তো মর্যাদার সঙ্গে দুঃখী হতে পারে। একস্থলে উল্লেখ করলুম গান্ধীর নাম। বিশেষণ বিরহিত। আমার দোভাষী যখন ইংরেজী থেকে জাপানীতে ভাষান্তরিত করলেন তখন বললেন, 'মহাত্মা গান্ধী।' কী যে ভালো লাগল শুনতে! মহাত্মা গান্ধীকে ওরা চেনে! ওরা তাঁকে মনে রেখেছে! যদিও তিনি বহু দূর। যেমন দেশের দিক থেকে তেমনি কালের দিক থেকে।

বক্তৃতার শেষে যখন প্রশ্নোত্তরের পালা তখন একজন উঠে বললেন, 'আচ্ছা, যুদ্ধ অপরাধী বলে জাপানী সেনাপতিদের যে বিচার ও দণ্ডদান হলো সে বিষয়ে আপনার কী মত?' সর্বনাশ! আমার বক্তৃতার বিষয়ের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক! লক্ষ করলুম যে সভাসুদ্ধ সকলের কান খাড়া রয়েছে এই প্রশ্নটির উত্তর শুনতে। বুঝতে পারলুম কোন্‌খানে তাদের জ্বালা। বললুম, 'এক নেশন আরেক নেশনের বিচারক হতে পারে না, দণ্ডদাতা হতে পারে না।'

স্থানে অস্থানে সময়ে অসময়ে জাপানীরা আমাকে এমনি সব বেখাপ্পা প্রশ্ন করেছে। তার থেকে আঁচতে পেরেছি কোন্‌খানে-কোন্‌খানে তাদের জ্বালা। পরমাণু বোমার মার তারা ভুললেও ভুলতে পারে, কিন্তু বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের গ্লানি তারা ভুলবে না। যুদ্ধ অপরাধী বলে তাদের সেনাপতিদের বিচার ও দণ্ড যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। সে কি ভোলা যায়! না ক্ষমা করা যায়! তার পর মার্কিন সৈন্য মোতায়েন। তার অনিবার্য পরিণতি 'মিশ্র সন্তান।' এদের সংখ্যা হাজার দশেকের বেশী নয়। মার্কিনরাই অনেকের ভার নিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তবু জাতীয় আত্মসম্মানে বাধছে। এমন কি বিবাহেও সম্মানহানি। বিজেতাকে মেয়ে দেওয়া যেমন রাজপুতের পক্ষে তেমনি জাপানীর পক্ষেও হীনতাসূচক।

তা বলে যদি কেউ অনুমান করেন যে জাপানীরা মার্কিনদের উপর প্রথম সুযোগেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তা হলে ভুল করবেন। জাপানীদের মস্ত বড় গুণ তারা শিখতে চায়। শিখতে হলে কার কাছে শেখবার আছে সব চেয়ে বেশী? আমেরিকাকেই তারা মনে মনে গুরু বলে বরণ করেছে। গুরুমশায় মেরেছেন বলে তাঁর কাছে শিখবে না তো কার কাছে শিখবে? গুরুও শেখাতে রাজী। আগে তো সবকিছু শিখে আত্মসাৎ করুক। শিক্ষা সাঙ্গ হলে তখন না হয় গুরুমারা চেলা হবে। কিন্তু যার ঘাড়ের উপর লাল চীন ও মাথার উপর সোভিয়েট রাশিয়া সে কি তাদের সঙ্গে হাতাহাতি না করে আমেরিকার দিকে পা বাড়াতে সাহস পাবে? আর তাদের সঙ্গে হাতাহাতিও কি কম সাহসের কাজ! জাপান পড়ে গেছে তিন মহাশক্তির তেমোহানায়। তাদের কেউ তার চেয়ে দুর্বল নয়। ভবিষ্যতে জাপান যদি মহাশক্তি হয় তারা হবে মহত্তর শক্তি। আবার যদি চালে ভুল হয় তবে জাপান হবে তেভাগা। ধীরমতি জাপানীরা এই ভেবে কৃতজ্ঞ যে আমেরিকা রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজী হয়ে জাপানকে দোভাগা হতে দেয়নি। নয়তো হোক্কাইদো চলে যেত রুশ এলাকায়। জাপানের সরকারী নীতি মার্কিনের সঙ্গে মিতালী। বেসরকারী নীতি তিন মহাশক্তির সঙ্গে সমঝোতা। জাপানের সাধারণ লোক আর যুদ্ধ চায় না। একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী হয়ে তারা যা কিছু লাভ করেছিল শেষ বার হেরে তার সমস্ত হারিয়েছে, শুধু মূল জাপানটুকু রাখতে পেরেছে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর মতো। জার্মানদের তাতেও শিক্ষা হয়নি, তাই দোভাগা। জাপানীদের চোখ ফুটেছে। আমি তাদের বার বার বাজিয়ে দেখেছি। তারা ভুলে যেতে চায় কবে কোথায় কোন্‌ লড়াই জিতেছিল।

এর পর চললুম আমরা য়ামানাকা দাইবুৎসুদো কোম্পানীর আফিসে। এঁরা প্রায় আড়াই শ'

বছর ধরে বৌদ্ধ গৃহস্থদের ছোট মাপের ঠাকুরঘর সরবরাহ করে আসছেন। কাঠের তৈরি। বড় বড় মন্দিরে গেলে আপনি যে রকম ঠাকুরঘর দেখতে পাবেন অবিকল সেই রকমটি দেখবেন এঁদের আড়তে। শুধু আকারে ছোট। এক এক সম্প্রদায়ের এক এক ছাঁদের ঠাকুরঘর। তা দেখে চেনা যায় কোন্‌টা জোদো, কোন্‌টা জোদো-শিন, কোন্‌টা জেন, কোন্‌টা শিন্‌গন, কোন্‌টা নিচিরেন। কত নাম করব? আরো যে অনেক সম্প্রদায়। একই আড়তে পাশাপাশি সবাইকে দেখে আমি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে প্রত্যক্ষ করলুম। এসব ঠাকুরঘর জাপানের সর্বত্র চালান যায়। তা ছাড়া যায় হাওয়াই দ্বীপে, কালিফর্নিয়ায়, ব্রেজিলে।

চা পানের পর ফুমিকাজু য়ামানাকা হলেন আমাদের দলপতি। সঙ্গে চললেন বুঙ্কো য়োকোয়ামা, হ্যারি শেপ্‌হার্ড, হোজুন কিকুচি। আর কী জানি কেন এক ফোটোগ্রাফার। এবার আমাদের লক্ষ্য হলো বুনরাকু-জা। বুনরাকু থিয়েটার। পুতুল নাচের স্থায়ী মঞ্চ। রোজ বেলা এগারোটা থেকে রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে। চারটের পর আধঘণ্টা বিরতি। একাধিক পালা দেখানো হয়। যাঁর যেটা খুশি তিনি কেবল সেইটে দেখে উঠে আসতে পারেন। টিকিটের দাম সময় অনুসারে। আমরা ছিলুম তিনটের থেকে চারটে। প্রেক্ষাগৃহে। তার পরে আরো কিছুক্ষণ সাজঘরে। যে পালাটি দেখলুম তার নাম 'সানবাসো।' সংস্কৃত নাটকের ভরতবাক্য বা শান্তিপাঠ বা স্বস্তিবাচন বা দীর্ঘজীবনকামনা। চিনামাকাই আর মিৎসুওয়াকাই নামে দু'দল খেলোয়াড় দশ বছর পরে সম্মিলিত হয়ে খেলা দেখাচ্ছেন। এটা তাঁদের বিজয়ার শুভসম্ভাষণ।

পাঁচ পুতুল নিয়ে 'সানবাসো' দশ বছর পরে এই প্রথম। সাধারণত তিন পুতুল নিয়ে 'সানবাসো' হয়। আমি ভাগ্যবান যে আমি সাতান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপানে উপস্থিত ছিলুম। যে দুটি দলের নাম করলুম তারা মাসের পর মাস খেলা দেখিয়েছে, কিন্তু এ মাসটা এদের তো ও মাসটা ওদের। দশ বছর পরে তাদের সুবুদ্ধি হলো, তারা শুধু সেপ্টেম্বর মাসটাই একসঙ্গে মঞ্চে নামল। তাই পাঁচ পুতুল নিয়ে 'সানবাসো'। খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন মান্‌জুরো কিরিতাকে। পরে তিনি সরকার থেকে নীল রিবন পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন। পুতুলের বাঁ হাত কেমন করে নাড়তে হয় তাই শিখতেই এঁর লেগেছিল পনেরোটি বছর। আর পা দুটি কেমন করে নাড়তে হয় তা শিখতে লেগেছিল দশটি বছর। আগে পা নাড়া দিয়ে শিক্ষানবীশী শুরু করতে হয়। তার পর বাঁ হাত। তার পর ডান হাত ও মাথা। এখন এঁর বয়স সাতান্ন। 'সানবাসো' পালার পাঁচটি পুতুলের জন্যে এঁর মতো পাঁচটি প্রধান খেলোয়াড় লাগে। প্রত্যেকের আবার দুটি করে সহকারী। সহকারীদের মুখ আর শরীর আগাগোড়া কালো ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা। যেমন বোরকা পরা বেগম। এরা ছায়ামূর্তি। এদের পায়ে খড়ের চটি। আর প্রধানদের পায়ে বড় বড় থান ইটের মতো কাঠের পায়া, মাঝখানটা ফাঁপা। তাই পরে নাচেন যখন তখন আকাশ ভেঙে পড়ে। কিন্তু সে নাচটা শেষে।

পাঁচটি পুতুলের মধ্যে একটিকে বলে চিতোসে। তার মানে তরুণী। আর একটিকে বলে ওউনা। বৃদ্ধা। আর একটিকে বলে ওকিনা। বৃদ্ধ। বাকী দুটি পুরুষ। এই পাঁচ জনের মুখ হাত পা ঠিক মানুষের মতো। মূল্যবান সাজপোশাক। এঁদের আকার ঠিক মানুষের মতো না হলেও মানুষের দুই-তৃতীয়াংশ। মাটিতে পা পড়ে না। শূন্যে তুলে ধরতে হয় সমস্তক্ষণ। এত বড় একটি পুতুলকে একা একজন কী করে এক ঘণ্টাকাল শূন্যে তুলে ধরবেন ও সেই অবস্থায় নাচাবেন খেলাবেন অভিনয় করাবেন? অগত্যা আরো দু'জনের সাহায্য নিতে হয়। দুই ছায়ামূর্তির একজন ভার নেন পায়ের। একজন বাঁ হাতের। আর প্রধান নিজে ভার নেন মাথার ও ডান হাতের। মাথার সঙ্গে ডান হাতের প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ। ডান হাতের এক জায়গায় চাপ দিলে মাথাটা এক দিকে ঘোরে। অন্য জায়গায় চাপ দিলে মাথাটা অন্য দিকে ঘোরে। এক জায়গা টানলে চোখের তারা নড়ে। আরেক জায়গা

টানলে ভুরু নড়ে। পুতুলের আঙুলও নড়ানো যায়। এসব কিন্তু দীর্ঘকাল শিক্ষাসাপেক্ষ। শিখতে শিখতে নখ ক্ষয়ে যায়। নিজেরি আঙুলের ডগা বিকল হয়ে যায়। তা ছাড়া ওস্তাদের কাছে কিল চড় খেতে হয়।

কাবুকি থিয়েটারের মতো বিস্তীর্ণ মঞ্চ ও প্রলম্বিত মঞ্চবাহু। তেমনি পাইনতরু আঁকা পশ্চাৎপট। পশ্চাৎপট থেকে মঞ্চের দিকে নেমে এসেছে গ্যালারির মতো তিন সার আসন। পিছনেরটা সব চেয়ে উঁচু। মাঝখানেরটা তার চেয়ে কম উঁচু। সামনেরটা আরো কম উঁচু। পিছনের ও মাঝখানের সারি দুটি জোরুরি গায়কদের। সামনেরটি সামিসেন বাদকদের। গায়ক ও বাদকদের সংখ্যা সাতচল্লিশ জন। আর খেলোয়াড়দের সংখ্যা পনেরো জন। মোট বাষট্টি জন মানুষ। আর পাঁচটি পুতুল। সকলেরই পরনে ক্লাসিকাল জাপানী পোশাক। কেবল ওই ছায়ামূর্তিগুলিব দিকে তাকালে মায়া হয়। কমসে কম পনেরো বছর পদসেবা ও বাম হস্তের ব্যাপার চালিয়ে না গেলে প্রমোশন নেই। ততদিন মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু দুঃখ কী! একদা মান্‌জুরোকেও তাই করতে হয়েছে। করতে হয়েছে য়োশিদাকেও।

কেউ যদি মনে করে থাকেন যে সাড়ে আট শ' জনের প্রেক্ষাগৃহ রোজ দশ ঘণ্টাকাল ভরে যায় শুধু পুতুলের নাচ দেখতে তা হলে তিনি ভুল করেছেন। আকর্ষণটা ত্রিবিধ। প্রথমত জোরুরি গীতিকথার। একাধারে গান আর গল্প। জোরুরি নামে এক কালে এক নায়িকা ছিলেন, তাঁর কাহিনী নিয়ে জনপ্রিয় গান থেকে জোরুরি গীতিকথার উৎপত্তি। দ্বিতীয়ত সামিসেন বাজনার। তিন তারের যন্ত্র সামিসেন জাপানীরা পায় লুচু দ্বীপ থেকে। লুচু পায় চীন থেকে। তখন থেকেই জনপ্রিয়। ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন একদিকে জোরুরির আবির্ভাব তেমনি একদিকে সামিসেনের প্রাদুর্ভাব। লোকে জোরুরি শুনতে পাগল, সামিসেন শুনতে পাগল। তখন এক জোরুরি প্রবর্তকের খেয়াল হলো, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? পুতুল নাচের সঙ্গে যদি জোরুরি গীতিকথা জুড়ে দিই? যদি সামিসেন বাজনা জুড়ে দিই? তা হলে নাচ গান বাজনার তিনরকম আকর্ষণ কি তিনগুণ হবে না?

হলোও তাই। কিন্তু তার জন্যে দরকার হলো নির্দিষ্ট একটা স্থান। একটা মঞ্চ। ঘুরে ঘুরে গ্রামে শহরে পুতুল নাচ দেখানো এক কথা। একঠাঁই নাচ গান বাজনার আয়োজন করা আরেক। সপ্তদশ শতাব্দীর এদোতে গিয়ে জোউন খুলে বসলেন এক নাটশালা। মাটির পুতুল ছেড়ে তিনি কাঠের পুতুল প্রবর্তন করলেন। ছোট ছোট গীতিকা ছেড়ে তিনি ছয় সর্গের গীতিকথা রচনা করলেন। শোগুনের রাজধানী এদো। 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' প্রথমে চাঁদ হাতে পেয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। তার পর হাতে দড়ি। তাঁর শিষ্যরা ফিরে যান কিয়োতো। সেখানে নাটশালা খোলা হলো। পরের পদক্ষেপ ওসাকা। সেইখানে পায়ের তলায় মাটি পাওয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই যে ষাট সত্তর বছর এই সময় ওসাকায় কাবুকিকে নিষ্প্রভ করে পুতুল নাটশালা চলে, জোরুরির আকর্ষণটাই মুখ্য আকর্ষণ হয়, জাপানের শেক্‌স্‌পীয়ার বলে কথিত চিকামাৎসু গীতিনাট্য লিখে দেন, গিদায়ু করেন পরিচালনা। আর পুতুল গড়ে দেন বড় বড় কারিগর, সাসায়া হাচিবেই ও সাসায়া য়োচিবেই। ধীরে ধীরে কানের চেয়ে চোখের আকর্ষণ বেড়ে যায়। জোরুরির চেয়ে অভিনয়ের আকর্ষণ। রূপের আকর্ষণ। সাজের আকর্ষণ। ক্রমে ক্রমে কাবুকির দিকেই লোকের মন যায়। পুতুল থিয়েটারের কলাকৌশল আত্মসাৎ করে মানুষ। থিয়েটার জমে ওঠে। কাবুকির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুতুল নাচ পেছিয়ে পড়ে। এর নাটশালা ওর নাটশালায় পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ওসাকায় বুনরাকু-কেন নামে এক ব্যক্তি এসে একটি পুতুল নাটশালা খোলেন। এঁর যাঁরা উত্তরাধিকারী হন তাঁরাও একে একে বুনরাকু নাম গ্রহণ করেন। সত্তর

আশি বছরের সংগ্রামের পরেও এঁদের নাটশালাটি বেঁচে বর্তে থাকে। তখন তার নাম দেওয়া হয় বুনরাকু-জা। আরো পঞ্চাশ বছর পরে এর প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে একে পরাস্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বুনরাকু-জা হয়ে দাঁড়ায় জাপানের অদ্বিতীয় পুতুল নাটশালা। অগ্নিদেব সে কথা শুনবেন কেন? ১৯২৬ সালে পুড়ে ছাই হলো পুরাতন গৃহ। সেইসঙ্গে শতাধিক পুত্তলিকার অধিকাংশ। নতুন বাড়ি বানাতে হয়। পুতুল বানাতে হয়। অলক্ষিতে পুতুল নাট্যের ক্লাসিকাল পদ্ধতির নাম রটে যায় বুনরাকু। একদা এটি ছিল একটি ব্যক্তির নাম। পরে একাধিক ব্যক্তির মঞ্চ নাম। শেষে দাঁড়ায় একটা আর্টের নাম।

সেদিন 'সানবাসো' দেখতে দেখতে আমরা তন্ময় হয়ে গেলুম। মনে রইল না যে পুতুল নাট্য দেখছি। কাবুকি যেমন এক কালে পুতুল নাট্যের কলাকৌশল আত্মসাৎ করে ঐশ্বর্যবান হয়েছিল বুনরাকু তেমনি কাবুকির কলাকৌশল আয়ত্ত করে নাটকীয় ও মানবিক হয়ে উঠেছে। পুতুলের সঙ্গে মানুষ থাকলেও তাদের দিকে নজর পড়ে না। পুতুলকেই মনে হয় সজীব ও সচেতন। তারা কখনো পরস্পরের দিকে ছুটছে, কখনো একে অপরের কাছ থেকে পালাচ্ছে। কখনো আসল মঞ্চ থেকে বেরিয়ে হানামিচি বেয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসছে। আবার উত্তেজিতভাবে ফিরে যাচ্ছে। গতি আর ভঙ্গী এই নিয়ে অভিনয়। পুতুল বা তার বাহকরা কথা বলে না। যা বলবার তা বলে জোরুরি গায়করা। আর তাদের বলা তো সুর করে গেয়ে চলা। নো নাটকের মতো, কাবুকি নাটকের মতো, বুনরাকুতেও লক্ষ করলুম টেনসন ধাপে ধাপে চড়ছে। এ কি জাপানী নাট্যের দস্তুর? শেষে আকাশ ভেঙে পড়ল পঞ্চ পুত্তলিকার পরস্পরমুখী পরস্পরবিমুখ দুরন্ত ঘুরন্ত তাণ্ডবে। কাঠের পায়া বাঁধা পায়ে বাহকদের ধাঁই ধাঁই ধপ ধপ দুম দাম আওয়াজে। এমন চমৎকার ছন্দে ছন্দে নাচন ও মাতন আর কোথাও দেখিনি। জাপানীরাও দেখল দশ বছর পরে পুনর্বার।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে নীত হলুম সাজঘরে। রাশি রাশি পুতুল। সাজ খুলে নেওয়া আটপৌরে আচ্ছাদনে মোড়া। এক কোণে বসেছিলেন তামাগোরো য়োশিদা। এটা মঞ্চ নাম। জাপানে মঞ্চ নাম এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে বর্তায়। তামাগোরো য়োশিদার ইনি দ্বিতীয় পুরুষ। সেকেণ্ড জেনারেশন। আপন নাম মাসাইচি য়ামাশিতা। ছোটখাটো মানুষটি পঁয়ত্রিশ বছর পুতুল নাট্যে হাত পাকিয়েছেন। পায়ের কাজ শিখতে পাঁচ বছর। বাঁ হাতের কাজ দশ বছর। ডান হাতের কাজ দশ বছর। এ গেল সাগরেদী। তার পর থেকে ওস্তাদী। অতি বাল্যকাল থেকে শিক্ষানবীশী। দলের লোকদের সম্বন্ধে মজার মজার গল্প বললেন। একজনের সঙ্গে একজনের যখন দেখা হয় তখন রাত দশটাই হোক আর বেলা বারোটাই হোক ইনি বলবেন, 'সুপ্রভাত।' আর উনি বলবেন, 'সুপ্রভাত।' তেমনি বিদায় নেবার সময় বেলা আটটা না সন্ধ্যা সাতটা সে খেয়াল থাকে না। ইনি বলবেন, 'সুনিদ্রা হোক।' উনি বলবেন, 'সুনিদ্রা হোক।'

তামাগোরো একটি সুন্দরী পুত্তলিকা আনিয়ে আমার সামনে রাখলেন। দেখালেন যতরকম প্রচ্ছন্ন কলকব্জা। কোন্‌খানে হাত দিলে কোন্‌খানটা নড়ে চড়ে ঘোরে। 'সুন্দরী আপনাকে দেখে খুশি হয়েছে। হাতে হাত রাখুন। হাত নাড়ানাড়ি করুন। সুন্দরী আপনাকে ছাড়তে চায় না। কাঁদছে। ওই দেখুন চোখে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে। সুন্দরী আপনার প্রেমে পড়ে গেছে। ওকে কাছে টেনে নিন।' সুন্দরীকে কাছে টেনে নিয়ে একটু শান্ত করছি। ওমা, তক্ষুনি ফোটো তোলা হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতক ফোটোগ্রাফার! এইজন্যেই কি তোমাকে সঙ্গে করে এনেছি!

আপনারা শুনলে শক্ পাবেন, তবু সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে, সুন্দরীর দেহ বলতে কিছু নেই। ওই মুখখানি আর গলাটি আর হাত দুটি আর পা দু'খানি। আহা, বেচারি! কিন্তু ওদিকে বাহক বেচারাদের দশাটাও ভেবে দেখতে হয়। এঁর যদি দেহ থাকত তা হলে সে দেহের ভার কত

হতো আন্দাজ করুন। সে দেহটিকে শূন্যে তুলে ধরতে তিন তিনটি পুরুষেরও সাধ্যে কুলোত না পাকা এক ঘণ্টা। আর আমিও কি কাছে টেনে নিয়ে পুতুলচাপা পড়তুম না? সত্যি, সুন্দরীর কাছ থেকে বিদায় নিতে দুঃখ হচ্ছিল। তামাগোরোর কাছ থেকেও।

য়ামানাকা-সান কাজের লোক। তিনি আমাকে খুব কম সময়ের মধ্যে খুব বেশী দেখাবেনই। এর পর নিয়ে চললেন নতুন টাওয়ারে। ছোটখাটো কুতুব মিনার। উপরে ওঠার জন্যে লিফ্‌ট্‌ আছে। প্রথম লিফ্‌ট্‌টা গোলাকার। তার পরেরটা চতুষ্কোণ। চূড়ায় উঠে শহর দেখা গেল দাঁড় করানো বড় বড় বাইনোকুলার দিয়ে। দূরে ইতিহাসবিখ্যাত ওসাকা দুর্গ। এক নজরে যা দেখলুম তাতে মনে হলো চার দিকে আধুনিক ইমারত গড়ে উঠছে। ম্যানসন। ফ্ল্যাট।

এর পর য়ামানাকা-সান নিয়ে গেলেন গরিবদের বস্তি দেখাতে। দারুণ ভিড়। চাঁদনির মতো সস্তা দোকান। কম দামে সব চীজ পাওয়া যায়। জুয়োখেলার মেশিন। অসংখ্য লোক একা একা খেলছে। আমিও খেললুম। হেরে গেলুম। তার পর সুলভ রেস্টোরাণ্টে আহার। প্রত্যেকটি ডিশ দশ ইয়েন বা তেরো নয়া পয়সা। টুলের উপর বসে কাঁকড়া খেলুম। বুক্কো য়োকোয়ামা বৌদ্ধ সাধু। তিনি সেখানে ঢুকবেন না। বাইরে অভুক্ত থাকবেন।

তখনো সন্ধ্যা হয়নি। য়ামানাকা-সান এক চক্কর ঘুরিয়ে আনলেন যেখানটার চার দিকে সেটা ওসাকার 'walled city'। হতভাগিনীদের আগে সেখান থেকে বেরোতে দেওয়া হতো না। এখন প্রাচীরে ফাঁক হয়েছে। তারা নামে স্বাধীন। জীবনে যা কখনো দেখিনি তাই দেখা হয়ে গেল। বিলাসগৃহ। বিলাসিনী। মোটর একমুহূর্ত থামেনি। থামলে ওরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ত। শেপহার্ড বললেন, 'ভাগ্যিস সন্ধ্যা হয়নি। নইলে টেনে নিয়ে যেত।'

॥ সতেরো ॥

ট্যাক্‌সি ডান্‌সার কাকে বলে জানেন? আমি জানতুম না। তবে নাম শুনেছিলুম। কিন্তু কোনোদিন কল্পনা করিনি যে স্বচক্ষে দেখব। স্বপ্নেও ভাবিনি যে—থাক। যথাকালে।

আমার ধারণা ছিল য়ামানাকার মোটর ওসাকা স্টেশনের অভিমুখে ছুটেছে। আমি কিয়োতো ফিরে যাচ্ছি। তা নয়। শেপ্‌হার্ড বললেন, 'এখানে একটা কাবারে আছে। তাতে আট শ' জন ট্যাক্‌সি ডান্‌সার। আপনার দেখা উচিত।' তার পর তিনি কথায় কথায় বললেন, 'ওদের মধ্যে শুনেছি এমন মেয়েও আছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। পড়ার খরচ জোটানোর জন্যে পার্ট টাইম নাচে।' আমার ঔৎসুক্য জাগল। দেখা যাক কী রকম cabaret!

বেচারা বুক্কো য়োকোয়ামা! আমার অভিভাবকরূপে কাসুগাই কর্তৃক নির্বাচিত। বৌদ্ধ সাধুকে তো আট শ' জন ট্যাক্‌সি ডান্‌সারের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যায় না। তিনিও সঙ্কুচিত। তাই তাঁকে কাবারের সুমুখে নামিয়ে দেওয়া হলো। পথি সাধু বিবর্জিত। আমরাও নিশ্চিন্ত হয়ে নাইটক্লাবের টিকিট কাটলুম। বিবিন্-জা। সুন্দরী তরুণীদের স্থান। আমাদের আতিথ্যের মেয়াদ এক ঘণ্টা। সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা।

ভিতরে যেতেই তরুণীরা আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন সামনের দিকের একটি খোলা বক্‌সে। সেখানে পাশাপাশি জনা দশেকের বসবার জায়গা। নাচের মেজের দিকে কতক

জনের মুখ। কতকের মুখ পরস্পরের দিকে, ঘাড় ঘোরালে নাচের মেজের দিকে। আসনের সম্মুখে টেবিল। টেবিলের উপর পানীয় ও ভোজ্য।

খেলা দেখানো শুরু হয়ে গেছে। মেজের মাঝখানটা গোল মঞ্চের মতো উঁচু হয়ে উঠল। মঞ্চের উপর তরুণবেশী তরুণীদের সঙ্গে তরুণীবেশী তরুণীদের তামাশা। পাশ্চাত্য সঙ্গীত আসছিল উপর তলার বাদকদের বিভিন্ন যন্ত্র থেকে। চার দিক চেয়ে দেখলুম দর্শকরা বসেছেন গোলাকার ব্যূহ রচনা করে। সব দিকই সামনের দিক। সারির পর সারি। পিছনের সারিগুলো ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে।

আমরা ছিলুম পাঁচজন পুরুষ। সঙ্গে নারী নেই। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। চেয়ে দেখি পাঁচটি মেয়ে এসে পাশে পাশে বসেছে। তাদের কেউ কিমোনোধারিণী কেউ পাশ্চাত্যবেশিনী। পাশ্চাত্য পোশাক পরলেও পাশ্চাত্য ভাষা জানে না। দুঃখের কথা আর জানাই কাকে। আমার পাশে এসে একটিও মেয়ে বসে না। একাধিক বসে গিয়ে ছাত্রটির পাশে। বোধ হয় সমবয়সী ও স্বভাষী বলে। আমি মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলতে থাকি আর মনকে বলতে থাকি, 'আঙুর ফল টক।' অবোধকে বোঝাই যে এই রঙ্গিলা দুনিয়ার রঙ্গভূমিতে সে দর্শকমাত্র। মন, চেয়ে দেখ কেমন তামাশা চলেছে। মঞ্চের উপর দৃষ্টিপাত কর। পাশের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাও। ওই দেখ, উঁচু মঞ্চ নিচু হতে হতে মিলিয়ে গেল। রঙ্গিণীরা অদৃশ্য।

এমন সময় বেজে উঠল নাচের বাজনা। পরিচিত সুর। ওয়াল্ট্জ্। জোড়ে জোড়ে চলল সবাই মেজের উপর ঘুরে ঘুরে নাচতে। এবার তরুণীর সঙ্গে তরুণী নয়। দর্শকরাই নর্তক। সঙ্গিনীরাই নর্তকী। য়ামানাকা আর স্থির থাকতে পারলেন না। অনুমতি নিয়ে আসন ত্যাগ করলেন। শেপ্হার্ড বার বার 'না, না' করলেন। তার পর আমার কাছে মাফ চেয়ে ফেরার হলেন। কিন্তু যাবার আগে আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ পরে একটি ইংরেজী জানা মেয়ে পাওয়া গেছে।' মেয়েটি সত্যি সত্যি আমার পাশে এসে আসন নিল।

আমার খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু তখন মন দিয়ে নৃত্যযজ্ঞ নিরীক্ষণ করছি, সঙ্গীত উপভোগ করছি। কে যে আমার পার্শ্ববর্তিনী হলো ভালো করে চেয়ে দেখলুম না। শুধু লক্ষ করলুম যে আমাদের ফোটোগ্রাফারের ক্যামেরা সহসা সক্রিয় হলো। তিনি মেয়েটিকে তাক করলেন। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই ফোটো তুলতে দেবে না। দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকবে। টেবিলের তলায় মুখ লুকোবে। আমি ধরে নিলুম যে আমার সঙ্গে ফোটোগ্রাফিত হতে তার আপত্তি। একটু সরে বসলুম। ফোটোগ্রাফার পরাস্ত হয়ে নিরস্ত হলেন।

মেয়েটির সঙ্গে দুটি একটি কথা হলো। তার পর দেখি সে উঠে গেছে। আপদ গেল। তার পর দেখি তার জায়গায় এসে বসেছে একটি কিমোনো পরা মেয়ে। ইংরেজী জানে না। তবু তাকে বলতে ভালো লাগছিল যে কিমোনো আমি ভালোবাসি। এখানে উল্লেখ করি যে পূর্ববর্তিনীর পোশাক ছিল পাশ্চাত্য। কালো নাচের গাউন।

এই মৌন মেয়েটিও কখন একসময় উঠে গেল। তখন আবার এলো সেই মুখর মেয়েটি। যেমন সপ্রতিভ তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রাণবান। চুল উঁচু করে বাঁধা। উজ্জ্বল মুখ। পাশে বসে বলল, 'তুমি তো পান করবে না, দেখছি। আমাকে ঢেলে দাও।'

কড়া কিছু নয়। বীয়ার। দিলুম ঢেলে। নিজে নিলুম না। নিঃস্পৃহ।

নাচের বাজনা একবার থামে, আবার বাজে আর মেয়েটি চঞ্চল হয়। বীয়ার রেখে বলল, 'সিগারেট খাবে না? আমি খাই।' এই বলে সে সিগারেট ধরাল। আমারি উচিত ছিল ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমি তখন অন্যমনস্ক।

তার পর মেয়েটি বলল, 'নাচতে যাবে না?'

আমি বললুম, 'নাচতে জানলে তো?'

মেয়েটি তা শুনে ফেটে পড়ল। ঝাঁজালো স্বরে বলল, 'ইউ ডোণ্ট স্মোক। ইউ ডোণ্ট ডিরিঙ্ক। ডোণ্ট ডান্স। দেন হোয়াট ডু ইউ ডু?'

আমি থতমত খেয়ে বললুম, 'আই ডু নাথিং।'

সে বোধ হয় আমার আশা ছেড়ে দিল। তার পর তার নজরে পড়ল আমার নাম লেখা পেন কংগ্রেসের ব্যাজ। একটু ঝুঁকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখতে লাগল।

বাস্তবিক, পুরুষকেই করতে হয় নাচের প্রস্তাব, নইলে নারী অপমানিতা বোধ করে। তাই আমার একবার মনে হলো, যারা নাচছে তারা এমন কী আহামরি নাচতে জানে! আমি যদি নাচি তো কেই বা আমার খুঁৎ ধরবে! ধরলে ধরবে সঙ্গিনী। কিন্তু তাকে তো বলে রেখেছি যে আমি জানিনে। তার পর সাত পাঁচ ভেবে সে খেয়াল ছাড়লুম।

এর পর নাচের এক অঙ্ক শেষ হলো। যে যাঁর আসনে ফিরলেন। য়ামানাকা-সান বললেন, আমাদের থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। আমার পাশে তখনো সেই মেয়েটি। সে যখন শুনল যে আমরা আজকের মতো উঠছি তখন আমাকে বলল, 'এত শীগগির কেন?'

বললুম, 'আমাকে এখনি কিয়োতোর ট্রেন ধরতে হবে।'

'তা হলে আবার কবে আসবে?'

'আর আসব না। কিয়োতো থেকে তোকিয়ো যেতে হবে। সেখান থেকে ভারত।'

'ভারত থেকে আবার কবে আসবে?'

'কে জানে আবার কবে! হয়তো এ জীবনে নয়।'

মেয়েটি আমাকে তার কার্ড বের করে দিল। ছাপা ছিল বিবিন্-জা। নম্বর এত। নাম? নাম ছাপা নেই। শুনলুম, 'এই নম্বর বললেই ওরা আমাকে ডেকে দেবে।'

মেয়েটিকে আমার ভালো লাগতে আরম্ভ করেছিল। আমার কার্ড বের করে দিলুম। তার কার্ডের গায়ে তার নাম লিখে দিতে বললুম। এর জন্য তাকে সাধতে হলো। বলতে হলো, 'তুমি একটি বিবিন্।' সে শরমে নত হলো।

নাম প্রকাশ করা বোধ হয় ওখানকার রীতি নয়। সে কী একটা লিখতে চেষ্টা করল। তার পর ছিঁড়ে ফেলল। অন্য একটা কার্ডে শেপ্হার্ডকে বলল লিখে দিতে। তিনি লিখে দিলেন ছোট একটুখানি নাম। পদবী নেই। বাড়ির ঠিকানাও নেই। আমি পীড়াপীড়ি করলুম না। উঠলুম।

এর পর আমরা পাঁচজনে ডান্স হল থেকে বেরিয়ে করিডোর দিয়ে বাইরে চললুম। ভেবেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে বিদায় দেওয়ানেওয়া হয়ে গেছে। দেখি সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আমার হাতে হাত রেখে। আর কোনো মেয়ে আর কারো সঙ্গে আসেনি। সকলের দৃষ্টি আমার উপরে। তার উপরে। সারা পথ লোকে চেয়ে দেখছে।

বাইরের দরজার কাছাকাছি এসেছি এমন সময় সে আমাকে আগলে দাঁড়াল। 'যেতে নাহি দিব।' সে কী? তা কি হয়। য়ামানাকারা ইতিমধ্যেই গাড়িতে গিয়ে উঠেছেন। দারোয়ানরা বিনা পয়সায় তামাশা দেখছে। আমি 'সায়োনারা' বলে হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে বিদায় নিলুম। গাড়িতে উঠে পিছন ফিরে লক্ষ করি মেয়েটি একই স্থানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। গাড়ি ছেড়ে দিল। তখনো মেয়েটি সেইখানে দাঁড়িয়ে। তেমনি তাকিয়ে।

এর পরে রেস্টোরান্টে গিয়ে জাপানী ধরনে আহার। বুঙ্কো য়োকোয়ামা যোগ দিলেন। কথায় কথায় বিবিন্-জা'র প্রসঙ্গ উঠল।

শেপ্হার্ড আক্ষেপ করলেন, 'আপনি জানেন না আপনি কী হারালেন। ওখানকার সব চেয়ে

যেটি সুন্দরী সেই মেয়ে এলো আপনার কাছে। তার সঙ্গে আপনি নাচলেন না।'

আমি হাসলুম। তার পর জানতে চাইলুম ওদের সিস্‌টেমটা কী। মেয়েটির সঙ্গে নাচলে কি আলাদা করে কিছু দিতে হতো আমাকে?

য়ামানাকা-সান এর উত্তর দিলেন। যা দেবার তা আগেই দেওয়া হয়ে গেছে টিকিটের দামের সঙ্গে শতকরা দশ হিসাবে। কর্তৃপক্ষ সারা মাসের শতকরা দশকে আট শ' জনের মধ্যে সমভাগ করে দেন। তা ছাড়া প্রত্যেকে একটা মাসোহারা পায়। এক একটি মেয়ের নীট উপার্জন মাসে পঞ্চাশ হাজার ইয়েন। তার মানে সাড়ে ছ'শ টাকা।

আমি যে ওই মেয়েটির সঙ্গে নাচলুম না তার দরুন ওর আয় কি একটুও কমবে না?

য়ামানাকা-সান আমাকে আশ্বাস দিলেন যে কেউ যদি নাচের আহ্বান না পায় তা হলেও তার আয় একটুও কমে না। ওরা বাছা বাছা মেয়ে। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কাজ পেয়েছে। ওটা ওদের ন্যূনতম আয়। তা ছাড়া বোনাস আছে। কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে নাচবার জন্যে যদি কর্তৃপক্ষের কাছে কেউ প্রার্থী হয় আর সেই মেয়েটির জন্যেই আসে তা হলে কর্তারা সেই প্রার্থিতার হিসাবে একটা বোনাস জুড়ে দেন। মাসের শেষে দেখা যায় সে বোনাসরূপে আরো কিছু উপরি পেয়েছে।

'ওই মেয়েটি গত মাসে সব জড়িয়ে কত পেয়েছে, শুনবেন?'

কত আর হবে! আমার কল্পনার দৌড় পঁচাত্তর হাজার ইয়েন। এক হাজার টাকা।

য়ামানাকা-সান গম্ভীরভাবে বললেন, 'থ্রী হাণ্ড্রেড থাউস্যাণ্ড ইয়েন!' চার হাজার রুপেয়া! গভীর আঘাত পেলুম শুনে। ও মেয়ে তো আমার কাছে রজতপ্রত্যাশী হয়নি। ও তো আমার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পায়। নাচঘর থেকে আমার সঙ্গে এসে যে সময়টা নষ্ট করল সে সময় হয়তো আর কারো প্রার্থনাপূরণের সময়।

এতক্ষণে আমার জ্ঞান হলো কী আমি হারিয়েছি। আর কী আমি পেয়েছি।

কিয়োতো পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। তোদো মহাশয় আর তাঁর গৃহিণী স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন অনেকক্ষণ। সেইখান থেকে সোজা নিয়ে গেলেন জাপানী সরাইতে। আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে এক রাত জাপানী সরাইতে কাটাব।

সরাইটি বনেদী। কিন্তু ছোট। এক ভদ্রমহিলা এর মালিক। নিজে থাকেন ও দেখাশোনা করেন। একটি পরিচারিকা রাঁধে, আর দুটি অতিথিদের ঘরে গিয়ে পরিবেশন করে, বিছানা পেতে দেয়, ফাইফরমাশ খাটে। অতিথিসংখ্যা অল্পই। দোতলায় তো আমি দ্বিতীয় অতিথি দেখলুম না। একখানা বড় বসবার ঘর ও একখানা ছোট শোবার ঘর আমার জন্যে বরাদ্দ। তা ছাড়া একটা অপ্রধান শৌচাগারও ছিল। একতলায় আরো কয়েকজন অতিথি। ঘরের সংখ্যা বেশী।

সরাইটির নামটি রোমান্টিক। শোগেৎসু। পাইন গাছে চাঁদ। কাছে কোথাও পাইন বন চোখে পড়ল না, কিন্তু রমণীয় উদ্যান। রক গার্ডেন। রাজপরিবারের এক মহিলা কবে নাকি এর একটি কক্ষে বাস করেছিলেন। পরের দিন সেই কক্ষে ক্ষণকাল উপবেশন করলুম। উদ্যানের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি। শান্ত সুন্দর পরিবেশ।

জাপানী সরাই নিয়ে রোমান্স রচনা করা জাপানীদের ঐতিহ্য। বিদেশীরাও সেখানে রোমান্স অন্বেষণ করেন। আমার সেইজন্যে আশঙ্কা ছিল যে রোমান্স আপনি এসে জুটবে আর কী জানি কী বিপদে পড়ব। জাপানী ভাষা জানলে তবু তার কাটান ছিল। কে বুঝবে আমার ইংরেজী। কাকেই বা বোঝাব যে আমি শুধু একরাত্রির মুসাফির। দেখে যেতে চাই জাপানের অন্যতম দ্রষ্টব্য। জড়িয়ে পড়তে চাইনে।

তোদো মহাশয় আর তাঁর গৃহিণী যখন আমাকে মালিকা ও তাঁর পরিচারিকাদের হাতে সঁপে দিয়ে চলে গেলেন তাঁদের সাহায্যে তার আগেই আমি জানিয়ে রেখেছিলুম যে আমি স্নানার্থী। ভাষার অভাবে যাতে স্নানের অভাব না হয়। পরিচারিকা একখানি পরিষ্কার য়ুকাতা এনে দিল। চটি তো তার আগেই পায়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সব মিলবে যথাস্থানে। অনুসরণ করলুম আমার প্রদর্শিকার। কিমোনো পরিহিতা সুরূপা সুভদ্রা। পরিচারিকা বলে ব্যক্তিমর্যাদায় খাটো নয়। আমার মনে হয় শ্রেণীমর্যাদাও পরিচারিকার উর্ধ্বে।

প্রথমে পড়ে ড্রেসিং রুম। সেখানে স্নানের আগে কাপড় ছাড়তে ও স্নানের পরে কাপড় পরতে হয়। যে যার কাপড়। সারি সারি কাপড়। আমার অতটা খেয়াল ছিল না। ভেবেছিলুম ও ঘরে না ছেড়ে পরের ঘরে ছাড়লেই চলবে। যেটা আসল স্নানাগার। আমার কুণ্ঠার অন্য কারণও ছিল। কপাট বলে একটা উপসর্গ নজরে পড়ছিল না। তার বদলে ছিল পর্দা। অবশ্য কপাট থাকলেও যে খিল থাকত এমন কোনো কথা নেই। যে কোনো লোক যে কোনো সময় ঘরে ঢুকে আমার প্রাইভেসী ভঙ্গ করতে পারত। আর শ্রীকৃষ্ণের মতো কেউ যদি ঘাট থেকে বস্ত্রহরণ করত তা হলে আমি যে গোপীদের মতো স্তব স্তুতি করব তার জন্যে ভাষা নেই।

য়ুকাতার নিচে আমি চুরি করে অন্তর্বাস পরে এসেছিলুম। পরিচারিকা তা ধরে ফেলল। একে একে খুলতে হলো তার সাক্ষাতে। সেও তার ভাষায় বোঝাতে পারে না, আমিও পারিনে আমার জানা ভাষায়। আকারে ইঙ্গিতে যে যতটুকু পারে। তবে শেষ মুহূর্তে সে চোখ বুজে পালিয়ে গিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও ভাবনা যায় না। এমন কি হতে পারত না যে আমি স্নানের কুণ্ডে নিমজ্জিত হলুম আর অমনি আরেকজনের আবির্ভাব ঘটল? তিনিও স্নানার্থী বা স্নানার্থিনী। একেই বলে ডেমক্রেসির খাঁড়া। যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ এসে বলতে পারেন, 'স্থানং দেহি।' যত বড় কুণ্ড তত বেশী দাবীদার। এই কুণ্ডটি যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর ও পরিষ্কার। এতে বসে ও শুয়ে অন্তহীন আরাম। কিন্তু আর কেউ এসে চাইলেই অংশ দিতে হবে। রক্ষা এই যে আজকাল পুরুষরা থাকতে মহিলারা আসেন না, মহিলারা থাকতে পুরুষরা আসেন না। কিন্তু ভুল করেও তো উঁকি মারতে পারেন। যদি আগে থেকে বলা থাকে।

আমার বেলা তোদো কিছু বলে রেখেছিলেন কি না জানিনে, আমি সেদিন নিভৃতে নির্জনে ভাসমান হয়ে ব্যাঘাত পাইনি। তবে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠেছিলুম। স্নানের শেষে গোপীদের মতো অবস্থা হয়নি। দোতলায় গিয়ে নরম বিছানায় ঢালা বিছানায় গা ঢেলে দিলুম। জাপানী প্রথামতো য়ুকাতা সমেতে। আঃ! কী আরাম! হঠাৎ খেয়াল হলো যে রাত্রে তেষ্টা পেলে খাবার জল নেই। বেল টিপতেই পরিচারিকা এলো। রাত এগারোটার সময় মেডকে ঘরে ডাকা তো সাধু লোকের কর্ম নয়। বরাত ভালো যে জাপানী ভাষায় জলকে কী বলে তা আমার জিবের আগায় জুটে গেল। ভিজে বেড়ালের মতো বললুম, 'মিজু।'

জল এলো। তার পরে ঘুম এলো। তার পরে ভোর হলো। তার পরে ঘুম ভাঙল। পায়চারি করে দোতলাটা দেখলুম। দোতলা থেকে শহর। বসবার ঘরে মনোহর একটি পট ছিল। তোকোনামায় ঝোলানো। আর ছিল একটি খাড়া পর্দা। তিন ভাঁজ কি চার ভাঁজ। তাতেও ছিল ছবি আঁকা। চমৎকার। পুরাতন। সরস্ত কপাটেও যতদূর মনে পড়ে নকশা ছিল। আর ওই যে নিচু টেবিলটিতে খাবার দিয়ে যায় সেটিও কাজ করা। তার এক পাশে একটি হাত রাখার আসবাব থাকে। যাতে হাত রেখে চেয়ারের হাতলের সাধ মেটাতে পারেন। সেটিতেও কারুকার্য। মেজে তো আগাগোড়া মাদুরে মোড়া।

এবার এলো প্রাতরাশ। আমি আমার অনভ্যস্ত চপ স্টিক দিয়ে যেমন তেমন করে খাচ্ছি

দেখে আমার পরিবেশিকার হাসি পেল। এটি আরেকটি মেয়ে। তেমনি কিমোনো পরা। সে আমার কাছে বসে আমাকে খোকাবাবুর মতো খাইয়ে দিল। ভারী ভালো লাগল।

প্রাতরাশের পরে একে একে বন্ধুদের প্রবেশ। কলেজের দুটি মেয়ে এলো আমার কবিতা পড়ে কেমন লেগেছে জানাতে। আমি তাদের লিখে দিলুম অটোগ্রাফের কবিতা আর তারাও লিখে দিল আমাকে উদ্দেশ করে কবিতা। তোদো এলেন। পাওনা চুকিয়ে দিয়ে চলে যাবার আগে ঘুরে ফিরে দেখলুম বাগান আর রাজবংশীয়ার কক্ষ। জাপানী সরাই হোটেল নয়। সরাই বলতে আমরা যা বুঝি সে জিনিসও নয়। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটি সহজ আত্মীয়তা জন্মায়। প্রভুভৃত্য সম্পর্কের বেড়া ভেঙে যায়। মালিক ভাড়াটে সম্পর্কের ব্যবধান কমে আসে। শ্রীহস্তের পরশ থাকে বলে একটি ঘরোয়া ভাবও থাকে।

কিয়োতোয় এই আমার শেষ দিন। দেখতে দেখতে আট রাত কেটে গেল। আরো এক রাত কাটবে। এবার এক বাঙালীর বাড়িতে, অথচ জাপানীর সংসারে। লেডী মুরাসাকির কিয়োতো! কত কালের নগরী! সেই যে কবে 'গেঞ্জি' পড়েছিলুম বিশ বছর কি পঁচিশ বছর আগে সেই থেকে পরিচয়। কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে!

উপহারের উপর উপহার জমেছে। বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যাগ কিনতে চললুম বড় একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে। দাইমারু। সেইখানেই ট্র্যাভেলার্স চেক ভাঙানো যায়, যদিও দিনটা রবিবার। আর তারাই খরিদা মাল বাড়ি পৌঁছে দেয়। সবই মেলে এক জায়গায়, তবু পুতুলের জন্যে গেলুম নামজাদা একটি পুতুল দোকানে। বড় মেয়ের হুকুম ছিল, বড় দেখে একটি জাপানী পুতুল কিনতে হবে। আকাশপথে নিয়ে যাবার ভাবনা না থাকলে আরো বড় কিনতেও রাজী ছিলুম। পুতুলের দেশ জাপান। যত ছোট চান তত ছোটও পাবেন, যত বড় চান তত বড়ও পাবেন। কল্পনা করতে পারবেন না এত ছোটও আছে, এত বড়ও আছে। যেটি কিনলুম সেটি জাপানের পক্ষে মাঝারি, আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বড়। আর মধুর।

তোদো নিয়ে গেলেন রেস্টোরাণ্টে। জাপানী। সেকেলে। উপাদেয়। ভাষা জানা থাকলে বিচিত্র স্থানে আহার করা যায়। তবে একটু ঘুরতে হয় এই যা। পায়ে হাঁটতে হয়। কিয়োতোরও গলিঘুজি আছে। পায়ে হেঁটে বেড়াতেও ভালো লাগে। দেশ দেখার সেই হলো সেরা উপায়। এত দিন সময় পাইনি। আজকের দিনটা ফাঁকা।

এর পর তোদো মহাশয়ের বাড়ি গিয়ে দোকানপাট তোলা। ছড়ানো জিনিস গোছানো। বিবলি আমার সহায়। এঁদের সঙ্গে এই ক'দিনে বেশ একটা আত্মীয় সম্পর্ক পাতানো হয়েছিল। বিবলি তো এরই মধ্যে ঘরের ছেলে বনে গেছে। তোদো পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে মন কেমন করছিল। তোদো একরাশ উপহার দিলেন। তার সঙ্গে স্বরচিত কবিতা। কিয়োতোর কাছে পেলুম জাপানের অন্তরের স্পর্শ।

উত্তর প্রান্তের শহরতলীতে বাস করেন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ট্রাম গিয়ে যেখানে দাঁড়ায় সেখান থেকে কয়েক মিনিটের পদযাত্রা। বিবলিতে আমাতে তৃতীয় বাঙালীর সন্ধানে চললুম। চক্রবর্তীজায়াকেও আমরা বাঙালী বলে গণ্য করব। আর তাঁদের তিন মাসের কন্যাকেও। ষষ্ঠ বাঙালী তা হলে ওসাকার অধ্যাপক ধীরেশচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু সেদিনকার চা পার্টিকে বাঙালীদের না বলে ভারতীয়দের বলব। সেখানে ছিলেন ওসাকার ব্যবসায়ী কেরলবাসী এক ভদ্রলোক। আর তাঁর তিন কন্যা। মা জাপানী, তবু ভারতীয়া বলে গণ্যা। ওসাকার ওঁরা একটু পরেই উঠলেন। ট্রেন ধরতে হবে তার পর বিবলিও উঠল। শেষ ট্রাম ছেড়ে দেবে। আমি তখন একমাত্র অতিথি হয়ে জাপানী মতে স্নান করে বাঙালী মতে আহার করে চক্রবর্তীর জীবনকাহিনী শুনলুম।

পরের দিন চক্রবর্তীজায়া আমাকে সকাল সকাল খাইয়ে দাইয়ে রওনা করে দিলেন। ইয়ায়ে তাঁর নাম। অষ্টদল চেরিফুল। আর তাঁর কন্যার নাম বীণা। অধ্যাপক এগিয়ে দিলেন।

ওসাকা থেকে এলো লিমিটেড এক্স্প্রেস। 'ৎসুবামে।' সোয়ালো (Swallow) পাখী। আগাগোড়া করিডোর। জায়গা যথারীতি রিজার্ভ করা ছিল। কোন্ কামরায় জায়গা তাও জানা ছিল। পরে খুঁজে নিলে চলবে। আপাতত বন্ধুদের সঙ্গে হাত মেলানো চাই। তোদো, তোদোজায়া, তোদোতনয়, কিকুচি, বিবলি, তোরিগোএ। আমার পাঠিকাদের একজন। আবার উপহার।

সায়োনারা! সায়োনারা! কিয়োতো! কিয়োতোর চারুচিত্ত মানুষ!

কিয়োতোয় এসে তোরিগোএ-র পত্রিকায় একটি কবিতা লিখেছিলুম। 'পুব আকাশের তারা'।

অচেনার মতো মনে হলো ক্ষণকাল
তার পরে দেখি তুমি আর আমি চেনা।
হাতে হাত রেখে ছাড়তে ছাড়তে যাই
হাত দেখি হাত কিছুতেই ছাড়বে না।
সায়োনারা! সায়োনারা!
পুব আকাশের তারা!

সেই কবিতা পড়ে যারা দেখা করতে এসেছিল তাদের একজনের খাতায় তুলি দিয়ে লিখি—

সূর্যোদয়ের দেশে
হঠাৎ আমি এসে
ভালোবাসা পেলেম এবং
গেলেম ভালোবেসে।

অপর জনের খাতায় আমার তুলির লিখন—

আত্মীয়রা আছে আমার দেশে দেশে ছড়ানো
দেখে গেলেম, সুধারসে নয়ন হলো ভরানো।

তার পরে আর একজনের জন্যে লিখি। বোধ হয় তোদো মহাশয়ের জন্যে।

জাপান, তোমার ভালোবাসা দোলায় আমার চিত্ত
ভুলব কি দেশ ভুলব কি ঘর তোমার নিমিত্ত!

তা দেখে কিকুচির হলো শখ। তাকে ধরিয়ে দিলুম মুখে মুখে আর হাতে লিখে—

কিয়োতো।
ভালোবাসা দিয়ো তো, আর
নিয়ো তো।

সুইনবার্নের সেই বিখ্যাত কবিতা মনে আছে?

'Swallow, my sister, O sister swallow,
How can thy heart be full of the spring?...

O swallow, sister, O fair swift swallow,

Why wilt thou fly after spring to the south...'

আমার সুন্দরী চঞ্চলা সোয়ালো বোন আমাকে তার সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু বসন্তকালে নয়, শরৎকালে। দক্ষিণ দেশে নয়, পূর্বাঞ্চলে। আকাশপথে নয়, রেলপথে। চেনা পথ। তবু নতুন লাগছিল। কিয়োতো থেকে তোকিয়ো। সেকাল থেকে একাল। এইবার আমি চলেছি কালের স্রোতে গা ভাসিয়ে। উজানে নয়, ভাঁটিতে।

এবার কিন্তু আমার সঙ্গে পেন কংগ্রেসের দলবল নেই। আমি একক। করিডোরের দু'ধারে জোড়া জোড়া গদিমোড়া চেয়ার। সকলের মুখ ইঞ্জিনের দিকে। আমার পাশে বসেছিলেন এক প্রৌঢ় জাপানী ভদ্রলোক। জানালার ধারে। জানালার উর্ধ্বে সরু এক ফালি বাঙ্ক। সেখানে যে যার ব্যাগ ইত্যাদি রেখেছে। ভারী মাল সঙ্গে নিতে দেয় না। পাশের ভ্যানে জমা দিতে হয়।

মধ্যাহ্নভোজনের টিকিট বেচতে এসেছিল। আমি একখানা কিনলুম। যথাকালে খানা কামরায় গিয়ে দেখি আমার সুমুখে উনি কে? ফন গ্লাসেনাপ! এই ভারতবন্ধুকে আমার পর মনে হয়নি। পুত্রের শিক্ষাগুরু। অপরিচিতদের মাঝখানে আমি যেন আপনার লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে বর্তে গেলুম। তিনি সেই দিনই তোকিয়োর হানেদা বিমানঘাঁটি থেকে প্লেন ধরে ব্যাঙ্ককে নামবেন, সেখান থেকে ভারতের উপর দিয়ে উড়ে যাবেন, থামবেন না ভারতে। তিনি বা আমি কেউ তখন জানতুম না যে পরের দিন ঘটবে শ্যামদেশে বিপ্লব। বিপ্লবে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়েছিল কি না জানিনে, কিন্তু পরে শুনতে পাই কী একটা কারণে তাঁর বিমান দমদমে নামতে ও থামতে বাধ্য হয়, তাঁকে রাত কাটাতে হয় কলকাতার হোটেলে।

যাক, সেদিন আহার সেরে গল্প করতে করতে বেরিয়ে এলুম আমরা। গল্প করতে করতে কামরার পর কামরা ছাড়িয়ে গেলুম। তার পর তিনি চললেন তাঁর কামরায়, আমি নিজের সীটে গিয়ে বসলুম। নাম লেখা নয়, নম্বর মারা সীট। কিছুক্ষণ পরে কেমন কেমন ঠেকল। ইনি তো আমার পার্শ্ববর্তী নন ইনি যে পার্শ্ববর্তিনী। এ মহিলা কখন এলেন? তিনিই বা কখন নেমে গেলেন? সোয়ালো পাখী তো সমানে উড়ছে। তার পর উর্ধ্বে চেয়ে দেখি আমার ব্যাগ ইত্যাদি নেই। গেল কোথায়? নিল কে? এমন সময় নজর পড়ল সামনের দেয়ালের উপর। এটা D কামরা। E কামরা নয়। তখন যঃ পলায়তি!

নাগোয়া স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই আমার পার্শ্ববর্তী গিয়ে লাঞ্চ প্যাকেট কিনে নিয়ে এলেন। খানা কামরায় তিনি যাননি। বড় কেউ যায় না লক্ষ করলুম। খানা কামরাও নেহাত ছোট। অধিকাংশের ক্ষুধা মেটায় স্টেশনে কেনা লাঞ্চ প্যাকেট বা সঙ্গে আনা খাবার। পানীয় জল দিয়ে যায় ট্রেনেরই দুটি মেয়ে। করিডোর বেয়ে তাদের যাতায়াত। যে যার স্বস্থানে বসে আহার করেন চপ স্টিক দিয়ে। অতি পরিচ্ছন্নভাবে। কিছুই মেজেতে পড়ে যায় না। হাঁ। চা থাকা চাই। আহার্যের সঙ্গে। সবুজ চা।

দিনটি পরিষ্কার। দৃশ্য দেখতে দেখতে বই পড়তে পড়তে সাত ঘণ্টা কেটে গেল। এরই মধ্যে একসময় শুচি হতে গিয়ে দেখি তেমন স্থানেও জাপানের প্রখ্যাত পুষ্পবিন্যাস। তিনটি ডালপালা এমন করে সাজানো যে রসিকরাই বোঝে ওর মর্ম। একটি দ্যোতনা করে স্বর্গের, একটি মানুষের, একটি ধরিত্রীর। যেটি উপরের দিকে হাত বাড়িয়েছে সেটি স্বর্গের দ্যোতক। যেটি ডান দিকে যেতে যেতে একটি ইংরেজী V হরফের মতো বেঁকে আবার সোজা হয়ে উঁচু নিচুর মাঝামাঝি রয়েছে সেটি মানুষের দ্যোতক। আর যেটি বাঁ দিকে নেমে গেছে, কিন্তু মাটি ছোঁয়নি, শেষ মুহূর্তে আকাশের দিকে মুখ তুলেছে সেটি ধরণীর দ্যোতক।

পুষ্পবিন্যাস জাপানের ঘরে ঘরে। ঘরে বাইরে। এটিও একটি আয়ত্ত করবার মতো বিদ্যা। চা অনুষ্ঠানের মতো এরও শিক্ষালয় আছে। শোনা যায় এর আদি রাজকুমার শোতোকুর আমলে। তেরো শ' বছর আগে। তাঁর স্বকীয় উপাসনামন্দিরে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে যখন পুষ্প নিবেদন করা হতো তখন স্বর্গ মানব পৃথিবীর ত্রিনীতি অনুসরণ করা হতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে এটা জাতীয় প্রথার পর্যায়ে ওঠে। এর প্রসার হয় সর্ব ক্ষেত্রে। প্রকরণও বিস্তারিত হয়। যেখানে তিনটি ডাল নেই সেখানে একটি ডালকেও ত্রিভঙ্গ করে সাজালে ফুলগুলি স্বর্গ মানব পৃথিবীর ইঙ্গিত দেয়। ফুলের প্রকৃতি, যে স্থানে রাখা হবে সে স্থানের প্রকৃতি, যে ফুলদানীতে ভরা হবে সে ফুলদানীর প্রকৃতি, এ সমস্তও বিবেচনার বিষয়।

তোকিয়ো স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পোর্টারের হাতে জিনিসপত্র সঁপে দিলুম। এই অতিকায় স্টেশনের প্রবেশ ও নির্গম পথ হাওড়া বা ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের মতো সহজ নয়। অনেক বার উঠতে নামতে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হয়। এই স্টেশনের নির্মাণ ১৯১৪ সালে আমস্টারডাম স্টেশনের আদলে। এর পনেরোটি প্ল্যাটফর্মে প্রত্যহ সতেরো শ' নব্বুইটি ট্রেন পৌঁছয়। যাত্রীসংখ্যা দৈনিক চার লাখ নব্বুই হাজার! বাহান্ন একর জুড়ে এই প্রকাণ্ড স্টেশন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে অদ্বিতীয়।

শিন্‌জুকু অঞ্চলে ভারতের রাষ্ট্রদূত ভবন। তাকাতানোবাবা স্টেশনের একটু আগে। তাকাতানোবাবা শুনে ভাবছেন তারকেশ্বর বাবার মতো কোনো এক দেবস্থান। তা নয়। শুনলে বিশ্বাস করবেন না—বাবা মানে ঘোড়া তালিম করার মাঠ। ডাউন টাউন থেকে যেতে হলে প্রথমে যেতে হয় সম্রাটের প্রাসাদভূমির পাড় ধরে পুব থেকে উত্তরপশ্চিমে। তার পর শিন্তোদের য়াসুকুনি পীঠস্থান বাঁ দিকে রেখে আরো উত্তরে মোড় ঘুরে আরো উত্তরপশ্চিমে যেতে হয়। তার পর সোজা রাস্তা। মার্কিন মতে 'এল্‌' আভিনিউ। তারই কতক অংশ জাপানী মতে সুওয়া মাচি। বাঁ দিকে লেখা আছে 'এম্‌বাসি অফ ইণ্ডিয়া'।

চন্দ্রশেখর ও তাঁর পত্নী লক্ষ্মী আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তোকিয়োতে এবার যে ক'দিন থাকব সে ক'দিন তাঁদের অতিথি। কিন্তু আমার নিজেরই জানা ছিল না ঠিক ক'দিন থাকব। আমার প্লেন অবশ্য আটাশে সেপ্টেম্বর। তখনো বারো দিন বাকী। কিন্তু বাড়ি থেকে আমার কর্ত্রীপক্ষ যদি চিঠি লেখেন, 'চলে এস', তা হলে হয়তো চব্বিশের প্লেন ধরতে হবে। আসবার সময় একমাস ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে এসেছি। তবু চিনি তো আমার কর্ত্রীপক্ষকে। শেষের দিকে বিরহ অসহন হবে। সেইজন্যে আমার প্রোগ্রামের শেষ চার দিন আমি ইচ্ছা করেই খালি রেখেছিলুম। উড়তে হয় ওড়া যাবে চব্বিশে। নয়তো আরো ভালো করে তোকিয়ো দেখা যাবে। অন্যত্র যেতে উৎসাহ আমার ছিল না। যাঁরা একমাসেই তামাম জাপান চষে ফেলতে চান আমি তাঁদের একজন নই।

আটদিনের প্রোগ্রামের খসড়া নিয়ে উপস্থিত হলেন ভারতবন্ধু কাকুজো (তেনশিন) ওকাকুরার পৌত্র কোসিরো ওকাকুরা। আমার অভিপ্রায় অনুসারে তিনি ইতিমধ্যেই জাপানের বিদগ্ধগণের সঙ্গে যোগসাধন করেছিলেন। বাকী ছিলেন তানিজাকি। তিনি তোকিয়োতে নয়, আতামিতে থাকেন। যদিও আমার উৎসাহ নেই তোকিয়োর বাইরে যেতে তবু তানিজাকির খাতিরে আতামি যেতে আমি রাজী। কিন্তু সাহিত্যিকদের সঙ্গলাভের জন্যে সন্ধ্যাগুলো বেহাত করতে আমি নারাজ। ওকাকুরাকে বললুম যাঁদের অতিথি আমি তাঁরা হয়তো সন্ধ্যায় কোনো পার্টিতে যাবেন, আমাকেও নিয়ে যেতে চাইবেন, অথবা আমিই চাইব তাঁদের কোথাও নিয়ে যেতে, থিয়েটারে কি সিনেমায়। সুতরাং সন্ধ্যাগুলো হাতে থাক।

এই খুব দূরদর্শিতার কাজ হয়েছিল। কিন্তু এর চেয়েও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ওসাকা থেকে

ওকায়ামা না গিয়ে কিয়োতো হয়ে তোকিয়ো ফিরে আসা। 'দূরদর্শিতা' বললুম, কিন্তু যা ঘটবে তা আমি দেখতেও পাইনি, কল্পনাও করিনি। সুতরাং 'দূরদর্শিতা' না বলে বলা উচিত প্রিডেস্টিনেশন। আমার নিয়তি আমাকে একটি নির্দিষ্ট দিনের আগে তোকিয়োতে টেনে নিয়ে এসেছিল একটি অজ্ঞাত প্রয়োজনে। অথচ এর জন্যে আমাকে আমার জাপানী বন্ধুদের প্রতি নির্মম হতে হয়েছিল। যথাকালে বলা হয়নি যে আমাকে নিতে দূত এসেছিলেন ওকায়ামা থেকে কিয়োতোয়। অভ্যর্থনার দিনক্ষণ স্থির হয়ে রয়েছিল, অপেক্ষা করছিলেন গবর্নর, মেয়র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট। ওকায়ামা থেকে কয়েক মাইল দূরে আমি দেখতে যেতুম আধুনিক ধরনের একটি কুষ্ঠ আরোগ্যনিকেতন। রোগীদের কেউ কেউ সাহিত্যিক। আমাকে কাছে পেলে তাঁরা হয়তো অনুভব করতেন যে তাঁরা বিশ্বের উপেক্ষিত নন। এ সমস্ত একদিকে। অন্যদিকে আমার অন্ধ নিয়তি। নিয়তি অন্ধ নয়। আমিই অন্ধ। এক দিন দেরি করে এলে আমি এমন কিছু হারাতুম যার ক্ষতিপূরণ নেই।

পরের দিন সতেরোই সেপ্টেম্বর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে করে চ্যান্সেলারিতে যাচ্ছি চিঠিপত্র কুড়োতে। এমন সময় তিনি বললেন, 'আজ সন্ধ্যাবেলা আপনি কী করবেন? আমরা তো যাচ্ছি নিমন্ত্রণ রাখতে। মস্কো থেকে বোলশয় ব্যালে এসেছে। আজ লেপেশিনস্কায়ার বিশেষ সন্ধ্যা। আজকের প্রোগ্রামের আর কোনো দিন পুনরাবৃত্তি হবে না। আপনি আসবেনই যদি আগে জানতুম আপনার জন্যে টিকিট সংগ্রহ করে রাখতুম। আপনার জন্যে দুঃখ হয়।'

এ যেন পাগলাকে সাঁকোর কথা মনে করিয়ে দেওয়া। জাপানে রাশিয়ান ব্যালে এসেছে এ সংবাদ আমার অগোচর ছিল না। কিন্তু মূর্খের মতো আমার ধারণা ছিল যে ব্যালের টিকিট চাইলেই কিনতে পাওয়া যাবে। জাপানীরা তার কী বুঝবে যে ভিড় করবে! আমার মতো অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বন্ধুভাগ্য অধিক না হলে সেদিন আমাকে কিউ দিয়ে শত শত দর্শনার্থীর পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হতো। তখন তো আমার জ্ঞান ছিল না যে টিকিট সব একমাস পূর্বেই বিক্রী হয়ে গেছে। কালো বাজারে তার দাম উঠেছে বিশ হাজার ইয়েন। আড়াই শ' টাকার উপর। অত টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে উড়ে এসেছেন আরো কত টাকা দিয়ে হাওয়াই থেকে ক্যালিফর্নিয়া থেকে রুশের শত্রুপক্ষ। হ্যাঁ, এরই নাম আর্ট। আর এরই নাম আর্টপ্রীতি।

চন্দ্রশেখরকে বললুম, 'ব্যালে আজ আমি দেখবই। যেমন করে হোক।' এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে বললুম যে কথাটা তাঁর মনে নাড়া দিল। তিনি বললেন 'আচ্ছা, আমার সেক্রেটারিকে বলছি প্রথমে কিনতে চেষ্টা করতে। কিনতে না পেলে পরে কম্প্লিমেন্টারি চাইতে। অন্যান্য দূতাবাস থেকে ওরা অসঙ্কোচে কম্প্লিমেন্টারি চায় ও পায়। আমরা সঙ্কোচ বোধ করি। রুশেরা তাই আমাদের বিশেষ খাতির করে।'

টিকিট কিনতে পাওয়া গেল না। বৃথা চেষ্টা। রুশ দূতাবাস আফসোস করলেন যে থিয়েটারে জন ধারণের ঠাঁই নেই, প্রত্যেকটি আসন ভরা, তা হলেও তাঁরা হাল ছাড়েননি, এক ঘণ্টা পরে জানাবেন কী উপায়। সেই এক ঘণ্টা আমি ইম্পিরিয়াল হোটেলে কাটিয়ে এলুম। সেখানে গচ্ছিত ছিল আমার একটি ব্যাগ। সেখানেও নাপিতের ঘরে বৃথা ধরনা।

সেক্রেটারির ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'এই নিন আপনার টিকিট। সোভিয়েট দূতাবাস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। এর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়েছে ওদের।' হাতে নিয়ে দেখলুম মূল্যবান উপহার। কৃতজ্ঞ হলুম।

ত্রিশ বছর আগে দেখেছিলুম লণ্ডনে আনা পাভলোভার দলের ব্যালে রুশ। ত্রিশ বছর পরে দেখলুম তোকিয়োতে বোলশয় থিয়েটার দলের ব্যালে রুশ। মস্কোর বোলশয় থিয়েটার বিপ্লবের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, খ্যাতিমান ছিল। বিপ্লবের পরে তাকে নতুন করে খ্যাতিমান করেছেন গালিনা

উলানোভা। কারো কারো মতে পাভলোভার চেয়েও বড় শিল্পী। উলানোভার নৃত্য আমি রুশদেশের ফিল্মে দেখেছি। তুলনা করার ক্ষমতা নেই। মস্কোর বলশোয় থিয়েটারের দল দেশের বাইরে কোথাও যায় না। তার প্রথম ব্যতিক্রম হলো কয়েক বছর আগে। উলানোভা গেলেন সদলবলে ইংলণ্ড জয় করতে। এর পর নানা রাজ্য থেকে আমন্ত্রণ এলো। তারাও বিজিত হতে চায়। এবারের মতো গ্রহণ করা হলো জাপানের আমন্ত্রণ। কিন্তু দলের মধ্যমণি উলানোভা নন। ব্যালেরিনা হিসাবে তাঁর পরেই যাঁর স্থান তিনিই হলেন মধ্যমণি। অল্‌গা লেপেশিন্‌স্কায়া তাঁর নাম। শোনা গেল উলানোভা আজকাল নাচেন না, নাচ শেখান। শরীর ভালো নয়।

জাপানে প্রেরিত দলটিতে মোট জনা 'পঞ্চাশ শিল্পী। নাচিয়ে বাজিয়ে সাজিয়ে আঁকিয়ে সবাইকে নিয়ে ব্যালে। ব্যালে কেবল নাচিয়েদের নাচ নয়, বাজিয়েদের বাজনা, সাজিয়েদের সাজসজ্জা, আঁকিয়েদের আঁকন। এমন এক দিন গেছে যখন পিকাসো আর রোএরিখ এঁকেছেন ব্যালের জন্যে দৃশ্যপট, স্ট্রাভিন্‌স্কি আর রিচার্ড স্ট্রাউস রচনা করেছেন সঙ্গীত। ডিআগিলেভ যখন জার আমলের রাশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপে চলে আসেন সে সময়—আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে—তাঁর পরিচালিত ব্যালে সম্প্রদায় নাচিয়ে বাজিয়ে ও আঁকিয়েদের সমান মর্যাদা দিতে আরম্ভ করে। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর 'তিন কোণা টুপি' নামে একটি ব্যালে সৃষ্টি হলো, তার চিত্রকর্মের কর্তা পিকাসো, সঙ্গীতকর্মের কর্তা De Falla আর নৃত্যনাট্যের কর্তা Massine। ব্যালে বিবর্তিত হতে হতে যা হয়েছে তা নিছক নাচ নয়, তিন চারটে বড় বড় শিল্পরূপ সম্মিলিত হয়েছে তাতে। নৃত্যের সঙ্গে অভিনয়, তার সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীত, তার সঙ্গে চিত্রকলা যুগপৎ বিভিন্ন শিল্পরূপের আস্বাদন দেয়।

ব্যালে রুশ বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে গভীর মতভেদ আছে। আমাদের কালোয়াতী সঙ্গীতও ভারতীয় সঙ্গীত, আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতও ভারতীয় সঙ্গীত। তেমনি জার আমলের ইম্পিরিয়াল ব্যালে স্কুলে যা শেখানো হতো ও সেন্ট পিটার্সবার্গের মারিন্‌স্কি থিয়েটারে তথা মস্কোর বোলশয় থিয়েটারে যা মঞ্চস্থ হতো সেও ব্যালে রুশ, আবার ফোকিন পরিকল্পিত ও ডিআগিলেভ পরিচালিত নবপর্যায়ও ব্যালে রুশ। এই সব স্বেচ্ছানির্বাসিত ব্যালে সংস্কারক পাশ্চাত্য খণ্ডে রাশিয়ার নাম রাখলেও ঘরের লোকের মন পাননি। পাভলোভা ঠিক সংস্কারক ছিলেন না। ডিআগিলেভের সম্প্রদায় থেকে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সরে যান। তাঁর সম্প্রদায়ে তিনিই ছিলেন একশ্চন্দ্রঃ। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি গোষ্ঠীগত নয়, ব্যক্তিগত। ব্যালেকে তিনি তাঁর নিজের মাধুরী মিশিয়ে যে অপূর্ব রূপসুষমায় মণ্ডিত করেন সে সৌন্দর্য তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে লীন হয়ে যায়। তাঁর 'মুমূর্ষু মরাল' অবলোকনের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনিই সেই 'মুমূর্ষু মরাল'। দেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত, বিদেশে মূলস্থাপনে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, অস্তগামী সমাজব্যবস্থায় বর্ধিত অথচ তার থেকে বিচ্ছিন্ন, বৈপ্লবিক সমাজদ্বন্দ্বে ভূমিকাবিরহিত শত শত 'মুমূর্ষু মরালে'-র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি আনা পাভলোভা।

ব্যালে রুশ দেশের বাইরে গিয়ে অত যে গৌরব লাভ করল দেশ তার কতটুকু নিল? এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজলুম সেদিনকার প্রোগ্রামে। Lepeshinskaya-র নৃত্যসাথীর নাম Preobrazhensky। প্রোগ্রামে লেখা ছিল লেপেশিন্‌স্কায়া ও প্রেওব্রাজেন্‌স্কির সন্ধ্যা। আমরা যাকে বলি বিশেষ রজনী। অন্যান্য দিনের প্রোগ্রামে এঁদের দু'জনের অবতরণ বার দুই মাত্র। সেদিনকার প্রোগ্রামের বিশেষত্ব উনিশটির মধ্যে আটটি নৃত্যপ্রবন্ধই এই দুই প্রখ্যাত শিল্পীর। তা বলে অপরাপর শিল্পীরা অবহেলিত হননি। কোনো একটি ব্যালের আদি অন্ত সেদিনকার প্রোগ্রামে ছিল না। পোল্‌কা ছিল, মাজুরকা ছিল, জিপ্‌সী নাচ, জর্জিয়ান নাচ, বাশকিরিয়ান নাচ, উরাল অঞ্চলের নাচ

ছিল। আর ছিল কয়েকটি ফ্যানটাসি নৃত্য। চারটি ওয়াল্‌ট্‌স্‌ ছিল, তার মধ্যে সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক চাইকোভ্‌স্কির 'Nut Cracker' থেকে একটি। আর ছিল মিন্‌কুসের সঙ্গীতযোজিত 'ডন কুইকসোটে'-র একাংশ। সন্ধ্যাটি নিশ্চয়ই উপভোগ্য হয়েছিল। দর্শকরা বার বার 'আঁকোর' দিয়ে নর্তকদের ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনলেন ও নাচালেন। লেপেশিন্‌স্কায়াকেও এক একটি নাচ একাধিকবার নাচতে হলো। সেসব অতি কঠিন নাচ। পায়ের আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে নাচতে হয়, ঘুরতে হয় চরকীর মতো। আর তাতেই জনতার করতালির বহর। কিন্তু সব চেয়ে জনপ্রিয় হলেন য়াগুদিন বলে এক যুবক। হাই জাম্প বিশারদ!

সব রকম রুচির কথা ভেবে প্রোগ্রাম করতে হয়। তা হলেও আমার মনে হলো ঝোঁকটা বড় বেশী টেকনিকের উপরে আর য়্যাক্রোবাটিক্‌সের উপরে। ব্যালের আত্মা ইউরোপীয়। কিন্তু ভ্রমণকারী বোলশোয় সম্প্রদায় এশিয়ার লোকনৃত্যকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়ে ইউরোপীয় বিভ্রমকে ক্ষুণ্ণ করেছেন মনে হলো। ইউরোপকে—বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপকে—আমি তেমন করে পেলুম না। জানা সঙ্গীতকারের মধ্যে চাইকোভ্‌স্কি, দ্বোরাক ও য়োহান স্ট্রাউস। শেষের জনকেই প্রতীচ্য বলা যায়। তাঁর 'ব্লু ডানিউবে'-র পরশ পেয়ে পুলকিত হলুম।

অন্যান্য দিনের প্রোগ্রাম হাতের কাছে ছিল। মিলিয়ে দেখলুম যে পশ্চিম ইউরোপের প্রভাব নগণ্য নয়। জার আমলের প্রভাবও নির্মূল হয়নি। 'Swan Lake', 'Dying Swan', 'Coppelia', 'Cinderella', 'Walpurgis Night' তার সাক্ষ্য দেয়। তা হলেও অধিকাংশ নৃত্য হয় রাশিয়ার, নয় সোভিয়েট-শাসিত এশিয়ার, নয় সোভিয়েট-অধিকৃত ইউরোপের। ব্যালের নিয়ম এই যে নৃত্য থাকলেই সঙ্গীত থাকে। কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীত। আর সেই যন্ত্রসঙ্গীতই নৃত্যের প্রেরণা দেয়। অনেক সময় সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে আগে, তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে নৃত্য। কোনো একটা প্রিয় সুরকে নৃত্যরূপ দিলে যারা শুনে মুগ্ধ তারা দেখে মুগ্ধ হয়। তবে ব্যালের প্রাণ বোধ হয় গল্পই। যে গল্প মুখের ভাষায় বলা যায় না, দেহের সর্বাঙ্গের ভাষায় বলতে হয়। নৃত্য এখানে নাচ নয়, সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি। ব্যালে শুধু পায়ের কাজ বা হাতের কাজ নয়, মুদ্রা নামক সাঙ্কেতিক ভাষা তো নয়ই। ব্যালেরিনার ও ব্যালে নর্তকের পোশাক নামমাত্র। ঈষৎ প্রচ্ছন্ন নগ্ন তনু ছন্দে ছন্দে লীলায়িত হয় কঠোর সব সূত্র মেনে। এক এক সময় মনে হয় অতি দুঃসাহসিক যৌগিক ব্যায়াম দেখছি। কিন্তু পরক্ষণেই নৃত্যের হিল্লোল ও স্ফূর্তি সে ভ্রম ভাঙিয়ে দেয়। ব্যালেরিনার নৃত্যসাথী যিনি হন তিনি বীরপুরুষ। ব্যালেরিনা দূর থেকে ছুটে এসে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে তাঁর গায়ে এলিয়ে পড়েন আর তিনি অনায়াসে তুলে নেন ওঁর দেহ। ভুজে নিয়ে তুলে ধরেন সেই গুরু ভার একটি হালকা প্রজাপতির মতো।

অভিজাত মহলে ব্যালের উৎপত্তি। বিপ্লবের পরেও সে তার অভিজাত ধারা ভঙ্গ করেনি। একবারও মনে হলো না যে প্রোলিটারিয়ান মহলে গিয়ে তার গোত্রান্তর ঘটেছে। কোথায় চাষী-মজুর, কোথায় মেহনতী জনতা, কোথায়ই বা শ্রেণীসংগ্রাম, কল কারখানা, যৌথকৃষি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, শূন্যে ভ্রমণ! সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সমন্বয়ের একটা প্রয়াস তো সাম্যবাদ বা বিপ্লববাদ নয়। ব্যালের জগৎ যেন অপ্সরা ও গন্ধর্বদের রূপলোক সুরলোক। সেখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি বা অত্যাচার অবিচার সংঘাত নেই। মতবাদ প্রচারের বাহন হিসাবে ব্যালে একেবারেই অকেজো। তবে রাশিয়ার উপর শ্রদ্ধা না হয়ে পারে না। পৃথিবীতে এখনো যদি নৃত্যোৎকর্ষ পরম সাধ্য হয়ে থাকে তবে তা একমাত্র রাশিয়ায়। এর তুলনায় আর সব দেশের নৃত্যকলা ইতিহাসের ভগ্নাবশেষ অথবা ঐতিহ্যহীন সাধু উদ্যোগ। আর এঁদের মতো কড়া তালিম পাওয়া পরিশ্রমী শিল্পী কোথায়! গায়ে অতিরিক্ত মাংস নেই, কেউ কেউ তো বেশ কৃশকায়। যেন

সার্কাসের বাঘ সিংহ। মঞ্চে যা অনায়াসসাধ্য বলে বিভ্রম জাগায় তার জন্যে দিনের পর দিন একান্তে শরীর সাধতে হয়। জিমন্যাস্টিক করতে হয়। লেপেশিন্স্কায়া, প্রেওব্রাজেনস্কি এঁদের প্রতিভার পনেরো আনার কায়ক্লেশ। ব্যালে একপ্রকার তপস্যা।

কোমা থিয়েটারে এক ঘর দর্শকের মাঝখানে বসে সেদিন সন্ধ্যায় আমি তাদেরি মতো উত্তেজিত ও তন্ময়। অথচ আপনাকে নিয়ে বিব্রত। কেন, বলব? আমার যে কথা ছিল ওদিকে ওকায়ামা যাবার, ওকায়ামার কাছে কুষ্ঠাশ্রমে গিয়ে দুঃখীদের দুঃখের ভাগ নেবার। তার বদলে এ কোথায় এসেছি! এ কী করছি! সুখস্বর্গে এসে রূপভোগ! কাসুগাই কী মনে করবেন! ভাববেন, এ কী রকম লোক! বুদ্ধের দেশের ছেলে আমি। আমার কিনা সময় হলো না কুষ্ঠরোগীদের জন্যে! কাম্য হলো অপ্সর-সান্নিধ্য!

মনকে বোঝালুম, কী করব! আমি যা আমি তাই। ভগবান আমাকে যে রকম করে গড়েছেন আমি সেই রকম। কেউ যদি বলে খারাপ লোক তবে খারাপ লোক। শিল্পী আমি। আমার টান রূপের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি। এ টান উপেক্ষা করলে হয়তো মহান হতুম, কিন্তু সে শক্তি আমার নেই। আর আমার নিয়তিও আমাকে এই দিকেই টেনেছে। শিল্পী যখন রূপভোগ করে তখন কেবল তার নিজের জন্যে করে না, করে বহুজনের তরে। আমার চোখ দিয়ে আমার পাঠকরাও দেখেন। ভোগ করেন।

পরের দিন আমাদের রাষ্ট্রদূত ভবনে লেপেশিন্স্কায়াদের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। এলেন তিখোমিরনোভা, প্রেয়ব্রাজেন্স্কি প্রভৃতি জনা দশ-বারো সহযোগী। এলেন না কেবল প্রিমা ব্যালেরিনা। আট বারের উপর আরো কয়েক বার আঁকোর নেচে তাঁর নাকি গুলফ্ গেছে ভেঙে। হায়, হায়! কী গোঁয়ার ঐ দর্শকগুলো! দুঃখ হলো তাঁর জন্যে, পরবর্তী দর্শকদের জন্যে। আর বেশী দিন তাঁর স্থিতি নয়। আর কি কোনো দিন তাঁকে দেখতে পাব! দুঃখ হলো আমার নিজের জন্যেও। কিন্তু হয়েছিল দেখা। কবে, কোথায়, কেমন করে তা যথাকালে বলব। গুলফ্ ভেঙে যায়নি। পা মচকেছিল।

হ্যামলেট না থাকলে হ্যামলেট নাটক জমবে কেন? আমাদের পার্টি জমল না। তবে ভোজনের শেষে উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হয়ে গেল জন কয়েকের সঙ্গে। একসঙ্গে ফোটো তোলাও হলো। ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি, তিখোমিরনোভা আমার হাত ধরে ধরে হাঁটলেন। হেঁটে চললেন মুভি ক্যামেরার অভিমুখে। মোশন পিকচার উঠল তাঁর সঙ্গে আমার।

কথাপ্রসঙ্গে রুশ দূতাবাসের রোজানভ বললেন, 'তৃপ্তি হতো যদি আস্ত একখানা ব্যালে দেখতেন। অমন টুকরো-টাকরা দেখে কি তৃপ্তি হয়।' আমি বললুম, 'আস্ত একখানা ব্যালে দেখতে আমার তো একান্ত সাধ। কিন্তু টিকিট পাই কী করে! পেলে মিলিয়ে দেখতুম আনা পাভলোভার সঙ্গে অল্গা লেপেশিন্স্কায়াকে।' ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা, মনে রাখব।' দ্বিতীয় বার সৌজন্য নিতে আমার কুণ্ঠা ছিল। সেইখানে ছেদ টানলুম। পরে আর তাঁকে মনে করিয়ে দিইনি।

॥ উনিশ ॥

রুষ অতিথিরা বিদায় নিলে পরে তাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন আমাদেরি দূতাবাসের শ্রীমতী—'তাই তো! রাশিয়ানরা তো বেশ নর্মাল!'

তা শুনে হাসাহাসি পড়ে গেল। নর্মাল হবে না তো কী হবে! য়াবনর্মাল! কিন্তু মন্তব্য যিনি করেছিলেন তিনি হাসতে হাসতে করেননি, হাসাবার জন্যে করেননি। তিনি চিন্তাশীলা। দীর্ঘকাল দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে ও আমেরিকান প্রচারণায় বিশ্বাস করে তাঁর বোধ হয় বদ্ধমূল ধারণা যে রাশিয়ানরা লাল জুজু। সাক্ষাৎ শয়তান। 'যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি সকলের মূলে কমিউনিস্টি।'

কিন্তু পাশাপাশি এক টেবিলে বসে গল্প করে খানাপিনা করে ও তার পরে উদ্যানে পায়চারি করে তাঁর সে ধারণা টলেছিল। রাশিয়ানরা আমাদেরি মতো মানুষ। কমিউনিস্ট কি না সে কথা মনেই আসে না। তা ছাড়া যারা আর্ট নিয়ে থাকে তারা আর্ট নিয়েই মশগুল। আর আর্টের জগতে আত্মপর নেই। যে সমজদার সে-ই আপনার। আমরা ওদের নৃত্য দেখে সুখী। ওরা আমাদের সুখ দেখে সুখী।

অতিথিদের মধ্যে কেবল যে শিল্পীরাই ছিলেন তা নয়। ছিলেন রুশ দূতাবাসের গণ্যমান্যরাও। আমার পার্শ্ববর্তিনী তাঁদের একজনের স্ত্রী। মহিলাটি দস্তুরমতো বুর্জোয়া। ছেলেমেয়েদের চিন্তাই তাঁর প্রধান চিন্তা। একটিকে দেশে রেখে এসেছেন। স্কুলে দিয়েছেন। আরেকটি ছোট। কাছে রেখেছেন। কথাবার্তায় অবিকল ইংরেজ গৃহিণী বা মার্কিন গৃহিণীর মতো। একটু আঁচড়ালে প্রাচ্য প্রকৃতিও ফুটে বেরোয়। আমাদের সঙ্গে খুব বনে। রাজনীতি পরিহার করলে কথাবার্তায় আর কোনো বাধাবিঘ্ন নেই। ওই যে একটা সংস্কার আছে রাশিয়ানরা নিজেদের গুপ্তচরদের ভয়ে প্রাণ খুলে কথা কয় না এটা হয়তো এক কালে সত্য ছিল। এখন জমানা বদলে গেছে। আমরা তো সমানে আড্ডা দিলুম। তবে সর্বক্ষণ সজাগ ছিলুম যাতে রাজনীতির ধারে কাছে না যাই।

সেদিন বিকেলে আমি স্থির করেছিলুম জাপানী ফিল্ম দেখতে যাব। ফিল্মের নাম 'বাঙ্কা'। তার মানে শোকাত্মক কবিতা। য়াসুকো হারাদার এই নামের উপন্যাসটি এক বছরে ছ' লাখ বিক্রী হয়েছে। কিন্তু জাপানী ভাষা তো আমি বুঝব না। আমার দোভাষী হবে কে? আকিরা ওগাওয়া বলে সেই যে ছেলেটি জাপানের প্রথম সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। ছেলেটি কিন্তু 'বাঙ্কা'র নাম শুনে বেঁকে বসল। বললে, 'ওসব মেয়েলি গল্প আমার ভালো লাগে না।' তখন জানতুম না গল্পটা কী নিয়ে। একটি মেয়ে আরেকটি মেয়ের স্বামীকে ভালোবাসে, অথচ একই সঙ্গে সেই আরেকটি মেয়েকেও ভালোবাসে। 'তেমনি' করে। দ্বিতীয় মেয়েটি আত্মঘাতিনী হয়।

'বাঙ্কা' দেখা হলো না। তার বদলে দেখা হলো 'দনজোকো'। গর্কির প্রসিদ্ধ নাটক 'Lower Depths'-এর জাপানী ভাষান্তর ও রূপান্তর। কুরোসাওয়া প্রযোজিত 'রাশোমন' তো দেখেছি কলকাতায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফিল্ম। তাঁরই নতুন কীর্তির আকর্ষণে চললুম চিয়োদা সিনেমায়।

মূল নাটকটির রুশ ভাষায় অভিনয় বছর ত্রিশ আগে লণ্ডনে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। যাঁরা দেখিয়েছিলেন তাঁরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের শিল্পী। যত দূর মনে পড়ে দেশত্যাগী। সেই অভিজ্ঞতার পর এই অভিজ্ঞতা তেমন সুখকর হলো না। এক ভাষাকে আরেক ভাষাতে তর্জমা করা তত শক্ত

নয়, যত শক্ত এক দেশকে আরেক দেশে তর্জমা করা। রাশিয়াকে জাপান করা। তাও হয়তো সম্ভব, কিন্তু কুরোসাওয়া অসাধ্যসাধনে হাত দিয়েছেন। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার আশাহীন জগদ্দল অন্ধকারকে স্থানান্তরিত ও কালান্তরিত করতে গেছেন মেইজি অভ্যুদয়পূর্ব জাপানের অনাধুনিক অন্ধকূপে। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! তোকুগাওয়া শোগুনশাসিত জাপানে বিপ্লবের পূর্বাভাস বা পদধ্বনি কোথায়! পরেই বা কোথায়! দেশান্তরিত করতে হলে যা যা করা দরকার করা হয়েছে, কিন্তু কালান্তরিত করা যায় না বলে ঠিক সুরটি বাজেনি।

তা হলেও মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করলুম অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিস্ময়কর টীমওয়ার্ক। শুনলুম আট মাস ধরে তাঁরা দিনের পর দিন একসঙ্গে মিলে রিহার্সাল দিয়েছেন। যে যার সুবিধামতো স্টুডিওতে এসে আপনার শুটিং দিয়ে চলে যাননি। প্রযোজকও জোড়াতালি দেননি। প্রত্যেকের জন্যে সকলে দায়ী। সকলের জন্যে প্রত্যেকে দায়ী। টীম থেকে আলাদা করে নাম যদি কারো করতে হয় তবে একজনের নাম করি। তোশিরো মিফুনে। ইউরোপ আমেরিকায় যেসব জাপানী ফিল্ম নাম করেছে তার কয়েকটিতে ইনি অভিনয় করেছেন।

কুরোসাওয়া দুঃসাহসিক প্রযোজক। টেকনিকের দিক থেকে নিত্য নূতন পরীক্ষা করে চলেছেন। আবহসঙ্গীতকে একেবারেই বাদ দিয়েছেন। সঙ্গীত বলতে যদি কিছু থাকে তবে তা অভিনেতাদের শিস দেওয়া বা গুনগুন করা। ফোটোগ্রাফি তো আশ্চর্য স্বাভাবিক। কুরোসাওয়ার ফিল্মের অত যে আদর তার প্রধান কারণ বোধ হয় তার ছবিত্ব। নাচ নয়, গান নয়, ভাঁড়ামি নয়। এমন কি তারকাদের যৌন আবেদনও নয়।

রাষ্ট্রদূত ভবনে ফিরে দেখি মাদাম তোমি কোরা এসেছেন। গ্রামোফোনে জাপানী কোতো বাজনার রেকর্ড দিয়েছেন। আমাকে দেখানোর জন্যে তিনি এনেছিলেন গুরুদেবের জাপানপ্রবাসের ফোটোগ্রাফ ও অটোগ্রাফ। কতক কবিতা আগে পড়েছি বলে মনে হলো না। এসব জাপানের সর্বত্র ছড়ানো। অনেক দিনের অশেষ পরিশ্রমে সংগ্রহ করেছেন মাদাম। সমস্ত তিনি দান করতে চান ভারতকে। আর চান কবিগুরুর আঁকা ছবিগুলির ও শান্তিনিকেতনের প্রাচীর চিত্রগুলির রঙিন ফোটো তুলে ভাবীকালকে দান করতে।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে চন্দ্রশেখর বললেন, 'নাঃ। এ ডিম মুখে দেওয়া যায় না। জানেন, এরা মুরগীকেও মাছ খাওয়ায়। মুরগীর ডিমেও মেছো গন্ধ।' তাই তো। জাপানের মুরগীও মৎস্যগন্ধা। তবে খুঁজলে পাওয়া যায় অন্যরকম মুরগীর ডিম, মৎস্যগন্ধ নাহি তায়। রাঁধুনীটি জাপানী, তাকে বলে দেওয়া হলো যে-মুরগীর ডিমে মাছের গন্ধ নেই সেই ডিম কিনতে। সে কী মনে করল, কে জানে! বোধ হয় ভাবল, একই খরচে ডিমও খাচ্ছিলে মাছও খাচ্ছিলে, অন্তত অর্ধভোজন করছিলে। তা তোমাদের কপালে সইবে কেন? মাছের খুশবু না হলে খাওয়া হয় কখনো! হলোই বা মুরগীর ডিম।

ওকাকুরা-সান এলেন। কথা ছিল তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করতে। সারা দিনের প্রোগ্রাম। আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিলুম সন্ধ্যার। সিনেরামা দেখতে সাধ ছিল। দেশে তো দেখবার জো নেই। জাপানে দেখে যাই। ঝা দম্পতি রাজী। ওকাকুরা রাজী। কিনলুম চারজনের টিকিট। সিনেমার তুলনায় বেজায় দামী। সিনেরামা তোকিয়োর একটিমাত্র থিয়েটারে দেখায়। মারুনৌচির ইম্পিরিয়াল থিয়েটার। তার পর্দা ইত্যাদি বিশেষ প্রকারের। তিন ডাইমেনসনের ফিল্মের উপযোগী।

ওকাকুরা-সান আমাকে যেখানে নিয়ে গেলেন সেটা একটা দোতলা কাঠের বাড়ি। হাত যোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে তৈরি। তাই তাকে বলে গাশিয়ো রীতির গৃহ। শুনলুম এখন মধ্য

জাপানের দুটিমাত্র স্থানে সে ধরনের ভদ্রাসন দেখতে পাওয়া যায়। তাতে একান্নবর্তী পরিবারের পঞ্চাশ জনের বাস। হঠাৎ তোকিয়ো শহরে সে রকম বাড়ি বানালো কে? কেউ না। বছর দুই আগে গ্রাম ডুবে যাচ্ছে দেখে গ্রামের বাড়িঘর সরানো হয়। সরিয়ে আনা হলো একটিকে মধ্য জাপান থেকে পূর্ব জাপানে। তোকিয়োতে এনে তাকে রেস্টোরাণ্টে পরিণত করা হলো। রেস্টোরাণ্টের নাম রাখা হলো 'ফুরুসাতো'। মানে মাতৃভূমি। অতিথিরা সেখানে বিশুদ্ধ জাপানী পদ্ধতির ভোজ্য পান। আর পান মধ্যযুগের জাপানকে। বাড়িখানার বয়স কয়েক শতাব্দী হবে। আগেকার দিনে গাশিয়ো রীতির গৃহ নির্মাণ করতে লোহার পেরেক লাগত না। তোকিয়োতে এনে অনেক অদলবদল করা হয়েছে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন জনা চারেক বন্ধু। তাঁদের একজন দোভাষী তরুণী মিস্ এতো। আর তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বিশিষ্ট আমার সমবয়সী কবি শিম্‌পেই কুসানো। এঁকে আমি পেন কংগ্রেসের ভোজে লক্ষ করেছিলুম। লক্ষ করবার মতো চেহারা ও পোশাক। ইনি কিমোনো পরেন। স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক সহাস্য মুখ। কে লোকটা, জানতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময় যোগাযোগ ঘটেনি। পরে ঘটবে জানতুম না। ঘটল দেখে আনন্দিত হলুম। কুসানো-সান বেশ রসিক পুরুষ। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য হলো—ব্যাঙ্। হাঁ, ব্যাঙ্। ব্যাঙ্ তাঁর চোখে মানুষ আর মানুষ তাঁর চোখে ব্যাঙ্। 'কেন? ব্যাঙ্‌কে কি ভালোবাসা যায় না? আমি তো ঐ কিম্ভূত প্রাণীটিকে অত্যন্ত ভালোবাসি। ব্যাঙ্ খেতেও ভালো লাগে।' কবি একটি তুলি নিয়ে ব্যাঙ্ এঁকে দেখালেন। ভয়ঙ্কর জীব। এক শয়তান ধনপতি কি রণপতি। মনে হলো কবি এঁদের সাক্ষাৎভাবে আক্রমণ না করে কার্টুন এঁকে ব্যঙ্গ করছেন। ব্যাঙ্ যেমন তাঁর ব্যঙ্গের পাত্র তেমনি সহানুভূতিরও। নিচের তলার শোষিত ও শাসিত মানুষও তাঁর দৃষ্টিতে মণ্ডুক। তাঁর ব্যাঙ্ কবিতার এক সঙ্কলন বেরোবে। আমাকে দিয়ে সেই গ্রন্থের নাম লিখিয়ে নিলেন বাংলা হরফে জাপানী তুলিতে। 'ব্যাঙ্। কুসানো।'

তাঁর প্রথম বয়স কেটেছে দক্ষিণ চীনে। ক্যাণ্টনে। দেশে ফিরে রকমারি কাজে হাত দেন। খবরের কাগজ। মাসিকপত্র। ভোজনালয়। গোড়ায় ছিলেন নৈরাজ্যবাদী, পরে হয়ে উঠলেন বোহিমিয়ান। দেখে চেনা যায় মুক্ত পুরুষ। তাঁর সঙ্গে আহারে বসে সেদিন আর যাই খাই ব্যাঙ্ খাইনি আমরা।

'ফুরুসাতো' থেকে বেরোবার সময় চোখে পড়ল এক ঢেঁকি। ঢেঁকির পাড় দিতে মানুষ নেই। নল বেয়ে জল আসছে, পিছন দিকে জল ভরে গেলে ঢেঁকি আপনি উঠে আপনি পাড় দিচ্ছে। একে বলে 'সুইসা' বা জলঢেঁকি। খুবই সোজা কৌশল।

এর পর ওকাকুরা-সান আমাকে নিয়ে চললেন দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দোভাষী মিস্ এতোকে বললেন সঙ্গে চলতে। দেখলুম আমরা চিন্‌জান্‌সোর কাছে গাড়ি নিয়ে ঘুরছি। বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিনে। ঘুরতে ঘুরতে পাওয়া গেল বাড়ি। সেখানে থাকেন জাপানের বিখ্যাত কবি হারুও সাতো। কেবল কাব্যে নয় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও এঁর মূল্যবান স্বাক্ষর। বয়স ষাটের কোঠায়। তানিজাকির সমসাময়িক। জাপানের জ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকরা কেউ পেন কংগ্রেসে যোগ দিতে যাননি। বিদেশীর কাছ থেকে দূরে থাকতে চান, স্বদেশীর কাছেও আশানুরূপ সম্মান পান না। নিভৃতবাসে ব্যাঘাত ঘটবে বলে বড় একটা দেখা দেন না। বিদেশীকে তো নয়ই। আমার বেলা ব্যতিক্রম হলো।

সম্ভ্রান্ত রাজবৈদ্য বংশে সাতো মহাশয়ের জন্ম। বংশের নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি কাব্যচর্চা করেন। তাঁর কবিতা যেমন রোমাণ্টিক জীবনও তেমনি। তোকিয়োর কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ। যেহেতু সেকালের একজন সেরা রোমাণ্টিক লেখক কাফু নাগাই সেখানে বক্তৃতা দিতেন। ডিগ্রী না নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ। তার পর শহর ছেড়ে এক গ্রামে গিয়ে বসবাস। সঙ্গে দুটি বেড়াল, দুটি

কুকুর। এবং তাঁর স্ত্রী। ভূতপূর্ব অভিনেত্রী। আনুষ্ঠানিকতা মানতেন না গ্যয়টের মতো, তাই বিবাহটা গ্যয়টের পদাঙ্ক অনুসারী। 'অসুস্থ গোলাপ' নামে এক উপন্যাস লিখে সাহিত্যে উপনয়ন। গোলাপ কী সুন্দর, কিন্তু তার সৌন্দর্যে অসুখের ছোঁয়াচ লেগেছে। 'হায় রে গোলাপ! তোর যে অসুখ!' এই উপলব্ধি নিয়ে লেখা হলো 'পল্লী বিষাদ'। লেখাটি নাকি তাঁর অন্যান্য রচনার প্রতিনিধি। তিনি 'আর্ট ফর আর্টস সেক' তত্ত্বে বিশ্বাসবান। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবের পর এলো প্রাচীন চৈনিক প্রভাব। ক্রমেই তাঁর সেই ডেকাডেন্সের সুর মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে তিনি বিশ্লেষণশীল সমালোচক হয়ে ওঠেন। ওদিকে বৌদ্ধধর্মের দিকেও মন যায়। এখন তিনি শহরে থেকেও সব কিছুর বাইরে।

পাশ্চাত্য ধরনের বসবার ঘরে চেয়ারে বসলুম আমরা। 'ফুরুসাতো'-র মতো মেজেতে নয়। কিন্তু কবির পরনে কিমোনো। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কথা বলেন কম। মহত্ত্বব্যঞ্জক মুখভাব। জাপানের লজ্জাকর পরাভব তাঁকে মর্যদাভ্রষ্ট করেনি। তিনি চীনের ক্লাসিকাল সংস্কৃতির ভক্ত। কিন্তু বর্তমান চীনের সংস্কৃতির পক্ষপাতী নন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ কোন্ লেখকের প্রতি আমার পক্ষপাত। আমি উত্তর দিলুম, 'টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, রম্যা রলাঁ।' তা শুনে বললেন, 'এই উত্তরের আলোয় আপনাকে আমি চিনতে পারছি।'

কবির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের আয়োজক ছিলেন কিয়োতোয় পরিচিত আর্ট ক্রিটিক রিয়ুগেন ওগাওয়া। আমার প্রতি এঁর অহেতুক প্রীতি। শুধু যে সন্ত হোনেন সম্বন্ধে স্বরচিত পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন তাই নয়, চিঠি লিখে বলেছিলেন পরজন্মে আবার আমাদের দেখা হবে। ইহজন্মেই আবার দেখা হয়ে গেল কবি-ভবনে। জাপানীরা আমাদের মতো জন্মান্তরবাদী। দেশে ফিরে কাসুগাইর মুখে শুনি সাতো নাকি লিখেছেন আমাব সঙ্গে তাঁর পূর্বজন্মের সম্পর্ক। শুনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। জাপানে কত লোকের সঙ্গে যে আমার দর্শনমাত্র ভাব হয়ে গেল তার ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে প্রাক্তন মানতে হয়।

কবিগৃহিণী আমাদের জাপানী মতে চা খাওয়ালেন। ভেবেছিলুম সেই শেষ। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি আমাকে প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছিলেন যে আমি তেম্পুরা খেতে ভালোবাসি। কথা বলতে বসে সেটা ভুলে গেছলুম। সবাই উঠছেন দেখে মনে হলো এবার আমাকে বিদায় দেওয়া হবে। তা নয়। দু'খানা বড় বড় মোটরে করে সবান্ধবে নিরুদ্দেশযাত্রা। আমরা যেখানে গেলুম সেটি একটি বনেদী তেম্পুরা রেস্টোরাণ্ট। সেখানে কেবল তেম্পুরাই ভেজে খাওয়ায়। তার নিজের একটি খাইয়ে দল আছে। ঘরানা খাইয়ে। আমি গেলুম ঘরানা খাইয়ের ঘরোয়া অতিথি রূপে। রাঁধুনীটি নাকি চিন্জান্সো থেকে আমদানি। তেম্পুরার ভিয়ান আমাদের সামনে। আমরা একপাশে আর রাঁধুনী এক পাশে। মাঝখানে একটা জালি। জালির উপর সদ্য-ভর্জিত মৎস্য বর্ষিত হচ্ছে আর আমরা যে যার থালির উপর তুলে নিচ্ছি। কাঁচা মাছ কেমন করে বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তেম্পুরায় পরিণত হয় সে দৃশ্য আমাদের সমক্ষে। গল্প করতে করতে একটার পর একটা তেম্পুরা খেয়ে চলেছি। ভাজা মাছ বললে ঠিক বোঝা যাবে না কী জিনিস। কাঁটা বেছে পাতলা করে কাটা মাছ দিয়ে হয় তেম্পুরা। লুচির মতো ছোঁকা হয় তপ্ত তেলে। তার আগে butter-এ ডুবিয়ে। খেতে খেতে গুনতে ভুলে গেছি মোট ক'খানা হলো। এত মাছ জীবনে খাইনি। জানতে চাইনি কোন্টা কী মাছ। হঠাৎ খেয়াল হলো, জিজ্ঞাসা করলুম, 'আচ্ছা, এটা কী মাছ?' কবি বললেন, 'কাটল ফিশ।'

হরি হরি! কাটল ফিশ! তার মানে অক্টোপাস। জাপানে পৌঁছনোর পরের দিন এক পার্টিতে অক্টোপাসের দাড়া দিয়েছিল, খাইনি! এখন আস্ত অক্টোপাসটাই খাব! তবে কাটল ফিশ ঠিক অক্টোপাস নয়। অক্টোপাসের অষ্ট ভুজ। কাটল ফিশের দশ ভুজ। স্বাদ নিশ্চয়ই ভিন্ন। কিন্তু সে

পরীক্ষা করছে কে? আমি? আমি সোজা বলে বসলুম, খাব না। হয়তো অভদ্রতা হলো। হয়তো কেন, নিশ্চয় অভদ্রতা হলো। কিন্তু জাপানীরা বিদেশীদের ক্ষমাচক্ষে দেখে। আমি হাত গুটিয়ে বসলুম আর আমার সহভোজীরা কাটল ফিশ আস্বাদন করলেন। জাপানীদের নৈশভোজন সারা হয় সন্ধ্যার পূর্বে। সেদিনকার তেম্পুরা পার্টি নৈশভোজনেরই বিকল্প।

কবি সেদিন তাঁর ভবনে আমাকে তাঁর কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। কবিতা, কিন্তু হাইকু নয়। তার পর স্নেহভরে উপহার দিয়েছিলেন তাঁর লেখা মূল্যবান একখানি বই। সংখ্যাচিহ্নিত লিমিটেড এডিশন। একটি বৌদ্ধ মূর্তির ইতিহাস তথা উপন্যাস।

দেশে ফিরে একদিন এক জাপানী বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে বলি, জাপানী সাহিত্যিকদের স্ত্রীভাগ্য ভালো। স্ত্রীরা কেমন যত্ন করেন স্বামীদের! আচ্ছা, তিনিই কি সেই অভিনেত্রী যাঁর কথা আছে 'পত্নীবিষাদে'?

বন্ধু বললেন, না। আপনি জানেন না বুঝি? জাপানে সবাই জানে।

গল্পটা সত্যি কি না যাচাই করিনি। ভেবেছিলুম লিখব না, কিন্তু না লিখলে জাপানকে চেনা যাবে না। আমাদের দেশের মতো জাপানেও গুরুজনের নির্বন্ধে বিবাহ করতে হতো। তানিজাকি, সাতো প্রভৃতি যুবকরা বিদ্রোহী হয়ে স্থির করলেন নতুন কিছু করবেন। একটি পার্টিতে সমবেত হলেন কয়েকটি তরুণতরুণী। একালের স্বয়ংবর সভা। না, স্বয়ংবর সভা নয়, স্বয়ংকন্যা সভা। মনোনয়নটা তরুণীদের নয়, তরুণদের। বিধি হলো, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরই অগ্রাধিকার। তিনি যাঁকে বধূ রূপে বরণ করবেন তাকে আর কেউ পাবেন না। তার চেয়ে যিনি বয়সে যত ছোট তাঁর মনোনয়ন তত পরে। মনোনয়নের পরিসর তত কম। তানিজাকি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি যাঁকে পছন্দ করে বেছে নিলেন সাতো তাকে স্বয়ংবরণের সুযোগ পেলেন না। আর যাঁরা বাকী রইলেন তাঁদেরি একজনকে নির্বাচন করলেন। এইভাবে বিয়ে হয়ে গেল তানিজাকি ও সাতো দুই বন্ধুর।

দশ বছর পরে সমুদ্রতীরে দুই দম্পতির হাওয়াবদল! জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে শোনাতে শোনাতে দুই গৃহিণী বললেন পরস্পরকে, ভাই, আমি কি ওঁকে চেয়েছি? উনিই চেয়েছিলেন আমাকে! আমাকে চাইতে দিলে আমি চাইতুম তোরটিকে! এখন জীবন বৃথা।

কর্তাদের ভুলে গৃহিণীদের জীবন বৃথা শুনে কর্তারা বললেন, বেচারিদের বাকী জীবনটা যাতে সুখের হয় তাই করা যাক। ওঁদের মনোনয়নই মেনে নেওয়া যাক।

হাওয়াবদল করতে এসে আর যা বদল হলো তা গুরুজনদের অনুমোদন নিয়ে। এমন কি সন্তানদেরও অনুমোদন নিয়ে। পুরোনো মা'র বদলে নতুন মা পাবে শুনে তারা নাকি আলাদিনের মতো আহ্লাদিত হয়েছিল! সন্তানরা মায়েদের সঙ্গে গেল না! বাপেদের সঙ্গেই রইল! এর পর সংবাদপত্রে দুই সাহিত্যিক দিলেন বিবৃতি। দেশের লোকেরও অনুমোদন চাই। আইন অন্তরায় হলো না! স্বয়ংকন্যার ভুল শোধরাল স্বয়ংবর। নারীর ইচ্ছা। তারপর আরো ত্রিশ বছর কেটে গেছে। যা হয়েছে তা সুখেরই হয়েছে। তবে ওই যা বলেছি। কাহিনীটা সত্য কি বানানো যাচাই করা হয়নি।

ওকাকুরা আর আমি দিন ফেলেছিলুম তানিজাকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রেলপথে আতামি যাব। কিন্তু খবর এলো তানিজাকি হঠাৎ কিয়োতো চলে গেছেন। নিরাশ হতে হলো। এখন সেই নৈরাশ্যটা দ্বিগুণ মনে হচ্ছে। কারণ ওই কাহিনীটা আধখানা হয়ে রইল। বাকী দু'জন নায়ক-নায়িকার দর্শনলাভ হলো না।

সেদিন সাতো দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চললুম ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে সিনেরামা দেখতে। একটু বাদে ঝা দম্পতি এসে পৌছলেন। চারজনে মিলে ভিতরে গিয়ে দেখি প্রেক্ষাগৃহের মাঝামাঝি আসন পড়েছে। বইখানার নাম 'জগতের সাত আশ্চর্য'। মনে করেছিলুম

প্রাচীন জগতের। তা নয়। প্রাচীন তথা আধুনিক জগতের। এবং সাতের চেয়েও বেশি। আসলে ওটা পৃথিবী পরিক্রমা। জাপান দিয়ে আরম্ভ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দিয়ে শেষ। যেসব বিচিত্র দৃশ্য দেখানো হলো তার মধ্যে ভারতের মহৎ দৃশ্য তাজমহল ব্যতীত একটিও ছিল না। কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখিয়ে দার্জিলিঙের ক্ষুদ্র রেলপথে পাগলা ইঞ্জিন ও বন্য হাতী। বন্য না আর কিছু। দিব্যি পোষ মানা হাতী। তার পর সাপের সঙ্গে বেজির লড়াই। অত খরচপত্র করে বিজ্ঞানের উন্নতির পরিচয় দিতে সিনেরামা সৃষ্টি হলো তো আর্টের অবনতির সাক্ষ্য দিল। পিছন দিক থেকে তিন-তিনটে প্রোজেকটার সর্বক্ষণ সক্রিয়। পর্দাটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি। মনে হচ্ছিল লম্বা লম্বা সারি সারি তার ঝুলছে, যেন টানা আছে, পোড়েন নেই।

সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। মঞ্চ যেন আমাকে সবলে টানছিল, সবেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। দর্শক আর দৃশ্য যেন একে অপরের অংশ নিচ্ছিল। ঝা'দের তো সেদিন মাথা ধরে গেল। সিনেরামা থেকে ফেরবার পথে এক জায়গায় ভিড় দেখে ভিড়ে যাই। শিন্তোদের এক মণ্ডপে নাচ চলেছে। তরুণ তরুণী দুই আছে। শিন্তোদের কী একটা পার্বণ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছিল। দিনের বেলাও চোখে পড়েছে ছেলেমেয়েদের রঙ্‌চঙে জামা, খেলনা, হাসিমুখ। রাস্তায় রাস্তায় কাঁধে কাঁধে পালকির মতো ঘুরছে শিন্তো পীঠস্থানের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

পরের দিন ওকাকুরা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর শোকিন কাৎসুতার বাড়ি। বয়স আশির কাছাকাছি। এখনো বেশ শক্ত। সৌম্য। অর্ধ শতাব্দী আগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বছর দুই বাস করে গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথদের সঙ্গে ছবি এঁকেছিলেন! সেকালের আলবাম দেখালেন। রবীন্দ্রনাথের একখানি দুষ্প্রাপ্য ফোটো দেখতে পেলুম।

কাৎসুতা-সান স্বয়ং আমাকে নিয়ে বেরোলেন। তাঁর গুরু হাশিমোতোর বহু পুরাতন চিত্রগুলি বহু স্থান থেকে সংগ্রহ করে উএনো মিউজিয়মে প্রদর্শিত হচ্ছিল। আমাকে প্রদর্শন করবেন। পথে যেতে যেতে একটি বাড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাইকানের গৃহ। তাইকান এখন সঙ্কটাপন্ন পীড়িত।' রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সেই মহান বর্ষীয়ান চিত্রকর ইতিমধ্যে গতাসু হয়েছেন।

একটি রেস্টোরান্টে নিয়ে গিয়ে কাৎসুতা-সান আমাকে প্রথমে মধ্যাহ্নভোজন করালেন! জাপানী রীতিতে। ততক্ষণে ওকাকুরা গেছেন, ইনাজু এসেছেন। তার পর আমরা মিউজিয়মে গিয়ে হাশিমোতো কক্ষে প্রবেশ করলুম। ছবিগুলির কতক গত শতাব্দীর শেষভাগের, কতক এই শতাব্দীর আদ্যভাগের। কতক সরন্ত দরজায়, কতক ঝুলন্ত পটে, কতক পর্দায়, কতক ফ্রেমে। পাশ্চাত্য প্রভাব ততদিনে ব্যাপক হয়েছে, কিন্তু হাশিমোতোর মতো শিল্পীর মনোহরণ করেনি। নতুন জাপানে পুরাতন জাপানের ধারা বহমান রেখেছে তাঁর দৃষ্টান্ত, কিন্তু ক্ষীণ হয়ে এসেছে সে ধারা। আধুনিকরা যত বেশী ঐতিহ্যসচেতন তার চেয়ে বেশী ইউরোপসচেতন।

এর পরে ইনাজু-সান আমাকে নিয়ে যান একটি আর্ট গ্যালারিতে, সেখানে অত্যাধুনিক জার্মান চিত্রকলার নিদর্শন সজ্জিত। প্রতিলিপি নয়, আসল ছবি। এ জিনিস ভারতবর্ষে দেখবার জো নেই। এর টেকনিক, এর বক্তব্য আমাদের পক্ষে দুর্বোধ্য, তবে এর শক্তি অনস্বীকার্য।

ইণ্টারন্যাশনাল হাউসে সে দিন আমার সান্ধ্য আহার ও বক্তৃতা। রকফেলারের অর্থানুকূল্যে ও জাপানীদের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত এই ভবন জাপানের একদল সাংস্কৃতিক নেতার উদ্যোগের ফল। এখানে হোটেলের চেয়ে কম খরচ হোটেলের মতো আরামে থাকতে খেতে পারা যায়। অন্যতম কর্ণধার গর্ডন বোলস-এর সঙ্গে আলাপ হলো। গান্ধীবাদ ও আধুনিকতা নিয়ে আমাদের মনের দ্বন্দ্ব ইণ্ডিয়া স্টাডি গ্রুপের বন্ধুদের বোঝালুম। উদাহরণ দিলুম বসন্তের টীকার। বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলনের কথা বললুম। অহিংসা কত দূর যেতে পারে শ্রেণীবিরোধ এড়াতে বা মেটাতে।

॥ বিশ ॥

যা ভেবেছিলুম তাই। বাড়ি থেকে চিঠি এলো, আর কত দেরি করবে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তো দোসরা পারমিট ফেরত চাইছে। চলবে কী করে?

ঝা-দের অতিথি না হলে চলত না সেটা ঠিক। আমাকে বাধ্য হয়ে চব্বিশের প্লেনে জায়গা খুঁজতে হতো। না মিললে জাপানী বন্ধুদের কথামতো এক-একজনের সংসারে এক-এক রাত কাটাতে হতো। আর নয়তো তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে কয়েক রাত। চন্দ্রশেখর ও তাঁর সহধর্মিণী লক্ষ্মীদেবী আমাকে কাছে রেখে বিস্তর খরচ বাঁচিয়ে দিলেন, আর বিস্তর সময়। সময়ের সঙ্গে রেস দিতে হচ্ছিল, তাই সময় যাতে বাঁচে সেইটেই শ্রেয়।

মনঃস্থির করলুম যে চব্বিশে ফিরে গেলে অসময়ে ফিরে যাওয়া হবে, আটাশেই সুসময়। সেই অনুসারে প্রোগ্রাম ছকা গেল। প্রতিদিনই নতুন নতুন নিমন্ত্রণ আসছিল। কল্পনাতীত সৌভাগ্য। আমেরিকার শান্তিবাদীরা নাকি জাপানী শান্তিবাদীদের খবর দিয়েছেন যে আমি এসেছি, আমাকে দিয়ে যেন কিছু বলিয়ে নেওয়া হয়। এঁরা কমিউনিস্ট নন, কোয়েকার। সময় নেই বলে এঁদের প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সময় করে নিতে হয়।

একুশে সেপ্টেম্বর শনিবার প্রাতরাশের পর একটু য়্যাডভেঞ্চার করা গেল। একা বেরিয়ে পড়লুম পায়ে হেঁটে তাকাতানোবাবা। ভাষা জানিনে, তা সত্ত্বেও কেনা গেল শিন্‌জুকুর টিকিট। ইলেকট্রিক ট্রেনে ওঠা গেল। নামা গেল শিন্‌জুকু স্টেশনে। সামান্য পথ। একটু ঘোরাঘুরি করে কেনা গেল মিতাকার টিকিট। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছে ইলেকট্রিক ট্রেন। সেটা মিতাকা যাবে কি না জিজ্ঞাসা করার আগেই চলতে শুরু করে দিল। তখন আমিও লাফ দিয়ে উঠে বসলুম। সকালবেলা শহর থেকে শহরতলীতে যাবার সময় ট্রেনে ভিড় হয় না। নয়তো ঝুলন্ত শিকে ধরে দাঁড়াতে হতো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হতো।

সঙ্গে মানচিত্র আনতে ভুলে গেছি। ট্রেনে সাধারণত একজন চিৎকারনবিশ থাকে, সে চেঁচিয়ে বলে যায় সামনের দিকের স্টেশনগুলোর নাম। দেখলুম না তাকে। লাজুক মানুষ, বোকা বনতে চাইনে সহযাত্রীর কাছে প্রশ্ন করে, 'এ ট্রেন কি মিতাকার দিকে যাচ্ছে?' তিনি যে ইংরেজী বুঝবেনই এমন কী কথা আছে! একটার পর একটা স্টেশন আসে। মিতাকার আভাস কোনোটাই বহন করে না। জাপানী রেলপথের একটা বিশেষত্ব, যে স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় সে স্টেশনের আগের স্টেশন ও পরের স্টেশনের নামও রোমান হরফে লেখা থাকে। তা দেখে নামবার জন্যে তৈরি হতে সময় পাওয়া যায়। নয়তো কখন এক সময় মিতাকা আসত, নামটা নজরে পড়ার পূর্বেই ট্রেন ছেড়ে দিত, আর আমি ঘুরতুম গোলকধাঁধায়। যাক, আমার কপাল ভালো। যথাকালে দেখলুম সামনের স্টেশনের নাম মিতাকা, তৈরি থাকলুম, মিতাকা আসতেই সবজান্তার মতো শান্তভাবে নামলুম।

স্টেশনের বাইরে গিয়ে দেখি একখানামাত্র ট্যাক্‌সি। তাকে বললুম একটিমাত্র শব্দ। 'কিরিসুতো।' সে একটিমাত্র কথা না বলে সটান নিয়ে পৌঁছে দিল ইন্টারন্যাশনাল খ্রীস্টান ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে। ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড হাতে আঁকা একটা নক্‌শা দিয়েছিলেন। তাই দেখিয়ে ট্যাক্‌সিকে নিয়ে গেলুম তাঁর আস্তানার সদর দরজায়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশী দিনের নয়। পরমাণু বোমা পড়ে যখন হিরোশিমা বিধ্বস্ত হয়ে যায় তখন আমেরিকার এক বিবেকী ধর্মযাজক তাঁর যজমানদের বলেন, এ তোমার এ আমার পাপ।

এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। তিনি যত টাকা চেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা উঠল। হিরোশিমায় তাঁরা কী যেন বানিয়ে দিলেন, হাসপাতাল না কী। বাড়তি টাকাটা দিয়ে কী করা যায় হিরোশিমার লোকের উপর ছেড়ে দিতেই তারা বলল, বিশ্ববিদ্যালয়। খ্রীস্টীয় বিশ্ববিদ্যালয়। হিরোশিমায় না করে রাজধানীতেই সেটা স্থাপন করা হোক।

খ্রীস্টানদের অনেকগুলো সম্প্রদায় একত্র হয়ে এটা চালাচ্ছে। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। ছেলে মেয়ে দুই একসঙ্গে পড়ে। অধ্যাপকের মতো অধ্যাপিকাও আছেন। শান্তিনিকেতনের মতো। কিন্তু শান্তিনিকেতনের তুলনায় বিস্তীর্ণ ভূমি। তার একাংশ বনানী। বোধ হয় সমস্তটা পূর্বে অরণ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে হটিয়ে দিয়েছে। ঘুরে ফিরে গেলুম ভোজনশালায়। আলাপ হয়ে গেল কয়েকজন অধ্যাপক ও লেখকের সঙ্গে। এক জাপানী অধ্যাপককন্যা বললেন, 'আমি ফরাসী। আমি ফরাসী।' কী রকম! বিবাহসূত্রে। বিয়ে করলে চেহারাও কি বদলে যায়! তিনি যে শুধু ফরাসী তাই নয়। প্যারিসিয়েন। স্বামীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন, অবিলম্বে ফিরে যেতে হবে। কোথায় দেশভক্তি! বিবাহিত জীবনের সুখ তাঁর মুখে চোখে উছলে পড়ছিল।

ফ্রান্সেস ক্যাসার্ডের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করে আবার সেই ভাবে শিন্‌জুকু ফিরি, কিন্তু সেখান থেকে আর তাকাতানোবাবা নয়, সরাসরি তোকিয়ো স্টেশন। ভারতের চ্যান্সেলারি তার কাছেই। সেখান থেকে যেতে হবে ৎসুকিজি হোঙ্গানজি মন্দিরে। ওঁদেরি লোক এসে নিয়ে যাবে। এই মন্দিরটির বহির্দ্বার অজন্তার অনুকরণে নির্মিত।

বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক বিনিময় পরিষৎ এর সঙ্গে সংযুক্ত। অধ্যাপক নাকামুরা প্রভৃতি সুধীদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে আহার করা গেল। আহার্য রক্ষিত ছিল এক-একটি ল্যাকারের বাক্সে। সুদৃশ্য। চতুষ্কোণ। আহার শেষ না হতে রাশি রাশি প্রশ্ন বর্ষিত হলো আমার উপর। একসঙ্গে উত্তর দিতে চেষ্টা করলুম। প্রশ্নগুলি ভারত সম্বন্ধে, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে, জাপানের সঙ্গে আদানপ্রদান সম্বন্ধে। কয়েকটি তরুণ ছিল, 'ইয়ং বুদ্ধিস্ট,' তাদেরি কৌতূহল বেশী। বললুম ভারত থেকে বৌদ্ধদের কোনো দিন বিতাড়ন করা হয়নি, বৌদ্ধ-ধর্ম লোপও পায়নি, প্রভাব অবশ্য হারিয়েছে, তার কারণ বিহারগুলি রাজসমর্থন হারিয়েছে, অচল হয়েছে মুসলিম আমলে।

নাট্যকার চিগিরি ছিলেন সেখানে। জাপানের চেস য়্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমাকে দিলেন এক সেট দাবাখেলার সরঞ্জাম। কেমন করে জানলেন যে আমি দাবাখেলা ভালোবাসি? কিন্তু ছোট ছেলের সঙ্গে হেরে গিয়ে অবধি আর আমি খেলিনে। আধুনিক জাপানী নাটক দেখতে যাচ্ছি শুনে চিগিরি বললেন, 'আর কী দেখতে চান?' আমি বললুম, 'লোকনাট্য।' তিনি বললেন, 'তা হলে পল্লীগ্রামে যেতে হয়।' কিন্তু আমার দিনগুলি আগে থেকে ভরা। তা সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টার একটা প্রোগ্রাম করা গেল। পরে একদিন খবর পেলুম যে লোকনাট্যের আয়োজন পল্লীগ্রামে সম্ভব হলো না। আমি যেন টেলিভিসনে দেখি।

এই সব আলোচনা করতে করতে খেয়াল ছিল না যে ওদিকে চ্যান্সেলারিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে বলেছি মিস্ এতোকে। তিনি আমার দোভাষী হয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন জাপানী নাটক 'প্রশান্ত পর্বতমালা' দেখতে হাইয়ুজা থিয়েটারে। হাইয়ুজা থিয়েটার হলো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের থিয়েটার। তাঁরাই মালিক আর পরিচালক। 'প্রশান্ত পর্বতমালা' যাকে বলছি তার আসল নাম 'শিজুকানারু য়ামায়ামা'। নাট্যকার সুনাও তোকুনাগা তখনো জীবিত ছিলেন। ইতিমধ্যে বিগত।

ছুটতে হলো আবার আমাদের চ্যান্সেলারিতে। গিয়ে দেখি গোটা নাইগাই বিল্‌ডিংটাই বন্ধ। ছ'টা বাজে। কেউ কোথাও নেই। মুশকিলে পড়লুম। চন্দ্রশেখর ও লক্ষ্মীদেবীকে নিমন্ত্রণ করেছি,

তাঁরা সরাসরি থিয়েটারে যাবেন, একসঙ্গে চারখানা টিকিট কিনব। মিস্ এতোর উপর ভার ছিল তিনি যেন বিখ্যাত অভিনেতা কেন্‌জি সুসুকিতাকে আমার হয়ে টেলিফোন করেন ও আমাদের জন্যে চারটে সীট সংরক্ষণ করতে অনুরোধ জানান। সুসুকিতা হলেন রিয়ুগেন ওগাওয়ার আত্মীয়। ওগাওয়ার মুখে 'সিস্টার-ইন-ল' শুনে আমি চমকে উঠি। তবে কি অভিনেত্রী? তিনিই সংশোধন করে বলেন, 'ব্রাদার-ইন-ল।' জাপানীতে ভাবা ও ইংরেজীতে কথা বলা কী যে কঠিন ব্যাপার তা মালুম হলো যেদিন শুনলুম যে ওদের ভাষায় 'আমি' আছে আট রকম, 'তুমি' আছে ক'রকম ঠিক জানিনে, আর 'সে' বা 'তিনি' বিলকুল নেই। অর্থাৎ প্রথম পুরুষটা ব্যাকরণে অনুপস্থিত।

যা বলছিলুম। দোভাষী না নিয়ে যাই কী করে? আসন সংরক্ষিত হলো কি না জানি কী করে? আর জাপানের টেলিফোন ডাইরেক্টরি তো বর্ণানুক্রমিক নয়, বর্ণমালা বলে কোনো পদার্থই নেই, নাম খুঁজে বার করতে জাপানীরাই হিমশিম খেয়ে যায়। গাড়িকে বললুম, আচ্ছা, ব্লকের চারদিকটা একবার চক্কর দিয়ে দেখা যাক। জাপানের বাড়িগুলো ব্লকে ব্লকে সাজানো।

চক্কর দিতে দিতে সত্যি সত্যি দেখা হয়ে গেল। মিস্ এতো ঘুরছিলেন গাড়ির সন্ধানে। তাঁকে তুলে নিয়ে ছুটল গাড়ি রপ্‌পঙ্গি। পথ যেন ফুরোতে চায় না। অবশেষে হাইয়ুজা থিয়েটার। দেখে আশ্বস্ত হলুম যে ঝা দম্পতি তখনো এসে পৌঁছননি। কিন্তু টিকিট কাটতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। সুসুকিতার নির্দেশ দাম নেওয়া হবে না। শুনুন কাণ্ড! দেখতে দেখতে ঝা-রা এসে পড়লেন। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো বেশ ভালো সীটে। ওদিকে অভিনয় শুরু হয়ে গেছে। পিছনে নীল পাহাড়। সামনে চাষীদের গ্রাম। মঞ্চের উপরে খড়ের ঘর। ঘরের ভিতরে মানুষ। প্রযোজনা ও অভিনয় বাস্তবধর্মী।

কাবুকি ও বুনরাকু জাপানের চিত্ত জুড়েছিল, আধুনিক নাট্য সেখানে প্রবেশ-পথ পায় পঞ্চাশ বছর আগে। এই অর্ধ শতাব্দী কাল সংগ্রাম করে এখনো সে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। রাষ্ট্র তাকে সাহায্য করে না। করলেও সে নেবে না। নিলে 'প্রশান্ত পর্বতমালা'র মতো বই দেখানো যায় না। ও যে কমিউনিস্টের লেখা প্রোলিটারিয়ান নাটক। যদিও যথেষ্ট মোলায়েম। আধুনিক থিয়েটার দেখতে যারা যায় তাদের টাকা বড় কম। খরচ ওঠে না। তাই বড়লোক মালিক জোটে না। অভিনেতারা নিজেরাই কোনো রকমে চালায়। অভিনয় করে রোজগার করা দূরে থাক অন্য ভাবে রোজগার করে রোজগারের টাকা থিয়েটারে ঢালে। ফলে বেশীর ভাগ সময় যায় রেডিওতে টেলিভিসনে সিনেমায়, অল্পই থাকে থিয়েটারের জন্যে। তা সত্ত্বেও তোকিয়োতে হাইয়ুজার মতো আরো তিনটে আধুনিক থিয়েটার চলে। যদিও এইটেই সব চেয়ে বড়। সব চেয়ে বড়তেও মাত্র চার শ'টি আসন। জনা সত্তর অভিনেতা অভিনেত্রী, একটি স্টুডিও, একটি নাট্যশিক্ষা ইন্‌স্টিটিউট। এবং অতি উন্নত প্রণালীর সাজসরঞ্জাম সমন্বিত মঞ্চ। ইন্‌স্টিটিউটে তিন বছর কাল তালিম দেওয়া হয়। স্নাতকরা হাইয়ুজার পাঁচটি শাখা থিয়েটারে কাজ করতে যায়। অন্য তিনটি থিয়েটারেরও সংগঠন মোটামুটি এইরকম।

আমাদেরি মতো এদেরও ভাবনা, ভালো নাটক পাই কোথায়? পাশ্চাত্য নাটকের জাপানী ভাষান্তর ও রূপান্তরই এদের প্রধান সম্বল। তার পরে পাশ্চাত্য রীতিতে লেখা মৌলিক জাপানী নাটক। আমাদের ব্রিটিশ আমলের মতো জাপানের যুদ্ধপূর্ব স্বদেশী আমলেও নাট্যাভিনয়ের স্বাধীনতা সামান্যই ছিল। রাষ্ট্রের মঞ্জুরি পাওয়া সহজ ছিল না। যুদ্ধের সময় তো আধুনিক নাটুকে দলগুলো বেআইনী ঘোষিত হয়। দলের হয়ে কেউ যদি সাহস করে প্রতিরোধ করলেন তো অমনি তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড। যুদ্ধের পর জাপান যখন পরাধীন হলো তখনি জাগরণ হলো নতুন করে এই সব আধুনিক নাট্যসম্প্রদায়ের। আগেকার দিনে তো মেয়েপুরুষের একসঙ্গে অভিনয় করাটাই ছিল

দোষের। এখন ভদ্রঘরের মেয়েরাও নিয়মিত অভিনয় করছেন। আমাদের দেশেও তাই। কিন্তু ঐতিহ্য একদিনে গড়ে ওঠে না। সাধনাও সিনেমার সঙ্গে শেয়ার করে হয় না। তবু জোর পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে। আধুনিক নাটক লাভের নয় লোকসানের কারবার জেনেও ছোট ছোট দল আসরে নামছে।

প্রত্যেকটি দৃশ্যের পর পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বিরাম থাকে। মঞ্চসজ্জা ও অঙ্গসজ্জার জন্যে সময় দিতে। সেই অবকাশটা মঞ্চের দু'ধারে রক্ষিত বোর্ডে সূচিত হয়। প্রথম দৃশ্যের পর দেখি রোমান হরফে পাঁচ সংখ্যাটি জ্বলজ্বল করছে। তার মানে পাঁচ মিনিট বিরাম। এমনি এক বিরামের অবকাশে দোভাষী সঙ্গে নিয়ে আমি সাজঘরে চললুম সুসুকিতা-সানকে ধন্যবাদ দিয়ে আসতে। তখনো তাঁর গায়ে চাষীর সাজ, মুখে ও মাথায় আনুষঙ্গিক মেক-আপ। এর পরের দৃশ্যে যাঁকে দেখা যাবে তিনি—প্রধান অভিনেত্রী কিয়োকো সেকি—তাঁর পাশে বসেছিলেন। সাজঘর বেশ সরগরম। বহুসংখ্যক অভিনেতা অভিনেত্রী যে যার প্রসাধনে রত। স্থান অতি সংকীর্ণ। আমাকে তো সারা পথ কসরৎ করতে করতে শরীর সামলিয়ে চলাফেরা করতে হলো। সুসুকিতা-সান সলজ্জ হাসিমুখে বললেন, আবার আসবেন তো? আমি বললুম, হাঁ, নাটকটা হয়ে গেলে আবার আসব। ফূর্তি লাগছিল অভিনেতা অভিনেত্রীদের মঞ্চের আড়ালে দেখে। যাকে দেখি তাকে অভিবাদন করি। দু'দিকেই হাসিমুখ।

জাপানী নাটক নাকি পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলে। তা হলে আমাদের রাত এগারোটা তক না খেয়ে থাকতে হয়। জাপানীদের কী! তারা তো আহারের পাট সন্ধ্যার আগেই চুকিয়ে দিয়েছে। বিরামের অবকাশে হালকা কিছু সীটে বসে বসেই খায় বা উঠে গিয়ে বাইরে খেয়ে আসে। আর আমরা বাড়ি গিয়ে ডিনার না খেলে বাঁচব না। ঘণ্টা দুই নাটক দেখে ঝা দম্পতি বললেন, ওঠা যাক। চাষীর গ্রাম থেকে মজুরের কারখানা পর্যন্ত এগিয়েছে নাটকের কাহিনী। একটা ধর্মঘটের উদ্যোগ চলছে। তাতে বাগড়া দিচ্ছে কয়েকটি দালাল প্রকৃতির লোক। মেয়ে মজুরদের কেউ কেউ ধর্মঘটের পক্ষে, কেউ বা বিপক্ষে। মজদুর ইউনিয়নের মাতব্বরদের বক্তৃতাও শোনা গেল। একটি জাপানী মেয়ে মজুর তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ককিয়ে আমার ভুল ভাঙিয়ে দিল যে জাপানীরা কখনো কাঁদে না, কান্না পেলেও হাসে। হতে পারে পরের সাক্ষাতে হাসাটাই এটিকেট, কিন্তু থিয়েটারে তো আমরা পর নই, আমরা ঘরের লোকের চেয়েও অন্তরঙ্গ। আড়ালে যা ঘটে তারও সাক্ষী। হাঁ, আপনার লোকের কাছে জাপানীরাও কাঁদে। কাবুকির মতো মুখোশ পরার কন্‌ভেন্‌শন নেই বলে আধুনিক থিয়েটারে মানুষের মুখেই সব রকম ভাবের অভিব্যক্তি ফোটে, ফোটাতে হয়। আর আধুনিক থিয়েটারের এইখানে জিত যে এতে পুরুষকে নারী সাজতে হয় না। এতে নারীরও মান আছে। তবে বিশুদ্ধ নাটকীয়তায় কাবুকির প্রতিদ্বন্দ্বী নেই জাপানে। আধুনিক থিয়েটার আরো পঞ্চাশ বছর তপস্যা করলে পরে হয়তো কাবুকির সঙ্গে দাঁড়াতে পারবে।

সুসুকিতার সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করা হলো না। ফুলের দোকানে গিয়ে দুটি সুন্দর তোড়া কিনে পাঠিয়ে দিলুম। একটি কেন্‌জি সুসুকিতাকে। একটি কিয়োকো সেকিকে। ভাগ্যিস মিস্ এতো সঙ্গে ছিলেন। নইলে সেদিন কী বিপত্তি হতো কল্পনা করুন। আমি তো কিনতে যাচ্ছিলুম আরো চমৎকার দুটি বাহারে তোড়া। কন্যাটি একটু হেসে আমার কানে কানে বললেন, 'ওসব ফুল দিতে হয় ফিউনেরালের সময়।'

পরের দিন রবিবার। ফ্রান্সেস ক্যাসার্ডের সারা দিন ছুটি। তিনি এসে আমাকে নিয়ে গেলেন শহরের টুকিটাকি দেখাতে। শিন্‌জুকু স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে খুঁজে নেওয়া গেল জাপানীরা যাকে বলে সুশিয়া। ছোট একটি দোকান। সেখানে সুশি কিনতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে কাউন্টারের

এ ধারে টুলে বসে সুশি খেতেও পারা যায়। কাঁচা মাছ নিয়ে ভাতের সঙ্গে মেখে চোখের সুমুখেই সুশি বানায়। আমি তো কাঁচা মাছ খাব না। একই প্রক্রিয়ায় ডিম দিয়ে সুশি তৈরি করা হলো। টুলে বসে তার স্বাদ নিলুম।

কফি খেতে নয়, কফি হাউস কেমন তা চোখে দেখতে একটি কফি হাউসে ঢুকে পড়া গেল। টেলিভিসন আছে, যাদের তাতে আগ্রহ নেই তাদের জন্যে গ্রামোফোন ও রেকর্ড। ফুল দিয়ে সাজানো ঘর। আরামের আসন। বসলুম না। এগিয়ে চললুম।

তার পর একটি জায়গায় এসে টিকিট কাটলুম। কিসের? ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড বললেন, 'একে বলে য়োসে।' জাপানের সেকালের ভড়্ভিল (Vaudeville)। মধ্য এশিয়া থেকে অতি পুরাতন কালে জাপানে আসে। এখনো টিকে আছে। ছোট একটা থিয়েটারের মতো মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ। পাশ্চাত্য ধরনের চেয়ারও আছে, আবার দেয়ালের দিকে জাপানী রীতিতে পা মুড়ে বসবার জন্যে সমান উঁচুতে মাদুরও আছে। আমরা মাদুরের উপর পা ভাঁজ করে বসলুম।

মঞ্চের উপরে দেখি একটি যুবক হাঁটু গেড়ে বসে গল্প শোনাচ্ছে। ফ্রান্সেস বললেন, 'ওর দিকে না তাকিয়ে দর্শকদের দিকে তাকান।' দর্শকদের মুখে অসীম কৌতূহল। সব রকম বয়সের লোকই ছিল তাদের মধ্যে। ছেলের মা বাপ ঠাকুমা ঠাকুরদা। তাঁদের সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা, মাঝে মাঝে হাসানো, ক্রমে ক্রমে গল্পের টেম্পো বাড়িয়ে দেওয়া, পরিশেষে—ঠিক বুঝতে পারলুম না কেমন করে সেই যুবক বা অন্য একজন যুবক ছোরা নিয়ে গোলা নিয়ে রকমারি খেলা দেখাতে লাগল। অন্যমনস্ক ছিলুম নেপথ্য সঙ্গীত শুনতে। সে অতি উন্মাদনাময় জগঝম্প বা সেইরূপ কোনো বাদ্য। কয়েকটা দৃশ্য দেখার পর মালুম হলো যে ওই সঙ্গীতটা দৃশ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

কাবুকির মতো য়োসে সকাল থেকে শুরু হয়, সমস্ত দিন চলে। যার যখন খুশি টিকিট কেটে ঢুকতে পারে, যতক্ষণ খুশি বসতে পারে। কারো কারো কোলে দেখলুম খাবারের বাক্স। ওঁরা বোধ হয় রবিবারটা ওইখানেই কাটাবেন। আমরা কি তা পারি! আমাদের উঠতে হলো। দোকান সব খোলা। আমরা গেলুম একটা স্টেশনারি দোকানে।

সেখানে দেখতে পেলুম বিচিত্র রকমের কাগজ, বিচিত্র রকমের খাম। এক এক রকমের খাম এক এক উপলক্ষে ব্যবহার করা হয়। যত রকম নিমন্ত্রণ তত রকম খাম। কাউকে যদি টাকা দিতে হয় একটি বিশেষ রকমের খামে পুরে ট্রে-তে করে দিতে হয়। তেমনি উপহার পাঠাতে হলে যেমন তেমন কাগজে মোড়া চলবে না, খোলাখুলি দেওয়া তো অসভ্যতা। কবিতা লিখে বন্ধুকে পাঠাতে হলে তার জন্যে লম্বা চৌকো সোনার বা রুপোর জল ছিটানো নানা রঙের কাগজ। চিঠি লেখার কাগজ ছাড়া আরেক জিনিস দেখা গেল। ভাঁজ করা পাখা। পাখা খুলে মনের কথা লিখে আবার ভাঁজ করে উপরে লিখতে হয় প্রাপকের নাম ঠিকানা। তারই এক কোণে ডাক টিকিট এঁটে ডাকে দিলে খাম পোস্টকার্ডের মতো সেটাও বিলি হবে। আমি তো পরখ না করে থাকতে পারিনে। যাঁদের উপর পরীক্ষা চালানো গেল তাঁরা পেয়েছিলেন। পাখা অবশ্য যে কেউ খুলে পড়তে পারে। তাই মনের কথাটা খুলে না বলাই ভালো।

এর পর আমরা ট্রামে চড়ে ডাউন টাউন চললুম। ছেলেমানুষের মতো আমার সাধ তোকিয়োর ট্রামে চড়তে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলপথে বেড়াতে। এসব সাধ একে একে মিটল। কিন্তু ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড আমাকে সেদিন রাস্তার ধারে পুতুল খেলা দেখাতে পারলেন না। খেলা যারা দেখায় তারা পুতুল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। যে অঞ্চলে তাদের সাধারণত পাওয়া যায় সে দিকে যেতে আমাদের দেরি হয়ে গেছল। ওদিকে একটা চা পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল। কোয়েকারদের ফ্রেণ্ডস সেণ্টারে।

চা খেতে খেতে আলাপ হয়ে গেল জাপানী মার্কিন ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতের নানা মতের নরনারীর সঙ্গে। কিন্তু চমক লাগল যখন মার্কিন লেখিকা এলিজাবেথ ভাইনিং বললেন, 'মনে পড়ছে না? সেই যে! কাবুকি থিয়েটারে!' আমি বললুম, 'কী আশ্চর্য! আপনার সঙ্গে পাশাপাশি বসেছি অথচ জানিনে যে আপনিই তিনি যাঁর সঙ্গে আলাপ করতে বলা হয়েছিল আমাকে।' জাপানের যুবরাজের গৃহশিক্ষিকা ছিলেন এই কোয়েকার মহিলা। এবার ইনি এসেছেন পেন কংগ্রেসের সম্মানিত অতিথিরূপে।

ইন্টারন্যাশনাল হাউসে সেবার গর্ডন বোল্‌সের পত্নী জেন বোল্‌সকে দেখিনি। এবার সে ক্ষতির পূরণ হলো। কিন্তু হাতে আমার সময় এত কম যে আর কোনো নতুন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছিলুম না। এঁরা বহু দিন ভারতবর্ষে ছিলেন। সে কারণেই হোক বা যে কারণেই হোক এঁদের সঙ্গে আমার আলাপ জমে গেল। সে আলাপ আর থামতেই চায় না। একে একে সবাই চলে গেলেন। রইলুম আমরা ক'জন। তখন এঁরা ফ্রান্সেসকে ও আমাকে এঁদের সঙ্গে মোটরে তুলে নিয়ে গেলেন ও স্কালা সিনেমায় নামিয়ে দিলেন। জাপানীরা বলে স্কালা-জা।

জাপানে ফরাসী ইতালিয়ান ও জার্মান ফিল্মও দেখায়। দেশে দেখতে পাইনে বলে ও ইনগ্রিড বার্গমানের আকর্ষণে স্কালা-জা'তে ফরাসী ফিল্ম দেখতে যাওয়া। প্রযোজকও বিখ্যাত শিল্পী। আর্ট ও টেকনোলজির এমন উৎকর্ষ অথচ এহেন অপব্যবহার কদাচিৎ চোখে পড়ে। সভ্যতার রোগ তো এইখানে যে প্রকৃতির উপর খোদকারি করতে গিয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারাতে বসেছে। মনুষ্যত্বের অভাব পূরণ করবে কী দিয়ে! লবণ যদি তার লবণত্ব হারায় তবে সে লবণত্ব পাবে কার কাছে! অর্ধেকটা দেখে ফ্রান্সেসকে বললুম, 'আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ ঠিক আটটায়। দূতাবাসের মালিক দম্পতির সঙ্গে।' তিনি অনুমতি দিলেন।

পরের দিন শরৎ বিষুব। জাপানের অন্যতম ন্যাশনাল হলিডে। ন্যাশনাল হলিডের সংখ্যা সারা বছরে নয়টি। নববর্ষ দিবস। সাবালকদের দিবস। বসন্ত বিষুব। সম্রাটের জন্মদিন। শাসনতন্ত্র দিবস। ছেলেমেয়েদের দিন। শরৎ বিষুব! সংস্কৃতি দিবস। শ্রমিক ধন্যবাদ দিবস। এই তালিকা থেকে ধর্ম সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। নইলে ভারতবর্ষের মতো হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখদের ছুটির দিনগুলো বছরের একটা মোটা অংশ জুড়ত। আর উৎপাদনে টান পড়ত। কাজকর্মে ছেদ পড়ত। পরে বুঝতে পারি নামকরণটা সেক্যুলার হলেও দিনগুলো ধার্মিকদের মুখ চেয়ে ধার্য করা হয়েছে। অন্তত এই দিনটি।

চাতানী মহাশয় এসে প্রাতরাশের পর আমাকে কামাকুরা নিয়ে গেলেন। মোটরে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। রাস্তার দু'ধারে সব ভেঙেচুরে ছারখার হয়েছিল যুদ্ধে। এই বারো বছরে গড়ে উঠেছে আবার। ধ্বংসের চিহ্ন নজরে পড়ল না।

সমুদ্রের কূলে কামাকুরা নগর। পুরীর মতো কারো কাছে তীর্থস্থান, কারো কাছে হাওয়াবদলের জায়গা। আট শ' বছর আগে এটা ছিল রণপতিদের রাজধানী। এখন এর প্রসিদ্ধির হেতু অমিতাভ বুদ্ধের বিশাল বিগ্রহ। মহাবুদ্ধ বা দাইবুৎসু। নারায় যেমন বৈরোচন বুদ্ধ কামাকুরায় তেমনি অমিতাভ বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ নন এঁরা একজনও। তবু সেই রকম মূর্তি, সেই রকম পদ্মাসন, সেই রকম মুদ্রা। নারার মতো এটিও ব্রঞ্জের তৈরি, কিন্তু তত বড় নয়। উচ্চতা বিয়াল্লিশ ফুট। উপবিষ্ট অবস্থায়। মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য সাত ফুট সাত ইঞ্চি। চোখের দৈর্ঘ্য তিন ফুট চার ইঞ্চি। কানের ছ'ফুট তিন ইঞ্চি। মুখবিবরের দু'ফুট আট ইঞ্চি। নাকের দু'ফুট ন' ইঞ্চি। দুই জানুর মাঝখানের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ ফুট। এই বিগ্রহের মাথার উপরে ছাদ নেই। মণ্ডপ ভেসে গেছে সমুদ্রের জোয়ারে। সাড়ে চার শ' বছর আগে। প্রতিষ্ঠা ১২৫২ সালে। পরিকল্পনা মহাশোগুন য়োরিতোমোর। কাজে পরিণত হয়

তাঁর মৃত্যুর পরে। যাঁর চেষ্টায় হয় তিনি ছিলেন শোগুন অন্তঃপুরিকা ইদানো-নো-ৎসুবোনে। যে মন্দিরের চত্বরে এই বিগ্রহের অবস্থান তার নাম কোতোকু-ইন মন্দির। মন্দিরের সংলগ্ন মঠ। একাংশে প্রধান পুরোহিতের বাসগৃহ।

॥ একুশ ॥

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মাৎসুও সাতো একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক। সংস্কৃতও জানেন। তাঁর পত্নীও একজন বিদুষী মহিলা। স্বামীর চেয়ে ইংরেজীতে এক কাঠি সরেশ। আমরা তাঁদের বাড়ি গিয়ে দেখা করতেই সাতো বললেন, 'এখনি আমাকে মন্দিরে যেতে হচ্ছে পৌরোহিত্য করতে। শরৎকালের এই অমাবস্যায় পিতৃপুরুষদের স্মরণ করতে হয়।'

তখন আমি মিলিয়ে দেখলুম যে ওই দিনটি আমাদের মহালয়া। বললুম, 'আমাদেরও পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতে হয় এই দিন।' আশ্চর্য! না? কোথায় জাপান আর কোথায় ভারত! পূর্বপুরুষদের স্মরণ করা হয় একই তিথিতে। জাপান সরকার ওটিকে অন্য নামে ন্যাশনাল হলিডে করেছেন।

সাতো-গৃহিণীর সঙ্গে ইংরেজীতে আলাপ করা গেল। তিনি ভারতীয় নারীদের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত। স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে তিনি সমিতি করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'জাপানের মেয়েদের স্বাধীনতা বেশী দিনের নয়। গত মহাযুদ্ধে পুরুষেরা যখন লড়াই করতে যায় স্ত্রীরা তখন স্বাধীন হয়।'

তার আগের মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডেও তাই হয়েছিল। এর পরের মহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচীতেও তাই হবে। হাঁ। যুদ্ধেরও একটা ভালো দিক আছে। সংস্কারকদের লাখ কথায় যা হয় না যুদ্ধের প্রয়োজনে আপনা থেকে তা হয়। মেয়েরাই তখন আপিস আদালত স্কুল কলেজ দোকান হাট কলকারখানা ট্রেন ট্রাম চালায়। যুদ্ধের পর তাদের সবাইকে অন্দরে ফেরৎ পাঠানো যায় না। পুরুষেরা পরের দেশ জয় করে এসে দেখে নিজেদের সদর বেদখল হয়ে গেছে।

বসবার ঘরে একটি টেলিভিসন সেট ছিল। একদল কুস্তিগির পাঁয়তারা কষছে তো কষছেই। না তারা ভাঁড়? ভাঁড়ামি করছে? সাতো-গৃহিণী বললেন টেলিভিসনটি তাঁর খ্রীস্টান বান্ধবী নোবুকো য়োশিয়া উপহার দিয়েছেন। বান্ধবীটি বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। উপন্যাস লিখে দু'দুটি টেলিভিসন যন্ত্র পুরস্কার পান, তারই একটি আমি দেখছি। নোবুকো য়োশিয়ার উপন্যাসের বাণী হলো পুরুষকেও নারীর মতো সতী হতে হবে। কায়িক অর্থে।

শুনুন। শুনুন। ক' হাজার বছর অবদমনের পরে কত বড় বেদনাকে বাণী দেওয়া হচ্ছে! আমার যদি সাধ্য থাকত আমিও তাঁকে আরো একটা টেলিভিসন সেট পুরস্কার দিতুম। জাপানের মতো দেশে এ কথা মুখ ফুটে বলতে দুর্দান্ত সাহস লাগে। আমার তো মনে হয় নোবুকো য়োশিয়া খ্রীস্টান বলেই এ রকম অসমসাহসী। ১৯৫২ সালে আটান্ন বছর বয়সে তিনি মহিলা সাহিত্যিক প্রাইজ পান। পুরুষদের দোষগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে তিনি সিদ্ধাঙ্গুলি। পুরুষকে তিনি মানুষ না করে ছাড়বেন না। তাঁর পুরোনো একখানি উপন্যাসের নাম 'আদর্শ স্বামী'! তাঁর লেখা জনগণের প্রিয়।

সেদিন সাতোদের গৃহে মধ্যাহ্নভোজনে বসা গেল তোকোনোমার সামনে। কর্তা ততক্ষণে অনুষ্ঠান সেরে ফিরে এসে আনুষ্ঠানিক সাজ ছেড়ে আলাপ-আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। একটি মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধমূর্তি দেখে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ইনি কে?' উত্তর পেলুম, 'ক্ষিতিগর্ভ।' বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ। বোধিসত্ত্ব ক্ষিতিগর্ভ যত দূর জানি মধ্য এশিয়া থেকে জাপানে আমদানি। ভারতে তাঁর আদি নয়। এক পণ্ডিত মশাই ভারত থেকে জাপানে বেড়াতে গিয়ে ক্ষিতিগর্ভের মুণ্ডিতমস্তক দেখে সিদ্ধান্ত করেন তিনি শঙ্করাচার্য। জাপানে এসে আমার আর কিছু না হোক এই শিক্ষা হলো যে ইসলামের মতো বৌদ্ধধর্ম বা সদ্ধর্ম ছিল স্বদেশকে অতিক্রম করে বহু দূর দেশে প্রসারিত, জাপান চীন সাইবেরিয়া মধ্য এশিয়া কাম্বোডিয়া শ্যাম মালয় ইন্দোনেশিয়া জুড়ে বিস্তারিত ছিল তার পরিধি, আরবীর মতো সংস্কৃত ছিল তার শাস্ত্রভাষা, যদিও পালিতেই তার প্রবর্তকের অনুশাসন। আরবী নাম তো আমাদের বাঙালী মুসলমানদেরও। তা বলে কি তাঁরা আরব? তেমনি অমিতাভ, ক্ষিতিগর্ভ ইত্যাদি অনেকে ভারতীয় না হওয়াই সম্ভব।

তোকিয়োর উএনো মিউজিয়মে অনেক বৌদ্ধ মূর্তি দেখেছিলুম। নাম সংস্কৃত, অথচ কল্পনা অভারতীয়। একটি মূর্তির নিচে লেখা ছিল নীলকণ্ঠ, কিন্তু কোনো মতেই তাকে শিবমূর্তি বলা যায় না। যা কিছু আলো ঠিকরায় তাই সোনা নয়। যা কিছু সংস্কৃতনামা তাই হিন্দু নয়। তা যে ভারত থেকে আমদানি তেমন কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। কামাকুরার একটি মিউজিয়মে দেখলুম সরস্বতীর মূর্তি। জাপানী নাম বেনজাইতেন বা বেনতেন। বীণাবাদিনী নন, কোতোবাদিনী। ইনি হলেন সরস্বতী নদীর দেবীরূপ। সঙ্গীতের সঙ্গে এঁর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু বিদ্যার সঙ্গে নয়। এঁর কোনো বাহন নেই। এঁর অধিষ্ঠান সরসীতটে। চাতানী আমাকে সেদিন নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কামাকুরার নিকটবর্তী একটি দ্বীপে অধিষ্ঠিত সরস্বতী-মূর্তি দেখতে। সাধ ছিল, কিন্তু সময় ছিল না। জলের সঙ্গে সরস্বতীর অবশ্য-সম্বন্ধ আমরা এ দেশে ভুলে গেছি। হাঁস বোধ হয় জলের ব্যঞ্জনা বহন করে।

শিন্তোদের হাচিমান-গু পীঠস্থান দেখতে গেলুম। গাড়ি রেখে অনেকটা পথ হাঁটতে হলো। অত্যন্ত জনপ্রিয় পীঠ। হাচিমানকে সাধারণত মনে করা হয় রণদেব, কিন্তু এখন ইনি জেলেদের দেবতা। সম্রাটের এক পৌরাণিক পূর্বপুরুষের নাম হিকোহোহো-দেমি। কালক্রমে তিনিই হয়ে দাঁড়ান জেলেদের ঠাকুর। পরে তাঁকেই হাচিমানের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়। তার থেকে হাচিমান হলেন জেলেদের দেবতা। হাচিমানকে আবার বিশ্বকর্মা বলেও পূজা করা হয়। কামারশালার দেবতা। হাচিমান কথাটার মানে অষ্ট পতাকা। নারা যখন রাজধানী ছিল তখন হাচিমানকে বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষক দেবতা করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে তিনি হন অমিতাভ বুদ্ধের সঙ্গে এক। কামাকুরায় যখন রণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বুদ্ধের সঙ্গে এক না হয়ে তিনি হলেন যুদ্ধের সঙ্গে এক। ইতিমধ্যে তিনি আবার শান্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন, যুদ্ধের সঙ্গে নয়।

শিন্তোদের প্রধান পীঠস্থান দেখতে হলে ইসে যেতে হয়। সে নাকি বিরাট ব্যাপার। মহা আড়ম্বরময়। সে ছাড়া শিন্তোদের আছে ৮৯টি জাতীয়, ২৭টি বিশিষ্ট জাতীয়, ৮৭টি রাষ্ট্রীয়, হাজার পঞ্চাশেক আঞ্চলিক বা গ্রাম্য, তেষট্টি হাজার গোত্রহীন পীঠ। তার উপরেও আরো হাজার হাজার পীঠ আছে যা গোত্রহীনেরও অধম। ইসের পীঠস্থান সূর্যদেবীর। অন্যান্যগুলিও তাঁর এবং অন্যান্য দেবদেবীদের, সম্রাটের বা সেনাপতিদের, গ্রামদেবতার, উপদেবতার, অপদেবতার, প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের, পশুপাখীর, বিবিধ বস্তুর। মৃত সৈনিকদের পীঠও বড় কম নয়। বহু ক্ষেত্রে একই পীঠে একাধিকের আরাধনা হয়।

কাসুগা পীঠস্থানের মতো হাচিমান-গু পীঠস্থানেও লক্ষ করলুম ভেস্টাল ভার্জিন বা উৎসর্গিত কুমারী। কিন্তু নৃত্যপরা নয়। দপ্তরে দাঁড়িয়ে কর্মতৎপরা। সংলগ্ন যাদুঘর বন্ধ ছিল। সেখান থেকে

যাই আধুনিক শিল্পশালায়। সেখানে নানা দেশের নানা যুগের পোর্সলিন দেখি। তারপর প্রাচীন মূর্তির মিউজিয়মে। সেখানকার সরস্বতী প্রতিমার কথা উল্লেখ করেছি। সেখানেই আমি আবিষ্কার করলুম—বড় দেরিতেই আবিষ্কার করলুম—যে জাপানের প্রত্যেকটি মন্দিরে, মিউজিয়মে, দ্রষ্টব্যস্থলে স্বতন্ত্র শিলমোহর থাকে। বললেই অটোগ্রাফের মতো ছেপে দেয়। পরে সবাইকে দেখাতে পারা যায় আলবামের মতো।

কামাকুরার ল্যাকার করা কাঠের কাজ বহুশতাব্দী ধরে প্রসিদ্ধ। তাকে বলে কামাকুরা বোরি। লালচে রঙের থালা, বাটি পর্দা প্রভৃতির উপর মনোহর নক্‌শা থাকে। একটি দোকানে গিয়ে কেনা গেল। অকস্মাৎ শুনি চাতানী-সান বলছেন, 'আপনাকে কী যে উপহার দিই ভেবে পাচ্ছিলুম না। এই নিন।'

সেদিন আমার অভিপ্রায় ছিল আতামি গিয়ে তানিজাকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, ফিরতে না পারলে আতামিতেই রাত কাটাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিলুম তানিজাকি সেখানে নেই, কিয়োতো চলে গেছেন। কামাকুরা থেকে ফেরার পথে চাতানী বললেন রাশিয়ান ব্যালে তখনো জাপান ছাড়েনি, সেই সন্ধ্যায় স্পেশাল শো। এত দিন রুশ দূতাবাস থেকে দ্বিতীয় টিকিট না পেয়ে আমি তো ধরে নিয়েছিলুম যে ওরা চলে গেছে। পাগলের মতো ছুটলুম কোমা থিয়েটারে, দৈবকৃপায় যদি টিকিট কিনতে পাই। দেখলুম লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো দামের একখানাও টিকিট পাবার জো নেই। চাতানী-সান বললেন ব্যালে দেখবে বলে আমেরিকানরা উড়ে এসেছে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপার থেকে, টিকিটের দাম ব্ল্যাক মার্কেটে বিশ হাজার ইয়েন। তখন বুঝলুম কমপ্লিমেণ্টারি টিকিটের মূল্য কত।

পরের দিন সকালে ইনাজু মহাশয় এসে আমাকে তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গেলেন। তোকিয়োর শামিল, অথচ শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন আরণ্যক পরিবেশ। বছর ত্রিশেক আগে পাহাড় কাটিয়ে জঙ্গল সাফ করিয়ে এর প্রতিষ্ঠা হয় আশ্রম বিদ্যালয়ের মতো। প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কুনিয়োশি ওবারা বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে পোড়ো জমি কেনেন ও সহধর্মিণীর সহযোগে ছোট একটি বিদ্যালয় পত্তন করেন। এখনো প্রচুর জমি অনাবাদী পড়ে রয়েছে। কতক জমি চাষও হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ হলো কৃষিবিভাগ। ওবারা হাতে কলমে কাজ করার উপর জোর দেন। ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে পড়ে, একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে খাটে। কিন্তু থাকে আলাদা আলাদা আবাসে। উপাসনার জন্যে একটি খ্রীস্টীয় চ্যাপেল। ওবারা স্বয়ং প্রেস্‌বিটারিয়ান হলেও উপাসনাপদ্ধতি সাম্প্রদায়িক নয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সব ধর্মের কাছে উন্মুক্ত। বৌদ্ধদর্শনও শিক্ষা দেওয়া হয়। আর জেনদের মতো চা অনুষ্ঠানও করা হয়, বিশিষ্ট অতিথির খাতিরে। আমার জন্যেও চা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু আমি পৌঁছলুম দেরিতে তাই বাদ গেল।

ছোটদের বিভাগগুলি দেখতে দেখতেই আমার মধ্যাহ্নভোজনের সময় হলো, তার পরে চ্যাপেলে গিয়ে আমাকে ভাষণ দিতে হলো সমবেত ছাত্রছাত্রী শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের। তার পরে জিমন্যাসিয়মে নিয়ে গিয়ে আমাকে ব্যায়াম দেখানো হলো সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত রেখে। ডেনমার্ক থেকে ও সুইটজারল্যাণ্ডের জেনিভা থেকে ওবারা এ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন, তার আগে সারা ইউরোপ ঘুরে সন্ধান করেছেন কোন্ দেশের ব্যায়াম শ্রেষ্ঠ। তেমনি লেখাপড়ার পদ্ধতি নিয়ে তিনি বাছবিচার ও পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন। শিশুরা নিজেরাই নিজেদের রুটিন ঠিক করে। দেখলুম ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে একখানা বড় ছবি আঁকছে। একটি ছেলে একাই একটি মূর্তি গড়ছে। কয়েক জনকে দেখা গেল নিজের হাতে পিআনো বানাচ্ছে। একটা রেডিও ছিল, সেটা ছেলেদের হাতে গড়া। বেহালাও দেখলুম, অসমাপ্ত কাজ। বিজ্ঞানের ঘরে চলেছে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট।

ইংরেজী সকলেই শেখে, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম জাপানী। তামাগাওয়ার ছেলেমেয়েদের গান শেখানো হয় পাশ্চাত্য সুরে। তাতে আমি আশ্চর্য হইনি, কিন্তু তাজ্জব বনে গেলুম যখন তাদের চ্যাপেলে গিয়ে শুনলুম তাদের কণ্ঠে 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা।' পরিপূর্ণ অনুকরণ।

তখন আমার ভাষণ আরম্ভ করলুম আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। তার থেকে এলো ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ও আঞ্চলিক ভাষার নাম। ভাষাসমস্যা! হিন্দী বনাম ইংরেজী। এমনি কত কথা। চ্যাপেল কেবল উপাসনার জন্যে নয়। স্বয়ং কুলপতি ওবারা সেখানে নীতিশিক্ষা দেন। সেইজন্যেই তার অস্তিত্ব। চরিত্রগঠনই তামাগাওয়ার সুনামের হেতু। গত মহাযুদ্ধের সময় ওবারাকে যুদ্ধবিরোধী বলে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে ধরে রাখাও যায় না। কারারক্ষীরা সেলাম করে বলে, 'মাস্টারমশাই'। আর জেনারেল ও য়্যাডমিরালরাই তাঁদের ছেলেমেয়েদের পাঠান তাঁর বিদ্যালয়ে চরিত্রগঠনের জন্যে। মাস ছয়েক পরে তিনি খালাস!

প্রেসিডেন্ট ওবারাকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এত বড় প্রতিষ্ঠান চালান কী করে? সরকারী সাহায্য পান নিশ্চয়।'

'সরকারী সাহায্য!' তিনি অবাক হলেন। তার পর আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আমি নেব সরকারী সাহায্য! নিলে তো ওরা বর্তে যায়। নিতে ওরা আমাকে বার বার সেধেছে। না, বাপু। ও রাস্তায় আমি নেই। জাপানে তিন হাজার সাত শ' প্রকাশক আছেন, তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ তাঁদের মধ্যে সপ্তম। বই থেকে আয় হয়, জমি থেকে আয় হয়, জমির উপর তৈরি বাড়ি থেকে আয় হয়। তার উপর ছাত্রবেতন থেকে আয়। সব ধার শোধ করে দিয়েছি। সরকারী সাহায্য কী হবে?'

ছেলেমেয়েদের জন্যে তামাগাওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানী ভাষায় যে বিশ্বকোষ প্রকাশ করা হয়েছে তার অনেকগুলি খণ্ড তিনি আমাকে উপহার দিলেন। চমৎকার ছবি আর ছাপা আর কাগজ। আমরা এ রকমটি পারিনে, পারবও না। আমাদের বিক্রয়সংখ্যা কম। জাপানে কাগজ ইত্যাদি বাবদ খরচও কম। ওবারা পুরোদস্তুর প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ, সেইসঙ্গে আদর্শবাদী। তিনি যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা সরকারী চাকুরে তৈরি করে না। এ সেই বুনিয়াদী শিক্ষা যা ছাত্রছাত্রীদের স্বাবলম্বী করে, স্বাধীন করে। জীবনে শ্রী এনে দেয়। শরীর মন চরিত্র সুগঠিত ও কর্মঠ হয়। এসব মানুষ নিজের স্থান নিজেই করে নেবেই। এরা মূল্যবান। দেখলুম আমাদের উত্তরপ্রদেশের একটি ছাত্র এখানে কৃষিবিদ্যা শেখে। মাস ছয়েকের মধ্যে জাপানী ভাষা চলনসই রকম আয়ত্ত করেছে। জাপানী খাদ্যও অভ্যাস করেছে। বয়স মাত্র ষোলো-সতেরো। চন্দ্রপাল সিং বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ভারতীয় বলে তার খাতির কত!

ফেরার পথে ঘুরে গিয়ে ওবারা-সান ও ইনাজু-সান আমাকে নিয়ে গেলেন মুশানোকোজির বাড়ি। জাপানের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। বয়স সত্তরের উপর। প্রথম যৌবনে ইনি টলস্টয়ের জীবনদর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। সে প্রভাব তেত্রিশ বছর বয়সে রূপ নিল 'নূতন গ্রাম' পত্তনে। অভিজাত বংশধর আত্মসুখেব অন্বেষণ না করে করলেন সর্বোদয়ের ধ্যান। সবাই বাস করবে একটি আদর্শ গ্রামে, আদর্শ সমাজে। সকলেই গতর খাটাবে, মাটি চষবে, সৃষ্টি করবে, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজবে। লোকে বলল ইউটোপিয়া। নিন্দাবাদ করল। স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে এখনো তিনি সেই 'নূতন গ্রাম' পরিচালনা করছেন, কিন্তু নিজে সেখানে থাকতে পারেন না, থাকেন তোকিয়োর শহরতলীতে।

'না, আমি টলস্টয়পন্থী নই।' আমাকে বললেন মুশানোকোজি, সংক্ষেপে মুশাকোজি। 'টলস্টয়ের কতকগুলি আইডিয়া সম্বন্ধে আমার আগ্রহ ছিল।' বললেন জাপানীতে। দোভাষী হলেন

ইনাজু।

আমি যখন গান্ধী ও বিনোবার সঙ্গে তুলনা করলুম তখন বললেন, 'তাঁরা চান গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। শত শত গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি। আমার তেমন কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। আমি চাই কয়েকটি ব্যক্তি নিজেদের অন্তর্জীবনকে আর একটু গভীর করবে, আর একটু ঋদ্ধ করবে।'

চল্লিশ বছর হলো, 'নূতন গ্রামে'র প্রতিষ্ঠা। এখন সেখানে থাকে এগারো জন অবিবাহিত পুরুষ ও একটি বিবাহিত দম্পতি। বাড়তে বাড়তে এমন হয়নি, কমতে কমতে হয়েছে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে বেশ শ্রীমন্ত অবস্থা ছিল। যেমন ছিল সাবরমতী ও সেবাগ্রাম আশ্রমের। আফসোস করে কী হবে! এই রকমই হয়ে থাকে। মুশাকোজি-সানকে বললুম, 'আপনার ঝঞ্ঝাট আরম্ভ হবে যখন ঐ এগারোটি পুরুষ এগারোটি বৌ ঘরে আনবে ও এগারোটি পরিবার সৃষ্টি করবে।' আরম্ভ হবে কী, অনেক আগেই হয়েছিল, এই তার পরিণাম। মুখ ফুটে বললুম না সে কথা। তিনি করুণভাবে চেয়ে রইলেন, নিরুত্তর, অসহায়।

মুশাকোজি মহাশয় প্রধানত উপন্যাস লিখতেন, দ্বিতীয়ত নাটক। ষাট বছর বয়সের পর থেকে সাহিত্য ছেড়ে চিত্রকলায় মশগুল রয়েছেন। তাও পাশ্চাত্য চিত্রকলা। আমাকে তাঁর স্বহস্তের একখানি ছবি উপহার দিলেন। তা ছাড়া কিছু তর্জমা। জিজ্ঞাসা করলুম, 'আধুনিক জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে কী আপনার মত?' উত্তর হলো, 'পড়িইনে।'

তাঁর 'নূতন গ্রামে'র যখন সুদিন ছিল তখন তাঁর সাহিত্যের কাজও সমান পরিণতি ও শক্তিমত্তা লাভ করেছিল। তখন তিনি এক হাতে গ্রাম চালাচ্ছেন, এক হাতে সাহিত্য। তার পর তিনি ইউরোপে যান। তাঁর স্বপ্নের দেশ। ইউরোপের প্রেরণায় বছর পাঁচ-সাত কাটল। তার পর জাপানের পরাভব, মুশাকোজির চিত্রলোকে অপসরণ। যুদ্ধের আদি থেকেই তিনি আপনাকে সরিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধেও তাঁর আদর্শের পরাভব। এরূপ পরিস্থিতিতে শিল্পীপ্রকৃতির মানুষ শিল্পেই ফিরে যায় ও আশ্রয় পায়। মুশাকোজি তা বলে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সাধনায় সুখী হবার পাত্র নন। তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা মহত্তর সামঞ্জস্যের আশা রাখে।

জাপানের সাহিত্যিকদের রকমারি 'বাদ' অনুসারে বিভক্ত করা হয়। কেউ ন্যাচারালিস্ট, কেউ রিয়ালিস্ট, কেউ আর্ট ফর আর্ট সেক-ইস্ট। কেউ কেউ আবার সেটানিস্ট (Satanist), নিও-রোমান্টিক, নিও-সেনসুয়াস, প্রোলিটারিয়ান। মুশাকোজি জানতে চাইলেন আমি কোন্ 'বাদী'। বলতে হলো, 'হাইয়ার রিয়ালিস্ট'। ইনাজু বললেন, 'না, আপনি আইডিয়ালিস্ট।' আমি মেনে নিলুম।

ভারতবর্ষে মুশাকোজি মহাশয় অল্প সময় ছিলেন। শিবপুরের বটানিক গার্ডেন তাঁর মনে পড়ল। সেখানে তিনি একটি বাঁদর দেখেছিলেন, সেটিকেও ভোলেননি।

এই ঋষিকল্প শিল্পী যে ঘরে বসে কাজ করেন সে ঘরও দেখলুম। বলা বাহুল্য চা পান করা গেল। লক্ষ করলুম তাঁর স্ত্রীভাগ্য।

ইংলণ্ডের যেমন 'অর্ডার অফ মেরিট' জাপানের তেমনি 'অর্ডার অফ কালচারাল মেরিট'। দেশের বাছা বাছা সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদিকে দেশের সরকার এই ভাবে সম্মানিত করেন। ১৯৩৯ থেকে আরম্ভ করে আঠারো বছরে চোদ্দ জনকে এ সম্মান দেওয়া হয়েছে। মুশাকোজি তাঁদের অন্যতম। তাঁর বন্ধু শিগা আরেক জন। তানিজাকি আরো এক জন।

কিন্তু মুশাকোজি তো কেবল সাহিত্যরথী নন, তিনি গ্রামসংস্থাপক, সমাজপ্রবর্তক। কোলরিজ, সাদে প্রভৃতির 'প্যান্টিসোক্রেসী' ছিল নিছক কবিকল্পনা, বাস্তবে বেশী দিন টিকল না। মুশাকোজির 'নূতন গ্রাম' চল্লিশ বছর পরেও বিদ্যমান। এখনো তার সম্বন্ধে পত্রিকা বেরোয়। তিনি আমার হাতে

একখানি দিয়ে বললেন, 'দেখে আসতে পারেন। এমন কিছু দূর নয়।' নিজে সেখানে থাকেন না, থাকে যারা তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তবু তাঁর প্রত্যয় তেমনি দৃঢ়, তাঁর নিষ্ঠা তেমনি নিষ্কম্প।

দেশে ফিরে এসে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল এক জাপানী বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধু বললেন, 'মুশাকোজি যখন পুনর্বার বিবাহ করেন তাঁর নববধূ তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে ওসব গ্রামে ট্রামে বসত করা তাঁর পোষাবে না। কী করবেন, স্ত্রীর ইচ্ছাই মেনে নিতে হলো।'

টলস্টয়ের জীবনেরও ট্র্যাজেডী নিহিত ছিল এইখানে। স্ত্রীর ইচ্ছা তাঁর আদর্শবাদকে ক্রমেই পরাস্ত করছিল। শেষে তো তিনি গৃহত্যাগ করে পথের ধারে এক রেলস্টেশনে দেহত্যাগই করলেন। স্ত্রী গেলেন সেবা করতে। স্বামী তাঁর মুখদর্শন করলেন না। কস্তুরবা যদি প্রতিকূল হতেন তা হলে গান্ধীজীকেও হয় নগরবাসী হতে হতো, নয় পত্নীত্যাগ করতে হতো। সেই গান্ধারী ছিলেন বলেই গান্ধীজীর আদর্শে ও বাস্তবে সামঞ্জস্য ছিল।

সেদিন আমাদের দূতাবাসের পুষ্পদাসের ওখানে আমার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমার সঙ্গে আমার বন্ধুদেরও। তাই ওবারা-সান ও ইনাজু-সানকে নিয়ে প্রথমে গেলুম রাষ্ট্রদূত ভবনে। সেখানে সাজবদল করব। যেতেই রাষ্ট্রদূতের সারথি দিয়ে গেল এক তাড়া চিঠি। বলে গেল, 'রুশ দূতাবাস থেকে টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে, দেখবেন।' কোথায় স্ত্রীর চিঠি পড়া, কোথায় সাজবদল, কোথায় কী! উভয়সঙ্কটে পড়ে উত্তেজনা চেপে আচার্য ওবারাকে বললুম, 'প্রেসিডেন্ট ওবারা, আপনিই বলুন এখন আমার কর্তব্য কী। ব্যালে দেখতে যাব না ডিনার খেতে যাব?'

ওবারা-সান বয়সে অনেক বড়। আমুদে মানুষ। রঙ্গ করে বললেন, 'আরে, বাবা, যে জিনিস দেখতে আমেরিকা থেকেও মানুষ উড়ে আসছে সে জিনিস পায়ে ঠেলতে আছে? গো। গো। গো ইমিডিয়েটলি। আমাদের জন্যে ভাববেন না। আমরা গিয়ে খানা খাব ঠিক। এখন শুধু একটিবার টেলিফোন করে নিমন্ত্রণকর্তার অনুমতি নিন।'

ছ'টায় আরম্ভ। আর মিনিট দশেক বাকী। তার পাঁচ মিনিট গেল টেলিফোনে। স্নান করছেন পুষ্পদাস। টেলিফোন ধরলেন তাঁর পত্নী। আমার কথা শুনে বললেন, 'এক শ' বার। এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে নেই। না, আপনাকে আটটার মধ্যে উঠে আসতে হবে না। ন'টা। সাড়ে ন'টা। দশটা। যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ দেখবেন। আমরা আপনার জন্যে খাবার নিয়ে বসে থাকব। না, এতে আমাদের একটুও অসুবিধে হবে না।'

কাছেই কোমা থিয়েটার। আমার ধারণা ছিল সেইখানে হবে। কিন্তু টিকিটের পিছনে জাপানী ভাষায় লেখা ছিল ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম। সেটা সুমিদা নদীর ও পারে। বহু দূরে। ওবারাদের পুষ্পদাসের ওখানে দিয়ে তাঁদেরি গাড়ি নিয়ে উধাও হলুম আমি, অবশ্য তাঁদেরি পরামর্শে। নইলে ফিরে আসার সময় ট্যাক্সি পেতে কষ্ট হতো। খরচ তো বাঁচলই। কিন্তু আমার তখন বিপরীত বুদ্ধি। কেন আমাকে ট্যাক্সি করতে দিলেন না, কেন আমাকে পুষ্পদাসের বাড়ি ঘোরালেন, আগে সময় না আগে টাকা! ঘড়ির দিকে চেয়ে থাকি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট...প্রায় চল্লিশ মিনিট দেরি হলো পৌঁছতে। অথচ ওঁরা যদি না থাকতেন, জাপানী ভাষায় কী লেখা আছে যদি না বলতেন, তা হলে আমি তো কোমা থিয়েটারে গিয়ে আরো এক চক্কর ঘুরতুম, আরো দেরিতে পৌঁছতুম। কিংবা পৌঁছতুমই না আমাদের দূতাবাসের জর্জের মতো। জাপানে বাস করে জাপানী না জানার ফলে বেচারার রাশিয়ান ব্যালে দেখা হলো না, যদিও টিকিট জুটেছে আমারি মতো।

'কই। মিঃ জর্জ কোথায়!' বার বার উঠছিলেন রুশ দূতাবাসের রোজানোভ। আমার আসন তাঁরই এক পাশে। আমার আশাও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বললেন, 'আঃ! আপনার জন্যে টিকিট জোটাতে আমাকে যা করতে হয়েছে! আপনি যদি আমাকে এক মাস আগে খবর দিতেন।' আমি

তখন ভারতবর্ষে শুনে অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'ওঃ! তাই তো। কিন্তু টিকিট সব এক মাস আগে থেকে বিক্রী। কোনো মতেই আপনার জন্যে আসন মেলে না। আজ শেষ দিন। বেশী লোক দেখতে পাবে বলে স্টেডিয়ামে ব্যালে দেখানো হচ্ছে। স্টেডিয়াম কি ব্যালের উপযুক্ত! আর এইসব আসনে কি রাষ্ট্রদূতদের বসতে দেওয়া! বেঁচে গেল কয়েকটা জায়গা। ভাবলুম আপনি তো ডিপ্লোম্যাট নন, লেখক মানুষ, আপনার হয়তো অপমান লাগবে না। তাই সাহস করে পাঠালুম একখানা টিকিট।'

ভাগ্যিস আমি ডিপ্লোম্যাট নই। লেখক। রোজানোভকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, 'এ কিছু মন্দ আসন নয়, কিন্তু এর চেয়ে মন্দ আসনেও আমার আপত্তি ছিল না। আমরা আর্টিস্টরা সব রকম অভিজ্ঞতার জন্যে প্রস্তুত। যদি সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ পাই। যদি সৌন্দর্য রূপান্তরিত করতে পারি। এখন আমাকে বলুন, 'সোয়ান লেক' দেখানো হয়েছে কি না।'

না। দেখায়নি। বাঁচলুম। সারা পথ ভাবতে ভাবতে এসেছি যে ট্যাক্সিভাড়া রাখতে গিয়ে আমি হয়তো 'সোয়ান লেক' হারাচ্ছি। কুল রাখতে গিয়ে শ্যাম।

॥ বাইশ ॥

'সোয়ান লেক' সেদিনকার প্রোগ্রামে ছিল না। যার জন্যে আমার দ্বিতীয় বার আসা। ওটা শেষ রজনীর পর শেষ অতিরিক্ত রজনী। শিল্পীরা সকলেই শ্রান্ত। আস্ত একটা ব্যালের জন্যে দম নেই। তা ছাড়া যাদের জন্যে এই শেষ অতিরিক্ত রজনী তারা রসিক দর্শক নয়, সর্বসাধারণ। তারা চায় বিচিত্র অনুষ্ঠান। তাই প্রোগ্রাম হয়েছে ভগ্নাংশের সঙ্গে ভগ্নাংশ জুড়ে। কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডনৃত্যের পর স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডনৃত্য সাজিয়ে।

সূচীর অনেকগুলি অংশ আমার আগের বারই দেখা ছিল। সেগুলি বাদ দিলে যেগুলি থাকে তাদের মধ্যে ছিল 'ডাইং সোয়ান'। মুমূর্ষু মরাল। পাভলোভার প্রিয় নৃত্য। পাভলোভা আপনি। ত্রিশ বছর পূর্বে পাভলোভাকে দেখেছিলুম নাচতে। সে নাচ যে আর কেউ নাচতে পারে তা কল্পনা করা শক্ত। নাচলেন তিখোমিরনোভা। এঁর স্থান বোলশয় থিয়েটারে লেপেশিন্স্কায়ার ঠিক পরে। এ নাচ এমন নাচ যে বার বার দেখেও তৃপ্তি হয় না। মৃত্যুর বিষাদ জীবনের শুভ্র কোমল পাখার উপর শান্তির মতো নেমে আসে। ঢলে পড়ে হাঁসটির গ্রীবা। ধীরে। অতি ধীরে।

এটি দেখার পর আর কিছু দেখার অভিলাষ ছিল না। বেশীর ভাগই পুনরাবৃত্তি কিংবা জনতার তুষ্টিবিধান। কিন্তু লেপেশিন্স্কায়াকে একবারও দর্শন না করে কেমন করে উঠি! আটটা বাজল। সাড়ে আটটা বাজল। মনে মনে সংকল্প করলুম ন'টায় গা তুলব। দর্শন হয় হবে, না হয় না হবে। কিন্তু সত্যি সত্যি ন'টা যখন বাজল অথচ দর্শন মিলল না তখন দেখি পা উঠতে চায় না। পা যদি না ওঠে গা উঠবে কী করে! ওদিকে বসে আছেন নৈশভোজনের অতিথিরা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আমার দ্বারা নির্বাচিত। কী লজ্জা! কিন্তু আমার তখন লজ্জাবোধের চেয়ে প্রবল হয়েছিল জেদ। ব্যালে দেখতে এলুম, লেপেশিন্স্কায়াকেই দেখলুম না। হ্যামলেট দেখতে এলুম, হ্যামলেটকেই দেখা হলো না। এ কি কখনো হয়! তবে কি তিনি এখনো পা ভেঙে পড়ে আছেন? না, আমি যখন এসে পৌঁছইনি তখন নাকি তিনি একবার নেচেছিলেন। তাতে আমার খেদ শুধু বেড়ে গেল। তা হলে তিনি নৃত্যক্ষম। আমার অনুপস্থিতিতে নাচবেন আবার। দেখুন দেখি কী

অন্যায়!

এমনি করে গেল কেটে পাঁচ মিনিট। লেপেশিন্‌স্কায়ার জন্যে আকুল প্রতীক্ষায়। অন্যদের তো আমার মতো দোটানা নেই। তারা প্রত্যেকটি দৃশ্যের পর করতালির করতাল বাজিয়ে 'আঁকোর' জানাবে। আর নাচিয়ে বেচারিকে পুনর্বার নাচিয়ে ছাড়বে। হাঁস মরে গেছে, ওরা তা মানবে না। মরা হাঁসকে আবার জ্যান্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে, নাচতে নাচতে মরতে হবে। সব চেয়ে কৌতুকের ব্যাপার য়াগুদিনকেই লোকে সব চেয়ে পছন্দ করে। যেমন কোমা থিয়েটারে তেমনি স্টেডিয়ামে তাঁকেই নাচতে হলো বার বার তিন বার। বাশকির অঞ্চলের শিকারীর নাচ। শিকারীর কাণ্ড দেখে বাঁচিনে। নাচ নয় তো, মুহুর্মুহু হাই জাম্প। দুই হাত দুই পা পরিপূর্ণভাবে মেলে সোজা করে সমান্তরাল করে সে কী ওস্তাদী উল্লম্ফন! রবারের বলের মতো উঠছে আর পড়ছে। আর হাত পা ছড়িয়ে শূন্যে ভেসে থাকছে। 'আঁকোর'! 'আঁকোর'! তালি বাজছে তো বাজছেই। শেষ আর হয় না। ওদিকে আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ন'টা বেজে যখন বিশ মিনিট, যখন আমি মরীয়া হয়ে আসন ছাড়তে উদ্যত, তখন কাকে দেখতে পেলুম, বলুন তো? প্রেওবাজেন্‌স্কিকে। শীত যদি আসে বসন্ত কি খুব বেশী পেছিয়ে থাকতে পারে? না, পারে না। দেখতে দেখতে প্রবেশ করলেন লেপেশিন্‌স্কায়া। 'ডন কুইকসোটে'র একটি দৃশ্য। আস্ত একটা ব্যালে না হলেও সত্যিকার ব্যালের একাংশ। আমার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সার্থক হলো। ভুলে গেলুম কোথায় কে আমার জন্যে বসে আছে নৈশভোজনের দলে। ভুলে গেলুম আমার নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা। এও তো একপ্রকার ভোজ। সৌন্দর্যের ভোজ। কত বার যে লেপেশিন্‌স্কায়া পায়ের আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে ঘূর্ণিহাওয়ার মতো ঘুরলেন! কেমন অবলীলাক্রমে! কত বার যে তাঁর নৃত্যসহচর তাঁকে শূন্যে তুলে ধরলেন। যেন ইনি একটি হারকিউলিস আর উনি একটি পাখী! মানবদেহের সুষমা ও সৌষ্ঠব পূর্ণ প্রকট হলো! কী প্রাণচাঞ্চল্য! কী শক্তিমত্তা! কী উল্লাস! কী কুশলিতা! ওদিকে সঙ্গীত পরিচালনা করছিলেন রজ্‌ডেন্টভেন্‌স্কি। আরেক জাদুকর।

ব্যালেরিনাকেই প্রশংসার ষোলো আনা দেওয়া রেওয়াজ। কিন্তু তাঁর পার্টনার যদি হন প্রেওব্রাজেন্‌স্কির মতো গুণী তবে প্রশংসাটাকে সমান সমান না হোক দশ আনা ছ' আনা ভাগ করে দিতে হয়। পরে একদিন চন্দ্রশেখর বলেছিলেন, 'আমার মতে প্রেওব্রাজেন্‌স্কি কোনো অংশে কম নন। বরং বড়।' রুশ দূতাবাসের ককটেল পার্টিতে চন্দ্রশেখর তো সোজা বলে বসলেন, 'আপনার নাম প্রেওব্রাজেন্‌স্কি। আমাদের ভাষায় প্রিয় কথাটার মানে কী, জানেন?' মঞ্চের বাইরে কিন্তু তাঁকে হারকিউলিসের মতো বলবান মনে হয় না। অথবা তাঁর সঙ্গিনীকে বিহঙ্গের মতো লঘুভার! জাপানে এসে এই তিন সপ্তাহে তাঁর ওজন কমে গেছে বারো না চোদ্দ পাউণ্ড। বোধ হয় ব্যালেরিনার বাহন হয়ে। পরে অবগত হয়েছি তা নয়, আমার ও ধারণা ভুল। ব্যালেরিনাদের এমন সুকৌশলে ধারণ করতে হয় যে পার্টনারদের উপর চাপ পড়ে না। আর ব্যালেরিনারা এমন সুকৌশলে নাচেন যে চাপ পড়ে পায়ের উপর নয়, উরুর উপরে।

এ যুগের সাধারণ দর্শক সে যুগের অভিজাত নয়। ব্যালেকে যদি সেকালের একটা মরা নদী না করে একালের বহতা নদী করতে হয় তবে এ যুগের সাধারণের মুখ চেয়ে বিষয় মনোনয়ন করতে হবে। দেখলুম জাপানের সাধারণ চায় লোকনৃত্য? চায় য়্যাক্রোবাটিক্‌স্। বোধ হয় সব দেশের সাধারণ তাই চায়। তা বলে অভিজাত ঐতিহ্য এখনো নিঃশেষ হয়নি। ব্যালের নিঃশ্বাস এখনো ক্লাসিকাল নৃত্য বা নাট্য। যা দিয়ে লেপেশিন্‌স্কায়ার ও প্রেওব্রাজেন্‌স্কির অগ্নিপরীক্ষা। এই দুই ধারার মাঝামাঝি হচ্ছে ফ্যান্টাসি নৃত্য বা নাট্য। স্বপ্নময়, ভাবময়, কল্পনাপ্রবণ। যেন পরীর রাজ্যে নিয়ে যায়। তিনটে ধারাই কম বেশী থাকে যে কোনো দিনের প্রোগ্রামে, যদি না আস্ত একটা ব্যালে মঞ্চস্থ

করতে হয়। সে রকম হয়েছিল একদিন কি দু'দিন। কে আমাকে টিকিট দিচ্ছে যে দেখতে যাব!

ব্যালের জন্যে চাই অসীম স্পেস। বিপুল মঞ্চ না হলে ব্যালে জমে না। নাচতে হয় হাত পা ছড়িয়ে, প্রাণ খুলে, দলে দলে, আবর্তন করে। ব্যালে শুধু পায়ের কাজ বা হাতের কাজ নয়। সারা দেহের সকল অঙ্গের কাজ। তা ছাড়া অভিনয় তো বটেই। তাকে স্বল্পপরিসর একটি মঞ্চে সংক্ষেপিত করা যায় না। আমাদের দেশে তার উপযুক্ত মঞ্চই নেই। জাপানে আছে। জাপানীরা এসব ক্ষেত্রে কত যে অগ্রসর তা ভারতে থাকতে আমরা অনুমান করতে পারিনে। বোলশয় থিয়েটারের ব্যালে সম্প্রদায় ভারতে এলে নাচবে কোথায়! তা সত্ত্বেও তাঁদের আমি স্বাগত জানিয়ে এসেছি। বলেছি, আসবেন, আসবেন আমার দেশে। বলেছি সেদিন নয়, পরের দিন। হাঁ, পরের দিনও তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল। নিমন্ত্রণ ছিল সোভিয়েট দূতাবাসে। পরে বলব সে কথা।

সে রাত্রে পুষ্পদাসের ওখানে খেতে গিয়ে দেখি তখনো অতিথিরা অপেক্ষা করছেন, কিন্তু আহারের পরে। ক্ষমাপ্রার্থনা করলুম সকলের কাছে। আলাপ করব কখন! রাত তখন দশটা। একে একে প্রস্থান করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়দর্শন সুধী হাজিমে নাকামুরা। সস্ত্রীক। ভারত সম্বন্ধে গবেষণার গ্রন্থ উপহার দিয়ে বললেন, 'শিবাঃ সন্তু পন্থানঃ।' সুন্দর সংস্কৃত উচ্চারণ। সময় থাকলে যাওয়া যেত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে, তোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি ভারতীয় দর্শন অধ্যাপনা করেন।

আমার সুখের জন্যে ধরে রেখেছিলুম ওবারা ও ইনাজুকে। তাঁদের তো আরো দূরের পাল্লা। যেতে হবে তামাগাওয়া। কৃতজ্ঞতা জানালে যদি ক্ষতিপূরণ হতো! তার পর আমাকে ভোজনে বসিয়ে দিলেন পুষ্পদাস গৃহিণী। ফরাসী মহিলা। পুষ্পদাস স্বয়ং পণ্ডিচেরীবাসী। গল্প করা গেল রাত জেগে। তার পর ওঁরা দুজনে গাড়ি করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। পথে যেতে যেতে এক অস্ট্রীয়ান মহিলার স্বামী জাপানী ডাক্তার বললেন, 'আপনার কাওয়াবাতা য়াসুনারি, শিগা নাওইয়া ইত্যাদির যুগ গেছে। আজকের জাপানে কে এঁদের লেখা পড়ে।'

মধ্যরাত্রির দৃশ্য দেখতে দেখতে চললুম। দোকানপাট তখনো কিছু কিছু খোলা। কিন্তু নিওনের রঙিন আলোর বিজ্ঞাপন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে বা নিবে গেছে। রাস্তায় ভিড় নেই, মোটরের সংখ্যাও কম। অবশেষে এলো শিন্‌জুকু। শুনেছিলাম তোকিয়োর ওটি একটি লালবাতি এলাকা। ও পথ দিয়ে রাত করে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে বারণ করেছিলেন ঝা-রা। একলা পদাতিক দেখলে চোর বাটপাড় যদি বা ছাড়ে ললনারা ছাড়বেন না। তোকিয়োর সমৃদ্ধির সোনার অন্তরালে দারিদ্র্যের ভয়াবহ খাদ। সেটা দিনের বেলা পুলিশের দাপটে গোপন থাকে। রাতের বেলা নরখাদক হয়। এক হাতে বিভব ও অন্য হাতে ব্যাধি বিস্তার করে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম যার অভিমুখে মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে তা সুখস্বর্গ নয়। এমন কি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও নয়। তাই থোরো, টলস্টয়, গান্ধী, মুশাকোজি প্রভৃতি দিশারীরা বলছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'ফিরে চল মাটির টানে।' কিন্তু সে ফিরে যাওয়া যেন মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া না হয়।

পরের দিন পঁচিশে সেপ্টেম্বর। আর তো বেশী দেরি নেই, এবার ফিরে চল দেশের টানে। কেনাকাটা করতে হবে। চাতানী-সান সহায় হলেন। নিয়ে গেলেন মিৎসুকোশিতে। জাপানের এইসব ডিপার্টমেণ্ট স্টোর এক একটি মহাভারত বিশেষ। যাহা নাই এখানে তাহা নাই জাপানে। যদি কেউ এক দিনে জাপান দর্শন করতে চান তা হলে তাঁকে পরামর্শ দেব মিৎসুকোশি কিংবা তাকাশিমায়া কিংবা দাইমারু ডিপার্টমেণ্ট স্টোরে দিনটা কাটাতে। কিনতে যে হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, নামমাত্র কিছু কিনলেও চলবে। তবে না কিনে তিনি থাকতে পারবেন না। লোভ হবে সব কিছু কিনতে। ইচ্ছা করলে গান শুনতে পারেন। ক্লাসিকাল ও আধুনিক গান। ছবি দেখতে পাবেন।

সেকালের ও একালের। শিক্ষার ও বিনোদনের অকৃপণ ব্যবস্থা। কিনলুম উপহার সামগ্রী, বেশীর ভাগই পুতুল। তার পর চাতানী আমাকে এগিয়ে দিলেন। স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটা গেল কলের ভিতর মুদ্রা ফেলে। ট্রেনে উঠলুম আমি, বিদায় দিলেন তিনি। কেনা জিনিস বাড়ি পাঠানোর ভার নিল স্টোর।

ঘুরে ফিরে শিন্‌জুকু স্টেশন। স্টেশন থেকে বেরোতেই নাকামুরায়া রেস্টোরান্ট। সেই যার মালিক ছিলেন রাসবিহারী বসুর শ্বশুর। এই পরিবার যেমন ধনী তেমনি বদান্য। এঁদের টাকায় একটি কলেজ চলে শুনেছি। যত দূর জানি রাসবিহারী বসুর কন্যাই এখন রেস্টোরান্ট চালান। চলে ভালো। লিফ্‌টে চড়ে উপরের তলায় গিয়ে দেখি আমার জন্যে একটি কক্ষে অপেক্ষা করছেন হিরোশি নোমা প্রভৃতি অত্যাধুনিক লেখক আর আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন ওকাকুরা-সান। পরে তিনি ও তাঁর পত্নী যোগদান করলেন। আহার পরিপাটী হলো।

হিরোশি নোমা একখানি উপন্যাস থেকেই যা কিছু মানুষের কাম্য সব কিছু পেয়েছেন। প্রভূত যশ, প্রচুর বিত্ত, রাজধানীতে বাড়ি, সুন্দরী ভার্যা। বইখানির ইংরেজী অনুবাদ হয়েছে। 'Zone of Emptiness.' জাপানীতে 'শিন্‌কু চিতাই।' শূন্য তেপান্তর। নোমা আমাকে মূলগ্রন্থটি উপহার দিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁকে ধরে নিয়ে সৈনিক করেছিল। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে ঔপন্যাসিক করে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও কদর্য অভিজ্ঞতা। এর পর তিনি হন কমিউনিস্ট ও শান্তিবাদী। তা বলে তাঁর উপন্যাসটি কমিউনিস্ট উপন্যাস নয়।

যুদ্ধোত্তর জাপানী কথাসাহিত্য প্রধানত যুদ্ধঘটিত, যুদ্ধোত্তর বিপর্যয়ঘটিত। আমাদের দেশে যেমন একদা প্রবাদ ছিল কানু বিনা গান নেই, তেমনি জাপানেও যুদ্ধের আগে পর্যন্ত প্রথা ছিল গেইশা বিনা গল্প নেই। এখন সে জমানা গেছে। সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও রণতন্ত্রের উপর নতুন জেনারেশনের অধিকাংশ লেখক বিরূপ। গেইশা তো সেই একই জীবনপরিকল্পনার অঙ্গ। সাহিত্য ক্রমে গেইশার কবল থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কোনো রকম মোহ নয়, নিদারুণ বাস্তব নিয়ে একালের সাহিত্যিকদের কাজ। নোমার চেয়ে আরো নাম করেছেন শোহেই ওওকা। পরাজিত ও ভগ্নমনোবল সৈনিকরা ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের মাংস খেতে বাধ্য হয়। ওওকা তাই শুনে 'নোবি' লেখেন। তামুরা বলে এক পরিত্যক্ত সৈনিক ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে আর চোখে আগুন দেখছে।

নোমা-সান বললেন, 'আমি কিন্তু I-novel লিখিনে।'

এর মানে কী হলো আন্দাজ করতে আমার বেশ কিছু সময় লাগল। মানে, জাপানী ঔপন্যাসিকরা সাধারণত গল্প বলান 'আমি' বলে একজনকে দিয়ে। গল্পটা বলছে কে? না 'আমি।' নোমা এই রীতি বর্জন করেছেন। এটাও কি যুদ্ধোত্তর পরিবর্তন? জানিনে।

সেদিন নোমা-সানকে নিয়ে আমি একটু তামাশা করলুম। বললুম, 'অত টাকা নিয়ে আপনি করলেন কী না বাড়ি তৈরি! বুর্জোয়ারা যা করে!'

তিনি বললেন তিনি কিছু দানখয়রাতও করেছেন। তার পর আমাকে চমকে দিলেন এই বলে যে, 'আমাদের দেশের গবর্নমেণ্ট তো নেহরু গবর্নমেণ্টের মতো ভালো গবর্নমেণ্ট নয় যে বাড়ি বানিয়ে দেবে।'

নেহরু সম্বন্ধে জাপানীদের ধারণা প্রায় হিমালয়ের মতো উচ্চ। আমার চলে আসার ঠিক পরে তিনি জাপান পরিক্রমায় যান। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর জাপান থেকে এক বন্ধু লিখলেন যে, ও-দেশের জনগণ নেহরুকে যেমন সম্বর্ধনা করেছে তেমনটি কোনো কালে কোনো বিদেশীকে করেনি। এত শ্রদ্ধা, এত ভালোবাসা আর কোনো আগন্তুক পাননি।

সেদিনকার পার্টিতে আরো কয়েক জন লেখক ছিলেন। তাঁদের অনুরোধে আমার নিজের সাহিত্যিক আদর্শ নিয়ে দু'কথা বলি। চিরকাল আমার বিশ্বাস ছিল সত্য বলতেই হবে, সুন্দর করে বলতেই হবে। কিন্তু কিছুকাল থেকে আমার ধারণা এই যথেষ্ট নয়। অন্তঃসৌন্দর্য থাকা চাই। প্রথমে করতে হবে অন্তঃসৌন্দর্যের উপলব্ধি, তার পরে তার প্রকাশ। শুধুমাত্র অন্তঃসৌন্দর্য নয়। সার সৌন্দর্য। এসেনশিয়াল বিউটি।

গরম জলে-ভেজা তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মোছা আহারে বসার আগে একবার হয়েছিল, আহারান্তে আবার হলো। গল্প করতে করতে আমরা সময় অতিক্রম করেছিলুম। ওকাকুরা গৃহিনী উঠলেন, উঠে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটি উপহার, রায়গৃহিণীর জন্যে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর স্বামী আর আমি চললুম অধ্যাপক তোমোজি আবের বাড়ি। বাড়ির নম্বর যদি দেওয়া থাকে ১৩৬৭ আর রাস্তা সম্বন্ধে যদি বলা হয়ে থাকে সেতাগায়া ২-ভাগ তা হলে খুঁজে পেতে বেশ একটু কষ্ট হয় বইকি। ট্যাক্‌সিওয়ালার মজা!

ওদিকে আবে মহাশয় আমাদের জন্যে পথ চেয়ে বসে আছেন। তাঁর ওখান থেকে যেতে হবে সোভিয়েট দূতাবাসে, সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে কতটুকুই বা কথা হতে পারে! তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হলো ইনটেলেকচুয়াল বা মননশীল। একদা তিনি নিউ আর্ট গোষ্ঠীর ধনুর্ধর ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধজনিত মানসিক যাতনার কথা লেখেন। যুদ্ধের পরে ছাত্রদের মনের অবস্থার কথা। বিবেকবান ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে তিনি সামাজিক বিষয় নিয়েও মন্তব্য করেন। পেন কংগ্রেসে জাপানের প্রতিনিধি হয়ে এডিনবরা যান, ইউরোপ ঘুরে আসেন। দিল্লীতে যে এশিয় লেখক সম্মেলন হলো তাতে জাপানের প্রতিনিধিরূপে তিনিই পাঠিয়েছিলেন য়োশিয়ে হোত্তাকে। সেদিন যে হাইড্রোজেন বোমাবিরোধী কনফারেন্স বসল জাপানে, তার জন্যে তাঁকেও খাটতে হয়েছে। মনে হলো তিনি ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন আর্টের রাজ্য থেকে কল্যাণের রাজ্যে। তাঁর বিবেক তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তৎকালীন একখানি 'নিউ স্টেটসম্যান।' একটি প্রবন্ধ ছিল পড়তে বললেন। ভাস্কো ডা গামা যখন সমুদ্রপথে ভারত আবিষ্কার করেন তখন ভারতের জাহাজ আফ্রিকার বন্দরে বন্দরে। ভারতীয় লস্করই তাঁকে পথ দেখিয়ে ভারতে নিয়ে আসে। খাল কেটে কুমীর ডাকার পরিণাম গোয়া দখল। সে যাই হোক, আবিষ্কারক মহাশয় কিছুই আবিষ্কার করেননি; সমুদ্রের পথঘাট ভারতীয়রাই তাঁর চেয়ে ভালো জানত। আর আফ্রিকাও অসভ্য মানুষের দেশ ছিল না। ছিল বন্দরে বন্দরে আকীর্ণ।

আবে গৃহিণী চা নিয়ে এলেন। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে। আধুনিক জাপানী গৃহস্থের সংসারে দু'রকম আয়োজন থাকে। যাঁরা চেয়ার না হলে বসবেন না তাঁদের জন্যে চেয়ার, টিপয় ইত্যাদি। যাঁরা মাদুরে বসা পছন্দ করেন তাঁদের জন্যে জলচৌকির মতো উঁচু চতুষ্পদ। যাঁরা ছুরি কাঁটা চীনামাটির প্লেট না হলে খাবেন না তাঁদের জন্যে তাই। আবার যাঁরা ল্যাকারের বাসন ও চপ স্টিক ভালোবাসেন তাঁদের জন্যে সে রকম। একবার ইউরোপীয় পোশাক মেনে নিলে আর সব একে একে আসে। তা বলে নিজেদের চিরাচরিত অশনবসন কেউ ছাড়তে পারে না। সে সবও থাকে। জাপানের দোটানা কেটে গেছে। সে এখন দুই সভ্যতাকেই জাতীয় জীবনের দুই অঙ্গ করে নিয়েছে। সদর ও অন্দর।

কিন্তু সহ-অবস্থান আর সামঞ্জস্য তো একই জিনিস নয়। সদরের সঙ্গে অন্দরের খুব যে একটা সামঞ্জস্য হয়েছে তা তো মনে হয় না। তার পর আধুনিকতাকে নিয়ে আমাদের যে সমস্যা জাপানেরও সেই সমস্যা। মধ্যযুগে ফিরে যেতে চাইনে, তার মানে কি এই হলো যে নীতি চাইনে, ধর্ম চাইনে? নীতি চাই, ধর্ম চাই, তার মানে কি এই হলো যে মধ্যযুগে দাঁড়িয়ে থাকতে চাই?

আসল কথা মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের যেমন অতিবৃদ্ধি ঘটেছে তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে নীতির বা ধর্মের সেই অনুপাতে বিকাশ বা বিবর্তন হয়নি। আধুনিক যুগের নীতিনিপুণরা তথা ধর্মাত্মারা মধ্যযুগেই রয়ে গেছেন, যে দু'চারজন যুগের সঙ্গে পদযাত্রা করছেন তাঁরা তাঁদের যুগটাকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। একে বর্জন করতে পারলেই তাঁদের কাজ সোজা হতো। তা যখন সম্ভব নয় তখন সে ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। সহ-অবস্থান। সামঞ্জস্য নয়।

অধ্যাপক আবে আমার পেন কংগ্রেসের বক্তৃতা পড়েছিলেন। বললেন, 'মর্মস্পর্শী হয়েছে। মোটের উপর আমাদের বেলাও প্রযোজ্য।'

আমরা যে সাম্প্রদায়িক হিংসাবাদীদের দমন করতে গিয়ে অহিংসায় অটল থাকতে পারিনি আমার এ কথা তাঁর স্মরণ ছিল। 'জানেন, আমাদের এখানেও শোভিনিস্টরা সক্রিয়।'

যথাকালে লিখতে ভুলে গেছি যে ফ্রেণ্ডস্ সেণ্টারে কে একজন ভদ্রলোক কি ভদ্রমহিলা আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা তো ভারতের দিকে চেয়ে বসে আছি। নেতৃত্বের জন্যে।' আমি উত্তর দিয়েছিলুম, 'অমন করে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবেন না। আমরা বিনম্র হতে চাই। আমাদের গৃহবিবাদেরই অন্ত হয়নি। হিংসার আশ্রয় না নিয়ে আত্মরক্ষা করতে কি পারব! আমরা আপনাদের অত বড় প্রত্যাশার যোগ্য নই।'

আমার প্রত্যাবর্তনের পর জবাহরলাল যে জাপানের বুকের উপর প্রীতির এক টাইফুন বইয়ে দিয়ে এলেন, উদ্বেল হলো তার বক্ষ, এর রহস্য কী? ভারতের কাছে নেতৃত্বের প্রত্যাশা। মানবজাতি যাতে রক্ষা পায়। যার যার গোষ্ঠীগত আত্মরক্ষা নয়, সমষ্টিগত আত্মরক্ষা।

সেদিন অধ্যাপক আবের সঙ্গে আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ছুটতে হলো রুশ দূতাবাসে। ককটেল পার্টি শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। সময়মতো না পৌঁছলে ঝা দম্পতি হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না, তখন আমাকে খান্না দম্পতির বাড়ি খানা খেতে নিয়ে যায় কে? রাস্তাঘাট ফোন নম্বর জানিনে! রুশ দূতাবাসে দেখি লেপেশিনস্কায়া হল-ঘরে দাঁড়িয়েছেন। কল্পতরুর মতো। তাঁর চার দিকে অটোগ্রাফপ্রার্থীদের ব্যূহ। রোজানভ আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। কী আফসোস! তিখোমিরনোভাদের অটোগ্রাফ যাতে ছিল সেই খাতাখানা সঙ্গে নেই। নোটবুকটা তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, 'মাদাম, আমার কন্যাদ্বয়ের জন্যে অটোগ্রাফ।' মাদাম ফস্‌ফস্ করে ইংরেজীতে দু'ছত্র লিখে সই করলেন দু'বার। বললেন, 'এক মেয়ের জন্যে ইংরেজীতে, আরেকটির জন্যে রুশভাষায়।' ক্ষিপ্র, কর্মঠ, প্র্যাকটিকাল প্রকৃতির মহিলা। কে বলবে যে ইনিই সেই ব্যালেরিনা! বরং প্রেওব্রাজেনস্কিকে দেখে মনে হয় আপনভোলা উদাসী আর্টিস্ট।

লেপেশিনস্কায়ার সঙ্গে পরে আবার কথাবার্তা হবে ভাবিনি। দূতাবাসের মিসেস মালিক বললেন, 'আমাকেও আলাপ করিয়ে দিন না।' মাদাম পাশের ঘরে বসে অন্য একজনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ফাঁক পাওয়া গেল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আসুক ঝড়, আসুক বৃষ্টি, আসুক বরফ, নাচের আমার কোনো দিন খেলাপ হবে না। এ-বেলা তিন ঘণ্টা ও-বেলা তিন ঘণ্টা প্রতিদিন আমি নাচবই। এ গেল আমার দৈনিক অভ্যাস। এ ছাড়া মঞ্চের নাচ। না, জাপানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।'

কী অদম্য সংকল্প, অচল নিষ্ঠা! এ না হলে সাধনা! নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লজ্জা পেলুম। আমার তো খেলাপটাই অভ্যাস, অভ্যাসটাই ব্যতিক্রম। মনে মনে বললুম, আসুক ঝড়, আসুক বৃষ্টি, আসুক পশ্চিমে হাওয়া, লেখার আমার খেলাপ হবে না, রোজ ছ'ঘণ্টা আমি লিখবই। এটা যেন লেপেশিনস্কায়ার বাণী। আমার উদ্দেশ্যে দেওয়া।

মাদামকে বললুম, 'সেদিন আমাদের রাষ্ট্রদূতের মধ্যাহ্নভোজনে আপনি এলেন না। নিরাশ

হলুম। আমার যে দেখতে ইচ্ছা ছিল আপনি কী কী খান, কত খান।'

'ওঃ! নাচতে নাচতে এক একদিন রাক্ষসের মতো খিদে পায়। কিন্তু খেলে কি রক্ষা আছে! অকেজো হয়ে পড়ব যে!' তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

এর পর হল-ঘরে ফিরে গিয়ে চন্দ্রশেখর ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে দেখা। তাঁরাও চাইলেন মাদামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। ইতিমধ্যে লেপেশিন্স্কায়া কী মহার্ঘ পুষ্পগুচ্ছ উপহার পাঠিয়েছিলেন রাষ্ট্রদূত ভবনে! ধন্যবাদ দিলেন ঝা দম্পতি। তখন কথাপ্রসঙ্গে মাদাম বললেন, 'আঃ। কী নাম ওঁর! রাজ। রাজ কাপুর। আমার বন্ধু। আর ওই যে ফিল্ম! 'আওয়ারা'। আহা! কী চমৎকার ওই ফিল্ম!' ভদ্রমহিলার পুলক ও উচ্ছ্বাস আন্তরিক।

মনে মনে বললুম, মাদাম, আপনার কাছে আমি আমার হৃদয়টি হারিয়েছিলুম। কিন্তু আপনার রুচি দেখে আমার হৃদয় আমি ফিরিয়ে নিলুম।

কান্না চেপে তার পর যাই খান্নাদের সঙ্গে খানা খেতে। সেখানে এক কানাডার লোকের সঙ্গে আলাপ। তিনি বললেন, 'ফুজি পর্বত আমি শতবার দর্শন করেছি। প্রতিবারেই নূতন। আছে ওর কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি।' কথাটা আমার মনে গাঁথা হয়ে গেল।

চমকে দিলেন আমাকে এক জাপানী অফিসার। সুভাষচন্দ্র যেদিন সায়গন থেকে শেষ যাত্রা করেন তখন তাঁকে প্লেনে তুলে দেবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন ইনি। নেতাজী বলে যান তিনি জাপান থেকে চলে যাবেন সোভিয়েট রাশিয়ায়।

॥ তেইশ ॥

যাত্রার সময় আমার বড় মেয়ে আমাকে বিশেষ করে বলেছিল ফুজি পর্বত দেখে আসতে। একবার আকাশ থেকে ও একবার তোকিয়োর দূতাবাস থেকে দৃষ্টিপাত করে ফুজি দর্শন আমার দৈবাৎ ঘটেছিল। তাই ফুজি দেখে আসার জন্যে দিন ফেলিনি। যার সময় স্বল্প ও অর্থ ততোধিক অল্প তার পক্ষে দেশময় অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ঘুরে বেড়ানো সুযুক্তি নয়। আমি স্থির করে রেখেছিলুম তোকিয়োতেই শেষের দিনগুলি কাটাব ও মানুষের সঙ্গে মিশব। দেশ দেখার চেয়ে মানুষ দেখা আমার কাছে আরো লোভনীয়।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওবারা বলে পাঠালেন যে আমার জাপান প্রবাসের শেষ রজনীটিকে চিরস্মরণীয় করতে তিনি আমার জন্যে হাকোনে হোটেলে রাত্রিবাসের আয়োজন করেছেন। আমার সহযাত্রী হবেন ইনাজু। সহযাত্রীর কাছে শুনলুম ওবারা স্বয়ং হাকোনে গিয়ে হোটেলের ঘর পছন্দ করে এসেছেন, কথাও দিয়ে ফেলেছেন। মুশকিলে পড়লুম। 'না' বলি কী করে? তা শুনে চাতানী বললেন, কোথাও যদি যেতেই হয় তবে হাকোনের বদলে নিক্কো। চন্দ্রশেখরও বললেন, নিক্কো না দেখলে খেদ থেকে যাবে। কথায় বলে, 'না হেরিয়া নিক্কো কহিও না কেক্কো।' জাপানী ভাষায় কেক্কো মানে সুন্দর।

তখন শেষ মুহূর্তে আমাকে ভাবতে হলো, কাঞ্চনজঙ্ঘা না তাজমহল? কোন্‌টা দেখব, কোন্‌টা ছাড়ব? নিক্কোতে রাত্রিবাস করলে তোকিয়ো ফিরে এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসে জিনিসপত্র জমা দেওয়া হয় না। সেদিন শনিবার, একটা পর্যন্ত আপিস। তা ছাড়া জমা দেওয়ার আগে

গোছগাছ করাও হয় না উপহার জমতে জমতে স্তূপাকার। বেশীর ভাগই বইকাগজ।

বৃহস্পতিবার সকালবেলাটা গোছগাছ করতে বসলুম। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে বুঝতে পারলুম আমার সাধ্য নয়। ওজন বেশী, পরিমাণ বেশী, আয়তন বড়। কোনো মতেই দুটো ব্যাগে ও একটা সুটকেসে আঁটে না। ছাতাটা ছড়িটার মতো আলতো নিয়ে যাওয়া সম্বন্ধেও কড়া নিয়ম। কেতাবগুলো জাহাজে করে পাঠাতেই হবে। ইতিমধ্যে পুষ্পদাসের পরামর্শ চাইতে গেছলুম। তিনি বললেন, সে কি সোজা ব্যাপার! তার চেয়ে এক কাজ করুন। ধর যাচ্ছেন জলপথে। তাঁকে ধরুন। তিনি হয়তো রাজী হবেন সঙ্গে নিতে। টেলিফোনে ধরকে ধরা গেল না। দূতাবাস থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময় দেখি এক বাঙালী ভদ্রলোক ঢুকছেন। কে? না সচ্চিদানন্দ ধর। রাজী? আনন্দের সঙ্গে রাজী। এই অপরিচিত বান্ধব আমাকে বাঁচালেন।

তবু গোছগাছ করা আমার দ্বারা হলো না। বার বার প্যাক করি, আনপ্যাক করি। যাতে ভাণ্ডের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডকে পোরা যায়। বৃথা চেষ্টা। আরো কিছু কেনাকাটা বাকী ছিল। হোকুসাইর আঁকা ফুজি পর্বতের দৃশ্য। উড ব্লক প্রিন্ট। Sublime-এর পর ridiculous. আমার ছোট মেয়ে চেয়েছে মাথায় মাখবার তেল, যা দিয়ে জাপানী মেয়েরা খোঁপা বাঁধে। মিসেস বাবার কাছে শুনেছে, কিন্তু নাম মনে রাখেনি। মিৎসুকোশির বিকিকিনি যাদের হাতে সেই তরুণীদের নিজে সুধাতে পারিনে, কারণ জাপানী জানিনে। চাতানীকে বলেছিলুম। তিনি খবর রাখেন না, খবর নিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন। ওকাকুরা আমার সহায় হলেন। তরুণীরা এনে দিল এক রকম তেল। বলল ওই তেল ওরা নিজেরাও মাথায় মাখে।

কিন্তু ওদের সকলের বব করা চুল। খোঁপা থাকলে তো খোঁপা বাধবে। ইতিমধ্যে আমি আবিষ্কার করেছিলুম যে খোঁপা জিনিসটা একালের মেয়েরা বাঁধে না। এমন কি গেইশা মেয়েরাও না। তৈরি খোঁপা কিনতে পাওয়া যায়। নানান ছাঁদের। খুশিমতো কিনে নিয়ে মাথায় বসিয়ে দিলেই হলো। মাথা জোড়া খোঁপা হচ্ছে এমন এক বিলাসিতা যার জন্যে দিনে তিন ঘণ্টা খরচ করতে বিলাসিনীরাও নারাজ। যারা খেটে খায় তারা অত সময় পাবে কোথায়! নারীর কেশ ইউরোপের মতো খাটো হয়েছে। কেশতৈল হয়েছে সেই কেশের জন্যে প্রস্তুত। কবরীর জন্যে নয়। নিরাশ হলুম। কাঁকই কিনতে ভুলে গেলুম। মেয়ে চেয়েছিল কাঁকই। উর্ধ্ব খোঁপার থাকে থাকে কাঁকই গোঁজা থাকে মাথার উপর টানা চুলকে খাড়া রাখতে। কাঠের কাঁকই।

নারীদের মাথা থেকে বোঝা নেমে গেছে। তারা হালকা বোধ করছে। স্বদেশীর তুলনায় পাশ্চাত্য পোশাকও লঘুভার। সৌন্দর্যের দিক থেকে হয়তো কিছু কমতি পড়ল, কিন্তু সৌষ্ঠবের দিক থেকে কিছুমাত্র না। ক'জন মনে রেখেছেন যে ভারতবর্ষের পুরুষরাও নারীদের মতো লম্বা চুল রাখত, খোঁপা বাঁধত, চূড়া বাঁধত। চীনের পুরুষরা তো বেণী বাঁধত। এখনো দক্ষিণ ভারতে তার রেশ আছে। পাশ্চাত্য পদ্ধতি যদি পুরুষদের শিরোধার্য হয়ে থাকে তবে নারীদের হওয়া বিচিত্র নয়। একদিন ভারতেও দেখা যাবে আমাদের নারীরাও তাতেই খুশি। সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি খোঁপাও বাজারে বিকোবে। তবে আমরা তা দেখে খুশি হব না। ওঃ কত বড় শক পেলুম যখন শুনলুম যে সুন্দরীদের কবরী দোকানের পণ্য! কালে কালে কত শুনব! ঘোর কলি!

বিকেলে আমার বক্তৃতা ছিল ফ্রেণ্ডস সেণ্টারে। যে প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে বক্তৃতা তার নাম ফেলোশিপ অফ রিকন্‌সিলিয়েশন। এঁদের কাজ জাতিতে জাতিতে মৈত্রী পুনঃস্থাপন। কর্মসচিব পল সেকিয়া জাপানী কোয়েকার। বাইরে মুশলধারে বর্ষণ, ভিতরে মুষ্টিমেয় শ্রোতা। সেকিয়া বলবেন, 'কী আফসোস!' আমি বললুম, 'একটি মানুষ না এলেও আমি বক্তৃতা দিতুম। এক মার্কিন প্রচারক যা করেছিলেন। নেপথ্যে ছিল একটি লোক। তার জীবন বদলে গেল। 'আমি বর্ণনা করলুম

গান্ধীজীর গত মহাযুদ্ধকালীন নীতি ও নীতি অনুযায়ী কার্যকলাপ। প্রথমত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে। দ্বিতীয়ত এবং প্রধানত মানবপ্রেমিক সত্যাগ্রহী হিসাবে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর আগে কেউ যুদ্ধের মাঝখানে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেননি, যুদ্ধরত সরকারকে রাজত্যাগ করতে বা রাজত্বত্যাগ করতে বলেননি। প্রতিপক্ষ তাঁকে বদনাম দিয়েছে এই বলে যে তিনি তাঁদের শত্রুপক্ষের সমর্থক ও সহায়ক, একালের বিভীষণ। তাঁকে হিংসার জন্যেও দায়ী করেছে। কোনো দেশের সরকার যদি দেশের লোকের অমতে যুদ্ধে লিপ্ত হয় ও তার ফলে দেশের উপর আক্রমণ আসন্ন হয় তা হলে লোকনেতার কর্তব্য সরকারকে লোকমতে সম্মুখীন হতে বাধ্য করা। আর সত্যাগ্রহীর কর্তব্য দুই যুধ্যমান শিবিরের মধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে উভয়কে শান্ত করা, অথবা উভয়ের পেষণে গুঁড়িয়ে যাওয়া। গান্ধীজী যদি ১৯৪২ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটাতে পারতেন তা হলে তাঁর চেষ্টা হতো জাপানের সঙ্গে আমেরিকার ও জার্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের তথা রাশিয়ার সম্মানজনক সন্ধিসূত্র আবিষ্কার। তা হলে পরমাণু বোমা পড়ত না। মারণাস্ত্রের নব নব উদ্‌ভাবন রহিত হতো। গান্ধীজী ক্ষমতার জন্যে ক্ষমতা চাননি। নিজের জন্যেও না।

ওদিকে গাড়ি এসে অপেক্ষা করছিল। পাঠিয়েছিলেন এশিয়া ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি প্রাচ্যবিদ্যার্ণব রবার্ট বি. হল। তাঁর ওখানে নৈশ ভোজন। হল দম্পতি দীর্ঘকাল জাপানে আছেন। বাড়িতে জাপানী প্রভাব। খানা টেবিলেও। আমেরিকার ঐতিহ্যের যা শ্রেষ্ঠ তার পরিচয় এঁদের চেহারায়, এঁদের কথাবার্তায়, এঁদের আচরণে, এঁদের বিশ্বাসে! সফল, ধনী, সামরিক, অহঙ্কারী আমেরিকার মেজাজ আমাদের চেনা। আরেক আমেরিকা আছে। তাকে না চিনলে সে দেশের মহত্ত্ব পরিমাপ করা যায় না। ছেলেবেলা থেকে আমি এই আরেক আমেরিকার কথা পড়ে এসেছি। এর অস্তিত্ব তো আমার নিজের ঘরেই। অনায়াসেই হল দম্পতি আমাকে আপনার করে নিলেন। যদিও শেরোয়ানী পরে গেছি! হলের সঙ্গে এই তৃতীয় বার দেখা। দ্বিতীয় বার তো তিনি আমাকে চমকে দিয়েছিলেন এই প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, ভারতবর্ষেও কি আত্মহত্যার হার জাপানের মতো? না জাপানের চেয়ে কম?' আত্মহত্যা জাপানীদের কাছে ছেলেখেলা। করে বেশীর ভাগ ষোলো থেকে বিশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা। আর ষাট সত্তর বছর বয়সী বুড়োবুড়ীরা। আত্মহত্যায় পাপবোধ নেই, ধর্মভয় নেই।

নৈশ ভোজনের আলাপী অধ্যাপক উইলিয়ামস বললেন, 'নিক্কো দেখে মুগ্ধ হইনি। তা ছাড়া অনবরত বৃষ্টি। আপনি যদি না দেখেন এমন কিছু হারাবেন না। কিন্তু ফুজি না দেখলে হারাবেন।' এ কথা শোনার পর আমি মনঃস্থির করলুম যে তোকিয়োর বাইরেই যদি শেষ রাতটি কাটাতে হয় তো ওবারার প্রস্তাবই গ্রাহ্য।

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা বৃষ্টির আড়ম্বর দেখে মনে হলো ফুজি দর্শনও অসম্ভবপর। শুনলুম আবার টাইফুন আসছে। বিমান চলাচল স্থগিত। ঝা দম্পতিও পরামর্শ দিলেন কোথাও না বেরোতে। টেলিফোনে ওবারাকে পেলুম না, ওকাকুরাকে অনুরোধ করলুম হাকোনে যাত্রা যাতে বন্ধ হয় তার উপায় করতে।

চন্দ্রশেখর আমাকে বার বার বলেছিলেন জাপান থেকে একটা ক্যামেরা কিনে আনতে। জাপানী ক্যামেরা এখন দুনিয়ার সেরা ক্যামেরাগুলির মধ্যে গণ্য। আমার ও শখ নেই, ভাবলুম ছোট ছেলের জন্য কেনাই যাক ছোট দেখে একটা। কিন্তু কেনবার সময় কী কী দেখে কিনতে হয় তা তো জানিনে। সঙ্গে যদি বাৎস্যায়ন থাকতেন! বাৎস্যায়নের কথা চিন্তা করতে করতে দূতাবাসে গেলুম। জর্জের ঘরে ঢুকে দেখি জর্জ টেলিফোন ধরে আছেন। কে যেন তাঁকে কী যেন বললেন আর তিনি তার উত্তর দিলেন, 'মিস্টার রায়? তিনি এইখানেই উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন?

আচ্ছা, দিচ্ছি।'

কে? না বাৎস্যায়ন! অবাক কাণ্ড! তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আসতে বললুম। তিনি আসতেই দু'জনে মিলে ক্যামেরা কিনতে যাওয়া গেল। তাঁরই পছন্দ অনুসারে কেনা গেল। তার পর আমরা একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করতে মারুনৌচির এক রেস্টোরাণ্টে প্রবেশ করলুম। জাপানের রেস্টোরাণ্টের একটি উত্তম প্রথা যেদিনকার যা মেনু তা বাইরে কাঁচের শো কেসে বস্তুগতভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। কাগজে কী ছাপা আছে তা আপনাকে পড়তে হবে না, পড়ে হয়ত বুঝতে পারবেন না, বোঝাতে পারবেন না। আপনি যে সুপটি, যে মাছটি, যে মাংসটি, যে পুডিংটি, শো কেসে দেখে মুগ্ধ হলেন সেটি ওয়েট্রেসকে ডেকে দেখিয়ে দিলেই সেই রকমটি আপনার টেবিলে এসে হাজির হবে। শো কেশে জিনিসের নিচে দামও লেখা থাকে। কত খরচ হবে তার হিসাব জেনে নিয়েই খেতে বসবেন। বকসিস? বকসিস শতকরা দশ ইয়েন। কিন্তু বিলের সঙ্গে যদি বকসিস আদায় করে না নেয় তা হলে গায়ে পড়ে কেউ বকসিস দেয় না। সাধারণ রেস্টোরাণ্টে চায়ও না।

এর পর বাৎস্যায়ন চলে গেলেন নিজের কাজে। আর আমি তোকিয়ো স্টেশনে গিয়ে টিকিট কলে ইয়েন মুদ্রা ফেলে শিন্‌জুকুর টিকিট পেলুম। আমার উদ্দেশ্য শিন্‌জুকু স্টেশনে ইনাজুর সঙ্গে মিলিত হয়ে বলা যে আজ আমার হাকোনে যাওয়া হলো না, আমার জন্যে হোটেলে যে ঘর সংরক্ষণ করা হয়েছে সেটি খারিজ করা যাক।

ইনাজু মহাশয়ের সঙ্গে যখন দেখা হলো তিনি বললেন, 'অসম্ভব। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, তাতে আপনার ও আমার সীট রিজার্ভ করা হয়েছে, টিকিট কাটা হয়েছে ওদাওয়ারা পর্যন্ত। তিন মিনিটের মধ্যেই ছাড়বে। আসুন, ওঠা যাক।'

সর্বনাশ! আমার সঙ্গে না আছে রাতের পায়জামা, না আছে দাড়ি কামানোর ক্ষুর। একবস্ত্রে কেউ কখনো শহরের বাইরে রাত কাটাতে যায়? তা ছাড়া ঝা-দের তো বলে আসা হয়নি যে আমি হাকোনে যাচ্ছি। ইনাজু-সানের দিকে একবার তাকালুম। তিনি নাছোড়বান্দা। 'সব কিছু ওখানে পাবেন। চলুন, এখুনি ছেড়ে দেবে।'

যে-আমি এসেছিলুম টেলিফোনে খবর দিতে না পেরে সাক্ষাতে খবর দিতে যে, হাকোনে যাওয়া আমার হবে না, সেই আমি প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা টেলিফোন দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে খবর দিলুম যে, হাকোনে যাচ্ছি, সে রাত্রে ফিরব না, ঝা দম্পতি যেন অপেক্ষা না করেন। তার পর ছুটতে ছুটতে লাফ দিয়ে ট্রেনে ওঠা। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের গতিবেগ অনুভব করা।

করিডোর ট্রেন। ঝকঝকে নতুন। এই লাইনটিকে বলে ওদাকিয়ু লাইন। আমাদের যেমন কর্ড লাইন। সোজা চলে গেছে ওদাওয়ারা। সাগর অভিমুখে। দক্ষিণ দিকে। তার পর মোড় ঘুরে পশ্চিমে। হ্রদ অভিমুখে। পার্বত্য অঞ্চলে। ওদাওয়ারায় নেমে আমরা বাস ধরলুম। বাস চলল পাহাড়ে রাস্তায় অরণ্যের ভিতর দিয়ে। ওর নাম জাপানের ন্যাশনাল পার্ক। জনতা যায় ছুটির দিন চড়াই বেয়ে চড়াইভাতি করতে। সেইজন্যে এক মাইল আধ মাইল অন্তর অন্তর হোটেল সরাই দোকানপাট। স্থানে স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ। স্নানের সুযোগ। ইনাজু একখানা মানচিত্র দেখতে দিলেন। ছবি আঁকা মানচিত্র। তার এক জায়গায় লেখা ছিল 'প্রমো[illegible]া'। জাপানীরা যে পাশ্চাত্য নয় এই তার প্রমাণ, হলে অবস্থানটা উহ্য রাখত। না, আধুনিকও নয়। এটা প্রাচীন মানসিকতার লক্ষণ।

জাপানের বাস জাপানের রেলগাড়ির মতো কাঁটায় কাঁটায় চলে না। বৃষ্টিও পড়ছিল। তাই সেদিন আমাদের হ্রদের জলে স্টীমার বিহার হলো না। ওবারার আইডিয়া। কথা ছিল স্টীমার ধরে

আমরা হোটেলের ঘাটে উঠব। সবটা পথ বাসে করে যাব না। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে আমরা স্থলপথেই হোটেল পর্যন্ত গেলুম। হাকোনে হোটেল। আশিনোকো হ্রদের তটে অবস্থান। ঘরের জানালা খুললেই হ্রদের জল। মনে হয় জাহাজে বসেছি।

ইনাজু সানকে বলেছিলুম, আমি উষ্ণ প্রস্রবণের জলে স্নান করতে চাই। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হোটেলেই স্নানের ঘরে গিয়ে সে জল পাবেন। গিয়ে দেখি চৌবাচ্চায় গরম জল, কিন্তু সে যে উষ্ণ প্রস্রবণের তা কেমন করে জানব? জলে একটু হলদের আমেজ ছিল। উত্তাপটাও অতিরিক্ত। গা মেলে দিয়ে কয়েক মিনিট পরে গা তুলতে হলো। শোবার ঘরে যখন ফিরে আসি তখন আমি সিদ্ধপুরুষ। তপ্ত শরীরকে শীতল করতে সময় লাগল। ইতিমধ্যে রাতের খাওয়া চুকিয়ে দিয়েছিলুম। পাশ্চাত্য পদ্ধতির উপাদেয় ডিনার। এর পর এক রাশ চিঠির কাগজ ও এক বোতল কালি নিয়ে বসলুম—চিঠি লিখতে নয়, 'আসাহি শিম্‌বুন'-এর জন্য প্রবন্ধ লিখতে। ভারত জাপান সংস্কৃতি বিনিময় প্রসঙ্গে। প্রসঙ্গত জবাহরলাল সম্বন্ধে।

নিঃশব্দ নিশীথ। লিখতে লিখতে ক্লান্ত হই। উঠি। জানালার ধারে যাই। খুলি। বাইরে তাকাই। আকাশে কালো মেঘ। হ্রদের জল কালির মতো কালো। দূরে একটি স্টীমার আশ্রয় নিয়েছে। কালো কেশে শাদা এক গুছি চন্দ্রমল্লিকা।

জাপানে এই আমার শেষ রাত্রি। এ কি শিবরাত্রি হবে? লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় দাঁড়ি টানলুম। তার পর শুভ্র কোমল শয্যায় আপনাকে বিছিয়ে দিলুম। তার আগে একবার জানালা খুলে দেখে নিলুম কোথায় আছি। আছি দিগন্তবিসারী হ্রদের ধারে।

ভোর হলো। কে একজন আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল দরজায় টোকা মেরে। ছ'টার বাস ধরতে হবে। ট্রেন সওয়া সাতটায়। ইতিমধ্যে সেরে নিতে হবে প্রাতঃকৃত্য। মেড এসে কামাবার সরঞ্জাম দিয়ে গেল। তার পর এলো চা। ইনাজু আর আমি শেষ দিনের প্রথম পান একসঙ্গে করলুম। জাপানে আজ আমার শেষ দিন।

সবই হলো, কিন্তু যে জন্যে হাকোনে আসা তাই হলো না। ফুজি দর্শন। এদিক খুঁজি, ওদিক খুঁজি। কোথায় ফুজি? বৃষ্টি নেই, কিন্তু কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। পর্বতের নীল মুছে গেছে। আর অপেক্ষা করতে পারিনে। বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাস ছেড়ে দিল।

ইনাজু-সানের সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছি, প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করা হয়েছে, এমন সময় লক্ষ করি ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে আমসী। তিনি একবার এ পকেট হাতড়াচ্ছেন, একবার ও পকেট। ব্যাপার কী? লজ্জায় ভাঙতে চান না। কিন্তু না বললে নয়। তাড়াতাড়িতে পার্স ফেলে এসেছেন। এখন বাস ভাড়া দেবেন কী করে? একটু পরে রেলভাড়া? টাকাও বড় কম ছিল না। পার্স যেখানে রেখেছিলেন সেখানে হয়তো এখনো পড়ে আছে। হোটেলে ফিরে যাওয়াই সুবুদ্ধি। আমি কি অনুমতি দেব? অনুমতি দেব কী আমিই প্রবর্তনা দিলুম। অবশ্য ফিরবেন তিনি একাই।

মাঝ রাস্তায় বাস থামবে না। তা ছাড়া তিনিও আমাকে ট্রেনে তুলে না দিয়ে ছাড়বেন না। ওদাওয়ারা স্টেশনে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ট্রেন হাজির। উঠে দেখি ইনাজুও উঠছেন। আমাকে এক স্টেশন এগিয়ে দিতে চান। ফেলে আসা পার্সের ভাবনার চেয়ে প্রবল হয়েছে ফেলে যাওয়া অতিথির ভাবনা। ছোট একটা স্টেশনে তিনি নেমে গেলেন। সঙ্গী হতে পারলেন না, সে দুঃখ তাঁর নীরব বদনে।

এবার ওদাকিয়ু লাইন নয়। এ হলো সেই লাইন যে লাইন দিয়ে কিয়োতো যাতায়াত করেছি। কিন্তু ট্রেন তো সেই ট্রেন নয়। তার চেয়ে নিকৃষ্ট। তেমন সাফসুতরো নয়। বহু লোক শহরে যাচ্ছে আপিস করতে। দাঁড়িয়েছে দুই কামরার মাঝখানের সেতুবন্ধে কিংবা শৌচাগারের সামনে। এরা

বোধ হয় বিনা টিকিটের যাত্রী। তা বলে এরা যে রেলওয়েকে ফাঁকি দেবে তা নয়। টিকিট ঘরের পাশেই একটা ঘর থাকে। সেখানে হয় রেলভাড়া হিসাবনিকাশ। 'Fare adjustment.' কোনো কারণে যারা টিকিট কাটতে পারেনি তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেখানে গিয়ে বকেয়া চুকিয়ে দেয়।

এই লাইন দিয়ে যেতে যেতে অফুনা স্টেশনের নিকটে দেখতে পেলুম অবলোকিতেশ্বর বা কান্নন দেবীর মূর্তি। বার বার প্রণাম করলুম। বিদায় নিলুম জাপানের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের তথা ভারতীয় ঐতিহ্যের অনির্বাণ শিখার কাছ থেকে। জাপানের শেষ দিবসে ফুজি দর্শন হলো না। তার বদলে হলো অবলোকিতেশ্বর দর্শন। বুদ্ধের ঠিক পরেই যার মান। সেই বিশাল বিগ্রহটি কামাকুরা বুদ্ধের মতো আকাশের তলে গৃহহীন। পঁচিশ বছর ধরে তার নির্মাণ চলেছে। নির্মাণ সমাপ্ত হবার পূর্বে আদি শিল্পীর মৃত্যু ঘটেছে। এই রকম শুনলুম।

ঝা-দের সঙ্গে প্রাতরাশ। লক্ষ্মীদেবী বললেন, 'কাল যখন বিকেলের দিকে রোদ উঠল তখন ভাবলুম কেন আপনাকে বাদলার ভয়ে হাকোনে যেতে দিইনি। তার পর খবর এলো আপনি হাকোনের ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। খুশি হলুম।'

আমি বললুম, 'আমিও খুশি হয়েছি হাকোনে গিয়ে। ট্রেনে ওঠার আগে পর্যন্ত অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু ট্রেনে যখন উঠলুম, ট্রেন যখন ছাড়ল, তখন দেখলুম দিনটি পরিষ্কার, গাড়িটি নতুন, যাত্রীরা প্রফুল্ল, দৃশ্যগুলি বিচিত্র, হৃদয়টি চঞ্চল। ইউরোপে আমি একটিমাত্র য়াটাশে কেস নিয়ে ঘুরেছি। এবার আমি একবস্ত্রে বেড়িয়ে এলুম।'

এর পরে ঘরে গেলুম তল্পিতল্পা গুটোতে। এক মাস তো আছি জাপানে। এর মধ্যেই আমার সঙ্গে আনা ব্যাগে সুটকেসে আঁটছে না, কিয়োতোয় কেনা ব্যাগেও না। এত কী জিনিস! কতরকম টুকিটাকি। পুতুল। খেলনা। বই। ছবি। বিবিধ উপহার। কাকে ছেড়ে কাকে রাখি! যাকে রাখি তাকে কোথায় রাখি! যাকে ছাড়ি তাকে কোন্ প্রাণে ছাড়ি! জায়গা বাঁচানোর জন্যে প্রত্যেকটি দ্রব্যের কার্ডবোর্ড আধার খুলে ফেলে দিলুম। কিন্তু আধার বাদ দিয়ে ঠাসাঠাসি করতে গেলে শৌখীন সামগ্রীর গায়ে আঁচড় লাগে, দূবের পাড়িতে ভেঙেও যেতে পারে। আবার সেই সব ফেলে দেওয়া বাক্‌স তুলে নিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপালুম। কোনোটার সঙ্গে কোনোটা খাপ খায় না। এমনি করে নিজের দেওয়া গিঁট নিজে খুলতেই আমার সময় যায়। কান্না পায়। কেমন করে আমি বারোটার আগে এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসে পৌঁছব। আরো আগে ভারতীয় দূতাবাসে!

মাদাম কোরা এলেন গ্রামোফোন রেকর্ড দিতে। 'আহা! আমাকে বললেন না কেন! আমি এসে সাজিয়ে দিতুম!' শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি গছিয়ে দিলেন আমার ঘাড়ে সোফিয়াদির জন্যে উপহার। ঘরে ফিরে গিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লুম। তখনো সব এলোমেলো অগোছালো পড়ে রয়েছে মেজের উপর। খাটের উপর, সেটির উপর। পুরুষের সাধ্য নয়, নারীরও অসাধ্য। একমাত্র ভগবান ভরসা। প্রাণপণে জপতে লাগলুম হে প্রভু, রক্ষা কর। হে প্রভু, রক্ষা কর। সেই যে শুরু হলো জপ এক ঘণ্টার উপর চলল মুহুর্মুহু অবিরাম।

ভগবান বুদ্ধি দিলেন, আর সুটকেস একটা কিনতে হবে। মনে পড়ল কাছেই একটা দোকানে সুটকেস চোখে পড়েছিল। গিয়ে দেখি বেশীর ভাগই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। সুটকেস যদি বা পছন্দ হলো চাবি খুঁজে পাওয়া গেল না। চাবি! আমার প্রশ্ন শুনে দোকানদার তো অবাক! চাবি! চাবি আবার কী! চাবির কী দরকার! লোকটাকে বোঝাতে পারিনে যে চাবি না দিলে ভিতরের জিনিস চুরি যেতে পারে। সে আমার যুক্তির মর্মভেদ করতে পারল না। বোধ হয় ভাবল কী সন্দেহশীল এই বিদেশীগুলো! চাবি না দিলে চুরি যাবে! জাপানে!

আরো কয়েকটা সুটকেস নাড়াচাড়া করলুম। একই ব্যাপার। চাবি নেই। বৃথা সময়ক্ষেপ।

কাছে কোথাও অন্য দোকান ছিল না। কিনতে হলে অনেক দূরে যেতে হয়। ওদিকে আমার জন্যে দূতাবাসে এসে বসে থাকবেন আসাহি পত্রিকার প্রতিনিধি। সময়মতো না গেলে এয়ার ইণ্ডিয়ার আপিসও দরজা বন্ধ করবে। এই সঙ্কটে যদি ভগবানের নাম নিয়ে থাকি তবে সেটা বুদ্ধি খাটিয়ে নয়। আপনা থেকেই অন্তর বলে উঠল, 'প্রভু, রক্ষা কর। প্রভু, রক্ষা কর।' মুহূর্তে মুহূর্তে ভগবানকে ডাকে কারা? যাদের প্রাণ বিপন্ন। এক্ষেত্রে আমার মান বিপন্ন। যাত্রা বিপন্ন। তা ছাড়া আর একজনকে দূতাবাসে আমার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ জানিয়েছিলুম। তাঁর উত্তর পাইনি। তিনি যদি না আসেন তা হলে খেদ থেকে যাবে, যদি আসেন ও আমাকে না দেখে চলে যান তা হলে পরিতাপের সীমা থাকবে না।

ফিরে যাচ্ছিলুম। কী ভেবে দোকানে ঢুকলুম আবার। জার্মানীর মতো জাপানেও রুকসাক পাওয়া যায়। তাতে এন্তার জিনিস আঁটে। পিঠে বাঁধলে কেমন হয়? দোকানদার দুটি একটি ইংরেজী কথা জানত। রহস্য করে বলল, 'কী! হিমালয়ে উঠবেন নাকি!' হিমালয়ে না উঠি, বিমানে করে বিশ হাজার ফুট উচ্চতায় তো উঠব।

রুকসাক আমার সমস্যার সমাধান করল। কিন্তু তার ওজন হলো এত বেশী যে তাকে পিঠে করে বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তাকে এয়ার ইণ্ডিয়ার কাছে ধরে দিতেই হবে। তারা যদি সাধু হয় তা হলে কোনো জিনিস চুরি যাবে না, যদি সতর্ক হয় কোনো জিনিস খোয়া যাবে না। রুকসাক আমার নিজের মানবচরিত্রে বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে এসেছে। বিশ্বাস থাকে তো এয়ার ইণ্ডিয়ার হাতে গছিয়ে দিয়ে আমি খালাস। না থাকে তো ফেরিওয়ালার মতো পিঠে গাঁটরি বেঁধে আমাকে বিমানে ওঠানামা করতে হবে হানেদায় হংকং-এ ব্যাঙ্ককে দমদমে।

রুকসাকে আর সব আঁটল, কিন্তু বইকেতাব বাইরেই পড়ে রইল গন্ধমাদনের মতো। কী করে যে পার্সেলের মতো বাঁধি! না আছে মোটা কাগজ বা কাপড়, না আছে দড়িদড়া। বর্ষাতী ছিল। তাই দিয়ে মুড়ে নিয়ে গেলুম। দেখি যদি দূতাবাসে একটা হিল্লে হয়।

॥ চব্বিশ ॥

চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে সাক্ষাতে বিদায় নেওয়া হলো না, তিনি অনেকক্ষণ চ্যান্সেলারিতে চলে গেছেন। লক্ষ্মীদেবীর কাছে বিদায় চাইলুম। তাঁর ইচ্ছা ছিল আমি আরো দু'চার দিন থাকি। কিন্তু আমি তো জানতুম প্রধান মন্ত্রীর জাপান পরিদর্শন নিয়ে তিনি ও তাঁর স্বামী কী পরিমাণ অন্যমনস্ক। ইতিমধ্যেই ইন্দিরা গান্ধীর উপনীত হওয়ার কথা। কলকাতায় হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী হয়ে তিনি তাঁর পিতার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ঝা দম্পতি না থাকলে আমার জাপান প্রবাসের শেষ ক'টি দিন ঘরে থাকার মতো স্বচ্ছন্দ লাগত না! অনেকটা নিঃসঙ্গ ও কতকটা নিরানন্দ মনে হতো। তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

চ্যান্সেলারিতে গিয়ে দেখি, এ কে! আইকো সাইতো! চিত্রশিল্পী। আমাকে বিদায় দিতে এসেছেন। অভিভূত হলুম এই বোনটিকে দেখে। লজ্জিত হলুম এক ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছি। তিনি যে আসবেনই এমন কোনো কথা শুনিনি। আর শুনলেই বা আমার সাধ্য কী যে যথাকালে লটবহর নিয়ে বেরোই। আসাহি পত্রিকার প্রতিনিধিকেও এক ঘণ্টা আটকে রেখেছি। সাংবাদিকদের কত

কাজ! তাঁর হাতে আমার লেখাটা পৌঁছে দিয়ে আমি দায়মুক্ত হলুম। জাপানী অনুবাদ তাঁরাই করাবেন। ছাপা হবে আমার প্রস্থানের পরে আর জবাহরলালের প্রবেশের পূর্বে। ওকাকুরার প্রস্তাবমতো নেহরু প্রসঙ্গও প্রক্ষেপ করেছি।

ওদিকে এয়ার ইণ্ডিয়া আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে মালপত্র নিয়ে। দূতাবাসে যাঁর কাছে সাহায্য পাব ভেবেছিলুম তিনি সেখানকার রেজিস্ট্রার সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় সেদিন আসতে পারেননি। তাঁরও ইনফ্লুয়েঞ্জা। বইকেতাব কি তবে অগোছালো অবস্থায় সচ্চিদানন্দ ধর মহাশয়ের জন্যে দূতাবাসেই ফেলে যাব? এদিকে এই বোনটিকে আসতে বলে তার পর বসিয়ে রেখে তার পর কাছে পেয়ে কেমন করে দু'মিনিটের মধ্যে বিদায় নিই? অভিপ্রায় ছিল আধুনিক চিত্রকলার কোনো এক প্রদর্শনীতে বা গ্যালারিতে গিয়ে তাঁর সহায়তায় আমার শিক্ষার ষোলো কলার একটি কলা পূর্ণ করব। কুমারী সাইতো বললেন তিনি দূতাবাসেই বসে থাকবেন যতক্ষণ না আমি ফিরি। সঙ্গে আছেন তাঁর পিতা। ঘণ্টা 'দেড়েক পরে ফিরে দেখি তিনি ঠায় বসে আছেন। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি।

সেদিন আইকো সাইতো আমাকে তাঁর নিজের আঁকা ছবি দেখালেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ছবিগুলির স্লাইড আর সেগুলিকে বড় করে প্রতিফলিত করার যন্ত্র। এক এক করে প্রতিফলিত হলো দূতাবাসের প্রতীক্ষাকক্ষের প্রাচীরে। সমস্ত ছবি abstract পদ্ধতির। কতটুকু তার বুঝলুম! শুধু এইটুকু বুঝলুম যে আইকোর সাধনা অকৃত্রিম ও তিনি বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন। মুখচোরা মধুরপ্রকৃতি এই কন্যাটির সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁকে আমি পাশ্চাত্য পোশাকে প্রত্যাশা করিনি। শিল্পীকে মানায় না। এর চেয়ে সুন্দর দেখতে তাঁর সেই কিমোনো পরা মূর্তি।

জাপানীর মেয়েকে বেলা আড়াইটে পর্যন্ত অভুক্ত রেখে বিদায় দিই ও নিই। তার পর সনৎবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি বাঙালীর মেয়ে অতিথির জন্যে অভুক্ত বসে আছেন। কী লজ্জা! যাত্রার উত্তেজনায় আমার না হয় ক্ষুধাবোধ রহিত, তা বলে অপরের খিদে পাবে না? খেতে বসে দেখলুম বাঙালী মতে রান্না। কত কাল পরে মাছের ঝোল আর ভাত। গোপন থাকল না যে আমিও ক্ষুধার্ত। সনৎবাবুও সঙ্গ রাখলেন। ফরেন সার্ভিসে নাম দিয়েছেন, আমাদের যেমন এক জেলা থেকে আরেক জেলায় বদলি এঁদের তেমনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে বদলি। ছোট ছোট মেয়ে দুটিকে জাপানী বিদ্যালয়ে দিয়েছেন। নিজেরাও জাপানী শিখেছেন।

চাটুজ্যের একে অসুখ, তার উপর বাসাবদলের ঝঞ্ঝাট। তা সত্ত্বেও আমার উপদ্রব সহ্য করলেন। বর্ষাত্রী খুলে বইকেতাবের রাশ ঢেলে দিয়ে ভারমুক্ত হলুম। ইতিমধ্যে ব্যাগ সুটকেস সঁপে দিয়ে এসেছি এয়ার ইণ্ডিয়ার কর্মচারীদের হাতে। রুকসাকটা আমাকে পরীক্ষা করে দেখল আমি সন্দিগ্ধমনা নই, সরলবিশ্বাসী। আশ্চর্য! বিশ্বাসের জয় হলো। জিনিস একটিও চুরি গেল না, খোয়া গেল না, যদিও চাবি দেওয়া হয়নি।

বিদায় নিতে যাব, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। তোকিয়োর পুরাতনতম বাঙালী অধিবাসী শিশিরকুমার মজুমদার! তিনি যখন শুনলেন যে আমি ওখানে উপস্থিত তখন আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। এই বিশিষ্ট বাঙালীর সঙ্গে দেখা করতে আমারও বিশেষ আগ্রহ ছিল, কিন্তু একটুও ফুরসৎ পাইনি। ভুলেও গেছলুম। অপ্রত্যাশিতভাবে আমার ইচ্ছাপূরণ হলো। মজুমদার মহাশয় মোটর ছুটিয়ে এসে পড়লেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল জাপানের সঙ্গে সংযুক্ত। মাঝখানে কয়েক বছর দেশে ফিরে গিয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন, কিন্তু জাপান তাঁকে আবার আকর্ষণ করল। তোকিয়োতে তাঁর প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি। স্বাধীন ব্যবসায়।

ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে দুটো কথা কইব তার উপায় ছিল না। চারটের সময়

ইম্পিরিয়াল হোটেলে ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন। মার্কিনের মেয়েকে তো এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বসিয়ে রাখা যায় না। অগত্যা মজুমদার মহাশয়ের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা করতে হলো। কী তাঁর মনে দুঃখ! আমারও কি কম! বিদেশে বাঙালীকে পেলে বাঙালী আর কিছু চায় না। প্রাণ ভরে বাংলা বলতে চায়। আমারি দুর্ভাগ্য যে আমি বাঙালীদের জন্যে আমার কর্মসূচীতে যথেষ্ট ফাঁক রাখিনি। অথচ চাটুজ্যে ও ধর এই দুই বাঙালী আমার জন্যে যা করেছেন আর কেউ তা করতেন না। আমি কৃতজ্ঞ।

ফ্রান্সেস তো আমার আশা ছেড়ে দিয়ে হোটেল থেকে নিষ্ক্রমণের চিন্তা করছিলেন। আমিও প্রথমটা তাঁকে দেখতে না পেয়ে ভাবলুম তিনি হয়তো চলে গেছেন। তাঁর সন্ধানে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি তিনি কোন্‌খান থেকে বেরিয়ে এসে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বাহুল্য সেটাও একপ্রকার কণ্ঠসঙ্গীত। একদা তিনি অপেরায় গেয়েছেন, এখনো মাঝে মাঝে রিসাইটাল দিয়ে বেড়ান। সঙ্গীতের অধ্যাপিকা।

'আহা! আমাকে ডাকলে না কেন! আমি গিয়ে গুছিয়ে দিতুম।' বললেন ফ্রান্সেস ক্যাসার্ড যখন শুনলেন যে আমি প্রাণপণে ভগবানকে ডেকেছি।

বাস্তবিক, সমাধানটা যে এত সরল তা আমার মাথায় আসেনি। আমি ধরে নিয়েছিলুম যে ইনাজু থাকবেন আমার সঙ্গে, দরকার হলে তাঁকেই ডাকব সহায় হতে। হঠাৎ তিনি যে তাঁর পার্সের পিছনে ছুটবেন তা তো গণনায় আনিনি। তা ছাড়া ঐ ক'টা জিনিস নিয়ে অমন রাজসূয় যজ্ঞ করা কেন? যেখানে যত হিতৈষী ও হিতৈষিণী আছেন সবাইকে আহ্বান করা?

ফ্রান্সেস আমার জন্য একটি ফুরুশিকি এনেছিলেন। যা দিয়ে বইপত্র জড়িয়ে বাঁধা যায়। শুধু বইপত্র নয় যত রকম টুকিটাকি জিনিস। জাপানীদের হাতে এ রকম একটি রঙীন বস্তানি দেখে আমার শখ হয়েছিল, কিন্তু বলিনি যে আমার চাই।

তার পর চললুম আমরা ইম্পিরিয়াল হোটেল থেকে তোকিয়োর শহরতলীতে। কোতো বাদন শুনতে। তাঁকে একদিন বলেছিলুম যে আমার শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যাবে যদি জাপানে এসে কোতো বাদন না শুনি। তাঁর এক বন্ধু ছোটখাটো একটি ওস্তাদ। ওস্তাদের বাড়ি গিয়ে তানালাপ শুনতে হয়। সেইজন্যে তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। বড় বড় ওস্তাদের দর্শন মেলা অত সহজ নয়। দর্শনী লাগে।

জাপানের রেলগাড়ি কাঁটায় কাঁটায় আসে ও ছাড়ে, কিন্তু ডাকঘর গোরুর গাড়ির অধম। ফ্রান্সেস তাই চিঠি লেখেননি, টেলিগ্রাম করেছিলেন। আর শিগেরু কুবো তার উত্তর দিয়েছিলেন টেলিফোনে। আমাকে তিনি কোতো বাজিয়ে শোনাবেন সানন্দে। আটাশে সেপ্টেম্বর শনিবার রাত এগারোটায় আমার প্লেন। রানী অফ আগ্রা। তার ঘণ্টা দুই আগে লিমুসিন ছাড়বে ইম্পিরিয়াল হোটেল থেকে। তার ঘণ্টা দুই আগে আমার ফিরে আসা চাই ডিনার খেতে ও বিদায় দিতে আসা বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে। আড়াই ঘণ্টা ফাঁক ছিল। সেটা ভরানো গেল শহরতলীতে যাতায়াতে আর সঙ্গীত শ্রবণে।

কিমোনো পরিহিত নম্র বিনয়ী যুবা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁর একখানিমাত্র কক্ষে। বাইরে ছোট একটি জাপানী পদ্ধতির বাগান। শিল্পীর পক্ষে আদর্শ পরিবেশ। একাই থাকেন, একাই বাজান, কেউ গেলে শেখান। ঐকান্তিক সাধনা ও নিষ্ঠা। ফ্রান্সেস থেকে থেকে গান গেয়ে উঠলেন তাঁর সুরেলা গলায়। আর কুবো বাজিয়ে চললেন গতের পর গৎ। প্রত্যেক বারেই নতুন করে সুর বাঁধতে হয় আর তার পদ্ধতিও বিচিত্র। তেরোটি তারের নিচে ঠেকা দেবার জন্যে অনেকগুলো ঠেকনা। প্রত্যেক বারই তাদের স্থানান্তর করতে হয়। এক একটি গতের জন্যে এক এক

রকম আয়োজন। আঙুল দিয়ে বাজায়। কোতোর অন্য নাম সো। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। কান নেই।

চা খেয়ে আর উপহার পেয়ে ঋণী হয়েই ফিরলুম। ধন্যবাদ দিলে কি ঋণের বোঝা হালকা হয়? কেবল কুবো-সান নন, বহু জনের কাছে বহু ভাবে আমি ঋণী। সবাইকে বলি, 'সায়োনারা।' তার আক্ষরিক অর্থ, যদি বিদায় নিতেই হয় তবে বিদায় নেওয়া যাক। বাচ্যার্থ, আবার দেখা হবে। কবে, কোথায়, কোন্ জন্মে জানিনে। হবে, এইমাত্র জানি। আমি বিশ্বাস করি যে কোনো দেখাই শেষ দেখা নয়।

ইচ্ছাপূরণ একে একে হয়েছিল, বাকী ছিল আরো কয়েকটি উড ব্লক প্রিন্ট কেনা। কিন্তু তার জন্যে যদি দোকানে দোকানে ঘুরতে হয় দেরি হয়ে যাবে। হোটেলের ভোজনাগারে ডিনার পরিবেশন শুরু হয়ে গেছে। ফ্রান্সেস আর আমি আসন নিলুম। লক্ষ করলুম পরিবেশিকাদের পরনে কিমোনো। অথচ পাশ্চাত্য মতে আহার। ইতিমধ্যে একবার উঠে গিয়ে দেখি ওকাকুরা-সান এসে বসে আছেন। বললুম, আমার খাওয়া সারা হয়নি। ততক্ষণ আপনি কি অনুগ্রহ করে আমার জন্যে খান কয়েক উড ব্লক প্রিন্ট কিনে আনতে পারবেন? তা হলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

আহারের পর লবিতে এসে দেখি ইতিমধ্যে আরো কয়েক জন এসেছেন। মিস এতো। অধ্যাপক ইনাজু ও তাঁর ছাত্রছাত্রীর দল। উপহার। ফুলের তোড়া। এঁদের এই ভালোবাসা অকৃত্রিম। এ শুধু মৌখিক সৌজন্য নয়।

লবিতে এঁদের নিয়ে ঘোরাফেরা করছি, এমন সময় চোখে পড়ল এক কোণে বসে আছেন এক শাড়ি-পরা ভদ্রমহিলা, তাঁর সঙ্গে এক বিলাতী পোশাক-পরা ভদ্রলোক। ভারতীয় এখানে কোন্‌খান থেকে এলেন? এঁরা কারা? চেনা চেনা ঠেকছে যে! দেখি, দেখি! ওমা!

তার পর নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য, তবু সত্য। ওই তো আমার কমলাবোন আর ওই যে তাঁর ওসাকাপ্রবাসী ভাই! আশ্চর্য! কমলাবোন তো জানতুম চোদ্দ দিন আগে রওনা হয়ে গেছেন। না, তাঁর যাওয়া হয়নি। হঠাৎ ওসাকায় অসুখ করে। অসুখ সারার পর দুর্বলতা রয়ে যায়। একা ভ্রমণ করতে সাহস পান না। অপেক্ষা করেন আরো কয়েক দিন যাতে আমার সঙ্গে এক বিমানে দেশে ফিরতে পারেন। এয়ার ইণ্ডিয়ায় খোঁজ নিয়ে জানতে পান যে আমি আটাশে তারিখের প্লেন ধরছি। তাঁর ভাই তাঁকে দিতে এসেছেন তোকিয়ো পর্যন্ত এগিয়ে। চেহারায় অসুখ থেকে সদ্য ওঠার ছাপ।

আমি ভার নিলুম কমলাবোনের। আর তিনি ভার নিলেন আমার। ফ্রান্সেস বললেন তাঁকে আমার ক্যামেরার উপর লক্ষ রাখতে, যাতে পথে কোথাও হারিয়ে না বসি। অদ্ভুত ইনটুইশন নারীজাতির। পরের দিন ক্যামেরাটা সত্যি ফেলে আসছিলুম ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে। চায়ের টেবিলে। কমলাবোন মনে করিয়ে দিলেন। নইলে যখন মনে পড়ত তখন আমি আকাশে। একটা ক্যামেরা তো চাঁদপুরের জাহাজে হারিয়েছি। সেই থেকে সতেরো বছর অনভ্যাস।

উকিয়োএ পাওয়া যাবে হাতের কাছে, এই মনে করে ওকাকুরাকে পাঠানো। কিন্তু কাছের দোকানগুলো বন্ধ দেখে তাঁকে ছুটতে হলো কান্দা অঞ্চলে। সেখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন তিনি সুন্দর কয়েকটি পট। না, আমার আর কোনো খেদ নেই। তাই বা কী করে বলি? নিক্কো দেখা হলো না যে। 'না হেরিয়া নিক্কো কহিয়ো না কেক্কো।' কাউকেই সুন্দর বলা চলবে না নিক্কো যতক্ষণ না দেখছি। সেটা পরের বারের জন্যে তোলা রইল। হয়তো আসতে হবে আবার আমাকে নিক্কো দেখে কেক্কো বলতে।

ন'টা বাজল। বন্ধুদের হাতে হাত রেখে বিদায় নিলুম। সায়োনারা! সায়োনারা! লবি থেকে

গেট পর্যন্ত একসঙ্গে পায়ে হেঁটে গেলুম। আরেক বার বিদায়! সায়োনারা! সায়োনারা! মোটরে উঠে বসলুম। হানেদা বিমান বন্দরের জন্যে আরো কয়েকজন সহযাত্রী ও যাত্রিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে বিদায় দিতে এত লোক আসেনি। বোধ হয় তাঁদের কারো এমন মন কেমন করেনি। জাপানী বন্ধুদের আমি মাঝে মাঝে বলতুম, ফরেনার কথাটা আমার পছন্দ নয়। আমরা কেউ কারো কাছে ফরেন নই। দেশকেও ফরেন লাগে না। একই পৃথিবী, একই আকাশ। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের নাড়ীর টান।

মোটর ছেড়ে দিল। আমার চোখে তো এলোই, বন্ধুদের কারো কারো চোখেও একটা করুণ ভাব এলো। হাত ছেড়ে, রুমাল নেড়ে বলাবলি করা গেল, সায়োনারা! সায়োনারা! গাড়ি এবার মোড় নিল। অদৃশ্য হয়ে গেল বন্ধুজনের জনতা, অক্ষয় হয়ে রইল তাদের স্মৃতি। ভারাক্রান্ত হয়ে রইল হৃদয়। যে দেশ ছেড়ে যাচ্ছি সেই দেশই তখনকার মতো আমার দেশ। একজনকে বলেছিলুম, জাপান যেন আমার হোম। মাত্র এক মাসের পরিচয়ে এতখানি আত্মীয়তা আমাকেই বিস্মিত করেছিল।

গত কয়েক দিন আবহাওয়ায় টাইফুনের আভাস ছিল। শোনা যাচ্ছিল টাইফুন আবার আসছে। এমন কথাও মনে হয়েছিল যে আমার প্লেন নির্দিষ্ট তারিখে ছাড়বে না। একখানি প্লেন নাকি এক দিন দেরিতে পৌঁছেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সব মেঘ কেটে গেল, দিনটির চেয়ে রাতটি হলো আরও বেশী পরিষ্কার। আমার যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হলো। টাইফুনের মাসে টাইফুন পেলুম না, ভূমিকম্পের দেশে ভূমিকম্প পেলুম না, পেলুম কিছু বৃষ্টিবাদল, তাও এমন কিছু নয়। মোটা একটা বর্ষাতী বয়ে বেড়ানোর মতো নয় নিশ্চয়।

হানেদা বিমান বন্দরে সাথীরা কে কোথায় সরে পড়লেন। দেখি আমরা দুটি মানুষ একা! কমলাবোন আর আমি। এশিয়ার সবচেয়ে বড় এয়ারপোর্ট। লোকে লোকারণ্য। দোকানপসারের কমতি নেই। শাস্ত্রে বলছে গৃহীত এব কেশেষু ধর্মমাচরেৎ। মেয়েদের বেলা বলা যেতে পারে, বিমানে ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শখের জিনিস কিনবে। কমলাবোন কি মেয়েলি শাস্তর লঙ্ঘন করতে পারেন!

দশ পনেরো মিনিট অন্তর অন্তর ডাক পড়ছিল, 'অমুক এয়ার লাইনের যাত্রীগণ! অমুক এয়ার লাইনের যাত্রীগণ! এইবার আপনারা তৈরি হয়ে নিন। আপনাদের প্লেন অপেক্ষা করছে।' আর অমনি প্রতীক্ষাগার থেকে এক দল যাত্রী উঠে চলে যাচ্ছিলেন। তাঁদের স্থান শূন্য হচ্ছিল। নতুন লোক তেমন বেশী আসছিলেন না। রাত বাড়ছিল। ক্ষীণ হয়ে আসছিল জনতা। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলুম। ভাবছিলুম বড় দেরি হচ্ছে। এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেন কি আজ ছাড়বে না? ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলুম আমাদের দলের যাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। কমলাবোন আমাকে খুঁজছেন। ডাক পড়েছে। তখন আমরা দল বেঁধে চললুম।

অভ্যন্তরে বিশ্রাম করছিলেন রানী অফ আগ্রা। কক্ষের পর কক্ষ পার হয়ে যেমন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে হয় তেমনি প্রবেশ করলুম রানীর নিভৃত দরবারে। এয়ার হস্টেসরা আদর করে নিয়ে বসিয়ে দিলেন যার যার নির্দিষ্ট আসনে। বিমান উটপাখীর মতো কিছুক্ষণ দৌড়ল, তার পর দাঁড়াল, তার পর গরুড়ের মতো আকাশে উঠল, উঠতে উঠতে উঠতে উঠতে এক সময় বোঝা গেল যে উড়ছে। বিমান বন্দরের লাল নীল বাতিগুলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো, তার পর কোথায় মিলিয়ে গেল। তোকিয়ো শহর তার আলোকমালা নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গ রেখেছিল, কিন্তু আর পারল না পাল্লা দিতে। পেছিয়ে পড়ল। অত যে আলোর বাহার তার চিহ্ন রইল না। তার পর সমুদ্র দেখা দিল। তার পর সমুদ্রই দৃষ্টি জুড়ল। জাপান এই একটু আগেও জাজ্বল্যমান সত্য ছিল।

সে এখন স্মৃতি।

কমলাবোনকে একজন এসে খবর দিলেন অন্য সারির পিছনের দিকে পাশাপাশি তিনটে আসন খালি। ইচ্ছা করলে তিনি মাঝখানকার হাতগুলো নামিয়ে খাটের মতো করে গা মেলে দিয়ে আরাম করে শুতে পারেন। তিনি বেঁচে গেলেন। তখন আমিও ফাঁকতালে পাশাপাশি একজোড়া আসনের অধিকারী হয়ে মাঝখানের হাতটা নামিয়ে দিয়ে পা মুড়ে শুলুম। সেই যে ভোর পাঁচটায় হাকোনে হোটেলে বিছানা ছেড়েছি তার পর থেকে রাত এগারোটা অবধি কেবল চরকির মতো ঘুরেছি। দেহময় ক্লান্তি। এখন একটু ঘুমতে পারলে বাঁচি। কিন্তু কোথায় ঘুম? ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুম আসছে না। উত্তেজনায় নয়, আশঙ্কায় নয়, সেসব নেই। বরং আছে একটা উদ্দাম আনন্দ। মানবজাতির কত কালের সাধ পাখীর মতো আসমানে উড়বে। এই তো আমি পাখীর মতো উড়ছি। এ কি কম সৌভাগ্য! নিদ্রায় অচেতন হলে তো পাখীর মতো উড়ে চলার স্বাদ পাওয়া যায় না, তা দিয়ে চেতনা ভরে নেওয়া যায় না। তার পর ধরিত্রীর কোলে স্পেস কোথায় যে স্পেসের পরিপূর্ণ স্বাদ পাব! এক যদি সাহারা মরুভূমিতে উটের পিঠে চাপি বা প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজের বুকে ভাসি। তার চেয়েও অসীম অগাধ স্পেস মহাব্যোমে। যদি পাখীর মতো ডানা মেলি, যদি গরুড়ের মতো ঊর্ধ্বে উঠি তা হলেই পাই অনন্ত অতল স্পেসের স্বাদ। চেতনা ভরে নিই।

ঘুম পাচ্ছে, অথচ ঘুম আসছে না। রাজ্যের কথা মনে পড়ছে। যে রাজ্য ছেড়ে চলেছি সেই রাজ্যের কথা। জাপানকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি। এই এক মাসে কত দেখলুম, কত শিখলুম। কত জনের সঙ্গে পরিচয় হলো। কারো কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। কে কে আমাকে ছাড়তে চায়নি। কাকে কাকে আমি ছাড়তে চাইনি। জাপানী, ভারতীয়, মার্কিন, রাশিয়ান, ফরাসী। স্বপ্নের মতো লাগছিল সত্যঘটনাকেও। তাই তো আমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলুম। যেন স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর স্বপ্নটাকে জোড়া দিয়ে টেনে দীর্ঘায়িত করছিলুম। করতে করতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। চোখ মেলে দেখি আলো হয়ে গেছে চার দিক। দেয়াল-জোড়া কাঁচের শার্সি দিয়ে দিনের আলো ভিতরে এসে ছড়িয়ে গেছে। যাত্রী-যাত্রিণীদের কতক তখনো ঘুমিয়ে।

আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া দেখবার আর কী আছে? আছে মেঘ। মেঘনাদ নাকি মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করত। কিন্তু সে থাকত মেঘের কাছাকাছি। আমরা মেঘের চেয়ে অনেক উঁচুতে। অত উঁচু থেকে মেঘকে দেখায় নীল জলের উপর শাদা ফেনার মতো, শাদা ধোঁয়ার মতো, শাদা ভেলার মতো। নীল? না, ঠিক নীল নয়। গাঢ় সবুজ। ঘন শ্যাম। দিগন্তেও এক একটি মেঘ দেখছি। মনে হয় বিমানের সমান উচ্চ। রঙিন মেঘও চোখে পড়ে।

কমলাবোন অন্য ধারে ছিলেন। বললেন, 'দেখুন, দেখুন! রামধনু।' এত বিশাল রামধনু জীবনে দেখিনি। দুই প্রান্ত সমুদ্রে নেমে গেছে। মাঝখানে কে জানে কত শত ক্রোশ ব্যবধান। শীর্ষ বোধ হয় বিমানের সমোচ্চ। যেমন বিশাল তেমনি উজ্জ্বল। সব ক'টি রঙ ঝকঝক করছে। চোখ ঝলসে যায়। একটু পরে আবিষ্কার করি ওটা যুগল রামধনু। সেই সাতটি রঙ পিঠোপিঠি উলটো করে সাজানো। সাত নরী নয় চোদ্দ নরী হার। হারদুটির মাঝখানে কে জানে কত যোজন ব্যবধান। রামধনু ক্রমে ক্রমে দৃষ্টির অতীত হলো। তার পর কমলাবোন আবার ডাকলেন। 'ও কী! রামধনু না?' দেখলুম সে এক আজব ব্যাপার। যে মেঘের উপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি সেই মেঘের উপর রামধনুর সাত রঙ। মেঘের পর মেঘ। সাতরঙার পর সাতরঙা। মেঘের বিরতি। সাতরঙার বিরতি। মেঘের পুনরাগতি। সাতরঙার পুনরাগতি। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ হলো যে এটা আমাদের বিমানেরই দ্বারা সৃষ্ট বর্ণালী।

তার পর কমলাবোন বললেন, 'ওটা কী জলের উপর ভাসছে? ভাসতে ভাসতে আমাদের

সঙ্গে চলেছে?' প্রথমে মনে হলো কী একটা জলজন্তু। কিন্তু এমন কোন জলজন্তু আছে যে প্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাইলের পর মাইল সমান দূরত্ব রক্ষা করতে পারে? না, ওটা জলজন্তু নয়। আমাদের বিমানেরই ছায়া। তাই ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। তার পর দেখা গেল ক্ষুদে ক্ষুদে নৌকা। খেলনার মতো জাহাজ। দেখতে দেখতে আমরা হংকং বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলুম। এবার আড়াই ঘণ্টা বিরাম। বাইরে যেতে পারি। ছাড়পত্র জমা দিলুম। এয়ার ইণ্ডিয়ার লোক আমাদের নিয়ে গেল কাওলুন শহর দেখাতে, হোটেলে প্রাতরাশ খাওয়াতে। প্রদর্শিকা চৈনিক তরুণী বললেন, 'আজকেই প্রথম সূর্যের মুখ দেখা গেল। এই ক'দিন চলছিল টাইফুনের উৎপাত।'

হংকং দিল চীনের একটুখানি আভাস। ক্রমে সেটুকু ক্ষীণ হয়ে এলো। আবার উড়ছি সাগরের উপর দিয়ে। উড়তে উড়তে এক সময় লক্ষ করছি পর্বতমালা, উপত্যকা, নদী। মানুষের বসতি অল্পই। কেমন এক ভয়াল সৌন্দর্য এই দেশের। যেন রূপকথার মায়ারাজ্য। অরুণ বরুণ কিরণমালার কাহিনীতে শোনা। এরই নাম ভিয়েৎনাম।

এর পর এলো বাংলার মতো সমতল সবুজ ভূমি। বড় বড় ক্যানাল গেছে বহু দূরে সরল রেখা টেনে। জমি যেন ছক-কাটা শতরঞ্চ। ছকগুলো সমচতুষ্কোণ। যেন কেউ পরিকল্পনাপূর্বক দিগন্তবিসারী উদ্যান রচনা করেছে। ধান্যের উদ্যান। শ্যামদেশ শ্যাম দেশই বটে। ব্যাঙ্কক বিমানবন্দরে ঘণ্টাখানেকের জন্যে থামা। তার পর শহরের উপর দিয়ে ওড়া। ছোট ছোট খাল গেছে রাস্তার মতো নক্‌শা কেটে। খালের পাড়ে বাড়ি। অগণিত প্যাগোডা।

সমুদ্রের উপর দিয়ে আবার উড়তে উড়তে চেয়ে দেখি অরণ্য। নদীমালা। শস্যক্ষেত্র। জনপদ। সহযাত্রী দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ বললেন, রেঙ্গুন এইমাত্র ছাড়িয়ে আসা গেল। আমার লক্ষ ছিল না। দৃষ্টি নিবদ্ধ বঙ্গোপসাগরে। বঙ্গকে মনে পড়ছে অনুষঙ্গ থেকে। দেশ আমাকে নিবিড় করে টানছে। বড় আশা ছিল পূর্ববঙ্গের উপর দিয়ে উড়ব। দশ বছর পরে অবলোকন করব তার রূপ। কিন্তু বিমান সুন্দরবনের পশ্চিম ঘেঁষে ভারতপ্রবেশ করল। স্তব্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলুম সমুদ্র কেমন করে জলমগ্ন মৃত্তিকা হয়ে যায়, তার থেকে কেমন করে কাদামাটি পলিমাটি জেগে ওঠে, তার উপর কেমন করে ঝোপঝাড় গজায়, ঝোপঝাড় কেমন করে গাছপালা হয়, গাছপালা কেমন করে গহন বন, গহন বনে কেমন নদীনালার আঁকিবুঁকি। ধীরে ধীরে আসে বিরল বসতি, ধানক্ষেত, রাস্তা। বিমান ততক্ষণে নিচু হয়ে আস্তে আস্তে উড়ছে।

আর আমি ততক্ষণে চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর। এই প্রথম গৃহকাতর বোধ করছি। মিলন যতক্ষণ সুদূর ছিল মিলনের কথা চেতনায় আনিনি। যেই আসন্ন হলো অমনি চেতনা ছাইল। বিমান একটু একটু করে নামছে। দমদম দেখা যাচ্ছে। ঐ তো বন্দর। ওই যে কারা সব অপেক্ষা করছে। বিমান যেই ভূমিষ্ঠ হলো কমলাবোনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অবতরণ করলুম। তার পর তীরের মতো সোজা চললুম মাঠ চিরে এক লক্ষ্যে। কিন্তু যে মেয়েটিকে আমার ছোট মেয়ে মনে করে একদৃষ্টে ছুটেছিলুম সে তৃপ্তি নয়। বাঁ দিকে তাকাতেই দেখি তৃপ্তি, আর তার মা, আর দুর্গাদাসবাবু।

আমার ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাতটা। কলকাতার ঘড়িতে বিকেল সাড়ে তিনটে। মেয়ের মা বললেন, 'এসেছ?' আর মেয়ে বলল, 'বাবা, আমার জন্যে কী এনেছ?'

২২শে জুলাই ১৯৫৮ সমাপ্ত

ফেরা

ভূমিকা

পশ্চিম সম্বন্ধে আমার উৎসাহ বালক বয়স থেকেই। কিন্তু এমন একদিন এলো যেদিন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাহিংসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হলো। যদিও সেটা বিশ্বযুদ্ধ তা হলেও সেটা ইউরোপীয় যুদ্ধ। বিশেষ করে ইউরোপীয়। প্রথম মহাযুদ্ধেরই সেটা দ্বিতীয় অধ্যায়। সেই ইংরেজ-ফরাসী-রুশ বনাম জার্মান। মাঝখানে একটা বিপ্লব ঘটে গিয়ে প্রতিবিপ্লব ডেকে এনেছে। নাৎসী-ফাসিস্ট প্রতিবিপ্লব। সুতরাং মহাযুদ্ধের মহাহিংসার দিক থেকে মুখ ফেরানো মানে ইউরোপের দিক থেকেও মুখ ফেরানো।

মুখ যেদিকে ফিরল সেদিক ভারতের অহিংস দিক। গান্ধীজী ও ভারতের জনগণ যার বীর্যবান সাধনায় নিমগ্ন। যে সাধনা সৃষ্টিশীল। বৈনাশিক নয়। যা মানুষকে এক করে, ভিন্ন ভিন্ন করে না। যা আপাতত ভারতের হলেও আখেরে সব দেশের, সব কালের। এই ধ্যান ধীরে ধীরে আমারও ধ্যান হয়, কেবল গান্ধীজীর বা তাঁর সহযোগীদের নয়। তবে আমি আমার শিল্পীজনোচিত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলি। গান্ধীপন্থীর ভিড়ে হারিয়ে যাইনে।

তার পরে এলো আরেক দিন। গান্ধীপন্থীরাই গান্ধীকে ছাড়লেন। নোয়াখালীর মাঠে 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে'। শাক্তরা শক্তিতীর্থ দিল্লী চললেন। বৈষ্ণব তাঁর একক সাধনায় নিমগ্ন রইলেন। পরে একদিন নিহত হলেন। যাদের হাতে হলেন তারাও ভারতীয়। দেখা গেল মহাহিংসা শুধু ইউরোপের বেলা সত্য নয়, ভারতের বেলাও সত্য। পরিমাণ নিয়ে চুলচেরা তর্ক করা বৃথা। ভারতের হাড়ে হাড়ে জড়িয়ে আছে যে হিংসা সেই হিংসার প্রকাশ্য রূপ জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা। মানুষ মানুষকে দিনে দিনে তিলে তিলে যে হিংসা করে তাকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তার পরিমাণ চার পাঁচ বছরের মহাযুদ্ধের মহাহিংসার চেয়ে কম নয়। তেমনি এক মহাহিংসার আবর্তে পড়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবেব বিভাগ কালে পাঁচ ছয় লক্ষ নরনারী নিহত হয়। তার বহুগুণ হয় উৎপাটিত।

তা হলে কি আবার মুখ ফিরিয়ে নেব? এবার ভারতের দিক থেকে? না, তা হলে মহাত্মার দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়। সত্য শুধু মহাহিংসা নয়, পরম অহিংসাও সত্য। অনাদিকাল থেকে একটি অহিংসার ধারাও বয়ে আসছে ভারতের মাটিতে। সাময়িকভাবে সে নিহত হতে পারে, পরে তার রেসারেকশন হবে।

তেমনি ইউরোপেরও একটি খ্রীস্টীয় দিক আছে। একটি হিউমানিস্ট দিক আছে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমারই ক্ষতি। ইউরোপের কী আসে যায়! আস্তে আস্তে ইউরোপের সঙ্গে আমার পুরোনো ভাব ফিরে আসে। মাঝখানকার বিমুখভাবটা কেটে যায়। ইউরোপও ক্রমে প্রকৃতিস্থ হয়। তখন পায়ে পা মিলিয়ে নেবার সময় আসে। ফাঁক ভরিয়ে নেবার সময়।

সুযোগও একদিন আপনা হতে এসে হাজির। জার্মান ফেডারেল রেপাবলিকের নিমন্ত্রণ। জার্মানী সম্বন্ধেই আমার সব চেয়ে কৌতূহল ছিল। কেমন করে ওরা আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে ও অন্যের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। অথচ আমাদেরই মতো পার্টিশন-জর্জরিত। বোঝাপড়ারও প্রশ্ন ছিল। কেমন করে ওরা নাৎসীদের পাল্লায় পড়ল। কই, ১৯২৯ সালে তো ওদের দেখে আমার মনে হয়নি যে ওরা হিটলারের হাতের পুতুল হবে। সে সময় নাৎসীদের চেয়ে বরং কমিউনিস্টদের প্রভাব

বেশী ছিল। যারা দেখত তারা ভাবত সোশ্যাল ডেমক্রাটদের পরেই প্লাবন। কালাপানির নয়, লাল দরিয়ার। হঠাৎ একটা ভোজবাজি ঘটে গেল। কমিউনিস্টরা অদৃশ্য। নাৎসীরা সর্বেসর্বা।

এদেশেও কি তাই হবে? অনেক সময় ভেবেছি। কেননা জার্মানীর সঙ্গে ভারতের মিল আছে। 'পথে প্রবাসে'-তে ওকথা লিপিবদ্ধ করেছি। এদেশের সোশ্যাল ডেমক্রাটদের সামনেও একই রকম সমস্যা। তাঁরা যদি সব দিক সামলাতে না পারেন তাঁদেরও একদিন আসর ছেড়ে দিতে হবে। তখন কমিউনিস্টরা এগিয়ে আসবে, না আরো আগে ফাসিস্টরা এসে সর্বেসর্বা হবে, এই হলো প্রশ্ন। এর জন্যে আমি প্রায়ই জার্মানীর কথা স্মরণ করে থাকি। তফাতের মধ্যে এই দেখি যে এদেশে একটি অহিংস ধারা আছে। গান্ধীজীর সঙ্গে সঙ্গে সে ধারা বিলুপ্ত হয়নি। এদেশের ফাসিস্টদের তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তেমনি কমিউনিস্টরা যদি সফল হয় তবে কমিউনিস্টদেরও তার সঙ্গে মোকাবিলা না করে উপায় থাকবে না। এরই নাম বৈষ্ণবী শক্তি। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, পরমাণু বোমা তো অনেকদূরের কথা, তবু এ শক্তি আছে। আছে বলেই ভারত নাৎসী জার্মানী হবে না।

এত কম সময়ে কীই বা দেখা যায়। তবু দেখেছি যতটা পেরেছি। পশ্চিম জার্মানী, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কোনোখানেই আমার চলাফেরার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়নি। ঠিক যেমন নিজের দেশে চলি ফিরি, মিলি মিশি, কথা বলি তেমনি। তিনটি দেশই গভীরভাবে ডেমক্রাটিক। যেমন ছিল আমার প্রথম দর্শনের সময়। মাঝখানকার উন্মত্ততা হাওয়ার সঙ্গে গেছে। কী একটা হাওয়া! মধ্যযুগের মহামারীর মতো।

জার্মান ও ফরাসী শব্দের বাংলা বানান যেখানে যেখানে পেরেছি ধ্বনির মতো করতে চেষ্টা করেছি, নয়তো পাঠকের সুবিধের জন্যে ইংরেজীর মতো। বাংলায় ওসব ধ্বনি আনা যায় না। মতভেদ অপরিহার্য।

॥ এক ॥

খুঁজতে বেরোলুম আমার পঁচিশ বছর বয়সের আমিকে। যে মহলে রেখে এসেছিলুম সেই মহলে। 'আমার পিতার ভবনে অনেকগুলি মহল।' তাদের একটির নাম ইউরোপ। এমনি এক অক্টোবর সন্ধ্যায় বিদায় নিয়েছিলুম তার কাছ থেকে। বলেছিলুম, পুনর্দর্শনায় চ।

তখন তো জানতুম না যে, মাস হবে বছর, বছর হবে যুগ, এক যুগ গিয়ে তিন যুগে ঠেকবে। দেখতে দেখতে অতীত হবে চৌত্রিশটি শরৎ। অভাবিতরূপে এলো কথা রাখার অবসর। পুনর্দর্শনের সুযোগ। পশ্চিম জার্মানীর নিমন্ত্রণে পশ্চিমযাত্রা এবার আমার জীবনে পশ্চাদ্‌যাত্রা। এক রাত্রেই পার হয়ে গেলুম এক কুড়ি চৌদ্দ বছর। লুফ্‌টহান্সার আসমানী জাহাজ যেন আমার টাইম মেশিন। কলকাতায় আমার বয়স উনষাট, করাচীতে পঞ্চাশ, ধারানে চল্লিশ, কায়রোতে ত্রিশ। আর—

রাতপোহানী আলো আঁধারিতে আকাশ থেকে নিরীক্ষণ করি ভূমধ্যসাগরের নীল পাড় ধরে ইটালীর শ্যামল অঞ্চল উড়ে চলেছে। বন্দে! বন্দে! মনে মনে বলে উঠি, বন্দে! ইউরোপ, তোমাকে বন্দনা করি। ইটালী, তোমাকে বন্দনা করি। বন্দনা করি তোমাকেও, হে আমার পঁচিশ বছর বয়সের জীবনযৌবন।

ফিরেছি ও ফিরে পেয়েছি। ধন্যতা! ধন্যতা!

এক এক সময় মনে হতো ইউরোপে ফেরা আর হবে না। আর হলেই বা কী! যার সঙ্গে আমার পরিচয় সে ইউরোপ কি আর আছে! সে চিরকালের মতো গেছে। এ ইউরোপে আমাকে চিনবে কে। আর আমিই বা চিনব কাকে! গ্যেটে তাঁর প্রথম বয়সের প্রেমিকাদের সঙ্গে দেখা করতে ভয় পেতেন। তরুণীর বদলে দেখবেন জরতীকে। মোহিনীর বদলে দেখবেন বহুসন্তানবতী ঘরণীকে। মোহভঙ্গ হবে। তার চেয়ে না দেখাই ভালো। চোখ বুজে ধ্যান করাই ভালো তখনকার বয়সের রূপলাবণ্য।

ভয়ে ভয়ে তাকাই। ভয় ভেঙে যায়। এ তো সেই প্রকৃতি। প্রকৃতির বয়স বাড়ে না। সে স্থিরযৌবনা। শুধু সাজ বদলায়। তার অঙ্গে আবার সেই শারদীয় সাজ। আত্মারও কি বয়স বাড়ে! সেও চিরযুবা। শুধু কালো কেশ ধূসর হয়, উষ্ণ রক্ত শীতল হয়। তা সত্ত্বেও আমার অন্তরে সেই প্রথম যৌবনের স্ফূর্তি।

বলে গেছলুম, আবার দেখা হবে। আবার দেখা হলো। এই আমাদের পুনর্দর্শন। যে চোখে তাকে দেখেছিলুম সেই চোখেই আবার দেখলুম। তারই চোখে চোখ রেখে দেখতে পেলুম পঁচিশ বছর বয়সের আমিকে।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় না হলেও প্রায় কাঁটায় কাঁটায় চৌত্রিশ বছর বাদে ফেরা। যতদূর মনে পড়ে সেবার অক্টোবরের সপ্তদশ দিবসে আমি ইটালীতেই ঘুরছি। আর সাত আট দিন পরে মার্সেলসে জাহাজ ধরব। এবার আসমানে উড়তে উড়তে আমি আমার ছেড়ে যাওয়া খেই হাতে নিলুম। দুই প্রান্ত জোড়া লেগে গেল। ফিরে এলো ধারাবাহিকতা। কন্টিনিউইটি।

যেখানে শেষ সেইখান থেকেই আরম্ভ। আমার মনে হলো না যে, আমি চৌত্রিশ বছর

অনুপস্থিত ছিলুম। চেয়ে দেখি ভোর হয়ে আসছে। বিমান থেকে রোম দেখা যাচ্ছে। বিহঙ্গের দৃষ্টিতে অবলোকন করলুম ইটালীর রাজধানীকে। তীর্থযাত্রীর দৃষ্টিতে দর্শন করলুম সেণ্ট পিটার্সকে। এই সেই ইটার্নাল সিটি। ইউরোপের যে রূপ চিরন্তন, যে রূপ কালজয়ী তাকে আমি চিনতুম। এক নিমেষে চিনতে পারলুম। প্রথম প্রভাত নিয়ে এলো শুভদৃষ্টি। শাশ্বতদৃষ্টি। ধ্রুবপদের মতো বেঁধে দিল আমার পুনর্ আগমনীর সুর।

এর পরে আমার সৌন্দর্য অভিষেক। আল্পস পর্বতের উপর দিয়ে উড়ছি। রাঙা হয়ে গেল পুব দিক। আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে হোলি খেলা। মেঘের আড়ালে অরুণোদয়। এ দৃশ্য তো কতবার দেখেছি। দেখেছি টাইগার হিল থেকেও। কিন্তু এর মতো কোনো বার নয়। পর্বত পড়ে আছে পায়ের তলায় মাথা হেঁট করে। কালো মাথায় সাদা পাগড়ি। তার মানে বরফ। কাঁধ বেয়ে নেমে যাচ্ছে সরু সরু পৈতে। তার মানে নদী। উপত্যকার থেকে উঠে আসছে ধূপের ধোঁয়া। তার মানে মেঘ। পরম উচ্চতায় বসে আছি আমি। সিংহাসনে বসে অভিষেক।

পুষ্পক, তোমাকে ধন্যবাদ।

॥ দুই ॥

ওদিকে ইউরোপের ভূমিস্পর্শের জন্যে পদদ্বয় অধীর। আশা করেছিলুম রোমে পরশ পাব। বিমান সেখানে থামল, কিন্তু আমরা যারা জার্মানীর যাত্রী তাদের নামতে দিল না। বলল দেরি হয়ে গেছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের অপেক্ষা করছি আর গ্যেটের কথা ভাবছি। তাঁর জন্মস্থানে ইউরোপের ভূমিস্পর্শ। নিশ্চয় এই যোগাযোগের একটা তাৎপর্য আছে। আমার কাছে তিনিই তো মূর্তিমান ইউরোপ। সেবার যখন ইউরোপে প্রথম আসি মার্সেলসে ঘটেছিল ভূমিস্পর্শ। ছিল বইকি একটা তাৎপর্য। ফরাসী বিপ্লবের সামরব উত্থিত হয়েছিল সেখানে।

'আমরা ফ্রাঙ্কফুর্টে নামছিনে। দুর্ভেদ্য কুয়াশা।' শুনে বুকটা দমে যায়। ওমা, এমন সুন্দর সূর্যোদয়ের পর সর্বগ্রাসী কুয়াশা। 'আমরা চললুম মিউনিক।'

হায় গ্যেটে!

কী চমৎকার উজ্জ্বল দিন! মাটিতে পা দিতেই মাটি আর আকাশ আর আবহ যেন একসঙ্গে সুর করে বলে উঠল, মনে পড়ে?

আমি তখন মনে মনে উচ্চারণ করছি, বন্দে! বন্দে! মৃত্তিকা, তোমাকে বন্দনা করি। জার্মানী, তোমাকে বন্দনা করি। গ্যেটে, তোমাকে বন্দনা করি।

বন্ধুরা ভয় দেখিয়েছিলেন মিউনিকে বরফ পড়বে, ওভারকোট গায়ে দিয়ে নামতে হবে, পশমের অন্তর্বাস পরে নিয়ে নামতে হবে। হঠাতের হল্লোড়ে অন্তর্বাস বদলানো হয়নি। শুধু ওভারকোটটাই চড়িয়েছি। কিন্তু বৃথা। শীতের লেশমাত্র নেই, বরফ তো কল্পনাও করা যায় না। কোথায় বৃষ্টি! কোথায়ই বা কুয়াশা!

'কেন আপনি অক্টোবরে যাবেন? আপনার নিমোনিয়া হবে। জুলাইতে যান।' বলেছিলেন ভাইস কনসাল মিস স্টেফলার।

'এবার যদি যাই তবে দৃশ্য দেখবার জন্যেই যাব না। দৃশ্য আমি অনেক দেখেছি।' আমি তাঁকে

বলেছিলুম, 'এবার যাব মানুষকে দেখতে, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। যাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই তাঁরা অক্টোবরের আগে স্বস্থানে ফিরবেন না। গ্রীষ্মকালে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন।'

'জানিনে আপনার ভাগ্য কেমন। হয়তো আপনার ভাগ্যে ভালো ওয়েদার জুটবে।' হাল ছেড়ে দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

'ভাগ্য আমার জাপানেও ভালো ছিল, জার্মানীতেও হবে।' বড়াই করে বলেছিলুম আমি।

রওনা হবার আগে কনসাল জেনারেল রুএটে উদ্বেগ ব্যক্ত করেন। আমি বেপরোয়া হয়ে বলি, 'দেখবেন আমিই উত্তম ওয়েদার বহন করে নিয়ে যাব।'

মুখে বললে কী হবে! বিষম শীতকাতুরে আমি। চৌত্রিশ বছর আগে ছিলুম না। ইতিমধ্যে হয়েছি। শীতের ভয়ে রাশিয়া যাইনি। এবার জার্মানী যেতেও যে ইতস্তত করিনি তা নয়। গৃহিণীকে বলেছি, কাজ কী অক্টোবরে গিয়ে! এপ্রিলে গেলেও তো সুধীদের সঙ্গে আলাপ হবে। শীতের মুখে এ বয়সে নাই বা বেরোলুম। তিনি বলেন, কথা যখন দিয়েছ তখন রাখতেই হবে। জুলাইতে গেলে না কেন? ওঁরা তোমার জন্যেই বন্দোবস্ত পালটেছেন। এখন আবার পালটাতে বলা বেআদবি হবে। ওদিকে আরো কত রকম এন্‌গেজমেন্ট হয়ে থাকবে।

শীতের ভয় যে কোথায় ফেরার হলো। ইউরোপের মাটিতে পা দিতেই আমি আবার সেই পঁচিশ বছরের যুবকের মতো নির্ভীক হয়ে গেলুম। ওভারকোট তো খুলে ফেললুমই, পারলে গরম সোয়েটারও খুলে রাখতুম। কিন্তু রাখতুম কোথায়? সুটকেস্ তো লুফ্‌টহান্সার হেফাজতে। ফেরৎ পাব কোলোনে। আসলে আমি কোলোনেরই যাত্রী। ফ্রাঙ্কফুর্টে বিমান বদলের জন্যেই থামার কথা। মিউনিকেও তাই।

রিয়েম বিমানবন্দরে বসে মিউনিকের স্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু জার্মানীর স্বাদ মেলে। ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে মিলেমিশে এক হয়ে যাই। সব ক'টা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি যে আমি এক নতুন দেশে। নতুন অথচ চেনা। বিদেশ অথচ বিদেশের মতো লাগে না। যাকে দেখি তাকে ডেকে বলতে ইচ্ছা করে, ওহে, আছো কেমন? কতকাল পরে দেখা! তুমি ভাবছ আমি একজন স্ট্রেন্‌জার! আরে না, না, না, না।

এর পর কোলোনে যাত্রা। নির্মল আকাশ। শরতের ম্লান আভা। স্নিগ্ধ রৌদ্র। ছবির মতো নিসর্গ। বাভেরিয়ার বনজঙ্গল পাহাড়। শহর মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। গ্রাম অত উঁচু থেকে দেখা যায় না। ক্ষীণকায় নদী। উড়তে উড়তে এক জায়গায় দেখি গাঢ়তম কুয়াশা। ফ্রাঙ্কফুর্ট নয় তো? এর পরে ক্রমেই আকাশের রং পালটাতে থাকে। কোথায় সূর্য! বিবর্ণ ঘোলাটে আসমান। বৃষ্টির আয়োজন। বৃষ্টির ধারা ঝরছে মাঠে, আর ক্ষেতে। হাওয়ার দোলা লাগছে গাছে।

তুমি যতই বল আর যতই কর শরৎশেষে এসে সোনালি রোদ তুমি পাবে না। মন, তৈরি হয়ে নাও ভিজতে আর কাঁপতে। এই হচ্ছে এ দেশের এ ঋতুর রূপ। সকালে যেটা দেখেছিলে সেটা তোমার স্বপ্নের জের।

কান্না পায় আমার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফুর্তিও পায়। এইবার সত্যি সত্যি ইউরোপে এসেছি। তার যা স্পিরিট আমারও তাই। আমরা পরোয়া করিনে শীত-বৃষ্টি কুয়াশার। বরং ওতেই আনন্দ পাই। হাঁ, এইবার ইউরোপের মতো লাগছে।

কোলোনে যখন নামি তখন বৃষ্টি টিপ টিপ পড়ছে। তা পড়ুক। আমি পৌঁছে গেছি।

॥ তিন ॥

পুনর্বার পশ্চিমে যাচ্ছি শুনে বন্ধুরা বললেন, 'এবারেও আর একখানা 'পথে প্রবাসে' লিখবেন তো?'

না। 'পথে প্রবাসে' আর নয়। আমার এবারকার পশ্চিমযাত্রায় 'পথে' আছে, 'প্রবাসে' নেই। মাত্র চার হপ্তার ঘোড়দৌড়। ঘোড়াটা পক্ষিরাজ। সেটার পিঠ থেকে নামি তো মোটরের পিঠে উঠি। মাঝে মাঝে রেলের পিঠেও। প্রবাস বলতে বোঝায় সাময়িক একটা স্থিতি। সেবার আমি দুটো বছরের জন্যে একটা স্থিতি পেয়েছিলুম। এবার আমি যাত্রী।

তা ছাড়া আজকালকার দিনে সব দেশ জুড়ে একটাই দেশ। কোনো দেশেই আমি ঠিক বিদেশী নই। কোনোটাই ঠিক আমার প্রবাস নয়। এ ঘর আর ও ঘর। এ পাড়া আর ও পাড়া। যেকালে আমরা বাস করছি সেকালটা আমাদের সকলের স্বকাল। আমরা ইতিহাসের একই কালাঞ্চলের বাসিন্দে। যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেটা বিংশ শতাব্দীর বাতাস। যে আলোতে দিক দেখছি সেটাও যুগালোক।

'পথে প্রবাসে' আর নয়। তখনকার দিনে আমার প্রত্যয় ছিল ভারতবর্ষের পুনর্যৌবনের জন্যে চাই জরা সংযুবনী মন্ত্র আর সে মন্ত্র রয়েছে প্রতীচির শুক্রাচার্যের ঘরে। কচের মতো আমাদের যুবকদের যেতে হবে সে মন্ত্র আদায় করে আনতে। নিছক দেশভ্রমণের জন্যে আমার যাওয়া নয়। তবু এ কথাও সত্য যে পশ্চিমে না গিয়ে আমার সোয়াস্তি ছিল না। তার ডাক আমাকে ব্যাকুল করে তুলত। সেটা যেন প্রতি অঙ্গকে প্রতি অঙ্গের ডাক। পশ্চিমকে বাদ দিয়ে পূর্ব সম্পূর্ণ হবে কি না এ নিয়ে তর্ক করা চলত, কিন্তু ইউরোপে না গেলে যে আমি অপূর্ণ থাকব সেটা ছিল আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ। আমার সে বয়সের পশ্চিমযাত্রা আমার জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে প্রয়োজনীয় একটি প্রিয় উপলব্ধি।

পরবর্তীকালে প্রতীচীর সংযুবনী মন্ত্রের উপর আমার বিশ্বাস ক্রমে শিথিল হয়। আমার মনে সন্দেহ জাগে যে ইউরোপ তার ভরা ভোগের মাঝখানেও অনির্দেশ্য এক অসুখে ভুগছে। অসুখটা কায়িক নয়। মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক। এরূপ একটা সন্দেহ আমার মনে উদয় হবার পর আর আমি তার ঐশ্বর্য বা ক্ষমতা বা নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি দেখে বিমুগ্ধ হতে পারিনে। তার যৌবন যদিও অফুরন্ত তবু জীবন তার অনিশ্চিত। তার মাথার উপর পরমাণুর খড়গ ঝুলছে। আর একটা মহাযুদ্ধ বাধলে তার যৌবন তাকে বাঁচাবে কি? জরার উত্তর সে আমাদের দিতে পারে, কিন্তু ব্যাধির উত্তর? মৃত্যুর উত্তর?

না। 'পথে প্রবাসে' আর নয়। সে বয়সও নেই। সে চোখও নেই। সে বয়সের চোখে অচেনা দেশ যেন অচেনা নারী। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম সেই বয়সেই সম্ভব। 'পথে প্রবাসে' একটি প্রেমে পড়ার কাহিনী। বহুকালের অদর্শনে সে প্রেম স্তিমিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তার ও আমার জীবনে কতরকম ঘটনা ঘটেছে। কতরকম পরিবর্তন হয়েছে। তখনকার দিনে একের প্রতি অপরের যে টান ছিল এখনকার দিনে সেটা আশা করা যায় না। মাঝখানে এসেছে ভারতের জনগণ। তৃতীয় এক সত্তা। এরও একটা আকর্ষণ আছে। এর আকর্ষণটাই নিবিড়তর। এটাও তেমনি প্রতি অঙ্গকে প্রতি অঙ্গের ডাক। এ ডাক যদি না শুনি তবে আমিই অপূর্ণ থাকব। কিন্তু এমন কোনো জাহাজ বা ট্রেন বা গোরুর গাড়ির ঠিকানা জানা নেই যাতে চড়ে জনগণের কাছে পৌছানো যায়!

'পথে প্রবাসে' আর নয়। এটা আমার 'সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি'। একদা যাকে চিনেছি ও ভালোবেসেছি তার অন্বেষণে যাওয়া। তাকে আর একটিবার দেখতে চাওয়া ও পাওয়া। যদিও জানি যে সে ইউরোপ এখন পুনর্দর্শনের অতীত।

আমার এই 'সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি' আমাকে নিয়ে এসেছে ঠিক সেইখানে যেখানে শেষ হয়েছে 'পথে প্রবাসে'র ইউরোপ হতে বিদায়। তার থেকে তুলে দিই।

'আহা, আবার কবে দেখব—যদি বেঁচে থাকি, যদি পাথেয় জোটে, যদি এই ভালোবাসা এমনি থাকে। অতগুলো যদির উপর হাত চলে না গো, ইউরোপা! মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা ও দেশের সঙ্গে ভালোবাসা এ দুইয়ের মধ্যে একটু তফাৎ আছে। তুমি যেখানে থাকলে সেইখানেই থাকলে। মানবী হলে নিশ্চয়ই আমার দেশে আমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে। তা যখন তুমি পারবে না তখন আমাকেই আসতে হয়। অন্তত বলতে হয় যে আবার আসব।

বললুম, আবার আসব। ভয় কী! কতই বা দূর! জলপথে পনেরো দিন, স্থলপথে বারো দিন, আকাশপথে সাতদিন মাত্র। কিছু না হোক, মনের পথে এক মুহূর্ত।

বললুম ওকথা। তবু জানতুম ওকথা মিথ্যা। জীবনে ফিরে আসা যায় না। একবারমাত্র আসা যায় এবং সেই আসাই শেষ আসা। আবার যদি আসি তবে দেখব সে ইউরোপ নেই।...এ দুটি বছর যা পেলুম তার বেশী এ জীবনে পাওয়া যাবে না। এই বা ক'জন পায়! এত জ্ঞান এত মান এত প্রীতি এত মমতা।...

স্মৃতির দাগ আপনি মুছে যায়। স্মৃতির পথ বেয়ে কত পথিকের আনাগোনা। তাদের চরণতল মৃত্যুর মতো নির্দয়। তবু যদি স্মৃতির দাগ ধরে যাওয়া সম্ভব হয় তবে কোন্ ইউরোপকে দেখব! ইউরোপ তো শুধু স্থান নয়, দৃশ্য নয়, সে মানুষ—ইউরোপের মানুষ। সেই মানুষগুলি কি আমার অপেক্ষায় অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে অচঞ্চলভাবে আমার স্মৃতিনির্দিষ্ট স্থানে কেউ বা বসে কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা টমটম হাঁকিয়ে কেউ বা ঠেলাগাড়ি ঠেলে কেউ বা বইয়ের উপর ঝুঁকে রয়েছে?

পদে পদে পরিবর্তনশীল ইউরোপ। ততোধিক পরিবর্তনশীল মানুষের জীবন যৌবন জীবিকা ও প্রেম। স্মৃতিতে যাদের যে সময়ের যে অবস্থার ফোটো রইল তারা যদি বা জীবিত থাকে তবু তাদের সে বয়স আর থাকবে না, তাদের মধ্যে যারা আকস্মিকভাবে আমার দৃষ্টিপথে পড়েছিল তাদের নামঠিকানা আমি হাজার মাথা খুঁড়েও পাব না। রাইন নদী চিরকাল থাকবে, স্টীমারও তাতে চলতে থাকবে। কিন্তু সেই যে মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী হয়েও মুখে রঙ মেখেছিল তাকে তার প্রেমিকের স্কন্ধলগ্নরূপে আর একটিবার দেখতে পাব কি? না যদি পাই তবে রাইনের উভয়তটের গিরিদুর্গ তেমন সুদৃশ্য বোধ হবে না। লোরেলাইয়ের মায়াসঙ্গীত শুনে নাবিকরা যেখানে প্রাণ দিত সেখানে আমার বুকের স্পন্দন হঠাৎ স্থির ও তার পরে প্রবল হয়ে উঠবে না।'

আমার অদৃষ্ট আমাকে আবার নিয়ে এসেছে রাইননদীর তটে। কিন্তু নদী নয়, নদ।

॥ চার ॥

হে প্রবহমান নদ, পুনরায় তোমার কূলে এসেছি। কিন্তু তুমি কি সেই প্রবাহ, না সেই কূল? সেবার তোমার যে জীবনস্রোতে অবগাহন করেছি এ কি সেই স্রোত, না সেই ঘাট? আর আমিও কি সেই

তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের বিমোহিত যৌবন? না তার প্রতিধ্বনি?

জিজ্ঞাসা করি রাইনকে। সেই সূত্রে জার্মানীকে। সেই সঙ্গে ইউরোপকে। আর আপনাকে।

চৌত্রিশ বছর পেছিয়ে গিয়ে দেখেছি আর কেউ পেছিয়ে নেই। সবাই ইতিমধ্যে এগিয়েছে। চৌত্রিশ বছর এগিয়েছে। এখন তাদের সেই অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। আমাকেও এগোতে হবে। এমন ভাবে এগোতে হবে যাতে মাঝখানকার সময়টার কোনো অংশ বাদ না পড়ে। কোনো অংশ ডিঙিয়ে যেতে না হয়।

লুফ্‌টহান্সার সাধ্য কী যে আমাকে চৌত্রিশ বছর এগিয়ে দেয়! তাও চোদ্দ দিনে! ওদের কাজ হলো আমাকে এক শহর থেকে আরেক শহরে নিয়ে যাওয়া। কোনোখানেই আমার বাস তেরাত্রির বেশী নয়। কোনো কোনোখানে দু'রাত্রি। কোলোন থেকে মোটরে বন্। বন্‌কে কেন্দ্র করে রাইনল্যাণ্ড। বন্ থেকে রেলপথে স্টুটগার্ট। সেখান থেকে মোটরে ট্যুবিঙ্গেন ও প্রত্যাবর্তন। স্টুটগার্ট থেকে রেলপথে মিউনিক। সেখান থেকে মোটরে ওবারআমারগাউ ও প্রত্যাবর্তন। মিউনিক থেকে আকাশপথে বার্লিন। বার্লিন থেকে আকাশপথে হামবুর্গ। মোটামুটি এই হলো আমার প্রোগ্রাম। প্রধানত জার্মানদের ইচ্ছায়। আমার ইচ্ছার অংশ কম। আমি যখন অতিথি তখন আমার ইচ্ছাকে খাটো করাই ভালো।

কতকটা পুনরাবৃত্তি, কতকটা পূর্বানুবৃত্তি। মনে মনে চৌত্রিশ বছর পশ্চাদ্ধাবন। লাফ দিয়ে পরিক্রমণ ও অতিক্রমণ। যুগপৎ দেশ ও কাল। শুধুমাত্র সারফেস দেখে আমি তৃপ্ত হতে পারিনে। আমার অন্বেষণ গভীরতর স্তরে। সদর মহল থেকে আমি অন্দর মহলে যাবার সঙ্কেত খুঁজি। সেইজন্যে মানুষের সঙ্গ চাই। ইণ্টারনাৎসিওনেস নামক যে সরকারী সংস্থা আমার ভার নিয়েছিল সে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে জার্মান সাহিত্যিক বা সুধীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে পারেনি। মনীষীরা হয় অসুস্থ নয় অনুপস্থিত শুনে আমি নিজেই উদ্যোগী হই। চিঠি লিখি আন্তর্জাতিক পি ই এন ক্লাবের সেক্রেটারি ক্রেমার-বাডোনিকে। তিনি তৎক্ষণাৎ মিউনিকে, বার্লিনে, হামবুর্গে খবর দেন।

কোলোন আর বন্ কাছাকাছি। বন্-এর এক বনেদী হোটেলে আমাকে তোলা হয়। সঙ্গে দেওয়া হয় এস্কর্ট বা গাইড। ৎসিকগ্রাফ নামক ছাত্র। মার্জিতরুচি প্রিয়দর্শন বিচক্ষণ। একই সময় পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন বিদ্যার্থী রাধেশ্যাম পুরোহিতকে। আমার প্রীতিভাজন সুলেখক। বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

বেঠোভেনের জন্মস্থান বন্। নয়তো পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী হবার মতো যোগ্যতা নেই অতটুকু শহরের। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের পর জার্মানরা স্মরণ করে গ্যেটেকে। তাঁর কর্মভূমি ভাইমারকে। ভাইমার যদিও রাজধানী হয় না তবু সেইখানে বসে কন্‌স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি। নতুন সংবিধান রচিত হয়। সেইসূত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের নাম হয় ভাইমার রেপাবলিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেখা যায় ভাইমার পড়েছে রুশ অধিকৃত এলাকায়। তাই পশ্চিম জার্মানীর নেতাদের মনে পড়ে বেঠোভেনকে।

জাতির পরম দুর্দিনে জাতি কাকে ধরে উঠে দাঁড়ায়? জার্মানরা এর উত্তরে বলেছে কবি ও সঙ্গীতকার। একই দিনে আমি এই দুই মহাশিল্পীর জন্মস্থান স্পর্শ করতে পারতুম, কুয়াশা যদি অন্তরায় না হতো। কোলোনে অবতরণের পর বৃষ্টির জোরও কমে এলো। বন্ যখন পৌঁছই তখন দুপুর। ফরসা হয়ে আসছে। বেরিয়ে পড়ার পক্ষে প্রশস্ত।

অতবড় একটা আকাশদৌড়ের পর বিশ্রাম করাই তো সমীচীন। দেশে হলে আমি তাই করতুম। কিন্তু ইউরোপে আমি ক'টা দিনের জন্যেই বা এসেছি! বিশ্রাম যদি করি তো দেখব কখন!

শুনব কখন! চিনব কখন! পুরোনো পরিচয় ঝালিয়ে নেব কখন! শরীর দম নিতে চাইলেও মন বলে এখন নয়। আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়। চোখ কান ভরে নিতে হবে।

রাইন নদের ধারেই হোটেল। মাঝখানে শুধু একটা প্রোমেনাড। জানালার ওপারেই ভেসে চলেছে অসংখ্য জাহাজ আর লঞ্চ আর ভেলা। শরীর চায় তাদের উপর দৃষ্টি রেখে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেসে চলতে। সেটাও কি বেরিয়ে পড়া নয়? পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমি এই বন্ থেকেই স্টীমার ধরে উজিয়ে গেছি দক্ষিণে। পরের বছরও তাই করেছি, কিন্তু আরো দক্ষিণ থেকে। এবার আমার হাতে অত সময় নেই। তা ছাড়া যাত্রীবাহী স্টীমার শুনছি একটা বিশেষ তারিখের পর চলাচল করে না, তার সীজন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

বেরিয়ে পড়ার আগে এক শ' রকম ভাবনা, কিন্তু একবার বেরিয়ে পড়লে দেখি জীবন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে আমার সব অবসাদ মুছে দেয়। এরূপ কর্মচাঞ্চল্য দেশে থাকতে অনুভব করিনি। এটা অবশ্য নতুন কথা নয় যে বাইরে গেলে সব কটা ইন্দ্রিয় সহসা রাশছাড়া হতে চায়। দেশ ছেড়ে বেরোনোর পর এখনো চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি। বন্-এ আমি পুবে হাওয়ার মতো শন্ শন্ করে ঘুরছি। মোটরে চড়ে।

বন্ ছিল ঘুমন্ত একটি শহর। ছোট অথচ প্রাচীন। কোলোনের মতো রোমান আমলের। কোলোন ছিল রোমানদের কলোনী আর বন্ ছিল তাদের সেনাবাস। রোমানরা থাকতেই খ্রীস্টধর্ম এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। তখন থেকেই এই অঞ্চল রোমান ক্যাথলিকদের একটা ঘাঁটি। রেফরমেশনও তাদের এখান থেকে হটাতে পারেনি। কোলোনের যিনি আর্চবিশপ তিনিই ছিলেন এই অঞ্চলের শাসক। সম্রাট নির্বাচনে তাঁরও একটা ভোট ছিল, তাই তাঁকে বলা হতো ইলেকটর। ইলেকটর ছিলেন মাত্র সাতজন, পরে আটজন। এঁরাই ছিলেন জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা। সম্রাট যদিও জার্মান তবু পোপের আশীর্বাদে সাম্রাজ্যের নাম হোলি রোমান এম্পায়ার। সেকালের রোমান সাম্রাজ্যের অনুবর্তন। নির্বাচনটা রোমান রীতি। কার্যত সম্রাটের বংশধরই সম্রাট হতেন। ভিয়েনা রাজধানী।

নেপোলিয়নের পতনের পর এসব এলাকা প্রাশিয়ার অধিকারে চলে যায়। পরে প্রাশিয়ার রাজা হন জার্মান সম্রাট। আর্চবিশপদের শাসনক্ষমতা তার আগেই রহিত হয়েছিল। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনও রহিত হলো। কোলোন তার গুরুত্ব রক্ষা করে চলল বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে। ওডিকোলোনের নাম কে না শুনেছেন! কোলোনের বিশ্ববিদ্যালয়ও একদা প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর সেই বিশ্ববিদ্যালয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বন্ধ হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীতে সেটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কোলোনের বিশ্ববিদ্যালয় যেসময় বন্ধ হয়ে যায় তার কিছুকাল পরে প্রাশিয়ার রাজা নতুন এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। বন্-এ। এখন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়েরই দেশবিদেশে খ্যাতি।

যতবার বন্-এর ভিতর দিয়ে যাই ততবার বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে যাই। অতি সুদৃশ্য এই ফটক একটি স্মরণীয় চিহ্ন। নভেম্বরের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে না, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা যাবে না।

॥ পাঁচ ॥

ক্লান্ত, তবু সন্ধ্যাবেলাটা আমি শূন্য যেতে দেব না। থিয়েটার বা কন্সার্টের জন্যে আগে থেকে বলা সত্ত্বেও আসন রিজার্ভ হয়নি। এখন কী উপায়! রাধেশ্যাম শুনে বললেন, 'আপনাকে একটা নতুন

ধরনের থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যেতে পারি। কনট্রা-ক্রাইজে (Kontra-Kreise)'।

কখনো শুনিনি ওর নাম। বুঝিনে কী ওর মানে। তবে বর্ণনা থেকে মনে হলো এই সেই পকেট থিয়েটার যার কথা কলকাতায় শুনেছিলুম। ঔৎসুক্য ছিল। রাজী হয়ে গেলুম।

কনট্রা-ক্রাইজে মানে বৃত্তের বিপরীত বা বৃত্তবিরোধী। বিপ্লবের যেমন প্রতিবিপ্লব বৃত্তের তেমনি প্রতিবৃত্ত। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ দিয়ে তত্ত্বটাকে বা জিনিসটাকে বোঝানো যায় না। মোটামুটি বলতে পারি এটা থিয়েটার নয়, থিয়েটারের উল্টো। থিয়েটারের উপর হতাশার থেকেই এর উদ্ভব। এটা নতুন একটা মুভমেন্ট।

স্ট্যানিস্‌লাভস্কির চেয়ে বড় অথরিটি কে! তিনি তাঁর শেষ জবানবন্দীতে বলে গেছেন—

'As a stage director and actor I have worked, on the one hand, in the field of production, and on the other, in the actor's sphere of inward creativeness. Having tried in the theatre all the means and methods of creative work, having paid homage to the enthusiasm for all types of productions along all lines of creativeness—costume drama, symbolic, ideological and others—having learned the production forms of various artistic movements—realistic, naturalistic, futuristic, schematized, exaggeratedly simple (with statuary drapes, screens, tulle and all sorts of lighting effects)—, I have come to the conclusion that all these things are unable to offer the background which the actor needs to display his creativeness to the full. And while my studies of scenery and stage design convinced me in the past of its limitations, I can now say that its possibilities are indeed exhausted.'

তাই যদি হয় সত্য তবে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে অভিনয়কেই লক্ষ্য করে। চোখ যেন আর কোনো দিকে না যায়। দৃশ্যপট, সেটিং, আলোকসম্পাত ইত্যাদি কি অভিনয়ের জন্যে, না অভিনয়ের থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে বিশ্রামের জন্যে, বৈচিত্র্যের জন্যে? থিয়েটার এক কালে একমুখী ছিল, ক্রমে ক্রমে বহুমুখী হয়েছে। কী করে তাকে আবার একমুখী করা যায় এই চিন্তা এখন অনেকের মনে। তারই একটা নমুনা হলো কনট্রা-ক্রাইজে।

স্টেজকে এঁরা একেবারে ছাঁটাই করেছেন। অভিনেতা ও দর্শকের মাঝখানে কোনো ব্যবধান রাখেননি। প্রযোজনার দিক থেকে সেকালের যাত্রার মতো সহজ ও সরল। অথচ অভিনয়ের দিক থেকে আধুনিক থিয়েটারের মতো চতুর ও সূক্ষ্ম।

আমার দুই বাহন আমাকে নিয়ে গেলেন ছোট একটা বাড়িতে। তার যে অংশটা মাটির উপরে সেটাতে সিনেমা। যে অংশটা মাটির তলায় সেখানে কনট্রা-ক্রাইজে। বেসমেণ্টে গিয়ে দেখি একখানা হলঘর। তার এক প্রান্তে একটা টেবল, অপর প্রান্তে একটা আয়না। টেবলের দিক থেকে আয়নার দিকে যাবার জন্যে ঘরের মাঝখান দিয়ে এক রাস্তা। তার দু'ধারে সারি সারি চেয়ার। ডান সারির চেয়ারের মুখ বাম সারির দিকে। এক সারির পিছনে আরেক সারি। এমনি তিন কি চার সারি। থিয়েটারে বা সিনেমার মতো করে সাজানো নয়, দরবারের মতো করে সাজানো। মাঝে মাঝে যাতায়াতের জন্যে ফাঁক। চেয়ার সংখ্যা শ' দেড়েক কি শ' দুই।

টেবলের ডান দিকের সামনের সারিতে আমাদের জন্যে খান দুই চেয়ার খালি করে দেওয়া হলো। রাধেশ্যাম বসলেন পিছনের সারিতে। চেয়ে দেখি ঘর প্রায় ভরে গেছে। কিন্তু মঞ্চ কোথায়? আমাদের দৃষ্টি মঞ্চাভিমুখী নয়। বরং বলা যেতে পারে দ্বারাভিমুখী। যে দ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকেছি। সামনে যাঁদের দেখছি তাঁরাও আমাদের মতো দর্শক। তাঁরাও দেখছেন আমাদের। টেবলের দিকে বা আয়নার দিকে তাকাতে হলে ঘাড় বেঁকাতে হয়। আর নয়তো একটু ঘুরে বসতে হয়। সকলের নজর টেবলের উপর দেখে আমিও তারই উপর নজর রাখলুম। আয়নাটা সত্যি কথা বলতে কি

তখনো আমার চোখে পড়েনি। একথাও বলে রাখি যে টেবলটা মেজের উপরে পাতা। আর আয়নাটা দেয়ালে লটকানো ছিল। আর টেবলের পিছনে ছিল একটা পর্দা।

সেই পর্দাটা ঠেলে কখন একসময় ঘরে ঢুকলেন দুই প্রৌঢ়া। টেবলের দু'পাশে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। একজন তো গৃহিণী। আরেকজন তাঁর প্রতিবেশিনী। আলাপটা চলছিল গোপনে। কিন্তু আমরা সবাই তা শুনতে পাচ্ছিলুম। এত কাছে বসে আছি আমরা, তবু আমাদের অস্তিত্ব তাঁরা বেবাক ভুলে গেছলেন। আমরা তাঁদের লক্ষ করছিলুম, কিন্তু তাঁরা যেন আমাদের দেখতেই পাচ্ছিলেন না। অভিনেতা সম্বন্ধে আমরা সচেতন, দর্শক সম্বন্ধে তাঁরা অচেতন।

ভাবনার কথা বইকি। মেয়ের বয়স হয়েছে। সে বিয়ে করতে চায়। ছেলেটিও ভালো। মেয়েটি তার খুব পছন্দ। কিন্তু কোথায় বাধছে, জানো? একটি দরকারী দলিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবাজীবন জেদ ধরে বসেছেন, সেটি চাইই চাই। নইলে বিয়ে হতে পারে না। সেটি হচ্ছে কনের মা-বাবার বিয়ের লাইসেন্স।

প্রতিবেশিনীর প্রস্থান। কন্যার প্রবেশ। এখন বোঝা গেল আয়নাটা ওখানে কেন। আয়না যদি না থাকবে তো মেয়েটি কিসের সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নেবে? আর ওখানে যদি না থাকবে তো কোনখানে থাকবে? আমাদেরি মাঝখানের পথ দিয়ে হেঁটে গেল অথচ একবার ফিরেও তাকাল না আমাদের দিকে। বোঝা গেল সে তার নিজের বাড়ির এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া আসা করছে। আমরা অদৃশ্য অশরীরী চক্ষু।

মেয়ে কিন্তু মাকে সাফ শুনিয়ে দিল যে লাইসেন্স খুঁজে না পাবার আসল কারণ লাইসেন্সই হয়নি। ছেলেটাকে মিছে কথা বলে কী লাভ! সত্যকে সহ্য করার শক্তি বা ইচ্ছা যদি ওর না থাকে তবে ওর বিয়ে করে কাজ নেই, ওকে ওর বাগ্‌দান থেকে মুক্তি দেবে মেয়েটি। মা তা শুনে হাঁ—হাঁ করে উঠলেন। লাইসেন্স হয়নি এইটেই মিছে কথা। তিনি আবার খুঁজবেন। মেয়ে কিন্তু নাছোড়বান্দা। আজকেই এস্‌পার কি ওস্‌পার।

যে দরজা দিয়ে আমরা ঢুকেছি সেই দরজা দিয়ে দেখি কে একটা লোক ঢুকছে। মনে হয় কারখানা থেকে আসছে। পোশাক থেকে ঠাওরাই একটু সম্পন্ন অবস্থার মিস্ত্রি। হাতে একটা ফুলের তোড়া ও পার্সেল। দর্শকদের মাঝখান দিয়ে সোজা চলে যায় টেবলের দিকে। ইনিই হচ্ছেন বাপ। বিখ্যাত অভিনেতা হফ্‌মান। এটা তো থিয়েটার নয় যে অভিনেতার জন্য আলাদা প্রবেশপথ থাকবে। এটা তাঁর বাড়ি বা ফ্ল্যাট। আমরাই উড়ে এসে জুড়ে বসে আছি। তিনি আমাদের লক্ষই করলেন না। বোঝাটি নামিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। টেবলটাকে টেনে লম্বা করে দেওয়া হলো। ওটা এখন ডাইনিং টেবল। পর্দার আড়ালে ছিল কাবার্ডের মতো। সেখান থেকে এলো খাবার। মনে পড়ছে না, বোধ হয় ভিতরে গিয়ে তিনি কাপড় ছেড়ে এলেন।

বাপ বাধা দিলেন না। বিয়ে ভেঙে গেল। ছেলেটা সংস্কারবদ্ধ। যে মেয়ের মা-বাপের বিয়ে হয়নি তাকে সে সমাজে তুলবে কী করে! তাকেও দেখা গেল অভিনয় করতে। সে খুবই অসুখী, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে কি অমন অবস্থায় বিয়ে করতে পারে! ওর প্রত্যাখ্যানের পর এলো আর-একটি যুবক। মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। কিন্তু বিয়ের আশা নেই। একে তো কন্যাটি অপরের বাগ্‌দত্তা। তার পর বলতে নেই, এ পাত্রটির পিতামাতা অবিবাহিত। ছেলেটি সত্যবাদী। মেয়েটি বলল, একেই বিয়ে করবে।

এমন সময় হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে মেয়ের মা-বাপের বিয়ের লাইসেন্স! আর সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুবকটি বলে, এবার আমার আপত্তি নেই। আমি রাজী। তখন মেয়েটি বলে, কিন্তু আমার আপত্তি আছে। আমি নারাজ।

:

॥ ছয় ॥

এখানে আমি বলে রাখি যে অভিনয় সারা হবার আগেই আমি আসন ছেড়ে উঠি। নইলে হাই তুলতে তুলতে ঢুলতে ঢুলতে কখন একসময় গড়িয়ে পড়তুম। তখন সবে ন'টা, শুতে যাবার কথা নয়। তা হলে কি অভিনয়টাই ঘুম পাড়িয়ে দেবার মতো?

উঁহু। হলো না। এর উত্তর হচ্ছে, ভারতীয় মতে তখন রাত দেড়টা। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে চার ঘণ্টা এগিয়ে দিলে তাতে ন'টা বাজতে পারে, কিন্তু নিদ্রাদেবী সেটা নির্বিবাদে মেনে নেবেন কেন? তিনি অধীর হয়ে উঠেছেন।

তখনো আহারপর্ব বাকী। রেস্টোরাণ্টে গিয়ে দেখি যা খুশি অর্ডার দেওয়া যায়। আমিষ-নিরামিষ অসংখ্য পদ। অত বুঝিও নে। অত চিনিও নে। ভিড়ের মধ্যে চেনা মানুষের মতো নজরে পড়ে ভীনার স্নিট্সেল। আঃ। ভীনার স্নিট্সেল। যদিও এটা ভিয়েনা নয় তবু জার্মানী তো। নিশ্চয়ই ওই জিনিসটা দেবে।

চৌত্রিশ বছর আস্বাদন করিনি। তা হলেও মুখে দিয়ে বুঝতে পারি যে সেই স্বাদ নয়। নিরাশ হই। জিভকে বলি ধৈর্য ধর। কাল আবার আর কোনোখানে অর্ডার দেব।

রাত্রে এক সময় ঘুম ভেঙে যায়। কোথায় আমি? পূর্বরাত্রে ছিলুম পুষ্পকে। এখন হোটেলে। জানালার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে রাইন নদ বয়ে চলেছে আপন মনে। নীরবে। আলো হাতে করে। জলের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে ভেলা। আলোর মালা।

এই সেই রাইন নদ পুরাণে যার প্রসিদ্ধি। পুরাণের নাম 'নাবেলুঙ্গেন লীড।' ভাগনার যার অদল বদল করে লিখলেন 'নীবেলুঙ্গেন রিং।' রাইন নদের তলায় গুপ্ত ছিল বামনদের ধন। সোনার তাল ও সোনার আংটি! দেবতারা কিন্তু জানতেন। এদিকে দানবদের সঙ্গে দেবতাদের চুক্তি হয়েছিল যে ভালহাল্লা নামে সুরপুরী নির্মাণের দরুণ দানবরা লাভ করবে যৌবনের দেবীকে। সুরপুরী নির্মাণের পর দানবরা যখন দেবীকে চায় তখন দেবতারা কথা ঘুরিয়ে বলেন দেবীর পরিবর্তে দানবরা পাবে বামনদের সোনার তাল ও সোনার আংটি। সোনার আংটি ধারণ করলে চিরযৌবন নয় সর্বময় ক্ষমতা হাতে আসে। সেটাও লোভনীয়। দানবরা রাজী। তখন দেবতারাই একদিন বামনদের ধন হরণ করে নিয়ে যান ও দানবদের দেন।

বেচারা বামনদের তো সাধ্য নেই যে বাধা দেয়। কিন্তু বামুনদের মতো বামনদেরও ছিল শাপ দেবার শক্তি। তারা অভিশাপ দেয় সোনার আংটি যে ধারণ করবে সে অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার অমঙ্গল হবে। সোনার তালের উপরেও অভিশাপ পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল ফলতে আরম্ভ করে। দানবদের এক ভাই আরেক ভাইকে মেরে সমস্তটা আত্মসাৎ করে, একটা গুহায় লুকিয়ে রাখে ও নিজে ড্রাগন হয়ে পাহারা দেয়। ড্রাগনকে কেউ মারতে পারে না। অবশেষে বীরশ্রেষ্ঠ সীগফ্রীড এই অসাধ্য সাধন করেন বিশেষ এক তরবারি দিয়ে। যার সাহায্য না পেলে এ কাজ সম্ভব হতো না। সেই বামনকেও নিপাত করে তিনি নিষ্কণ্টক হন। কিন্তু সোনার আংটি ও সোনার তাল যে অভিশপ্ত। ক্ষমতার শিখরে উঠেও তাঁর সর্বনাশ হয়। অনেক কাণ্ডের পর সেই অভিশপ্ত ধন আবার রাইনের তলায় ফিরে যায়। ইতিমধ্যে দেবতারাও চক্রান্ত করছিলেন ওটা নিজেরাই গ্রাস করবেন। কিন্তু দানবদের ফাঁকি দিয়ে ও পরের ধনে পোদ্দারি করে তাঁদের যে পাপ হয়েছিল সেই পাপে তাঁরাও ধ্বংস হন, তাঁদের ভালহাল্লাও ভস্ম হয়। ধন আর ক্ষমতা থেকে কারো

মঙ্গল হয় না। না মানবের, না দানবের, না বামনের, না দেবতার।

রাইনকে অবলম্বন করে কত না কিংবদন্তী রচিত হয়েছে। লোরেলাই তার অন্যতম। নদের দুই তীরে গিরিদুর্গের পর গিরিদুর্গ। কবি বাইরন তাদের অমর করে দিয়েছেন। ইতিহাসেও তাদের স্থান আছে। আপাতত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিজেতারা কয়েকটি গিরিদুর্গে তাঁদের দূতাবাস স্থাপন করেছেন। মার্কিন দূতাবাস তো এলাহী ব্যাপার। রাজধানীতে অত জায়গা নেই যে সব ক'টা দূতাবাসের কুলোয়। আমাদের চান্সেরি যদিও বন্ শহরে রাষ্ট্রদূতের নিবাস কোলোন শহরে। বলা যেতে পারে বন্ যদিও রাজধানী তবু রাইনতটের অনেকখানি জুড়ে বৃহত্তর রাজধানী। রেলপথ ও মোটরপথ সমগ্র অঞ্চলটাকে দ্রুত অধিগম্য করেছে। অটোবান দিয়ে দিনরাত মোটরের কারাভান ছুটেছে। যেমন তাদের গতিবেগ তেমনি তাদের অবারিত গতি। কিন্তু একটা মোটর যদি বিকল হয় তবে পিছনের সব ক'টা অচল।

ইংলণ্ডের যেমন লণ্ডন, ফ্রান্সের যেমন প্যারিস, ইটালীর যেমন রোম, জার্মানীর তেমন কোনো সাংস্কৃতিক রাজধানী নেই। কোনো কালেই ছিল না। জার্মান সংস্কৃতি বরাবরই বহুকেন্দ্রিক। জার্মান সাহিত্যিকরা নানা স্থানে ছড়ানো। পশ্চিম বার্লিনে, মিউনিকে, হামবুর্গে, কোলোনে। পূর্ব বার্লিনে, ড্রেসডেনে, লাইপৎসিগে, ভিয়েনায়। এ ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পশ্চিম জার্মানীতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গেই দেখা কবা সম্ভব। কিন্তু কার সঙ্গে কোথায় সে খবর আমার অজানা। সুখী হলুম শুনে যে হাইনরিখ ব্যʼল (Boll) থাকেন কাছেই, কোলোনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিরতিশয় অসুখীও হলুম যখন শুনলুম তিনি অসুস্থ ও সাক্ষাতে অসমর্থ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নতুন একদল লেখকের উদয় হয়। তাঁরা এখন মধ্য গগনে। ব্য'ল তাঁদের শীর্ষে। তাঁদের বলা হয় সাতচল্লিশের দল। গ্রুপ ৪৭। সাতচল্লিশ সালেই এই দলটির পত্তন। ব্য'লের বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো। অন্যান্যদের বয়স আরো কম। কী করে এঁরা সাহিত্যের আকাশ আলো করে অধিকবয়সীদের নিষ্প্রভ করলেন? এর ব্যাখ্যা, হিটলারী আমলে জার্মানীর সেরা সাহিত্যিকরা একে একে দেশান্তরী হন। সাত শ' আট শ' সাহিত্যিক স্বেচ্ছায় নির্বাসনবরণ করেন। বাকী যাঁরা রইলেন তাঁদের মুখ বন্ধ। আর নয়তো তাঁরা নাৎসী অনুশাসনে স্বধর্মভ্রষ্ট। আস্ত একটা যুগ জুড়ে সাহিত্যে নিষ্প্রদীপ ও ভূতচতুর্দশী। অবশ্য নির্বাসনে যাঁরা গেলেন তাঁরা সাহিত্যসাধনায় নিষ্ক্রিয় রইলেন না। কিন্তু লেখক ও পাঠক একই প্রবাহে অবগাহন না করলে, একই সমবেত অভিজ্ঞতায় শরিক না হলে, লেখক পাঠকের নাড়ীতে হাত না রাখলে, পাঠক লেখকের সঙ্গে পা মিলিয়ে না নিলে দশ বারো বছরের বিরহও বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। সে বিচ্ছেদ অলঙ্ঘনীয়।

অনেকেই ফিরলেন না। যাঁরা ফিরলেন তাঁরাও স্থান ফিরে পেলেন না। তাঁদের কেউ কেউ আবার প্রস্থান করলেন। যেমন টোমাস মান। সামনের সারি খালি পড়েছিল। এগিয়ে গিয়ে ঠাঁই করে নিলেন সাতচল্লিশের দল। হিটলারী আমলের সমুদ্রমন্থনের সময় এঁরা উপস্থিত ছিলেন। সে যুগের গরল এঁরা আকণ্ঠ পান করেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের অগ্নিপরীক্ষায় এঁরা বিদগ্ধ হয়েছিলেন। এঁদের হাত দিয়ে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হলো তাকে জার্মান সাহিত্যের পুনরারম্ভ বলা চলে। এঁরা শুধু নতুন বিষয়বস্তুর নয়, নতুন ভিত্তির সন্ধানরত। সে ভিত্তি ভীষণভাবে বাস্তব হলেও তার শক্তির উৎস গভীর অন্তঃপ্রত্যয়। সে অন্তঃপ্রত্যয় আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক। অনেকেই এঁরা ক্যাথলিক। যেমন হাইনরিখ ব্য'ল। গত যুগের অধিকাংশ সাহিত্যিক ছিলেন লিবারল হিউমানিস্ট। দেখা গেল যুদ্ধ ও বিপ্লবের এলিমেণ্টাল শক্তিসংঘর্ষের দিন তাঁদের অন্তঃপ্রত্যয় কেমন নিঃসহায়। বলতে পারা যায় যে তাঁরাই স্বেচ্ছায় গদী ছেড়ে দিলেন।

এ যুগের সাহিত্যের ভিত্তি সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় আসেনি। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর

সোশিয়াল ডেমক্রাট জমানার ভবিষ্যদ্বক্তাদের বোকা বানিয়ে দেয় ক্লাস ওয়ারের পরিবর্তে রেস ওয়ার। ন্যাশনাল সোশিয়ালিজমের নামে ন্যাশনাল রেসিয়ালিজম। এবার তো ইহুদী নেই যে হিংসাটাকে পাত্রান্তরিত করতে পারা যাবে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব শুরু হলে তার বিকল্প থাকবে না। প্রতিপক্ষ জার্মানীর একভাগ জমি দখল করে নিয়ে সেখানে স্বত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছে। কে জানে হয়তো আরো একটা মহাযুদ্ধ মহাকালের ঝোলায়। সেইসঙ্গে নির্বিকল্প শ্রেণীযুদ্ধ। লিবারল হিউমানিস্ট অন্তঃপ্রত্যয় যদি ঘাতসহ না হতে পেরে প্রব্রজ্যা বরণ করে থাকে তো খ্রীস্টীয় গণতন্ত্রী অন্তঃপ্রত্যয়ের ঘাতসহতা কতদূর তাও অপরীক্ষিত। সাম্প্রতিক সাহিত্যিকরা যুদ্ধের পানপাত্র নিঃশেষ করে থাকলেও বিপ্লবের তলানিটুকু গলাধঃকরণ করার সুযোগ বা দুর্যোগ পাননি। যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা এখন পূর্ব জার্মানীতে ও ভিন্ন গোষ্ঠীতে। তাঁদের অন্তঃপ্রত্যয় অন্যপ্রকার। তাঁদের সৃষ্টি আমি দেখিনি।

এই দ্বিভাজন যদি স্বল্পকালস্থায়ী না হয়ে চিরস্থায়ী হয় তা হলে জার্মান সাহিত্যের পুনরারম্ভ বলতে এপারে যা বোঝাবে ওপারে তা বোঝাবে না, ওপারে যা বোঝাবে এপারে তা বোঝাবে না। কে জানে কতকাল লাগবে বোঝাপড়া করতে। যেসব জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি এপারে এসেছি এটাও তার অন্যতম। সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনার এটাও একটা বিষয়।

॥ সাত ॥

বন্‌কেও চিনতে পারিনি। কোলোনকেও না। কিন্তু কোলোনের গথিক রীতির ক্যাথিড্রালকে দেখবামাত্র চিনলুম। যুদ্ধে এর এক পাশ জখম হয়েছিল। ইতিমধ্যে সারানো গেছে। সারানোর কাজ এখনো চলেছে। তবে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিককে মেলানো সম্ভব নয়। সেসব চিত্রিত কাঁচের তুলনা নেই। সে জীবন্ত বিশ্বাস কি বিংশ শতাব্দীতে একজন শিল্পীরও আছে?

বোমা বা গোলা দিয়ে বাড়ি ভেঙে দিলে বাড়ি আবার গড়া যায়। কারখানা ভেঙে দিলে কারখানা। শহরকে শহর ভেঙে দিলে শহরকে শহর। পুনর্গঠন ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু যে গির্জার নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ও সম্পূর্ণ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে যদি পুরোপুরি ধ্বংস হতো তা হলে তার পুনর্গঠন করত কে? তার পুনর্গঠন বলতে বোঝাত কী? অবিকল সেই জিনিসটি না সেই নামে অন্য জিনিস? এসব পুরাকীর্তির পুনর্গঠন হয় না। এটি যে মোটের উপর অক্ষত রয়েছে এ শুধু জার্মান জাতির নয়, মানবজাতির ভাগ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধ জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি। আকাশ থেকে বোমা যা পড়েছিল তা এরকম মারাত্মক নয়। এবারকার মহাযুদ্ধে জার্মানী স্বয়ং একটি যুদ্ধক্ষেত্র। উপরন্তু বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত। যুদ্ধশেষের সাত বছর পরেও কোলোনের অঙ্গে করাল ক্ষতচিহ্ন দেখে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভয় পেয়ে যায়। প্রকৃতি বা মানুষ তখনো সে ক্ষতচিহ্ন ঢাকা দিতে পারেনি।

ইতিমধ্যে সেসব ক্ষত মিলিয়ে গেছে। ভিতরের ব্যথা হয়তো দূর হয়নি। তবু বাইরে আরোগ্যের লক্ষণ। সর্বনাশ এখন সমৃদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আমেরিকার পরেই পশ্চিম জার্মানীর বিত্তবৈভব। হেরে যাওয়া ভাগ হয়ে যাওয়া দেশ সতেরো বছরে নব কলেবর ধারণ করেছে। হে মরণ, কোথায় তোমার হুল! হে কবর, কোথায় তোমার জয়!

আমার মনে পড়ে ফ্রেজারের 'গোল্ডেন বাও' হতে এলিয়টের উদ্ধৃতি—

'In the summer after the battle of Linden, the most sanguinary battle of the seventeenth century in Europe, the earth, saturated with the blood of twenty thousand slain, broke forth into millions of poppies, and the traveller who passed that vast sheet of scarlet might well fancy that the earth had indeed given up her dead.'

প্রতিটি রক্তবিন্দু এবারকার যুদ্ধের পরও পপি হয়ে ফুটেছে। মুঠো মুঠো পপি, মুঠো মুঠো নোট, মুঠো মুঠো ভোগ্য সামগ্রী, মুঠো মুঠো ভোজ্য বস্তু। ভগ্ন স্তূপ সরিয়ে রাশি রাশি নতুন ইমারৎ পপির মতো মাথা তুলেছে। মার্কিনদের চেয়েও মার্কিনতর। মাঝে মাঝে কয়েকটি পুরোনো ধরনের বাড়ি রয়েছে যেন স্মরণ করিয়ে দিতে যে এটা জার্মানী।

এই কুরুক্ষেত্র সপ্তদশ শতাব্দীতে ছিল ধর্মক্ষেত্র। এখন কর্মক্ষেত্র। মানুষ তার শেষ স্বেদবিন্দুটি পাত করছে ও তার বিনিময়ে লাভ করছে প্রভূত মুনাফা ও মজুরি। সেটা উড়িয়ে দেবার জন্যেও প্রচুর খেলাধূলা নাচগান আমোদপ্রমোদ। ভোগ না করলে উৎপাদন হয় না। উৎপাদন না করলে ভোগ হয় না। একটার বাড়তিতে অপরটার বাড়তি। সেকালের ক্যাপিটালিস্টরা যাই বিশ্বাস করে থাকুন একালের ক্যাপিটালিস্টদের বিশ্বাস সবাইকে কাজ যোগাতে পারা যায়, খাটিয়ে নিয়ে যথেষ্ট মজুরি দিতে পারা যায়, মজুরি দিয়ে কেনবার মতো যথেষ্ট ভোজ্য ও ভোগ্য সরবরাহ করতে পারা যায়, মজুরির একভাগ লভ্যাংশরূপে ফিরে পাওয়া যায়।

পশ্চিম জার্মানীতে কেউ বেকার বসে নেই। মেয়েরাও সর্বঘটে। শরণার্থী হয়ে যারা পূর্ব জার্মানী থেকে, পোলাণ্ডভুক্ত জার্মানী থেকে, রুশভুক্ত জার্মানী থেকে পালিয়ে এসেছে তাদের সংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ। তারাও সবাই কাজ পেয়ে গেছে। এর উপরেও অন্যান্য দেশ থেকে পাঁচ লক্ষের মতো কর্মপ্রার্থী এসে জুটেছে। তা সত্ত্বেও কর্মখালি। অথচ পশ্চিম জার্মানীর কোনো উপনিবেশ নেই। হিটলার যাকে বলতেন বাঁচবার মতো ঠাঁই তারও কোনো দরকার দেখা যাচ্ছে না।

তবে পশ্চিম জার্মানীর শাসকদের মতে জার্মানীকে আবার ঐক্যবদ্ধ না করলে নয়। পূর্ব জার্মানীর স্বাতন্ত্র্য তাঁরা স্বীকার করেন না। পোলাণ্ডভুক্ত ও রুশভুক্ত জার্মানীর উপর তাঁদের জাতীয় দাবী তামাদি হয়নি ও হবার নয়। যদিও তাঁদের এলাকা আপাতত পশ্চিম জার্মানী তবু তাঁদের রাষ্ট্রের নাম রাখা হয়েছে জার্মানীর ফেডারেল রেপাবলিক। ওদিকে পূর্ব জার্মানীর শাসকরাও কম যান না। তাঁদের রাষ্ট্রের নাম জার্মানীর ডেমোক্রাটিক রেপাবলিক। সুযোগ পেলে তাঁরাও জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। কিন্তু ফেডারেল ভাবে নয়, প্রদেশবিভাগ তুলে দিয়ে। তাঁদের আচরণ থেকে আশঙ্কা হয় যে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রও তাঁরা তুলে দেবেন।

সত্যিকার লড়াই কেউ আপাতত চান না। জার্মানে জার্মানে লড়াই কেউ আজকাল আর কল্পনাও করেন না। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টের লড়াই থেকে সকলেই শিখেছেন ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব না বাধলে জার্মানী অনেক আগেই ইউরোপের অগ্রগণ্য শক্তি হতো। অথচ ঠাণ্ডা লড়াই প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে চলেছে। ক্যাপিটালিস্ট অর্থনীতির সঙ্গে সোশিয়ালিস্ট অর্থনীতির। দু'পক্ষকেই কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে তাঁদের ব্যবস্থাটাই উৎকৃষ্ট, অন্যদেরটা নিকৃষ্ট।

কিন্তু লড়াইটা আসলে হলো দুটো জাগতিক শক্তি জোটের। পশ্চিম জার্মানীকে একা লড়তে কেউ দেবে না, পূর্ব জার্মানীকেও না। খেলার মাঠে টীমসুদ্ধ যখন নামবে তখন দু'পক্ষেরই সেণ্টার ফরওয়ার্ড হবে জার্মান। খেলার মাঠের সেণ্টার হবে জার্মানী।

॥ আট ॥

পপিফুল দিয়ে আবৃত এই রণাঙ্গনে প্রাণশক্তির তথা ধনশক্তির উচ্ছলতা নিরীক্ষণ করে আমি একটি পথিক চমৎকৃত। আমার মন কিন্তু অত সহজে আশ্বস্ত হবে না। বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি কলকারখানা শহর ইত্যাদির পুনর্গঠন আঠারো বছরে সম্ভব, কারণ মূলধন তো অক্ষত ছিল, খনিগুলোও সচল। কিন্তু বিড়ম্বিত বিজিত বিভক্ত জনচিত্তের পুনর্গঠন আরো অধিক কালসাপেক্ষ। ভগ্নস্বপ্ন ভগ্নমোহ ভগ্নবিশ্বাস ব্যক্তিচিত্তের পুনর্গঠন কালান্তরের অপেক্ষা রাখে। কেবলমাত্র কালব্যবধানের নয়।

বন্-এর বেঠোভেন রেস্টোরাণ্টে রিসেপশন। কানে এলো আমার পার্শ্ববর্তিনী জার্মান মহিলা বলছেন তাঁর অপর পার্শ্ববর্তী জার্মান পুরুষকে, 'জার্মান সমৃদ্ধির এই রূপকথায় আমি বিশ্বাস করিনে।'

এর পরে বলছেন, 'এরা ঠাওরেছে দেশটা আমেরিকা। দেশটাকে আমেরিকা করে তুলবে। আমেরিকার ঐশ্বর্য যে কী অপরিসীম তা কি এরা জানে!'

এই প্রকাশকদুহিতা সুশিক্ষিতা ও সুবেশা। মভ রঙের পোশাকে এঁকে খুব মানায়। যদিও মধ্যবয়সিনী তবু তন্বী। ধীরস্থির অথচ স্মার্ট। এঁর পিতার কারবারে ইনিও কাজ করেন। আমেরিকায় ছিলেন কিছুকাল। অনির্দেশ্য এক বিষাদ এঁর মুখে চোখে কথাবার্তায় প্রচ্ছন্ন।

যে হৃদয়ভঙ্গকর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এঁরা সকলে গেছেন বিষাদই তার স্বাভাবিক পরিণাম। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত, পদানত, ক্ষতিপূরণের বোঝায় ভারাক্রান্ত দেশ। মুদ্রাস্ফীতি, সঞ্চয়হানি ও মন্দায় জর্জরিত দেশবাসী। সোশিয়াল ডেমোক্রাসী বা ডেমোক্রাটিক সোশিয়ালিজমের রূপকথায় বিশ্বাস করে বিশ্বাসহানি। অতিমানবিক নেতার বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি ন্যাশনাল সোশিয়ালিজমের নতুন রূপকথায় বিশ্বাস করে হাতে হাতে নগদ লাভ। অপ্রতিহত তড়িৎ দিগ্বিজয়। বিপুলসংখ্যক প্রাণ পণ করে নিষ্ঠুর জুয়াখেলা। খেলায় হেরে অর্ধেক রাজ্য হারানো। শাপে বর পশ্চিম জার্মানীর সমৃদ্ধি। অভিনব রূপকথা।

শৈশবের ও যৌবনের রূপকথায় বিশ্বাস করে যারা কেঁদেছে মধ্যবয়সের রূপকথায় বিশ্বাস করতে যদি তাদের কারো কারো অরুচি দেখি তবে আশ্চর্য হবার কী আছে! তবু আশ্চর্য হই আমেরিকার উল্লেখ শুনে। আমেরিকার হাত ধরে উঠে দাঁড়ানো দেশের অভিনব রূপকথাটা আমেরিকান সাফল্যের কাহিনী। সেই একই সাফল্য দেশে দেশে পুনরুক্ত হবে এটা বিশ্বাস করতে আমারও যেন বাধে। আমি চুপ করে থাকি।

খেতে খেতে মিস মি—পরিবেশককে কী একটা আনতে ফরমাস দিলেন। সে হাসিমুখে এনে হাজির। তিনি তা দেখে হতাশ স্বরে বললেন 'কী কাণ্ড! জার্মানীতে বসে জার্মান ভাষায় অর্ডার দেবার জো নেই। দিলে উনি বুঝবেন না।' আমার খেয়াল ছিল না যে ওয়েটারটি ইটালিয়ান। ওই একটি নয়, প্রায় সব ক'টি। শুধু এখানেই নয়, অনেক স্থলে। ইটালী কমন মার্কেটে যোগ দিয়ে জার্মানদের খানাপিনা পরিবেশন করছে।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাতে না পেরে প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন ইণ্টারনাৎসিওনেস। সেদিন বন্ থেকে কোলোন যাই সেখানকার এক বিশিষ্ট প্রকাশকের সঙ্গে চা খেতে। তাঁর ফ্ল্যাট খুঁজতে খুঁজতে আর একটা ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে পড়ি। বাপ রে বাপ! 'KU KLUX KLAN.' কেউটে সাপের গর্ত!

আমি কি তা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে? না জার্মানীর পশ্চিম অঞ্চলই এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঞ্চল? কিন্তু ইহুদী তো নেই। কাকে মারতে কামান দাগা? কালা আদমি কি এত বেশী আছে? জার্মানীকে কি নাৎসীদের কড়াই থেকে নামানো হয়েছে কিউ ক্লাক্স ক্ল্যানের আগুনে ফেলতে?

কাছেই ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বাস করেন। তাঁর ওখানে রিসেপশন। অচ্যুত মেনন ও আমি একই বছরের ফসল। আমি এখন ফসিল। তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে চিনলেন। ভিড়ের মধ্যে একটি মুখ আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। আমার বিশ্বাস ভারতীয়। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন তিনি ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত। করুণ মুখের উপর গভীর বিষাদের ছায়া। জার্মানীই তাঁর স্বদেশ। তিনি এখন নিজ বাসভূমে পরবাসী। ত্রিশ হাজারের মতো ইহুদী এখনো অবশিষ্ট আছে। তারা ও তিনি এখন ভিন্ন রাষ্ট্রের লোক। জার্মানীকে তিনি ভালোবাসেন, কিন্তু জার্মানীতে তিনি এলিয়েন।

সেখান থেকে যাই অপেরা হাউসে। তার স্টেজে যেমন অপেরা দেখানো হয় তেমনি ব্যালে। পর্যায়ক্রমে। আমার সৌভাগ্য, সেদিন ছিল বেঠোভেন রচিত একমাত্র ব্যালে, 'প্রমিথিউসের জীবসৃষ্টি'। আর সেই সঙ্গে বেলা বার্তক রচিত ব্যালে, 'বর্বরদের নৃত্য'। বেঠোভেন যে ব্যালেতেও হাত দিয়েছিলেন তা অল্প লোকেই জানে। না জানবারই কথা। কারণ কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। কোলোন অপেরা হাউসের ব্যালে সম্প্রদায় দীর্ঘকাল পরে ওটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। দুর্লভ সুযোগ।

অপেরা হাউস কিছুদিন আগে পুনর্গঠিত হয়েছে। খানদানী ব্যাপার। শহরের উচ্চতম মহল উৎকৃষ্টতম পোশাক পরে বড় বড় সিঁড়ি বেয়ে দোতলা তেতলা চার তলায় যাচ্ছেন। প্রত্যেক তলায় ঘুরে বেড়ানোর জন্যে ফয়ার। ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্যে কত রকম মূর্তি আর ছবি। গলা ভিজিয়ে নেবার জন্যে ঠাণ্ডা গরম মিঠে কড়া পানীয়। ওভারকোট বা রেনকোট জমা দেবার ব্যবস্থা। আড্ডা দেবার জন্যেও ঠাঁই আছে। আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছল। সরাসরি ভিতরে গিয়ে আসন নিলুম।

প্রমিথিউস মাটি আর জল দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। বিভিন্ন প্রাণীর কাছ থেকে তিল তিল করে বিভিন্ন গুণ আহরণ করে মানুষকে তিলোত্তম করেছিলেন। তারপর তাকে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনে দেন। তার ফলে সে কৃষি আর শিল্প আর অস্ত্রশক্তি আর জ্ঞানবিজ্ঞানে সব প্রাণীর উপরে টেক্কা দেয়। মর্ত্যলোকে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। পুরাণে এরকমও বলে যে তিনি মানুষ থেকে আরম্ভ করে সব প্রাণীকেই যার পক্ষে যেটা উপযুক্ত সেরকম আত্মরক্ষার উপকরণ দিয়েছিলেন। সেইসূত্রে নখীকে দিয়েছিলেন নখ, দন্তীকে দিয়েছিলেন দাঁত, শৃঙ্গীকে শৃঙ্গ। মানুষকে আগুন।

মানুষের হাতে আগুন পড়লে কী হতে পারে সে কথা ভেবে স্বর্গের অধীশ্বর জিউস ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। প্রমিথিউসকে বেঁধে রাখেন ককেশাস পর্বতের একটা শৃঙ্গে। সেখানে তাঁর যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় প্রতিদিন এক ঈগল। প্রতিরাত্রেই নতুন যকৃৎ গজায়। এ সাজা ততদিন চলবে যতদিন না কোনো একজন অমর প্রমিথিউসের খাতিরে আপনার অমরত্ব বিসর্জন দেয়। অবশেষে কাইরন বলে এক সেণ্টর এই কাজটি করে। তখন প্রমিথিউস উদ্ধার পান। মতান্তরে, হারকিউলিস ঈগল বধ করে জিউসের সম্মতি নিয়ে বন্দীকে মুক্তি দেন। প্রমিথিউস তেজস্বী টাইটান। মানুষের বন্ধু ও চির উন্নতশির বিদ্রোহী। কখনো ক্ষমাভিক্ষা করেননি, করুণাভিক্ষা করেননি। জীবনের দিক দিয়ে বেঠোভেনের আদর্শ পুরুষ তিনি। এই ব্যালেতে তাঁর শাস্তিপর্ব নেই। আছে শুধু সৃষ্টিপর্ব। এর নায়ক বন্দী প্রমিথিউস নন। স্রষ্টা প্রমিথিউস।

ব্যালে হচ্ছে একাধারে নাট্য আর নৃত্য আর বাদ্য। আধুনিক ব্যালে তার সঙ্গে আরো একটি অঙ্গ যোগ করেছে। চিত্রকলা। বেঠোভেনের যুগের পর দেড় শ' বছর অতীত হয়েছে। বিষয়টাও আজকাল আর ব্যালে রচনার উপযুক্ত নয়। নৃত্যের পদ্ধতিও বদলে গেছে। কোরিওগ্রাফি ও দেকর নতুন করে বিরচনের ভার নিয়েছেন একালের দুজন শিল্পী। আমরা যা পেলুম তা অবিমিশ্র বেঠোভেন নয়। তবে সঙ্গীতটা মহাশিল্পীর। আইডিয়াটাও তাঁরই।

বেলা বার্তক হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার। একালের লোক। কিছুদিন আগেও জীবিত ছিলেন। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতরচয়িতারা লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেই সম্পর্ক যাঁরা পুনরুদ্ধার করেন বার্তক তাঁদের মধ্যে প্রধান। তিনি তাকে আদর করে নিজের সৃষ্টির অঙ্কে স্থান দেন। হাঙ্গেরী ও বলকান রাজ্যগুলির লোকসঙ্গীত অপূর্ব মনোহর। বার্তক তাকে জাতে তুলে নিয়ে সকলের করে দিয়েছেন। 'বর্বরদের নৃত্য' সম্বন্ধে খোঁজ নিইনি। মনে হয় এর প্রেরণাও লোকসঙ্গীতের সুর।

দুটি ব্যালেতেই লক্ষ করলুম বিস্তর কুশীলব অংশ নিয়েছেন। তারকা বলতে কেউ নেই। আর বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতকে মঞ্চের উপরেই স্থাপন করা হয়েছে। একই সেটিং বদলে দিয়ে বার বার ব্যবহার করা হচ্ছে। পেগান ও বর্বরদের সাজসজ্জা অবশ্য একালের লোকলজ্জা বাঁচিয়ে। যেন তারা সচেতন যে সভ্য খ্রীস্টানরা তাদের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো বেশ একটু আড়ষ্টভাব তাদের হাবে ভাবে। রাশিয়ান ব্যালের সঙ্গে তুলনা করব না। সে প্রলোভন সংবরণ করছি।

॥ নয় ॥

এতক্ষণ যেন এক মায়ার জগতে ছিলুম। যবনিকা পড়তেই হুঁশ হলো যে আবার আমি বাস্তব জগতে। ব্যালে বলো, অপেরা বলো, ক্ষণকালের জন্যে আমাদের মায়ালোকে নিয়ে যায়।

অপেরা দেখার সুযোগও মিলে গেল তার পরের দিন সন্ধ্যায়। সেইখানেই। ভাগনার রচিত 'অঙ্গুরীয়' পর্যায়ের চারখানি পালার প্রথম দু'খানি ইতিপূর্বে অভিনীত হয়ে গেছে, তৃতীয়খানির অভিনয় দেখতে গেলুম। 'সীগফ্রীড' তার নাম।

আমাদের সব চেয়ে প্রিয় বীর যেমন অর্জুন জার্মানদের তেমনি সীগফ্রীড। মহাযুদ্ধের সময় 'সীগফ্রীড লাইনে'র নাম কে না শুনেছেন? সেই মহাবীর এই পালার নায়ক।

আরম্ভেই দেখা গেল বামনদের বিশ্বকর্মা মিমের কামারশালা। ঘুরতে ঘুরতে সীগফ্রীড সেখানে উপস্থিত। মিমে তাঁকে তাঁর পিতার ভাঙা তলোয়ারের টুকরোগুলো দেখায়। এমন সময় দেবরাজ ওটানের ছদ্মবেশে প্রবেশ। ছদ্মবেশী বলেন টুকরোগুলো জোড়া দিতে সে-ই পারবে যে ভয় কাকে বলে জানে না। সীগফ্রীড নির্ভীক। তার হাতে ভাঙা তলোয়ার জোড়া লাগে। এই সেই তরবারি নোটুং যার নাম। অর্জুনের যেমন গাণ্ডীব।

মিমে তাঁকে নিয়ে যায় এক গুহায়। সেখানে ফাফনার নামক দানব ড্রাগন হয়ে পাহারা দিচ্ছে সাত রাজার ধন মানিক সেই বামনদের সোনা। সীগফ্রীড তো ফাফনারকে বধ করলেনই, সেসময় ড্রাগনের রক্ত মুখে লেগে যাওয়ায় পাখিরা কী বলছে তা তিনি বুঝতে পারেন ও মিমের মতলব ভালো নয় জানতে পেয়ে তাকেও বধ করেন। পাখিরাই তাঁকে বলে দেয় দেবকন্যা ব্রুনহিল্ডা

কোথায় ঘুমিয়ে। আগুন দিয়ে ঘেরা সেই ঘুমন্ত ভালকীরীকে তিনি জাগান। তারপর তাঁদের পরিণয়।

ব্যালে যেমন নৃত্যাভিনয় অপেরা তেমনি গীতাভিনয়। কথামাত্রেই গীত। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বাজছে। যেমন ব্যালেতে তেমনি অপেরায়। তার জন্যে অর্কেস্ট্রা মজুত। চিত্রকলাও এর মধ্যে একটু স্থান করে নিয়েছে। মঞ্চসজ্জায় চিত্রশিল্পীর কল্পনা রূপ ধরে। যতদূর মনে পড়ে অপেরায় আমি পুরোনো ধরনের দৃশ্যপট দেখলুম।

অপেরার আবেদন চোখের চেয়ে কানের কাছেই বেশী। অ্যাকশন বলতে বিশেষ কিছু নেই। গল্প একটা আছে, সেটা গানে গানে বলা হয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা বা শ্রোতারা তাকে তন্ময় হয়ে গ্রাস করছেন। এমন অভিনিবেশ আমি দেখিনি। সেদিন প্রত্যেকটি আসন পূর্ণ। ভাগনার যে কী জনপ্রিয় তা মাঝে মাঝে অনুভব করছিলুম সমবেত তারিফ থেকে। বিষয়গুণেই হোক বা সঙ্গীতের গুণেই হোক সবাই একপ্রকার একাত্ম বোধ করছিলেন।

'সীগফ্রীড' যেন তাঁদের মনের মানুষ আর ভাগনার যেন হৃদয়বীণার বীণকার। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কেও বাজিয়ে চলেছেন।

সেদিন এই অপূর্ব উপলব্ধিটি আমার হতো না, যদি অপেরায় না গিয়ে থিয়েটারে যেতুম। সংস্কৃতি দপ্তরের ডক্টর গেরোল্ড আমাকে বলেছিলেন 'অ্যানডোরা' দেখতে। দেশে থাকতেই 'অ্যানডোরা' নাটকের নাম শুনেছিলুম, কিন্তু তার গুরুত্ব আমি অনুমান করতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করে 'অ্যানডোরা'র টিকিট পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে নেহাত বরাতের জোরে 'সীগফ্রীডে'র শেষ দু'খানি টিকিট পাওয়া গেছে, হাতের পাখিকে হাতছাড়া করতে ইচ্ছা ছিল না। জার্মানরা যে ভিড় করে 'অ্যানডোরা' দেখছে এটা সুলক্ষণ।

'অ্যানডোরা' একটি কাল্পনিক দেশ। সে দেশের এক অধ্যাপক একটি বালককে পুত্রস্নেহে পালন করেছিলেন। লোকে জানত যে সে ইহুদী ও অনাথ। বালকটিরও ধারণা তাই। একদিন নাৎসীরা এসে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে যায় ও হত্যা করে। তা শুনে অধ্যাপকেরও প্রাণবিয়োগ হয়। আসলে তিনিই ছিলেন তার জনক। কিন্তু পরিবারের কাছ থেকে প্রকৃত পরিচয় গোপন করতে হয়েছিল।

জার্মানদের মনের কাবার্ডে একটি কঙ্কাল আছে। সেটি ওই নাটকের নাটকীয়তার নিদান। ইহুদীরা জার্মান জাতির পালিত পুত্র। এই কোলোন শহরেই তারা রোম সম্রাটের সনদ নিয়ে বাস করতে আসে চতুর্থ শতাব্দীতে। সেই শতাব্দীতেই কোলোন হয় খ্রীস্টীয় বিশপের পীঠ। রাইন নদের পুবদিকে তখনো খ্রীস্ট ধর্মের প্রসার হয়নি। সারা জার্মানী খ্রীস্টান হতে আরো তিন শতাব্দী লেগে যায়। ষোল শ' বছর একই দেশে সহ-অবস্থান করার পর দেখা গেল যে ইহুদীরা মনোবাক্যে জার্মান হয়ে গেলেও কায়ায় জার্মান হয়ে যায়নি ও যাবে না। আর জার্মানরা ওটুকু স্বাতন্ত্র্য সহ্য করবে না। বলা বাহুল্য জার্মানরা সকলে একমত নয়। বহু জার্মান ছিল ও আছে যারা নাৎসীদের মতো রক্তান্ধ নয়, রক্তপার্থক্যের দরুন রক্তপাতে বিশ্বাসী নয়। সকলে রক্তান্ধ হলে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগের বিভীষিকার জন্যে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে বাঁচিয়ে রাখত না, বাড়তে দিত না। তার চেয়ে বড় কথা কেউ যীশুখ্রীস্টের ভক্ত হতো না, মা মেরীকে পূজা করত না। ওঁরাও তো রক্তে ইহুদী। ইহুদীরা যে এতকাল ধরে এতবেশী সংখ্যায় ছিল ও এত উন্নত অবস্থা লাভ করেছিল এর থেকে প্রমাণ হয় যে রক্তের পার্থক্য নিয়ে আগেকার দিনে এ পরিমাণ অন্ধতা ছিল না।

এটার সূচনা গত শতাব্দী থেকেই। জাতীয়তাবাদের উদার ব্যাখ্যা অনুসারে জার্মানীবাসী ইহুদীরাও জার্মান। সকলের সঙ্গে সমান অধিকারী। শহরের এক কোণে আর তাদের ghetto নশীন করে রাখা চলে না। প্রতিযোগিতার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আর তাদের প্রবেশ নিষেধ করা যায় না।

প্রতিযোগিতায় তাদের সঙ্গে না পেরে অগত্যা জাতীয়তাবাদেরই একটা সংকীর্ণ রক্তগত সংজ্ঞা নিরূপণ করে তাদের সেই অজুহাতে বঞ্চিত করতে হয়। যারা আর্য নয় তারা দেড় হাজার বছর জার্মানীতে বাস করলেও জার্মান নয়, সুতরাং সম অধিকারী নয়। শেষপর্যন্ত দেখা গেল তারা প্রাণধারণেরও অধিকারী নয়।

অপর পক্ষে এটাও মনে রাখতে হবে যে ইহুদী জায়নিস্টদের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞাও একই রকম সংকীর্ণ রক্তগত। তাদের মতে ইহুদীরা স্বতন্ত্র এক নেশন, তাদের পক্ষে অপর নেশনের সামিল হয়ে বাস করা কষ্টকর, তাদের নিজস্ব একটা ন্যাশনাল হোম চাই, প্যালেস্টাইনই তাদের চিরকালের জাতীয় বাসভূমি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জায়নিস্টদের সাহায্যের বিনিময়ে ইংলণ্ড কথা দেয় যে প্যালেস্টাইনে ন্যাশনাল হোম সংস্থাপন করা হবে। তাই জায়নিস্টদের কাম্য হয় ইংলণ্ডের জয়, জার্মানীর পরাজয়। জার্মানীর ইহুদীরা তখন থেকেই জায়নিস্ট বলে সন্দেহভাজন হয়। যুদ্ধোত্তর জগতে জায়নিস্টদের প্রভাব যতই বাড়ে জার্মানীতে ইহুদীদের উপর সন্দেহও ততই বাড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও জায়নিস্টদের কাম্য মিত্রপক্ষের জয়, জার্মান পক্ষের পরাজয়। তখন জার্মান ইহুদীদের উপর সন্দেহ চরমে ওঠে। জায়নিস্ট ও নাৎসী দু'পক্ষই রক্তান্ধ। তা বলে সব ইহুদী জায়নিস্ট নয়, যেমন সব জার্মান নাৎসী নয়।

ডক্টর গেরোল্ডের কণ্ঠস্বরে ইহুদীদের প্রতি আন্তরিক দরদ ছিল। নাৎসীদের প্রতি ছিল আন্তরিক বিরাগ। জার্মানরা তাদের সাময়িক অন্ধতা কাটিয়ে উঠেছে। আবিষ্কার করেছে তাদের অজ্ঞাতসারে কী অমানুষিক কাণ্ডই না সংঘটিত হয়েছে। পলাতক ইহুদীদের হয়তো ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু হিটলার যাদের পরপারে পাঠিয়েছে তাদের আর ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। তাদের কঙ্কাল চিরকালের মতো মনের কাবার্ডে তোলা রইল।

এই নিয়ে আরো একখানা বিখ্যাত নাটক লেখা হয়েছে। তার নাম 'প্রতিনিধি'। এক রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী ইহুদীদের সমূলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে দেখে বিবেকের জ্বালায় অস্থির হন। কোথাও কোনো প্রতিকার না পেয়ে তিনি সরাসরি রোমে চলে যান ও পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পোপ হলেন খ্রীস্টের প্রতিনিধি। তিনি অন্তত একটিবার প্রতিবাদ করবেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কিছুই করলেন না। হতাশ হয়ে ক্যাথলিক পাদ্রী বন্দী ইহুদীদের সঙ্গে বধ্যস্থান আউশভিৎসের শিবিরে গিয়ে হাজির হন। সেখানে ইহুদী হত্যার প্রতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হন। তিনিই হলেন সত্যিকার খ্রীস্টান। আর 'প্রতিনিধি' বলে যাঁর অভিমান তিনি তা নন। বলাবাহুল্য এ নাটক প্রোটেস্টান্টের লেখা। তা সত্ত্বেও লেখককে চাকরি ছেড়ে সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে নিরাপদ হতে হয়েছে। হকহুট তাঁর নাম। ভাগ্যিস হাতের কাছে সুইটজারল্যাণ্ড বলে একটি রাজ্য আছে। 'অ্যানডোরা'র লেখক ম্যাক্স ফ্রিশ সে রাজ্যের নাগরিক।

॥ দশ ॥

আগেকার দিনে রাইনের বক্ষে স্টীমারযাত্রা করেছি দু' বছরে দু'বার। এবারেও করতুম, কিন্তু সময় পেরিয়ে গেছে। রাইন বিহারের সে আনন্দ আমি পাব কোথায়? দু'দিকে গিরিদুর্গের পর গিরিদুর্গ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। কাব্যবর্ণিত। কিংবদন্তী-আশ্রিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে রূপকথামিশ্রিত।

রাইনের কোলে স্টীমারযাত্রা তো হলো না। তার বদলে হলো রাইনের কূল দিয়ে সমান্তরাল ভাবে মোটরযাত্রা। মধুর অভাবে গুড়।

না, না, গুড় কেন হবে? মধু, মধু, মধু। শরৎ তখনো শেষ হয়ে যায়নি, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ প্রভাত, নির্মল আকাশ। বনস্পতি মহলে পাতা ঝরানোর পালা চলেছে, কিন্তু ডালপালা রিক্ত নয়। কয়েকটি চিরসবুজ তরু বাদ দিলে আর সকলের পাতা মলিন। শীতের পদধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু আমার মতো শীতকাতুরে লোকেরও শীত করছে না।

এমন ঋতুতে আমাদের দেশের রাজারা দিগ্বিজয়ে বেরোতেন। আমি বেরিয়েছি লাকের সী হ্রদের ধারে মারিয়া লাক মোনাস্টেরি দর্শনে। রাইনের পশ্চিম পাড় ধরে দক্ষিণ মুখে যেতে হয় বেশ কিছু দূর। তার পর রাইনের দিকে পিছন ফিরে ডান দিকে বেঁকে যেতে হয়। পশ্চিমে, আরো পশ্চিমে। পাহাড়ী অঞ্চলে।

রাইনতটের গিরিদুর্গ যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। কিন্তু অবিকল তেমনি নয়। অনেকগুলোতেই বিদেশী রাষ্ট্রদূতাবাস, সুতরাং আধুনিকতার স্পর্শ। বাড গোডেসবার্গ একদা হিটলারের আস্তানা ছিল। এখন সেখানে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অধিষ্ঠান। এই পরিবর্তনটা তাৎপর্যপূর্ণ। আমেরিকার রাষ্ট্রদূত যদি রাজার হালে থাকেন তো ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতই বা কেন প্রজার হালে থাকবেন? তিনি থাকবেন লর্ডের হালে। রুশ রাষ্ট্রদূত, ফরাসী রাষ্ট্রদূত এঁরাও থাকেন গ্র্যাণ্ড স্টাইলে। এঁদের শৈলাবাসের কাছাকাছি একস্থানে আডেনাউয়ারের শৈলাবাস। আমার জার্মানী পৌঁছনোর আগের দিন ছিল আডেনাউয়ারের অস্তাচলযাত্রা। এরহার্ডের যেদিন উদয় সেইদিন আমার ফেরা।

যেতে যেতে দেখি একটা ভাঙা পুল। হটে যাবার সময় জার্মান সৈন্য এটা ভেঙে দিয়ে যায়। তখন মার্কিন সৈন্য রাতারাতি আর-একটা পুল তৈরি করে কাছেই এক জায়গায় রাইন পার হয়। এককালে রাইন নিজেই একটা সামরিক লাইন ছিল। সেই লাইন পাহারা দেবার জন্যেই অতগুলো গিরিদুর্গ। সে যুগ আর নেই, সেইজন্যে আরো পশ্চিমে লাইন নির্মাণ করতে হয়। সীগফ্রীড লাইন। দুর্ভেদ্য বলে তার খ্যাতি। প্রথম মহাযুদ্ধে কেউ তাকে অতিক্রম করেনি। করার আগেই যুদ্ধবিরতি হয়। এবার সে লাইন তো অতিক্রান্ত হলোই, রাইনও অতিক্রান্ত হলো। ঝড়ের মুখে খড়ের মতো উড়ে গেল হিটলারের ফৌজ।

জার্মানরা হয়তো আবার লড়বে, কিন্তু সীগফ্রীড লাইনের দুর্ভেদ্যতার প্রবাদ চিরকালের মতো গেছে। পশ্চিম ফ্রন্টে আর কোনো দিন লড়াই হবে না। সে মনোভাবও আর নেই। ফ্রন্ট যদি হয়' একটাই হবে। পূর্ব ফ্রন্ট। পশ্চিমের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানী এখন পশ্চিম ইউরোপ বলে একটি বৃহত্তর সংগঠনের অভিমুখে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছে। ন্যাশনালিজম এখনো প্রবল, তাই কেউ জোর করে বলতে পারে না যে ফরাসীতে জার্মানে আর কোনো দিন স্বার্থের সংঘাত বাধবে না। বা ইংরেজে জার্মানে। কিন্তু ক্যাপিটালিজম তার চেয়েও প্রবল। এখন তো সাম্রাজ্য নেই যে ইংলণ্ড বা ফ্রান্স অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে পারবে। স্বাচ্ছন্দ্যের মান উন্নত রাখতে হলে ও সার্বজনীন করতে হলে প্রতিবেশীর সঙ্গেই একতাবদ্ধ হতে হবে। কমন মার্কেটে যোগ দেবার জন্যে ব্রিটেন ব্যাকুল। ফ্রান্স তাতে বাদ সাধছে তার প্রধান কারণ ইংলণ্ডের হাইড্রোজেন বোমা আছে, ফ্রান্সের নেই।

মজা এখানেই যে জার্মানরা এবার হেরে গিয়েও জিতেছে। অর্থনীতির নতুন বিন্যাস যদি পশ্চিম ইউরোপের একত্বনির্ভর হয় তবে পশ্চিম জার্মানীই হবে সর্বপ্রধান অংশীদার। সেদিন গেরোল্ড বললেন, 'দুঃখ শুধু এই যে পূর্ব জার্মানীর লোক দুঃখ পাচ্ছে। তাদের দুঃখ আমরা ভুলতে পারছিনে।' একথা মনে হলে মজা আর মজা নয়। সাজা। তা হলে বলতে হয় জার্মানরা হেরে গিয়ে

একদিক থেকে জিতেছে, আরেকদিক থেকে মহাবিপদে পড়েছে। অবশ্য অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক বিন্যাস যদি কাম্য হয়, যদি স্থায়ী হয়, তবে পূর্ব জার্মানীব মহাবিপদটাই মহাসুযোগ। সমাজতান্ত্রিক পুনর্বিন্যাস তো বিনা অশ্রুপাতে হবার নয়। পূর্ব ইউরোপ বলে আরো একটা বৃহত্তর সংগঠনও কি গড়ে উঠছে না? তাতে পূর্ব জার্মানীর অংশ সর্বপ্রধান না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বসম্পন্ন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি সব জার্মানের পক্ষে সমান করুণ হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি তা নয়। এবার একযাত্রায় পৃথক ফল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ কি ধনতন্ত্র বিস্তার করবে না সমাজতন্ত্র বিস্তার করবে? পূর্ব জার্মানীকে নীল করে দেবে না পশ্চিম জার্মানীকে লাল করে দেবে? কেউ ঠিক জানেন না। সকলেই আঁধারে পরমাণুর ঢিল ছুঁড়ছেন। আপাতত মনে মনে। তবে ইতিমধ্যে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার পারমাণবিক ব্যাপারে একটা সমঝোতা হয়ে যাওয়ায় জার্মানরা একটু বেকায়দায় পড়ে গেছে। পূর্ব জার্মানী সই করেছে শুনে পশ্চিম জার্মানী প্রথমটা বিমুখ হয়েছিল, তার পর কী একটা গৌরচন্দ্রিকা করে শেষপর্যন্ত স্বাক্ষর দেয়। ফরেন অফিসের ভদ্রলোক বললেন, 'যুদ্ধ করতে কে চায়? শান্তিপূর্ণ সমাধানই আমরা চাই। তা বলে পূর্ব জার্মানীর ওটা কি একটা গবর্নমেণ্ট? ওর সঙ্গে আমরা কথা বলব কী করে?'

জার্মানী নামক রাষ্ট্র যে ইউনাইটেড নেশনসের সভ্য নয় এর জন্যেও চাপা আফসোস লক্ষ করি। 'জানেন তো আমরা ইউনাইটেড নেশনসে নেই।' কেন নেই, তার কারণ এই শুনি যে পশ্চিম জার্মানী তার সভ্য হতে চাইলে পূর্ব জার্মানীও তার সভ্য হতে চাইবে। ফলে দুই জার্মানী স্বীকার করে নেওয়া হবে। ঐক্যের আশা লোপ পাবে। তার চেয়ে ইউনাইটেড নেশনসে নাই বা যোগ দেওয়া গেল।

যতই দিন যাবে ততই দুর্বহ হবে এক জাতি এক রাষ্ট্র ফিরে পাবার আশায় জাতিসঙ্ঘের থেকে দূরে সরে থাকা। যেখানে গড়ে উঠছে এক মানবজাতি ও এক বিশ্বরাষ্ট্র সেখানে জার্মানীর কণ্ঠস্বর নেই, হাত নেই, এটা বিসদৃশ।

॥ এগারো ॥

পথের একধারে পাহাড়ের গায়ে দ্রাক্ষার ক্ষেত। ধাপের পর ধাপ। তখনো গাছে ফল ছিল। এর থেকে হবে রাইন মদ। পথের অন্য ধারে রাইন নদ।

ডান দিকে মোড় ঘোরার পর দু'ধারেই পেলুম চাষের জমি। মাঝে মাঝে গ্রাম। একটা তেপান্তরের মাঠ ঘিরে নিয়ে তৈরি হচ্ছে হেলিকপ্টার। হাস্যকর চেহারা নিয়ে গোটাকয়েক দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে পার্বত্য হ্রদ। লাকের সী। হ্রদ বা সায়র। পাঁচ মাইলের মতো এর পরিধি। চতুর্দিকে পাহাড়। এক কোণে একটি মঠ। হাজার বছরের পুরোনো। যাঁদের মঠ তাঁরা বেনেডিক্টিন সম্প্রদায়ের রোমান ক্যাথলিক সাধু। মধ্যে কিছুদিন তাঁদের মঠ রাজার দখলে যায়। তার পর জেসুইটদের হাতে পড়ে। গত শতাব্দীর সেই ভাগ্যবিপর্যয় কাটিয়ে উঠে মঠবাড়ি আবার প্রতিষ্ঠাতা সাধুমণ্ডলীর অধিকারে আসে। মা মেরীর নাম অনুসারে নাম মারিয়া লাক।

সাধনার পক্ষে অতি নিভৃত স্থান। সন্ন্যাসীদের রুচির প্রশংসা না করে পারিনে। রবিবার বলে

বহু দর্শনার্থী এসেছেন। মঠের গির্জায় প্রভাতী আরাধনা চলেছে। ক্যাথলিকদের গির্জা শুধু দর্শনের জন্যে নয়। যাঁরা এসেছেন তাঁরাও বোধহয় ক্যাথলিক। তাঁরাও যোগ দিয়েছেন। আমরা আরাধনায় ব্যাঘাত করতে চাইলুম না। একটু ঘোরাফেরা করে দেখলুম। তার পর প্রস্থান।

কোলোনের ক্যাথিড্রালেও আরাধনা লক্ষ করেছি। সান্ধ্য আরাধনা। সেখানেও আরাধকদের সমাগম। ক্যাথলিকদের ধর্মভাব রাষ্ট্রের পোষকতার অপেক্ষা রাখে না। সে যুগ গেছে। এসব মঠবাড়ি গির্জা ও ক্যাথিড্রাল ক্যাথলিকদের নিজেদের দাক্ষিণ্যে চলে। সে কথা প্রোটেস্টাণ্টদের বেলাও খাটে। পশ্চিম জার্মানীতে দুই খ্রীস্টীয় শাখার জনবল প্রায় সমান সমান। সমাজিক কাজকর্মে উভয় শাখার সমান উৎসাহ। দুই শাখার সমাজকর্মীদের একসঙ্গে ধরলে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা তিন লাখ, বেতনভুকের সংখ্যা দু'লাখ। অধিকাংশ কিণ্ডেরগার্টেন ও youth home এঁরাই চালান।

ক্যাথলিক সঙ্ঘ যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সকলেই সন্ন্যাসী। ক্যাথলিক সমাজে সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছুক বালকের কোনো দিন অভাব হয়নি। যেদিন হবে সেদিন এ সঙ্ঘ আপনি ভেঙে পড়বে। এ রকম একটা ভীতি আছে বলেই ক্যাথলিকরা সেকুলার শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষপাতী নন। ক্যাথলিকদের আলাদা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। সেসব প্রতিষ্ঠানে অপর ধর্মের ছাত্রদেরও নেওয়া হয়। কিন্তু আসল কাজ হলো এমন কতকগুলি ছেলে তৈরি করা যারা পরে সঙ্ঘ পরিচালনা করবে, নয়তো ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ হয়ে সঙ্ঘকে সাহায্য করবে। সন্ন্যাসিনীর জন্যেও ক্যাথলিক সঙ্ঘে স্থান আছে।

ক্যাথলিকদের সঙ্গে প্রোটেস্টাণ্টদের তত্ত্বঘটিত বিরোধ অতি গভীর। তা ছাড়া যীশুজননীকে, সন্তদেরকে, সন্ন্যাসীদেরকে, পোপকে যেমন ক্যাথলিকরা ভক্তি ও মান্য করেন প্রোটেস্টাণ্টরা তেমন করেন না। প্রোটেস্টাণ্ট সঙ্ঘ সন্ন্যাসীশাসিত নয়। তার যাঁরা পরিচালক তাঁরা ইচ্ছা করলে বিবাহ করতে ও গৃহস্থ হতে পারেন। সংসারত্যাগের উপরে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা নয়, তার অস্তিত্বের জন্যে একদল ছেলেকে সন্ন্যাসের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হয় না। প্রোটেস্টাণ্টদের নিজেদের একটা শিক্ষাব্যবস্থা আছে, সেটাতে অপরের প্রবেশ আছে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমই তাদের লক্ষ্য।

রেফরমেশন জার্মানীতে ও তার সংলগ্ন ভূমিতেই প্রথম মাথা তোলে। বিদ্রোহের একটা কারণ তো গুরুর একাধিপত্য। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ল্যাটিন ভাষাকেই ধর্মকর্মের ও শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র বাহন করে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সর্বসাধারণের উপর রাখালগিরির নড়ি তুলে দেওয়া। বাইবেলে কী আছে সাধারণকে তা জানতে দেওয়া হবে না। তার যে ভাষ্য প্রভুরা দেবেন সেই ভাষ্যই একমাত্র প্রমাণ। তার বাইরে যা আছে তা তো অপাঠ্য। সংস্কারকদের দাবী জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে হবে। লুথার তাঁর অনুবাদকর্মের দ্বারা জার্মানভাষার পুষ্টিসাধন করেন। লুথারের হাই জার্মান আজ অবধি জার্মানীর সাধুভাষা। বহু উপভাষায় বিভক্ত জার্মানভাষাকে লুথার যে ঐক্য দিয়ে যান সে ঐক্য জার্মানীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তকে আজকের দুর্দিনেও একসূত্রে গেঁথেছে। একটু একটু করে ল্যাটিনকে আসনচ্যুত করা হয়। সুতরাং জাতীয়তাবাদের সঙ্গে প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করতে করতে মানুষের মন অন্যরকম হয়ে যায়।

ত্রিশ বছরের যুদ্ধের সময় বিরোধটা রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। বহু মোনাস্টেরি ও তার জন্যে উৎসৃষ্ট সম্পত্তি প্রোটেস্টাণ্ট সামন্ত রাজারা বাজেয়াপ্ত করেন। সম্রাট তাঁদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না। যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন মাথার উপরে নামমাত্র একজন সম্রাট থাকলেন আর সামন্তরা এক একজন স্বাধীন রাজার মতো ক্ষমতা ভোগ করলেন। তাঁদের মধ্যে ক্যাথলিক রাজা ও রাজশক্তিবিশিষ্ট ক্যাথলিক বিশপও ছিলেন।

রেফরমেশন ও কাউন্টার-রেফরমেশন জার্মানীকে যেমন দু'ভাগ করে দেয় তেমনি রোমকেন্দ্রিক ইউরোপকে দ্বিধাবিভক্ত। ইউরোপের অন্যান্য দেশ হয় একপক্ষে না হয় অপরপক্ষে যোগ দেয়, কিন্তু জার্মানী পড়ে যায় দু'পক্ষে। তার এক পা ক্যাথলিক শিবিরে, আরেক পা প্রোটেস্টাণ্ট শিবিরে। এই দোটানা ইংলণ্ডের বা ফ্রান্সের ছিল না। ইংলণ্ড পুরোপুরি প্রোটেস্টাণ্ট গোষ্ঠীতে। ফ্রান্স পুরোপুরি ক্যাথলিক গোষ্ঠীতে। জার্মানীর আধখানা এ গোষ্ঠীতে, আধখানা ও গোষ্ঠীতে। বিদেশী প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে ক্যাথলিকদের লড়াইয়ের সময় দেখা যায় দু'পক্ষেই জার্মান সৈন্য। পরের জন্যে জার্মান লড়ছে জার্মানদের সঙ্গে। আবার পরও এসে লড়ছে জার্মানদের হয়ে জার্মানদের সঙ্গে।

নেপোলিয়নের কাছে হেরে যাবার পর জার্মানরা হৃদয়ঙ্গম করে যে এক হতে হবে। কিন্তু এক হওয়া বলতে যদি বোঝায় প্রোটেস্টাণ্ট ক্যাথলিক নির্বিশেষে একই ধর্মসঙ্ঘ গড়ে তোলা তা হলে সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। ধর্মসঙ্ঘ চিরকালের মতো দু'ভাগ হয়ে গেছে। তা হলে এক হওয়া বলতে বোঝায় প্রোটেস্টাণ্ট ক্যাথলিক নির্বিশেষে একই রাষ্ট্র গঠন। বাধ্য হয়ে জার্মানরা তারই উপরে জোর দেয়। সঙ্ঘের কাছে একদা লোকে যে শক্তি, যে মহিমা, যে প্রেরণা লাভ করেছিল সঙ্ঘশক্তি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ায় সঙ্ঘের কাছে আর সেসব আশা করে না। তাদের আশা রাষ্ট্রকেই ঘিরে তারই মধ্যে সঙ্ঘের সংহতি অন্বেষণ করে। অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র নিতান্তই রাষ্ট্র। জার্মানীতে রাষ্ট্র প্রায় ঠাকুরদেবতা। অন্যান্য দেশের লোক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। জার্মানদের ঐতিহ্য অন্যরূপ।

ঐক্যভাবনা একান্তভাবে রাষ্ট্রকেই আশ্রয় করে, অথচ সবাই মিলে একমত হয়ে এক রাষ্ট্র গঠন করার উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। অস্ট্রিয়া ক্যাথলিক, তার সম্রাটের অধিকাংশ প্রজা অজার্মান। প্রাশিয়া প্রোটেস্টাণ্ট, তার রাজা অস্ট্রিয়ার সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাট সারা জার্মানীর সম্রাট পদ ত্যাগ করেছিলেন। 'হোলি রোমান সাম্রাজ্য' নেপোলিয়নের আঘাতে ভেঙে যায়। কিছুদিন কনফেডারেশন করেও ঐক্যের স্বাদ পাওয়া যায়নি। তর্কটা দাঁড়ায় গিয়ে এইখানে যে অস্ট্রিয়া যদি জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চায় তো অজার্মান রাজ্যগুলির মায়া কাটাক। আর নয়তো জার্মানীর মায়া কাটাক। তার মানে অস্ট্রিয়া হবে অজার্মানবঞ্চিত অথবা জার্মানী বহির্ভূত। অস্ট্রিয়া কিন্তু অজার্মানদেরও ছাড়বে না, স্বেচ্ছায় জার্মানী থেকেও নড়বে না। এ সমস্যার সমাধান হবে কী করে?

হবে গায়ের জোরে। বিসমার্ক অস্ট্রিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে জার্মানী থেকে বহিষ্কার করেন ও প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীকে এক করেন। প্রাশিয়ার রাজা হন জার্মান সম্রাট। ওটা অবশ্য শিবহীন যজ্ঞ। অস্ট্রিয়া ওতে নেই। ফলে ক্যাথলিক যারা থাকে তারা সংখ্যালঘু। বিসমার্ককে তারা জ্বালায়। সংখ্যালঘু হলেও ক্যাথলিকদের সেণ্টার পার্টি কাইজারের পতনের পরেও প্রভাবশালী ছিল। এমন একদিন আসে যেদিন অস্ট্রিয়ার এক ক্যাথলিক বংশের ছেলে জার্মানীর সর্বময় কর্তা হয়ে বসে। ততদিনে অস্ট্রিয়ার অজার্মানরা স্বাধীন হয়ে গেছে। অস্ট্রিয়াকে জার্মানীর ভিতরে আনতে সেদিক থেকে বাধা নেই। কিন্তু তার সম্মতি চাই। গায়ের জোরে বিসমার্ক তাকে বহিষ্কার করেছিলেন, গায়ের জোরে হিটলার তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে আসেন। তারপর চেকোস্লোভাকিয়া স্বতন্ত্র হবার সময় তার মধ্যে কিছু জার্মানও পড়েছিল। তাদের অঞ্চলটাকে জোর করে টেনে আনতে গিয়ে আস্ত চেকোস্লোভাকিয়াটাকেই গ্রাস করা হয়। দেখা যায় যে অজার্মানে হিটলারের আপত্তি নেই, যদি তারা হয় জার্মানদের দাস।

এক রাষ্ট্র বানাতে চাওয়া কিছু মন্দ কথা নয়, কিন্তু গায়ের জোরে একে তাড়িয়ে দেওয়া ওকে

ধরে আনা তাকে দাস করে রাখা নিশ্চয়ই মন্দ। ইতিহাসের মারে আবার দু'খানা হলো দেশ। তিনখানাও বলা যায়, কারণ অস্ট্রিয়া আবার আলাদা হয়েছে। সেবার প্রোটেস্টান্টে ও ক্যাথলিকে মিলে যা করেছিল এবার কমিউনিস্টে ও নাৎসীতে মিলে তাই করেছে। জার্মানীর এক পা এখন ক্যাপিটালিস্ট শিবিরে, আর এক পা কমিউনিস্ট শিবিরে। কী করে ঐক্য ফিরে পাওয়া যায় এই হলো সর্বপ্রধান সমস্যা। গায়ের জোরে না সম্মতি নিয়ে? সম্মতিও সহজ নয়, কারণ ওপারের কমিউনিস্টরা নাছোড়বান্দা। তাদের পিছনে রাশিয়া।

॥ বারো ॥

মারিয়া লাক দেখে ফিরে আসার সময় আবার রাইনের সঙ্গে দেখা। কতবার তো দেখলুম। আর কেন? তবু বন্ থেকে বিদায় নিয়ে স্টুটগার্টের ট্রেন ধরার আগে আরো একবার রাইনের উপর চোখ বুলিয়ে নিলুম। হোটেলের ওপাশে যে প্রোমেনাড সেখানে সেদিন পদচারণিকদের ভিড়। রবিবারের বিকেল। আমরাও পায়চারি করতে করতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলুম।

হঠাৎ দেখি ট্যাক্সি ড্রাইভার ছুটে আসছে। কী ব্যাপার! 'আপনাদের কোথায় না খুঁজেছি? আসুন, আর সময় নেই।' এই বলে পকেট থেকে ছোট একটা টাইমটেবল বার করে। তাতে যা লিখেছে তা পড়ে শোনায়। আমরা একটু আশ্চর্য হই। আমাদের ধারণা ছিল আমাদের ট্রেনের টাইম আরো বিশ মিনিট পরে।

ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে তর্ক করা চলে না। অগত্যা রাইনের কাছ থেকে ঝপ করে বিদায় নিয়ে খপ করে ট্যাক্সিতে উঠে বসি। সে তখন এমন জোরে ট্যাক্সি চালায় যে সামনে লাল সিগনাল দেখলেও থামে না। কলিসনের ভয়ে আমরা জড়সড়। 'বেঘোরে বেহারে চড়িনু এক্কা।' বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে যথাসময়ে পৌঁছে দেয় সে ঠিক, কিন্তু স্টেশনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে 'যথাসময়ে'র তখনো বিশ মিনিট দেরি। ড্রাইভার তো অপ্রস্তুত। টাইমটেবল পড়তে ভুল করেছিল। ভুলের মাশুল যে আমাকে দিতে হয়নি এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

জার্মানদের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে ওরা 'নিষেধ' দেখলে নির্বিচারে মান্য করে। এই ড্রাইভারটি আমার খাতিরে তার জাতীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করেছে। এ প্রসঙ্গে একটা খোশগল্প মনে পড়ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে একদল বিপ্লবী জার্মান বার্লিনের রাজভবন দখল করার জন্যে মার্চ করে যাচ্ছে। সময় বাঁচে যদি তারা প্রাসাদ সন্নিহিত লনের উপর দিয়ে হাঁটে। কিন্তু ঐ যে লেখা আছে, 'ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটা নিষেধ'! একজনেরও খেয়াল হলো না নিষেধটা রাজার, যাঁকে তারা উচ্ছেদ করতে যাচ্ছে। সময়ই তো বিপ্লবের সারকথা। লম্বা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্রতিপক্ষ তৈরি হবার সময় পায়। বিপ্লবীদের ছত্রভঙ্গ করে। বিপ্লব সে যাত্রা ঘটে না।

সে কাইজারও নেই, সে জার্মানীও নেই। সে জার্মানীকে যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল সে প্রাশিয়াও নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানী নামে দু'দুটো রাষ্ট্র দেখা দেয়, কিন্তু প্রাশিয়া নামে যে রাজ্যটা ছিল তার পাত্তা মেলে না। পশ্চিম জার্মানীতে তার জায়গা নিয়েছে পাঁচ ছয়টি প্রদেশ বা 'লাণ্ড'। প্রত্যেকটি স্বশাসিত। কোলোন বন্ যার অন্তর্গত তার নাম রাখা হয়েছে 'নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালিয়া'। এর দক্ষিণে 'রাইনল্যাণ্ড পালাটিনেট'। যার ভিতর দিয়ে আমি মোটরে করে ঘুরে এসেছি। আবার

তারই ভিতর দিয়ে রেলপথে যাচ্ছি। যেখানে যাব সেটা কিন্তু প্রাশিয়ার অঙ্গ ছিল না। বাডেন আর ভুর্টেমবার্গ এই দুই স্বতন্ত্র রাজ্য এখন একটাই প্রদেশ হয়েছে। স্টুটগার্ট তার রাজধানী।

প্রাশিয়ার অন্যান্য খণ্ড অধুনা অন্যান্য নামে পূর্ব জার্মানীতে, পোলাণ্ডে ও সোভিয়েট অধিকারে বিক্ষিপ্ত। যে রাজ্য একদিন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল সেই আজ ছিন্নভিন্ন বিলুপ্ত। জার্মানী আবার এক হতে পারে কিন্তু প্রাশিয়া আর ফিরবে না। একাধিপত্য ও সামরিকতা ছিল প্রাশিয়ার ঐতিহ্য। জার্মানীর ঐতিহ্য নয়। কিন্তু প্রাশিয়ার প্রভাবে হয়ে দাঁড়ায় জার্মানীরও ঐতিহ্য। ডান হাত যা দেয় বাঁ হাত তা কেড়ে নেয়। ঐক্য থেকে জার্মানীর অসামান্য শক্তি ও সমৃদ্ধি। একাধিপত্য ও সামরিকতা থেকে জার্মানীর পরাজয় ও বিভাজন। প্রাশিয়া যেন একটা স্টীম রোলারের মতো জার্মানীর বুকের উপর চেপে রয়েছিল। জার্মানীকে দিয়েছিল স্টীম রোলারের মতো সমভূম করা ঐক্য। সে স্টীম রোলারও নেই, সে সমভূম করা ঐক্যও নেই। পক্ষান্তরে অস্ট্রিয়া যে ঐক্য দিয়েছিল সেটা ছিল বিকেন্দ্রীকৃত ও শিথিল। একাধিপত্য ও সামরিকতা তখনকার দিনের জার্মানীর ঐতিহ্য ছিল না। কারণ অস্ট্রিয়ার ঐতিহ্য ছিল অন্যরূপ। অস্ট্রিয়ান নেতৃত্ব ও প্রাশিয়ান নেতৃত্ব এই দুই নিয়েই জার্মানীর ইতিহাস। প্রথমটা যদি জার্মানীকে দুর্বল করে থাকে তবে দ্বিতীয়টা করেছিল মাথাভারী। জার্মানী এখন অপেক্ষা করছে তৃতীয় এক নেতৃত্বের। যেটা দুর্বলও হবে না, মাথাভারীও হবে না। কিন্তু কোথায় তার লক্ষণ?

প্রাশিয়া গেছে, তার শূন্যতা পূরণ করার জন্যে রাশিয়া এসেছে, তার গতিরোধ করার জন্যে আমেরিকা এসেছে, ব্রিটেন ও ফ্রান্স এসেছে। জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেই এরা যে যার ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু তারই বা লক্ষণ কই? জার্মানীর সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার আগে জার্মানী বলে একটি সত্তা চাই, যার স্বাক্ষরকে বলা হবে জার্মানীর স্বাক্ষর। পশ্চিম জার্মানীর মতে ফেডারেল রেপাবলিকই সেই জার্মানী। পূর্ব জার্মানীর মতে ডেমোক্রাটিক রেপাবলিকই সেই জার্মানী। দুই রেপাবলিক এক হতে পারলে বা একমত হতে পারলে শান্তি চুক্তির দিন জার্মানীর পক্ষে স্বাক্ষর করার জন্যে সর্বসম্মত একজনকে পাওয়া যেত। আঠারো বছরেও তেমন ঐক্য বা ঐক্যমত সম্ভব হলো না। তাই দেশী স্টীম রোলারের বদলে বিদেশী স্টীম রোলার চেপে বসে আছে। প্রকাশ্যে নয়, নেপথ্যে। শান্তিও হচ্ছে না, যুদ্ধও হচ্ছে না, হবার মধ্যে হচ্ছে আভ্যন্তরিক পরিবর্তন। সেটা পশ্চিম জার্মানীতে একভাবে পূর্ব জার্মানীতে আরেকভাবে। দুটোই চলেছে জোর কদমে, কিন্তু পরস্পরের অভিমুখে নয়, পরস্পরের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নয়, পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে।

এখানে বলে রাখতে চাই যে পূর্ব জার্মানীতে যা ঘটেছে তার মূল রাশিয়ার মাটিতে নয়, জার্মানীর মাটিতেই। বিসমার্ক যখন জার্মানী নামক রাষ্ট্রের পত্তন করেন তার আগেই প্রাশিয়াতে মার্ক্সবাদের বীজ বোনা হয়। ল্যাসালে সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে ব্রতী হন, পার্টি গঠন করেন, নির্বাচনে নামেন ও কোনো কোনো স্থানে জয়ী হন। বিসমার্ককে যেমন ক্যাথলিকরা জ্বালায় তেমনি সোশিয়ালিস্টরাও। তাদের প্রোগ্রামের কতক অংশ তিনি আপনা থেকেই প্রবর্তন করেন, যাতে তাদের আর লড়বার কারণ না থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্দোলন চলতে থাকে, জোর পেতে থাকে ও বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতে থাকে। জার্মানীতেই বিপ্লব ঘটার কথা। ঘটল কিনা রাশিয়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের হাতে ক্ষমতা আসে। তাঁদের পিছনে ঘোরতর সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তি, কিন্তু সৈন্যদল তাঁদের পিছনে ছিল না। তা ছাড়া কমিউনিস্ট বলে আলাদা একটা দল সৃষ্টি হয়। জার্মানীর সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা মার্ক্সবাদী, কমিউনিস্টরা মার্ক্সলেনিনবাদী। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ওঁরা রুশনিরপেক্ষ, এঁরা ডিক্টেটরশিপে আস্থাবান।

সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা একটার পর একটা দু'দুটো বিপ্লবের জন্যে তৈরি ছিলেন না।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতো যে বিপর্যয় ১৯১৮ সালে জার্মানীতে ঘটে সেটাকে সামাজিক বিপ্লব পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সাধ্য তাঁদের ছিল না। দক্ষিণ ও বাম উভয় দিক থেকে বাধা পেয়ে তাঁরা আর এগোতে পারলেন না। বিপ্লবের ছদ্মবেশে এলো প্রতিবিপ্লব। ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম। এর পরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ, যুদ্ধে পরাজয়, পরাজয়ের ফলে দেশভঙ্গ। সোশিয়াল ডেমোক্রাট ও কমিউনিস্ট যাঁরা তখনো বেঁচে বর্তে ছিলেন তাঁরা পূর্ব জার্মানীতে গিয়ে সামাজিক বিপ্লবের অবাধ পরিসর পেলেন। এবার তাঁদের পিছনে কেবল সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকশক্তি নয়, নিজেদের একটা সৈন্যদলও রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের নাম করলেও পদার্থ বলতে কিছু নেই। কারণ একই সময়ে গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র এই দুই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হওয়ার খেলা তাঁদের জানা নেই। আগের বার গণতন্ত্রের খেলা খেলতে গিয়ে সমাজতন্ত্র হয় না। এবার সমাজতন্ত্রের খেলা খেলতে গিয়ে গণতন্ত্র হচ্ছে না।

জার্মানীর শ্রমিকশক্তি বরাবরই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, কিন্তু ধনিকশক্তি ছিল আরো বেশী সঙ্ঘবদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধে ধনিকশক্তি ধাক্কা খায়নি, দুর্বল হয়নি। যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দীনহীন করে, তার আত্মসম্মানে ঘা দেয়। কিন্তু ধনিকদের ধনসম্পদ ক্ষয় করে না, বরং বৃদ্ধি করে। শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকায় তাদের ক্ষতি যা হয় তা অন্যভাবে পুষিয়ে যায়। মধ্যবিত্তরাই মুদ্রাস্ফীতির বলি। ওদিকে মধ্যবিত্তদের ভোটটি তো কম নয়। তাদের জন্যে কিছু না করতে পারলে তারাই বা ভোট দেবে কেন? মুদ্রাস্ফীতির বলি হয় শেষপর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এর পরেও গণতন্ত্র খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। কিন্তু ১৯২৯ সালে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয় তার ফল সুদূরপ্রসাবী। জার্মানীতে দেখতে দেখতে ষাট লাখ কর্মী বেকার হয়। এবার, গণতন্ত্র, তোমায় রাখবে কে? কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করবে এই ভয়ে ক্যাপিটালিস্টরা হিটলারের সঙ্গে হাত মেলায়। সোশিয়াল ডেমোক্রাট বা অন্য কোনো গণতন্ত্রী দলের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সাধারণ লোকের বিশ্বাস গণতন্ত্রের দ্বারা কিচ্ছু হবার নয়। চাই একজন জবরদস্ত নেতা, একটা জবরদস্ত দল। চাই একনায়কতন্ত্র। হিটলারের হাত শক্ত করে সাধারণ লোকের বীরপূজা। ধনশক্তি যাঁকে গদীতে বসাতে চায় জনশক্তি তাঁকেই ভোট দেয়। একবার গাছে ওঠার পর তাঁরও আর মইয়ের দরকার হয় না। গণতন্ত্রকে তিনি অবজ্ঞার সঙ্গে লাথি মেরে সরান। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশক্তিকেও পদানত করেন।

॥ তেরো ॥

স্টুটগার্ট আমি এর আগে দেখিনি। এটাই প্রথম দর্শন। প্রথম দর্শনে প্রেম এ বয়সে মানায় না। কিন্তু দৃষ্টিপাত করে মুগ্ধ হই। পাহাড়ে পাহাড়ে রোশনাই। আর তা আমার হোটেলের ঘরের জানালার এত কাছে। শুতে যাব, না এ দৃশ্য দেখব? পরের দিনের জন্যে তুলে রাখি।

বন উপবন পাহাড়। পাহাড়ের কোলে দ্রাক্ষার ক্ষেত। নেকার নদ। নেকারের দু'কূল জুড়ে শহর। স্টুটগার্ট আর তার অঙ্গীভূত বাড কানস্টাট। প্রকৃতি ও লোকালয় বিচ্ছিন্ন নয়। ওতপ্রোত। এমনটি একালে বিরল।

সকালবেলা আমার প্রথম কাজ হলো মোটরে করে বেরিয়ে পড়া, বাইশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ট্যুবিঙ্গেন ঘুরে আসা। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বড় ছেলে এক সময় পড়ত। আমার এটা সেন্টিমেন্টাল জার্নি।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে যাবার আগে লক্ষ করি দারুণ বেগে নির্মাণের কাজ চলেছে। নতুন নির্মাণের। জার্মানী দিন দিন নতুন হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেশ মোটরগম্য সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ অটোবান দিয়ে ছাওয়া। অটোবানের সঙ্গে পরিচয় হয় কোলোন বন্ যেতে আসতে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কোথাও ট্রাফিক সিগনাল নেই। অবাধে উধাও। রাস্তার সঙ্গে রাস্তার ক্রশিং হয় না। এমন কৌশলে তৈরি। কিন্তু একটা মোটর যদি হঠাৎ বিকল হয় তা হলে পিছনের সব ক'টা অচল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথরোধ। গতিরোধ।

চাষের ক্ষেত এলো। আমাদের মতো কোথাও আল বাঁধা নেই। চাষীরা ট্রাক্টর চালাচ্ছে। কেন, ঘোড়া? ঘোড়া দেখছিনে কেন? বলদের বদলে ঘোড়াই তো লাঙল টানে, মাটি চষে।

এর উত্তরে আমার তরুণী প্রদর্শিকা শ্রীমতী হেম্পেল বলেন, 'ঘোড়া অনেকদিন উঠে গেছে। চাষীরা ট্র্যাক্টর ধরেছে। ঘোড়াকে খোরাক জোগাতে বড় বেশি খরচ হয়। ট্র্যাক্টরে খরচ কম। একটা ট্র্যাক্টর অনেকগুলো ঘোড়ার কাজ করে।'

শুনে কান্না পায়। ঘোড়া অনেকদিন উঠে গেছে। বেচারা ঘোড়া! তাকে দিয়ে চাষের কাজ করানো যদিও আমাকে পীড়া দিত তবু তো সে নিসর্গের ছবিটিতে ছিল। তাকে বাদ দিলে ছবিটির অঙ্গহানি হয় না কি? সেও কি অনাবশ্যক বলে বিলোপের সমীপবর্তী হয় না?

ঘোড়া যদিও মানুষ নয় তবু আমার মনে হলো ঘোড়ার পাট উঠিয়ে দেওয়াটা অমানবিক। ঘোড়ার পিছনে ঘুরে ঘুরে চাষ করলে মানুষ মানুষের মতো থাকে। ট্র্যাক্টরের ঘাড়ে চেপে চাষ করলে মানুষ প্রাণীসঙ্গ হারিয়ে যন্ত্রের মতো হয়।

দেখি মাঠ থেকে লরি বোঝাই করে রাশি রাশি সাউয়ারক্রাউট চালান যাচ্ছে। গেঁজে ওঠা বাঁধাকপি। গন্ধে মাতাল করে।

চাষী গৃহস্থের বাড়ি আর গোয়াল ঈর্ষা করবার মতো। হাঁ, গোরু এখনো আছে। ঘোড়ার মতো উঠে যায়নি। হয়তো আর একটা উদ্ভাবনের অপেক্ষায় আছে। শিল্প বিপ্লব এখন কৃষিকে যন্ত্রায়িত করছে। একে একে সব ক'টা অঙ্গ যন্ত্রায়িত হলে গোরু রাখাও কি পোষাবে?

বীচ, বার্চ, ওক প্রভৃতি বনস্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ। আমার পুরোনো আলাপী। ফার চিরসবুজ। শীতের শ্বাস লেগে তার পাতা ঝরে যায় না। তাকে ও তার মতো তরুদের বাদ দিয়ে সারা বনস্থলী জুড়ে পাতা ঝরানোর পালা চলেছে। মলিন বিবর্ণ পাতা। আমি এসেছি ঋতু পরিবর্তনের মুখে। আরো কয়েকদিন দেরি করে এলে দেখতুম গাছগুলো কাঠ হয়ে খাড়া রয়েছে। নিসর্গচিত্র দেখতে দেখতে বদলে যাচ্ছে। আমি তার সাক্ষী।

স্টুটগার্টের মতো ট্যুবিঙ্গেনও উঁচু নিচু অসমতল পাহাড়ে জায়গা। তেমনি নেকার নদের ধারে। তেমনি হাজার বছরের পুরোনো, তেমনি সুন্দর, সুরম্য। এটি কিন্তু ছোট একটি শহর। লোকসংখ্যা কম। এর বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিতেই এর খ্যাতি। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়। রেফরমেশনের অন্যতম গুরু মেলাঙ্কটন (Melanchthon) এখানে কিছুদিন পড়িয়েছেন। পরবর্তীকালে হেগেল, শেলিং, হ্য'ল্ডারলিন (Hölderlin) এখানে পড়েছেন।

মধ্যযুগের মতো শিলা বাঁধানো সরু সরু রাস্তার দু'দিকে সারি সারি ঢালু ছাদ। চড়াই ভেঙে গাড়ি চলে বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে। মাঝখানে কতক অংশ পরিষ্কার করে আধুনিক বাস্তুর জন্য ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধে এ শহর জখম হয়নি। তাই পুনর্গঠনের প্রশ্ন ওঠে না। নির্মাণ এখানে নতুন নির্মাণ। তাই অসঙ্কোচে আধুনিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সামনে নামি। নভেম্বরের আগে খোলার কথা নয়। অধ্যাপক বলনভ ইটালীতে বিশ্রাম করছেন। সহকারী অধ্যাপক রোডি কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে কাজ

চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার ছেলেকে চিনতেন। আমাকে নিয়ে যান উপর তলার একটি নিরিবিলি ঘরে। জানালা দিয়ে বহু দূরের দৃশ্য নজরে পড়ে। নেকার নদ তো একেবারে পায়ের তলায়।

'এই ঘরে বসে আপনার ছেলে পড়াশুনা করত।' বলেন ডক্টর রোডি। 'আর এই টেবিলে বসে থীসিস লিখত।' সাত বছর পরেও এসব তাঁর মনে আছে। যেন সেদিনকার কথা। দার্শনিক মননের পক্ষে লোভনীয় পরিবেশ।

ট্যুবিঙ্গেনের সেসব দিন আর নেই। এখন ছাত্রের ভিড়ে প্রত্যেকের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া দুঃসাধ্য। জার্মানীর সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই একই অবস্থা। ছাত্র সংখ্যা বহুগুণ হয়ে গেছে। তাই শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

রোডি আমাকে নিয়ে যান পুরোনো একটি কোঠায়। থিওলজি বিভাগের সেমিনারী গৃহে। হেগেল সেখানে আবাসিক ছাত্র ছিলেন। থিওলজি চর্চার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন। সেইটেই আদি বিদ্যা। রেফরমেশনের পর ক্যাথলিক থিওলজি পরিত্যক্ত হয়। তার আসনে বসে প্রোটেস্টাণ্ট থিওলজি। উনবিংশ শতাব্দীতে দুই থিওলজি সহাবস্থান করে। এখনো তাই করছে। ইতিমধ্যে লাটিন প্রাধান্য দূর হয়েছে। সংস্কৃতের মতো লাটিন ছিল জার্মানীর ধর্মভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম। লুথার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। লুথারের বাইবেল অনুবাদের ভাষাই জার্মানীর সাহিত্যিক ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। কেবল প্রোটেস্টাণ্টদের নয়, ক্যাথলিকদেরও। কিন্তু ও ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করতে উভয় সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের আপত্তি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে আপত্তির খণ্ডন হয়।

হেগেল পড়তেন থিওলজি তথা ফিলসফি। আর হ্যোল্ডারলিন শুধু থিওলজি। কিন্তু তাঁর মন পড়ে রয়েছিল গ্রীক সাহিত্যে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে নানা স্থানে ভাগ্য পরীক্ষার পর হেগেল হন আশাতীত সফল। আর হ্যোল্ডারলিন তেমনি বিফল এবং পাগল। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে ট্যুবিঙ্গেনে পাঠিয়ে দেন। এখানে তিনি নেকার নদের তীরে এক ছুতোর মিস্ত্রীর বাড়িতে থাকেন। মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরত। কিন্তু বেশী দিনের জন্যে নয়। জীবনের শেষ ছত্রিশ বছর—প্রায় অর্ধেক জীবন—পাগল অবস্থায় কাটে যে বাড়িতে সেখানে এখন তাঁর মিউজিয়াম। পুরোনোর সঙ্গে নতুন মিলিয়ে তৈরি। রোডি আমাকে সেখানেও নিয়ে যান। কবির পাণ্ডুলিপির নকলই বেশীর ভাগ। আসল চলে গেছে বার্লিনে। 'ডিওটিমা' বলে যাঁর পরিচয় তাঁর একটি মূর্তি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। মনীষাদীপ্ত সুন্দর মুখ। এঁর অকালমৃত্যুর বার্তা শুনে কবি ফরাসী দেশের বর্দো থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে। পথের শেষে দেখা যায় তিনি পাগল হয়ে গেছেন।

রোডির সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখি। পাহাড়ের উপরে ষোড়শ শতাব্দীর কাস্‌ল। ডিউকরা সেখানে থাকতেন। এখন জরাজীর্ণ। একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারে লাগে। পাহাড় থেকে নেমে এলে পঞ্চদশ শতাব্দীর টাউন হল। গত শতাব্দীর মেরামতির ফলে এখনো সুদর্শন। তার সামনেই মার্কেট। মার্কেটের উপরেও মধ্যযুগের ছাপ। তবে সেই মধ্যযুগ এখন আর আত্মরক্ষা করতে পারছে না। উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে উঠেছে। মধ্যযুগের দোকানে পসারে তো আধুনিকতম ভোগ্যসম্ভার বিক্রী হতো না। চার দিকের পরিবেশ মধ্যযুগকেই ক্রমেই কোণঠাসা করে আনছে। বড়ো বড়ো ইমারত উদ্ধতভাবে মাথা তুলছে। আধুনিক রুচির। ট্যুবিঙ্গেন একটা স্বপ্নের মতো ছিল, সে স্বপ্ন দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাচ্ছে। থিওলজিতে যার জন্ম টেকনোলজিতে তার উপনয়ন।

ফেরা

॥ চোদ্দ ॥

ট্যুবিঙ্গেনের পাশেই বেবেনহাউসেন। সেখানকার দ্বাদশ শতাব্দীর মঠবাড়ি সিস্টারসিয়ান সাধুমণ্ডলীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। রেফরমেশনের সময় প্রোটেস্টাণ্টরা সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পত্তিভোগ সহ্য করে না। মঠবাড়ি বাজেয়াপ্ত হয়। মৌমাছি উড়ে যায়। মৌচাকটি অন্য কাজে লাগে।

সাধুদের সেল তেমনি রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ বদলে গেছে। প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদ যত না পরিবর্তন এনেছে তার চেয়ে ঢের বেশী এনেছে আধুনিক সভ্যতা। যার জন্যে সিস্টারসিয়ানরা এখানে মঠ নির্মাণ করে ছিলেন কোথায় সে নিভৃত আবেষ্টন!

কিন্তু হয়তো আমিই ভুল করছি। সিস্টারসিয়ান সাধুরা ছিলেন কায়িক শ্রমের পক্ষপাতী। নিজেরা চাষবাস ও পশুপালন করতেন, অপরকে সে সব শেখাতেন। তাঁদের শিক্ষায় পশ্চিম ইউরোপে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য উন্নতি লাভ করে। ধর্মজীবনের সঙ্গে কর্মজীবন যে কেবল মঠবাড়ির ভিতরেই চলত, তা নয়। চলত মঠবাড়ির চার দিকে। সাধুদের লোকাভাব হলে সেটা পূরণ করা হতো গৃহী ভাইদের আশে পাশে বসত করিয়ে। তারাও কর্মজীবনে অংশ নিত।

খুব কঠিন সাধনা ছিল সিস্টারসিয়ানদের। বেনেডিক্টিনদের মধ্যে শিথিলতা প্রবেশ করেছিল বলেই সংস্কারপন্থী সিস্টারসিয়ানদের উদয়। কিন্তু কয়েক শ' বছর পরে এঁদের মধ্যেও শিথিলতা প্রবেশ করল। অত কষ্ট করে চাষবাস করে কে? জমি ভাগে দাও, বন্দোবস্ত করো, প্রজা বসাও আর টাকা আদায় করে ভোগ লাগাও। আবার সংস্কারের চেষ্টা হলো। কিন্তু ত্যাগ তপস্যা ও বিশ্বাস দিয়ে আদি খ্রীস্টীয় প্রেরণার বা প্রেমের পুনরাবৃত্তি সম্ভব হলো না। গোড়া ঘেঁষে সংস্কারের দরকার দেখা দিল। তারই পরিণতি রেফরমেশন। প্রোটেস্টাণ্ট সাধনা মঠবাড়িকেই উচ্ছেদ করল। সন্ন্যাসকেই উৎপাটন করল। কিন্তু সঙ্ঘকে নির্মূল না করে পাল্টা সঙ্ঘ স্থাপন করল। তার নেতৃত্ব সন্ন্যাসীদের হাতে নয়। গৃহীদের হাতে। গৃহীদের মধ্যেও দুই ভাগ। যাঁদের মাথা হলেন রাজা। যাঁরা রাজার কর্তৃত্ব মানলেন না। তাতেও কি আদি খ্রীস্টীয় প্রেরণা বা প্রেম ফিরল?

ইউরোপের মন চলে গেল গ্রীস রোমের অতীতে। খ্রীস্টীয় জীবনধারার বিকল্প জীবনধারায়। রেনেসাঁস তারই পুনঃপ্রবর্তন। সেই দুটি বিরুদ্ধ জীবনধারার দ্বন্দ্বসমাস হচ্ছে আধুনিক ইউরোপ। কোনোটাকেই বাদ দেবার জো নেই। আদি খ্রীস্টীয় প্রেমের স্বাদ এখনো মানুষের মুখে লেগে রয়েছে। তেমনি গ্রীকদের জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শনমনন কাব্যসৌন্দর্য ও রোমানদের আইন আদালত বিধানসভা প্রশাসন শান্তি শৃঙ্খলা মানুষের মনে জেগে রয়েছে। অথচ দুটোকে মেলানো সহজ নয়। আজ অবধি মেলেনি। ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদ এসে চোখের সামনে তুলে ধরেছে জার্মানীর নর্ডিক অতীত। সীগফ্রীড যার প্রতীক। তার মানে আরো একটা বিকল্প জীবনধারা। রেনেসাঁস বা রেফরমেশন কোনোটার সঙ্গেই এর সম্পর্ক নেই। আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে এর মিশ খায় না। এই যদি হয় জার্মানদের স্বধর্ম তবে আর সব ইউরোপীয় জাতির সঙ্গে তাদের কোনোদিনই বনবে না। তারা ইউরোপের মূল স্রোতের বাইরে চলে যাবে। এতকালের বিবর্তনের পর সেটা তো সম্ভব নয়।

কিন্তু কেমন করে ফিরে আসবে সেই ধ্যানদৃষ্টি? যার সুযোগ দিত এইসব মঠবাড়ি। মানুষ এখন নির্জলা ইণ্টেলেক্ট দিয়ে বিশ্বরহস্য ভেদ করতে চায়। করেওছে বহু পরিমাণ। চারিদিকে ইণ্টেলেক্টের জয়জয়কার। কিন্তু ধ্যানের সুযোগ না পেলে দিব্যদৃষ্টি খুলতে পারে না। আর দিব্যদৃষ্টি খুলে না গেলে সমগ্র সত্য উদ্ভাসিত হবে না। খণ্ড সত্য নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হবে। মানুষের তাতে

তৃপ্তি নেই। মঠবাড়ি গেছে যাক। কিন্তু যে সুযোগ সেখানে ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যেত না সে সুযোগ যেমন করে হোক পেতে হবে। সবাইকে নয়, কতক মানুষকে ধ্যানে তন্ময় হতে হবে। তার জন্যে অনেক কিছু ছাড়তে হবে। তা বলে প্রেম ছাড়া যায় না। রস ছাড়া যায় না। রূপ ছাড়া যায় না। জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো ছাড়া যায় না। দিব্যদৃষ্টি অর্জনের পথে এগুলি অন্তরায় নয়।

ভারতবিদ্যার বিশেষজ্ঞ সুধীশ্রেষ্ঠ ফন গ্লাসেনাপকে আমি জাপানে দেখেছিলুম। ট্যুবিঙ্গেনে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হলে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু আমার আসার অল্পদিন আগে তিনি এক মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ট্যুবিঙ্গেনে আমার আর কোনো এনগেজমেণ্ট ছিল না। বন্ধুকন্যা মী—সেখানে ডাক্তারি পড়ে। ইতিমধ্যে সে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। বেবেনহাউসনের এক সেকেলে রেস্টোরাণ্টে আমরা চারজনে মধ্যাহ্ন ভোজন করি।

মী—জানত না যে আমি ইউরোপে এসেছি। হঠাৎ টেলিফোনে আমার গলা শুনে চমকে ওঠে। পুলকিত বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে বলে, 'সত্যি? আপনি!' আমি তাকে আমার সঙ্গে যোগ দিতে ও আহার করতে বলি। বিদেশে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে মেয়েটি একটু বেশীরকম উদ্বিগ্ন। আমার টেলিফোনের আগের মুহূর্তে নাকি কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিল। আমার বন্ধুপত্নী জার্মান। মী—দুই দেশেই মানুষ হয়েছে। তাই তার ব্যাকুলতা দুর্বোধ্য। কিন্তু দেখেশুনে মনে হোলো জার্মানদের কাছে অনাদর পেয়ে তার মধ্যে ভারতীয়তার অভিমান প্রবল হয়েছে।

'জানেন, মেসোমশায়', মী—আমাকে আড়ালে এক সময় বলে, 'নারীর প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা এদেশে নেই। যেমন আছে ভারতে। নারীকে এরা সমান ভাবতেই পারে না। নারী এদের চোখে ইনফিরিয়র।'

মনে পড়ে হিটলারের সেই প্রসিদ্ধ ফতোয়া : নারীর স্থান রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর ও গির্জা। মেয়েদের তিনি আপিস ও দোকান থেকে খেদিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরের অন্দরে বন্ধ করেছিলেন এই আশায় যে, পুরুষদের কর্মসংস্থান নিষ্কণ্টক হবে। তা পুরুষরা বাঁচল কোথায় যে, মেয়েদের হাত থেকে বাঁচবে! এখন আর কর্মের দুর্ভিক্ষ নয়, পুরুষেরই দুর্ভিক্ষ। ওদিকে ত্রিশ লক্ষ নারী বাড়তি। তাদের বিয়ের ফুল ফুটবে না। গড়পড়তায় ঊনত্রিশ বছর বয়স হচ্ছে ছেলেদের ও ছাব্বিশ বছর বয়স হচ্ছে মেয়েদের বিবাহের বয়স। বিয়ের পর প্রতি চারটি দম্পতির মধ্যে একটি থাকে নিঃসন্তান। শতকরা বাইশটি দম্পতির একবার মাত্র সন্তান হয়ে আর হয় না। জীবনযাত্রার ব্যয় এত বেশী বেড়েছে যে, স্ত্রীকেও দায়ে পড়ে চাকরি নিতে হয়। অন্তত পার্ট টাইম। যে নারী রাঁধবে না, মা হবে না, বাইরে গিয়ে পরপুরুষের অধীনে বা সঙ্গে খাটবে, সন্ধ্যায় যে খিটখিটে, রাত্রে যে ক্লান্ত সে যদি সেকালের মতো শ্রদ্ধা না পায় তবে উপায় কী!

এ সমস্যা ভারতেও দেখা দেবে। গ্রামকেন্দ্রিক দেশ যখন নগরকেন্দ্রিক হবে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতি যখন শিল্পপ্রধান হবে, যুদ্ধে বিগ্রহে জড়িয়ে পড়ে যখন পুরুষের দুর্ভিক্ষ হবে, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্যে যখন মেয়েরা অন্দর ছেড়ে সদরে আসতে বাধ্য হবে, রান্নাঘর ও আঁতুড়ঘর যখন অবহেলিত হবে তখন সেকালের মতো শ্রদ্ধা ভারতনারীও কি আশা করতে পারবে! তুলনাটা আসলে ভারতের সঙ্গে জার্মানীর নয়, সেকালের সঙ্গে একালের। আমরা যখন ভারত থেকে ইউরোপে যাই তখন সেকাল থেকে একালে যাই। ভারতে থেকে যখন একালকে দেখি তখন ভাবি ইউরোপকে দেখছি। এক শতাব্দী পূর্বে জার্মানীও ভারতের মতো ছিল। আধ শতক পরে ভারতও জার্মানীর মতো হবে। যদি না আমরা আরো বিজ্ঞ হই।

তার মানে কি অপরিবর্তনীয় অতীতকাল? না। ওটার নাম আরো বিজ্ঞতা নয়। সেকালের কাছ থেকে বিদায় নিতেই হবে, অথচ একালের মধ্যে বাস করেও একালের ভুলভ্রান্তি লোভ-হিংসা

জাতিবিদ্বেষ শ্রেণীবিদ্বেষ পরিহার করতে হবে। কিন্তু বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। করা সহজ হলে গান্ধীজীকে অমন করে মরতে হতো না। দেশবাসীকেও দুর্নীতির পাঁকে মজতে হতো না। করা কঠিন, তবু করতেই হবে। স্বাধীনতা অর্জন করে আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমরা কঠিন কাজের অযোগ্য নই। দুনিয়া যখন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে তখন কোনো একটা শিবিরে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকাও কঠিন কাজ। তাও তো আমরা এতদিন পেরেছি। আমরা পেরেছি বলেই অপরে পারছে। ভারত এক্ষেত্রে নেতৃত্ব করছে।

মী—কে ট্যুবিঙ্গেনে তার হোস্টেলে নামিয়ে দিই। দেবার সময় তাকে বলি, 'তা ইচ্ছা করলেই তুমি দেশে ফিরে যেতে পারো।' সে দৃপ্তভঙ্গীতে বলে, 'আমি কি এতই ভীতু! দিন দিন টাফ্ হচ্ছি। চেষ্টা করলেই এখানে চাকরি পাওয়া যায়। চাকরি করতে করতে পড়ব।'

॥ পনেরো ॥

আবার স্টুটগার্ট। সেখানেও কাস্‌ল। সেখানেও টাউনহল বা রাটহাউস। সেখানেও মার্কেট প্রাঙ্গণ। পুরাতন জার্মানীর এই ছিল প্যাটার্ন। যেখানেই যাই সেখানেই এই তিনটি নিয়ে ত্রয়ী। ভারতের মতো জার্মানীতেও ছিল শত শত রাজধানী বা ডিউকধানী বা কাউন্টধানী বা বিশপধানী। রাজভবন তো থাকবেই, মার্কেটও না থাকলে নয়। কিন্তু ভারতে যা ছিল না জার্মানীতে তা ছিল। রাটহাউস। এই জিনিসটি আমার ভালো লাগে দেখতে। অবশ্য গির্জা বাদে।

স্টুটগার্টের শহরতলীর একেবারে শেষ প্রান্তে, গ্রাম অঞ্চলের ধার ঘেঁষে একটি নিভৃত নিলয়ে বাস করেন প্রবীণ ও চিন্তাশীল সাহিত্যিক আল্‌ব্রেখ্‌ট গ্যা'স (Goes)। বাড়ি খুঁজে পেতে আমাদের একটু দেরি হয়। বেল টিপতেই তিনি নেমে এসে দোর খুলে দেন ও স্বাগত জানিয়ে উপরে নিয়ে যান। তাঁর পাঠগৃহে বসান ও নিজের হাতে চা ঢেলে খাওয়ান। তাঁর গৃহিণী তখন দক্ষিণ আফ্রিকায় কন্যার কাছে। বাড়িতে তিনি একা।

'অশান্ত রজনী' নামে একটি উপন্যাসিকা লিখে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের একটি অজ্ঞাত দিক উদ্‌ঘাটিত করেন। জার্মান অধিকৃত উক্রাইনের একটি অখ্যাত ঘটনা। সৈন্যবাহিনী যেখানে মোতায়েন ছিল তার আশেপাশের গ্রামে ডিম বা তরকারি কিনতে পাঠানো হতো সৈনিকদের। সেই সূত্রে লিউবা বলে এক গ্রামবাসিনী তরুণীর সহিত ভাব হয়। মেয়েটির স্বামী অল্পদিন আগে যুদ্ধে মরেছে, রেখে গেছে একটি শিশু। শিশুটির উপর সৈনিকটির মায়া পড়ে যায়। তাকে তার বাপের শোক ভুলিয়ে দিতে মন চায়। বারানভ্‌স্কির বাহিনীকে মাঝে মাঝে ঠাঁই বদল করতে হতো সে খবরটা সে লিউবাকে এক টুকরো কাগজের পিঠে লিখে জানাতো। খেয়াল ছিল না যে, এর জন্যে তার সাজা হবে তিন বছর কারাবাস। মিলিটারী কারাগার অতি ভয়ানক। কারাগারের পথে ভয় পেয়ে সে ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে জঙ্গলে লুকোয়। জঙ্গলে শত্রুপক্ষের গেরিলারাও ছিল। জঙ্গল ঘেরাও করে যখন তাদের ধরা হয় তখন বারানভ্‌স্কিও ধরা পড়ে। এবার প্রাণদণ্ড।

মৃত্যুর পূর্বে আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার প্রয়োজন হতে পারে বলে পাদ্রী চাই। এক্ষেত্রে প্রোটেস্টান্ট পাদ্রী। দূরস্থিত আর একটি বাহিনী থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি

এই কাহিনীর 'আমি'। কাহিনীটা 'আমি'র জবানীতে বলা। তিনি গিয়ে যা দেখেন, যা শোনেন, যা পড়েন—মোটা এক বাণ্ডিল কেস রেকর্ড—তাই নিয়ে তাঁর মন অশান্ত হয়, রাত কাবার হয়। ভোরবেলা গুলী করে মারা হবে। হুকুম দেবেন কে? না তাঁরই এক বন্ধু ও তাঁরই মতো একজন ধর্মযাজক। যুদ্ধে তিনি সৈনিকের সাজ পরে নেমেছেন ও পড়বি তো পড় তাঁরই উপর পড়েছে একটি ভাইকে গুলী করে মারতে হুকুম দেবার অপ্রিয় কর্তব্য। কর্তব্যটা যিনি চাপিয়েছেন তিনিও এককালে ধর্মযাজক ছিলেন, চার্চ ত্যাগ করে পরে হিটলারের সঙ্গে যোগ দেন ও যুদ্ধে পদোন্নতির ফলে পুরাতন উপরওয়ালাকে পেয়ে ময়লা কাজটা তাঁকেই দিয়ে করাতে চান। এই মেজর যেমন দুশ্চরিত্র তেমনি প্রভুত্বপরায়ণ। ধরাধরি করলে হয়তো তিনি কর্তব্যটাকে পাত্রান্তরিত করতেন, কিন্তু ওরকম একটা লোকের কাছে দরবার করতে আত্মসম্মানে বাধে। ওদিকে আবার বিবেকেও বাধছে।

বারানভ্স্কি জন্মাবধি ভাগ্যবিড়ম্বিত। মরেই তার শান্তি। মরার আগে পাদ্রীর কাছে সে যা পেলো তা একজন দরদী অগ্রজের ব্যক্তিগত স্নেহ ও সেই সঙ্গে যীশুর অভয়বাণী। চিরন্তন প্রেম তাকে প্রত্যাখান করবে না সংসার যাকে বার করে দিল। যে যত বড়ো পাপীই হোক না কেন স্বর্গের শান্তি রয়েছে প্রত্যেকের জন্যে। জীবনের ভোজে যার নিমন্ত্রণ হলো না শেষ থালাটি সাজানো রয়েছে তারই জন্যে।

কিন্তু যিনি তার উপর গুলী চালাবার হুকুম দিলেন তাঁর শান্তি কোথায়! যিনি তার মামলার কাগজপত্র পড়েছেন তাঁরই বা কোথায় শান্তি! আইন অফিসার বলে একজন থাকেন, তিনিও ভিতরে ভিতরে অশান্ত। পাদ্রী তাঁকে বলেন, 'দেখুন, এর সমস্তটাই ন্যায়ের বিকৃতি।'

ওদিকে স্টালিনগ্রাডে চলছিল দারুণ লড়াই। যোগ দিতে উড়ে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন ব্রেন্টানো। আকাশ থেকে নেমে পাদ্রীর শোবার ঘরে রাত্রের শেষ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যান। সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয় হাসপাতালের নার্স মেলানী। মিলনটা গান্ধর্ব। পাদ্রী উপেক্ষা করেন বা উপেক্ষিত হন। তিনি তখন বারানভ্স্কির নথি পড়ায় মগ্ন। ব্রেন্টানোর আননে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বীরের মৃত্যুর পূর্বকালীন আভা। প্রেমিকপ্রেমিকার অন্তিম মিলনে অন্তরায় হন না। কে জানে, সন্তান হয়তো গর্ভে আসবে, ভবিষ্যৎ হয়তো উন্মোচিত হবে। সেই শিশুর জ্ঞান হবার আগে বর্তমানকালের মন্দ শক্তিসমূহের বিনাশ ঘটে থাকবে।

আধুনিক যুদ্ধের দাবি এমন সর্বগ্রাসী যে, ধর্মযাজককেও সৈনিক সেজে মানুষ মারার হুকুম দিতে হয়। সেও নিজের পক্ষের মানুষ। খ্রীস্টের সেবককেও করতে হয় ভ্রাতৃহত্যা। সেও অবোধ একটি ভাই। এ কাহিনীর মূল তত্ত্ব এই যে যুদ্ধের গিল্ট থেকে একজনও মুক্ত নয়, সকলেই গিল্টি। যারা বাঁচে তারা সারাজীবন গিল্ট বহন করে বাঁচে। এটা যেন একটা লোহার বেড়ি। যুদ্ধ যারা দেখেছে তারা মোহমুক্ত হয়ে যুদ্ধের মায়াজাল থেকে উত্তরপুরুষকে বাঁচাবে। যুদ্ধের কল্পলতা নতুন করে গজালে তাকে বিষবৃক্ষের মতো ছেদ করবে।

জার্মানীর সামরিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি আর একটি ঐতিহ্যও আছে, সেটি সমরবিরোধী। মনে পড়ে, অসীস্ট্স্কি যখন হিটলারের ক্ষমতালাভের পর স্বদেশে ফিরে আসেন তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় নিশ্চিত বিপদের মুখে তিনি জার্মানীতে ফিরে এলেন কেন। তিনি জবাব দেন, 'বাইরে থেকে কথা বললে আমার কণ্ঠস্বর ফাঁপা শোনাত।' হিটলারের বন্দীশালায় তাঁর দেহান্ত হয়। কবেকার কথা!

সেদিন চা খেতে খেতে গ্যাসকে আমি প্রশ্ন করি, 'যুদ্ধবিগ্রহ, দেশভঙ্গ ও আনুষঙ্গিক দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে বলে আপনার জীবনদর্শনের কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি?'

তিনি দ্বিধা না করে উত্তর দেন, 'না। কোন পরিবর্তনই হয়নি। আমি ট্যুবিঙ্গেনে পড়াশুনা

করেছিলুম। গ্যেটে আর হ্য'লডারলিনের কাছে জীবনের পাঠ নিয়েছিলুম। সেইজন্যে ওসব ঘটনা ও দুর্ভোগ আমাকে টলায়নি।'

তার পর হ্য'লডারলিনের একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আওড়ান। তাতে বলা হয়েছে, 'বিপদ যত বড়ো হবে তুমি হবে তার চেয়েও বড়ো।'

সৌম্যদর্শন স্থিতধী জ্যেষ্ঠ একালের ইনটেলেকচুয়ালদের থেকে ভিন্ন। জীবনের আদিপর্বে তিনি যে প্রজ্ঞা ও নিশ্চিতি লাভ করেছিলেন জার্মানীর উপর দিয়ে যে ঝড়ঝাপটা বয়ে গেল তার চেয়ে সে স্থায়ী। হিউমানিস্ট ও খ্রীস্টীয় ঐতিহ্য তাঁর মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। জাতীয়তাবাদ ও তার চরম বিপর্যয় তাঁকে ভ্রষ্ট করেনি।

এর পর তাঁর কাছে জানতে চাই, 'এটা কি সত্য যে, কমিউনিস্ট মতবাদের আক্রমণ রোধ করার জন্যে তারই মতো জোরদার আর একটি মতবাদ দরকার বলে জার্মানীর তথা পশ্চিম ইউরোপের লোক রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের শরণ নিচ্ছে?'

তিনি একটুও ইতস্তত না করে বলেন, 'না। সত্য নয়।'

তখন আমার খেয়াল ছিল না যে, তিনি প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মযাজক ছিলেন, অবসর নিয়েছেন, এখনো মাসে একবার করে গির্জায় গিয়ে সার্মন দেন। তা ছাড়া আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে, পশ্চিম বার্লিনের প্রশ্নে আমেরিকার দৃঢ়তা ও রাশিয়ার নিষ্ক্রিয়তা দেখে কমিউনিজমের ভয় ভেঙে গেছে। ভয় যদি-বা থাকে তবে সেটা অর্ধেক জার্মানীর ভবিষ্যৎ ভেবে। কমিউনিজম প্রতিহত হয়েছে। তার আরো এক কারণ, মস্কো-পিকিং বিরোধ। মোট কথা, আমার এই প্রশ্নটা আউট অফ ডেট হয়ে গেছে, বিশেষ করে আডেনাউয়ারের প্রস্থানের ও এরহার্ডের প্রবেশের পর। উনি ক্যাথলিক, ইনি প্রোটেস্টাণ্ট।

আরো অনেক কথার পর বিদায় নিই। স্টুটগার্ট যার জন্যে বিখ্যাত, তেমন কোনো সংগীতশালায় আমার জন্যে আসন মেলেনি, তার বদলে স্টুটগার্ট যার জন্যে গর্বিত সেই টেলিভিশন টাওয়ারের চূড়ায় উঠে শহরের নৈশ শোভা সন্দর্শন করি।

॥ ষোল ॥

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। স্টুটগার্টের সেই কুতবমিনারের চূড়ার কাছাকাছি গিয়েও মানুষ খেতে বসে ও আড্ডা দেয়। আমার ভোজনসঙ্গী অধ্যাপক কু—একজন ভারতবন্ধু। ভারত প্রসঙ্গে কথাবার্তার পর পূর্ব জার্মানীর প্রসঙ্গ ওঠে। তিনি সম্প্রতি সেখানে গেছলেন।

কমিউনিস্টরা ওখানকার শিক্ষাব্যবস্থা বদলে দিয়েছে। সাহিত্য বা ইতিহাস আগাগোড়া অন্যরকম করে পড়ায়। তথ্য আলাদা, মূল্য আলাদা। ওখানকার ছেলেমেয়েরা যখন বড়ো হবে আর এখানকার ছেলেমেয়েরা যখন বড়ো হবে, তখন কেউ কাউকে বুঝতে পারবে না, যদিও ভাষা তাদের একই। সব যদি অন্যরকম হয়ে যায় তবে মনের মিল হবে কী করে? ফল হবে পাকাপাকি অনাত্মীয়তা। হলোই বা একই জাতি, একই ধর্ম।

সমস্যাটা দিন দিন আরো কঠিন হচ্ছে, কারণ নতুন যারা জন্মাচ্ছে তাদের চোখে পশ্চিম জার্মানী বিদেশ, এখানকার সংস্কৃতি বুর্জোয়া সংস্কৃতি। ওদের প্রোলিটারিয়ান সংস্কৃতি যে এদের

নবজাতকরা আপনার বলে আদর করবে, তা নয়। সেতুবন্ধনের কথা ভাবতে হচ্ছে সরকারের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে। সরকারী মহলের ধনুর্ভঙ্গ পণ যে, সমগ্র জার্মানীর সাধারণ নির্বাচন হবে ও অধিকাংশের ভোটে জার্মানীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে।

কু—বলেন, 'ওরা এতে রাজী হবে না। হতে পারে না। তিপ্পান্ন সব সময় সতেরোর চেয়ে বেশী।'

আমি বুঝতে পারিনে। 'তার মানে?'

'আমরা তিপ্পান্ন মিলিয়ন। ওরা সতেরো মিলিয়ন। ভোটে ওরা হেরে যাবেই। কেন তা হলে সাধারণ নির্বাচনে রাজী হবে?' কু—বিশদ করলেন।

তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন। রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে তেমন উদ্বেগকর নয়। যুদ্ধবিগ্রহের নিকট সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ শোচনীয়।

আমার মনে পড়ছিল ভারত-পাকিস্তান সমস্যা। তলিয়ে দেখলে এটাও সেই তিপ্পান্ন বনাম সতেরো। তিন-চতুর্থাংশ বনাম এক-চতুর্থাংশ। সেইজন্যে প্রথমে এলো স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি। তার পরে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এখন সংস্কৃতিও দিন দিন বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন হতে চলেছে। তফাত এই যে, জার্মানীতে ওটা শ্রেণীবিভেদ, ভারত-পাকিস্তানে ধর্মবিভেদ। বলা বাহুল্য, ধর্মবিভেদ হলো অতীতের মামলা, সব দেশেই অল্পবিস্তর ছিল। আর শ্রেণীবিভেদ হচ্ছে ভবিষ্যতের মামলা। সব দেশেই অল্পবিস্তর দেখা দেবে।

কেউ কোনো হদিস পাচ্ছে না। কু—যে পেয়েছেন তা নয়। তিনি আবার যাবেন পূর্ব জার্মানী। গিয়ে ওদের বলবেন, 'তোমরা নিজেরাই নির্বাচন কর।' অর্থাৎ গণতন্ত্র চালাও। যেন ওদের ওটা গণতন্ত্রই নয়। লাল ষাঁড়কে সাদা ন্যাকড়া দেখাবেন অধ্যাপক কু—।

পূর্ব পশ্চিম জার্মানীতে মিলে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তাব যতবারই উঠেছে ততবারই সে প্রস্তাবের পিছনে রয়েছে এই উদ্দেশ্য যে মিলিত নির্বাচনের ফলে দুই খণ্ড জোড়া লেগে একাকার হবে। তখন তার একাংশের উপর থেকে কমিউনিস্ট শাসন দূর হবে, সোভিয়েট অধিকার শেষ হবে। কিন্তু এমন কথা কি কেউ দিয়েছেন না দিতে পারেন যে সোভিয়েট সেনা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ইংরেজ ও ফরাসী সেনাও চলে যাবে, জার্মানী নামক পুনর্গঠিত রাষ্ট্র নর্থ আটলান্টিক ট্রীটি অর্গনাইজেশন নামক পাশ্চাত্য সামরিক সংস্থায় নাম লেখাবে না, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব বা পশ্চিম কোনো দিকে হেলবে না?

না, এমন কথা কেউ দিতে পারেন না। আসলে বিষয়টা স্থির হয়ে যায় জার্মানদের মাথার উপর দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন ও রুশ ও ইংরেজ শিবিরের বড়কর্তাদের মধ্যে। কালনেমির লঙ্কাভাগের মতো মিত্রপক্ষের জার্মানী ভাগ ঘটে যুদ্ধজয়ের পূর্বে, যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তার জন্যে সবুর না করে। জার্মান বড়কর্তা জানতেন যে এবার যুদ্ধে হেরে যাওয়া মানে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করা আর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করার অর্থ জার্মানীকে বিভক্ত হতে দেওয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের মতো শর্তাধীন আত্মসমর্পণে মিত্রপক্ষ রাজী হবেন না, জার্মানীকে অখণ্ড থাকতে দেবেন না। পরে যদি রুশে মার্কিনে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধে তা হলে অখণ্ড জার্মানী যার পক্ষে যাবে সেই জিতবে, মার্কিন পক্ষে গেলে মার্কিন, রুশ পক্ষে গেলে রুশ। এতবড় একটা শক্তিকে প্রতিপক্ষের হাতে আস্ত সঁপে দেবার চেয়ে তার একখণ্ড কেটে নিয়ে আপনার হাতে রাখাই সাবধানতা। সেইভাবেই ব্যালান্স অফ পাওয়ার রক্ষিত হবে।

এখন জার্মানদের সকলের কথায় ব্যালান্স অফ পাওয়ার তাদের মর্জির উপর ছেড়ে দেবে কে? তাদের একীকরণের ফলে যদি কমিউনিস্টরা কোণঠাসা হয় ও ক্যাপিটালিস্টরা জাঁকিয়ে বসে তা হলে সেটা তৃতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েটের অগ্রিম পরাজয়। কমিউনিস্টরা বা সোভিয়েট কর্তারা

তাতে রাজী হবেন কেন? এক শ্রেণীর ইচ্ছা যদি অপর শ্রেণীর ইচ্ছার উপর জয়ী হয়, এক জাতির ইচ্ছা যদি অপর জাতির ইচ্ছার উপর জয়ী হয় তবে যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা বা অন্তর্বিপ্লবের দ্বারাই হবে, নির্বাচনের দ্বারা হবে না। নির্বাচন সেই ক্ষেত্রেই চলে যেক্ষেত্রে কোনো পক্ষই যুদ্ধ করতে বা বিপ্লব ঘটাতে চায় না। উভয় পক্ষ চায় শান্তিপূর্ণ সমাধান। যেক্ষেত্রে তেমন কোনো অঙ্গীকার নেই সেক্ষেত্রে নির্বাচন এক পক্ষ চাইলেও অপর পক্ষ চাইতে পারে না। মিলিত নির্বাচনের লেশমাত্র আশা নেই।

সেইজন্যে অধ্যাপক কু—মিলিত নির্বাচনের বদলে স্বপ্ন দেখেছেন বিচ্ছিন্ন নির্বাচনের। তার ফলে জার্মানদের একীকরণ না হয় নাই হলো, কিন্তু পূর্ব জার্মানদের উপর ডিকটেটরশিপ চলবে না। বলা বাহুল্য কমিউনিস্টরা ডিকটেটরশিপ ছাড়তে রাজী হবে না। বিপ্লব যাতে দৃঢ়মূল হয় সেই তাদের লক্ষ্য। নির্বাচকদের স্বাধীন মতের উপর ছেড়ে দেওয়া মানে বিপ্লবের পক্ষে অনাবশ্যক ঝুঁকি নেওয়া। শতবর্ষ অপেক্ষার পর তাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে। সারাদেশের উপর নয়, একাংশের উপর। সেই একাংশই তাদের দুর্গ। দুর্গের অভ্যন্তরে নানা মতের লোককে অবাধ স্বাধীনতা দিলে দুর্গ ভেঙে পড়তে পারে। দিলে ওইটুকু দেবে যেটুকু বিপ্লবের পক্ষে হানিকর নয়। সোভিয়েটের সঙ্গে তাদের স্বার্থের মিল। স্বার্থের মিল কি রক্তের মিলের চেয়ে কিছু কম প্রবল?

তার পর এটারই বা নিশ্চয়তা কোথায় যে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে গণতন্ত্রী দলগুলির অগণতন্ত্রী বিরোধীপক্ষ দেখা দেবে না! গণতন্ত্রীদের বরাত ভালো যে পশ্চিম জার্মানীতে কমিউনিস্ট নেই বললেও চলে। সবাই গিয়ে পূর্ব জার্মানীতে আশ্রয় নিয়েছে। এখন তাদের আশ্রয় নেবার মতো একটা ঠাঁই আছে। জার্মানী যদি পুনরায় এক হয় তা হলে কি সে রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট বলে কেউ থাকবে না? তারা তা হলে যাবে কোথায়? কমিউনিস্ট থাকলে নাৎসীও থাকবে। এমনিতেই রয়েছে। সুতরাং পুনর্ একীকরণের পর সেই দৃশ্যই পুনরভিনীত হবে যে দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল বর্তমান শতকের দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে। যদি না সমগ্র জার্মানী সুনিশ্চিতভাবে পাশ্চাত্য শক্তিজোটের সামিল হয়ে নাৎসীদের এক হাতে ও কমিউনিস্টদের অন্য হাতে দমন করে। যদি না ব্যালান্স অফ পাওয়ার সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যায়।

বলা বাহুল্য সোভিয়েট এরকম একটা সমাধানে সহযোগিতা করবে না। নাৎসীদের ভয়ে ইংলণ্ড ফ্রান্সও করবে না। আমেরিকাও করবে কি না সন্দেহ। 'জোন' ভাগ ওরা এখনো তুলে দেয়নি। প্রকাশ্যে রাশিয়ার ভয়ে, ভিতরে ভিতরে জার্মানীর ভয়ে। জার্মানীর পশ্চিমাংশই এই কয়েক বছরে শিল্পে বাণিজ্যে ও জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে অতিক্রম করেছে, আমেরিকার পরেই তার সমৃদ্ধি। সমগ্র জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলে তার ধনবল ও জনবল আমেরিকার আরো কাছাকাছি যাবেই। পরমাণুশক্তিও হাতে আসবেই। তখন ব্যালান্স অফ পাওয়ার আবার জার্মানীর অনুকূলে যাবে। ইউরোপ দু'ভাগ না হয়ে তিন ভাগ হবে। তৃতীয় ভাগটা হবে জার্মানীর প্রভাবাধীন। সে জার্মানী বিশুদ্ধ গণতন্ত্রী হলেও তাকে অতটা শক্তিশালী হতে কেউ দেবে না। ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকা মনে মনে একটা মাত্রা মানে। পশ্চিম জার্মানী পর্যন্ত তাদের ভালোবাসার দৌড়। সীমানা বাড়াতে গেলে ভালোবাসার পরিবর্তে ভয় জাগবে।

ইউরোপকে তেভাগা হতে দেওয়া আপাতত রুশ মার্কিন ইঙ্গ ফরাসীর ইচ্ছা নয়। পূর্ব জার্মানীর শাসকদলেরও ইচ্ছা নয়। তা সত্ত্বেও জার্মান জাতির ঐক্য আবার একদিন সম্ভব হতে পারে। তিন শতাব্দী পূর্বে প্রোটেস্টান্টদের সঙ্গে ক্যাথলিকদের ও জার্মানদের সঙ্গে তাদের প্রতিবেশীদের একপ্রকার সমঝোতা হয়। তার নাম 'ওয়েস্টফালিয়ার শান্তি'। ত্রিশ বছর লড়াইয়ের পর একটা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তেমনি একটা সূত্র খুঁজে পেলে জার্মানী আবার একসূত্রে গ্রথিত হবে।

॥ সতেরো ॥

আরো একটি মধুময় দিন। নীল উজ্জ্বল আকাশ। মেঘ বৃষ্টি কুয়াশার লেশমাত্র নেই। শীতই বা কোথায়! শুধু শুধু ওভারকোট বয়ে বেড়নো।

সকালবেলা বেরিয়ে পড়ি। রেলপথে স্টুটগার্ট থেকে মিউনিক। দক্ষিণ জার্মানীর সোয়াবিয়া অঞ্চল দেখতে দেখতে যাওয়া। পাহাড়ের পর পাহাড়। নদীর পর নদী। প্রশস্ত প্রান্তর। প্রশান্ত পরিবেশ। ক্বচিৎ একটা আধটা শহর নজরে আসে। গ্রামেরও সাক্ষাৎ মেলে কদাচ।

এই পথেই ইতিহাসবিশ্রুত উলম ও আউগ্‌সবুর্গ। উলমে নেপোলিয়নের যুদ্ধজয়। আউগ্‌সবুর্গে লুথারপন্থী সংস্কারকদের মূলনীতিব্যাখ্যান। দুটোই দু'রকম লড়াই। একটা শস্ত্রের আরেকটা শাস্ত্রের। এ ছাড়া আরো একপ্রকার লড়াইয়ের জন্যে উলমের সুখ্যাতি ছিল। মাইস্টারসিঙ্গার বা ওস্তাদ কবিয়ালদের গানের লড়াই।

এখানে বলে রাখি যে উলম ও আউগ্‌সবুর্গ দুটোই ছিল স্বাধীন নগরী। স্বাধীন অথচ সরাসরিভাবে সম্রাটের ছত্রতলে। রাজা রাজড়ার বা মোহন্ত মহারাজদের আওতার বাইরে। স্বাধীনতাসম্পন্ন এমনি কয়েকটি ইম্পিরিয়াল সিটি ছিল মধ্যযুগের জার্মানীর বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য এদের ক্ষমতা শুধু মিউনিসিপ্যালিটি চালাবার ক্ষমতা নয়, গবর্নমেন্ট চালাবার ক্ষমতা। একমাত্র সোয়াবিয়া অঞ্চলেই বাইশটি শহর মিলে চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি লীগ গঠন করে। সামন্ত রাজাদের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা তাদের উদ্দেশ্য। সম্রাট তাদের সহায়। সোয়াবিয়ান লীগ ইতিহাসে নাম রেখে গেছে।

সোয়াবিয়ার চাষীরাও একদা ইতিহাসে স্থান পেয়েছিল। লুথারের জীবদ্দশায়। তিনি তখন সামন্তকুলের পক্ষ সমর্থন করেন। বিদ্রোহীরা এমন সাজা পায় যে আর কখনো মাথা তুলতে পারে না। তার থেকে একটা ধারণা জন্মায় যে জার্মানরা চিরকাল রাজশক্তির বা সামন্তশক্তির আজ্ঞাবহ ও রাষ্ট্রের অন্ধ অনুগামী। শস্ত্র আর শাস্ত্র যদি একসঙ্গে প্রতিকূল হয় তবে শূদ্রের বিদ্রোহ সব দেশেই সুদূরপরাহত। ফরাসী বিপ্লব তাই উভয়কেই একসঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে। রুশবিপ্লবও সেই মার্গ অনুসরণ করে। জার্মানীর কৃষকবিদ্রোহ কিন্তু ধর্মদ্রোহ ছিল না। বরং ধর্মকেই আশ্রয় করেছিল। তবে অহিংসাকে নয়।

পশ্চিম জার্মানীর চাষীরা আর কোনো দিন বিদ্রোহ করবে না। চাষী ক'জন যে বিদ্রোহ করবে! এক শ' বছর আগে কৃষিজীবীর অনুপাত ছিল শতকরা চল্লিশ জন। এখন শতকরা এগারো জন। তখনকার দিনে শতকরা চৌষট্টি জন বাস করত গ্রামে। এখনকার দিনে শতকরা ছিয়াত্তর জনের বসত শহরে। শিল্পবিপ্লব জার্মানীকে দ্রুতবেগে নগরবাসী করেছে। এত দ্রুতবেগে ইংলণ্ডকেও করেনি, ফ্রান্সকে তো নয়ই। মাত্র আধ শতাব্দী সময়ের ব্যবধানে জার্মানীর শিল্পবল, ধনবল, সৈন্যবল, জনবল ও শিক্ষাবল লাফ দিয়ে প্রথম সারিতে উঠে যায় ও প্রথম আসন দখল করতে চায়। তার থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মূল কারণ একই, কিন্তু গভীরতর কারণ শ্রমিকবলের সঙ্গে ঘরে বাইরে বিরোধিতা।

কলকাতার যেমন দমদম মিউনিকের তেমনি রিয়েম। সেদিন রিয়েম বিমানবন্দরে নেমে যা দেখেছি তার নাম মিউনিক দর্শন নয়। ভেবেছি কিছুই চেনা ঠেকছে না যে। মিউনিকের সঙ্গে মিলছে না যে! এবার আমার ট্রেন আমাকে নিয়ে গেল শহরের ভিতরে। হাঁ, এই তো সেই মিউনিক। ওই

যে কাথিড্রালের দুই চূড়া। কাশীর যেমন বেণীমাধবের ধ্বজা। মিউনিক, তুমি ইউনিক।

জার্মানদের ট্রেন কাঁটায় কাঁটায় চলে। কিন্তু দেখা গেল মিউনিকে পৌঁছতে মিনিট দশ পনেরো দেরি করেছে। আমাদের দেশ হলে বলা যেত, উহাই নিয়ম। কিন্তু আমাকে নিতে যিনি এসেছিলেন তিনি গোড়াতেই কৈফিয়ৎ দিলেন, 'আমরা হলুম বাভেরিয়ার লোক। আমাদের ট্রেনও আমাদেরি মতো ধীরে সুস্থে চলে। সময়ের শাসন মানে না।' যুবকটি গম্ভীরপ্রকৃতির রসিক। না 'গ্রাউ', ইংরেজীতে 'গ্রে'।

বাভেরিয়া যে প্রাশিয়া নয় তা জানতুম। মিউনিকের লোক এক ভাঁড় বীয়ার নিয়ে বসবে তো উঠতে চাইবে না। ঘড়ির কাঁটা দেখে তো বীয়ার পান করা বা আড্ডা দান করা চলে না। শুনলুম মিউনিকের সেই বিখ্যাত বীয়ার হল নাকি যুদ্ধে ধ্বংস হয়েছে। হায়, হায়!

তা পানশালা ধ্বংস হলে কি পানপার্বণ রহিত হয়? বছরে দু'বার মার্চ মাসে ও মে মাসে বীয়ার খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। তা ছাড়া বছরে আরো তিনটে মচ্ছব হয়, তার প্রধান উপচার বীয়ার। অক্টোবর মাসে ষোল দিন ধরে যে শারদোৎসব হয় নানা দিগ্‌দেশাগত প্রমোদবিহারীতে সেটি ভরে যায়। আমাকেও দেখা যেত সেই উৎসবে যদি হাজির হতে আমার দিন সাতেক দেরি না হোত। আফসোস! আফসোস!

তার পর, মিউনিক, আছো কেমন? টোমাস মানের মতো সাহিত্যিক নেই, কাণ্ডিন্‌স্কির মতো শিল্পী নেই, তবু তুমি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের প্রিয় বাসস্থলী। জার্মানীর রোম বা প্যারিস। তোমার বাস্তুকলার উপর ইটালীর তথা ফ্রান্সের প্রভাব। তোমার সৌন্দর্যের ধ্যান ওদেরি অনুরূপ। প্যারিসের যেমন মঁমার্ত্র (Montmartre) তোমার তেমনি শোয়াবিং (Schwabing) নামে শিল্পীদের পাড়া। তোমার যাদুঘর আর আর্ট গ্যালারি আর থিয়েটার আর কনসার্ট হল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। তোমার অপেরার আন্তর্জাতিক খ্যাতি। তোমার রুচির সঙ্গে বার্লিনের রুচির তুলনা হয় না। বরাবরই তুমি জার্মানীর সংস্কৃতি-রাজধানী। বাভেরিয়ার রাজাদের সেদিকে দৃষ্টি ছিল।

এ শহরে মাসের পর মাস থাকতে হয়। আমি দু'রাতের অতিথি। কতটুকুই বা দেখতে পারি! ক'জনের সঙ্গেই বা আলাপ করতে পারি! আমার সৌভাগ্য যে ব্রাক (Braque)-এর প্রদর্শনী হচ্ছিল। আগস্টের শেষদিনে প্যারিসে তাঁর মৃত্যুর পর এই বোধহয় প্রথম সর্বাঙ্গীন প্রদর্শনী। শুধু এইটুকু দেখবার জন্যেও মিউনিক আসতে হয়।

এক এক শহরের এক এক চারিত্র্য। বার্লিন যেন পাথরের মতো নিরেট বা সলিড। মাটির বুকের পর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে আছে। মিউনিক তার তুলনায় লঘুভার। সে যেন পুরুষ আর এ যেন নারী। সুশ্রী সুবেশা নারী। শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত নীম্ফেনবুর্গ প্রাসাদ দেখতে যাবার সময় মনে হচ্ছিল এই মিউনিক নিজেও একটি নীম্ফ বা অপ্সরা। তা নইলে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা একে এত ভালোবাসেন কেন?

বাভেরিয়ার রাজাদের এই গ্রীষ্মনিবাস সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কীর্তি। রোমানদের বসন্তের দেবী ফ্লোরার নামে এর উৎসর্গ। সাভয়ের রাজকন্যা বাভেরিয়ার রাণী হয়ে আসার পর একটি ইটালীয় রীতির ভিলা প্রতিষ্ঠা করেন, সেই ভাবেই এর আরম্ভ। প্রথমে ইটালীয়, পরে ফরাসী শিল্পীদের দিয়ে এর নির্মিতি। আরো পরে জার্মান শিল্পীরা ফরাসীদের দেশে গিয়ে তালিম হয়ে আসেন ও অলঙ্করণের ভার নেন। ভিলা বাড়তে বাড়তে প্রাসাদ হয়। প্রাসাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়তে বাড়তে রাজপুরী হয়। ফোয়ারা মুখরিত মূর্তিমণ্ডিত উদ্যান দিয়ে ঘেরা।

সেকালে যা রাজা রাজড়াদের কয়েকজনের সখের জিনিস ছিল এখন তা সর্বসাধারণের অধিগম্য যাদুঘর। একবার চোখ বুলিয়ে নিতেও অনেক সময় লাগে। তাই আমরা দুটি একটি কক্ষ

দেখে বিশেষ মনোযোগ দিলুম সেকালের ঘোড়ার গাড়ি সংগ্রহের উপর। কত রকম সৌখীন গাড়ি তখনকার দিনে ছিল। মোটর গাড়ি এসে তাদের যাদুঘরে পাঠিয়েছে। কিন্তু তাদের সেই রাজকীয়তা কি সব চেয়ে দামী মোটরের আছে? আর সেইসব ঘোড়ার রাজকীয়তা? তারা নেই, কিন্তু তাদের প্রতিমূর্তি রয়েছে সেকালের সাক্ষ্য দিতে।

দুই শতাব্দী পেছিয়ে গিয়ে জার্মানীর তথা বাভেরিয়ার শাহী আমলের সঙ্গে এক হয়ে যাই। মনে পড়ে সমসাময়িক ফ্রান্সের সঙ্গে, ইটালীর সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ও অকুণ্ঠিত মিল ছিল। জার্মানরা যে ভিন্ন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ, সুতরাং সকলের উপর সর্দারি করবার জন্যেই তাদের জন্ম এসব ধারণা তখনকার দিনে অকল্পনীয় ছিল। ফ্রেডারিক দি গ্রেট ভলতেয়ারের সঙ্গে পত্রব্যবহার করতেন। ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদর সর্বত্র ছিল। তেমনি ইটালীর বিভিন্ন যুগের শিল্পের। রোমে জার্মান কলাবিদ্ ও গবেষকদের মস্ত আড্ডা ছিল। প্যারিস তো সব দেশের গুণীজনের মক্কা। আন্তর্জাতিকতার আকাশটা ছিল বড়ো। জাতীয়তার মৃত্তিকা তার তুলনায় ছোট। কিন্তু নেপোলিয়নের দিগ্বিজয়ের পর সব ওলটপালট হয়ে যায়। ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা ছিল, সেটার আবেদন একদেশের মাটিতে নিবদ্ধ থাকতে পারত না। কিন্তু নেপোলিয়ন যে দেশেই যান বিপ্লবের পতাকাবাহক হয়ে নয়, ফরাসী পতাকার বাহক হয়ে যান। অপর জাতির আত্মসম্মানে বাধে। স্বকীয়তা মাথা উঁচু করে। মাটির উপর পা রাখে। জোর দেয়। মাটির সঙ্গে সঙ্গে আকাশও খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এটা জার্মানদের আকাশ, ওটা ফরাসীদের আকাশ, এমনি করে সমসাময়িকের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়, মিল কমতে থাকে, অমিল বাড়তে থাকে।

এক এক রাজার একাধিক দেশের উপর রাজত্ব ছিল, সেটা যে সব সময় বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে পরিণয়সূত্রে গ্রথিত ছিল। রাজপুত্র রাজকন্যারা স্বদেশে বিবাহ করতেন না। স্বদেশে সমান ঘর কোথায়? তাই এক একটি রাজবংশ ছিল রক্তসূত্রে আন্তর্জাতিক। রাজবংশীয়ারা সমান ঘরের জন্যে অত দূরে যেতে বাধ্য না হলেও রাজা রাজড়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। অভিজাতরাও সেইভাবে জাতে উঠতেন। সমাজের নেতৃত্ব যতদিন রাজকুল ও সামন্তকুলের হাতে ছিল আন্তর্জাতিকতা ততদিন সহজাত ছিল। যখন মধ্যবিত্তের হাতে এলো তখন জাতীয়তাবাদ হলো তার চেয়ে আরো স্বাভাবিক। মধ্যবিত্তরা তো সমান ঘরের জন্যে দেশের বাইরে যায় না। বিবাহের দ্বারা অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া এক ইংলণ্ডেই কতকটা চলে, অন্যত্র তত নয়। নেশন কথাটা যদিও বহু শতাব্দীর পুরাতন ন্যাশনালিজম তত্ত্বটা গত দুই শতাব্দীর নূতন। মধ্যবিত্ত অভ্যুদয়ের সমসাময়িক এই তত্ত্ব বোধহয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই ঐতিহাসিক 'অবদান'।

সমাজের নেতৃত্ব ক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাত থেকে সরে যাচ্ছে। আর জাতীয়তাবাদের উপর থেকেও মানুষের মন উঠে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের জন্যে যে বিপুল ধনবল ও শ্রমবল চাই তার কোনোটাই মধ্যবিত্তদের নেই। যাদের আছে তারা ধনিক ও শ্রমিক নামে দুই পরাক্রান্ত শক্তি। তাদের স্বার্থ তাদের আন্তর্জাতিক করেছে। তারা দুই শ্রেণীতেই দুনিয়া ভাগ করে নিচ্ছে। নেশন আরো অনেককাল থাকবে, কিন্তু ন্যাশনালিজম তার মধ্যাহ্ন পার হয়েছে। তার চূড়ান্ত দেখা গেল হিটলারের জার্মানীতে। ইতিহাসের ওই অধ্যায়টি একহিসাবে ক্লাসিক। জাতীয়তাবাদ যে কত বলবান অথচ কত বুদ্ধিহীন হতে পারে, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে কত বুদ্ধিমান অথচ কত বলহীন হতে পারে ওটা তার বরাবরের রেকর্ড। ও রকম একটা কনট্রাস্ট ইতিহাসে একবারই হয়। এই সুন্দরী নগরী মিউনিকই ছিল হিটলারের প্রথম দিকের কর্মক্ষেত্র। ক্ষমতা ধর্ষণের প্রথম প্রয়াস এইখানেই। এইখানেই চেম্বারলেনের সঙ্গে কুখ্যাত মিউনিক চুক্তি। পরের দিন পথে যেতে যেতে গ্রাউ বললেন, 'ওই সেই ভবন যেখানে বসে চুক্তি হয়।'

কিন্তু এই কি সব! যুদ্ধের মাঝখানে মিউনিকের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়। ছ'জন সুন্দর মানুষ যুদ্ধবিরোধী ও হিটলারবিরোধী কার্যকলাপের দরুন শান্ত সৌম্যভাবে মৃত্যুবরণ করেন। তাদের একজন নারী। পরে বলব তাঁদের কীর্তিকথা।

॥ আঠারো ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর সৌন্দর্যভোজ থেকে বিংশশতাব্দীর সৌন্দর্যভোজ। নীম্ফেনবুর্গ থেকে ব্রাক প্রদর্শনী। তুলনা করব না। যে যার আপন অধিকারে আপন অর্থে সুন্দর।

কিউবিস্ট রীতির প্রবর্তক বলে ব্রাকের নাম পিকাসোর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত। কিন্তু আরো আগে তিনি আঁকতেন ফোভিস্ট রীতির ছবি। সেখানে মাতিস ছিলেন অগ্রণী। মডার্ন আর্টের পত্তন হয় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে। কারো কারো মতে গত শতাব্দীর শেষের দিকে। সেজান তার জনক। ফোভিস্ট আর কিউবিস্ট উভয় ধারার সঙ্গেই ব্রাকের সংযোগ ছিল। তবে তাঁর পরিণতি আসে কিউবিস্ট ধারায় অনবরত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে। কিউবিস্ট ধারারও পরে তিন প্রশাখা হয়। ব্রাক তার একটিকে আপনার করে নেন। টেবিল, বোতল, গেলাস, গীতার প্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রীর সঙ্গে খবরের কাগজের টুকরো, চেরা কাঠের ফালি, ন্যাকড়া, তার ইত্যাদির সংশ্লেষণ ঘটিয়ে তিনি যার সূত্রপাত করেন তাকে বলে 'কলাজ'।

প্রথম মহাযুদ্ধে জখম হয়ে ব্রাক যুদ্ধোত্তর কালে ডিয়াগিলেফের সঙ্গে যোগ দেন ও ব্যালের অলঙ্করণে মন দেন। পরে তাঁর হাত পড়ে থিয়েটারের শোভাবর্ধনে। মডার্ন আর্ট যখন জাতে ওঠে তখন লুভর মিউজিয়ামের একটি প্রকাণ্ড সীলিং চিত্রায়ণের ভার পড়ে এই শিল্পীর উপর। এর পরে পিকাসো উঠে যান খ্যাতির সোপান বেয়ে উচ্চতা থেকে উচ্চতায়। ব্রাক যদিও নিষ্ক্রিয় থাকেন না তবু তাঁর নাম তত শোনা যায় না। অল্প কয়েকটি সামগ্রীর স্থির জীবন নিয়েই প্রধানত তাঁর পরীক্ষা। শেষের দিকে উড়ন্ত পাখি আঁকাও তাঁর প্রিয় কর্ম। বিভিন্ন বস্তুর প্রাকৃতিক রূপকে ভেঙেচুরে খণ্ড খণ্ড করে তিনি তার গঠনের রহস্য আয়ত্ত করে আবার তাকে নিজের খুশিমতো গড়েন। প্রাকৃতিক রূপের অন্তরালে যে জ্যামিতিক সুষমা আছে তাকে উদ্‌ঘাটন করেন। দৃশ্যত যা স্থির তাতে গতিবেগ সঞ্চার করেন। একটিমাত্র দর্শনবিন্দু থেকে দেখে সন্তুষ্ট হন না। বিভিন্ন দর্শনবিন্দু থেকে দেখেন ও আঁকেন। এক একখানা ছবি বহু বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা। চেনা জিনিসকেও ম্যাজিকের মতো লাগে। আর দুই ডাইমেনসনের ছবিকেও লাগে তিন ডাইমেনসনের মূর্তির মতো। কিউবিজম এক হিসাবে ভাস্কর্যের দিকে পদক্ষেপ। 'এ শুধু দর্শনীয় নয়, এ হচ্ছে স্পর্শনীয়।' তাঁর উক্তি।

এর মধ্যে স্পেসের ব্যাপার টাইমের ব্যাপারও আছে। সেসব বোঝা আমার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে। সেকালের ছবির সঙ্গে একালের ছবির অর্থাৎ মডার্ন আর্ট বলে পরিচিত ছবির মূল তফাৎ এইখানে যে এ ছবি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা। প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্যে এর মাথাব্যথা নেই, বরঞ্চ সাদৃশ্যের থেকে মুক্তিই এর লক্ষ্য। এ কোনো একটা ঘটনার বিবরণ দেয় না, বরং বিবরণের থেকে মুক্তিই এর কাম্য। ছবির অবজেক্ট থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। না থাকলেই বরঞ্চ এর মুক্তি। তবে ব্রাকের নাম অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের সঙ্গে যুক্ত নয়। তাঁর সমসাময়িক কাণ্ডিনস্কির নাম যেমন। এই শতাব্দীর প্রথম পাদে প্যারিস ছিল মডার্ন আর্টের গঙ্গোত্রী আর

মিউনিক তার যমুনোত্রী।

মডার্ন আর্ট উনবিংশ শতাব্দীতে ফিরে যেতে চায় না, অথচ তার কয়েকটি মূলসূত্র এসেছে গ্রীকদের চেয়েও পুরাতন উৎস থেকে। নানা দেশের প্রিমিটিভ চিত্রকলা থেকে, আফ্রিকার নিগ্রোদের ভাস্কর্য থেকে, চীন জাপান ভারত ও পারস্যের রূপজিজ্ঞাসা থেকে। মডার্ন আর্ট সেইজন্যে ফরাসী বা জার্মান বা ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য বলে পরিচিত নয়। সে দেশনিরপেক্ষ তথা আন্তর্জাতিক। মর্ডান আর্টের কেতাবে দেখা যায় জাপানীদেরও ছবি। ওঁরা পশ্চিমের অনুকারী বলে নয়, ওঁরা মডার্ন আর্টের অনুশীলনে অগ্রসর বলে। শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নেই। এটাও একপ্রকার শ্রীক্ষেত্র। রূপ ও রসের শ্রীক্ষেত্র।

ব্রাক বলতেন, 'দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতেই হবে। কোনো বস্তুই যুগপৎ সত্য এবং সদৃশ হতে পারে না।' আরো বলতেন, 'মানুষ যাকে সৃষ্টি করতে চায় তাকে অনুসরণ করা অসম্ভব।'

এই হলো মডার্ন আর্টের বীজতত্ত্ব। কিন্তু বীজ থেকে যে বৃক্ষ হয়েছে তার শাখা প্রশাখার অন্ত নেই। সুতরাং তত্ত্বঘটিত পথভেদ ও রীতিভেদেরও অন্ত নেই। রূপ ও রসের শ্রীক্ষেত্রেও বিষম দলাদলি। ফোভিজম ও কিউবিজম কবে বাসি হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়নি। অর্ধ শতক পরেও এক একটি সৃষ্টি রূপকথার জগতের মতো বিস্ময়ভরা পুলক জাগায়। যেমন কাস্‌লের ছবি, নৌকার ছবি। তত্ত্ব এখানে গৌণ। যা হয়েছে সেইটেই মুখ্য। হওয়াটাই থাকে।

এর পর রূপলোক থেকে সুরলোকে যাত্রা। ব্রাক প্রদর্শনী থেকে ভিকতোরিয়া দে লস্‌ আন্‌জেলেস নাম্নী গায়িকা উত্তমার কনসার্টে। তাঁর পিয়ানো সঙ্গতকার জেরাল্ড মূর। স্থান শীতকালীন রাজপ্রাসাদের সংগীতশালা। গ্রীক পুরাণের বীর হারকুলিসের নামে নামকরণ হারকুলিস মহল। দেয়ালের গায়ে হারকুলিসের দ্বাদশ অসাধ্যসাধনের চিত্র।

প্রথমে মন্তেভের্দি ও স্কারলাতির ইতালীয় গীতি, তার পরে হেণ্ডেল, শুবার্ট, শুমান ও ব্রাহ্‌মসের জার্মান গীতি। বিরাম। বিরামের পর রাভেলের ফরাসী গীতাবলী। শেষে স্পেনদেশের গান। এতক্ষণে সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল। যেন অন্য জগতে ছিল। ইহলোকে ফিরে আসতেই করতালির ঝড়। সে ঝড় আর থামে না। অগত্যা ভিকতোরিয়াকে আবার গ্রীনরুম থেকে ফিরে আসতে হয়। কার্টসি করতে হয়। মূর তো নেই, পিয়ানোর সঙ্গত করবে কে? একা একা গান করতে হয়। যেই গ্রীনরুমে প্রস্থান অমনি আবার করতালির ঝঞ্ঝা। থামে না। পুনঃপ্রবেশ। পুনরায় গান। এ রকম কত বার যে হলো তার সংখ্যা নেই। এর মধ্যে একবার ভিকতোরিয়া মূরকেও ধরে নিয়ে এসে পিয়ানোতে বসিয়ে দেন। কিন্তু মূর আর ফিরতে চান না। তাঁর বয়স হয়েছে। ভিকতোরিয়াই বা কোন তরুণী? চল্লিশ বছর বয়সে এই সেদিন তাঁর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দেড় মাসের খোকাকে কার কাছে রেখে এসেছেন তিনি জানিনে, কিন্তু তাঁর মনটা নিশ্চয় ওর কাছেই পড়ে আছে।

কত কাকুতি মিনতি করলেন তিনি। কিন্তু শ্রোতারা অবুঝ। শেষে—না, শেষ নেই সেই সন্ধ্যার—তিনি কী একটা সারেঙ্গীর মতো যন্ত্র এনে নিজেই নিজের সঙ্গত রাখলেন ও আরো একটি লোকগীতি শোনালেন। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল আর পারছেন না। রাত তখন সাড়ে দশটা। পুরো আধ ঘণ্টা ধরে প্রোগ্রামের বাইরের জলসা চলেছে। তিনি বিদায় নিতেই আবার তেমনি করতালির তুফান। এবার কিন্তু তাঁকে ফিরতে দেখা গেল না। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে আমি ধরে নিলুম যে এইখানেই সত্যি সত্যি ইতি। কিন্তু আমার মতো দু'চারজন ছাড়া আর কাউকে গা তুলতে দেখা গেল না। লোকের বিশ্বাস তাঁর ক্লান্তি নেই, তিনি দেবতা কি অপ্সরা, ভক্তজনের একান্ত আহ্বান এড়াতে পারবেন না, সাড়া দেবেনই। হল থেকে বেরিয়ে আসার পর নিচের তলা থেকেও শুনতে

পাচ্ছিলুম যে করতালির বিরাম নেই। একটু মন্দ হয়ে এলে পরে আবার দ্বিগুণ জোরে তালিবর্ষণ চলেছে। সুদখোর মহাজনদের যেমন সুদের ক্ষুধা মেটে না জার্মান কাবুলিওয়ালাদের তেমনি গানের ক্ষুধা।

নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটান অপেরা, লণ্ডনের কভেন্ট গার্ডেন অপেরা ও মিলানের স্কালা, এই তিনটি বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতশালায় ইনি নিযুক্ত ছিলেন। এ ছাড়া জার্মানীর বায়রয়ট অপেরা উৎসবে গেয়েছিলেন। মিউনিকেও ইনি অচেনা নন। শ্রোতারা জানে কার কাছে কী সুধা প্রত্যাশা করতে হয়। সঙ্গীতের শ্রীক্ষেত্রেও জাতিভেদ নেই। জার্মান যাদের মাতৃভাষা তারা সমান পিপাসাভরে ফরাসী ইতালীয় ও হিস্পানী ভাষার গীতিসুধা পান করছে। ওই যে করতালির আবেগ ওটা নিছক স্বদেশী গানের জন্যে নয়। সঙ্গীতের রাজ্যে দেশবিদেশ নেই। চেতনা সেখানে চাতকের মতো উর্ধ্বাভিমুখ।

'আদম, তুমি কোথায়?' বলে হাইনরিখ ব্য'ল রচিত বিখ্যাত উপন্যাসে হাঙ্গেরীর এক ইহুদী কন্যার কাহিনী আছে। তার নাম ইলোনা। ক্যাথলিকদের কনভেণ্টে শিক্ষিতা। সন্ন্যাসিনী হতে ইচ্ছা ছিল। হয়েছে শিক্ষয়িত্রী। শিশুদের নিয়ে গানের দল গড়েছে। ক্যাথলিক ধর্মসঙ্গীত গায় ও শেখায়। জার্মান ভাষাও ভালোবাসে, পড়ায়। অন্যান্য ইহুদীদের মতো তাকেও বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় যুদ্ধের সময় নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সেখানে মরণ ধ্রুব। কিন্তু যারা ভালো গাইতে পারে তেমন বন্দীদের নিয়ে সঙ্গীতপাগল নাৎসী নায়ক স্বকীয় এক গানের দল তৈরি করেছে, তাদের বেলা মরণ নিশ্চিত হলেও বিলম্বিত।

কন্যাটি জানত না যে বন্দীশিবিরে এক গানের দল আছে, তাতে নেবার জন্যে তাকে পরীক্ষা করা হবে। আসন্ন মরণের জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল সে। গান করতে বলায় সে গাইতে আরম্ভ করে ক্যাথলিকদের 'সর্ব সন্তের বন্দনা'। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যায় কমাণ্ডাণ্ট ফিলসকাইট। অপরূপ কণ্ঠে প্রেরণাময় ধর্মসঙ্গীতের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। তার পর এ মেয়েটি আর্য না হলেও এর অঙ্গসৌষ্ঠব আর্যোচিত অনবদ্য। আর তার নিজের দুঃখ এই যে, সে আর্য হলেও তাকে দেখতে আর্যদের মতো নয়। মেয়েটি সুন্দরী, সে সুপুরুষ নয়। মেয়েটি মহীয়সী, সে মহান নয়। মেয়েটি বিশ্বাসবতী, সে বিশ্বাস করে না। কোনো মেয়ে কোনো দিন তাকে ভালোবাসেনি, সেও কোনো মেয়েকে কোনো দিন ভালোবাসেনি। তার কেমন যেন মনে হয় এ মেয়ের চোখে ভালোবাসার মতো কিছু ফুটেছে।

সহসা খেয়াল হয় এ কন্যা ক্যাথলিক ইহুদী। অমনি তার মাথায় খুন চাপে। সে তখন কম্পিত হস্তে তুলে নেয় তার রিভলভার। জীবনে কখনো আপন হাতে খুন করেনি। কিছুতেই তার হাত ওঠেনি। এবারে কিন্তু সে স্বহস্তে একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার গুলী করতে করতে নিঃশেষ করে দেয় তার রিভলভার আর মেয়েটির প্রাণ।

বিউটি বনাম ডিউটি। ডিউটি এখানে ইর্‌র্যাশনাল।

॥ উনিশ ॥

এ জাতির সৌন্দর্যবোধ যেমন গভীর কর্তব্যবোধও তেমনি প্রখর। কিন্তু বিচার বিবেচনা যদি উন্মার্গগামী হয় তবে বিভীষিকার রাজত্ব। তখন কর্তব্যের অনুশাসনে এক ভাগ জার্মান সব কিছু করতে পারে। তাদের তুলনায় অপর ভাগ ক্ষীণকণ্ঠ হীনবল নির্জীব নিষ্ফল। এরা যদি ভিতর থেকে প্রতিরোধ করতে পারত তা হলে বাইরে থেকে ইংরেজ মার্কিনকে ছুটে আসতে হতো না, রাশিয়ারও ছুটে আসার ন্যায়সঙ্গত হেতু থাকত না। এ কাজ একজনকে না একজনকে করতে হতোই।

তা বলে প্রতিরোধের চেষ্টা আদৌ হয়নি তা নয়। শান্তিবাদী অসীস্টস্কির নাম আগেই করেছি। ধর্মযাজক নীম্যু'লারের নাম সকলের জানা। যুদ্ধের পূর্বে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ নিতান্ত নগণ্য ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের সময় দেশদ্রোহিতার অপবাদ যে কোনো দেশের প্রতিরোধকারীকে নিরস্ত করে। সরকার তো মারেই, জনতাও ছাড়ে না। বলে, শত্রুপক্ষের চর। ইহুদীমাত্রকেই সেই অপবাদে দাগী করা সহজ হয়। যারা ইহুদী নয় তাদের বরাতও পাইকারি হারে না হলেও খুচরো হারে তেমনি করুণ। তা সত্ত্বেও প্রতিরোধ অনুপস্থিত ছিল না। অন্তত একটি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সফলও হয়েছিল।

ইহুদীরা অনার্য বলে পোলরা অজার্মান বলে জিপসীরা অশ্বেত বলে অবশ্যবধ্য। রক্তের বিশুদ্ধির খাতিরে ইতর জাতিদের বধ করাই কর্তব্য। নইলে কুলীন জাতির কুল রক্ষা হয় না। কিন্তু ওই যথেষ্ট নয়। আর্য জার্মানদের মধ্যেও যারা সৌজাত্যের বিচারে বংশবৃদ্ধির অযোগ্য তারা কেন বেঁচে থেকে দেশের অন্ন ধ্বংস করবে? বাসস্থান জুড়ে থাকবে? হাসপাতালের শয্যা আটকে রাখবে? রুগ্ন পঙ্গু বিকলাঙ্গ পাগল বৃদ্ধ ইত্যাদিকে অকারণে বাঁচিয়ে রাখতে যে খরচটা হয় সেটা যুদ্ধের বাজেটে বাজে খরচ। আর যুদ্ধের বাজেটটি আজকালকের দিনে ছোটখাটো নয়। অনেকদিন ধরে অনেক রণক্ষেত্রে বিধিমতো লড়াই চালিয়ে যেতে হলে পদে পদে রসদে টান পড়ে, ডাক্তারে টান পড়ে, নার্সে টান পড়ে। ওদিকে আবার নাগরিকদের আহারে টান পড়ায় তারা টি-বি প্রভৃতি ব্যামোয় ভোগে, তাদের জন্যেও নার্স ও ডাক্তার কম পড়ে। এই সমস্যার উত্তর কী? উত্তর, ইতর জাতির জন্যে গ্যাস চেম্বার, স্বজাতির অযোগ্য অপদার্থদের জন্যে ইউথেনেসিয়া। মেহেরবানি করে চিরকালের মতো ঘুম পাড়ানো।

মানসিক রোগী অপবাদে প্রায় সত্তর হাজার মানুষকে কষ্টহীন মরণ দেওয়া হয়। তাতে নাকি প্রায় অষ্টাশি কোটি মার্ক মুদ্রার সাশ্রয় হয়। এরা প্রায় সবাই আর্য জার্মান। ব্যাপারটা ছাপা থাকে না। চার্চের লোকেরা সোরগোল তোলেন। খ্রীস্টধর্ম তো সব চেয়ে দুর্বল, সব চেয়ে অক্ষমের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াবেই। এতকাল দাঁড়িয়ে আছে তাই করে। এর জন্যে খ্রীস্টধর্মের উপরে অতিমানববাদীরা গত শতাব্দী থেকেই খড়্গহস্ত। দীন দুর্বলের বাঁচার অধিকার মানে যে ধর্ম সে ধর্মেরই বাঁচার অধিকার নেই। চাই পেগান যুগের প্রত্যাবর্তন, যোগ্যতমের উদ্বর্তন, অযোগ্যের উৎসাদন। প্রথম মহাযুদ্ধেও অতিমানববাদীরা তাঁদের থিয়োরি খাটাতে কসুর করেননি। এবারেও প্রয়োগের মওকা পান। কিন্তু চার্চের সোরগোলে সাধারণ মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। পাগল বা পঙ্গু বা অসুস্থ বা বৃদ্ধ বলে যদি কারো বাঁচবার অধিকার না থাকে তবে ক'জন নাগরিক নিরাপদ! রাম শ্যামকে যদি মানসিক রোগের অবসাদে পরলোকে পাঠানো হয় তবে একদিন না একদিন যদু মধুর পালা আসবে।

প্রতিবাদ সফল হয়। ইউথেনেসিয়া বন্ধ হয়। তবে পুরোপুরি নয়। যেসব শিশু জন্ম থেকে

বিকলাঙ্গ বা বিকৃতমস্তিষ্ক তাদের চুপি চুপি সদয়ভাবে মর্ত্য হতে বিদায় দেওয়া হয়। কে কার খবর রাখে! তা ছাড়া হিটলার তখন একটার পর একটা দেশ জয় করছেন। যুদ্ধে একটানা জয় ঘটছে। ভাবনা কী? খুব শীগগির যুদ্ধ খতম হবে। ততদিন একটু আধটু অন্যায় সহ্য করা গেলই বা! শিশু মরছে তো শিশু আবার জন্মাবে। দিগ্বিজয়ীকে ঠেকাতে গেলে দিগ্বিজয় এনে দেকে কে? দ্বিগ্বিজয়ের শর্ত যদি হয় অন্যায়কার্য তবে সে শর্ত না মেনে উপায় কী?

নিরস্ত্র পোলদের উপর ঘাতক লেলিয়ে দিতে এক জার্মান সেনাপতির সামরিক বিবেকে বাধে। এটা তো সামরিক ঐতিহ্য নয়। তিনি হিটলারের কাছে প্রতিবাদ করেন। উত্তর পান, বাপু হে, যুদ্ধ কি কখনো সালভেশন আর্মির পদ্ধতি মেনে চালানো যায়? মারো শত্রু পারো যে প্রকারে। হিটলারের তখন অপ্রতিহত প্রতাপ। যুদ্ধে নেমে একবারও হার হয়নি। নেপোলিয়নের পর কার এ রকম রেকর্ড! বড়ো বড়ো সেনাপতিরাও কর্তাভজা হন। কর্তার অন্যায় হুকুমও মান্য করেন। কর্তব্য!

প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত শাস্তিপ্রাপ্ত দেশকে জয়গৌরবের স্বাদ দেওয়া, বিচ্ছিন্ন বিভক্ত জাতিকে এক পতাকার তলে আনা, সমাজবিপ্লবকে যতদূর সম্ভব পুবদিকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে পরাস্ত বা কোণঠাসা করা এই সবের জন্যেই গড়ে উঠেছিল হিটলারের পরম শক্তিশালী ঐক্যকেন্দ্রিক কর্তৃত্ব। কর্তা যে অপরাজেয় এ পুরাণকথায় প্রত্যয় স্টালিনগ্রাডে পরাভবের পর ভিতরে ভিতরে নড়ে যায়। হিটলারের আত্মবিশ্বাস অবশ্য শেষপর্যন্ত অটল ছিল। তার বারো আনাই জাতীয় আত্মসম্মান। বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে জার্মান জাতি রাজী ছিল না, কারণ সেটা আত্মসম্মানবিরুদ্ধ। সেখানে নেতা ও জাতি এক ও অভিন্ন। ওদিকে মিত্রপক্ষ শর্তাধীন আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবেন না। তাঁদেরও ধনুর্ভঙ্গ পণ প্রথম মহাযুদ্ধের বেলা যা ঘটেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলা তা ঘটতে দেবেন না। এবার জার্মানীর বিষদাঁত ভেঙে দেবেন।

এই ট্রাজেডী পঞ্চম অঙ্কের অন্তিম দৃশ্য পর্যন্ত অভিনীত হলোই। কেউ সংক্ষেপ করতে পারল না। কিন্তু স্টালিনগ্রাডের পর পুরাণকথায় প্রত্যয় কমজোর হতে থাকে। তখন নতুন একটা পুরাণকথা তার স্থান নেয়। ইংরেজ মার্কিন কি রুশ বিপ্লবকে জার্মানীর চৌকাঠ মাড়াতে দেবে? কক্ষনো না। নিজেদের স্বার্থেই তারা জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করবে দেখো। এতদিন যখন সেকেণ্ড ফ্রন্ট খোলেনি তখন সত্যি কি সেটা খুলবে? পরে একদিন এ পুরাণকথারও ভিৎ টলে যায়। অল্প কয়েক সপ্তাহ পরে স্টাউফেনবার্গের বোমার বিস্ফোরণ। হিটলারের সামান্য চোট লাগে। হিমালয়প্রমাণ হিংসার সঙ্গে বল্মীক সমান হিংসা পারবে কেন? তেইশ ঘণ্টার মধ্যে বিরোধীদের সন্ধান, বন্ধন ও চরম দণ্ড সারা হয়।

কিন্তু স্টালিনগ্রাডের পরেই সেকেণ্ড ফ্রন্টের অনেকদিন আগেই এই মিউনিক শহরেই একপ্রকার প্রতিরোধ দেখা দেয়! সেটি তৎকালীন অবস্থায় যেমন সাহসিক তেমনি অহিংস। প্রধান রাজপথের দেয়ালে দেয়ালে পাকা পেন্ট দিয়ে লেখা : 'হিটলারের পতন হোক।' কমসে কম সত্তরটি জায়গায়। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারের উপরে লেখা : 'স্বাধীনতা'। এর দিনকয়েক পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ইস্তাহার বিলি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় দু'জন ছাত্রছাত্রী। হান্স্ শল্ ও তার বোন সোফি শল্। এদের মণ্ডলীতে ছিল আরো তিনটি ছাত্র। ক্রিস্টফ প্রবস্ট, আলেকজাণ্ডার স্মোরেল, ভিলি গ্রাফ। মণ্ডলীর পিছনে ছিলেন এদের বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী অধ্যাপক কুর্ট হুবার। সব ক'জনকেই ধরে নাৎসী পদ্ধতিতে বিচার করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ফাঁসী নয়, গুলী নয়, শিরচ্ছেদ। অবশ্য এরা আরো আগে থেকেই ব্যাপকভাবে ইস্তাহার বিলি করে আসছিল ও কোনো কোনো ইস্তাহারে কেবল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয় সাবোটাজ প্রচার করা হয়েছিল। সোফি এদের

কার্যকলাপের সঙ্গে মাত্র শেষবারটি সংশ্লিষ্ট ছিল, তবু স্বেচ্ছায় অপরের অপরাধ আপনার ঘাড়ে নেয়। প্রত্যেকেই সৌম্যভাবে শান্তভাবে মরণ বরণ করে।

অধ্যাপক হুবার 'জন আদালতে' যে জবানবন্দী দেন তার খসড়ার একাংশ এইরূপ—

'What I aimed to do was to rouse my students, not by means of an organisation but by the simple word, not to an act of violence but to an ethical understanding of the grave evils in our present political life. A return to definite ethical principles, to the law, to mutual trust between man and man—that is not illegal, rather it is the re-establishment of legality......There is an ultimate limit beyond which all outward law becomes untrue and immoral. It is reached when law becomes a cloak for cowardice, for the fear to oppose manifest infringements of Justice. A state which forbids all free expression of opinion, all justifiable criticism, and visits the most fearful punishments on every proposal for betterment, calling it 'Preparation for High Treason', breaks and unwritten law which still has its place in 'healthy popular sentiment' and must still retain it. ...One thing I have achieved : I have uttered this warning not in a small, private debating society, but before a responsible court, the highest court in the land. I have risked my life to give this warning, this solemn prayer that we mend our ways.'

মানবাত্মা এইভাবেই দানবিকতার প্রতিরোধ করে। বোমা দিয়ে নয়, মহত্তর মানবিকতা দিয়ে। এসব কথা প্রাণ খুলে বলতে পারাও মুক্তি। এরা ক'জন মুক্তির স্বাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে। নয়তো দেশদ্রোহিতার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মরা দুর্বহ হতো।

ওসব ইস্তাহারে ইহুদীহত্যা, পোলহত্যা, পোল অভিজাতকন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নরওয়ের নাৎসী বেশ্যালয়ে পাঠানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ছিল। অন্তত ছ'জন জার্মানও যে মুখ ফুটে আপত্তি জানাতে পেরেছিল এটা ইতিহাসের আদালতে জার্মানীর অনুকূলে যাবে। তার মহাকলঙ্কের কতকটা স্খালন হবে। ছিল, ছিল, মানুষ ছিল, মানুষের হৃদয় ছিল, মানুষের হৃদয়ে প্রেম ছিল, সে প্রেম ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। জার্মানীর অন্তরের প্রেম শিরশ্ছেদেও নির্বাপিত হয়নি। প্রেম অনির্বাণ।

'Greater love hath no man than this that he lay down his life for his friends.'

যীশুর এই মহান উক্তির পুনরুক্তি করেন কারাগারের পাদ্রী। মৃতদেহ কবর দেবার ক্ষণে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। তার দিকে ইশারা করে বলেন, 'আবার উদয় হবে।'

ক্রিস্টফ লিখেছিল তার মাকে, 'তোমাকে ধন্যবাদ, তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ বলে। যখন সব কথা ঘুরে ফিরে ভাবি তখন দেখতে পাই আমার সমস্ত জীবনটাই ঈশ্বরের দিকে যাবার একটা পন্থ। এখন আমি তোমার এক পা আগে যাচ্ছি, মা। তোমার জন্যে চমৎকার একটি অভ্যর্থনা প্রস্তুত করে রাখব।'

মানবিকবাদ ও ভাগবতবাদ জার্মানীকে আসুরিক শক্তির হাতে সঁপে দিয়ে মানবের প্রতি ও ভগবানের প্রতি কর্তব্যহানি করেনি, স্বদেশের প্রতি ও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। করলে সে কলঙ্কের স্খালন হতো না। মানবিকবাদী হুবার ও ভাগবতবাদী ক্রিস্টফ ও আরো চারজন সমানধর্মা জার্মানজাতির মুখ রক্ষা করেছেন। কার নাম দেশপ্রেম ও কার নাম দেশদ্রোহ এর শেষ বিচারের দিন আসেনি। কিন্তু আসবেই। হান্স ও সোফি শলের পিতা 'জন আদালতে'র দণ্ডাদেশ শুনে চিৎকার করে ওঠেন, 'এ ছাড়া আর-একটা ন্যায় আছে।' আছে বইকি। নিশ্চয় আছে।

॥ বিশ ॥

আমাদের সৌভাগ্য দেখছি সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। আবার একটি আলো ঝলমল দিন! হে সূর্য, হে আকাশ, আমি কৃতার্থ।

ইসার নদের ওপারে ফিশার-বলে এক নামকরা সংস্থা। তাঁদের প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন থেকে আধুনিক সংস্কৃত হিব্রু আরবী ফারসী বাংলা হিন্দী তামিল প্রভৃতি বিবিধ প্রাচ্য ভাষার কাব্যসঙ্কলন ছিল। জার্মান ভাষার তর্জমা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম হয়েছে বঙ্কিমচাঁদ। ভুল ধরিয়ে দিতেই হাতে হাতে বকসিস। ওই সঙ্কলনের এক কপি।

যাতায়াতের পথে এক জায়গায় লক্ষ করি সব সময় সকলের নজরে পড়বার মতো উচ্চতায় স্থাপিত এক মূর্তি। আগে তো কখনো দেখিনি। না, আগে ওর সৃষ্টি হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আসমান থেকে নেমে এসেছেন 'শান্তির দেবদূত।' কে জানে আবার কোনদিন না উড়ে চলে যান। ডানা থাকার ওই তো দোষ। মানুষ যদি জানত তাঁর ডানা দুটো কেটে রাখতে! তা হলে ডানাকাটা পরী যেমন আমাদের ঘরে ঘরে তেমনি ডানাকাটা শান্তিও আমাদের দেশে দেশে বিরাজ করতেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন এক রেস্টোরান্টে। ভোজনসাথী বাভেরিয়ার ললিতকলা আকাডেমির সাধারণ সম্পাদক ক্লেমেন্স গ্রাফ পোডেভিলস্ ও উদীয়মান প্রবন্ধকার হর্স্ট বিনেক। গ্রাফ অর্থাৎ কাউন্ট পোডেভিলস্ অভিজাত বংশীয় প্রবীণ। পোশাকে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, কিন্তু চেহারায় একটা স্মিত বিষণ্ণ নির্লিপ্ত সুকুমার লালিত্য। ব্যবহার অকৃত্রিম বিনম্র নিরহঙ্কার। ইংরেজীতেই আলাপ করলেন।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে কখন এক সময় দেখি ভারতের নীতি ও গান্ধীজীর নীতি ব্যাখ্যা করছি। আমি যেদেশ থেকে এসেছি সেদেশের লোক মন থেকে বিশ্বাস করে না যে আবার মহাযুদ্ধ বাধবে, বাধলে ভারত তাতে জড়িয়ে পড়বে। শান্তির বাণী সহজেই আমাদের মুখে আসে। আমাদের মন আর মুখ এক। হিংসাকে রুখতে না পারলেও হিংসার চেয়ে অহিংসার দিকেই আমাদের টান, তার একটা বহমান ক্ষীণ ধারা অনুমান করতে পারা যায়। এই তো সেদিন ঢাকার কয়েকজন মুসলমান খালি হাতে দাঙ্গা থামাতে গিয়ে খুন হয়ে গেলেন। হাতিয়ার নিয়ে লড়তে যাননি কেন প্রশ্ন করায় ঘটনার বিবরণদাতা উত্তর দেন, গান্ধীজীর শিক্ষা। আমার সংবাদদাত্রী জেরা করেন, মুসলমানদের মধ্যে গান্ধীজীর শিক্ষা! তাও পাকিস্তানে? বিবরণদাতা বলেন, হাঁ।

অপর পক্ষে ইউরোপে সে অনুভূতি নেই। যদিও একরাতের পথ তবু একেবারে অন্য জগৎ। এখনকার ইউরোপের লোক, বিশেষ করে জার্মানীর লোক, কামানের মুখে বসে আছে। তাদের সব হাসিখেলার পিছনে ওই নিরেট সত্য যে কামান হাঁ করে আছে। তা বলে কি অহিংসা একটা বিশ্বজনীন নীতি নয়? তার প্রয়োগ কি একটি কি দুটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে? জাতীয়তাবাদ যদি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সাম্যবাদ যদি বিশ্বের অর্ধেক আয়তন জুড়ে থাকে তা হলে অহিংসাবাদ কেন সীমাহীন হবে না? যেখানে তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সব চেয়ে আশঙ্কা সেইখানেই তো তার সব চেয়ে বড়ো পরীক্ষার ক্ষেত্র। কেউ কেন তাকে হিসাবের মধ্যে ধরবে না? কেউ কেন তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে না?

কাউন্ট মৃদু হেসে বলেন, 'অহিংসা! সে কি কখনো সম্ভব। ইউরোপে! যেখানে তার পাটই নেই!'

আমাদেরও কি ছিল? গান্ধীজী আসার আগে অহিংসা বলতে যা বোঝাত রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক অর্থে নয়। জাতিগত বা শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব বিরোধের ক্ষেত্রে নয়। দু'চারজন সাধুসন্ত তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণে অহিংস ছিলেন। তা ছাড়া কতক লোক নিরামিষভোজী ছিল। যুদ্ধের বা বিপ্লবের বিকল্প হিসাবে অহিংসার প্রয়োগ গান্ধীজীর পূর্বে আমাদের কারো মাথায় আসেনি। ভারতে যা দু'দিন আগে ব্যবহার করা হয়েছে ইউরোপে তা দু'দিন পরে ব্যবহার করা কেন সম্ভব হবে না?

তার পর ইউরোপে যে তার কোনো নজীর নেই তা নয়। ইতিহাসের পাতায় একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। জার্মানীতেও। সেদিন তার উল্লেখ করি। আসলে ভারতের কোনা পেটেন্ট নেই। তার থেকে আসে মিস্টিকদের কথা। জার্মানীর মিস্টিক ঐতিহ্যের কথা। কাউন্ট উদ্দীপ্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'ওঃ! এক্‌হার্ট!'

এক্‌হার্ট, ব্যা'হ্মে প্রভৃতি মিস্টিকদের ধারা এখন শুকিয়ে গেছে কি না জানিনে, কিন্তু এ ধারা বহতা ছিল বলেই জার্মানীর ক্লাসিকাল সংগীত স্বর্গ ছুঁয়ে আসতে পেরেছিল। সেখানে তো জার্মানদের সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। বরং সকলেই তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও জার্মানী বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল, সেখানেও বিরোধ ছিল না। কিন্তু পার্থিব সাফল্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞানচর্চা, অহমিকার সঙ্গে মিলিয়ে দর্শনচর্চা, বাহুবলকে গৌরবের আসনে বসিয়ে শাস্ত্রচর্চা, শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করে বুদ্ধিচর্চা জার্মানীকে যেখানে নিয়ে গেছে সেখানে হিউমানিজমের শত্রু হয়েছে প্রাণের মহিমা অস্বীকার। ফলে তারও শত্রু হয়েছে চারিদিকে। ঘরের ভিতরেও ভূমিষ্ঠ হয়েছে হেগেলের ডায়ালেকটিকের গর্ভ থেকে ঘরভেদী ডায়ালেকটিক। মনীষাকে হাতিয়ারে পরিণত করলে সে হাতিয়ার বুমেরাং হতে পারে। একদিন সে আকাশ থেকে বোমা হয়ে নামতে পারে।

গত মহাযুদ্ধে মিউনিক বোমাবর্ষণে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতদিনে সে ক্ষতির পূরণ হয়েছে। তবে এখনো দুটো পুরোনো বাড়ির আধখানা উড়ে গেছে দেখা যায়। নতুন অপেরা হাউস তৈরি হচ্ছে। নতুন যা কিছু হচ্ছে তা নতুন বাস্তুকলা অনুসারে হচ্ছে। তবে গির্জাকে তো আর নতুন ছাঁদে গড়া যায় না। সেখানে পুরাতনের অনুবর্তন চাই। নইলে লোকের মন মানে না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেছে। জাহাজের মতো একটা বাড়ি, তার আলাদা একটা মাস্তুল দেখে আমি ঘাবড়ে যাই। এটা নাকি পুনর্গঠিত একটা গির্জা। সেণ্ট ম্যাথিউর গির্জা।

গির্জা হবে এমন যাকে দেখে গির্জা বলে চিনতে পারা যায়, যাকে দেখে স্বতঃ ভক্তিসঞ্চার হয়। তা নয় তো এ কী অনাচার! মডার্ন আর্টের জন্যে আর জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না! অ্যাঁ! আমি হতভম্ব হয়ে তাকাই; এর নাম গির্জা!

গ্রাউ আমাকে বোঝালেন যে, সেকালের গির্জা ছিল সেকালের মানুষের ধর্মভাবের বহিঃপ্রকাশ। একালের মানুষের ভিতরে যদি সেই ধর্মভাব না থাকে তবে তার বহিঃপ্রকাশ কী করে সেই প্রকার হবে? হলে সেটা হবে অসাধুতা। আমরা যা নই তাই বলে জাহির করা অন্যায়। একালের গির্জা একালের মানুষের অন্তরের কথা একালের বাস্তুকলার ভাষায় ব্যক্ত করছে। আমরা যা আমরা তাই। আমরা আর কেউ নই, আর কিছু নই।

মডার্ন আর্টের আওতার বাইরে যায় হেন সাধ্য দেখছি গির্জারও নেই। সাধারণ বাসভবনের সাধ্য কী যে এই জলতরঙ্গ রোধ করে! মিউনিক শুধু নয়, যেখানেই বোমা পড়েছে, সেখানেই মডার্ন আর্ট উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সেইটেই জাস্টিফিকেশন। মানুষ তারই দিকে তাকিয়ে পুরাতনের শোক ভুলছে। যেন নতুনকে জন্ম দেবার জন্যেই পুরাতনের মৃত্যু ঘটল। মহাযুদ্ধ যেন সূতিকাগার। পুরাতন যেন নূতনের প্রসূতি।

আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে মডার্ন আর্টের চিত্রময় রূপ দেখি। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের

'সেতু' গোষ্ঠীর আড্ডা ছিল ড্রেসডেন, সদস্যরা সকলেই জার্মান। পরবর্তী 'নীল ঘোড়সওয়ার' গোষ্ঠীর আস্তানা মিউনিক, সেখানে জড় হন নানা দেশের শিল্পী। রাশিয়া থেকে কাণ্ডিনস্কি ও জাভ্লেনস্কি, সুইটজারল্যাণ্ড থেকে পল ক্লে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী হয় এক্সপ্রেসনিজমের পীঠস্থান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মৃতপ্রায় চিত্রকলার পুনর্জীবন ঘটেছে অ্যাবস্ট্রাক্ট পরিভাষায়। অন্যতম শিল্পী নায় (Nay)। দেখতে পেলুম তাঁর কাজ।

॥ একুশ ॥

সেদিন কে যেন বললেন, 'আপনি গ্রুপ সাতচল্লিশের লেখকদের সঙ্গে আলাপ করতে চান। কিন্তু তাঁদের দেখা পেতে হলে যেতে হয় দক্ষিণ জার্মানীর একটি অখ্যাত নিভৃত পাহাড়ে। সেখানেই এ বছর তাঁদের সম্মিলন। কয়েকদিন চলবে।'

তা হলে আবার স্টুটগার্টে ঘুরে যেতে হয়। তার উপায় ছিল না। শুনেছিলুম, দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বিখ্যাত লেখক এরিখ্ ক্যে'স্নার (Kästner) থাকেন মিউনিকে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহ প্রকাশ করি। প্রথমটা তাঁর সম্মতি পাওয়া যায়নি, বোধ হয় আমি সরকারী অতিথি বলে। ওদিকে সরকারী মহলেও তিনি বামপন্থী বলে পরিচিত। পশ্চিম জার্মানীতে কমিউনিস্ট নেই, সুতরাং বামপন্থীরাই চক্ষুঃশূল। সম্ভবত পি ই এন-এর সেক্রেটারি ক্রেমার-বাডোনির চিঠি পেয়ে তাঁর মত বদলায়। তিনি একজন প্রাক্তন সভাপতি কিনা।

'উনি বাড়িতেই ডিনার খান, ডিনারে যোগ দিতে পারবেন না, কিন্তু ডিনারের পর রেস্টোরাণ্টে এসে আলাপ করবেন।' গ্রাউ আমাকে খবর দেন।

একটা যুগোস্লাভ রেস্টোরাণ্টে নৈশভোজন করছি, ভোজ্য তালিকায় আমাদের মোগলাই খানার দুটো-একটা পদ আছে। এমন সময় ক্যে'স্নার এসে একটু তফাতে আসন নিলেন ও পানীয় ফরমাস করলেন। পর পর কয়েক পেগ হুইস্কি। বয়স ষাটের উপর, কিন্তু মনে হয় আরো কম। সুরসিক লাজুক প্রকৃতির মানুষটি। ভিতরে ভিতরে শক্ত। পানীয়ের দাম নিজেই বহন করলেন। সরকারের আতিথ্য নিলেন না।

উনি যখন আঠারো বছর বয়সের ছাত্র, তখনো স্কুলের পড়া শেষ হয়নি, তখন ওঁকে ধরে নিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বছর-খানেক পরে লড়াই খতম হলো। বাড়ি ফিরলেন দুর্বল হৃৎপিণ্ড নিয়ে। এর পর মুদ্রাস্ফীতিতে পিতামাতা নিঃস্ব হন। লেখাপড়ার খরচ চালাতে অক্ষম হন। ছাত্রবৃত্তি হিসাবে যা পেতেন তাতে কোনো রকমে এক প্যাকেট সিগারেট কেনা যায়। তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে কলম ধরতে হয়। প্রথমে এক আপিসে, তার পরে সাংবাদিকরূপে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়ে তিনি সাংবাদিকতাই করতে থাকেন, কিন্তু লেখার ঝাঁজ এত বেশী যে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তখন তিনি ড্রেসডেন থেকে বার্লিনে চলে যান ও দেখতে দেখতে লেখকরূপে নাম করেন। সামরিকবাদের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে জ্বালাভরা ব্যঙ্গকবিতা লিখতেন। তাঁর ব্যঙ্গকবিতাগুলো হিটলারের পূর্বের জার্মানীতেও হুল ফোটাত। হিটলার যেই মসনদে বসলেন অমনি হুকুম দিলেন, অমন বইয়ের মুখে আগুন লাগাও। চব্বিশ জন সাহিত্যিকের বইয়ের মধ্যে তাঁর বইগুলিও পুড়ল। দাহকালে একমাত্র তিনিই স্বচক্ষে দর্শন করেন।

সাত শ'-আট শ' জন সাহিত্যিক মানে মানে দেশান্তরী হন। সাহিত্যকে বাঁচাতে, আপনাকে বাঁচাতে। সীমান্ত পার হলেই সুইটজারল্যাণ্ড। সেখানেও জার্মান চলে। আমেরিকাতেও বিস্তর জার্মানভাষী। ইংলণ্ডে গিয়েও নানাভাবে অর্থোপার্জন করা যায়। ক্যে'স্‌নার কিন্তু স্থির করেন যে, তিনি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। দেখবার জন্যে থাকবেন। যা থাকে কপালে।

যুদ্ধের পরে মার্কিনদের সঙ্গে দেখা হলেই তাঁরা শুধাতেন, 'আপনার লেখা বারণ জেনেও কেন আপনি জার্মানীতে থেকে গেলেন, যখন লণ্ডন, হলিউড বা জুরিখে বসে আপনি আরো বেশী সুখের ও আরো কম বিপদের জীবন যাপন করতে পারতেন।'

তিনি উত্তর দিতেন, 'লেখক যে নেশনের অঙ্গ দুঃসময় এলে সে নেশন কীভাবে আপন ভাগ্য বহন করছে এ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে লেখকের ইচ্ছা করে। লেখকের পক্ষে এটা একটা অবশ্যলভ্য অভিজ্ঞতা। জাতির দুঃসময়ে দেশের বাইরে যাওয়া কেবল তখনি যুক্তিক্ষম যখন প্রাণরক্ষার অন্য উপায় নেই। সর্বপ্রকার আপদ-বিপদের ঝুঁকি মাথায় নেওয়াই তো লেখকের বৃত্তিগত কর্তব্য, যাতে সে চাক্ষুষ সাক্ষী হতে পারে, চাক্ষুষ সাক্ষী হিসাবে একদিন যাতে সাক্ষ্য দিতে পারে।'

ক্যে'স্‌নার যে কেবল জার্মানীতেই থেকে যান তাই নয়, একেবারে খাস বার্লিনে। দর্শকের পক্ষে সেইটেই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। চোখ কান খোলা রাখলে অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কিন্তু মুখে তালা না দিলে প্রাণটাই চুরি যায়। আর লেখনীকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হয়। ও যে তলোয়ারের চেয়ে ধারালো।

আমি জানতে চাই, কী করে তিনি টিকে থাকতে পারলেন। নাৎসীদের চোখে ধুলো দিয়ে।

'আমি তো ওদের কোনো ক্ষতি করিনি,' তিনি করুণভাবে ঈষৎ হাসেন। 'লিখতুম অক্ষতিকর রচনা।' শিশুপাঠ্য কাহিনী বা ছড়া।

'তাতেই আপনার সংসার চলত?' বোকার মতো প্রশ্ন করি।

ক্যে'স্‌নার নীরব। গ্রাউ বললেন, 'অন্যান্য দেশ থেকে রয়ালটির টাকা আসত। পুরোনো বইয়ের অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ তো বন্ধ ছিল না।'

এসব দরজা খোলা ছিল। আমার জানা ছিল না যে, একমাত্র 'এমিল এবং ডিটেকটিভরা' বলে ছেলেদের বইয়েরই পঁচিশটি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। ভিন দেশ থেকে রয়ালটির টাকা না এলে ক্যে'স্‌নার কী করতেন জিজ্ঞাসা করিনি।

ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অযথা কৌতূহল ভালো নয়। আমি রাশ টানি। যে প্রশ্নটা আমাকে ত্রিশ বছর ধরে ধাঁধায় ফেলেছে সেটার উত্তর আমি বই কাগজ পড়ে ঠিকমতো পাইনি। তাই সরেজমিনে অনুসন্ধান করতে এসেছি। জার্মানদের মতো জাতি—যাদের আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি—তাদের দেশে কী করে এত কাণ্ড সম্ভব হলো।

'সম্ভব হলো কী করে?' আমি আবেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি। দরদী বন্ধুর মতো। জার্মান জাতির বিরুদ্ধে আমার অন্তরে বিতৃষ্ণা নেই। বিরাগ শুধু নাৎসীদের উপরে। ১৯২৯ সালে আমি নাৎসীদের তেমন কোনো প্রভাব লক্ষ করিনি। হিটলারের নামও কদাচিৎ দেখেছি। অসংখ্য পার্টি ছিল। তাদের বিভিন্ন কর্মসূচী ছিল। লোকে যাদের ভোটে জিতিয়ে দিত তারা নাৎসী নয়। কী করে মানুষ বুঝবে যে, বছর দু'তিনের মধ্যে দুনিয়াটা উল্টে যাবে! অবশ্য এটা আমি জানতুম যে, জার্মানরা সুখে নেই। আর একটা যুদ্ধের জন্যে ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে। তা বলে হিটলারের একনায়কত্ব! জাতিবৈর! চিন্তার ও বিবেকের স্বাধীনতাহরণ! সাহিত্যের ও শিল্পের নিষ্প্রদীপ! সামগ্রিক সামরিকতা! অসামরিক জনগণকে পাইকারিভাবে জবাই! হিংসা আর মিথ্যার বিষ

পরিবেশন করে স্বজাতির মনকেও হত্যা! এসব সম্ভব হলো কী করে?

'এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।' ক্যে'স্নার অভিভূত হয়ে বলেন, 'বিষয়টা এতবেশী জটিল যে জট খোলাই দুঃসাধ্য।'

আমাকে নিরাশ হতে দেখে তিনি আরো দু'এক কথা জুড়ে দেন। 'এর জন্যে দায়ী বিসমার্ক। তিনি যে বীজ বুনে গেছেন তারই ফসল ফলছে।'

জার্মান ঐক্য প্রমুখ মহাসমস্যাগুলোর সমাধান ভদ্রভাবে পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে হবার নয়। তার জন্যে চাই 'রক্ত আর লৌহ।' বিসমার্কের এই উপলব্ধি ও উক্তি জার্মানীর সফলতা-বিফলতা উভয়ের মূলে। ভালোমন্দ দু'রকম ফলই ফলেছে। একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করা যাবে কী করে? বিসমার্কের সাফল্য দেখে মনে হয়েছিল, ওর মতো মোক্ষম উপায় আর নেই। 'রক্ত আর লৌহ' দিয়ে যে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের বৈফল্য দেখে লোকের চোখ ফোটে। ভদ্রভাবে পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে বড়ো বড়ো সমস্যাগুলো সমাধান দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়, এ প্রত্যয় জাগে। কিন্তু সে আর কতদিন! নাৎসী এবং কমিউনিস্ট মিলে দেশের লোককে ভজায় যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় নয় ভদ্র কিংবা পার্লামেণ্টারি। অল্পদিনেই লোকে ভুলে যায় যে, বিসমার্কীয় সিদ্ধির উলটো পিঠ প্রথম মহাযুদ্ধের অসিদ্ধি। বিস্মরণ থেকে আসে হিটলারীয় সিদ্ধি ও তার উলটো পিঠ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অসিদ্ধি।

পূর্ব জার্মানীর প্রসঙ্গ যে-কোনো জার্মানের মুখে বিষাদের কালিমা মাখিয়ে দেয়। ক্যে'স্নার তাঁর বিষাদকে হুইস্কির সলিলে ডুবিয়ে দিলেন।

'পূর্ব-পশ্চিম জার্মানী কি এমনি বিচ্ছিন্ন থাকবে?' জিজ্ঞাসা করি উদ্বেগভরে। দেখছি তো কেমন করে মানুষ ভিতরে ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে। সইতে পারছে না এই বিচ্ছেদ।

ক্যে'স্নার এ নিয়ে নিশ্চয় অহরহ ভেবেছেন। আমার দিকে চেয়ে স্মিত হেসে বলেন, 'সিন্থেসিস। একদিন একটা সিন্থেসিস হবে।'

অর্থাৎ পশ্চিম জার্মানী হচ্ছে থীসিস। পূর্ব জার্মানী হচ্ছে অ্যান্টিথীসিস। থীসিসের সঙ্গে অ্যান্টি-থীসিসের বিরোধ থেকে আসবে সিন্থেসিস। তখন পশ্চিম জার্মানী আর ক্যাপিটালিস্ট থাকবে না, পূর্ব জার্মানী আর কমিউনিস্ট থাকবে না, তৃতীয় একটা ব্যবস্থাসূত্রে গ্রথিত হয়ে এক হবে।

'দুটো সিস্টেম। এ দিকে একটা সিস্টেম, ও দিকে একটা সিস্টেম।' তিনি বেশী কথা বলেন না ইংরেজীতে। সংক্ষেপে বোঝালেন যে, পূর্ব পশ্চিমের তফাৎটা নিছক ভৌগোলিক নয়। দু'দিকের দুটো সিস্টেম কোনোটা কোনোটার সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। সেইজন্যে পূর্ব পশ্চিম জার্মানী মিলে মিশে এক হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু সম্ভব। মিলন সম্ভব। যখন দুই সিস্টেমের সংশ্লেষণে তৃতীয় এক সিস্টেম জাত হবে।

ক্যে'স্নার হিটলার-পূর্ব জার্মানীতে যেসব ব্যঙ্গকবিতা লিখেছিলেন বছর-কয়েক আগে তার কয়েকটি খণ্ডের নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। একটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'(ব্যঙ্গকবিতার লেখক যা লিপিবদ্ধ করেছেন) তা অসুখের ডায়গ্নসিস দেওয়া ছবি। কার অসুখ? কোনো একটি মুহূর্তের অসুখ নয়, প্রহরের অসুখ নয়, দিবসের অসুখ নয়, গোটা যুগটারই অসুখ। যেসব ব্যঙ্গকবিতা ১৯৩০ সালের অবস্থার প্রতি প্রযোজ্য ছিল সেসব যদি ১৯৬০ সালের অবস্থার প্রতিও প্রযোজ্য হয়ে থাকে তবে তার কারণ এই নয় যে, লেখক একজন ভবিষ্যদ্রষ্টা। তার কারণ হচ্ছে এই যে, নিযুত নিযুত মানুষের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে সঙ্গে যুগটারও মরণ হয়নি। যতকিছুই বদলে গিয়ে থাক না কেন অতি স্বল্পই সত্যি বদলেছে। এবং অতি স্বল্প লোকেরই

পরিবর্তন হয়েছে। একটা নতুন যুগ এলেই আর পুরোনো ব্যঙ্গকবিতার প্রযোজ্যতা থাকবে না। তখন নতুন ধরনের সব ক্রনিক রিয়ালিটি দেখা দেবে। পরবর্তী 'আধুনিক যুগে'র বিশেষ বিশেষ ব্যাধি। তখনি কেবল নতুন ব্যঙ্গকবিতা লেখা চলবে।'

আসলে অত সহজে একটা যুগের অবসান হয় না, তার অসুখেরও অবসান হয় না। দেশে ভেঙে যাওয়া বা জোড়া লাগার চেয়ে আরো গভীরে যেতে হবে। এমন কি বিসমার্কের চেয়েও আরো পেছিয়ে যেতে হবে। এ যুগের আরম্ভ যে শুধু জার্মানীতেই তা নয়। শিল্পবিপ্লবের শুরু যেখানে সেইখানেই এর সূত্রপাত।

॥ বাইশ ॥

প্রকৃতির থেকে যে যত বেশী দূরে যাবে, সে তত বেশী সভ্য, সে তত বেশী সংস্কৃতিবান। শিল্পীরাও পৌঁছে গেছেন প্রকৃতি অনুকৃতি ও বিকৃতি ছাড়িয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে। অসুখের নিদান তো এইখানেই। এখন আমরা টুরিস্টদের মতো প্রকৃতিকে বাইরের থেকে দেখি। এই যেমন আমি যাচ্ছি দক্ষিণমুখে বাভেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চল দেখতে। তার আগে একবার মডার্ন আর্টের প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, বিভিন্ন রীতির উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। আর্ট কেমন করে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টে এসে ঠেকল, তার মোটামুটি একটা ধারণা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা জাগছে যে, এর পরে কী? আরো অ্যাবস্ট্রাক্ট? না এক-পা এক-পা করে পিছু হটা?

আমি বিশ্বাস করি যে, প্রকৃতির কাছে একদিন ফিরে যেতে হবেই, যদি এ অসুখ সারাতে হয়। ফিরে যাওয়া মানে পরিদর্শকের মতো নয়, ঘরের ছেলের মতো। কোটি কোটি প্রাণ বলি দিয়ে হয়তো এক অন্ধকার শক্তিকে পরাস্ত করা যায় বা একটা নৈতিক অরাজকতাকে আয়ত্তে আনা যায়, কিন্তু জীবনের রূপান্তর শুধু বলিদানের বিনিময়ে হয় না। তার জন্যে চাই নতুন ধ্যান, নতুন চেতনা, নতুন সৃষ্টির প্রেরণা। নতুন নিশ্চিতি, নতুন স্থিতি। নতুন অর্থপূর্ণতা। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম না হলে এসব হবার নয়। আরো নাগরিকতা, আরো যান্ত্রিকতা, আরো সমৃদ্ধি, আরো ক্ষমতার পরিণাম আরো অসুখ। মহাকালীর কাছে কোটি কোটি নরবলি দিয়েও তার থেকে পরিত্রাণ নেই।

তা বলে প্রাথমিক যুগে ফিরে যাবার কথা ওঠে না। প্রকৃতির কোলে যে-কোনো দিনই ফিরে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রাথমিক যুগে কোনো দিনই ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতি চিরন্তন, কিন্তু আদিকাল বরাবরেব মতো গতকাল। সভ্য মানুষকে অসভ্য মানুষ হতে কেউ বলছে না, সংস্কৃতিবানকে অসংস্কৃত হতে বলা মিছে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে পুনর্মিলন না হলে অসুখ তো সারবেই না, পরিবর্তন যা হবে তা কোটি কোটি নিহত প্রাণের অনুপাতে মহৎ কিছু নয়। মহতী বিনষ্টির সঙ্গে মহৎ পরিবর্তনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আমি অস্বীকার করি। দুনিয়াকে চুরমার করলেও তার রূপান্তর ঘটবে না, ঘটবে একপ্রকার পুনর্গঠন। কিন্তু তাতে কারো জীবন ভরবে না, মনে হবে এত রক্তপাত বৃথা গেল। গত মহাযুদ্ধের লাভ লোকসান হিসাব করলে দেখা যাবে যে, নীট ফলটা ধনিকে শ্রমিকে মোটামুটি একটা ভারসাম্য। পশ্চিমের সব ক'টা বড়ো বড়ো দেশে ধনতন্ত্রের ওইটুকু রূপান্তর ঘটেছে। তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্যাপিটালিস্টে-কমিউনিস্টে একটা ভারসাম্য। এটা নড়বড়ে। জার্মানরা যদি নড়িয়ে দেয় তো তেসরা মহাযুদ্ধ বাধবে।

সাঁকো যদি কেউ নড়ায় তো সে এই জার্মান জাতি। কিন্তু তার আগে তাকে ভিতরে ভিতরে একমত হতে হবে। সিন্থেসিসে উপনীত হতে হবে। সিন্থেসিস যদি কোনোখানে হয় তো এই জার্মানীতেই হবে। কিন্তু তাই যদি হয় তো যুদ্ধের দরকার হবে না। জার্মান ঐক্য সন্ধিসূত্রেই ফিরে পাওয়া যাবে। হারা জমিও।

দিনটা মেঘলা। মোটর চলেছে চড়াইয়ের পথে। যেতে যেতে দেখি এক হ্রদ। জার্মানরা বলে সায়র। তার নীল জলের নীলাঞ্জন মেখে চোখ জুড়ায়। এ-পথে জনবসতি বিরল। দূরে দেখা যায় বাভেরিয়ান আল্পস। সেই পর্বতমালার ওপারে অস্ট্রিয়া। টিরোল। ইনসব্রুক। এককালে যে সব দেখে' আনন্দ পেয়েছি।

ভিস্ বলে একটি পাহাড়ী গাঁ। সেখানে থাকবার মধ্যে আছে একটি গির্জা ও তার অদূরে একটি মঠ, ক্যাথলিক সঙ্ঘের কোনো এক শাখার সন্ন্যাসিনীদের। চারদিকে অসমতল মাঠ ও বনজঙ্গল। বাইরে থেকে বোঝবার জো নেই কী আছে এখানে, যা টেনে নিয়ে আসে দেশবিদেশের তীর্থযাত্রীদের। গির্জার ভিতরে এক বার পা দিলে পা আর সরতে চায় না। রূপের ঐশ্বর্য, ভাবের ঐশ্বর্য একসঙ্গে বিস্মিত ও পুলকিত করে। এবং ভক্ত হয়ে থাকলে অশ্রুতে আপ্লুত করে। প্রভু যীশুর কশাহত মূর্তির চোখে একদিন এক বৃদ্ধা জল দেখতে পেয়েছিলেন। সেই অলৌকিক ঘটনাকে সকলের গোচরে আনার জন্যে এই গির্জার পরিকল্পনা। অষ্টাদশ শতকের রোকোকো রীতির নির্মিতি ও মণ্ডন। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি যাঁর হাতে গড়া, তিনি একজন গ্রাম্য কারিগর, ডোমিনিকাস সিমারমান। সুতরাং একে একপ্রকার লোকশিল্প বলতে পারা যায়। লোকচিত্তের অধ্যাত্মবোধ ও রূপবোধ মিলে যা সৃষ্টি করেছে, তা একটুও ম্লান হয়নি। মনে হয়, যেন এই সেদিন তৈরি। অরণ্যকুসুমের মতো চির সরস, চির সুগন্ধ এই গির্জায় যারা আসে, তাদের অভীষ্ট অনুতাপ ও করুণা। প্রার্থনার পক্ষে একান্ত উপযোগী পরিবেশ। যখন ফিরে যায়, তখন বুকের বোঝা নামিয়ে দিয়ে বুক ভরে বল সঞ্চয় করে নিয়ে যায়। আমার মতো যারা নিছক দর্শক, তাদের রসবোধ তৃপ্ত হয়। খ্রীস্টের আত্মবিসর্জনের চরম বেদনাকে পরম আনন্দে রূপান্তরিত করেছেন সিমারমান।

এর পর সেই বিশ্ববিখ্যাত গ্রাম ওবারআমারগাউ। এটিও পাহাড়ী, কিন্তু জনবিরল নয়। প্রধান শিল্প কাঠ খোদাই। দশ বছর পর পর এখানে যীশু খ্রীস্টের অন্ত্য লীলা অবলম্বন করে যে 'প্যাশন প্লে' (বেদনার নাটক) গ্রামবাসীর দ্বারা অভিনীত হয় তা দেখতে দেশবিদেশ থেকে দর্শক সমাগম হয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন। দেখে 'শিশুতীর্থ' লিখেছিলেন। প্রথম ইংরেজীতে, পরে বাংলায়। ১৬৩৩ সালে একবার এ গ্রামে মড়ক হয়। লোকে মানত করে যে দশ বছর অন্তর অন্তর যীশু খ্রীস্টের অন্ত্য লীলা অভিনয় করবে। ১৬৩৪ সাল থেকে শুরু। পরে দশমিক গণনার খাতিরে সাল বদল হয়। শেষবার অভিনয় হয়েছে ১৯৬০ সালে। আগামীবার হবে ১৯৭০ সালে। তিন শ' বছরে একবারমাত্র বিরতি হয়। ১৯৪০ সালে। নাৎসীরা গাঁ উজাড় করে লোকজনকে যুদ্ধে চালান দেয়। খ্রীস্ট লীলার মহিমা বোঝে না। যারা একপ্রকার মড়ক এড়াবে বলে যাত্রা মানত করেছিল তারা আরেকপ্রকার মড়কের মুখে পড়ে।

এই অভিনয় আধ ঘণ্টা ধরে চলে। এতে যারা অংশ নেয় তারা সকলেই গাঁয়ের বারোয়ারি। তাদের মধ্যে সংলাপে অংশ নেয় ১২৪ জন। 'জনতা' সাজে বহু শত জন। বলতে গেলে সমগ্র গ্রামটাই একটা রামলীলার দল। কবে একদিন অভিনয় করবে তার জন্যে বছরের পর বছর আয়োজন চলে। সব চেয়ে বড়ো কথা যাকে যে অংশ দেওয়া হয় তাকে সেই চরিত্রের অনুরূপ জীবন যাপন করতে হয়। সে তার নাটকীয় জীবনে তন্ময় হয়ে যায়। যীশু সাজবে যে সে যেন সাক্ষাৎ যীশু খ্রীস্ট। তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যীশুভাবে বিভোর। লোকও তাকে যীশু মনে করে।

ভুলে যায় সে আণ্টন লাঙ্গ। আণ্টন লাঙ্গের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবাক হয়ে ভেবেছেন এ কি অশিক্ষিত একটি গ্রামিক না এ একজন মহাপুরুষ? যীশুর ভাবে বিভোর হতে গিয়ে চেহারাও যীশুর মতো হয়ে যায়।

ভিস্-এর গির্জার মতো ওবারআমারগাউয়ের যাত্রাভিনয়ও একটি লোকশিল্প। সাধারণ চাষী মজুর কারিগর শ্রেণীর লোকই এর স্রষ্টা ও প্রবর্তক। এ রকম আরো কত কী ছিল, এখন উঠে গেছে। যেমন মাইস্টারসিঙ্গারদের দল। জার্মানীর মধ্যযুগ সংস্কৃতির দিক থেকে পরম সমৃদ্ধ ছিল। তার ছিটেফোঁটা এখনো অবশিষ্ট আছে এমনি দুটি একটি নিভৃত অঞ্চলে। পাহাড়-পর্বত বলেই রক্ষা। তবে যাত্রাও আজকাল থিয়েটারের মতো হয়েছে, শুধু তার ভিতরকার ধর্মভাব সেকালের মতো রয়েছে।

যার জন্যে এ গ্রাম বিখ্যাত তাই দেখা হলো না। তবে যেখানে অভিনয় হয় সেখানটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া গেল। প্রাকৃতিক পটভূমিকা অপূর্ব। যতদূর দৃষ্টি যায় পর্বত আর উপত্যকা। যীশুর জীবননাট্যের শেষদৃশ্যের উপযুক্ত স্থলী। যে নাটক শাশ্বত তার অভিনয়ও শাশ্বতের ছন্দে বাঁধা। না, শহরে ওকে মানায় না। বহির্দ্বার মঞ্চেও না।

সেদিন মিউনিকে ফিরে আমার হাতে সামান্য সময় ছিল। সন্ধ্যায় বার্লিনের বিমান ধরতে হবে। বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ব্রুনো ভারনারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ভদ্রলোক অসুস্থ বলে তাঁর গৃহিণীর অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু কর্তা আমাকে স্বয়ং টেলিফোন করে সাদরে আহ্বান করেন। বাড়ি যেতেই উৎসাহভরে উঠে বসেন। পশ্চিম জার্মান পি ই এন-এর সভাপতি। তাঁর কাছে শুনি পশ্চিম জার্মানীর প্রায় আড়াই শ' জন লেখক লেখিকা তাঁদের ক্লাবের সভ্য। কিন্তু কেন্দ্র হবার মতো কোনো একটি স্থান নেই। লণ্ডন প্যারিসের মতো কোনো একটি মেট্রোপলিস। বার্লিন তো এখন ছিটমহল হয়ে পূর্ব-পশ্চিম দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। পূর্ব জার্মানীর পি ই এন কিন্তু পূর্ব বার্লিনেই। উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ নেই। সাহিত্যও রাজনীতির মতো দ্বিখণ্ডিত। আমাদেরও তো সেই দৃশ্য।

॥ তেইশ ॥

পশ্চিম জার্মানীর বিমান পূর্ব জার্মানীর আকাশে উড়তে পারবে না। তাই আমার পশ্চিম বার্লিন যাত্রার ব্যবস্থা হলো প্যান আমেরিকানের সঙ্গে। আবার সেই রিয়েম এয়ারপোর্ট। এবার তো দিনের আলো নেই। অন্ধকারে লাফ দেওয়া।

নিশাচর পক্ষীর মতো উড়ে চলেছে বিমান। বাতায়নের ধারে বসে দেখি মিউনিকের আলো মিলিয়ে গেছে। অন্য কোনো শহরের দীপমালা এগিয়ে আসছে। ওটা কি রেগেন্সবুর্গ? না ন্যূর্নবার্গ? এলো আর গেল। আরো কত ছোট ছোট শহর পিছনে পড়ে রইল। এবার বোধহয় পশ্চিম জার্মানীর সীমানা পার হয়ে পূর্ব জার্মানীতে পড়েছি। অবশ্য বারো-তেরো হাজার ফুট উঁচু আসমানকে যদি জমিনের সামিল বলে ধরি।

এককালে মাটির উপর দিয়ে রেলপথেও গেছি। এ অঞ্চল আমার অজানা নয়। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না। কোনো শহরকেই চিনতে পারছিনে। ভাইমারকেও না। লাইপৎসিগকেও না।

কাউকেই বলতে পারছিনে যে, তুমি আমার চেনা, আমি তোমার চেনা। নিতান্ত অপরিচিতের মতো মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। সেকালের কথা ভেবে একটা নস্টালজিয়া বোধ করছি।

কিন্তু সেই একমাত্র অনুভূতি নয়। কে জানে কেন একটা আশঙ্কার ভাব অন্তরে! বার্লিন যাওয়া সেবারকার মতো অবিমিশ্র ফুর্তির নয়। মাঝখানে রক্তাক্ত ইতিহাস। হিটলারের উত্থান ও পতন। এখনো চার শক্তি হানা দিচ্ছে সেখানে। বন্দুক ও বেয়োনেট উঁচিয়ে রেখেছে। শুনেছি পরমাণু বোমা নিয়ে দু'পক্ষের জঙ্গী বিমানও ফেরি দেয়। এক পক্ষ যদি এক সেকেণ্ড আগে ফেলে সেই ভয়ে আরেক পক্ষ বোতামে হাত রেখে বসে আছে। এক নিমেষের মধ্যে একটা প্রলয় ঘটে যেতে পারে। জানি ঘটবে না, তবু মনের উপর একটা কালো ছায়া পড়ে। বার্লিন যে একটা যুদ্ধক্ষেত্র। কিছু না হোক শীতল যুদ্ধের অঙ্গন।

শুনেছিলুম যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যি সত্যি পৌঁছে গেলে আর ভয়ডর থাকে না। পশ্চিম বার্লিনের টেম্পেলহফ বিমানবন্দরে নেমে দেখি কোথাও কারো মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। জীবনযাত্রা দিব্যি স্বাভাবিক। যেমন মিউনিকে বা কোলোনে তেমনি পশ্চিম বার্লিনে। প্রাণচাঞ্চল্য বরং পশ্চিম বার্লিনেই বেশী। আগেকার দিনের বার্লিনও ছিল সব চেয়ে প্রাণবান। বার্লিন হচ্ছে বার্লিন। তোমার ওই যুদ্ধক্ষেত্রটেত্র কথার কথা। অকারণে ভয় পাওয়া।

সেদিন নয়, তার পরে একদিন আমার প্রদর্শিকা শ্রীমতী ভেমান (Weymann) হঠাৎ বলে ওঠেন, 'বেশ আছি, কিন্তু মাঝে মাঝে ভিতরটা কেমন যেন হয়ে যায়। ভয়ে কাতর হই। আমরাই যে প্রথম বলি। যুদ্ধ বাধলে এইখানেই তার শুরু।'

শহরের মাঝখানে বিমানবন্দর। এমনটি ইউরোপের আর কোথাও নেই। বেরিয়ে আসতেই শহরের সঙ্গে চোখাচোখি। চিনতে পারলুম বলতে পারব না। বার্লিনকে নাকি বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের পরে গুঁড়ো ঝেঁটিয়ে জড় করে সাত-সাতটা পাহাড় হয়। পুনর্গঠনের পাট এতদিনে সারা হয়েছে, এখানে ওখানে দুটো একটা ভগ্নাবশেষ পুনর্গঠনের প্রতীক্ষায় আছে। যেমন রাজা উইলিয়ামের মেমোরিয়াল গির্জা। তার চূড়াটা গেছে।

দোকানপসার কোনোদিন এমন জমজমাট ছিল কি না মনে পড়ে না। ভোগ্য সামগ্রী যে কত বিচিত্র ও কত প্রচুর হতে পারে পশ্চিম বার্লিন তার নমুনা। ওটা যেন ক্যাপিটালিজম নামক সমাজব্যবস্থার একটা শো-কেস। এর জন্যে পরমাণু বোমা খেয়ে প্রাণ দিয়েও সুখ আছে। বাঁচতে হয় তো এমনি উপভোগ করে বাঁচতে হয়। তা নয় তো পূর্ব বার্লিনের কমিউনিস্টদের মতো শুকিয়ে শুকিয়ে আধখানা হয়ে বাঁচা!

পরের দিন প্রথম কাজ হলো প্রাচীর পরিদর্শন। সে যে কী ভয়াবহ তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। শহরের মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা দেয়াল চলে গেছে। এমন কিছু শক্ত কিংবা উঁচু দেয়াল নয়। জেলখানার দেয়ালের মতো নয়। অনেক স্থলে তো দেয়ালই নেই, আছে বড়ো বড়ো দালান। কিন্তু তার দরজা জানালা গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। সীমানার খানিকটে নদী। নদীর স্রোতের মাঝখানে তো দেয়াল দেওয়া যায় না। তার বদলে পাহারা দিচ্ছে বোট। বোটের উপর হাতিয়ার হাতে প্রহরী। কেউ যদি ডুব সাঁতার দিয়ে পালাতে যায় যেই মাথা তোলে অমনি গুলী। পশ্চিমারা সেইসব অভাগাদের জন্যে দেয়ালের ধারে ধারে শহীদবেদী রচনা করেছে। দেয়ালটা যেন একটা কান্নার দেয়াল।

পাশাপাশি বাড়ি। মাঝখান দিয়ে দেয়াল। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারবে না, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না, রোগে শোকে দেখা করতে পারবে না। কতকালের প্রতিবেশী। হয়তো নিকটতম আত্মীয়। তবু একবার টেলিফোনও করতে পারবে না। পূর্ব বার্লিন থেকে বেরিয়ে আসা

একেবারে অসম্ভব। ওরা আসতে দেবে না। সেই জন্যেই তো দেয়াল দিয়েছে। পশ্চিম বার্লিন থেকে কেউ গেলে ঢুকতে দেয় না, পাশপোর্ট চায়। তার মানে তো ওদের সরকারকে স্বীকার করে নেওয়া। সেটা এদের সরকার করবেন না। তবে একদল শ্রমিক আছে, তাদের কাজ পূর্ব বার্লিনে। তারা রেলে কাজ করে। তারাই অনুমতিপত্র পায়। যাতায়াত করে। এখনো কতকগুলো বিষয়ে পূর্ব-পশ্চিম বার্লিন পরস্পরনির্ভর। যেমন রেল আর ড্রেন। আপোসে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল পশ্চিমারা চালায়, মাথার উপরকার রেল পূরবীয়ারা। যদিও এদের সরকার ওদের সরকারকে স্বীকার করে না তবু সোভিয়েটের সঙ্গে কারবার করার ছলে প্রকারান্তরে ওদের সঙ্গে কারবার করে।

দেয়ালের এক-এক জায়গায় এক-একটা চেক পয়েন্ট। তিনটে পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীদের জন্যে, দুটো পশ্চিম জার্মানীর অধিবাসীদের জন্যে, একটা বিদেশীদের জন্যে। দস্তুরমতো পাশপোর্ট বা পারমিট লাগে। একই শহর, অথচ দুই শাসনাধীন। এর যে কী জ্বালা তা আমরা কেউ কল্পনা করতে পারব না। কারণ আমাদের তো শহর ভাগ হয়নি। তা বলে জার্মানরাই একমাত্র ভুক্তভোগী নয়। আমি মনে করিয়ে দিই যে পৃথিবীতে আরো একটি শহর ভাগ হয়ে রয়েছে। যীশু খ্রীস্টের জেরুজালেম। তিনি যদি দ্বিতীয়বার আগমন করেন তাঁকেও সীমান্ত পারাপারের সময় আটক হতে হবে।

পূর্ব বার্লিন যেমন পূর্ব জার্মানীর সংলগ্ন পশ্চিম বার্লিন তেমনি পশ্চিম জার্মানীর সংলগ্ন হয়ে থাকলে জ্বালা কম হতো। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর থেকে পশ্চিম বার্লিন দূর অস্ত। এর তিন দিকে পূর্ব জার্মানীর কাঁটা তারের বেড়া। এক দিকে পূর্ব বার্লিনের দেয়াল। এটা একটা দ্বীপ। এ দ্বীপ পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে তথা বহির্জগতের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেছে তিনটি আকাশপথ, চারটি রেলপথ, চারটি মোটরপথ ও সমুদ্রগামী দুটি জলপথ দিয়ে। এগুলি পূর্ব জার্মানীর উপর দিয়ে বা ভিতর দিয়ে গেছে। চার শক্তির চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকবে পূর্ব জার্মানী একা একা কিছু করতে পারবে না। কিন্তু চুক্তিপত্রে তো প্রত্যেকটি আটঘাট বেঁধে রাখা হয়নি। পূর্ব জার্মানী ইতিমধ্যে বিস্তর অদলবদল করেছে। ভালো করে সমঝিয়ে দিয়েছে যে তার ঘরে সে মালিক। সোভিয়েট তাকে উৎসাহ দিয়েছে। যারা একদা ওর মিত্রপক্ষে ছিল, কিন্তু এখন তা নয়, পূর্ব জার্মানীর অভ্যন্তরে তাদের সামরিক উপস্থিতি সোভিয়েটের চক্ষুঃশূল। তবে পশ্চিম বার্লিন যদি অসামরিক ফ্রী সিটি হয় পূর্ব জার্মানীকে রাশিয়া প্রশ্রয় দেবে না। কিন্তু এ প্রস্তাব চুক্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং অগ্রাহ্য।

চুক্তি অনুসারে বার্লিনের স্বতন্ত্র একটি সত্তা হবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে শহরটা পূর্ব-পশ্চিম দু'ভাগ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পূর্ব বার্লিন পূর্ব জার্মানীর রাজধানী হয়েছে ও সব স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। এটা যে কেবল সোভিয়েটের প্রশ্রয়ে হয়েছে তা নয়। ভূগোলের আনুকূল্য পেয়ে হয়েছে। এখন পশ্চিম জার্মানদের অনেকের বাসনা যে পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী পশ্চিম বার্লিনে স্থানান্তরিত হয় ও পশ্চিম জার্মান সরকার সেখানে বসে নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা জাহির করেন। বলা বাহুল্য পশ্চিম বার্লিনের স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে তেমনি থাকবে। পশ্চিম বার্লিন এখনকার মতো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। কিন্তু ছিটমহলে বসে রাষ্ট্র চালাতে গেলে প্রতিবেশীর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবেই। বিপদের দিন বেকায়দায় পড়তে হবে। অপসরণের উপায় থাকবে না। রুশ সৈন্যদল যেখানে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে সেখানে পশ্চিম জার্মান সৈন্য মোতায়েন করাও সুবুদ্ধি নয়। তাদের নিয়ে যাবার সময়ই মারামারি বেধে যাবে। অথচ নিজের সৈন্য যেখানে গিয়ে রক্ষা করবে না সেখানে সরকার কী করে গিয়ে রাজধানী স্থাপন করবেন? গায়ের জোরে ঢুকলে তো পূর্ব জার্মানীর জল স্থল আকাশ দিয়ে ঢুকতে হবে। পূর্ব জার্মানী বাধা দেবেই। এমনিতেই তো প্রেসিডেন্ট বা চ্যান্সেলার যখন পরিদর্শনে আসেন তখন স্বদেশের বিমানে চড়ে আসেন না। আমারি মতো

তাঁরাও বিদেশী বিমানে চলাফেরা করেন। মোট কথা পূর্ব জার্মানীকে স্বীকার না করলে স্থিতাবস্থার পরিবর্তন হবে না।

'দেখছেন তো, আমরা যেন একটা দ্বীপে বাস করছি। যে-কোনো দিন যোগাযোগ কেটে দিয়ে ওরা আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আমরা পালাবার পথ পাব না।' বলেন শ্রীমতী ভেমান। তাঁর চোখ মুখে ক্লস্ট্রোফোবিয়া।

তা বলে তিনি হতাশ নন। তাঁর আশা এবং বিশ্বাস যে মার্কিনরা পশ্চিম বার্লিন রক্ষা করবে। ওরা যে বিজেতা রূপে আসেনি, এসেছে রুশের হাত থেকে ত্রাণকর্তা রূপে, এরকম একটা উপকথা এই আঠারো বছরে দৃঢ়মূল হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর অভয়বাণী শুনতে পশ্চিম বার্লিনের বারো লাখ নাগরিক ভিড় করে! লোকসংখ্যা যেখানে বাইশ লাখ।

সর্বত্র নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। রাশি রাশি ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে। হামবুর্গের এক প্রকাশনসংস্থা বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড ইমারত গড়ছেন দেখে প্রদর্শিকা বলেন, 'পশ্চিম বার্লিনের উপর আস্থা না থাকলে কেউ হামবুর্গ থেকে এখানে আপিস উঠিয়ে আনে! এত টাকা ঢালে! ভয় নেই। ভয় কিসের!'

না, ভয় নেই। ভয় ভেঙে গেছে। তবু—বেয়োনেটের উপর বসে থাকা আরামের নয়।

॥ চব্বিশ ॥

দেয়াল দেখতে বেরিয়ে প্রথমেই যাই সেখানে যার উল্টো দিকে ব্রাণ্ডেনবুর্গের তোরণ। চিনতে পারব না? ও যে বার্লিনের হৃৎপিণ্ড। হায়, হায়! ওটা যে পড়েছে দেয়ালের ওধারে। আমি কেবল চাক্ষুষ করতে পারি ওর পিছনের অংশ। তোরণের উপর চার ঘোড়ার রথ আমার দিকে পিঠ ফিরিয়েছে।

যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি সেখানে ক্যাপিটালিস্ট টার্মিনাস। আর ওই তোরণ যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে কমিউনিস্ট দুনিয়ার আরম্ভ। দেয়ালটা মাঝখানে খাড়া থেকে শান্তিরক্ষা করছে। ওই যে ব্রাণ্ডেনবুর্গের তোরণ ওখানে যে ভূভাগের শুরু তার বিস্তার রাশিয়া ছাড়িয়ে চীন ছাড়িয়ে উত্তর-দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝখানতক। সেখান থেকে যে ভূভাগের সূচনা তার প্রসার প্রশান্ত মহাসাগর ছাড়িয়ে আমেরিকা ছাড়িয়ে আটলান্টিক মহাসাগর ছাড়িয়ে পূর্ব-পশ্চিম বার্লিনের মাঝখানতক। বড়ো বড়ো দুটো সাপ যেন পরস্পরের ল্যাজে মুখ বসিয়েছে। পৃথিবীকে বেষ্টন করেছে মেখলার মতো। কেউ কাউকে গিলতে পারছে না। ছাড়তেও পারছে কি? এই শান্তি সত্যিকার শান্তি নয়। এটা যুদ্ধবিরতি। শীতল যুদ্ধের তো বিরতিও নেই। ওই যে চারটে ঘোড়া ওরা যেন অ্যাপোকালিপ্সের চার ঘোড়সওয়ারের চার বাহন। যাদের নাম যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ আর মহামারী আর মৃত্যু। ঘোড়াগুলো সব সময় দুই পা তুলে রয়েছে।

পূর্ব বার্লিন এত কাছে অথচ নাগালের বাইরে। একটা লাফ দিলে ওখানে পৌঁছতে পারি অথচ লক্ষ্মণ যে গণ্ডী এঁকে দিয়েছেন তাকে লঙ্ঘন করতে সাহস নেই, করলে রাবণের হাতে পড়ব। সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করি পশ্চিম বার্লিনবাসীর এ দুঃখ। সহানুভূতি দেখাতে যাই। শ্রীমতী ভেমান বলেন, 'ওঃ! আপনি চান ওপারে ঘুরে আসতে!'

'এককালে কত ঘুরেছি। ওই যে উন্টার ডেন লিণ্ডেন দেখছেন ও তার সাক্ষী দেবে।' বলতে-

গিয়ে উত্তেজনা বোধ করি। যেন সেদিনকার কথা।

'বেশ তো। আপনার যদি মর্জি হয় আমরা তার ব্যবস্থা করব। আমরা কিন্তু কেউ সঙ্গে যাব না, আমাদের যাওয়া বারণ। একজন বিদেশীকে বলব আপনার সঙ্গী হতে। তিনিই দেখাবেন। কিন্তু ঝুঁকিটা সম্পূর্ণ আপনার। আপনার যদি ভালোমন্দ কিছু একটা হয় আমরা তার জন্যে দায়ী হব না।' বলে আমার প্রদর্শিকা আমাকে সাবধান করে দেন।

আমি ধন্যবাদ দিই। উন্টার ডেন লিণ্ডেনকে ঘিরে যে অঞ্চল পূর্বযুগে সেই দিকেই তো ছিল আমার ঠিকানা। এতকাল পরে ফিরে যদি সেইটেই না দেখি তবে আমার মনে একটা খেদ থেকে যাবে বইকি।

কৈফিয়তের কোনো দরকার ছিল না। পশ্চিম বার্লিন দেখতে যাঁরাই আসেন তাঁরা সকলেই একবার প্রাচীরের ওপারেও পদার্পণ করে আসেন। তাতে তুলনার সুবিধা হয় কোন্‌টা সমৃদ্ধ, কোন্‌টা রিক্ত। কোন্‌টাতে ক্যাপিটালিজমের সোনার কাঠি লেগেছে, কোন্‌টাতে কমিউনিজমের রুপোর কাঠি। পশ্চিম জার্মানীর কর্তৃপক্ষ বাধা দেওয়া দূরে থাক তুলনার সুযোগ জুটিয়ে দেন। অপর পক্ষেরও আপত্তি নেই। ঐভাবে তাঁদের কিছু বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়।

সেদিন অনেক ঘোরাঘুরির পর মধ্যাহ্নভোজনে বসেছি, সঙ্গে শ্রীমতী হাইসিঙ্গার বলে এক বর্ষীয়সী লেখিকা। এমন সময় শ্রীমতী ভেমানের প্রশ্ন, 'আপনি কি মিস্টার গস্‌কে চেনেন?'

দু'তিনবার জেরা করার পর মালুম হয় কোনো একজন ঘোষের কথা বলছেন। কিন্তু পুরো নামটা জানেন না। আমি 'হাঁ'ও বলতে পারিনে 'না'ও বলতে পারিনে। বাটাচারিয়া বলে এক ভারতীয় সাহিত্যিক যখন পশ্চিম বার্লিনে আগমন করেন তখন তাঁর জন্যে আয়োজিত পার্টিতে নাকি গসের সঙ্গে পরিচয়। ওঃ হরি! ও যে আমাদের ভবানী ভট্টাচার্য। আমার বন্ধু ভবানী। ওর খবর শুনে পরম প্রীত হই।

ভদ্রমহিলা পরে এক সময় ঘোষকে টেলিফোন করেন। এই স্থির হয় যে, পরের দিন ঘোষ সেই রেস্টোরাণ্টে আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন ও তার পর আমার সাথী হয়ে পূর্ব বার্লিনে যাবেন। তা হলে আমার জন্যে আর ভাবনার কারণ থাকবে না। সত্যি, কী সৌজন্য। কাকে বেশী ধন্যবাদ দেব? শ্রীমতীকে, না ঘোষকে?

পশ্চিম বার্লিনে আমার জন্যে কোনো থিয়েটারে বা অপেরায় বা কন্সার্টে আসন মেলেনি। নানা দেশ থেকে আগত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডেলিগেশন আমার জন্যে একটিও অবশিষ্ট রাখেননি। ঠিকই তো। ওঁরাই তো সব কিছুর সমঝদার। মনটা উদাস হয়ে যায়। সান্ত্বনা এই যে বার্লিন ফিলহার্মনিক এখনো খোলেনি। কারায়ানের পরিচালিত অর্কেস্ট্রা যদি ওঁরা শুনতেন আর আমি না শুনতুম তা হলে ধনতন্ত্রের অবিচার দেখে মর্মাহত হতুম।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়। একেই বলে মস্তিষ্কের ঢেউ। শ্রীমতী ভেমানকে বলি, 'আচ্ছা, আমি যদি পূর্ব বার্লিনে গিয়ে নাটক দেখে আসি তা হলে কেমন হয়?'

'আপনার খুশি। ওখানকার খরচও আমরাই বহন করব, কিন্তু আসন পাবেন কি না সেটা আপনার বরাত। এপার থেকে খোঁজখবর নেবার বা সংরক্ষণ করবার কোনো উপায় নেই। মিস্টার গস্‌কেও আমি বলে রাখব।' শ্রীমতী আমাকে বাধিত করেন।

বিনা নোটিশে আসন পাওয়া আজকাল সব থিয়েটারেই কষ্টকর। ব্রেখ্‌ট থিয়েটারে তো শুনেছি চার সপ্তাহের নোটিস লাগে। অনেক দিনের বাসনা যে ব্রেখ্‌টের নাটক ব্রেখ্‌টের নিজের থিয়েটারে দেখি। কিন্তু পূর্ব বার্লিনে প্রবেশ পাওয়া সম্ভব হলেও ব্রেখ্‌ট থিয়েটারে প্রবেশ পাওয়া সহজ নয়। যদি না আর কেউ সহায় হয়।

এপারের সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎ পাওয়া কি সহজ হতো যদি না পশ্চিম জার্মান পি ই এন সহায় হতো? চারজন নামকরা লেখক আজ আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী হয়েছেন। একজন হলেন কবি রুডলফ্ হার্টুং। এক প্রকাশনসংস্থার সঙ্গে সংযুক্ত। একখানি ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত। বিকেলে দেখা করতে যাই তাঁর আপিসে। সেখান থেকে 'দর্পণ' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকার বার্লিনের আপিসে। শল্‌ৎস সেখানে ছিলেন, সীডলার সেখানে এলেন ও কথাবার্তার মাঝখানে কার্শ এসে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন। তিনি বার্লিনের বাইরে থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন।

সেকালের মতো বার্লিন নয়, হামবুর্গ আজকাল পশ্চিম জার্মানীর সংবাদপত্র জগতের রাজধানী। বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলোর সদর আপিস সেখানে। হামবুর্গের পরে ফ্রাঙ্কফুর্ট। খবরের কাগজের দিক থেকে বার্লিন এখন মফঃস্বল। অথচ যুদ্ধের আগে এই ছিল সদর। পশ্চিম বার্লিন সমেত পশ্চিম জার্মানীতে দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা এখন ১৪৬৪ খানা। এর মধ্যে ৬৯০ খানা হচ্ছে প্রধান সংস্করণ। মোট প্রচার সংখ্যা এক কোটি আশি লক্ষ কপি। বিশখানা সচিত্র সাপ্তাহিক আছে। তাদের প্রচারসংখ্যা ষাট লক্ষ কপি। তা ছাড়া মাসিকপত্রাদির সংখ্যা ৫৬৩০ খানা। তাদের প্রচারসংখ্যা এগারো কোটি নব্বুই লক্ষ। যে রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ তার পক্ষে এটা বড়ো কম কথা নয়।

'বার্লিনার টাগেব্লাট' বলে তখনকার দিনে একখানি বনেদী সংবাদপত্র ছিল, তার সাপ্তাহিক ইংরেজী সংস্করণের আমি ছিলুম একজন গ্রাহক। জানতে চাই সে পত্রিকার কী হলো। কেউ বলতে পারেন না। যতদূর জানি ওটি ছিল ইহুদী পরিচালিত। মাক্স রাইনহার্ডটের থিয়েটার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কেউ বলতে পারেন না সে রঙ্গালয়ের কী হলো। সেটিও যতদূর জানি ইহুদী পরিচালিত। পরশুরাম যেমন ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন হিটালার তেমনি জার্মানীকে নির্-ইহুদী করে গেছেন। তার ফলে যে কত বড়ো একটা ফাঁক হয়েছে সেটা সব সময় মনে থাকে না। রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো এক একটা খাপছাড়া প্রশ্ন করি আর উত্তরে শুনি, 'ছিল বটে, কিন্তু সেসব কবেকার কথা!'

ইহুদীরা নেই, এইটেই সব চেয়ে বড়ো তফাৎ। এতে জার্মানদের লাভ হয়েছে কি লোকসান হয়েছে ওরাই ভালো বোঝে। কিন্তু বাইরের লোক আমি, আমার তো মনে হয় না যে সংস্কৃতির মুখ্য স্রোত আর জার্মানীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সংস্কৃতির মুখ্য স্রোত সেইখানেই প্রবাহিত হয় যেখানে শিল্পীরা সাহিত্যিকরা বৈজ্ঞানিকরা দার্শনিকরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিন ভাববিনিময় করছেন, প্রতিযোগিতা করছেন, ঝগড়াঝাটিও করছেন। সমষ্টিজীবনের একটি অঙ্গকে যদি বেমালুম বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় তবে সেই শূন্যতা দেহ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হলেও মানসিক রক্তচলাচল ব্যাহত করার অর্থ দেশকে নির্বীর্য করা। সে অভিশাপ তো আমরা এখনো ভোগ করছি। তেমনি জার্মানীর মতো দেশকে নির্-ইহুদী করার অর্থ দেশকে এক শ' রকম ধ্যানধারণা কলাকৌশল পরীক্ষানিরীক্ষার দিক থেকে নিস্তেজ করা। যে দেশে মার্ক্স জন্মায় না, ফ্রয়েড জন্মায় না, আইনস্টাইন জন্মায় না সে দেশ আধুনিক সংস্কৃতিকে বীজধান জোগাতে পারবে কি? আমার এক বন্ধু আমাকে একবার বলেছিলেন, আধুনিক ইউরোপে মৌলিক কাজ যা হয়েছে তা ওই তিন মনীষীর জন্যেই।

জার্মানী এখন উল্টে বাইরে থেকে বীজধান সংগ্রহ করছে। পূর্ব জার্মানী রাশিয়া থেকে, পশ্চিম জার্মানী আমেরিকা থেকে। হেমিংওয়ে, ফক্‌নার প্রভৃতি এখন জার্মান সাহিত্যে প্রভাবশালী। জার্মান গদ্যও নাকি তার সমাসবদ্ধ জটিল গদাই-লস্করী গঠন ও চাল ছেড়ে সরল সংক্ষিপ্ত কাটাকাটা হয়ে উঠছে। টোমাস মান এখনো জার্মান কথাসাহিত্যের শীর্ষে। কিন্তু এ যুগের লেখকদের উপর তাঁর তেমন প্রভাব নেই। এঁরা বরং মার্কিনদের কাছে মন্ত্র নেবেন। অতীতে যাঁরা ফিরে তাকাচ্ছেন তাঁদের

দৃষ্টি গ্যেটের পূর্ববর্তী এক গোষ্ঠীর উপর। ওঁদের লেখায় খাঁটি জার্মান ঐতিহ্যের ও লৌকিক রীতির স্বাদ পাওয়া যায়। মার্কিন নয়, ম্যে'র্খেন (Märchen) বলে পরিচিত রূপকথার রীতিও অনুসরণ করা চলেছে।

ইউরোপের মুখ্য স্রোত যেমন জার্মানী থেকে সরে গেছে জার্মানীর মুখ্য স্রোত তেমনি বার্লিন থেকে। বার্লিনের সাহিত্যিকদের প্রতি আমার সহানুভূতির সীমা নেই। ওঁদের মতো দশা যদি আমাদেরও হতো তা হলে কী যে হতো ভাবি। কলকাতা শহর ভাগ করার দাবীও তো উঠেছিল। যদিও দুঃস্বপ্ন তবু একবার কল্পনা করা যাক যে পশ্চিম কলকাতার তিন দিকে কাঁটা তারের বেড়া ও এক দিকে দেয়াল। ভারতে যাতায়াতের পথ যদিও খোলা তবু সে পথ পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে এক শ' মাইল অবধি গেছে। কালাপানি পার হয়ে আন্দামানের সাহিত্যিকদের কণ্ঠস্বর যেমন ভারতে পৌঁছয় তেমনি পশ্চিম কলকাতার সাহিত্যিকদের কণ্ঠস্বর পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছত। পৌঁছত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জোর কতটুকু হতো, আওয়াজ কত ক্ষীণ হতো! শহরের বুকের উপর যে দেয়াল সেটা পাঁচ ফুট কি ছয় ফুট হলেও কণ্ঠস্বর সেইখানে আটকে যেত, তার ওপারে যেতে পারত না। এত ইম্পোটেন্ট! আকাশবাণীতে তারস্বরে চিৎকার করলেও বেড়ার ওপারে ফাঁপা শোনাত।

সব চেয়ে দুঃখের হতো পূর্ব কলকাতার সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ হারানো, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণার সাহিত্যিকদের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটানো। তাঁরা যদি মুসলমান হয়ে মুসলিম লীগের সদস্য হতেন তা হলে তো মনোমালিন্য চরমে উঠত। বাংলা ভাষায় লিখলেনই বা তাঁরা। কে পড়তে চাইত তাঁদের লেখা! তাঁদের অতিক্রম করে তাঁদের রাষ্ট্রে পাঠকদের কাছে সরাসরি পৌঁছতে পারত কি এপারের কারো বাণী? তাঁরাই যে গতিরোধ করতেন। ওপারেও একটা ন্যস্ত স্বার্থ তৈরি হতো। ওপারের সুসমাচারকে এপারে আসতে না দিলে এপারের স্বাধীনতার বার্তা ওপারের লোকের কানেও পড়ত না, কানের ভিতর দিয়ে মরমেও পশত না। দেখা যেত বিনিময়ে কোনো পক্ষই রাজী নয়।

তা সত্ত্বেও বিনিময় একটু আধটু হচ্ছে বইকি। ক্যে'স্নারের বই ওপারেও দু'একখানা চলে। ব্রেখ্‌টের নাটক এপারেও দু'একখানা অভিনয় করা হয়। আশ্চর্য মানুষের মানিয়ে নেবার শক্তি। জার্মানরাও মানিয়ে নিচ্ছে। তবে সরকারীভাবে নয়। বেসরকারীভাবে। যোগাযোগেরও রন্ধ্র আছে। চিঠি লেখালেখি বারণ নয়। পার্সেলও বড়োদিনের সময় পাঠানো যায়। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা না হোক, নাড়ীর টান তো কেটে যায়নি। আর কমিউনিজম সত্যি ক'জন কবুল করেছে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সেইজন্যেই তো একত্র নির্বাচনের কথা এপার থেকে এতবার ওঠে আর ওপার থেকে খারিজ হয়। যাঁরা খারিজ করেন তাঁদের সঙ্গে সন্ধি না করলে তাঁরাও যে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবেন তেমন দুর্বল তাঁরা নন। সোভিয়েটের হাতের পুতুল বললে তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে খাটো করা হয়। যেমন মুসলিম লীগকে ইংরেজের ডামি ভেবে ভুল করা হয়েছিল।

॥ পঁচিশ ॥

পথি নারী বিবর্জিতা। তা তো নয়। এ যে দেখছি পথি নারীবিবর্জিতঃ।

সেদিন শ্রীমতী আমাকে হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে উধাও। তাঁর নাকি নিজের কেনাকাটা বাকী। এখন থেকে কিনে না রাখলে কাল সকালে প্রাতরাশ জুটবে না। হোটেলে ঢুকে দেখি ডাইনিং হল অন্ধকার। ধারে কাছে জনমানব নেই। ব্যাপার কী? দেরি হয়ে গেছে না আরো দেরি হবে? শুনি এতো বড়ো হোটেলে নাকি ডিনার দেয় না। পা বাড়ালেই কুর্‌ফ্যু'রস্টেনডাম (Kurfürstendamm)। পশ্চিম বার্লিনের সব চেয়ে শৌখীন রাস্তা। সেখানে গিয়ে রেস্টোরাণ্টে খাওয়াই তো ফ্যাশন।

সাথী না থাকলে বাইরে খেয়ে তেমন সুখ নেই। আমার অনুরোধে ওঁরা আমাকে হালকা কিছু বানিয়ে দেন। তার বেশী ওঁদের কাছে থাকলেও রাঁধবার লোক ছিল না। যার যার নিজের খাটবার সময় আছে কিনা। রাত তখন মোটে ন'টা। অত সকালে কেউ শুতে যায় না। বার্লিনের মতো শহরের নৈশ জীবন বরং তখনি আরম্ভ হয়। হোটেল একরকম খালি দেখে আমিও বেরিয়ে পড়ি। ফেরা যাবে আর একটু রাত হলে। রাতের বার্লিন না দেখলে বার্লিন দেখাই হয় না।

পায়ে হেঁটে কুর্‌ফ্যু'রস্টেনডামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত চক্কর দিই। দোকানের কাঁচের জানালা দিয়ে দেখি দুনিয়ার সম্ভার থরে থরে সাজানো। দোকান ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে, দুটি একটি বাদ। লোকের ভিড় লেগেই আছে। নিয়নের আলোয় দোকানের সার রাতকে দিন করে রেখেছে! রোশনাইয়েব সে কী বাহার! কাফেতে শৌখীন ভদ্র ও ভদ্রারা জমিয়ে বসেছেন। প্রধানত বিদেশী বিদেশিনী। টোকিয়োর বিখ্যাত রাজপথ গিঞ্জার কথা মনে পড়ে। টোকিও যেন ধনতন্ত্রের পশ্চিম রাজধানী আর পশ্চিম বার্লিন যেন ধনতন্ত্রের পূর্ব রাজধানী। টোকিওরই জলুস বেশী। তবে দৌলৎ বোধ হয় পশ্চিম বার্লিনেরই অধিক।

যেতে যেতে এক জায়গায় দেখি ফুটপাথের উপর মস্ত ভিড়। দুর্ঘটনা নয় তো! আমিও ভিড়ে যাই। না, তেমন কিছু নয়। গরিবের মতো পোশাক পরা জনা চারেক গেঁয়ো গান জুড়েছে। একজনের হাতে কী একটা বাজনা। লোকসঙ্গীত নিশ্চয। জার্মানরা সঙ্গীত ছেড়ে একটা রাতও বাঁচবে না। আসুক যুদ্ধ, আসুক মৃত্যু, আসুক বিপ্লব, আসুক সর্বনাশ। কিন্তু সঙ্গীত তাদের চাই-ই। সঙ্গীতকে তারা ছাড়বে না। সঙ্গীতও তাদের ছাড়বে না। যে কোনো চারজন ইয়ার একটা সম্প্রদায় গড়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে। একজনের হাতে একটা যন্ত্র। আরেকজনের হাতে একটা টুপি। টুপিটা সিকিতে আধুলিতে ভরে যাবে। নেশা হিসাবে ভালো, পেশা হিসাবে মন্দ নয়।

মোড় ঘুরে ঘুরে একটি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি ফুটপাথের ধারে আর-এক ভীড়। একটি তরুণী তার ঠেলাগাড়িতে বসে সসেজ ইত্যাদি মুখরোচক খাবার সদ্য ভেজে পরিবেশন করছে। মহাপ্রসাদের মতো প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যম্। বলা বাহুল্য দামটাও হাতে হাতে চুকিয়ে দেওয়া চাই। ভিড়টা যেই পাতলা হয়ে আসে অমনি তরুণীর পায়ের চাকা ঘোরে। আশাকরি বলতে হবে না যে ওটা পা দিয়ে ঠেলার গাড়ি। রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর সব আছে ওতে।

পথ হারানোই আমার স্বভাব। পথ হারাতে হারাতেই আমি পথঘাট চিনি। মহা ভাবনা যদি হোটেলে ফিরে যাবার পথ খুঁজে না পাই! কিন্তু যেদিকেই যাই না কেন ঘুরে ফিরে 'চিড়িয়াখানা'

আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশনের কাছে এসে হাজির হই। আমার কতকাল আগে চেনা স্টেশন। চিড়িয়াখানার স্মৃতি একেবারে মুছে যায়নি। মাটির তলা দিয়ে রেল গেছে যেমন, তেমনি মাথার উপর দিয়েও গেছে। তারও এক সার স্টেশন। এ ছাড়া আছে সার্কুলার রেলপথ। পূর্ব পশ্চিম মিলে একটিই বৃত্ত। এ হেন শহরকে দু'ভাগ করা কি লোকের সম্মতি নিয়ে হয়? দখলকারী চার শক্তিও সেটা চাননি। তা হলে ওটা হলো কী করে? কার কথায়?

দেশটাকে সামরিক অর্থে চারটি এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছিল। গোটা বার্লিনটাই ছিল রুশদের এলাকায়। সেসময় পূর্ব বার্লিন ও পশ্চিম বার্লিন বলে দুটো ভাগ ছিল না। পরে চার বিজয়ী শক্তির মধ্যে একটা সমঝোতা হয়। সোভিয়েটকে ঠুরিঙ্গিয়া, সাকসেন-আন্‌হাল্ট, স্যাক্সনির ও মেকলেনবুর্গের একাংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। পরিবর্তে সোভিয়েট দেয় সমগ্র বার্লিনে মার্কিন ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্য রাখার ও সোভিয়েটের সঙ্গে মিলে মিশে কর্তৃত্ব করার অধিকার। পরে স্বাধীনভাবে নির্বাচিত সর্ব-জার্মান সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এটাও স্থির হয়। বার্লিনে যাবার জন্যে পাশ্চাত্য কর্তাদের আসমানে তিনটে করিডর দেওয়া হয়, জমিনে চার সেট রেলপথ ও মোটরপথ। তার উপর জলপথ। সেসময় সকলের বিশ্বাস ছিল যে সারা দেশের জন্যে একটাই সরকার গঠিত হবে। স্বাধীনভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে। অধিকন্তু বিশ্বাস ছিল যে চার শক্তির মৈত্রী অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাঁরা নিজেরাই দুই শিবিরে বিভক্ত হবেন না। স্বনির্বাচিত সর্ব-জার্মান সরকার চার শক্তির সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করবে। তখন যে যার সৈন্যদল অপসরণ করবে। চার এলাকা এক হয়ে যাবে। বার্লিনও এক থাকবে।

কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস অন্য রূপ নেয়। সর্ব-জার্মান নির্বাচন হয় না, সর্ব-জার্মান সরকার হয় না। সর্ব-বার্লিন নির্বাচন ও সর্ব-বার্লিন সরকার যদি বা হয় তাতে কমিউনিস্টরা ও তাদের মিত্ররা হয় সংখ্যালঘু। নগরশাসন নিয়ে নিত্য ঝগড়া। ওদিকে চার শক্তির জার্মানী শাসন নিয়েও নিত্য দ্বন্দ্ব। চার সৈন্যদলের মিলিত কমাণ্ডের মুখ্য ছিলেন সোভিয়েট সেনাধ্যক্ষ। তিনি মিলিত কমাণ্ড তুলে দিয়ে বার্লিনকেও বিভক্ত করে দেন। তিন পাশ্চাত্য শক্তির আশ্রয়ে গড়ে ওঠে পশ্চিম বার্লিন সরকার। সোভিয়েট শক্তির আশ্রয়ে পূর্ব বার্লিন সরকার। পশ্চিম বার্লিনের সরকার নির্বিবাদে চলে। বিরোধীপক্ষ নেই। তেমনি পূর্ব বার্লিন সরকারও নিষ্কণ্টক। তেরো বছর ধরে লোক পলায়নের পর রাতারাতি দেয়াল ওঠে।

পশ্চিম বার্লিন হচ্ছে স্থপতিদের স্বর্গ। এ রকম একখানা পরিষ্কার স্লেট বহুভাগ্যে মেলে। না, না, বহু দুর্ভাগ্যে। ইংরেজ মার্কিন রাশিয়ানরা একে মনের সুখে বোমা দিয়ে গুঁড়িয়েছে, গোলা দিয়ে উড়িয়েছে। হয়তো দৈবক্রমে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়েছে। কাজটা ভয়ানক খারাপ, সে আর বলতে! কিন্তু অমন করে মুছে সাফ করে না দিলে এ স্লেটের গায়ে নতুন করে লেখা এমন নিরঙ্কুশ হতো না। স্থপতিরা মনের সুখে পরীক্ষা করেছেন। যাঁর মাথায় যা ছিল তিনি তাকে খুশিমতো রূপ দিয়েছেন। আধুনিকতম স্থাপত্যের নমুনা সব দেশেই কিছু না কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু চণ্ডীগড়ের মতো আস্ত একটা শহর পত্তন না করে ঐতিহাসিক একটি নগরকে আধুনিকতম হর্ম্য দিয়ে রূপান্তরিত করা বহুভাগ্যে—না, না, বহু দুর্ভাগ্যে—ঘটে।

দিনের বেলা ঘুরে ফিরে দেখেছি কংগ্রেস হল, শিলার থিয়েটার, নতুন অপেরাগৃহ, হান্‌সা অঞ্চলের মঞ্জিল। যাতে অগণ্য ফ্ল্যাট। এমনি অনেক দালান। কোনোটাতে হাত লাগিয়েছেন ফরাসী স্থপতি করবুসিয়ের, কোনোটাতে জার্মান স্থপতি বর্নেমান। কংগ্রেস হল তো মার্কিনদের দান। স্থপতি হিউ স্টাবিন্‌স। তির্যক গোল ছাদ। যেন বিরাট এক জোড়া ছত্র। সমতল, অথচ সমান্তরাল নয়। আকাশের দিকে বেঁকানো। আধুনিকতম স্থাপত্য যেন এক একটা জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান।

অথবা আপনি একটা জ্যামিতিক সমস্যা। এটা যেমন বাইরের দিক থেকে তেমনি ভিতরের দিক থেকে আরাম ও সুবিধার অঢেল বন্দোবস্ত।

সব চেয়ে অবাক করে নতুন ভঙ্গীর গির্জা। যেমন প্রোটেস্টাণ্টদের তেমনি ক্যাথলিকদের। কেউ কারো চেয়ে কম আধুনিক হবে না বলে যেন পণ করেছে। ধার্মিকরা পড়ে গেছেন স্থপতিদের পাল্লায়। স্থপতিরা কতখানি ধর্মসচেতন জানিনে কিন্তু জ্যামিতিসচেতন তার চেয়ে বেশী, চিনিয়ে না দিলে চেনা শক্ত যে গির্জা দেখছি। গির্জার চূড়াকে যেন কিউবিস্ট পদ্ধতিতে বিশ্লিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। ওটা এখন গির্জার মাথায় নয়, এক পাশে। যেন স্বতন্ত্র এক মিনার। একটি গির্জার ছাদ তো গোরুর গাড়ির ছইয়ের মতো গোলাকার। ভিতরে গেলে যা চোখে পড়ে তাও আধুনিক চিত্রকলা ও অপরাপর কলার নিদর্শন। সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও টেকনোলজির। মানুষ আজ যে জগতে বাস করছে সে জগৎ যতই অদ্ভুত হোক না কেন সেইখানেই সে তার ঘরে আছে বলে বোধ করতে চায়। যেখানেই সে যাক সে যে ঘরে আছে এ ভাবটা তার চাই। গির্জাও তো এ জগতের অঙ্গ। গির্জাতেও সে যাতে ঘরে আছে বলে ভাবতে পারে তার জন্যেই কি এমনতরো আয়োজন?

বার বার রাজা উইলিয়ামের স্মারক গির্জার সামনে দিয়ে হাঁটি। আমার কিন্তু ভালো লাগে সাবেক রীতির গির্জা।

॥ ছাব্বিশ ॥

অত বড়ো একটা অগ্নিশুদ্ধির ভিতর দিয়ে গেছে যে জাতি তার জীবনের কোন্ দিকটা সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে? সেটা কি তার ধর্ম, তার নীতি, তার দর্শন, তার সাহিত্য, তার সঙ্গীত, তার স্থাপত্য, তার বিজ্ঞান, তার টেকনোলজি, তার সামাজিক পুনর্বিন্যাস?

শহর থেকে শহরে লাফ দিয়ে যেতে যেতে এক নজরে দেখবার মতো নয় এর কোনোটাই। বইপত্র পড়েই যদি জানতে হয় তবে দেশে বসেই তো জানতে পারি। কিন্তু আলো দেবার মতো নতুন বইপত্রের সন্ধান দেশে বসেও পাওয়া যায় না। এমন কি যে দেশে এসেছি সে দেশেও না। জার্মানী এখনো নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায়নি। তার জীবনে স্থিতি আসেনি। যুদ্ধবিগ্রহের কালরাত্রি পোহালেও শান্তির প্রভাতটা গাঢ় কুয়াশার লৌহ যবনিকায় ঢাকা।

প্রবীণরা হয় প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে মানুষ হয়েছেন, নয় ভাইমার রেপাবলিকের আশাবাদ আস্বাদন করেছেন। তাঁদের কাছে যে আলো পাওয়া যায় সে আলো যেন গতরাত্রের মোমবাতির। বেলা দশটায় গিয়ে দেখি এখনো জ্বলছে। কিন্তু যাঁর ঘরে টেবিলের উপর জ্বলছে তিনি সেকালের নন, একালেরই একজন লেখক। অটো লুথার। ছদ্মনাম য়েন্‌স রেহ্‌ন। প্রভাতটা কিন্তু গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা নয়। প্রখর না হলেও স্নিগ্ধ সূর্যালোক থেকে মোমবাতির আলোয় এসে বসি। লুথার দম্পতির সঙ্গে আলাপ করি। এই সুখী দম্পতির একটি শিশুপুত্র আছে। তাকে স্কুলে দিয়ে আসা ও সেখান থেকে নিয়ে আসা জননীর স্বকাজ। রেডিওর চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ছেলের চাকরি করছেন তিনি। স্বামী ঐ রেডিওর সাহিত্য বিভাগের পরিচালক।

লুথার তাঁর স্বকালের অগ্রগণ্য লেখকলেখিকাদের প্রত্যেকের উপর একটি করে ছড়া লিখেছেন। ছড়াকে সচিত্র করা হয়েছে চিড়িয়াখানার জীবজন্তুদের এক একটির সঙ্গে মিলিয়ে। তবে

পরিহাসটা বেদরদী বা বিদ্রূপাত্মক নয়। সাহিত্যে প্রবেশ করার পক্ষে এটাও এক প্রকার গাইড। কিন্তু সাহিত্য কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার দিগ্‌দর্শন পাই কার কাছে

এর পর ঘুরতে ঘুরতে কালকের সেই রেস্টোরাণ্ট। সেখানে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করেন রাজস্ব শিক্ষারত জীবনজিজ্ঞাসু যুবা প্রণব ঘোষ। আমরা দুই ভারতীয় যাচ্ছি লৌহ-যবনিকার অন্তরালে। নিজেদের দায়িত্বে। সবরকম ঝুঁকি নিয়ে। আমাদের মোটরচালক একজন লেবাননের আরব সাংবাদিক। তথা ছাত্র। মজহর হাম্‌জে। সদালাপী সুদর্শন। ভারতকে লেবাননকে পূর্ব জার্মানী সন্দেহ করে না। তাই আমরা তিনজনে এক নৌকায়। থুড়ি এক মোটরে। হাঁ, মোটর সমেত। ফিরতে যদি রাত হয় মোটর ছেড়ে দিতে হবে। আর থিয়েটার দেখতে গেলে তো রাত হবেই। কাজে লাগে না বলে মোটা ওভার কোট সঙ্গে নিতে আমার রুচি ছিল না। কিন্তু ঘোষ নিজে একবার জেনোয়া থেকে রেলপথে আসবার সময় ওভারকোটের অভাবে অশেষ কষ্ট পেয়েছিলেন বলে আর ও ঝুঁকি নিতে চান না। সৎপরামর্শই দেন। জার্মানীর আর কোথাও এত শীত আমি পাইনি, যেমন রাতের বেলা পূর্ব বার্লিনে। প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া যায়। শীতের ঝুঁকি নেওয়া যায় না। মানুষকে বিশ্বাস করতে পারা যায়। ওয়েদারকে বিশ্বাস নেই।

ঘোষের অনুরোধে তাঁর বাসস্থানটাও পরিদর্শন করা গেল। ভূতপূর্ব প্রখ্যাত মেয়রের নামে নামকরণ। আর্নস্ট রয়টার হাইম। আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীদের জন্যে নির্মিত বহুতল সৌধ। যে যার নিজের ঘরে থাকে। ইচ্ছা করলে রেঁধে নেবার আলাদা জায়গা আছে। নয়তো ক্যান্টিনে গিয়ে খেতে হয়। খাসা বন্দোবস্ত। এখানে মাঝে মাঝে লেকচার হয়, ক্লাস হয়। বাইরের লোকেরও যোগ দেবার অধিকার আছে। পাড়াটা শ্রমিকপ্রধান। অবসর সময়ে তারাও জ্ঞান অর্জন করে। এখানে বলে রাখা দরকার যে পশ্চিম বার্লিন সরকারও শ্রমিকদের গুরুত্ব দেন। তাদের উন্নতির সুযোগ অবাধ।

চেক-পয়েণ্ট চার্লিতে নেমে আমরা পাশপোর্ট দাখিল করি, কাস্টমসের কাগজপত্র সই করি, পশ্চিম জার্মানীর মার্কমুদ্রার বিনিময়ে পূর্ব জার্মানীর মার্কমুদ্রা গ্রহণ করি। সেই ফাঁকে একবার কর্মচারীদের একজনকে বলি থিয়েটার দেখতে চাই। ব্রেখ্‌টের থিয়েটার। ব্রেখ্‌ট অবশ্য নেই, কিন্তু তাঁর থিয়েটার অবশ্যদর্শনীয়। ভদ্রলোক দয়া করে টেলিফোন করেন। উত্তর পান, দুঃখিত। সাতদিন আগে থেকে সব আসন ভর্তি। দু'খানিও খালি নেই। এ রকম যে হবে এটা আমার অজানা ছিল না। একবার ঢুকতে তো পাই, তার পর নিজে চেষ্টা করে দেখব। প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো যে রাত বারোটার মধ্যেই ফিরতে হবে। ইচ্ছা করলে পরের দিন আবার যেতে পারব। সারাদিন সারা সন্ধ্যা থাকতে পারব। কিন্তু রাত বারোটার মধ্যে না ফিরলে কী জানি কী অনর্থ হবে।

জার্মানীতে ছাত্ররাও মোটর চালিয়ে ঘণ্টায় দশ টাকা রোজগার করে। মোটরটা কোনো এক কোম্পানীর। তারাও ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দেয়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো মোটরকে সকাল সকাল ছুটি দেওয়া। কিন্তু তার আগে নিশ্চিত হতে হবে থিয়েটারে আসন পাব কি পাব না। প্রথমেই বলি ব্রেখ্‌ট থিয়েটারে নিয়ে যেতে। দেখি না একবার বলে কয়ে ম্যানেজারকে। 'ব্রেখ্‌টের নামডাক শুনে আমরা সেই নেহরুর দেশ থেকে ছুটে আসছি। আপনারা কি আমাদের সত্যি হতাশ করবেন?' কিন্তু বলার অবসর দিচ্ছে কে! মজহর হান্‌জে যদিও ফিল্ম তৈরি করার জন্যে তালিম নিচ্ছেন তবু ব্রেখ্‌টের সমঝদার বলে প্রমাণ দেন না। 'ওই যে একটা থিয়েটার দেখছি। আসুন, ওইখানেই খবর নেওয়া যাক।' তিনি আমাদের যেখানে নিয়ে তুললেন সেটার নাম ম্যাক্‌সিম গর্কি থিয়েটার। স্পষ্ট বোঝা যায় যে বনেদী রঙ্গালয়, শুধু নামান্তরিত হয়েছে। উন্টার ডেন লিণ্ডেন থেকে একটু আড়ালে।

বক্স অফিসের অধিষ্ঠাত্রী প্রৌঢ়া মহিলাকে আমরা ধরি। তিনি যদি দয়া করে একবারটি খোঁজ

নেন ব্রেখ্‌ট থিয়েটারে আসন খালি আছে কি না। অসঙ্গত অনুরোধ। তাঁর নিজের থিয়েটারের স্বার্থবিরোধী। কিন্তু দুটোই তো রাষ্ট্রের থিয়েটার। সব ক'টাই তো রাষ্ট্রের। সেই মিষ্টস্বভাব মহিলা টেলিফোন করে জানতে পান যে সাতদিন আগে থেকে সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। দুঃখিত। আমরা তখন ফোক্স থিয়েটারে চেষ্টা করার কথা ভাবছি। ভদ্রমহিলা করুণভাবে বলেন, 'আচ্ছা, আমাদের থিয়েটার কী দোষ করল?' না, কোনো দোষ করেনি। তবে ব্লাজেক যে কে, 'এবং এটা ক্রিস্‌মাস ইভে' যে কী, সেসব তো জানিনে। চোখ বুজে টিকিট কাটব?

ভেবে দেখি যে আমাদের পক্ষে সবই আঁধারে ঝাঁপ দেওয়া। ফোক্স থিয়েটারের নাম আছে বটে, কিন্তু সেখানেও যদি জায়গা না পাই তা হলে তো এইখানেই ফিরে আসতে হবে। কোন মুখে দ্বিতীয়বার টেলিফোন করতে বলি? ভদ্রমহিলাকে নিরাশ করতে মায়া হয়। রাজী হয়ে যাই। টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি দু'খানিমাত্র টিকিট বাকী ছিল। সেও সব চেয়ে দামী। ঘোষের মতে পশ্চিম বার্লিনের তুলনায় কম দামী। আমবা বিনিময় করে যা পেয়েছিলুম টিকিট কাটতে গিয়ে উড়িয়ে দিই। অভিনয়ের তখনো ঘণ্টা কয়েক দেরি। কী ভাগ্যি পকেটে বিনিময় করবার মতো আরো কিছু মুদ্রা ছিল। নইলে সে রাত্রে একাদশী।

শনিবার বিকেলটা কমিউনিস্টরাও ছুটি নেয়। দোকানপাট বন্ধ। মুদ্রা বিনিময় করতে কি আবার চেক-পয়েন্ট ফিরে যেতে হবে? না, শহরেও আর একটা আপিস আছে, সেখানে গেলে মুদ্রার বদলে মুদ্রা দেয়। সেখানেও দেখি এক ভদ্রমহিলা অধিষ্ঠান করছেন। বয়স বেশী নয়। খুব চটপটে। এই দরকারী কাজটি সেরে আমরা আবার চলি উন্টার ডেন লিণ্ডেনে। কতকালের চেনা রাজপথ। মোটামুটি তেমনি আছে, শুধু লিণ্ডেন তরুবীথি নেই। হিটলার কর্তৃক কর্তিত। স্টেট অপেরা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি একে একে মিলিয়ে নিই। মেলে না চ্যান্সেলারের ভবন। সেখানে বিরাট ময়দান। তার খানিকটা উঁচু। চারদিকে কাঁটাতার। জানতে চাই হিটলার কোথায় বাঙ্কার তৈরি করে থাকতেন। মজহর একদিকে আঙুলের ইশারা করে বলেন, 'কাউকে যেতে দেওয়া হয় না।' সেখান থেকে নাকি সুড়ঙ্গপথ গেছে সীমান্তের ওপারে রাইখ্‌স্‌টাগ ভবনে। সেকালের পার্লামেন্ট। চেয়ে দেখি এক পাশে একটা সাইনপোস্ট। লেখা আছে 'হোটেল আডলন।' ফাঁকা মাঠ। যতদূর মনে পড়ে ইডেন এখানে উঠেছিলেন। অভিজাতদের খানদানী হোটেল। কেউ তার পুনর্গঠন করেনি।

পূর্ব বার্লিনে পুনর্গঠনের তাড়া নেই। তবে একেবারেই হচ্ছে না এটা ভুল। শ্রমিকদের মঞ্জিল বেশ তকতকে। পশ্চিম বার্লিনের মতো জলুস নেই, তবু এদেরও নিয়ন বাতি জোটে। কিন্তু একটা ঘোরতর প্রভেদ লক্ষ করে চমকে উঠি। দোকানের পর দোকানের উপরে লেখা দুটি অক্ষর—এইচ ও। তার মানে কি হাইড্রোজেন অক্সিজেন? উঁহু! হলো না। তার মানে হাণ্ডেলস অর্গানাইজেশন। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। একধার থেকে সব ক'টা দোকান রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। তেল নুন লকড়ি।

জল হচ্ছে এইচ ২ ও। আর কমিউনিজম হচ্ছে এইচ ও। তফাৎটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। জলের চেয়েও সোজা। হো হো!

॥ সাতাশ ॥

আরো বড়ো চমক অপেক্ষা করছিল। যেতে যেতে এক খোলা জায়গায় দেখি শূন্য বেদী। তাকে ঘিরে একটা প্রকাণ্ড কাঠামো। এ কী!

'নাম করতে নেই। তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' মজহর বলেন, 'আগে এই রাস্তার নাম ছিল স্টালিন অ্যালি। এখন এর নাম কার্ল মার্কস অ্যালি।'

অবশ্য স্টালিনের নামে নামকরণের আগে ওর আরো একটা নাম ছিল। ফ্রাঙ্কফুর্টার অ্যালি। বিখ্যাত রাজপথ। স্টালিনকে তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছিল। এখন মরা সিংহকে সবাই লাথি মারে। যাঁর নাম ছিল সর্বঘটে এখন তাঁর নাম সবখান থেকে মুছে গেছে। নাম করতে নেই। তাঁর অনুপস্থিতিও একপ্রকার উপস্থিতি। স্টালিনগ্রাডের লড়াই কি কেউ ভুলতে পারে? স্টালিনগ্রাডের হারজিতের ফলেই বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। হিটলারের শহরে স্টালিনের মূর্তি। তা কমিউনিস্টরা এখন আর মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করে না।

জার্মান কমিউনিস্টরা জাতি হিসাবে পরাজিত হলেও মতবাদের দিক থেকে বিজেতা। তাঁদের পতাকা এখন ব্রাণ্ডেনবুর্গের তোরণের শীর্ষে। কার বিজয়তোরণ এখন কার বিজয়তোরণ! পূর্ব বার্লিন এখন কমিউনিস্ট দুনিয়ার পশ্চিম রাজধানী। পিকিং যেমন তার পূর্ব রাজধানী। সমৃদ্ধির নিরিখে পশ্চিম বার্লিনের সঙ্গে পূর্ব বার্লিনের তুলনা হয় না। পূর্ব বার্লিন সত্যিই নিরেস। কিন্তু ও ছাড়া আরো একটা নিরিখ আছে। এইচ ও তার প্রতীক। এইচ ও মিলে হো। সব লাল হো। সব লাল হো যায়েগা। ওহো।

ব্রাণ্ডেনবুর্গের তোরণের কাছে গিয়ে পশ্চিম বার্লিনের দিকে তাকাই। মাঝখানে সেই দেয়াল। আকারে-প্রকারে চীন দেশের মহাপ্রাচীর নয়। তবু তারই মতো দুর্ধর্ষ ও দুরতিক্রম্য। এই দেয়ালটা যেন একটা বনাম। ধনশক্তি বনাম শ্রমশক্তি। বৈশ্যসমাজ বনাম শূদ্রসমাজ। থীসিস বনাম অ্যান্টিথীসিস।

দিনের আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে মজহর যখন আমাদের নিয়ে যান সোভিয়েট মেমোরিয়াল দেখাতে। বার্লিন যে কত সুন্দর তার অন্যতম নিদর্শন এই বনস্থলী। স্তব্ধ বিজন প্রকৃতির কোলে শায়িত রয়েছে সোভিয়েট জননীর পাঁচ সহস্র বীর সন্তান। তাদের শিয়রে জাগ্রত রয়েছে শোকাভিভূত জননীর শ্বেতমর্মর প্রতিমা। মাথা নত করে দাঁড়িয়েছে দুই অজ্ঞাত সৈনিক। কবরের বিভিন্ন ফলকে রুশভাষায় কী সব উৎকীর্ণ। জার্মান ভাষার কোথাও স্থান নেই। এটা যেন জার্মানীই নয়। রাশিয়া বা সোভিয়েট ইউনিয়ন। ইংরেজদের কবি রূপার্ট ব্রুক যেমন কল্পনা করেছিলেন সৈনিকের মতো মৃত্যু হলে তাঁকে যে মাটিতে গোর দেওয়া হবে সে মাটি চিরতরে ইংলণ্ড তেমনি বার্লিনের ট্রেপটভ অঞ্চলের এই গোরস্থানের মাটিও চিরতরে সোভিয়েট। বিষাদ ও শ্রদ্ধাভরে আমরা ক্ষণকাল নীরব থাকি। মানবাত্মা অমর। কোথায় তার দেশ আর কোথায় তার কাল! বিস্মৃত হোক মর্ত্যের যত বিদ্বেষ ও ঘৃণা।

মজহর বলেন, 'স্টালিনের নাম এই একটি জায়গায় এখনো খোদাই রয়েছে। সরালে ফলকটাই সরাতে হয়।'

শুধু কি সেই ফলকটাকেই? ইতিহাসের সেই অধ্যায়টাকেও। বার্লিন থেকে সোভিয়েট অধিকার একদিন মুছে যাবে। মুছবে না সেই শেষ ক'দিনের যুদ্ধ। হিটলার ও স্টালিন উভয়েরই নাম

থাকবে। দু'জনেই দুই প্রোটাগনিস্ট। তাঁদের এপিক সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায় এই বার্লিনেই। জয়-পরাজয় স্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে নির্ধারিত হয়েছিল। বার্লিনের যুদ্ধ তার জন্যে নয়। বার্লিনের যুদ্ধ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ ঠেকিয়ে রাখার জন্যে। যতক্ষণ আশ ততক্ষণ শ্বাস। আশা যেদিন নিবল শ্বাস সেদিন থামল।

হিটলারের মনে কী ছিল জানিনে। বোধ হয় এটাই তিনি চেয়েছিলেন যে, তাঁর পরে গবর্নমেণ্ট গঠনের জন্যে কোন ব্যক্তি থাকবেন না, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে কোন গবর্নমেণ্ট থাকবে না, সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করবার জন্যে কোনো রাষ্ট্র থাকবে না, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরম্পরা বলে কিছু থাকবে না। এমন একটা ছেদ পড়বে যার উপব সেতু নির্মাণ কবা অসম্ভব। এই তাসখানা তাঁর হাতে ছিল বলেই আশ ছিল ও শ্বাস ছিল। এটাও একপ্রকার পোড়ামাটি। ইতিহাসে এর কোনো নজীর মেলে না।

যুদ্ধ বাধিয়েছিল যে রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রই নেই। সে বা তার অব্যবহিত উত্তরাধিকারী না থাকলে অপরাধের দায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে কে? সন্ধি করবে কে? পশ্চিম বা পূর্ব জার্মানী কি স্বীকার করছে যে যুদ্ধ বাধানোর দ্বায়িত্ব ও ক্ষতিপূরণের দায় তার উপর অর্শেছে? প্রথম মহাযুদ্ধের পর কাইজারের সরকারের দায়দায়িত্ব সোশিয়াল ডেমক্রাট সরকার বহন করেন, অসম্মানজনক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে লোকচক্ষে হেয় হন, ক্ষতিপূরণের ঠেলায় টাল সামলাতে পারেন না। অবশেষে পটল তোলেন। এবার কিন্তু যত দোষ নন্দ ঘোষ। যুদ্ধ বাধিয়েছিল হিটলার। দায়দায়িত্ব ওই ব্যক্তির। ওর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। আর কাউকে অতীতের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অপ্রিয় হতে হবে না। পটল তোলার ঝুঁকি নিতে হবে না। পীস ট্রীটি এই আঠারো বছরেও হলো না। আর কবে হবে?

যাঁরা সেদিন যুদ্ধ জয় করেছিলেন তাঁরা আজো শান্তি জয় করতে পারেননি। হিটলার যেমন যুদ্ধজয়ে অক্ষম তাঁরাও তেমনি শান্তিজয়ে অসমর্থ। হিটলার যেন যাবার বেলা গণ্ডী দিয়ে বলে গেছেন, 'তোমরা আটকা পড়লে। তোমাদের সৈন্যসামন্ত অনন্তকাল জার্মানীতে আটক থাকবে। সন্ধি তোমাদের সঙ্গে কেউ করবে না। বিনা শর্তে সৈন্য অপসারণে কি তোমাদের রুচি হবে? সেটাও তো একপ্রকার বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ।'

না। সেটাও অভাবনীয়। মৃত সোভিয়েট বীরদের পাহারা দেবার জন্যে জীবিত সোভিয়েট বীরদেরও এখানে থাকতে হবে, নয়তো তাঁদের দেহকেও স্টালিনের দেহের মতো কবরান্তরিত করতে হবে। সোভিয়েট ভূমিতেই। চিরতরে ইংলণ্ড বা চিরতরে সোভিয়েট এ কথার কি মানে হয়! কালস্য কুটিলা গতি।

আর না। আঁধার হয়ে আসছে। বনস্থলীর বাইরে গিয়ে দেখি রাস্তায় বাতি জ্বলতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু লোক চলাচল নেই। মোটরও বিরল। এই কি বার্লিন শহর? আবার আমরা উন্টার ডেন লিণ্ডেনে ফিরে যাই। শনিবারের সন্ধ্যা। নগরের শ্রেষ্ঠ সরণি। কিন্তু কোথায় কলকোলাহল! কতটুকু জনসমাগম! কমিউনিস্টরা কি পথে বোরোয় না? হুল্লোড় করে না?

জীবনের স্রোত একই খাতে প্রবাহিত হয় না। উন্টার ডেন লিণ্ডেন ছিল সম্রাটের প্রাসাদ থেকে চ্যান্সেলারের ভবন পর্যন্ত প্রসারিত জমকালো মার্গ। এখন পূর্ব জার্মান সরকারের রাজধানী সরে গেছে পূর্ব বার্লিনের উত্তরপাড়ায়। পান্‌কভ অঞ্চলে। আর পশ্চিম জার্মান সরকারের রাজধানী তো বার্লিনেই নয়। সেইজন্যে উন্টার ডেন লিণ্ডেন এমন নিষ্প্রাণ।

থিয়েটার আটটার আগে খুলবে না। দশটার আগে ভাঙবে না। খেতে হয় তো এই ফাঁকেই খেয়ে নিতে হয়! চায়ের পক্ষে দেরি হয়ে গেছে, ডিনারের পক্ষে বড়ো বেশী আগে। ওদিকে মজহরেরও আর আমাদের সঙ্গে থাকার জো নেই। মোটর নিয়ে ফিরে যেতে হবে। তিনি আমাদের

নামিয়ে দিয়ে যান উন্টার ডেন লিণ্ডেনের এক রেস্টোরান্টে। থিয়েটার অদূরে।

যথেষ্ট ভিড়। দোতালায় চেষ্টা করি। একটি টেবিলে এক মহিলা ও তাঁর দুই শিশুর পাশে বসি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওয়েটার যদি বা আসে অর্ডার দিলে খাবার আর আসেই না। ব্যাপার এই যে, ওয়েটার সংখ্যা কম। কিন্তু ওঁকে ওয়েটার বলা কি ঠিক? উনিও তো একজন কমরেড। পরনে ইভনিং ড্রেস। এমন চালে চলেন যেন উনি একজন কার্ডবিশিষ্ট পার্টি মেম্বার। আজ ওয়েটার, কাল হয়তো ম্যানেজার কি ডাইরেক্টর। পরে হয়তো কমিশার কি ডিকটেটর। লোকটির আত্মমর্যাদাবোধ আমাকে মুগ্ধ করে। বিল মিটিয়ে দেবার সময় দেখি বকশিশের বালাই নেই। ভাবখানা যেন এই যে, তুমিও কমরেড আমিও কমরেড। আমি কি ছোট যে তোমার হাত থেকে বকশিশ নেব? না আমি পশ্চিম বার্লিনের ওয়েটার যে মোটা বকশিশ পাব আর ফুর্তিসে পরিবেশন করব?

বকশিশের উপরেই সার্ভিস। যে রাজ্যে বকশিশ নেই সে রাজ্যে সার্ভিস ঢিমেতালে হলে আশ্চর্য হব না। খাবারটা ভালোই রেঁধেছিল। আর দাম তো পশ্চিম-বার্লিনের তুলনায় অনেক কম। তবে নির্বাচন করবার মতো পদ বেশী নয়। যেমন রাষ্ট্রে তেমনি রাষ্ট্রীয় ভোজনশালায়। যা দেয় তা উপাদেয়। ডিনারের টেবিলে কেক দেখে আমার লোভ হয়। খেয়ে দেখি স্বর্গীয়। কমিউনিস্ট হলেও খোরাকের বেলা জার্মান। আর পোশাকের বেলা? আমার ভয় হয় যে, ওটা উচ্চশ্রেণীর নয়। পোশাক দিয়ে যদি মানুষের বিচার করতে হয় তো উচ্চশ্রেণীর বাবু ও বিবিরা এতদিনে দেয়ালের ওপারে বা পরপারে। এপারে যাঁরা রয়েছেন তাঁরা উন্টার ডেন লিণ্ডেন দখল করেছেন। মায় রেস্টোরাণ্ট। যাকে দখল করেছেন সেই দখল করবে। এক পুরুষ বাদে এঁরাই হবেন বুর্জোয়া। হয়তো আরো আগে।

এবার থিয়েটার। প্রাচীরপত্রে লক্ষ করি পরবর্তী আকর্ষণের তালিকায় 'বসন্তসেনা।' তা ছাড়া শেক্সপীয়ার, টলস্টয় ইত্যাদি আন্তর্জাতিক নাম। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখছি জাতিবর্ণশ্রেণী নেই। আর রুচি তো বুর্জোয়াদের চেয়েও ভালো। আগেও শুনেছি যে, কমিউনিস্টরা নিছক প্রচারের যুগ পেরিয়ে এসেছে। ভালো জিনিস দেখে ও শোনে। এই থিয়েটারও সুন্দর ও সুসজ্জিত। দর্শকদর্শিকারা তাঁদের সবচেয়ে পরিপাটি বেশ পরে এসেছেন। আমার পাশে যাঁরা বসেছিলেন তাঁরা শিক্ষিত ও ভদ্র। তাঁদের কাছেই শুনি যে, ছাত্রছাত্রী ও আপিস কর্মীদের টিকিট একসঙ্গে কাটলে কনসেসন রেটে পাওয়া যায়। বইখানি হাসির বই বলে স্কুল থেকে টিকিট কেটে পাঠিয়েছে। পিছনের আসনগুলো তাদের দিয়ে ভরা।

নাটক দেখে আমার সন্দেহ হয় যে, এটা বুর্জোয়া কমেডি। মূল রচনা চেক ভাষায় লেখা। ব্লাজেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার। কিন্তু কবে লিখেছেন বইখানা? কমিউনিস্টদের আসার আগে না পরে? কবেকার সমাজচিত্র? উত্তরে শুনি বছর তিন চার আগেকার।

॥ আটাশ ॥

লৌহ যবনিকার পরপারে বসে থিয়েটার দেখছি। থিয়েটারে যবনিকা উঠতেই দেখি এক বুড়ী ঠাকুমা বসে সেলাই করছেন। তাঁর নাতি নাতনীর সঙ্গে কথা বলছেন। নাতিটি বিশ একুশ বছর বয়সের।

নাদুসনুদুস নন্দদুলাল। আর নাতনীটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের তন্বী। মা নেই, বাপকে আসতে দেখা গেল সন্ধ্যার পর আপিস বা কারখানা থেকে ক্লান্ত হয়ে। অবস্থাপন্ন, সেটা বোঝা যায় ঘরের আসবাব থেকে। দেয়ালজোড়া বুককেস। শিক্ষাদীক্ষা আছে।

ভদ্রলোক টের পাবার আগেই আমরা টের পেয়েছি যে তাঁর মেয়ে তার সমবয়সী এক হাবা গঙ্গারামকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেছে, ঠাকুমার আপত্তি নেই, এখন বাপ যদি অনুমতি দেন। বোনের শখ দেখে দাদাও পেছপাও হবার পাত্র নয়। সেও একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, মেয়েটি রাশভারি মেজাজের বিদুষী। ঠাকুমার অমত নেই, কিন্তু বাড়ি ফিরে বাপের চক্ষুস্থির। একে তো কম বয়সে বিয়ে, তারপর ভাবী জামাতার যেমন বিদ্যা তেমনি চেহারা। ওদিকে ছেলেও শাসাচ্ছে যে বোনের যদি বিয়ে হয় তো ওরই বা কেন হবে না! পড়াশুনা করে যোগ্য হওয়া কী এমন দরকারী। বউ যখন একাই দুজনের সমান। বৌমা যিনি হবেন তিনি যে রূপে বিদ্যাধরী তা নয়, আর শ্বশুরকে যে মেনে চলবেন তারও লক্ষণ দেখা যায় না।

সবাই একে একে হাজির হয়েছে বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যার উৎসবে যোগ দিতে। একটি ক্রিস্‌মাস তরুও এক পাশে দেখা যাচ্ছে। কোথায় বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করবেন তা নয়। মা-মরা ছেলেমেয়ে দুটোকে বিয়ে দিতে হবে। সমস্যা বইকি। সব দেশে সব কালেই সমস্যা। আজকের দিনের প্রাগ শহরেও তাই শ্রমিক শ্রেণী থেকে উদ্‌গত কমিউনিস্ট জমানার নব্য মধ্যবিত্ত সমাজেও তাই। ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আমাদের দিকে ফিরে আপন মনে যা বললেন তার মানে বোধহয়—নাঃ। বাড়িতে আর কোনো সুখ নেই, যাই যেদিকে দু'চোখ যায়।

যাবেনই বা কোন্ ভূস্বর্গে! সেই সনাতন সরাবখানায়। সেখানে তাঁর একটি জুড়ি জুটে যান। তিনিও তেমনি চিন্তিত। তাঁর ছেলেটা একটা গবেট। বিশ্ববিদ্যালয়ে ওকে নিচ্ছে না। অথচ বাবুর বিয়ে করা চাই। কে একটি মেয়ে ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। আমাদের বুঝতে বাকী নেই যে ইনিই হলেন বরের বাপ। দুই বেহাইয়ের সেটা কিন্তু জানতে বাকী থেকে যায়। কনের বাপ কী করেন, উৎসবের সন্ধ্যাটা বাড়ির বাইরে কী করে কাটান! উৎসবের অংশ নিতে বাড়িতেই ফিরে যান। গিয়ে দেখেন নাচ চলছে। আহারের আয়োজন হচ্ছে। আসর সরগরম। তিনিই কেবল অসুখী।

মেয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাপড়ার চেষ্টা। মেয়েও নাছোড়বান্দা। বাপও নারাজ। খাওয়াদাওয়ার পর একসময় ভাবী বরকর্তার প্রবেশ। ছেলেকে ডেকে নিয়ে একঘর লোকের সামনে তার গালে এক চড়! আহা বেচারা! ভদ্রলোক তাকে পলিটেকনিকে না কোথায় পড়তে পাঠাবেন। ছেলেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অযোগ্য বলে কারিগরী শিক্ষার অনুপযুক্ত নয়। বরকর্তা কন্যাকর্তার ব্যথার ব্যথী। এঁকে উদ্ধার ওঁর উদ্দেশ্য। তাঁর প্রস্থানের পর মেয়ে জানিয়ে দেয় আজ রাত্রেই সে তার বালক বন্ধুর সঙ্গে গৃহত্যাগ করবে। তুমি কি মনে করেছ, বাবা, যে তুমি বিয়ে না দিলে আমার বিয়ে হবে না?

এই বলে সে তার হবু বরের হাত ধরে বিদায় নেয় আর কী? কী রকম একখানা পরিস্থিতি! এমন বিপদেও কেউ পড়ে! ওদিকে ঘরের ছেলেটিও পরের মেয়েটিকে নিয়ে উধাও হবার তালে আছে। মনে হয় ঠাকুমাও তলে তলে নাতি নাতনীর চাল সমর্থন করেন। ঠাকুমা বলে একটা জাত আছে সেটা সব দেশেই সমান। নাতি নাতনীর বিয়ে দেখবে এই তার জীবনের সাধ। মা-মরা সন্তান। ওদের মন ঠাকুমাই বোঝে।

রাত তখন তিনটে। আমাদের ঘড়িতে নয়, নাটবেদীর দেয়ালঘড়িতে। এবার বাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন না, মেয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছে। ওঃ কী নিদারুণ ট্র্যাজেডী!

আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাস। এমন সময় মেয়ের বাপ হবুচন্দ্রকে কাছে টেনে নিয়ে দুটো একটা কথার পর তার মাথায় ছোট্ট একটি চাঁটি মেরে বলেন, যাঃ! পরশুরামের পরিভাষায় ওর মানে, হাঁ। ছেলেটা তো অবাক। ওই চড়ের চেয়ে এই চাঁটি কিন্তু মিষ্টি। এই মধুর পরিণতির উপর যবনিকা নামে। নাটবেদীর সকলের মুখে আনন্দ। ততক্ষণে বড়দিন শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু তখনো কিছু বাকী ছিল। মঞ্চের সুমুখের দিকে এগিয়ে এসে আত্মগতভাবে অথচ আমাদেরকে তাঁর অন্তরের অন্তরঙ্গ করে কন্যাকর্তা বলেন, ওই অবস্থায় ও ছাড়া আর কী করবার ছিল! মত না দিয়ে কি পারি! অমন অবস্থায় পড়লে আর কেউ কি আর কিছু করতে পারতেন!

তা তো বটেই। তা তো বটেই। আমরা একবাক্যে বলতে পারতুম, বলিনে। তার বদলে সবাই মিলে করতালি দিই। নাটবেদী আবার ভরে যায়। অভিনেতা অভিনেত্রীরা সমবেত হয়ে আমাদের অভিবাদন করেন। আনন্দ আর ধরে না। শুধু কনের বাপের মুখখানি করুণ। এইবার তো ছেলে এসে ধরবে, বিয়ে দাও। নইলে আমিও—

সেদিনকার অধিকাংশ দর্শকই তরুণবয়সী ছেলেমেয়ে। তারা যে খুব উপভোগ করছে এটা আমাদের সমঝিয়ে দিয়েছে। বিয়ে করতে কে না চায়, তবে চাঁটি খাওয়ার আগে গঙ্গারামকে বোধহয় কথা দিতে হয়েছিল যে সে মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, সৎপাত্র হবে। শ্রমজীবী সমাজেও পড়াশুনার কদর আছে। ভুলো মাৎ, ভুলো মাৎ।

আমার কিন্তু মনে হলো না যে আমি কমিউনিস্টদের রাজ্যে বসে সোশিয়াল রিয়ালিজম দেখছি। স্টেজ বা সাজসজ্জা বা আঙ্গিক বা অভিনয় কোনোখানেই বামপন্থী স্বাক্ষর নেই। কিংবা নেই পরীক্ষামূলকতার নিদর্শন। তবে ওই যে প্রধান অভিনেতা দর্শকদের দিকে এগিয়ে এসে স্বগত উক্তির ছলে দর্শকদের কাছে তাঁর সমস্যাটা খুলে ধরছিলেন এটা বোধহয় দর্শকদের সঙ্গে সাযুজ্যের সচেতন প্রয়াস। যেন বলতে চান, 'এই তো আমার পরিস্থিতি। এখন আমি এ ছাড়া আর কী করতে পারি, আপনারাই বলুন।' ওটা কি তবে আমাদের দেশের যাত্রার দিকে একটি পদক্ষেপ?

ব্রেখ্‌টের নাটক দেখার সৌভাগ্য হলো না। মনে হলো ব্রেখ্‌ট না থাকলেও তাঁর প্রভাব অনুপস্থিত নয়। ব্রেখ্‌টের নাটকের দর্শকরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ না করলেও সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় নন। অভিনেতাদের লক্ষ্য তাঁদের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন যোগস্থাপন। অন্তত বই পড়ে সেইরূপ ধারণা জন্মায়। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধার যেমন সরাসরি দর্শকদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতেন ব্রেখ্‌টের নাটকের কোনো একজন অভিনেতাও তেমনি দর্শকদের দিকে মুখ করে তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু বলে নাটকটির সূচনা বা সমাপ্তি করতেন। এরই নাম কি সমাজসচেতনতা?

জমা দেওয়া ওভারকোট ফেরৎ নিয়ে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়ি। ঘোষ আর আমি। উন্টার ডেন লিণ্ডেন রাত সাড়ে দশটায় মৃতের মতো নিস্তব্ধ। রাস্তার আলো মিটি মিটি জ্বলছে। একটা ট্যাক্‌সি একধারে থেমে যাত্রী নিয়ে চলে যায়। এর থেকে অনুমান করি যে অপেক্ষা করলে ট্যাক্‌সি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ট্যাক্‌সির সাক্ষাৎ পাইনে বা পেলেও সেটা খালি নয়। দিব্যি শীত। যাকে রাখ সেই রাখে। আমার ওভারকোট আমার রক্ষক। নইলে বার্লিনের ভালুকের মতো বার্লিনের শীত হতো ভক্ষক। বলতে ভুলে গেছি যে প্রথম দিনই বার্লিনের ভালুকের খেলনা সংস্করণ কেনা হয়ে গেছে।

ওদিকে রাত বারোটা বেজে গেলে আমাদেরও বারোটা বাজিয়ে দেবে। হাজতে রাত কাটাতে হবে কি না কে বলবে। অগত্যা পদব্রজেই চলি, যেদিকে ট্যাক্‌সির আড্ডা। এক পথিক দয়া করে নির্দেশ দেন। কেন্দ্রীয় রেল স্টেশনের দিকে যতবেশী এগোই ততবেশী আলো আর প্রাণ এগিয়ে আসে। না, বার্লিন মৃত নয়, জীবন্ত। কোনো কোনো বিপণি তখনো খোলা। যেতে যেতে আমরা

ট্যাক্সি পেয়ে যাই। ততক্ষণে এগারোটা পার হয়ে গেছে। ওই ট্যাক্সিওয়ালাই আমাদের ত্রাণকর্তা। ওকে বকসিস দেওয়া উচিত। অন্যত্র ওটাই রেওয়াজ। কিন্তু ও যে একজন কমরেড। ও যে ওর কর্তব্য করেছে। ও শুধু ভাড়াটুকুই নেবে।

আবার সেই চেক-পয়েন্ট চার্লি। এবার আমাদের কেউ আটকায় না। আরেকদফা মুদ্রা বিনিময় করে লৌহ যবনিকা ভেদ করি। মার্কিন সৈন্যরা হেসে ছেড়ে দেয়। আমরা এখন মুক্ত দুনিয়ায়। পাশ্চাত্য জগতের দোরগোড়ায়। আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলস্টেশনের পাতালে নেমে গিয়ে টিকিট কাটি। দেখি টিকিটের গায়ে তারিখের সঙ্গে সঙ্গে সময়ও দেগে দিয়েছে। রাত সাড়ে এগারোটা। কী প্রখর সময়জ্ঞান!

আণ্ডারগ্রাউণ্ড দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ করি যে স্টেশনের পর স্টেশন ভিতর থেকে বুজিয়ে দেওয়া। মানে? মানে আমরা পশ্চিম বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে যাচ্ছি, ভায়া পূর্ব বার্লিন। ওটুকু পার হয়ে গেলে স্টেশনের প্রবেশ ও প্রস্থানপথ খোলা। মানে পশ্চিম বার্লিনে এসে গেছি। ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে ভূগর্ভের এই যে গরমিল এর কারণ আণ্ডারগ্রাউণ্ড সিস্টেম আগের মতো রয়েছে। ওর বাঁটোয়ারা হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়।

চিড়িয়াখানা আমার স্টেশনের নাম। উপরে উঠে চেয়ে দেখি চারিদিকে জমকালো আলোর রোশনাই। কত প্রাণ! কত আওয়াজ। না, না, জানোয়ারের নয়। মানুষের ও মোটরের। কুর্‌ফ্যু'রস্টেনডাম তার বৈভবের পসরা মেলে বসে আছে। কেনাকাটার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু কাঁচের জানালা দিয়ে সে বিকীর্ণ করছে তার বিচিত্র ঐশ্বর্য। সব প্রাইভেট মালিকানা। এইচ ও কোথাও নেই। ওটা যেন একটা মায়া জগতের দুঃস্বপ্ন।

।। ঊনত্রিশ ।।

কোন্‌টা যে মায়া জগৎ এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ আছে। এই যে দ্বীপটির নাম পশ্চিম বার্লিন এটিও কি মায়াবী নয়? এর অঙ্গে মহাযুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন নেই, তার বদলে শিল্প বাণিজ্যের চেকনাই। কিন্তু এহো বাহ্য। একটু উঁকি মারলেই দংষ্ট্রা নখর বেরিয়ে পড়ে। চিড়িয়াখানার জানোয়ারের নয়। সুসভ্য মানুষের। তার সত্তার গহনে ওত পেতে রয়েছে আদিম যুগের হিংসা। তার সঙ্গে মুখোমুখি হলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়।

বার্লিন ছাড়তে হবে সন্ধ্যায়, তার জন্যে হোটেল ছাড়তে হবে সকালে। শ্রীমতী ভেমান এসে হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করছেন, আমার দেরি হচ্ছে গোছগাছ ও সাজগোজ করতে। কথা ছিল ঘোষ এসে আমাদের সঙ্গে ঘুরবেন। তিনি আসতেই তাঁর হাতে ছুঁচ সুতো বোতাম ধরিয়ে দিই।

এবার আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় বধ্যভূমিতে। না, না, আমাকে বধ করবার জন্যে নয়। আমাকে দেখাতে যে ২০শে জুলাই ১৯৪৪ তারিখে হিটলারকে যাঁরা মারতে গিয়ে ব্যর্থ হন সেই হতভাগ্য আর্মি অফিসারদের কোথায় এবং কেমন করে বধ করা হয়। জার্মানদের জীবনে ওটি একটি ঐতিহাসিক দিবস। স্টাউফেনবার্গের বোমায় হিটলারের প্রাণান্ত হলে মহাযুদ্ধের শেষ ন'মাসের ওস্তাদের মার থেকে জার্মানরা বাঁচত। প্রায় পাঁচ বছরের মারের সুদে আসলে শোধ ওই ন'মাসেই হয়। ওই ক'মাসে যত জন মরেছে ও যত জনপদ ধ্বংস হয়েছে তার আগের ক'বছরে

তত নয়। বিশে জুলাইয়ের বোমার উপরে নির্ভর করছিল রণশ্রান্ত জার্মানীর ভাগ্য। কিন্তু ইতিহাসের জট বোধহয় অত সহজে খোলে না। বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ হিটলারের পরবর্তী অধিনায়কও করতেন না। রাতারাতি গণতন্ত্র ফিরে এলে গণতন্ত্রী নেতারাও কি করতেন? করলে তাঁরাও হয়তো আরেক দল সন্ত্রাসবাদীর বোমায় বা বুলেটে নিহত হতেন।

স্টাউফেনবার্গ ও তাঁর চক্রের চক্রীদের তেইশ ঘণ্টার মধ্যে ধরে এনে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পাষাণ কারার কক্ষে এখনো ফাঁসির দড়ি ঝুলছে ও হাতের শিকল পড়ে আছে। আলোর চেয়ে আঁধারের ভাগ বেশী। বাইরের থেকে সবটা ভালো করে দেখা যায় না। আবহাওয়ায় এমন কিছু রয়েছে যাতে আমাদেরও দম বন্ধ হয়ে আসে। দর্শকরা গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছেন। বেশ ভিড়। অধিকাংশই জার্মান। তখনকার দিনে হিটলারদ্রোহ ছিল এক প্রকার রাজদ্রোহ, তথা দেশদ্রোহ। এখন বোধহয় ওই লোকগুলির উপর সহানুভূতি জন্মেছে। তা বলে ওদের সমর্থন করাও সহজ নয়। সমর্থন করলে আর্মি অফিসারদের আনুগত্যের উপর যুদ্ধকালে নির্ভর করা কঠিন হয়।

একথা স্টাউফেনবার্গও জানতেন। আর্মির ভিতরে এমন অফিসার অনেক ছিলেন যাঁরা তাঁরই মতো হিটলারের পাগলামির হাতিয়ার হতে নারাজ। কারো কিন্তু 'না' বলার জো ছিল না। হিটলার তাঁর অধীনস্থ সবাইকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর নিজের নামে। জার্মান ফৌজের শপথ দেশের নামে নয়, রাজার নামে নয়, অধিনায়ক হিটলারের নামে। এর জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা বিবেকের পীড়া ছিল। হিটলার বেঁচে থাকতে বা নেতা থাকতে সে পীড়া যাবার নয়। কিন্তু তাঁকে সরাতে গেলেও যে শপথভঙ্গের প্রশ্ন ওঠে। সেটাও তো বিবেকের প্রশ্ন। এই দোটানায় পড়ে মনঃস্থির করতে দীর্ঘসূত্রিতা ঘটে তাঁদের সকলের। শেষে স্টাউফেনবার্গ আর সবুর করতে পারেন না। পাপ হচ্ছে জেনেও পাতকের দায় নেন, বিচারের ভার ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেন। চেষ্টা করে তারপরে ব্যর্থ হলেও তাঁর কোনো খেদ থাকবে না। কিন্তু চেষ্টা না করলে খেদ থাকবে। অমন একটা সঙ্কটক্ষণে নিশ্চেষ্ট থাকাটাই অসহনীয়। মরণ তার চেয়ে সহনীয়। তিনি মরে গিয়ে বাঁচেন।

আর আমরা পালিয়ে গিয়ে বাঁচি। দেখতে যাই একটা আধুনিক ছাঁদের গির্জা। এক দেশের গির্জার সঙ্গে আরেক দেশের গির্জার মেলে না। এক যুগের গির্জার সঙ্গে আরেক যুগের গির্জা যদি না মেলে তা বলে বাইবেল অশুদ্ধ হবে? আমার ওটা নেহাৎ একটা সংস্কার। আধুনিক মানুষের ভাষায় কথা না বললে আধুনিক মানুষ তোমার কথা শুনতে আসবে কেন? লেখকের মতো, কথকের মতো, স্থপতিকেও আধুনিক মানুষের ভাষায় কথা বলতে হয়। গির্জার বাইরের রূপ তার যুগের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে পারে না। কিন্তু তার বাণী তো বাইরের নয়। অন্তরের। প্রেমের। দু'হাজার বছরের শিক্ষার পর তপস্যার পর মানুষের হৃদয়ে আজ প্রেম কোথায়! প্রেম থাকলে তার প্রকাশ কোথায়! প্রভাব কোথায়! প্রেম যদি সক্রিয় হতো তা হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের হিংসা প্রতিহিংসার ঘাত প্রতিঘাত আজ চরম পর্যায়ে উঠে ভগবানের পৃথিবীকে প্রাণহীন জড়পিণ্ডে পরিণত করতে উদ্যত হতো না। প্রেমের পন্থ চিরদিনই কণ্টকময়। আজকের দিন আরো বেশী। প্রেমের কণ্টকমুকুট আজ পরবেন কে? পরবেন কারা? অতীতের পরিধানের স্মৃতিই কি সব? তা হলে আর আধুনিকতার নাম মুখে আনা কেন? তার নামাবলী অঙ্গে ধারণ করা কেন?

শার্লোটেনবুর্গের প্রাসাদ এখন ন্যাশনাল গ্যালারিকে অঙ্কে স্থান দিয়েছে। সময় হাতে থাকলে ভিতরে যাওয়া যেত। গ্রেট ইলেকটরের অশ্বারোহী মূর্তি বাইরে দাঁড়িয়ে। যেমন সওয়ার তেমনি ঘোড়া। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। জার্মান বারোক রীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন শ্ল্যটার সৃষ্ট এই ভাস্কর্য কর্ম যেমন প্রাণবন্ত তেমনি উদ্দাম। ব্রাণ্ডেনবুর্গের সামন্তরাজাদের সম্রাট নির্বাচনে হাত ছিল বলে তাঁদের বলা হতো ইলেকটর। পরবর্তীকালে ব্রাণ্ডেনবুর্গ বাড়তে বাড়তে হয় প্রাশিয়া

আর প্রাশিয়া বাড়তে বাড়তে হয় জার্মানী। তেমনি ইলেকটর থেকে রাজা, রাজা থেকে সম্রাট। সপ্তদশ শতাব্দীর এই প্রাসাদ তিনটি পর্যায় দেখার পর চতুর্থ পর্যায়ে দেখে রাজতন্ত্রের পতন হয়েছে, সম্রাটের আসনে বসেছেন প্রেসিডেন্ট। এবার্ট তাঁর নাম। দর্জির ছেলে, ঘোড়সইসের সাগরেদ। এই ঘোড়া তখন উল্লাসে হ্রেষারব করেছে। হিটলারী আমলে প্রজাতন্ত্র পর্যবসিত হয় স্বৈরতন্ত্রে। তখন আনন্দে অট্টহাস্য করেছেন এই ঘোড়সওয়ার। পঞ্চম পর্যায়ের পর ষষ্ঠ পর্যায়। বরাত ভালো যে এই অঞ্চলটা কমিউনিস্টদের ভাগে পড়েনি। পড়লে ঘোড়া এবং ঘোড়সওয়ারকে তুলে নিয়ে কোথায় চালান দেওয়া হতো কে জানে।

উগ্র ক্ষত্রিয়কে তাঁর স্বস্থানে রেখে এবার চলি উগ্র বৈশ্যকে তাঁর স্বাধিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ করতে। বার্লিন হিলটন হোটেল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও হিলটন হোটেল আছে। পরিপূর্ণ আধুনিক ও রাজসিক মার্কিন ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মধ্যাহ্নভোজনে বসে ভাবছিলুম গত সন্ধ্যার সান্ধ্যভোজনের কথা। আঠারো ঘণ্টার মধ্যে এত বড় একটা কনট্রাস্ট! এ যেন পৃথিবীর উল্টো পিঠের প্রতিপাদস্থান। অ্যাণ্টিপোডিস। সেই ঘোষ আর সেই আমি ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এসে পৌঁছেছি! এবার আমাদের সঙ্গে শ্রীমতী ভেমান ও কুমারী ভুণ্ডট (Wundt)। এই কন্যাটি জাপানে দীর্ঘকাল থেকে জেন বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। ভারতেও দিন কয়েক কাটিয়েছেন। ভোজন না সেরেই এঁকে উঠে যেতে হয়। পিতার অসুখ।

শ্রীমতী ভেমানের অভিলাষ ছিল মধ্যাহ্নভোজনটা ভান্ সী হ্রদের ধারে বনভোজন হয়, কিন্তু সকালের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখে তাঁর আশঙ্কা জাগে যে বৃষ্টি নেমে সব মাটি করবে। তাই হিলটনের শরণ নেন। চমৎকার রোদ। এমন দিনে কোথাও বেরিয়ে পড়াই তো রীতি। রবিবারে কেউ শহরে পড়ে থাকে! কিন্তু বার্লিনারদের দৌড় তো ওই কাঁটাতারের বেড়া অবধি। ত্রিকালদর্শী আর্যবংশীয় ঋষিরা বোধ হয় দেখতে পেয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে এ রকমটা হবে, তাই বার্লিন শহরের মাঝখানেই মৃগবন প্রভৃতি বন উপবন ও দুই প্রান্তে ভান সী প্রমুখ হ্রদ রচনা করে রেখেছিলেন, যাতে শহরের বাইরে না গিয়েও অরণ্যের ও সমুদ্রের স্বাদ পাওয়া সম্ভব হয়। ভারী ভারী কলকারখানাও যেমন আছে, নীরব নির্জন নন্দনকাননও তেমনি আছে, হ্রদের ধারে বেলাভূমিও তেমনি আছে। সেখানে গেলে মনে থাকে না যে শহরেই রয়েছি।

আধঘণ্টার মধ্যেই পটপরিবর্তন। আমরা বসে আছি বনের আড়ালে সমুদ্রেব ধারে। এই প্রথম আমার চোখে পড়ে যে জার্মানীতে পাখি আছে আর সে পাখি গাছের ডালে লাফালাফি করছে। হয়তো আমারি দোষ। আমি প্রায় সব সময় অন্যমনস্ক। যে প্রকৃতি শাশ্বত তার প্রতি দৃষ্টি নেই, যে সভ্যতা তাসের ঘর তারই পূর্বাপর চিন্তা করতে বিভোর। দিনমান ছুটোছুটি, রাত্রেও থিয়েটার বা সঙ্গীতশালা বা সাক্ষাৎকার। আমারও তো ছুটি চাই। ভান সী আমার সেই ছুটির উপভোগ। হ্রদের অপর প্রান্তে কী আছে দেখতে পাইনে। জল আর জল। সাঁতারের ঋতু নয়, জলে নামতে সাহস হয় না, আর কেউ তো নামছে না। এই হ্রদ হাভেল নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। হ্রদে আর নদীতে মিলে একাকার। এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করে না। হাতের কাছে রেস্টোরাণ্ট। সেকেলে ছাঁদের বাড়ি।

এমনি একটি বনস্থলীর সঙ্গে সংলগ্ন শ্রীমতী হাইসিঙ্গারের ভিলা। এই বর্ষীয়সী লেখিকা শিশুসাহিত্যনিপুণা। চা খেতে খেতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এলো। আপন হাতে তৈরি করেছিলেন কেক। পেট ভরে খেতে হলো। দেশবিদেশের রূপকথার বই লিখেছেন। এবার লিখতে চান দেশবিদেশের ঘুমপাড়ানী গানের বই। নিজের অভিজ্ঞতাও আন্তর্জাতিক। শ্রীমতী হাইসিঙ্গার মুহূর্তেই আপনার করে নেন। বলেন, 'হোটেলে হোটেলে বেড়িয়ে কি জার্মানী দেখা হয়? থাকতে হয়

মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়িতে। আবার যখন আসবেন তখন এ বাড়িতে উঠবেন। শুনে এত ভালো লাগে। হেসে বলি, 'তার মানে তো আরো চৌত্রিশ বছর পরে?'

॥ ত্রিশ ॥

আবার সেই টেম্পেলহফ বিমানবন্দর। আবার সেই প্যান আমেরিকান বিমান। পশ্চিম বার্লিন থেকে উড়ে যেতে হলে মার্কিন কিংবা ব্রিটিশ কিংবা ফরাসী বিমানে উঠতে হয় স্বয়ং জার্মানদেরও।

শ্রীমতী ভেমান ও শ্রীমান প্রণব ঘোষের সঙ্গে উষ্ণ করমর্দনের পর কয়েক পা এগিয়ে যাই। হঠাৎ মনে পড়ে যায় যে আজ বিজয়াদশমী। ফিরে এসে প্রণবের সঙ্গে কোলাকুলি করি। মাত্র দু'দিনের সাহচর্য তবু অকপট হৃদ্যতা। তাঁর মধ্যে লক্ষ করে খুশি হয়েছিলুম একটি খোলা মন ও দরদী দিল। সেই সঙ্গে সাহিত্যিক রসবোধ।

পশ্চিম বার্লিন এখন আমার পশ্চাতে। সাধলেও আমি ওখানে বেশীদিন কাটাতে রাজী হতুম না। ওর আসমানে পারমাণবিক ছত্র ধরে বা ওর জমিনে নিত্য নতুন ইমারত গড়ে ওকে নর্মাল করতে পারা যাবে না। আঠারো বছর ধরে ওর ঘরে বাইরে বিদেশী সেনা। তথা কমিউনিস্ট জার্মান সেনা। ও যেন দুই শিবিরের যুদ্ধবিরতির ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিক করে বাজছে। যে কোনো দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। চলতেও পারে অনির্দিষ্টকাল। মানুষের স্নায়ু কাঁহাতক সহ্য করতে পারে!

রাতের আকাশ থেকে মালুম হচ্ছে না কোন্‌টা বার্লিনের দেয়াল। এই দেয়াল থাকতে মানুষের মন নর্মাল হতে পারে কখনো? স্বামী ছেড়ে স্ত্রী, ছেলে ছেড়ে মা কতকাল ধৈর্য ধরবে! পৃথিবীর ও-পিঠের জন্যে ছাড়পত্র পেতে পারে, পৃথিবীর ও-পিঠের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা চালাতে পারে, কিন্তু রাস্তার ও-পিঠের সঙ্গে সব যোগাযোগ বন্ধ। পারে সইতে কেউ এ যন্ত্রণা! উদ্বেগেই মানুষ পাগল হয়ে যাবে। এর থেকে পরিত্রাণ কোথায় ও কবে! পারমাণবিক হিংসা যদি এর উত্তর দিতে অপারগ হয় তবে পরম মানবিক অহিংসার দিকেই মুখ ফেরাতে হয়।

পূর্ব পশ্চিম জার্মানী অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু পূর্ব পশ্চিম বার্লিন তা পারে না। তার জট কী করে খুলবে জানিনে, কে খুলবে জানিনে, কিন্তু এখন না খুললে পরে কাটতে হবে। আর একটা বিশ্বযুদ্ধ এড়িয়ে কেমন করে তা সম্ভব! অথচ এই ইসুতে বিশ্বযুদ্ধ সম্ভবপর মনে হয় না।

বার্লিন দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। বিদায়, ট্র্যাজিক সিটি! তোমার ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের চোখে তুমি ভয়ঙ্করী। কত বড় বড় ঐতিহাসিক অন্যায় তোমার তর্জনীসঙ্কেতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্ধেক ইউরোপের অধীশ্বরী, আজ তুমি অর্ধেক এ-পক্ষের অর্ধেক ও-পক্ষের। তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত। আমরা ভারতীয়েরা তোমাকে অন্য চোখে দেখি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তুমি অন্যতম পীঠ। এখনো আমার কানে বাজছে, 'আমি সুভাষ, বার্লিন থেকে বলছি।'

আমার আলাপীরা আমাকে বলেছিলেন, 'হামবুর্গে যাচ্ছেন। দেখবেন ওখানকার আবহাওয়া ইংলণ্ডের মতো। জীবনযাত্রাও ইংরেজদের মতো।' কথাটা আমার মনে ছিল। ফুল্‌স্‌ব্যু'টেল বিমানবন্দরে তাই শীতল সম্বর্ধনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই অবতরণ করি। কিন্তু কোথায় শীত বৃষ্টি কুয়াশা! বোডেন বলে এক যুবক এক গাল হেসে আমাকে স্বাগত জানান। চমৎকার মোটরবিহার। হোটেলটি আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে এখন আমি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে। তা বলে ওই

যে জলরাশি ওটা সাগরের নয়, হ্রদের। হামবুর্গ তো আগে দেখিনি। তাই এই ধাঁধা।

দেখলেও কি চিনতে পারতুম! যুদ্ধে আধাআধি সমভূম হয়ে যায়। ইতিমধ্যে নতুন করে গড়ে উঠেছে। অত্যন্ত আধুনিক। নিউ ইয়র্কের পর সব চেয়ে বেশী জাহাজ হামবুর্গে আসে যায়। লণ্ডনকে বাদ দিলে ইউরোপের সব চেয়ে বড় বন্দর। এলবে নদীর বক্ষ দিয়ে কমিউনিস্ট শাসিত অঞ্চল ও দেশগুলির বাণিজ্য বেহাত হয়ে যাওয়ায় স্যোর ক্ষতি পূরণ করতে হয়েছে নতুন নতুন শিল্প দিয়ে। শিল্পেও হামবুর্গ পশ্চিম জার্মানীর অগ্রগণ্য শহর। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে এটি একটি স্বাধীন নগরী। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই চালাতেন। মাথার উপর ছিলেন ছত্রপতি সম্রাট। কিন্তু রাজারাজড়া বা মোহান্ত মহারাজ বলে কেউ ছিলেন না। এখনো এর স্বাতন্ত্র্য আছে। পশ্চিম বার্লিনের মতো এটি একাই একটি 'লাণ্ড' বা রাজ্য। শহরের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামও এর অঙ্গীভূত হয়েছে।

ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক বহু শতকের। কিন্তু মার্কিনদের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক আরো সমৃদ্ধিকর। উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের শাসনপাশ তথা বাণিজ্যপাশ থেকে মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হামবুর্গের জার্মানরা লাভজনক বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে। এই সুযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে পরবর্তীকালে যখন দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্পেন পর্টুগালের শাসনবন্ধন তথা বাণিজ্যবন্ধন ছেদ করে। হামবুর্গের শ্রীবৃদ্ধি আটলান্টিকের ওপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফল। তার দৃষ্টি সেই জন্যে সাগরপারে প্রসারিত। তার থেকে এসেছে একটা কস্‌মোপলিটান ভাব। হামবুর্গ ঠিক জাতীয়তাবাদী নয়। কিংবা জাতীয়তাবাদী হলেও সংকীর্ণ অর্থে নয়। তা ছাড়া তার পিছনে রয়েছে মধ্যযুগের হানসিয়াটিক লীগের ঐতিহ্য। হামবুর্গ, ল্যু'বেক প্রভৃতি কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্র মিলে সঙ্ঘ গঠন করে। বণিকরাই কর্তা। তাঁরা প্রধানত জার্মান হলেও তাঁদের কারবার উত্তর ইউরোপ জুড়ে। জাতীয় স্বার্থ নয়, শ্রেণীস্বার্থই তাঁদের একমাত্র ভাবনা। সর্ব জাতির সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যই ছিল রীতি। সেইসূত্রে অন্তর্বিবাহ ঘটত। ভাববিনিময় তো ঘটতই। হামবুর্গের বন্দর পৌনে আট শতাব্দীকাল শুল্কমুক্ত। পঁচাত্তর বছর আগে হামবুর্গ শহরও তাই ছিল।

'আমাদের কোনো অভিজাতশ্রেণী নেই, কোনো সম্ভ্রান্ত বংশধর নেই, কোনো ক্রীতদাসও নেই। এমনো কি কোনো সাবজেক্ট নেই। সব সত্যিকার হামবুর্গবাসী মানে যে তাদের আছে একটি মাত্র শ্রেণী। তার নাম সিটিজেন শ্রেণী।' লিখেছিলেন যোহান কুরিও ১৮০৩ সালে, হামবুর্গের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে। তখনকার দিনে এক সুইটজারল্যাণ্ড বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এর তুলনা চলত। নানা রাজ্যের শরণার্থীদের আশ্রয়দানও ছিল হামবুর্গের রীতি।

ওদিকে থিয়েটার কনসার্ট অপেরা প্রভৃতির জন্যেও হামবুর্গের সুখ্যাতি আছে। নানা দেশের সঙ্গীতকারদের আমন্ত্রণ করে আনা হয়। স্ট্রাভিনস্কির অশীতিপূর্তির সময় তাঁকে নিয়ে উৎসব করা হয় শুনেছি। তিনি তাঁর নতুন রচনা বাজিয়ে শোনান। আমার দুর্ভাগ্য আমি একবছর পরে এসেছি। কিন্তু সেও সহ্য হতো, সহ্য হয় না এই সেদিন জার্মানীর প্রসিদ্ধ অভিনেতা গ্র্যু'শুগেন্সের আকস্মিক মৃত্যু। ফিলিপাইন্সে অভিনয় করতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাঁর প্রাণবিয়োগ হয়। হামবুর্গের স্টেট থিয়েটার কানা হয়ে গেছে। তাঁর মতো মেফিস্টোফেলিস সাজবে কে? কেন যে আমি তিন মাস আগে আসতে রাজী হইনি।

আলস্টার হ্রদের দুই ভাগ। বাহির আলস্টার ও ভিতর আলস্টার। বাহির আলস্টারের ফেরীঘাট আমার হোটেলের দোরগোড়ায়। পরের দিন মোটরলঞ্চ করে ঐ হ্রদের একধার থেকে আরেকধার যাই। সেদিকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক। জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নভেম্বরের পূর্বে খোলে না। কিন্তু কোনো কোনো বিভাগ খোলা থাকে। গ্যেটে গ্রন্থপঞ্জী ও গোটে শব্দসূচী যেখানে প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। ধন্য জার্মানদের অধ্যবসায়। বাংলা ভাষায় আমি

গ্যেটের উপর গোটা দু'তিন প্রবন্ধ লিখেছি, এটাও সংগ্রহ করবার মতো তথ্য। মহাকবির বিবলিওগ্রাফীতে আমারও অংশ আছে। তার পর সে কী পণ্ডিতিয়ানা! এক একটি শব্দ গ্যেটে কোন্ কোন্ গ্রন্থের কোন্ কোন্ জায়গায় ব্যবহার করেছেন তা যদি কেউ জানতে চায় তো কার্ড ইন্‌ডেক্সের বাক্স খুললেই পাবে। এই মহৎ কর্ম সমাধা করতে করতে আরো একটি শতবার্ষিকী এসে পড়বে।

একই সমস্যা ট্যুবিঙ্গেন তথা হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রসংখ্যা মাটি ফুঁড়ে উঠছে। বেশী লেখাপড়া আজকাল সকলেরই ছেলেমেয়ে করতে চায়। সকলেরই হাতে দু'পয়সা হয়েছে। সমাজের নিম্নতম স্তরও বাকী নেই। জার্মানীতেও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ছাড়া আর কারো ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেত না। বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরই সংখ্যা দেখে তৈরি হয়েছিল। এখন অন্যান্য বর্ণের সংখ্যা অনুসারে তৈরি করতে হবে। একটা বক্তৃতাকক্ষ দেখি। সেখানে দু' হাজার ছাত্র বসতে ও শুনতে পারে। আসনগুলি আরামদায়ক। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়াটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত ও বৃক্ষবহুল। হামবুর্গে গাছপালা কোথায় নেই! বার্লিনের মতোই রাস্তায় রাস্তায় গাছ! তা ছাড়া উদ্যান উপবন। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

॥ একত্রিশ ॥

'ল্যু'বেক দেখতে যাবেন না? সুন্দর অবস্থায় রয়েছে টোমাস মানের শহর।' বললেন ডক্টর হান্স ব্যু'টভ। মধ্যাহ্নভোজনের সময়। সদালাপী সুবিজ্ঞ সুজন, জার্মান পি ই এনের সভ্য। টোমাস মানের প্রসঙ্গে তাঁর মত হলো, মান ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের ফসল। তাঁর জীবনদর্শনের অন্তঃসার উনবিংশ শতাব্দীর। উক্ত শতাব্দীর মতো তিনিও আজ অস্তংগমিতমহিমা। তবে তাঁর মহত্ত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ছোটগল্পে।

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বাসের জায়গায় বিংশ শতাব্দীর সংশয় তেমন কোনো গভীর পরিবর্তন নয় যেমন গভীর সেকালের অন্তর্নিহিত নিয়মশৃঙ্খলার স্থলে একালের অন্তর্নিহিত অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। নিয়ম ও শৃঙ্খলার জগতে মানুষ হয়েছেন যিনি তাঁর পক্ষে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার জগতে বনিয়ে চলা শক্ত। বিংশ শতাব্দী নিয়ম ও শৃঙ্খলার যুগ নয়। উপরে উপরে একটা নিয়মশৃঙ্খলা থাকতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেটা ক্ষয়ে এসেছে। টোমাস মান তা জানতেন, তাঁর চিত্র আঁকতেন, কিন্তু তাঁর পদতলভূমি নিয়ম ও শৃঙ্খলার শানবাঁধানো ঘাট। কাফকা বা কাম্যু যে অর্থে বিংশ শতাব্দীর শিল্পী মান সে অর্থে নন। বিংশ শতাব্দী নিয়মশৃঙ্খলার বন্দর ছেড়ে দূরে চলে এসেছে। এটা যেন একটা ঘূর্ণায়মান নৌকা। আরোহীরা অস্থির থেকে অস্থিরের দৃশ্য দেখছেন ও আঁকছেন। দুর্বোধ্য প্রহেলিকা।

ইউরোপীয় মানুষের অন্তর এই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরে আরো অস্থির হয়েছে। তাকে স্থির করা তেমন সহজ নয় যেমন সহজ ভাঙা শহরের বা ভাঙা ব্যবস্থার পুনর্গঠন। বেশীর ভাগ শক্তি ব্যয় হচ্ছে পুনর্গঠনে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের জন্যে পুনঃপ্রস্তুতিতে। ধ্বংসটা অবশ্য নিজের দেশের নয়, কিন্তু যাদের দেশের তারাও তো পাল্টা ধ্বংস করবে। সুতরাং ধ্বংসটা দৃশ্যত পরের হলেও কার্যত আপনারও। এটা এমন একটা অর্থহীন আত্মঘাতী প্রয়াস যে কাফকার উপন্যাসের জগতের উপযুক্ত। এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। প্রকৃতির জগৎ যেমনকে তেমন আছে, ভগবানের জগৎও যেমনকে তেমন। শুধু মানুষের জগৎই বদলাতে বদলাতে প্রাগৈতিহাসিক রূপকথার মতো নিরর্থক

নিয়মশৃঙ্খলাহীন ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

টোমাস মান অন্তরে অন্তরে অনুভব করতেন যে সভ্যতার অসুখ করেছে। সেটা শুধু এগিয়ে গেলেই সারবে না। সেটার কোনো বৈপ্লবিক বা সোশিয়াল ডেমোক্রাটিক নিরাময় প্রত্যয়গম্য নয়। কোনো রকম সরলীকরণও আত্মপ্রতারণা। হিটলারীকরণ তো অসভ্যতা। অসুখ বা অবক্ষয় তাঁর সমসাময়িক ইনটেলেকচুয়াল মহলের চোখে একটা স্বতঃপ্রতিভাত বস্তুর মতো ছিল। কিন্তু তার থেকে উদ্ধারের জন্যে তাঁরা ধর্মের শরণ নিতে নারাজ ছিলেন। মার্কসবাদও তো একটা ধর্ম। ধর্মীয় স্থিরতার উপর তাঁদের আস্থা ছিল না। মিথ্যা স্থিরতার চেয়ে সত্যিকার অস্থিরতাও শ্রেয়।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক অস্থিরতার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, তার সঙ্গে সঙ্গে আর্টবিষয়ক অস্থিরতা। যেসব দেশে সব চেয়ে বেশী সেসব দেশেই ফাসিস্ট কিংবা নাৎসীদের প্রাদুর্ভাব। এরা একপ্রকার স্থিরতার আশ্বাস দেয়। অথচ তার জন্যে কমিউনিস্টদের মতো ধর্মকে বা সমাজবিন্যাসকে বিপর্যস্ত করতে হবে বলে না। এরা যে একদিন ভরাডুবি ঘটাবে সেটা তো সাধারণ মানুষ অনুমান করেনি।

ভরাডুবির পর উদ্ধারের পালা। অসংখ্য মানুষ ডুবল। তাদের উদ্ধার করা অল্পক্ষেত্রেই সম্ভব হলো। কিন্তু মানুষের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ— তার সঙ্গীত, তার সাহিত্য, তার ললিতকলা, তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার দর্শন, তার ধর্ম, তার নীতি, তার আদর্শ—তাকে সমুদ্রগর্ভ থেকে পুনরুদ্ধার করা দুঃসাধ্য নয়। এ কাজ দিনরাত চলেছে। চলতে থাকবে। বাইরের দিকে যেমন পুনর্গঠন ভিতরের দিকে তেমনি পুনরুদ্ধার। জার্মানীকে, ইউরোপকে তার অন্তঃসম্পদ সব একে একে পুনরুদ্ধার করতে হবে। সন্ধান করতে হবে নূতন শৃঙ্খলার। যে শৃঙ্খলা দেশসুদ্ধ মানুষকে এক পাল ভেড়ার মতো সুশৃঙ্খলভাবে কসাইখানার অভিমুখে চালিয়ে নিয়ে যায় তেমন শৃঙ্খলা নয়। সেটার উৎপত্তি সর্বব্যাপী অস্থিরতা থেকে। সর্বব্যাপী অস্থিরতার উত্তর দিতে। সর্বব্যাপী অস্থিরতার উত্তর সর্বব্যাপী স্থিরতা। তার উপর খাড়া হবে নূতন শৃঙ্খলা। অবশ্য একদিনে নয়। ইতিমধ্যে বিস্তর গঠনমূলক চিন্তা ও কর্ম ও সৃষ্টিশীল ধ্যান ও ধারণা চাই। যেমন জার্মানীতে তেমনি আর সব দেশে।

সেদিন ব্যু'টভ মহাশয়ের জবানীতে শোনা গেল আধুনিকতম কবিদের হাত দিয়ে যে কবিতা হচ্ছে সে অতি চমৎকার। দুঃখ এই যে অন্য ভাষায় অনুবাদ করলে তার রসহানি হয়। ইংরেজী তর্জমা বড়ো একটা নজরে পড়ে না। বরং ফরাসী তর্জমা লক্ষ করা যায়।

কাফকার একটি উক্তি ওঁর কোনো অপ্রকাশিত পত্র থেকে এরিখ হেলার তাঁর 'উত্তরাধিকারবঞ্চিত মন' নামক পুস্তকে উদ্ধার করেছেন।

'No people sing with such pure voices as those who live in deepest Hell; what we take for the song of angels is their song.'

কী গভীর নরকের ভিতর দিয়ে যাত্রা করতে হয়েছে আধুনিকতম কবিদের! এখনো কি তার অবসান হয়েছে? বৈষয়িক সমৃদ্ধিই সব নয়। যারা বাঁচতে পারত, বাঁচল না, তাদের অতৃপ্ত আত্মা অদৃশ্য হলেও চারিদিক জুড়ে বাস করছে। জীবন থেকে যাদের বঞ্চিত করা হলো তারা যে অমনি নাস্তিত্ব পেলো তা নয়। তাদের ভুলতে চাইলেও ভুলতে দিচ্ছে কে! তাদের সঙ্গে বনিবনা করে বাঁচতে হচ্ছে যারা বেঁচে আছে তাদের সকলের। যেমন শরণার্থীদের সঙ্গে বনিবনা করে বাঁচতে হচ্ছে। বিত্ত দিয়ে তর্পণ হয় না মানুষের।

চায়ের নিমন্ত্রণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অধ্যাপক ডক্টর বেকের বাড়ি। অধ্যাপক-গৃহিণী সাদরে চা পরিবেশন করেন। আর অধ্যাপক আমাকে জমিয়ে রাখেন হ্য'লডারলিন প্রসঙ্গে। স্টুটগার্ট তাঁর দেশ। হ্য'লডারলিন তাঁর প্রিয় কবি। উভয়েই সোয়াবিয়ার সন্তান। কবির উপর বিশ্বকোষে

লিখেছেন, কবির পত্রাবলী সম্পাদনা করেছেন। উপহার দেন। কবির একটি কবিতা বছর দশেক আগে লণ্ডনে আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি নিজেই তো বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। গ্যেটে ও শিলারের সঙ্গে হ্যোল্‌ডারলিনের নাম করার রেওয়াজ খুব বেশী দিনের নয়। তিনি প্রেমের বলি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু কল্পনার বলি নিঃসন্দেহ। কল্পলোকেই ছিল তাঁর বিহার।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি যা চেয়েছিলুম তাই পেয়ে গেলুম। হামবুর্গের বিখ্যাত মিউজিক হলে প্রসিদ্ধ সিম্ফোনিক অর্কেস্ট্রার কন্সার্ট। কণ্ডাকটর হার্মান মিকায়েল। সোলোইস্ট জুলিয়ান ফন কারোল্যি। সেদিনকার প্রোগ্রামের মধ্যবর্তী অংশটি লিস্টের রচনা, সেটিতে সোলোইস্টেরও ভূমিকা। তাই তাঁর সামনে পিয়ানো। তেমনি কারো হাতে বেহালা, কারো হাতে ভিওলা, কারো হাতে চেলো, কারো মুখে ক্লারিওনেট, কারো মুখে ফ্লুট, কারো মুখে ওবো, কারো পাশে ড্রাম। এমনি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ও বিস্তর বাদকবাদিকা। হাঁ, বাদিকা। অত্যন্ত গম্ভীর রাশভারি ওঁরা সকলে। গুণে দেখিনি মোট ক'জন। আশির কাছাকাছি হবে। আশ্চর্য, তাঁদের মধ্যে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ। ডাবল বেস নিয়ে বসেছেন। নিগ্রো নন। লাটিন আমেরিকান বলেই অনুমান হয়। কিংবা উত্তর আফ্রিকার কোনো অঞ্চলের লোক।

স্ট্রাভিন্‌স্কির ১৯৪৩ সালের 'ওড' দিয়ে আরম্ভ।

মাঝখানে লিস্ট (Liszt)। আগেই তাঁর উল্লেখ করেছি। হাঙ্গেরিয়ান। শেষে চাইকোভস্কি। রাশিয়ান দিয়ে শুরু, রাশিয়ান দিয়ে সারা। বলা যেতে পারে রুশ হাঙ্গেরিয়ান সন্ধ্যা। কিন্তু কারো মাথায় আসে না যে এঁরা কেউ বিদেশী। সঙ্গীতের জগতে জাতীয় চেতনা কাজ করে না। সেই স্বরস্বর্গে যাঁরাই পদার্পণ করেন তাঁরাই মর্ত্য থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গের লোক হয়ে যান। শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে যে সুধা পান করেন তা দেবভোগ্য। কিছুকালের জন্যে তাঁরাও দেবতা। সঙ্গীত রচয়িতারা তো দেবতাই, পরিচালক ও বাদকবাদিকারাও দেবলোকবাসী। সেই সুরলোকে আমরা সকলেই সকলের আত্মীয়। কেউ পরদেশী নয়।

সাহিত্যিকদের পার্টিতে কিন্তু এভাব মনে জাগে না। পরের দিন অধ্যাপক ইটালিয়াণ্ডার তাঁর বাসস্থানে আমাকে আমন্ত্রণ করেন। কয়েকজন বিশিষ্ট জার্মান লেখক লেখিকাকেও। অধ্যাপক বার বার আফ্রিকা ঘুরে এসেছেন, ভারতেও বেড়িয়েছেন। তাঁর নিজস্ব একটি শিল্পসংগ্রহ আছে। আফ্রিকান আর্টেরই বেশী। ওরিয়েণ্টাল আর্টও উপস্থিত। সাহিত্যিকরা দুটি একটি বাক্যবিনিময় করতে না করতেই দু'ভাগ হয়ে যান। ও-ঘরে জার্মানভাষীদের আড্ডা। এ-ঘরে ইংরেজী ভাষীদের। এই জাতিভেদ আমাকে পীড়া দেয়। আমি তো ককটেলের জন্যে আসিনি, এসেছি আলাপ-আলোচনার জন্যে। গিয়ে হাজির হই জার্মানভাষীদের আড্ডায়।

॥ বত্রিশ ॥

ও ঘরে গিয়ে দেখি সীগফ্রীড লেন্‌ৎস। দেশে থাকতেই এঁর নাম শুনেছিলুম। কিন্তু ধাম জানতুম না। এঁর কথা যাঁর মুখে শুনি তিনি এঁর নাম স্বহস্তে লিখে দিয়ে বলেন এঁকে বার করে এঁর সঙ্গে আলাপ করতে। খুঁজে বার করার সময় পাইনি, আপনা হতে পাই। আবিষ্কার করে পুলকিত হই। আরো খুশি হই ইংরেজীতে সাড়া পেয়ে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। তিনিও ইংরেজী জানেন। ওঁরাও থিয়েটারে

যাচ্ছেন। আমিও। স্থির হলো থিয়েটারের পর ওঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে আলাপ করা যাবে। নাটক লিখেই লেন্‌ৎস নাম করেছেন। বয়স বোধহয় চল্লিশের এদিকে। ছিপছিপে গড়ন। অত্যন্ত বিনীত ও নম্র।

শেক্সপীয়ারের 'মেরি ওয়াইভস অফ উইণ্ডসর।' আজকেই বহুকাল বাদে প্রথম অভিনয় হামবুর্গের সুপ্রসিদ্ধ 'জার্মান থিয়েটারে'। জার্মান ভাষায় অবশ্য। এই থিয়েটারের প্রাণ ছিলেন জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গুস্টাফ গ্র্যু'গুগেন্স। থিয়েটারের করিডরে এঁর ছবি দেখলুম।

'মেরি ওয়াইভস' দেখা মানে ফলস্টাফ নামক রসিক পুরুষের লীলাখেলা দেখা। কতরকম দুষ্টু বুদ্ধি এক পেটমোটা বুড়ো শালিখের হতে পারে। তবে সে ধর্মধ্বজ ভণ্ড নয়। তার দরকারও নেই। রাজ সভাসদ নাইট বা নবাবরা অমন হয়েই থাকেন। কিন্তু ফলস্টাফ যে অনুপম এটা তাঁর রকমারি অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে নয়। তাঁর হাস্যকর চেহারা চালচলন ও কথাবার্তার জন্যে। তা বলে কি তিনি একজন ক্লাউন বা ভাঁড়? না, তাও না। তাঁর মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্যে সহানুভূতি জাগে। মায়া হয়। এ চরিত্র অভিনয় করা কঠিন। যার তার কর্ম নয়। সেরা অভিনেতা না হলে রস জমবে না। সেদিনকার অভিনয় যে উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এর জন্যে ধন্য বলতে হয় হার্মান শম্বার্গকে। মনে হলো ফলস্টাফকেই দেখছি। বহু শতাব্দী পরে দেখা।

স্টেজকে শেক্সপীয়ারের যুগের মতো করে সাজানো হয়েছিল। মঞ্চের উপরেই। সেকেলেঁ সব সেট। আঁকা দৃশ্য নয়। নেপথ্যের সময় মূল স্টেজের বাইরে একটি প্রকোষ্ঠের ব্যবহার দেখে সন্দেহ হচ্ছিল যে ওটা বোধহয় আধুনিক একটা কায়দা। হামবুর্গের এই থিয়েটার পশ্চিম জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ থিয়েটার। এই রাষ্ট্রের থিয়েটার সংখ্যা প্রায় ১৭৫টি। তার মধ্যে ৯৬টি রাষ্ট্র বা প্রদেশ বা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠান। ১৯টি ভ্রাম্যমান। ১১টি মুক্তাকাশ। ৬টি স্টুডিও থিয়েটার। নতুন থিয়েটার স্থাপন করা আজকাল খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। লাভ সামান্যই হয়। কিন্তু দর্শকসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। জার্মানীর থিয়েটারগুলিতে একই নাটক রাতের পর রাত দেখানোর রেওয়াজ নেই।

রাত এগারোটার পর ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে চড়াও হওয়া কি ভালো দেখায়! কিন্তু উপায় নেই। পরের দিনই আমাকে হামবুর্গ ছাড়তে হবে। লেন্‌ৎস দম্পতি এখনো গুছিয়ে বসতে পারেননি, সবে কাল দক্ষিণ জার্মানী থেকে ফিরেছেন, তার আগে ছিলেন ডেনমার্কে ছ'সাত মাস। দক্ষিণ জার্মানীর কোনো এক স্থানে গ্রুপ সাতচল্লিশের সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সেই উপলক্ষে যাওয়া। আর ডেনমার্কের এক নির্জন দ্বীপে একটি কুটির নিয়ে বসন্ত থেকে শরৎ যাপন করা সাহিত্যের দিক থেকে সৃষ্টিকর। শীতকালে হামবুর্গে ফিরে আসা হয় আইডিয়া জড়ো করতে, মনে মনে রূপ দিতে। বসন্তে ডেনমার্কে চলে যাওয়া হয় খেটেখুটে নাটকে পরিণত করতে। সারা সকাল ঘরে বসে লেখা। লিখতে লিখতে মাথা ধরে গেলে বিকেলটা সমুদ্রের জলে সাঁতার কাটা। দ্বীপে ছ'সাত ঘর জেলে। কার সঙ্গে কথা বলবেন? সেখানে কথা নয়, কাজ। আর হামবুর্গে কাজ নয়, কথা। আড্ডা দেওয়া। জীবনকে দেখা। নাটকে প্রকাশ করা। মঞ্চস্থ করা। যা বললেন, তার মর্ম, শহরে না থাকলে আইডিয়া পাওয়া যায় না, উপাদান পাওয়া যায় না। আবার শহর থেকে বহুদূরে পালাতে না পারলে লেখার পরিবেশ পাওয়া যায় না, লেখায় মনোনিবেশ করা যায় না। তাই বছরটাকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে হয়। একটানা প্রস্তুতির জন্যে শীতকাল, যখন প্রকৃতি নিঃস্পন্দ। একটানা সৃষ্টির জন্যে বসন্ত থেকে শরৎ। যখন প্রকৃতিও সৃষ্টিতৎপর। প্রত্যেক বছরই এই তাঁর কর্মপদ্ধতি। বলা বাহুল্য লেখা দিয়েই সংসার চালাতে হয়। অন্য কোনো পেশা নেই। গোড়ায় তাঁর নাটক কেউ প্রকাশ করতে রাজী হতেন না। কিন্তু একবার একখানা নাটক অভিনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে বরাত ফিরে যায়। সাধারণত নৈতিক সমস্যা নিয়ে লেখেন।

গ্রুপ সাতচল্লিশের বিবরণ শুনি। তার কোনো চাঁদা বা সভ্য হবার নিয়ম নেই। কোনো সঙ্ঘ

বা সমিতি নেই। কতকটা কল্লোল গ্রুপের মতো ব্যাপার। সাতচল্লিশ সালে কয়েকজন লেখক নিজেদের একটি মণ্ডলী করেন। পরে সেই মণ্ডলীতে তাঁদের দেখাদেখি আরো কয়েকজন যোগ দেন। এমনি করে বরফের গোলার মতো বেড়ে চলে দল। এতদিনে বোধ হয় শতাধিক লেখক-লেখিকা যোগ দিয়েছেন। এঁরা চারদিকে ছড়ানো। কোনো একটা শহরের বাসিন্দা নন। এঁদের মতবাদও বিভিন্ন। পদ্ধতিও বিচিত্র। বছরে একবারমাত্র মিলন হয়। বেশ কয়েকদিন এক সঙ্গে কাটে। পারস্পরিক আলোচনা হয়। নতুন লেখকরা লেখা পাঠ করে শোনান। প্রবীণরা নির্মম সমালোচনা করেন। গ্রুপের বাইরের লোকও যোগ দেন। কেবল লেখক না, প্রকাশকও গিয়ে জোটেন। সেইভাবে লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হন, বইপত্রের খোঁজখবর নেন, চুক্তি সই করা হয়। রথ দেখা ও কলা বেচা একসঙ্গে চলে। এরই নাম সাহিত্যমেলা। এর উদ্যোগের ভার সাতচল্লিশ সালের এক বন্ধুর উপরে। তিনিই ফী বছর সবাইকে ডাক দেন।

বিদায় নিতে নিতে ক্যালেণ্ডারের তারিখ পালটে যায়। হামবুর্গে আমার শেষদিন, আপাতত জার্মানীতেও তাই। সাতচল্লিশের গ্রুপের একজন বিশিষ্ট লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বলে আমি কৃতার্থ। নইলে মনে হতো আমি নতুন কালের কণ্ঠস্বর শুনতে পাইনি। একালের নাট্যকাররা নীতির প্রশ্ন তুলেছেন, তুলে সাড়া পেয়েছেন, লোকে ভিড় করেছে তাদের প্রশ্ন শুনতে এতে আমি মুগ্ধ। জার্মানীর মতো দেশ কখনো নৈতিক অরাজকতা সহ্য করতে পারে না। এক পুরুষ পূর্বে আমি যা দেখেছিলুম তা নৈতিক তথা মানসিক অরাজকতা। তার প্রতিফল হিটলার। কিন্তু গায়ের জোর তো তার উত্তর নয়। ন্যায়ের জোর ছাড়া উত্তর হয় না। সেদিকে এবার মন গেছে। নাটক তো শুধু তামাশা নয়, শুধু মনস্তত্ত্ব নয়, গ্রীক ট্র্যাজেডীর মতো তার তাৎপর্য আছে। জার্মান ট্র্যাজেডীর পিছনেও নৈতিক নিয়ম ও তার লঙ্ঘনের ইঙ্গিত থাকবে।

ঘুম থেকে উঠে হামবুর্গের সংবাদপত্র জগতের অন্যতম জ্যোতিষ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। কথা বললেই বুঝতে পারা যায় যে ইনি একজন সুবিজ্ঞ মানুষ। জানতে চাই ইউরোপীয় ঐক্যের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। এই একটি বিষয়ে আমি ইউরোপীয়দের চেয়েও অধিক উৎসাহী। ভদ্রলোক দুঃখ করে বলেন, 'দ্য গল থাকতে খুব বেশী আশা করবার কী আছে! তাঁর নিজের দেশের লোকই তাঁর পলিসি সমর্থন করতে কুণ্ঠিত। ঐ যে অমন করে ব্রিটেনকে প্রবেশ করতে দেওয়া হলো না ওর ফলে ইউরোপীয় ঐক্য ব্যাহত হলো। দ্য গল জার্মানীকেও উভয়সঙ্কটে ফেলেছেন। আমরা যদি ফ্রান্স আর আমেরিকা এই দুটোর থেকে একটাকে বেছে নিতে বাধ্য হই তবে আমেরিকাকেই বেছে নেব। কারণ আমেরিকার সঙ্গেই আমাদের সর্বপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কি অর্থনৈতিক, কি কূটনৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি সামরিক। আশা করি বেছে নেবার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যদি হয় তা হলে ইউরোপীয় ঐক্য সুদূরপরাহত।'

ইংরেজদেরও তো আমেরিকার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। ভদ্রলোক বলেন, 'হাঁ। কিন্তু ইংলণ্ডের সঙ্কট তার নিজেকে নিয়ে। ইংরেজরা কি খাটবে! জার্মানদের মতো ওরা খাটতে পারে না। আমেরিকার পরেই জার্মানী।'

বেচারি ইংরেজদের জন্যে আমার মায়া হয়। পরের কাঁধে চড়ে দু'শ' বছর কাটিয়ে দেবার পর ওদের এখন নিচে নামতে হয়েছে, কিন্তু গাধাখাটুনি খাটার অভ্যাস নেই। ইউরোপের কমন মার্কেটে যোগ দিয়ে ওদের সুবিধে কী হবে, যদি জার্মানদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে? কিন্তু জার্মানরাও যে মোড়ালি করতে পারবে তাও নয়। ফরাসীরা যেমন চালবাজ।

ভদ্রলোকের কাছে জার্মানীর ঘরের কথা শুনতে চাই। তিনি বলেন, 'আডেনাউয়ার যতদিন ছিলেন প্রাশিয়ানদের প্রাধান্য ছিল না। তার কারণ প্রোটেস্টাণ্টদের প্রাধান্য ছিল না। এরহার্ড যদিও

বাভেরিয়ান তবু প্রোটেস্টান্ট তো। প্রাশিয়ানরা এতদিন পরে মাথা তুলছে। জানেন তো কী রকম লোক ওরা! ভাবনার কথা।'

প্রাশিয়া নেই, কিন্তু প্রাশিয়ানরা আছে। তাদের ঐতিহ্য আছে। ভাবনার কথা বইকি। ভদ্রলোক ওদের ঠেকিয়ে রাখতে চান, কিন্তু পারবেন কি? হামবুর্গের মানুষ যুদ্ধবিগ্রহ ভালোবাসে না। ওরা ভালোবাসে বাণিজ্য, ওরা ভালোবাসে সমুদ্রযাত্রা। ওদের দৃষ্টি আটলান্টিকের পরপারে নিবদ্ধ। আমেরিকার উত্তর দক্ষিণের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পেলেই ওরা সুখী। বাঁচোয়া এই যে সংবাদপত্র জগতের রাজধানী এখন হামবুর্গ।

ইতিমধ্যে আমেরিকানরা আভাস দিয়েছে যে পশ্চিম জার্মানী থেকে কিছু কিছু সৈন্য অপসরণ করবে। পশ্চিম জার্মানীতে তা নিয়ে শোরগোল পড়ে গেছে। তা হলে সোভিয়েটের আক্রমণের বেলা রুখবে কে? জার্মানীর নিজের সৈন্য যথেষ্ট নয়। নিজের সৈন্যের পিছনে টাকা ঢালতে গেলে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করতে হবে। খরচটা এখন আমেরিকার উপর দিয়ে যাচ্ছে, তাই গায়ে লাগছে না। উপরন্তু রাশি রাশি ডলার আসছে। মার্কিন সৈন্য মার্কিন ডলার টেনে আনছে। ডলারের ফলার খেয়ে পশ্চিম জার্মানীর অর্থনীতির পেট ভরে উঠছে, গায়ে মাংস লাগছে। মার্কিন সৈন্য চলে গেলে মার্কিন ডলারও আর আসবে না। তখন? আবার সেই বেকার সমস্যা? সে দায়িত্ব নেবে কে? না, না, মার্কিন সৈন্য অপসারণ চলবে না। আমার তো বিশ্বাস হয় না যে মার্কিন সৈন্য যখন খুশি অপসরণ করবে। যদি না পশ্চিম ইউরোপ সমবেতভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। সেটা যদি হয় তবে পশ্চিম ইউরোপ আপনা হতে এক হবে।

কিন্তু গোড়ায় গলদ মার্কিন বাহিনী যখন খুশি অপসরণ না করলে কি কারো মাথায় বাজ ভেঙে পড়বে? আর বাজ ভেঙে না পড়লে কি কারো বাস্তববোধ জাগবে? আর বাস্তববোধ না জাগলে কি ঐক্যের খাতিরে কেউ কারো সোভরেণ্টি খাটো করতে রাজী হবে? তা না করে বরং আরো কয়েকটা ব্রহ্মাস্ত্র বানাবে। ঐক্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে ব্রহ্মাস্ত্র তার বিকল্প নয়। কিন্তু ইংলণ্ডকে ও ফ্রান্সকে একথা বোঝানো শক্ত। সুতরাং পশ্চিম জার্মানীকেও। সেও এখন পরমাণু বোমার জন্যে লালায়িত। যদি পায় সর্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হবে। বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে।

আরো একটা বিশ্বযুদ্ধ কেউ চায় না। কিন্তু চায় না বললে কী হবে, যদি প্রস্তুতি সমানে চলতে থাকে আর জটগুলো না খোলে? যুদ্ধ বাধানোর ক্ষমতা পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলির হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে, নিয়ে অর্পণ করতে হবে পশ্চিম ইউরোপীয় মহাজাতির হাতে। তার পক্ষে যুদ্ধ বাধানো অত সহজ হবে না, যদি মার্কিন সৈন্য দূরে সরে যায়। সে না বাধিয়ে যদি সোভিয়েট বাধায় তা হলে অবশ্য মার্কিন বাহিনী তৎক্ষণাৎ উড়ে আসবে। এইরকম একটা উড়ে আসা আর্মি থাকতেই অভিনীত হয়। আটলান্টিকের ওপার থেকে এপারে উড়ে আসতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। সাজসজ্জা অস্ত্রশস্ত্র সমেত।

॥ তেত্রিশ ॥

'ওই যে সুন্দর বাসভবন দেখছেন', আমার প্রদর্শক বোডেন ইশারা করেন, 'ওটি ভাঙা হবে। বাসের অযোগ্য বলে নয়। মালিক চড়া দামে বেচছেন। যিনি কিনছেন তিনি ওখানে বহুতল অফিস সৌধ নির্মাণ করে কোম্পানীগুলোকে ভাড়া দেবেন।'

চেখভের 'চেরি অরচার্ড' আর কী! বোডেনের কণ্ঠস্বরে কারুণ্য। আমারও নিঃশ্বাস দীর্ঘ হয়। রেসিডেন্সিয়াল এলাকার বনেদী ইমারত, এখনো তাতে কয়েকটি পরিবার বাস করছে, অত বড়ো একটা যুদ্ধেও তার তেমন ক্ষতি হয়নি। এখন কিনা তাকে বিনা অপরাধে ধ্বংস করা হবে। এলাকাটা ক্রমে ক্রমে আফিস এলাকা হবে।

বোমাই একমাত্র ধ্বংসকর নয়। টাকাও ধ্বংসকর। বরং টাকা যত ধ্বংস করেছে বোমাও তত করেনি। এমনি কত বাড়িই না ধ্বংস করা হয়েছে শান্তির সময়! তার উপর পুনর্গঠন করা হয়েছে আফিসের বা কারখানার প্রয়োজনে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সভ্যতা এক হাতে ভেঙেছে, এক হাতে গড়েছে। সৌধসমূহের দিকে যখন তাকাই আমার প্রাণের ভিতর থেকে রব উঠে, না, না, ভারতের জন্যে এ সভ্যতা নয়। ভারতের রূপান্তর এই রূপ নেবে এ কখনো কাম্য হতে পারে না। নেতি। নেতি।

কেমন সুন্দর নগর ছিল ড্রেসডেন। আমার প্রদর্শক বোডেনের যেখানে জন্ম। জন্মের কিছুদিন পরে সপরিবারে স্থানত্যাগ না করলে সেই কুখ্যাত বোমাবর্ষণের দিন মরতে হতো। ইংরেজরা কয়েক ঘণ্টার বর্ষণে এক লাখের উপর মানুষ মারে। প্রায় হিরোশিমার সমান। যুদ্ধের বিশেষ বাকী ছিল না। ওটা না করলেও যুদ্ধে জয় হতো। বোধ হয় উদ্দেশ্যটা ছিল রাশিয়া বার্লিন নেবার আগে জার্মানদের উপর এমন চাপ দেওয়া যাতে ওরা হিটলারকে সরিয়ে দিয়ে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। সে রকম কিছু ঘটল না। মাঝখান থেকে অমন সুন্দর নগরটা গেল। বোডেনের চেয়ে আমারই স্মরণ বেশী, আফসোস জানাই। বোডেন প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধে কী না হয়?'

এই জীবনদর্শন এর মধ্যেই জার্মানদের অনেকের যুদ্ধ সংক্রান্ত অপরাধবোধ ভুলিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ। যুদ্ধে কী না হয়! এখনো যাদের অপরাধবোধ আছে তারাও ভুলে যাবে যখন পুনর্গঠন সমাপ্ত হবে। দুঃখ তাঁদের এই যে ড্রেসডেনের মতো বহু শহর এখন সোভিয়েটের কবলে। মন তখন তৈরি হবে গায়ের জোরকে গায়ের জোরে হটাতে। আবার বোমা পড়বে, আবার শহর শ্মশান হবে। পুনর্গঠিত শহরগুলোর শ্রী এমন নয় যে তাদের জন্যে কারো মায়া হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যদি বা কিঞ্চিৎ মায়া ছিল তৃতীয় মহাযুদ্ধে সেটুকুও থাকবে না। যদি বাধে।

অবশেষে আসে হামবুর্গ থেকে বিদায় নেবার পালা। দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা দ্বিপ্রহর। এয়ারপোর্টে চলি। অক্টোবর শেষ হবার মুখে আশা করা যায় না এত আলো। এত প্রখর আলো। হামবুর্গের আবহাওয়া যদি হয় ইংলণ্ডের নমুনা তা হলে লণ্ডনে আমি উজ্জ্বল দিবালোক পাব। কিন্তু বলতে নেই। কতবার ঠকেছি। কতবার ঠেকেছি। এই শিখেছি যে শীত-বৃষ্টির জন্যে তৈরি থাকাই ভালো।

তা হলে সত্যি আমি বিলেত দেখব? টানা চৌত্রিশ বছর বাদে? এক এক সময় মনে হতো এ যাত্রা বিলেত দেখা হবে না, হামবুর্গ থেকেই ফিরতি বিমান ধরতে হবে। জার্মানদের নিমন্ত্রণ ঐখানেই শেষ। ইংরেজদের নিমন্ত্রণ সময়মতো না পেলে বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে হতাশ হৃদয়ে

দেশে ফিরতে হবে। সে যে কী আফসোসের ব্যাপার তা আমিই জানি আর জানেন আমার অন্তরাত্মা।

লণ্ডনযাত্রী বিমানে উঠে বসি। তা হলে সত্যি আমি লণ্ডন দেখব? আজকেই ঘণ্টা আড়াই বাদে? পথিক যখন নানা দেশ দেখে বাড়ি ফেরে তখন পথের শেষ অংশটুকু তাকে অধীর করে তোলে। পথ যেন ফুরোতে চায় না। লণ্ডন আমার বাড়ি নয়, কিন্তু যৌবনের দুটি বছর আমি ওখানে কাটিয়েছি। ওকে বাড়ির মতোই ভালোবেসেছি। বলেছি সেকেণ্ড হোম। লণ্ডন হয়তো আমাকে ভুলে গেছে, আমি কিন্তু ওকে ভুলিনি। আমিও একজন লণ্ডনার।

আর কত দেরি! আর কত দূর! আর কত দেরি! আর কত দূর! এই হলো হৃদয়ের ছন্দ। হে লণ্ডন, তোমাকে দেখতেই ইউরোপে আসা। জার্মানী আমার পথে পড়ে। হে লণ্ডন, তুমিই আমার লক্ষ্য। জার্মানী উপলক্ষ। তুমিই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছ, টেনে নিয়ে চলেছ, তোমার টানেই আমি চৌত্রিশ বছর বাদে ফিরছি, চৌত্রিশ বছর আগে ফিরছি। আমি সেই পঁচিশ বছর বয়সী। কই, কোথায় গেল মাঝখানকার বছরগুলোর ব্যবধান! ক্রমেই ক্ষয় হয়ে আসছে। আমার এটা একটা টাইম মেশিন।

ব্রেমেনে কিছুক্ষণ থেমে প্লেন চলে হল্যাণ্ডের উপকূল দিয়ে সমুদ্রকে ডাইনে রেখে। সবুজ সমতল ভূমি। রমণীয় দৃশ্য। নামতে তো পারছিনে। চেয়ে দেখি দু'চোখ ভরে। আর কত দেরি! আর কত দূর!

এইবার সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ছি। হল্যাণ্ডের উপকূল মিলিয়ে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের উপকূল এখনো স্পষ্ট নয়। দূর থেকে শুধু একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বন্দে! বন্দে! ব্রিটানিয়া, তোমাকে আমি বন্দনা করি। জীবনের দুটি শ্রেষ্ঠ বছর তোমার অঙ্গনে কেটেছে। তার শিক্ষা, তার আনন্দ ভুলিনি। রাজনৈতিক বিরোধ থেকে বিরাগ এসেছে, বিরোধ মেটার সঙ্গে সঙ্গে সে বিরাগ গেছে। কে সেসব মনে রাখে! কিন্তু মনে আছে সে বয়সের সেই দর্শনপিপাসা, সেই প্রথম দর্শন, সেই উন্মাদনা, সেই ধন্যতা। তেইশ বছর বয়সের সেই অনুভূতির সে আবেগের পুনরাবৃত্তি কি উনষাট বছর বয়সে সম্ভব? দ্বিতীয় দর্শন তো প্রথম দর্শনের পুনরুক্তি নয়।

অন্যমনস্ক ছিলুম। জানালা দিয়ে দেখি। কখন এক সময় জল পার হয়ে এসেছি। মাটির উপর দিয়ে উড়ছি। সবুজ সমতল ভূমি নয়। চকখড়ির পাহাড়ও নয়। বনস্থলী, ঢালু মাঠ, এখানে ওখানে বাড়ি-ঘর। পাতা ঝরে যাওয়া গাছ। বিবর্ণ বিরলপত্র বনস্পতি। আকাশের আলো পড়ে ছবির মতো দেখাচ্ছে। এই ইংলণ্ড! আমি তবে এখন ইংলণ্ডের উপরে!

বুকের স্পন্দন দ্রুত হচ্ছে। কোনো মতে উত্তেজনা দমন করছি। এতদিন পরে সময় ও সুযোগ হলো আসবার। কী করে যে হলো! এই তো সেই ব্রিটেন আর এই তো সেই আমি। মাঝখানকার বিচ্ছেদটা মায়া।

হীথরো এয়ারপোর্ট। স্বচ্ছন্দে অবতরণ। সহজভাবে ভূমিস্পর্শ। যেন এই সেদিন বাইরে গেছলুম। আজ ফিরছি। কেউ আমাকে চিনবে না। আমিও চিনব না কাউকে। তাতে কী? আমি তো চিনি এই দেশকে। আমিও অচেনা নই।

এয়ারপোর্ট থেকে এয়ার টার্মিনাল। সেখানে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসেছিলেন। কিন্তু তিনি কি আমাকে চিনতেন যদি চিনিয়ে না দিতেন 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়?

সাউথ কেনসিংটন। হাঁ, এই পাড়াতেই সেবার আমার প্রথম সন্ধ্যা। এবারেও দেখছি ঘুরে ফিরে সেইখানেই প্রথম সন্ধ্যা। তবে এবার আমি রাতের অতিথি অন্য পাড়ায়। মার্বল আর্চে। হাইড পার্কের উত্তরে।

জাহাজ এখন বন্দরে পৌঁছেছে। আমি এখন লণ্ডনে। অন্তরে আমার পরম পরিতৃপ্তি। যা চেয়েছিলুম তা পেয়েছি। যদি একটা দিনও থাকি, যদি পরের দিনই ফিরে যাই তা হলেও আমার মনে খেদ থাকবে না। আমি বুড়ি ছুঁয়েছি।

রীতিমতো ক্লান্ত। শুয়ে শুয়ে কথা বলতে পারলে দেহের আরাম, মনের শান্তি। কিন্তু ওসব আমার স্বভাবে নেই। বিশ্বনাথবাবুকে এগিয়ে দেবার নাম করে বেরিয়ে পড়ি। পায়ে হেঁটে বেড়াই। অক্সফোর্ড স্ট্রীট। রিজেন্ট স্ট্রীট। পরিবর্তন হয়েছে বইকি। তবু চেনা জিনিস যেখানে রেখে গেছলুম সেখানেই রয়েছে। আমাকে বলে দিতে হবে না যে ওটা সেলফরিজেস।

এর মধ্যেই ভুলে গেছি যে আমি আজ দুপুরে হামবুর্গে ঘুরেছি। এখন আমি একজন লণ্ডনার। যাকেই দেখি তাকেই পাকড়িয়ে সুধাতে চাই, তার পর আছেন কেমন? অনেক দিন বাদে দেখা। ইদানীং আমি লণ্ডনের বাইরে থাকি কি না।

মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। চাঁদের আলো বিছানায় এসে পড়েছে। উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি লণ্ডনের আকাশে চাঁদ। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। নিদ্রাহারা শশীর মতো বসে স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালাবার সাধ ছিল না। এক নজরে দেখে নিলুম যে পাড়া ঘুমিয়ে, কিন্তু রাস্তা জেগে। তার জুড়োবার জো নেই। গর্জন করে মোটর ছুটেছে।

॥ চৌত্রিশ ॥

পরের দিন আমি গোল্‌ডার্স গ্রীন আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশন থেকে বেরিয়ে হ্যাম্পস্টেড গার্ডেন সাবার্বের পথে পথে আমার সেই তরুণ আমিকে খুঁজছি যাকে প্রায়ই দেখা যেত ঐসব পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতে। কোথাও কি সে তার পায়ের চিহ্ন রেখে যায়নি? আমার পঁচিশ বছব বয়সের আমি? তার চেহারা আমার নিজেরি তেমন মনে নেই। তবে আছেন একজন যাঁর মনে থাকবে। তিনি আমাকে দেখে চিনতে পারলেই আমি আমাকে খুঁজে পাব।

চিনলেন তিনি আমাকে। আমিও তাঁকে। কালের ব্যবধান দূরতিক্রম্য নয়। কিন্তু কাল যে ক্ষতি করে যায় তার আর পূরণ নেই। তাঁর দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠি। মনে পড়ে কবি ইয়েটসের সেই দুটি লাইন—

'The innocent and the beautiful
Have no enemy but time.'

শুধু কাল নয়, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর জীবনযাত্রা। ঝি পাওয়া যায় না, রাঁধুনি পাওয়া যায় না, মালী পাওয়া যায় না। একটি রেফিউজি মেয়ে আসত বাগানের কাজ করতে এক বেলা কি আধ বেলা। এখন আর আসে না। পারিবারিক চিকিৎসক মারা গেছেন। সরকারী হেলথ সার্ভিসের ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে যা হোক একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দিয়ে দায় সারেন, ভালো করে শোনেনও না অসুখের ইতিবৃত্ত। থিয়েটারের টিকিটের অসম্ভব দাম, অনেক আগে থেকে রিজার্ভ না করলে মেলে না। সঙ্গীতের একটা ক্লাব আছে, তিনি তার সভ্য। কিন্তু নিজের মোটর নেই। বন্ধুরা ভরসা।

নাঃ। কলকাতায় আর লণ্ডনে আজকাল বড়ো বেশী তফাৎ নেই। তবে লণ্ডনের আণ্ডারগ্রাউণ্ড

রেলপথ একাই এক শ'। মোটের উপর সেই রকমই আছে। অটোমেটিকে মুদ্রা ফেললে টিকিট বেরিয়ে আসে। সেটা হাতে নিয়ে লাইন দাও। এস্‌কালেটর দিয়ে নেমে যাও। সুড়ঙ্গ দিয়ে পথ খুঁজে নাও। তার পরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। ট্রেন আসছে, ট্রেন আসছে, ট্রেন ছাড়ছে, ট্রেন ছাড়ছে। মাঝখানে কয়েক সেকেণ্ড সময়। লাফ দিয়ে ওঠ। ভিড় থাকে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চল। নয়তো আরাম করে বস। সুড়ঙ্গ দিয়ে স্টেশনের পর স্টেশন পার হও। বেরিয়ে দেখ লণ্ডনের আরেক পাড়ায় পৌঁছেছ।

এবার শহরতলী থেকে ফিরে শহরের মাঝখানে। টেমস নদীর ধারে। অলডউইচ। কিংস কলেজ। লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স। সব মনে আছে। আমি যেন এই সেদিন দেখে গেছি। ইতিমধ্যে হাই কমিশনারের অফিস এ পাড়ায় উঠে এসেছে। এই বুঝি সেই ভবন। তার পর বুশ হাউস। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের সদর। এটাও আমার চোখে নতুন। 'বিচিত্রা' অনুষ্ঠানের পরিচালক বিনয় রায় তাঁর অনুষ্ঠানসূচীতে আমার জন্যে একটু স্থান করে রেখেছিলেন। ভিতরে যেতেই তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। বি বি সি থেকে বাংলাভাষায় বেতার অনুষ্ঠানের দুই প্রস্থ ব্যবস্থা। একটা ভারতের জন্যে। একটা পাকিস্তানের জন্যে। দুটোই উপাদেয়। বিনয় রায়ের উপর প্রথমটির ভার। তাঁর সঙ্গে স্টুডিওতে যাই, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিই মুখে মুখে। অমনি রেকর্ড হয়ে যায়। রেকর্ড শুনে আমার গলা আমিই চিনতে পারিনে। দেশের লোক কি চিনবে?

দিনটি সকালবেলা মেঘলা ছিল, এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকে উজ্জ্বল। পায়ে হেঁটে ঘুরি। আশ্চর্য লাগে যাই দেখি। নতুন বলে নয়। পুরাতন অথচ নতুন বলে। কতবার লণ্ডনে ফেরার কথা ভেবেছি, কিন্তু জীবন আমাকে ছুটি দেয়নি। এবার সত্যি সত্যি ফিরেছি। ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা বোধ করছি। কিন্তু বয়সের ব্যবধান তো মায়া নয়। উত্তেজনা আপনাকে আপনি সম্বরণ করছে। আমার প্রদর্শক ডোমান তো সেদিনকার ছেলে। আর সঙ্গী বিশ্বনাথবাবু সেদিনকার প্রবাসী। তাঁরা আমাকে দেখাবেন না আমি তাঁদের দেখাব? আমি যে এ পাড়ায় হপ্তায় দু'তিনবার ক্লাস করেছি। চষে বেড়িয়েছি। একদা এসব আমার মুখস্থ ছিল। কিন্তু এখন অত মনে নেই। পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। তবে জার্মানীর মতো নয়। যুদ্ধ তেমন ক্ষতি করেনি। আর ইংরেজরাও স্বভাবত রক্ষণশীল।

অন্তরে অন্তরে আমি জানি যে এ লণ্ডন সে লণ্ডন নয়। এ ইংলণ্ড সে ইংলণ্ড নয়। মাঝখানে ছোটখাটো একটা সমাজবিপ্লব ঘটে গেছে। একটা মৃদু ভূমিকম্প। শ্রমিক শ্রেণীর মন মেজাজ বদলে গেছে। বাঘ যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। রক্ত মানে ক্ষমতা, রক্ত মানে অর্থ। আমার হোটেলেই আমি তার নমুনা দেখছি। বাইরে থেকে ঝি চাকর আমদানি করতে হয়েছে। ইটালিয়ানই বেশী। রাস্তায় ঘাটে কালা আদমি লক্ষ করছি। কেউ স্টেশনে টিকিট চেক করে, কেউ বাসে টিকিট বিক্রী করে। এরাও স্বাধিকার সচেতন। কেউ ইনফিরিয়র নয়। আজকের ইংলণ্ডেও ধনবৈষম্য ও বর্ণবৈষম্য আছে। কিন্তু মাঝখানে এমন একটা যুগ গেছে যে-যুগের ব্যবধানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাম্য গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগ, তার পরবর্তী শ্রমিক সরকারের যুগ। হাঁ, শ্রমিক রাজের যুগ। লেবার পার্টি শুধু আর একটা পার্টি নয়। আর একটা শ্রেণী। যদিও মনে মনে মধ্যবিত্ত হতে উৎসুক।

না, এ ইংলণ্ড সে ইংলণ্ড নয়। আমেরিকার কাছে দ্বিতীয় হতেও এর আপত্তি ছিল, রাশিয়ার কাছে তৃতীয় হওয়া তো কল্পনাতীত। আমাদের সেক্রেটারী অফ স্টেট ছিলেন লর্ড বার্কেনহেড। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ভারতবর্ষ আরো দু'শ বছর ব্রিটিশ শাসনে থাকবে। সেই ইংলণ্ড এখন সাম্রাজ্যহীন। অথচ তারও একটি পারমাণবিক মর্যাদা চাই। সেও হাইড্রোজেন ক্লাবের সদস্য

হবে। নইলে পশ্চিম জার্মানীর কাছে চতুর্থ হয়ে যায়, ফ্রান্সের সঙ্গে সমান হয়ে যায়। এর খরচটি বড়ো কম নয়। একেই অগ্রাধিকার দিলে কলকারখানা নতুন করে বসানোর জন্যে যথেষ্ট ধন থাকে না। ইতিহাস এখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন ছাড়িয়ে সায়েন্টিফিক রেভোলিউশনের পর্যায়ে পড়েছে। এযুগের উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র না হয় হলো, কিন্তু যন্ত্রপাতির উপযোগিতাও তো চাই। অথচ সে রকম যন্ত্রপাতির পিছনে খরচ করতে গেলে শ্রমিকদের আরো বেশী খাটিয়ে নিতে হয় কিংবা আরো কম মজুরি দিতে হয় কিংবা মজুরির বদলে ডোল দিয়ে বেকার করে রাখতে হয়। এর কোনোটাই শ্রমিকরা সহ্য করবে না। তারা বলে ধনিকরা কম লাভ করুক বা উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের হাতে তুলে দিক। ধনিকরা নারাজ। তারা বরং কমন মার্কেটে যোগ দেবে। শ্রমিকদের তাতে উৎসাহ নেই। কারণ কমন মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ যাঁদের হাতে তাঁরা সকলেই ধনতন্ত্রবাদী রক্ষণশীল।

তখনকার দিনের তুলনায় ইংলণ্ড একটি বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হয়েছে। ধনিক শ্রমিক নির্বিশেষে সবাই মেনে নিয়েছে যে সমাজের সব ব্যক্তিকে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সামাজিক নিরাপত্তা দিতে হবে। কেউ কর্মহীন থাকবে না, কেউ অন্নহীন থাকবে না, কেউ বৃদ্ধ বয়সে পেন্সনহীন থাকবে না, কেউ অসুখে বিসুখে চিকিৎসাহীন থাকবে না। এটা একটা নতুন ধরনের ম্যাগনা কার্টা। অথচ এর জন্যে কারো গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না। এর খাতিরে ডিক্টেটরশিপ প্রবর্তন করতে হবে কেউ এটা স্বীকার করে না। এ ভাবে সমাজতন্ত্র বিবর্তিত হবে কি না সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ থাকতে পারে, কারণ রক্ষণশীলদেরই ভোটের জোর বেশী, ঠোঁটের জোর বেশী, জোটের জোর বেশী। হেরে গেলেও তারা ফিরে আসতে পারে, ফিরে এসে যেটা তাদের অপছন্দ সেটা রদবদল করতে পারে। সুতরাং কেবল এক পক্ষের ইচ্ছায় সমাজতন্ত্র কায়েম হতে পারে না। সর্বসাধারণের ইচ্ছার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এক কথায় ইংলণ্ড এখন সামাজিক ন্যায়ের অভিমুখে এর বেশী অগ্রসর হতে প্রস্তুত নয়। গতিশীলতার পর স্থিতিশীলতা এসে গেছে। শ্রমিক দল রাষ্ট্রিক ক্ষমতার আসনে ফিরে এলেই যে সমাজতান্ত্রিক গতিশীলতাও ফিরে আসবে তা নয়। যেটা এসেছিল সেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঢেউয়ের পিঠে চড়ে এসেছিল। যুদ্ধে ত্যাগস্বীকারের পুণ্যফলহিসাবে সর্বশ্রেণীর ওটা পাওনা ছিল। কিন্তু কল্যাণব্রত রাষ্ট্র বলতে ওর চেয়ে অনেক বেশী বোঝায়। আরো একটা যুদ্ধ না বাধলে ও আরো কিছু পুণ্যফল প্রাপ্য না হলে কি মালিকানার পরিবর্তন হবে?

আপাতত মার্কিন নেতৃত্বে অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি পত্তন করতে পারলে কে না চায়! আহা, থাকলই বা কিছু মার্কিন সৈন্য ও ঘাঁটি ইংলণ্ডের মাটিতে। ডলারের ফলার তো জুটছে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

সেদিন সন্ধ্যাবেলা পিরান্দেল্লোর 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র' বইখানির অভিনয় হচ্ছিল। বরাতক্রমে টিকিট জুটে গেল। মেফেয়ার হোটেল ইদানীং যাঁদের পরিচালনায় গেছে তাঁরা তার একটি বিখ্যাত কক্ষকে রূপান্তরিত করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন মেফেয়ার থিয়েটার। আধুনিকতার শেষ কথা। এই নাটকই তার প্রথম অর্ঘ।

বছর তিরিশ আগে। পিরান্দেল্লো যখন নোবেল প্রাইজ পান তখন তাঁর এই নাটক আমি পড়ি ও পড়ে মুগ্ধ হই। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের এই সন্দর্ভ নাটক হিসাবে আশ্চর্য উতরেছে, কিন্তু এর অভিনয় রঙ্গমঞ্চে কতখানি ওতরাবে সে বিষয়ে আমার সংশয় ছিল। ওই যে ছয়টি চরিত্র ওরা জীবন্ত মানুষও নয়, অশরীরী প্রেতও নয়, ওরা কোনো এক গ্রন্থকারের দ্বারা লিপিবদ্ধ না হওয়া একটি বিদ্‌ঘুটে কাহিনীর পাত্রপাত্রী। একদল অভিনেতা অভিনেত্রী যখন অন্য এক নাটকের মহলা দিতে যাচ্ছে তখন রূপ ধরে ওই ছয়টি চরিত্রের আবির্ভাব। পুরাণে রূপকথায় আমরা রূপ ধরে আগমনের সঙ্গে পরিচিত। জীবনে তেমন কোনো ঘটনার কথা জানিনে। কিন্তু আমাদের ধরে নিতে বলা হচ্ছে যে একদল অভিনেতা অভিনেত্রীর জীবনে এমন আজব ঘটনা ঘটে। ওরা দর্শকের অংশ নেয়। অভিনয় করে যায় ওই ছয়টি চরিত্র। ওরা যেন মুখে মুখে বানানো একটি নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রী। সমস্তটা একটা ফ্যাণ্টাসি।

দু'দল অভিনেতা অভিনেত্রী। এরা এগারোজন। ওরা ছ'জন। আমাদের সামনে একদল অভিনেতা অভিনেত্রী আরেক দল অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় দর্শন করছে। কাহিনীটার নাট্যরূপায়ণে সাহায্য করছে। এরা সাহায্য না করলে ওরা যা করত তা নিয়ে নাটক হতো না। ওরকম নাটক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারত না। ওকে দাঁড় করাবার জন্যে এই টেকনিকের শরণ নিতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রিয়ালিটি ও মায়া সম্বন্ধে একটি প্রহেলিকার অবতারণা করা হয়েছে। অভিনয়কলা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। সত্যি সত্যি যেরকম ভাবে ঘটে আর অভিনেতা যেরকম করে দেখান তার তফাৎ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষে যেখানে ছোট মেয়েটি জলে ডুবে মারা যাচ্ছে ও ছোট ছেলেটি রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করছে সেখানে অতীতের বিবরণ ও বর্তমানের ঘটনা একাকার হয়ে গিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করছে যে, ওই চরিত্রগুলি কি অভিনয় করে দেখাচ্ছে না বাস্তবিক অমন কিছু ঘটে যাচ্ছে। এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া, এ কি সত্য, এ কি কায়া!

পিরান্দেল্লো ধাঁধার ছলে শিক্ষা দিতে চেয়েছেন কি নিছক তামাশা করেছেন বোঝা যায় না। তবে এ নাটক এণ্টারটেনমেণ্ট হিসাবেও কম সফল নয়। বার্নার্ড শ নাকি একবার বলেছিলেন যে জীবনে তিনি যে পাঁচটি সেরা নাটক দেখেছেন এটি তার একটি। বলা বাহুল্য এটা নাটক নিয়ে একটা এক্সপেরিমেণ্ট। এটা একপ্রকার অ্যান্টি-প্লে। নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী নাটক।

এককালে আমি পিরান্দেল্লোর এ নাটক পড়ে এর মধ্যে যে মহত্ত্ব দেখেছিলুম সেটা বিষয়বস্তুর বা সত্যের হলে অভিনয়ের ভিতর দিয়েও পরিস্ফুট হতো। না, তেমন কোনো মহিমা নেই এই নাটকের, এ সৃষ্টির। এটা দাঁড়িয়েছে একটা তত্ত্বের উপরে। ওটা দার্শনিকের মস্তিষ্কজাত। চতুর রচনা, চতুর অভিনয়। স্টেজের উপর অভিনয় চলতে চলতে দেখা গেল স্টেজের বাইরেও অভিনয় প্রসারিত হয়েছে। কয়েকজন ঢুকল যে দরজা দিয়ে আমরা ঢুকেছি, সে দরজা দিয়ে। কয়েকজন মঞ্চ থেকে নেমে এসে আমাদের একপাশে দাঁড়িয়ে দর্শক সাজল। বড়ো ছেলে তো মাকে এড়াবার জন্যে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো চীৎকার করে ছুটতে ছুটতে দোতলার দর্শকদের গ্যালারিতে উঠে বসল। এসব হলো জাপানী কাবুকি ধরন।

টেকনিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে টেকনোলজি। স্টেজ, তার উপরকার সেট, তার আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা এসব যেমন কলাকৌশলের ব্যাপার তেমনি কলকৌশলের। যান্ত্রিকতার জয়জয়কার। পিরান্দেল্লোর যুগে এত কাণ্ড ছিল না। জলজ্যান্ত একটা ফোয়ারা, তার জলে তলিয়ে যাচ্ছে ছোট মেয়ে। জলজ্যান্ত একটা বাড়ি, তার ছাদ থেকে পড়ে যাচ্ছে গুলীবিদ্ধ পাখির মতো আত্মঘাতী ছোট ছেলে। পিরান্দেল্লো নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন যে ফ্যাণ্টাসির অভিনয় হবে কল্পনাকুশল।

কিন্তু যন্ত্র এসে কল্পনার আসন জুড়ে বসেছে। অভিনয়ও বাস্তবধর্মী। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয় না যে ওই বাপ, ওই মা, ওই সৎমেয়ে স্বপ্নের মতো অলীক। ওরাও যেকোনো বাস্তবধর্মী নাটকের পাত্রপাত্রীর মতো আকারে প্রকারে কথায় ও কাজে বাস্তব জগতের বাসিন্দা। আসলে পিরান্দেল্লো নিজেই খিচুড়ি পাকিয়ে গেছেন। ওই ছয়জন যে 'চরিত্র', ওরা যে এই এগারো জনের মতো রক্তমাংসের মানুষ নয় এই সূক্ষ্ম প্রভেদটি অভিনয় ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা সহজ তো নয়ই, বোধ হয় সম্ভবও নয়। আমি তো কোনো প্রভেদই লক্ষ করলুম না। সোজা অভিনয়ের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো লাগল মাকে। ব্রেজিলদেশীয়া অভিনেত্রী মাদালেনা নিকলকে। কেবল বাক্যে নয় ভাবভঙ্গীতে বেশবাসে চালচলনে তিনি ট্র্যাজিক।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে জ্যোৎস্নাধবল ধরণীতে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচি। এমন রাত্রে কি সুড়ঙ্গপথে দম বন্ধ করে চলাচল করতে হয়? পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিই। যথারীতি পথ ভুলি। সঙ্গে কেউ নেই যে দিশা বলে দেবে। মানচিত্র নেই। হাইডপার্কের ধার ধরে উল্টো দিকে চলেছি সে খেয়াল নেই। এ কী! নাইটসব্রিজ। আচ্ছা। দেখাই যাক। খুব একটা পরিবর্তন নজরে পড়ে না। সেইরকমই সযতনে বিপণি সাজানো। কাঁচের এপার থেকে দেখা যায়। কিন্তু দাম সেইরকম নয়। ইতিমধ্যে বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা তো নেই। আমি সর্ব প্রলোভনের অতীত। তবু ঘুরে ফিরে দেখি। নিঃস্পৃহ পরিদর্শক।

পরের দিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে ওঠে। আমার বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের টেলিফোন। ওকে আমি জার্মানীতে পাইনি। যেখানেই যাই সেখানেই শুনি ভবানী এসেছিল, কিন্তু চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। ওকে ধরতে হলে ডিটেকটিভ সাজতে হয়। সঙ্গে সলিলা আছে বলেই আমি নিশ্চিন্ত, নইলে ও যে রকম সনাতন ছেলেমানুষ, কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে! আমার সম্বন্ধে ভবানীরও অনুরূপ ধারণা।

অর্ধাঙ্গিনীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে ভবানী এখন আধখানা হয়ে গেছে। আমিও তো আধখানা। এমন অবস্থায় দুই বন্ধুরই উচিত এক হোটেলে বাস করা, একসঙ্গে ঘোরাফেরা করা। তা হলে আর কিছু না হোক আবার আমরা সেই পুরাকালে ফিরে যেতে পারি, যখন দু'জনেই লণ্ডনের নাগরিক ছিলুম। কিন্তু আমাদের এক একজনেব এক এক রকম প্রোগ্রাম। তাই মেনে নেওয়া গেল ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

আশ্চর্য! দেশে আমাদেব দেখা হয় না। কতকাল হয়নি। বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে দেখা। ঘুরতে ঘুরতে আমরা সেইখানেই আর সেইকালেই ফিরে এসেছি। সেই ভবানী আর সেই আমি। দুই বন্ধুতে মিলে পিকাডিলি অঞ্চলের পথ দিয়ে চলেছি। বড়ো বড়ো রাস্তা ছেড়ে ছোট ছোট গলিতে পা দিলে বিশ্বাস হয় না যে লণ্ডন বিশেষ বদলেছে। লণ্ডন সেই লণ্ডন। তবে, হাঁ, পরিবর্তনও নজরে পড়েছে। অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। যুদ্ধের ফলে কতকটা, কালক্রমে কতকটা। কালস্রোত পদ্মাস্রোতের মতো এক কূল ভাঙে, আরেক কূল গড়ে। থিয়েটার যেখানে ছিল সেখানে আফিস অট্টালিকা কিংবা সুপারমার্কেট কিংবা বহুতল গারাজ। মাঝখানে একটা যুগ গেছে যখন টেলিভিশনের দাপটে থিয়েটার খালি, যখন মনে হতো থিয়েটারের যুগ গেছে, বৃথা বাড়ি আগলে রাখা। এখন আবার থিয়েটারের সুদিন এসেছে, টেলিভিশনের সঙ্গে তার জাতিবৈর নেই দেখা যাচ্ছে। আবার তার জন্যে গৃহনির্মাণ বা গৃহসংস্কার চলেছে।

লণ্ডনে এখন স্কাইস্ক্রেপার হয়েছে। কাচের বাড়ি হয়েছে। লণ্ডনের আকাশরেখা বদলে গেছে। রাস্তা পারাপারের জন্যে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়েছে। মোটর রাখার জন্যেও গহ্বর হয়েছে। মোটর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এত বেশী হয়েছে যে মোটর রাখবার জায়গা নেই। ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক আগেকার

দিনে কদাচিৎ চোখে পড়ত। এখন যত্র তত্র। ফলে অনেক বেশী ঘুরতে হয়। শুনতে পাই মোটর চলাচলের জন্যেও একটা আণ্ডার গ্রাউণ্ড যানপথ কল্পনায় আছে। সবাইকে একটা করে মোটর দিলে মোটর চালাবার জন্যে রাস্তাও দিতে হয়, কিন্তু মাটির উপরে এত জমি কোথায়? জমির তল্লাসে তাই মাটি খুঁড়তে হবে। পাতালে যেতে হবে। মন্দ আইডিয়া নয়। যুদ্ধের সময় পরমাণু বোমার উৎপাত থেকে আশ্রয় চাইলে মোটরসমেত পাতাল প্রবেশ করা যাবে। আকাশে উড়তে শিখে সভ্য মানুষ যে বিপদ ডেকে এনেছে তার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় পাতালে নিহিত।

॥ ছত্রিশ ॥

সাতদিনের অতিথি আমি, আমার কি অতীতের দুটি বছরের সঙ্গে পায়ে পায়ে মিলিয়ে দেখার অবসর আছে? পুনরাবৃত্তি বা পূর্বানুবৃত্তি কোনোটাই এক নিঃশ্বাসে হয় না। আমাকে আমার সীমাবন্ধন মেনে নিতে হবে। তারই মধ্যে যতটুকু হয়। যাদুঘর আমি মনে মনে বাদ দিয়ে রেখেছি। কিন্তু টেট গ্যালারিতে মোদিলিয়ানির প্রদর্শনী হচ্ছে শুনে লাফিয়ে উঠি। এ জিনিস ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে এই প্রথম হচ্ছে। সুতরাং আমারও এই প্রথম সুযোগ।

মোদিলিয়ানি (Modigliani) বছর চোদ্দ বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন। তারপর বছর বাইশ বয়সে ইটালী ছেড়ে প্যারিসে চলে আসেন। সেখানে থাকতে বছর পঁচিশ বয়সে ছবি আঁকা ছেড়ে ভাস্কর্যে নিমগ্ন হন। তারপর বছর বত্রিশ বয়সে ভাস্কর্য ছেড়ে চিত্রকলায় ফিরে আসেন ও স্থির হয়ে বসেন। আপনাকে আবিষ্কার করে আপনার পথ পেয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে অন্তরকে উজাড় করতে যাবেন এমন সময় যে ব্যাধি তাঁকে ছেলেবেলায় চিত্রময় জগতে এনেছিল সেই ব্যাধ তাঁকে ক্রৌঞ্চের মতো অকস্মাৎ বধ করে। পরের দিন তাঁর ক্রৌঞ্চী জানালা থেকে ঝাঁপ দিয়ে অনুমৃতা হন। মোদিলিয়ানির মর্ত্য জীবন মাত্র ছত্রিশ বছরের।

এই ট্র্যাজেডীর পর মোদিলিয়ানি জীবনে যা পাননি তাই পান। সর্বব্যাপী সমাদর। বাজার ছেয়ে যায় রাশি রাশি জাল ছবিতে। সাচ্চা ও ঝুটার মধ্যে বাছাই করা কঠিন হয়। সে বিতর্ক এখনো থামেনি। আধুনিক চিত্রভাস্কর্যে এঁর যা দান তা সংখ্যায় বেশী না হলেও বিশেষ গুণে গুণান্বিত। তার মধ্যে পাওয়া যায় ইটালীর রেনেসাঁস আদর্শের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের পরীক্ষানিরীক্ষা ও উপলব্ধির একপ্রকার মেলবন্ধন। ইটালীতে থাকলে তিনি হয়তো এটা পারতেন না, কারণ সেখানে অতীতের প্রভাব শিল্পীদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে চায় বলে আত্মপ্রকাশের জন্যে বাধ্য হয়ে অতীতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ফিউচারিস্ট হতে হয়। তেমন করে তো নিষ্পত্তি হয় না। প্যারিসে এসে তিনি ইটালীকে ভুলে যাননি, আরো ভালোবেসেছেন। রেনেসাঁস চিত্রকলার ও ভাস্কর্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। সেকালের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতা অন্তরালে গিয়ে আরো গভীর হয়েছে। অপর পক্ষে স্বকালের মুখ্য স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল প্যারিসে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম চোদ্দ বছরের প্যারিস ইউরোপীয় আর্টের ইতিহাসে অতুলনীয়। নানা রাজ্যের নানা রীতির কলাবান ও কলাবতীদের সেই অপূর্ব ভাব সম্মিলন মোদিলিয়ানিকে দিয়ে পূর্ণ হয় ও তাঁকে পূর্ণ করে। মহাযুদ্ধ বাধলে পরে সেই আত্মগত জগতের বোহেমিয়ান জীবনযাত্রা ছিন্নভিন্ন হয়।

স্পিনোজা যাঁর মাতৃকুলের পূর্বপুরুষ তাঁর ভিতরেও কিছু আধ্যাত্মিক উপাদান ছিল। তাঁর

শেষের দিকের প্রতিকৃতিগুলি রেখায় বর্ণে ভঙ্গীতে ব্যঞ্জনায় অসাধারণ। সমসাময়িকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও তিনি কোনো দলে যোগ দেননি, কোনো রীতি কবুল করেননি। তিনি অনন্য। তা বলে একেবারে ছোঁওয়া বাঁচিয়েও চলেননি। এখানে ওখানে পড়েছে ফোভিস্ট বা কিউবিস্ট প্রভাব। তেমনি আফ্রিকার নিগ্রো আর্টের আদল। একালের শিল্পীদের কতকগুলি সমস্যা আছে। প্রত্যেককেই তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। মোদিলিয়ানি এক এক করে যা কিছু অবান্তর সব ত্যাগ করেন। যেমন এক হাতে ত্যাগ করেন তেমনি আরেক হাতে গ্রহণ করেন। গ্রহণটা ভাস্কর্যের ভাণ্ডার থেকে। সে এক অক্ষয় ভাণ্ডার। কোন্ লক্ষ্যে তিনি উপনীত হতেন যদি আরো দশ বিশ বছর বাঁচতেন তার আভাস শুধু মেলে বেলাশেষের আঁকা প্রতিকৃতিগুলির থেকে। যেমন তাঁর স্ত্রীর শেষ প্রতিকৃতির থেকে। অসম্পূর্ণ হলেও তাঁর জীবন অতৃপ্ত নয়। শান্তি ও তৃপ্তি শেষ পর্যন্ত মেলে। কিন্তু যেই মেলে অমনি তাঁর ছুটি।

টেট গ্যালারির অপর একটি কক্ষে মোদিলিয়ানির বন্ধু সুতিনের প্রদর্শনী। এটিরও আয়োজক গ্রেট ব্রিটেনের আর্টস কাউন্সিল। সুতিন (Soutine) ছিলেন লিথুয়ানিয়া থেকে আগত প্যারিস প্রবাসী চিত্রকর। ইহুদী বলে নাৎসী অধিকারের সময় পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেন, পরে অসুস্থ হয়ে প্যারিস ফিরে এসে মারা যান। মোদিলিয়ানির মতোই বোহেমিয়ান, কিন্তু রীতিতে ইনি এক্সপ্রেশনিস্ট। আঁকেন যখন তখন ইন্স্টিংক্টের উপর নির্ভর করেন, মাথা খাটাতে চান না। চোখে যেমন সরষে ফুল দেখে তেমনি কত কী অপরূপ অসংলগ্ন অনাসৃষ্টি দেখেন। রঙের উপর রঙ চাপিয়ে যান, রেখাগুলো শিরার মতো ফুলে ওঠে, ছন্দ যেন তড়কার যন্ত্রণা। কেমন এক দুঃস্বপ্নের মতো লাগে। বিষাদ ও আশঙ্কা বয়ে আনে। সুতিন নাকি তাঁর ছবির প্রদর্শনী করতেন না। সেইজন্যে এই প্রদর্শনীও একটি অভিনব না হোক বিরল ঘটনা।

টেট গ্যালারি থেকে বেরোবার সময় হেনরি মূরের ভাস্কর্য নিদর্শন দেখি। মূর এখন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। আকারে বিরাট, প্রকারে সরল, প্রকৃতিতে সজীব ও আদিম তাঁর এই সব মূর্তি ভিতরে ভিতরে ভাবময় ও মননশীল। মূর্তিকে তিনি প্রতিকৃতির হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাকে দেখে কার মূর্তি তা বলার জো নেই। নৈর্ব্যক্তিক, তা বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নয়। মূরের সৃষ্টি রূপবান অথচ কৃত্রিমতাবর্জিত।

খেয়াল নেই যে নভেম্বর আরম্ভ হয়ে গেছে। বহুকাল ইংলণ্ড ছেড়েছি, তাই বুঝতেও পারিনে কী ব্যাপার। টেট গ্যালারির প্রবেশপথে হঠাৎ দু'তিনটি বালকবালিকা এসে আমার কাছে হাত পাতে। 'একটা পেনী দিন না।' এ তো ভারি অন্যায়! আজকের দিনেও ভিক্ষাবৃত্তি! এত যে শুনি ইংলণ্ডে এখন অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি তার নমুনা কি এই? কই, চেহারা থেকে তো মনে হয় না যে খেতে পাচ্ছে না? পোশাকও তো ভিখারীর মতো নয়। আমি কিছু মুখ ফুটে বলিনে। ওদের মুখে হাসি দেখে বিরক্ত হয়ে পাশ কাটিয়ে যাই। এ গেল টেট গ্যালারির ঘটনা। ঠিক এমনি ঘটনাই ঘটে সন্ধ্যাবেলা স্যাডলার্স ওয়েলস থিয়েটারের দোরগোড়ায়। এ কী কাণ্ড! এটা কি ছেলেমেয়েদের ডেলিনকোয়েন্সির লক্ষণ! এ প্রশ্নের উত্তর দিন কয়েক পরে পাই। কিন্তু থাক। যথাকালে।

স্যাডলার্স ওয়েলস থিয়েটার বহুদিন থেকে অপেরা গৃহে পরিণত হয়েছে। সেদিন সেখানে ছিল রসিনির 'কাউন্ট ওরি'। রসিনির যেসব অপেরা সর্বত্র অভিনীত হয় এটি তার অন্যতম নয়। রাশি রাশি অপেরা লিখে জনপ্রিয়তার ও খ্যাতির মধ্যগগনে উপনীত হয়ে বছর সাঁইত্রিশ বয়সেই তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষান্তি দেন। বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, সহজ প্রেরণার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। গায়ের জোরে এগিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা তার আয়েসী স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর এই সৃষ্টি ১৮২৮ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তখন তিনি বিদায়ের প্রান্তে। পরের বছর 'উইলিয়াম টেল'

তাঁকে শীর্ষদেশে নিয়ে যায়। সেইখানেই তাঁর প্রথম জীবনের ইতি। দ্বিতীয় জীবনও সমান দীর্ঘ। কিন্তু সেটা যেন নির্জনবাস।

বহু পরিশীলনের পর তাঁর হাত ও মন পেকেছে, কিন্তু বিষয়বস্তু ফুরিয়ে এসেছে। যা হয় একটা কিছু অবলম্বন করে সেই সূত্রে গানগুলোকে ঝুলিয়ে দিতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় কৌতূহল জাগিয়ে রাখতে হয়। মধ্যযুগে ক্রুসেডে যোগ দিয়ে বিদেশে লড়তে গেছেন সদলবলে এক কাস্‌লের মালিক। তাঁর ফিরতে পাঁচ বছর দেরি হচ্ছে। তাঁর পত্নী কাউন্টেস ও অন্যান্য পুরনারী দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য পালন করছেন। কাউন্টেস তো অমনি করে অসুখ বাধিয়ে বসেছেন। এমন সময় কাস্‌লের বাইরে একদল সাধুর আবির্ভাব। সাধুদের শিরোমণি কাউন্টেসকে বোঝান যে, অসুখের মকরধ্বজ হলো সাধুর সঙ্গে সম্ভোগ। কাস্‌লের দ্বার খুলে দিলে অন্যান্য সাধুরাও প্রবেশ করতেন ও অন্যান্য সাধ্বীদেরও বিরহব্যাধি সারাতে উদ্যত হতেন। এই তো পরিস্থিতি। এখন সাধুদের হাত থেকে সাধ্বীদের পরিত্রাণ করে কে?

ওদিকে কাউন্ট ওরি বলে এক উচ্ছৃঙ্খল জমিদার কুমারের গৃহশিক্ষক তাকে ও তার ইয়ারদের খুঁজতে খুঁজতে এই কাস্‌লের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। তখন ধরা পড়ে যায় যে, ওরা ছদ্মবেশী লম্পট। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে চম্পট। সতীরা সেযাত্রা রক্ষা পান। কিছুদিন বাদে হঠাৎ ঝড় ওঠে। ঝড়ের রাতে আশ্রয়ের জন্যে কাস্‌লের কপাটের সামনে এসে কাতর প্রার্থনা জানায় একদল তীর্থযাত্রিণী সন্ন্যাসিনী। দয়াময়ী কাউন্টেস তাদের ভিতরে ঢুকতে দেন। দেখা গেল ওরা কাস্‌লের ভাঁড়ার থেকে চুরি করে মদ আনিয়ে নিয়ে হৈ হল্লা করছে। এবার গৃহশিক্ষক নয় এবার অনুচর কাউন্টেসকে সাবধান করে দেয় যে, ওরা সেই লম্পট সম্প্রদায়। অন্ধকারে ওদের নেতা ওরি কাউন্টেস ভ্রমে নিজের অনুচরকেই প্রেম নিবেদন করতে যাচ্ছে এমন সময় ক্রুসেডারদের প্রত্যাবর্তন ও ছদ্মবেশীদের অন্তর্ধান।

ছাই প্লট। কিন্তু খাসা সঙ্গীত। দারুণ ফুর্তির সঙ্গে গাওয়া সে সব গান ও সেই সঙ্গে প্রাণ মাতানো বাজনার সঙ্গত কানকে তৃপ্ত করে। আর চোখের তৃপ্তি নিয়ে আসে জমকালো সাজপোশাক ও সুদর্শন অভিনেতা-অভিনেত্রী। আগেকার দিনের মতো দৃশ্যপট নয়। মালমশলা দিয়ে স্টেজের উপর কেল্লা তৈরি করা হয়েছে দেখা যায়।

রসিনি ছিলেন রসিক পুরুষ। আমোদ করে গান বাঁধতেন, কষ্ট করে নয়। উতরেও যেত তাঁর বরাতগুণে। যাকে বলে স্বভাবকবি। কিন্তু অপেরা তো কেবল গানের ঝারি নয়, অপেরা হচ্ছে নাটক। কেবল নাটকীয় পরিস্থিতিপরম্পরা নয়, নিয়তিচালিত কার্যকারণ শৃঙ্খলা ও তার অমোঘতা। রসিনিসৃষ্ট অপেরাকে বলা হয় 'অপেরা বুফা'। গান জানা থাকলে কণ্ঠে লেগে থাকে, ইটালীর আদালতেও নাকি লোকে গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে। কিন্তু অপেরা জগতের ত্রয়ী হলেন মোজার্ট, ভাগনার ও ভের্দি। রসিনি তাঁদের একজন নন। আর এই 'কাউন্ট ওরি' তাঁর অন্যতম প্রধান রচনাও নয়। তবু সব রকম রুচির জন্যে সরবরাহ করতে হয়। নইলে সব রকম লোক আসবে কেন? প্রযোজনা আজকাল এত বেশী ব্যয়সাপেক্ষ যে, অধিক সংখ্যক লোক যেটা অধিকবার দেখতে আসবে সেটার দিকে নজর রাখতে হয়। তবে স্যাডলার্স ওয়েলস তো প্রাইভেট ব্যবসা নয়। এটা একটা পাবলিক ট্রাস্ট। জাতীয় নাট্যশালার কাছাকাছি জাতীয় অপেরা গৃহ নির্মাণ করা হবে নদীর দক্ষিণ পারে। তখন স্যাডলার্স ওয়েলস সেখানে স্থানান্তরিত হবে শুনছি।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

পরের দিন পথ চলতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এমন কিছু নয়। লণ্ডনের পদাতিকরা এর জন্যে প্রত্যহ প্রস্তুত। আর বৃষ্টিও তাদের মান রাখে। পোশাক ছাড়বার মতো করে ভেজায় না। দিলে আমার কী দশা হতো সেদিন? ভিজে কাকের মতো চেহারা নিয়ে কি সুপ্রসিদ্ধ অ্যাথেনীয়ান ক্লাবে ঢোকা যায়, না জর্জ বুকানানের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে বসা যায়?

একদা স্যার ওয়াল্টার স্কট ছিলেন এই ক্লাবের সদস্য। সেকালের বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিকের এই ছিল প্রধান আড্ডা। এর পরে আরো দুটো নামকরা সাহিত্যিক আড্ডার পত্তন হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। স্যাভিল ক্লাব ও স্যাভেজ ক্লাব। এ তিনটি এখনো বিদ্যমান। তবে এসব এখন বড়লোকী ব্যাপার। ক'জন সাহিত্যিকের সাধ্যে কুলয়? যদিও সাহিত্যিকরা কেউ না খেতে পেয়ে মরছেন না তবু বর্ধনশীল স্বাচ্ছন্দ্যের মান রক্ষা করে জীবনধারণ করা আগের চেয়ে অনেক বেশী ব্যয়সাপেক্ষ হয়েছে। শুধু সাহিত্যসৃষ্টি করে আজকাল সংসার চলে না। যাঁদের চলে তাঁরা ব্যতিক্রম। দুই মহাযুদ্ধের পূর্বে বহু সাহিত্যিকের ছিল পৈত্রিক ধন বা প্রাইভেট ইনকাম। দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানেও বই থেকে আয় না হলে সম্পত্তির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করে ভদ্রতা বজায় রাখা যেত।

গ্রেট ব্রিটেনের সাহিত্যিক বা লেখক সংখ্যা এখন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার হবে। কিন্তু সাহিত্যকে বা লেখাকে যাঁরা জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের সংখ্যা হাজার ছয়েকের বেশী নয়। এঁদের মধ্যে হাজার চারেকের মাসিক আয় গড়ে সাড়ে পাঁচ শ' টাকার মতো। যে দেশের জাতীয় আয় গড়পড়তা মাথাপিছু মাসিক ন'শ টাকার উপরে সে দেশে লেখকবৃত্তি স্পষ্টই লাভজনক নয়। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে পড়ে আরো পাঁচ রকম কাজ। খবরের কাগজের জন্যে লেখা, রেডিওর জন্যে লেখা, টেলিভিশনের জন্যে লেখা, রেডিওতে বা টেলিভিশনে বলা, ইত্যাদি। শুধুমাত্র বই লেখাই যাঁদের পেশা তাঁদের আয় আরো কম, সুতরাং সংখ্যা মুষ্টিমেয়। গড়পড়তার কথা বাদ দিলে সারা গ্রেট ব্রিটেনে এমন লেখক অল্পই আছেন যাঁদের উপার্জন বছরে বিশ হাজার টাকার বেশী। তাঁদের মধ্যে যাঁরা কেবলমাত্র গ্রন্থকার তাঁদের সংখ্যা বিশজনের বেশী কি না সন্দেহ। এটা অবশ্য অনন্যকর্মাদের তালিকা। যাঁরা জীবিকার জন্যে আর কিছু করেন ও সময় পেলে সাহিত্য-চর্চা করেন তাঁদের তার থেকেও আয় হয়।

তবে তাঁদের আবার অন্য সমস্যা। সব জিনিসের মতো সময়েরও দাম বেড়ে যাচ্ছে। ভালো করে লিখতে হলে যে পরিমাণ সময় লাগে সে পরিমাণ সময় তাঁরা পাচ্ছেন না। কর্মস্থলে যাতায়াত করতেই দম বেরিয়ে যায়। তুলনা করলে দেখা যায় যে, আগেকার দিনে লেখকদের অনেকের সময়ও বেশী ছিল, নীট আয়ও বেশী ছিল, স্বাধীনতাও বেশী ছিল, মর্যাদাও বেশী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যিকরা স্বাধীনভাবে লিখতেন, রাজা বা প্রজা কারো মনোরঞ্জনের উপর নির্ভর না করলেও তাঁদের বেশ চলত। বিদগ্ধমণ্ডলীতে এত খাতির তাঁদের। উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠকসংখ্যা হাজার হাজার বেড়ে যায়। বিদগ্ধ ও সাধারণ দুই শ্রেণীর কাছে সমান আদর ও সমান খাতির পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীতে সাধারণ পাঠকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, অথচ বিদগ্ধের সংখ্যা তেমন বাড়েনি। আর্থিক কারণে সাধারণ পাঠকের মুখ চেয়ে লিখতে হয়, ফলে বিদগ্ধমণ্ডলীকে অতৃপ্ত রাখতে হয়। বিদগ্ধরা পিছনে না থাকলে স্বাধীনভাবে লেখা আরো শক্ত হয়। সত্যিকারের

স্বাধীনতা না থাকলে মর্যাদা নেমে যায়। সাহিত্যিকদের প্রভাব পড়তির দিকে। বনস্পতিরা বিরল। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ।

অ্যাথিনীয়াম ক্লাবের এই ভবনটি ১৮৩০ সালে নির্মিত। ডেসিমাস বার্টনের কল্পনা। মনে হয় প্রাচীন গ্রীসের অ্যাথিনীয়ামের ভাবরূপ। সেযুগের ও সেদেশের অ্যাথিনীয়াম ছিল অ্যাথিনা দেবীর মন্দির। সেখানে কবি ও বিদ্বানরা মিলিত হয়ে যে যার রচনা পাঠ করতেন। ইংলণ্ডের অ্যাথিনীয়াম সোজাসুজি ক্লাবের ঐতিহ্য নিয়েছে, দেবমন্দিরের ঐতিহ্য নয়। পানাহারের পরিপাটি আয়োজন। ধূমধাম ও বিশ্রম্ভালাপের প্রশস্ত পরিবেশ। পেল মেল নামক বিখ্যাত বর্ত্মের উপর নিভৃত অবস্থান। শহরের কলকোলাহল শহরের মাঝখানের এই দ্বীপটিতে সামান্যই পৌঁছয়।

মেনুতে ফেস্যাণ্ট পাখির মাংস দেখে দুঃখ বোধ করি। নিমন্ত্রণকর্তা পীড়াপীড়ি করেন, 'এসেছেন এদেশে। এদেশের এই বিশেষ পদটি একবার আস্বাদন করবেন না?' কথাগুলি ঠিক মনে নেই। তবে ওব মর্ম এই যে, ফেস্যাণ্ট হচ্ছে এমন কিছু যেটা 'ইংলিশ'। যেদেশে যাই সে ফল খাই। প্রবাদবাক্য মান্য করে অতিথির কর্তব্য করি। 'না' বলতে চক্ষুলজ্জা। দেশে ফিরে এসে গল্প করছিলুম। একটি মার্কিন মেয়ে তা শুনে মর্মাহত হয়ে আমাকে ধিক্কার দেয়। 'ছি ছি! শিভালরি নেই আপনার! নিরীহ ফেস্যাণ্ট পাখি!' নিষাদ মনে করে আমাকে বাল্মীকির মতো অভিশাপ দেয় আর কী!

শনিবারের বিকেল। আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে এসেছে। ক্লাব থেকে আমাকে বগলদাবা করে নিয়ে যায় নিমাই আর হপন। পুত্রপ্রতিম। হপনের নিজের মোটর চড়ে প্রথমে যাই টেমস নদীর ধারে। পার্লামেণ্টের সংলগ্ন উদ্যানে ফরাসী ভাস্কর রোদ্যাঁ (Rodin) নির্মিত 'ক্যালে নগরীর ছয় মাতব্বর'। চর্তুদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড যখন এক বছর ধরে ক্যালে অবরোধ করেন তখন দুর্ভিক্ষের ও হিংসার হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্যে এই ছ'জন ত্যাগী পুরুষ আত্মসমর্পণ করেন। এঁদের প্রাণের বিনিময়ে ক্যালে মুক্তি পায়। দেশবিদেশের লোক এ কাহিনী ভোলেনি। কেউ এঁকেছেন, কেউ গড়েছেন। রোদ্যাঁর ছ'টি মূর্তির ছ'রকম মুখভাব ও অঙ্গভঙ্গী। গলায় ফাঁসির দড়ি, হাতে নগরদ্বারের চাবি। রোদ্যাঁর গড়া মূর্তি যেমন প্রাণময় তেমনি মনোময়। কিন্তু 'ছয় মাতব্বরে'র আসলটা ক্যালে শহরেই রয়েছে। আমি যেটা দেখছি সেটা তার নকল।

হপনের মোটর ঘুরে ফিরে যায় উত্তর পশ্চিম মুখে। প্রিমরোজ হিল চোখে পড়তেই আমি চমকে উঠি। চক ফার্ম আসতেই সতৃষ্ণ হই। হ্যাভারস্টক হিল দিয়ে তর তর করে উঠে যাই। ডান দিকে তাকিয়ে থাকি। এখনো আছে তো সেই রাস্তা? পার্কহিল রোড? আছে। আছে। বাঁচা গেল। যাই, দেখি, আছে কি না সেই বাড়ি। সরোজ ও তটিনী দাস যেখানে থাকতেন। হিরণ্ময় ও আমি যেখানে গিয়ে উঠি। ছত্রিশ বছর আগে। পুরো একটি বছর সেখানে কাটিয়েছি। হ্যাম্পস্টেড হীথের অদূরে।

এ কি সেই বাড়ি? এ কি সেই বাড়ি নয়? বার বার মনে মনে তোলাপাড়া করি। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারিনে। নম্বরটাও ঠিক মনে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নদ্রষ্টা পূর্বজন্মের প্রিয়ার মতো ঃ 'নাম দোঁহাকার দু'জনে ভাবিনু কত, মনে নাহি আর।'

খুঁজতে থাকি আমার তেইশ বছর বয়সের আমিকে। এ বাড়ির দোতালার সামনের দিকের ঘরে যাকে দেখা যেত জানালার ধারে বসে 'পথে প্রবাসে' লিখতে। এই পথ ধরে যে দিনে চার বার কি ছ'বার আনাগোনা করত। খুঁজতে থাকি আমাব চব্বিশ বছরের আমিকে। একদিন যে বিদায় নেয়, অন্যত্র ওঠে।

তারপর সেকালের চেনা সড়কগুলি দিয়ে মোটর চলে আর আমি ভাবাবেগে উদ্বেল হই। আছে, আছে। এখনো সেই সব সরণি আছে। শুধু নেই আমার পায়ের চিহ্ন। আমার কত কিছু মনে আছে। কিন্তু আমাকেই কারো মনে নেই। আমি কেবল ভিন্ দেশের নয়, আমি ভিন্ যুগের পান্থ।

নিমাই আর জয়ার সংসার দেখে ওদের সুখে সুখী হয়ে এর পর আমি একাই বেরিয়ে পড়ি সেকালের মতো নির্ভয়ে ও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ভরে। পাতালপথের ট্রেনে মনে হয় যেন সেদিন চড়েছি। চৌত্রিশ বছর যেন মায়া। ভারি ফুর্তি লাগে ছুটে ধরতে, উঠে বসতে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে, নেমে গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে হাঁটতে। সুড়ঙ্গ থেকে নিষ্ক্রমণ করে প্রাণভরে তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিই। আর আকাশের আলোয় দু'চোখ ভরি।

॥ আটত্রিশ ॥

ওয়াটারলু স্টেশন থেকে ওল্ড ভিক দেখতে পাওয়া যায়। এখন ওটা হয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটারের সাময়িক আস্তানা। ন্যাশনাল থিয়েটার নামক শতবর্ষের পুরাতন স্বপ্ন আপাতত ওল্ড ভিকের পুরাতন আধারে আভাসিত হচ্ছে। পরে ওর নিজস্ব আলয়ে রূপধারণ করবে। সরকার দশ লক্ষ পাউণ্ড দিয়েছেন। ন্যাশনাল থিয়েটার বোর্ড গঠিত হয়েছে। লরেন্স অলিভিয়ার হয়েছেন ডিরেক্টার। এই তো সবে সেদিন—মাত্র এগারো দিন আগে—শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' দিয়ে শুভ উদ্বোধন।

আজকের নাটক বার্নার্ড শ'র শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সেণ্ট জোন'। আগের বার এ বই আমার দেখা হয়নি। নামভূমিকায় সিবিল থর্নডাইককে আর দেখতে পাব না। সেই অসাধারণ মহিলাকে অবশ্য অন্যভাবে দেখেছি। জোনের ভূমিকার জোন প্লাউরাইট তত বড়ো না হলেও নাম কববার মতো অভিনেত্রী। এই দুরূহ ভূমিকার অভিনয় করা কি যার তার পক্ষে সম্ভব! পঞ্চদশ শতাব্দীর এই ঐতিহাসিক বিস্ময়কে সমসাময়িকরা সহ্য করতে পারেননি। পরবর্তীরা এক এক সময় এক একরকম ভেবেছেন, সেই অনুসারে নাটক লিখেছেন। শেক্সপীয়ার, ভলতেয়ার, শিলার প্রভৃতি ছোট বড়ো অনেক নাট্যকারের হাত দিয়ে জোন চরিত্রের বিবর্তন হয়েছে। ইতিমধ্যে বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা গেছে। ফলে জোন সম্বন্ধে ধারণা আরো পরিষ্কার হয়েছে। সব চেয়ে কৌতুকের কথা জোনকে যে চার্চ ধর্মদ্রোহী বলে ডাকিনী বলে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল সেই চার্চ অবশেষে তাঁকে সেণ্ট বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর স্থান এখন সেণ্ট পিটার, সেণ্ট পল প্রভৃতির সঙ্গে স্বর্গের সন্ত মণ্ডলীতে। পাঁচ শ' বছর পরে ১৯২০ সালে জোন সেণ্ট জোন হন। কৌতুকপ্রিয় শ তখন বহুদিনের অভীষ্ট বিষয়ে নাটক লিখে নাম রাখেন 'সেণ্ট জোন'। এ যা হয়েছে তা শুধু রোমান্স নয়, শুধু ট্র্যাজেডী নয়, অধিকন্তু কমেডী।

ফ্রান্সের তখন চরম দুর্দিন। পাগল রাজা মারা গেছেন। যুবরাজকে রাজা বলে মানতে চায় না জ্ঞাতিরা। তারাই দখল করে বসে আছে তাঁর রাজ্যের অধিকাংশ। একা নয়, ইংরেজদের সঙ্গে মিলে। ইংরেজদের রাজা হচ্ছেন পাগল রাজার দৌহিত্র। পাগলের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে ফ্রান্সের সিংহাসনটাও তাঁরই উত্তরাধিকার। ফ্রান্সের যুবরাজ নাকি বাপকা বেটা নন। বার বার যুদ্ধে হেরে বেচারির মনোবল ভেঙে গেছে। তাঁর পক্ষে যাঁরা লড়াই করছেন তাঁরা প্রতিকূল বাতাসের মুখে নদী

পার হতে পারছেন না। এমন সময় ফ্রান্সের ইতিহাসে জোন বলে একটি সতেরো বছর বয়সী কৃষক কন্যার আবির্ভাব। হঠাৎ হাওয়ার মোড় ফিরে যায়। আক্ষরিক অর্থে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তলোয়ার হাতে জোন আগে আগে চলেন, সৈনিকরা সেনাপতিরা তাঁর সাহস দেখে তাঁর কথা শুনে প্রেরণা পান। একটার পর একটা যুদ্ধে যুবরাজের জয় হয়, শত্রুরা হটে যায়।

ফ্রান্সের রাজাদের অভিষেক করা হতো যেখানে সেটা হলো র‍্যাঁ (Rheims) শহরের ক্যাথিড্রাল। সেখানে অভিষেক না হওয়া পর্যন্ত রাজাকে প্রকৃত রাজা বলে প্রজারা স্বীকার করত না। সেইজন্যে জোনের লক্ষ্য হলো র‍্যাঁ শহর দখল করে সেখানে রাজার ছেলের অভিষেক। একদিন এই অসাধ্য সাধন করেন সে কন্যা। যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি। প্যারিস তখনো শত্রুহস্তে। জোন চান আরো এগোতে। কিন্তু রাজার তাতে উৎসাহ নেই। দুর্বল ভীরু আয়েসী লোক। তিনি বরঞ্চ সন্ধি করবেন, সন্ধিসূত্রে যা পাবার পাবেন। এদিকে জোনের কথা হলো জোন ভগবানের বার্তা বহন করে এনেছেন, ভগবানের ইচ্ছায় অঘটন বার বার ঘটেছে, আবার ঘটবে। জোন কেন রাজার কথা শুনে ওইখানেই থামবেন? তিনি এগিয়ে যান। কিন্তু শত্রুর হাতে ধরা পড়েন। বন্দী হন। রাজার জ্ঞাতিশত্রুরা ওঁকে ইংরেজদের কাছে বিক্রী করে মোটা টাকা পায়।

ইচ্ছা করলে রাজা ওঁকে পণ দিয়ে মুক্ত করতে পারতেন। করেন না বোধহয় অর্থাভাবে। ইংরেজরা ইচ্ছা করলে ওঁকে নিজেরাই বধ করতে পারত। করে না। বোধহয় বদনামের ভয়ে। চার্চের হাতে দিয়ে বিচার করতে বলে। পিছন থেকে বিচারকের উপর চাপ দেয়। যাতে চরম শাস্তি হয়। পুরুষের বেশ পরে সৈনিকদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা, ওদেরি সঙ্গে রাত কাটানো, এটা তো ভালো মেয়ের লক্ষণ নয়। এ মেয়ে কি শুদ্ধ? মন্ত্রবলে বাতাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া, আরো কত অঘটন ঘটানো, এ কি কখনো শয়তানের সঙ্গে চুক্তি না করে হয়? এ মেয়ে মায়াবিনী ডাকিনী নয় তো? ভগবানের আদেশ সন্তদের মুখে স্বকর্ণে শুনেছে বলে দাবী করা, পয়গম্বরের মতো ভগবানের বার্তা বহন করে এনেছে বলে ঘোষণা করা, চার্চকে ডিঙিয়ে সরাসরি ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক জাহির করা, এসব কি আস্পর্ধা নয়, ধর্মদ্রোহ নয়? এমনি অনেকগুলি অপরাধে জোনের বিচার হয়। ন্যায়াধীশ একজন ফরাসী বিশপ। কুশোঁ তাঁর নাম। তাঁর সঙ্গে বহু শিক্ষিত ধর্মযাজক ছিলেন। তখনকার দিনে এসব অপরাধের—বিশেষ করে ধর্মদ্রোহের—শাস্তি মৃত্যু। চার্চ তো রক্তপাত করবে না। তাই এমন মৃত্যু দেওয়া হতো যাতে রক্ত না পড়ে। আত্মা বাঁচত, দেহ পুড়ত। জোন প্রথমে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অপরাধ মেনে নেন। কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করার চেয়ে মরণ শ্রেয় ভেবে তাঁর স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেন। তখন দেওয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। এর পিছনে ইংরেজ রাজপারিষদ ওয়ারউইকের হাত ছিল। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। হোক না সে অবলা।

পঁচিশ বছর পরে চার্চের উপরওয়ালারা বিশপের রায় উলটিয়ে দেন। ঘোষণা করেন যে জোন নির্দোষ। ততদিনে রাজা তাঁর রাজ্য ফিরে পেয়েছেন। বিশপ মারা গেছেন। কুশোঁর দেহাবশেষ কবর খুঁড়ে বার করে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। জোনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিনে দিনে বাড়ে। ফ্রান্সের লোকের চোখে জোন শুধু বীরাঙ্গনা নন, সত্যিকার সেণ্ট। এবার জবাবদিহির দায় ইংরেজদের। ক্রমে ইংরেজদেরও অন্তঃপরিবর্তন হয়। তা বলে জোনকে সেণ্ট বলে স্বীকার করতে ওদের বাধে। ইতিমধ্যে জাতকে জাত প্রোটেস্টাণ্ট হয়েছে। প্রোটেস্টাণ্ট না হলে শেক্সপীয়ার অমন করে জোনের মানহানি করতেন না। ইংরেজী সাহিত্যে জোনকে সম্মানিত করার প্রয়োজন বার্নার্ড শ বহুদিন থেকে অনুভব করেছিলেন। পরে একখানি চিঠিতে এই কথা লিখেছিলেন—

'I am, like all educated persons, intensely interested and to some extent conscience-stricken, by the great historical case of Joan of Arc. I know that many others

share that interest and that compunction, and that they would eagerly take some trouble to have it made clear to them how it all happened. I conceive such a demonstration to be an act of justice for which the spirit of Joan, yet incarnate among us, is still calling.'

ইংরেজরা এতদিন অন্যায়ের দায়টা নিজেদের কাঁধ থেকে ক্যাথলিক চার্চের কাঁধে তুলে দিয়ে সান্ত্বনা বোধ করছিল। শ আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে ক্যাথলিক চার্চকেও অব্যাহতি দিয়েছেন। শ'র সিদ্ধান্ত হচ্ছে জোন ছিলেন প্রোটেস্টান্ট আন্দোলন শুরু হবার পূবের্কার অন্যতম প্রচ্ছন্ন প্রোটেস্টান্ট। ব্যক্তিগত বিবেককে, স্বাধীন চিন্তাকে, ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ককে, প্রাইভেট বিচারকে তিনি চার্চের নির্দেশের ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন। পরবর্তী যুগের লুথার প্রমুখ প্রোটেস্টান্টদের মতো। যে শক্তি শতবর্ষ পরে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে দ্বিখণ্ডিত করবে জোন ছিলেন সেই শক্তির অন্যতম অগ্রদূত। কুশোঁর সাধ্য কী যে তাঁকে নিরপরাধ বলে খালাস দেন! সেকালের চার্চের নিয়মকানুন ও নীতির দিক থেকে বিচার না করে কি তাঁর উপায় ছিল? তেমনি ওয়ারউইক ছিলেন সেকালের ফিউডাল সিস্টেমের ধারক। যে শক্তি ফিউডালিজমকে পরবর্তী কালে চূর্ণবিচূর্ণ করবে জোন ছিলেন সে শক্তিরও অন্যতম অগ্রদূত। সাধারণ সৈনিক থেকে আরম্ভ করে রাজা ও রাজসেনাপতি পর্যন্ত সব শ্রেণীর লোকের সঙ্গে তাঁর সমান ব্যবহার। সৈনিকের কাজ করতেন বলে তিনি পুরুষের সাজ পরতেন। একালের মেয়েরাও তো তাই করছে। সেদিক থেকেও তিনি ছিলেন অগ্রপথিক। এমন মানুষকে সহ্য করত কে! শাস্তি দিতই। অথচ শাস্তিটা যে অন্যায় শাস্তি সেটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দুঃখের বিষয় অগ্নিপরীক্ষা না করে সীতাকে কেউ সতী বলে স্বীকার করত না। তেমনি বিষপান না করিয়ে সোক্রেটিসকে কেউ সত্যনিষ্ঠ বলে মেনে নিত না। তেমনি ক্রুশে বিদ্ধ না করে যীশুকে কেউ প্রেমময় বলে চিনত না। তেমনি ধর্মদ্রোহী ও ডাকিনী বলে দাহ না করে জোনকে কেউ সেন্ট বলে গণত না। জোন যদি আবার আসেন তা হলে আবার তাঁর ওই দশা হবে, আগুনে পুড়ে নয়, অন্য কোনো ভাবে। একালের ধর্মগুলো, মতবাদগুলো, তেমনি অসহিষ্ণু। এইখানেই শ'র উপসংহারের কারুণ্য তথা কৌতুক। মানুষের স্বভাব বদলায়নি। একই ট্র্যাজেডী বার বার অভিনীত হয়ে চলেছে। ট্র্যাজেডীর পরে কমেডী। ডাকিনীর থেকে দেবী। এ কাহিনীর প্রথমে কিন্তু রোমান্স। পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদা।

একাধারে রোমান্স, ট্র্যাজেডী ও কমেডীর নায়িকা জোনের ভূমিকায় অভিনয় করা কম কুশলতার পরিচায়ক নয়। জোন প্লাউরাইট একটুও মঞ্চসচেতন নন। নারীত্বসচেতন নন। শ যেমনটি চেয়েছিলেন। জোন যে অক্ষত ছিল এটা তার নারীত্ব অচেতনতার জন্যে। ফরাসীদের চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি, অর্জুনকেও আকর্ষণ করেনি। শ তাকে রোমান্টিক হিরোইন করতে চাননি। অথচ তাকে ট্র্যাজিক হিরোইনের মতোও লাগে না। আবার কমেডীর হিরোইনের মতো না। তা হ'লে কি সেন্টের মতো লাগে? না, তাও নয়। শ'র এই সৃষ্টি পুরুষও নয়, নারীও নয়, একে বলা যেতে পারে এঞ্জেল কিংবা বোধিসত্ত্ব।

শ'র পরেও জোন সম্বন্ধে নাটক আরো কয়েকখানি লেখা হয়েছে। এ কাজে হাত দিয়েছেন ব্রেখ্‌ট, আনুইল, ম্যাক্সওয়েল অ্যাণ্ডারসন। মনে হয় না যে এ ধারা কোনো দিন শুকোবে। জোনভক্তদের চোখের জল যেমন কোনো দিন শুকোবার নয়। ওই হৃদয়বিদারক মৃত্যুর জন্যে ব্যক্তিকে দায়ী না করে শক্তিকে দায়ী করলেই কি বেদনার অবসান হবে? না মানুষের স্বভাবকে দায়ী করলে মানুষ তার স্বভাব শোধরাবে? ওটা না ঘটলেই ভালো হ্‌তো, কিন্তু ঘটেছে যখন তখন

সীতার পাতালপ্রবেশের মতো যুগ যুগ ধরে কাঁদাবে। জোনকে সেন্ট আখ্যা দিয়ে চার্চ তার দিক থেকে ক্ষতিপূরণ করেছে। ইংরেজদের দিক থেকে ক্ষতিপূরণ তো বার্নার্ড শ'র এই নাটক। ইংলণ্ডের মুখরক্ষা করেছে জোনের অন্তিম মুহূর্তে সহৃদয় একটি নামহীন ইংরেজ সৈনিকের সৎকাজ। উপসংহারে ওয়ারউইকের ও চ্যাপলিনের অন্তঃপরিবর্তন লক্ষ করবার মতো। কিন্তু সব ক্ষতিপূরণের উর্ধ্বে সেই দৃশ্য যাকে নাট্যকার মঞ্চের উপর অভিনীত হতে দেননি। যা আমাদের কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাকে ক্ষমা করা সম্ভব, কিন্তু ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আরো নাটক লেখা হবে। আরো কতরকম দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

প্রযোজনা ও মঞ্চসজ্জা একান্ত আধুনিক। স্টেজের উপরে কেল্লা তৈরি করতে হয়েছে। পাত্রপাত্রী উপরে নিচে ওঠানামা করছে। স্বপ্নের দৃশ্যও বাস্তবধর্মী। ভাগ্যিস শ তাঁর নাটকে খোঁটাতে বেঁধে আগুনে দগ্ধ করার দৃশ্য আঁকেননি। আঁকলে সেটাও হয়তো এঁরা প্রদর্শন করতেন। অবশ্য লর্ড চেম্বারলেনের অনুমতি নিয়ে।

ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে আর্টস কাউন্সিল। এই সংস্থা দেখছি কেবল চিত্রকলায় নয় নাট্যকলায়ও আগ্রহী। আগেকার দিনে এর অস্তিত্ব ছিল না। অন্তত আমার তো মনে পড়ে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

॥ উনচল্লিশ ॥

যেখানে উঠেছি সেখান থেকে পা বাড়ালেই হাইড পার্ক। রবিবার সকালে আকাশভরা আলো দেখে আমরা সেই সবুজ আঁচলপাতা তেপান্তরের মাঠে কদম কদম এগিয়ে যাই। বিশ্বনাথবাবু ও আমি। চলতে চলতে সার্পেন্টাইনের ধারে গিয়ে পৌঁছই। যেখানে একদা নৌকা ভাড়া করে একাই দাঁড় বেয়ে কসরৎ করেছি। থাক, তার পুনরাবৃত্তি করে কাজ নেই। এ বয়সে সেটা অক্লেশকর হবে না।

এ সময় লেকের ধারে কাছে লোকজন বেশী দেখা যায় না। মাসটা নভেম্বর। বেলাটা সকাল। হতো যদি বসন্ত কি গ্রীষ্ম, সন্ধ্যা কি একপ্রহর রাত তা হলে—হুঁ! বিশ্বনাথবাবু আমাকে বাঙাল মনে করে হাইকোর্ট দেখান। ব্যাপকভাবে যুগললীলার সমাচার শোনান। বলেন, 'সে সময় এলে এ পথ দিয়ে হাঁটতে পারতেন না।'

কে না জানে যে লণ্ডনের বৃন্দাবনের রাসপূর্ণিমা নভেম্বর মাসে নয়। তবু শুনে মনে হলো গোপগোপী সমাগম আগেকার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা সমৃদ্ধির লক্ষণ। অবসর আর বিত্ত আর স্বাধীনতা আর স্বাস্থ্য যদি কল্যাণব্রত রাষ্ট্রের কল্যাণে বেড়ে গিয়ে থাকে তবে জীবনের ঐদিকটাও সেই বাড়তির সঙ্গে পাল্লা রেখে বেড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অটোমেটিকের যেমন অভূতপূর্ব উন্নতি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে অনুমান করলে অন্যায় হবে কি যে দৈনন্দিন কাজকর্ম যন্ত্রই চালাবে, মানুষকে বড়জোর দিনে একঘণ্টা যন্ত্রের পরিচর্যা করতে হবে? তা হলে মানুষ এ জীবন নিয়ে করবে কী? আহার, পান ও হাইড পার্ক?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও শুনতে পাচ্ছি যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা আজকাল সহজেই চাকরি পেয়ে যায়, তাই চটপট বিয়ে করে ফেলে। জার্মানীতেও তাই। আরো বেশী ছেলেমেয়ে বিয়ে থা করে সংসারী হতো, যদি সংসার পাতার জন্যে আলাদা ফ্ল্যাট জুটত। অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি আর সব

যোগাতে পেরেছে, কিন্তু ওটি যোগাতে পারেনি। গৃহসমস্যা বোধ হয় আরো কঠিন হয়েছে। বাড়িভাড়া অসম্ভব বেড়েছে। বিয়ে যদি করতে না পারল তবে কি কোর্টশিপ করতে করতেই বুড়ো হয়ে যাবে? তা হলে যৌবন ভোগ করবে কবে ও কোনখানে? কেন, সন্ধ্যার পরে ও হাইড পার্কে। দুঃখের বিষয় অবৈধ সন্তানের সংখ্যাও অসম্ভব বেড়েছে। যেমন জার্মানীতে তেমনি ইংলণ্ডে।

হাইড পার্ক কর্নার থেকে বাস ধরে ট্রাফলগার স্কোয়ারে যাই। সব ঠিক আছে। মোটের উপর মনে হয় লণ্ডন সেই লণ্ডন। মহাযুদ্ধ তার মহাক্ষতি করেনি। তার পরিবর্তন তাই জার্মানীর বড়ো বড়ো শহরের তুলনায় বিপুল নয়। যুদ্ধ না বাধলেও কতকগুলো পরিবর্তন কালক্রমে হতোই। জমির দাম বাড়তোই, অগত্যা পাঁচতলা বাড়ি ভেঙে পনেরো তলা ম্যানসন গড়তে হতোই। দেখতে দেখতে স্কাইলাইন বদলে যেতোই। তবে যুদ্ধ বাধলে যে পরিমাণ জীর্ণসংস্কার হয় শান্তি থাকলে সে পরিমাণ হয় না। প্রাচীনকে শীতল রক্তে ধ্বংস করতে হাত ওঠে না। মায়া লাগে। যুদ্ধের প্রয়োজন নির্মম। সে যেন এক ভূমিকম্প। কে কাকে নিবৃত্ত করবে! উভয় পক্ষই একই সর্বনাশে প্রবৃত্ত।

যেটা কালক্রমে সর্বত্র ঘটছে—কলকাতায় বম্বেতে দিল্লীতে—সেটাকে আমি তেমন গুরুত্ব দিইনে। কিন্তু গুরুতর একটা পরিবর্তন যার চোখ আছে তার চোখে পড়বেই। সেই যে বাস সেটাতে আরো একজন কালো মানুষ ছিল। যাত্রী নয়। কণ্ডাক্টর। এ কী! আমরা কি তা হলে ভারতবর্ষে! না, লোকটি ভারতীয় নয়। সম্ভবত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান। আজকাল এদেশে কালো মানুষের লেখাজোখা নেই। যেতে যেতে দেখি—'মুর্শিদাবাদ গ্রিল'। শোনা গেল লণ্ডনে এরকম ভোজনাগার চার শ' কি পাঁচ শ'। আমাদের সময় ছিল চারটি কি পাঁচটি।

কালা আদমির সংখ্যা যত বেড়েছে বাসা সেই অনুপাতে বাড়েনি। এ কারণে ও অন্যান্য কারণে গোরাদের মন মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। অথচ কালাদের একেবারে বাদ দিলেও ইংলণ্ডের চলবে না। অত কম মজুরিতে আর কেউ অত বেশী মেহনৎ করবে না। ইংরেজরা তো আরো বেশী রোজগারের লোভে দেশ ছেড়ে আমেরিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ঘরকন্না পেতে বসছে। ব্রিটেন যদি কমন মার্কেটে যোগ দেয় তা হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের বদলে ইটালিয়ানদের দিয়ে চারদিকে ছেয়ে যাবে। ওরাও যে ধবধবে সাদা তা তো নয়। ওরাও অল্পসংখ্যক বাসায় অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গাদাগাদি করে বাস করবে ও পরিবেশ নোংরা করবে। মজুরি না বাড়ালে, যথেষ্ট জায়গা না যোগালে, মনুষ্যোচিত আমেনিটি না দিলে ওরাও কষ্ট পাবে ও কষ্ট দেবে। তখন বর্ণবিরাগ গেলেও ভাষাবিরাগ দেখা দেবে।

ইংলণ্ডের হয়েছে উভয়সংকট। নিজেরি গরজে বাইরে থেকে শ্রমিক নিতে হচ্ছে। নইলে ঘরে শ্রমিকদের খাটুনি বাড়িয়ে দিয়ে মজুরি কমিয়ে দিয়ে বিপ্লব ডেকে আনতে হয়। অথচ অতগুলি বিদেশীকে বিধর্মীকে বিভাষীকে আত্মসাৎ করাও সহজ নয়। ওরাও যদি ইংরেজ বনে যায় তো ওরাও মজুরি বাড়ানোর জন্যে ধর্মঘট করবে। মিশ্রণের আতঙ্ক তো আছেই।

শহরতলী হেণ্ডনে বিনয় রায়ের ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। সম্পূর্ণ বাঙালী মতে। গৃহকর্ত্রীর শ্রীহস্তের রান্না। ইংরেজ বনে যাবার পথে প্রবল অন্তরায়। 'সাহেব সেজেছি সবাই'য়ের যুগ গেছে। তবে দীর্ঘকালের পরিচয়ের ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের একটা গভীরতর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেটা রাজনৈতিক সম্পর্কনিরপেক্ষ। একদিন হয়তো কমনওয়েলথের বন্ধন ক্ষয় হবে। তা বলে অন্তরের সংযোগসূত্র ছিন্ন হবে না। ভুল বোঝাবুঝি মাঝে মাঝে ঘটবে। দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতি এক নয়। ওরা যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আর আমরা নিরপেক্ষ থাকি তা হলে মনোমালিন্য চরমে উঠবে। ওরা বলবে, তোমরা আমাদের কিসের বন্ধু? আমরা বলব, বন্ধু

বলেই আমরা তোমাদের শত্রুশিবিরে নেই। আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করি যে একদিন একটা পরীক্ষালগ্ন উপস্থিত হবে। আমাদের ওরা দলে টানতে চাইবে। আমরা হাত ছাড়িয়ে নেব। সেদিন প্রমাণ করা শক্ত হবে যে আমরা সত্যি ওদের ভালোবাসি, ওদের ভালো চাই। সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমি জানি যে আমাদের সঙ্কটে ওদের ডাক দিলে ওরা আসবে না। বড়জোর কিছু সাহায্য পাঠাবে।

যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের মূলগত মতভেদ আছে। ওটা ওরাও ভুলতে পারবে না, আমরাও ভুলতে দেব না। আসলে ওইটেই হলো স্বাধীনতার কষ্টিপাথর। ভারত যে স্বাধীন ওই তার প্রমাণ। ওটা বাদ দিলে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সত্যিকার বিরোধ খুব বেশী নেই। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর আধারে ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে সোশিয়ালিজমের বোঝাপড়া ওদের ও আমাদের উভয়েরই সর্বপ্রধান ভাবনা। এই এক ভাবনা উভয়কে আরো কাছাকাছি করছে। এ বন্ধুতা যদি টেকে তবে এই ভাবনার সাম্যের জন্যেই টিকবে। শ্রেণীসংঘর্ষ ওরাও চায় না, আমরাও চাইনে। অথচ সোশিয়াল জাস্‌টিস কি তেমনি জিনিস যে চাইলেই মেলে? শ্রমিক দল এখনো বিশ্বাস করে যে অধিকাংশের ভোটে পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ইস্পাত শিল্প রাষ্ট্রসাৎ করতে পারা যায়। একবার তো ভোটের জোরে রাষ্ট্রসাৎ হয়েওছিল। কিন্তু পরে রক্ষণশীলদের হাতে ক্ষমতা আসায় তারাও তেমনি ভোটের জোরেই সেটা উলটিয়ে দেয়। পরে শ্রমিক দল আবার রাষ্ট্রসাৎ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তেমনি রক্ষণশীল দল সেটা উলটিয়ে দিতে দৃঢ়সংকল্প। পার্লামেণ্টারি খেলা যদি বার বার অমীমাংসিত থেকে যায় তা হলে শ্রমিক দল কি একদিন 'ধুত্তোর' বলে ও খেলায় ইস্তফা দেবে না? তা হলে দেখা যাচ্ছে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে মীমাংসার উপর। ও পদ্ধতি ইংলণ্ডে অকর্মণ্য হলে ভারতেও ওর প্রেস্টিজ হারাবে।

কে যেন পরিহাস ছলে শিখিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পুরুষকে নারী বানাতে পারে না, নারীকে পুরুষ বানাতে পারে না, ওছাড়া আর সবকিছু পারে। তা যদি সত্য হয় তবে একদিন ইস্পাত শিল্পকেও রাষ্ট্রের সম্পত্তি বানাবে ও সেটা পরে রদ করা চলবে না। তার মানে শ্রমিক দলের এই জীবনমরণ প্রশ্নটা রক্ষণশীলদের অন্তর স্পর্শ করবে। ওরাও মর্মে মর্মে বুঝবে যে সামাজিক ন্যায়ের অনুরোধে ইস্পাতের মতো শিল্প রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়াই শ্রেয়। ইতিহাস অবশ্য সেইখানেই থামবে না। একদিন ব্যাঙ্কের উপরও হাত পড়বে।

তার দেরি আছে। ইতিমধ্যে ম্যাকমিলান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় রক্ষণশীল নেতাদের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি বেধে গেছে। প্রধানমন্ত্রী হবেন কে? সকলের মুখে এই এক প্রশ্ন। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো যে যার প্রিয় ঘোড়ার নামে বাজি রাখছে। এমন সময় শোনা গেল যার নাম কারো মাথায় আসেনি রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে অনেক মাথা খাটিয়ে বুড়ো ম্যাকমিলান তাঁরই নামটি পেশ করেছেন। যদিও আইনে কোনো বাধা নেই তবু এটা একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী যিনি হবেন তাঁর কমন্স সভার সদস্য হওয়া চাই। আর এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত এটাও একটা নিয়ম ছিল যে লর্ড সভার সদস্য হবার যোগ্য যাঁরা তাঁরা পদবী ত্যাগ করে কমন্স সভায় বসবার জন্যে নির্বাচিত হতে পারবেন না। আশ্চর্য ইংলণ্ডের অঘটনপটীয়সী রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা। চোদ্দ পুরুষের আর্ল যিনি তিনি রক্ষণশীল দলের ঐক্য রক্ষার জন্যে আর্লডম ত্যাগ করলেন। এখন থেকে তাঁর নাম হলো সার অ্যালেক ডগলাস-হিউম। নাম পালটিয়ে কমনারকে লর্ড হতে দেখা গেছে, কিন্তু এই দ্বিতীয়বার লর্ডকে কমনার হতে দেখা গেল। কমন্স সভা কী জয়!

এরূপ অঘটনপটীয়সী যাদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিভা আর নব নব উন্মেষশালিনী যাদের বুদ্ধি তাদের এক পক্ষ সত্যি কোনো দিন সামান্য ইস্পাত বা ব্যাঙ্কের জন্যে পার্লামেণ্টারি খেলায় অপর পক্ষকে চালমাৎ করে অন্যপন্থা ধরতে বাধ্য করবে এটা বিশ্বাস হয় না। তবে কিছুই বলা যায় না।

জাতীয় স্বার্থে সব ইংরেজ এক। কিন্তু শ্রেণীস্বার্থে সব ইংরেজ এক নয়। গণতন্ত্রে সব ইংরেজ আস্থাবান। কিন্তু সামাজিক ন্যায়ের ধারণা ও প্রয়োগের বেলা সব ইংরেজ এক নয়। অবস্থার উন্নতি হওয়া ও ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া কি একই জিনিস? অবস্থার উন্নতি হয়েছে, সেটা প্রত্যক্ষ। কিন্তু ব্যবস্থার পাকাপাকি রদবদল হয়নি। বরং ধনিক ও শ্রমিক যে যার ঘাঁটি শক্ত করেছে। ভারসাম্য বা শক্তিসাম্য থেকে একপ্রকার সমঝোতা এসেছে। কিন্তু সেইটেকেই সামাজিক ন্যায় বলে মেনে নিতে শ্রমিক পক্ষ রাজী হবে না। সামনের নির্বাচনে জয় লাভ না করলে বার বার তিনবার পরাজয়ের পর তার মাজা ভেঙে যাবে বা মাথা বিগড়ে যাবে। একটানা সতেরো আঠারো বছর ধৈর্য ধারণ করবে কে, যদি আশার আমেজ না দেখে? তখন ধর্মঘটই হবে দৈনন্দিন ঘটনা।

॥ চল্লিশ ॥

দ্বন্দ্বের জগৎ থেকে ছন্দের জগতে যাই। রয়াল ফেস্টিভাল হলে বসে স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত স্কটিশ ন্যাশনাল অর্কেস্ট্রার সৃষ্ট সঙ্গীতলোকে বিহার করি। সেদিনকার প্রোগ্রামে বেঠোভেনের একটি পিয়ানো কনচের্তো ছিল। সোলোইস্ট অ্যাবি সাইমন। আর ছিল সিবিলিউসের একটি সিম্ফোনি, শোস্টাকোভিচের ফেস্টিভাল ওভারচার ও মাসগ্রেভের সিনফোনিয়া। এটি এই প্রথম লণ্ডনে শোনানো হচ্ছে। সব কটির কণ্ডাক্টর অ্যালেকজাণ্ডার গিবসন। যেমন বিশাল কক্ষ তেমনি বিচিত্র বাদিত্রসঙ্গম। স্মরণীয় সন্ধ্যা।

সোলোইস্টের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার নাটকীয় সংলাপ বেঠোভেনের ঐ রচনাটিকে বিশেষ উপভোগ্য করে। সংলাপটিকে যদি লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় তো বেহালা বর্গের উপর ওতে পিয়ানোর জিৎ হয়। অর্ফিউস যেমন তাঁর সঙ্গীতের দ্বারা বন্যপ্রাণীদের বশ করতেন এটাও তেমনি একপ্রকার বশীকরণ। উপমাটা আমার নয়, প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার শুমানের। এর পর অর্কেস্ট্রার স্বরতরঙ্গ উত্তাল হয়।

স্কটিশ ন্যাশনাল থেকে মনে হয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের স্বকীয় সঙ্গীত শুনব। সেটা ভুল ধারণা। অর্কেস্ট্রার বাদকবাদিকা স্কটল্যাণ্ডের। কণ্ডাক্টর আগে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বিদেশের নামকরা গুণী। এখন যিনি তিনি স্বদেশের বিশিষ্ট সন্তান। এ ছাড়া আর সব অখণ্ড ইউরোপীয়। আরম্ভটা তো শোস্টাকোভিচের ওভারচার দিয়ে। সেটা রচিত হয়েছিল রুশদেশের অক্টোবর বিপ্লবের সপ্তত্রিংশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে। সমাপ্তিটা যাঁর সিম্ফোনি দিয়ে ি... ...াণ্ডের সঙ্গীতকার সিবেলিউস। শুনতে শুনতে ইউরোপের মহাভাবময় ধ্বনিরূপ অন্তরে মুদ্রিত হয়ে যায়। তার কালভেদ নেই। মাসগ্রেভের রচনাটি মাত্র এক বছর আগের। আর বেঠোভেনেরটি তো দেড় শতাব্দী পূর্বের। শাশ্বতের স্পর্শ পেয়ে ও সমসাময়িকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে 'স্বর্গ হইতে বিদায়' নিই।

পরের দিন স্যাভিল ক্লাবে প্রবীণ সাহিত্যিক রিচার্ড চার্চের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন। চার্চ শহরে বাস করেন না, মাঝে মাঝে আসেন। স্বদেশের সিভিল সার্ভিসে ছিলেন, সাহিত্যের ডাক শুনে চাকরি ছেড়ে দেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল। সে সময় তিনি এক কথায় সার কথা বলেছিলেন, যীশুখ্রীস্টের ভাষায় : 'Thou canst not serve two masters.'

অপরকে বোঝানো শক্ত। যাঁরা বোঝেন তাঁরাও বোঝেন না কত দুঃখ। সেইজন্যে পরের

বিচারভার আপনার হাতে নিতে নেই। চার্চও এককালে গ্যেটের সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে, 'গ্যেটে সিভিল সার্ভ্যাণ্ট পোয়েট।'

স্যাভিল ক্লাব সাহিত্যিকদের মক্কা না হোক মদিনা, তবু খবর নিয়ে জানা গেল যে সেদিন আমাদের পাশের টেবিলগুলিতে যাঁরা গুলজার করেছিলেন তাঁরা মুসলমান নন, তাঁরা কাফের। তাঁরা ডাক্তার বা সেই রকম কিছু। সাহিত্যের জন্যে তাঁরা আসেননি। এসব ক্লাবকে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে অসাহিত্যিকদের কাছ থেকে মোটা চাঁদা নিয়ে চালাতে হয়। তাঁরা খেতে খেতে বৈষয়িক আলোচনা বা খোশগল্প করেন। তা করুন, আমরা একটু নিরিবিলি পেলেই বর্তে যাই।

কথা প্রসঙ্গে চার্চ সেদিন বলেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা ভেঙে যাচ্ছে।' তাঁর কণ্ঠে গভীর উদ্বেগ। মুখেও উদ্বেগের ছাপ ছিল।

এটা অবশ্য খুব একটা নতুন কথা নয়। তখনকার দিনে স্পেংলারও তো এই ধরনের কথা বলতেন। অনেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর হতাশ হয়ে প্রাচ্য সভ্যতার কাছে আশা রাখতেন। এখনো কেউ কেউ রাখেন। জাপানের জেন বৌদ্ধধর্ম এখন ইউরোপের সুধীদের আগ্রহের ধন। তেমনি ভারতের যোগ। কিন্তু সভ্যতা তো কেবল ধর্ম বা দর্শন নয়। তার অসংখ্য দিক। প্রাচ্য সভ্যতার কতটুকু এখনো বহতা স্রোত আর কতখানি এখন মরা গাঙ! মৃতের পুনর্জীবন বা রিভাইভাল ব্যতীত প্রাচ্য সভ্যতার গুরুজনদের আর কী লক্ষ্য আছে! যাঁদের আছে তাঁদের প্রাচ্য না বলে আধুনিক বলাই যথার্থ। আধুনিকের প্রাচ্য পাশ্চাত্য নেই। ওটা মানবিক।

পঁচিশ বছরের মধ্যে দু' দুটো মহাযুদ্ধ। তার পর থেকে অবিরাম স্নায়ুযুদ্ধ। তৃতীয় একটা মহাযুদ্ধের জন্যে প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক। একালের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়, এর পিছনে রয়েছে অর্থনীতিক প্রয়োজন। সেকালের ধর্মযুদ্ধের পিছনেও অর্থনীতিক প্রয়োজন প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একালে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ তার চারিদিকে ধর্মের মতো একটা বর্ম রচনা করেছে। ওর নাম মতবাদ। মতবাদের সঙ্গে মতবাদের সংঘর্ষটাও একপ্রকার ধর্মযুদ্ধ। শান্তিকালেও এর বিরাম নেই। ইতিহাসে দেখা গেছে সাধারণ যুদ্ধ যত মারাত্মক হয় ধর্মযুদ্ধ তার বহুগুণ মারত্মক। একালের বর্ণচোরা ধর্মযুদ্ধও তেমনি বহুগুণ মারাত্মক হবে, যদি বাধে। আপাতত স্নায়ুযুদ্ধ হিসাবে তার পাঁয়তারাও মানুষকে ভিতরে ভিতরে ভেঙে দিচ্ছে। সভ্যতা তো ভাঙবেই।

তারপর আরো একপ্রস্থ দ্বন্দ্ব সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সেটা অত সুউচ্চারিত নয়। লোকে মুখ ফুটে স্বীকার করতে ভয় পায়। শ্রমিকদের ছেলেদের জন্যে এখন অক্সফোর্ড কেমব্রিজের ফটক খুলে গেছে, কিন্তু ইটন হ্যারোর দুয়ার যতদূর জানি খোলেনি। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহেও সংস্কারগত বাধা। এমন কি ভাষা থেকেও চেনা যায় U না Non-U, উচ্চ না অনুচ্চ। গত মহাযুদ্ধে অনেকগুলো প্রাচীর টুটেছে, তবু অনেকগুলো প্রাচীর খাড়া রয়েছে। মিলিটারী অফিসার শ্রেণীতে প্রবেশ পাওয়া কঠিন, ফরেন সার্ভিসে অসম্ভব বললেও চলে। এক কথায় এস্টাব্লিশমেণ্ট যাকে বলা হয় সেখানে ঠাঁই পাওয়া তত সহজ নয় পার্লামেন্টে ঠাঁই পাওয়া যত সহজ। সংখ্যাভূয়িষ্ঠতা থাকলে গভর্নমেণ্ট গঠন করা যত সহজ। বংশকৌলীন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কাঞ্চনকৌলীন্য। কিন্তু শ্রমকৌলীন্যেব সেরূপ মর্যাদা নেই। একজন ভালো শ্রমিকও যে একজন কুলীন এ বোধ নেই। সুতরাং সংগ্রাম না করে উপায় নেই। সংগ্রামটা অবশ্য গণতন্ত্রসম্মত। গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র ও মধ্যবর্তী মধ্যবিত্ত শ্রেণী মিলে শ্রেণীশান্তি রক্ষা করছে। নইলে ফাসিজম ও কমিউনিজম ইংলণ্ডেও দ্বৈরথ বাধাত।

কিন্তু 'পাশ্চাত্য সভ্যতা ভেঙে যাচ্ছে' বললে আরো গভীর স্তরের ব্যাপার বোঝায়। গ্রীক রোমক ও খ্রীস্টীয় উত্তরাধিকাবের সঙ্গে স্বোপার্জিত মানবিকবাদ যোগ করলে যা হয় তারই নাম পাশ্চাত্য সভ্যতা। কতকগুলো যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যা হয় তার গায়ে পাশ্চাত্য লেবেল এঁটে

দেওয়া মিছে। মহাশূন্য বিহারের প্রথম গৌরব এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের। কে না জানে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন অর্ধেক প্রাচ্য ও অর্ধেক পাশ্চাত্য! যন্ত্রপাতিতে জাপান কিছু কম যায় না, অস্ত্রশস্ত্রে চীনও কিছু কম যাবে না। ওদিকে আফ্রিকাও আপাতত যন্ত্রসংগ্রহ করছে, পরে অস্ত্রসংগ্রহ করবে। আরবদেরও গতি সেই অভিমুখে। যা নিয়ে এত অভিমান ও এত আড়ম্বর তার চরম বিকাশ শেষপর্যন্ত তাদেরই হাতে যাদের জনবল বেশী, যাদের শ্রমশক্তি বেশী, যাদের সঙ্ঘবদ্ধতা বেশী, যাদের স্বার্থত্যাগ বেশী। আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের মধ্যেই প্রতিযোগিতা। শেষ হাসিটা কে হাসবে তা এখন আর নিশ্চিত নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা যদি তারই আশায় থাকে তো ঘোড়দৌড়ের বাজি হেরে গেলে যা হয় সেই দশা হতে পারে।

যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের উপর অত্যধিক মনোনিবেশের পরিণাম হয়েছে এই যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশেষ্য ও বিশেষণ দুটি শব্দই বিশেষত্ব হারিয়েছে। খ্রীস্টীয়তা যেখানে সক্রিয় সেখানে নরনারীশিশু-নির্বিশেষে ষাট লক্ষ ইহুদী হত্যা হতে পারে না। আর মানবিকবাদ যেখানে সক্রিয় সেখানে মানবধ্বংসী পারমাণবিক বোমার অতর্কিত বিস্ফোরণের উপর মানবনিয়তিকে ছেড়ে দিয়ে যে যত পারে চুটিয়ে ভোগ করে নিতে পারে না। নিজের ও পরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতখানি উদাসীনতা মানুষের সাজে না। পশ্চিমের মানুষ ভগবানের উপর বা প্রকৃতির উপর আপন ভাগ্য ছেড়ে দিতে নারাজ হয়ে একদা আপনার হাতে নেয়। এই যে আপনার নিয়তি আপনি নিয়ন্ত্রণ এটাই হলো মানবিকবাদের মূল কথা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কি আজকের জগতে মানুষের হাতে, না মানুষের হাতের বাইরে কোনো এক অন্ধ নিয়তির হাতে? তার পর সভ্যতা বলতে যদি কেবল তামসিকতা বা রাজসিকতা না হয় তবে সাত্ত্বিকতার ভাগ কি বাড়ছে না কমছে? সাহিত্যের বা সঙ্গীতের বা ললিত কলার শ্রেষ্ঠ বিকাশ কি সামনে না পিছনে? স্বর্ণযুগ কি দুই মহাযুদ্ধের ওপারে না এপারে? প্রগতি মানে কি আঙ্গিকের প্রগতি না অন্তঃসারের প্রগতি?

ধনসম্পদ ধোপে টিকবে কি না সন্দেহ। বাহুল্যও তেমনি অচিরস্থায়ী। যেটা আমার মতে নীট লাভ সেটা হচ্ছে নারী ও শূদ্রের মুক্তি। পূর্বতন সভ্যতা নারী ও শূদ্রকে পায়ের তলায় রেখে তাদের উপর দাঁড়িয়ে বড় হয়েছিল। বর্তমান সভ্যতা কতকটা স্বেচ্ছায় কতকটা অনিচ্ছায় তাদের পিঠের উপর থেকে পদযুগল সরিয়ে নিয়েছে ও নিচ্ছে। ঘরে ও সমাজে অঘটন ঘটলেও এ দুটি কাজ ঐতিহাসিক বিচারে অবশ্যম্ভাবী, নৈতিক বিচারে অবশ্য করণীয়। বহুকালের ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে বলে সভ্যতা ভেঙে যাচ্ছে, এই যদি হয় সত্য তবে এ ভাঙন পুনর্বিন্যাসের জন্যে ভাঙন। নতুন বাড়ি গড়তে গেলে পুরোনো বাড়ি ভাঙতে হয়। সভ্যতা আপনাকে আপনি সামলে নিতে সমর্থ হবে। যদি না মানুষ জাতটা ইতিমধ্যে আপনাকে আপনি উৎসন্ন করে।

॥ একচল্লিশ ॥

উপন্যাসের নাট্যরূপ কাকে বলে জানি, কিন্তু এ যা দেখছি তা সঙ্গীতরূপ। ডিকেন্স কি কল্পনা করতে পারতেন যে, তাঁর 'অলিভার টুইস্ট' সঙ্গীতনাট্যে রূপান্তরিত হয়ে নিউ থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে যত না অভিনীত তার চেয়ে বেশী গীত হবে? মিসেস কর্নি, মিস্টার বাম্বল ও ছেলের পাল অবাক হয়ে গান জুড়বে, 'অলিভার অলিভার'! ব্যাপার কী! না অলিভার টুইস্ট আরো খেতে চায়। ওইটুকুতে তার

পেট ভরেনি। কারই বা ভরেছে! কিন্তু এ রাজ্যে মুখ ফুটে বলা বারণ। বললে ওটুকুও জুটবে না। তার বদলে জুটবে প্রহার আর বন্দী দশা। বিস্ময়সূচক চিহ্ন দিয়ে এ পালার নামকরণ হয়েছে 'অলিভার!'

অপেরা নয়। তবু এতে সব্বাই গান গায়। বিল সাইকস, ন্যান্সী, ফেগিন ও তার পকেটমার সম্প্রদায় এদের কণ্ঠেও গান আছে। তবে মাতামহ ব্রাউনলোর বা ডাক্তারের বেলা তা নয়। শেষ দৃশ্যটা ট্র্যাজিক। কিন্তু দর্শকরা মিউজিক্যাল কমেডিতে অভ্যস্ত। তাই গান দিয়েই শেষ। আর করুণ রসের চেয়ে হাস্যরসেরই প্রাধান্য। খাসা এন্টারটেনমেন্ট। স্টেজের উপর বিচিত্র সব সেট বানিয়ে বাস্তবকে চোখের সুমুখে তুলে ধরা হয়েছে।

ইংলণ্ড আর সে ইংলণ্ড নেই, কিন্তু অলিভার টুইস্ট সেই অলিভার টুইস্ট। ডিকেন্স সেই ডিকেন্স। দর্শকরা নতুনের সন্ধানে আসেননি, এসেছেন পুরাতনকে নতুন করে পেতে। গানগুলিই প্রাণ। আমার মজা লাগছিল ফেগিনের ভূমিকায় অব্রে উডসের বিদ্‌ঘুটে সাজ দেখতে আর হরবোলা গলায় শুনতে—'You 've got to pick a pocket or two'.

পরের দিন ভবানীর সঙ্গে আবার দেখা। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে দেখি এক মুরগী সরাই। চিকেন ইন্। মুরগী যারা ভালোবাসে তাদের জন্যে হরেক রকম তরকারি মজুত। আগেকার দিনে এটা ছিল বড়লোকের শখ। এখন সাধারণ লোকের পকেটে মুরগী রস আস্বাদনের রসদ জমেছে। তাই যত্রতত্র মুরগী সরাই।

এখন এই মুরগী নিয়ে না মোরগের লড়াই বেধে যায়। মুরগীর এই মরশুমের মূলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওরাই জাহাজ বোঝাই করে মুরগী চালান দিচ্ছে। তাই সকলের পাতে মুরগীর মাংস পড়ছে। শুধু ইংরেজদের নয়, জার্মানদের, ফরাসীদের। এর দরুন স্বদেশী উৎপাদকদের স্বার্থহানি। খোঁজ খবর নিয়ে দেখিনি এই সব সরাই প্রতিষ্ঠার পিছনে কাদের মূলধন কাজ করছে; মুরগী ভোজনের সদাব্রত খুলে দিয়ে কোন মহাপ্রভুর স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে। আমরা অর্থনীতি বুঝিনে। শুধু লক্ষ করি যে, গণতন্ত্র এখন জনগণকে মুরগীভোজন করাতে পারে। থ্রী চীয়ার্স দেব না?

স্টীফেন স্পেণ্ডার তো গণতন্ত্র আর কমিউনিজম এই দুই তন্ত্রের 'এন্‌কাউন্টার' নিয়ে আছেন। আমরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে মোলাকাৎ করি। মানুষমাত্রেরই বয়স বাড়ে। তাঁরও বেড়েছে। চুল পেকেছে। কিন্তু গড়নের সেই ক্ল্যাসিকাল সৌষ্ঠব তেমনি আছে। বিদ্রোহের আগুন যা ছিল তা এখন ছাই হয়ে গেছে। অথচ রক্ষণশীল হতেও তাঁর বাধে। বর্তমান ইংরেজী সাহিত্যের প্রচ্ছন্ন শ্রেণীবিরোধ তাঁকে অসুখী করেছে। সেটাও তো একটা এন্‌কাউণ্টার। কিন্তু সেটা নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করতেও তাঁর অরুচি। উঠতি শ্রেণীর প্রতি খুব যে একটা সহানুভূতি বোধ করেন তা নয়। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে, ওরা মধ্যবিত্ত হতেই চায়। পুরোনো মধ্যবিত্তদের মেরে নয়, নয়া মধ্যবিত্ত হয়ে জাতে উঠে। অলিখিত নিয়মের বাধা পেলে যদি কোনো কোনো যুবক 'অ্যাংরি' হয়ে ওঠে সেটা সহ্য করা ও হেসে উড়িয়ে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। ইংলণ্ডের 'এস্টাব্লিশমেণ্ট' যেন জিব্রালটরের পাহাড়। কেউ তাকে টলাতে পারবে না। উচ্চাভিলাষীদের জাতে তুলে নেবার কৌশল ইংলণ্ডের বুর্জোয়াদের মতো কেউ জানে না।

ডিজরেলি বলতেন ইংলণ্ডে দুটো নেশন আছে। ধনী ও দরিদ্র। অত্যুক্তি বইকি! তবে সর্বৈব অসত্য নয়। ইতিমধ্যে চরম বৈষম্য দূর হয়েছে। মুরগী যদি সকলের পাতে পড়ে তবে বৈষম্যের আর বাকী রইল কী? ইস্কুল? কলেজ? সিভিল সার্ভিস? ফরেন অফিস? আর্মি? নেভি? এয়ার ফোর্স? সব দরজাই তো খুলে যাচ্ছে। তবু আছে, আছে। ইংরেজরা আমাদের বর্ণাশ্রমীদের মতো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আঁকে না, বরং চীনাদের মতো সীমান্তটা অচিহ্নিত রেখে দেয়। তবু আছে,

আছে। অস্‌বর্ন কখনো স্পেণ্ডার হতে পারবেন না। একদিন হয়তো লর্ড অস্‌বর্ন হবেন, লর্ড সভায় বসবেন, কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করা অত সহজ নয়। এমন সব অদৃশ্য বাধা আছে যা জন্মসূত্র ছাড়া আর কোনো সূত্রে লঙ্ঘন করা যায় না। এমন সব ক্লাব আছে যেখানকার সভ্য হওয়া ধনকুবেরেরও অসাধ্য। লর্ডকেও তার জন্যে সাধ্য সাধনা করতে হয়।

রিপাবলিক না হলে এ সব বাধা ঘুচবে না। অথচ লেবার পার্টির চরমপন্থীরাও দ্বিতীয়বার সে পরীক্ষা করতে চায় না। ক্রমওয়েলের সঙ্গে সঙ্গে সে পরীক্ষা চুকেছে। কদাচ একআধজন এইচ জি ওয়েলস রাজতন্ত্র তুলে দেবার কথা মুখে আনতে সাহস পান। আইনত নিষিদ্ধ বলে নয়, জনমত প্রতিকূল বলে। রাজারাজড়ার জন্যে বড় বেশী খরচ হচ্ছে, অত আড়ম্বর কেন ইত্যাদি উক্তি মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু রাজপরিবার না থাকলে ইংলণ্ডের জীবন অত্যন্ত বিবর্ণ ও বিস্বাদ হয়ে যায়। রাজমুকুট যাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তিনি শুধু রাষ্ট্রের মাথা নন, সমাজেরও মাথা, ধর্মেরও মাথা। রাজতন্ত্রের পতন মানে অ্যাংলিকান চার্চেরও পতন, বর্ণব্যবস্থারও পতন। না, ইংলণ্ডের বামপন্থীরাও অত বড় ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নন। সেদিক থেকে আমরাই বরং এগিয়ে রয়েছি। রাজতন্ত্রী ইংলণ্ড এসে ভারতের রাজতন্ত্রকে চুরমার করে দিয়ে গেছে। আর আমরা তার উপর প্রজাতন্ত্রের পত্তন করার সুযোগ পেয়েছি।

তবে একটা বিষয়ে সত্যিকার একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। কখনো যা কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। কমন্সসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি হবার জন্যে মানুষ লর্ড পদবী ত্যাগ করতে চায়? আইনে বাধা ছিল। সে বাধা অপসারণ করা হলো একজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে কমন্সসভায় বসতে না দেওয়ার অন্যায় হৃদয়ঙ্গম করে। এখন তো আরো কয়েকজন লর্ড স্বেচ্ছায় কমনার হয়েছেন। এ রকম যদি চলতে থাকে তবে রাজার ছেলেও রাজমুকুট ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যে কমনার হতে পারেন। বার্নার্ড শ যার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে রাজকন্যাকে কমনার বিয়ে করতে দেওয়া হয়েছে। তার জন্যে তাঁকে সিংহাসনের দাবি ছাড়তে বলা হয়নি। ইংরেজরা রক্ষণশীল হলেও গোঁড়া নয়। তেমনি বামপন্থী হলেও মতান্ধ নয়। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র সবই রেখে দিয়েছে, অথচ নিয়মের যেমন নিপাতন এ সবের তেমনি ব্যতিক্রম আছে। এর পশ্চাতে রয়েছে উদারনৈতিক ঐতিহ্য। উদারনৈতিক দলটা ছোট, কিন্তু তার সেই ঐতিহ্যটা ছোট নয়! সেটা যথেষ্ট বলবান বলেই ইংলণ্ডের জীবনে দুই বিপরীত শ্রেণীর সংঘাত ঘটছে না।

এক পশলা বৃষ্টির পর ভিজে পথঘাট দিয়ে গাড়ীতে করে রাত্রে পি ই এন ক্লাবের ককটেল পার্টিতে যোগ দিতে যাচ্ছি ভবানী আর আমি দুই লেখক ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের মিস গোর-সাইমস। ট্রাফলগার স্কোয়ারের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখি—ও কী! ওরা কারা! এই শীতে সর্বাঙ্গে পোশাক পরা অবস্থায় ফোয়ারার জলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ধারাস্নান করছে কেন? ওরা কি মাতাল না পাগল? চারদিক থেকে ভিড় জমে গেছে ওই ছোকরাদের দেখতে, চেঁচিয়ে বারণ করতে, কিন্তু কারো দিকে তাদের দৃক্‌পাত নেই, তাবা আপন মনে দাঁড়কাকের মতো কালো ডানা ঝাড়ছে। আর মুখ দিয়ে হুশহাশ শব্দ করছে। শীতের ঠেলায় আর কী! ওদের বয়স হয়েছে, নিতান্ত নাবালক নয়। আমার ঠিক মনে পড়ছে না ওদের দলে ওদের বয়সী মেয়েরা ছিল কি না। হয়তো ছিল একটু তফাতে গা বাঁচিয়ে। শেষে পুলিশের লোক যায় ওদের পাকড়িয়ে চ্যাংদোলা করতে।

ব্যাপার কী জানতে চাওয়ায় মিস গোর-সাইমস বলেন, আজ 'গায় ফক্‌স ডে'। ওঃ। 'গায় ফক্‌স ডে'। এতক্ষণ মনে ছিল না। ওই যে ছড়া আছে—

'Remember! Remember!
Thc fifth of November!'

রাজা জেমসের আমলে রোমান ক্যাথলিক নির্যাতনের প্রতিবাদে গায় ফক্স ও তাঁর সাথীরা পার্লামেণ্ট ভবনের নিচের তলায় বারুদের পিপে লুকিয়ে রাখে। রাজা ও মন্ত্রীরা যেই উদ্বোধন উপলক্ষে শুভাগমন করবেন অমনি বিস্ফোরণ ঘটবে। চক্রান্তটা সময় থাকতে ফাঁস হয়ে যায়। তখন গায় ফক্স ও তার দলবল ধরা পড়ে ফাঁসী যায়। পার্লামেণ্টসুদ্ধ মানুষ যদি সেদিন বিলুপ্ত হতো তা হলে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপরেও কি শোধ তোলা হতো না? সাড়ে তিন শ' বছর পরে সে উত্তাপ জল হয়ে গেছে। ক্রোধ পরিণত হয়েছে কৌতুকে। লণ্ডনের ছেলেরা বাজী পোড়ায়। কুশপুত্তলিকা দাহ করে। খরচ যা হয় সেটার জন্যে দিন কয়েক আগে থেকে ভিক্ষে করতে বেরোয়। পথচারী দেখলেই হাত পেতে বলে, 'এ পেনী ফর পুঅর গায়।'

পাজী গায় এখন পুঅর গায় হয়েছে। সেই যে সেদিন অচেনা ছেলেমেয়েরা আমার কাছে একটি পেনী ভিক্ষে চেয়েছিল সেটা তারা অভাবগ্রস্ত বলে নয়। বেচারা গায় অভাবগ্রস্ত।

ওকথা আমাকে বলতে হয়। ওরা সেদিন ওটা আমাকে বলেনি। বললে কি আমি পেনী বার করে দিতুম না? এখন আফসোস হচ্ছে।

পি ই এন ক্লাব চেলসীতে। সামান্য একটি বাড়ির কয়েকখানিমাত্র ঘর। লণ্ডনের সাহিত্যিকদের জন্যেই এর প্রয়োজন বেশী। নইলে কে কাকে খুঁজে বেড়াবে? সেদিন ছিল আন্তর্জাতিক ককটেল পার্টি। শুকনো এসব ব্যাপার হবার জো নেই। স্থানাভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছেন নানা দেশের লেখকলেখিকা। হাতে পানপাত্র। সাকী এসে ভরে দিয়ে যাচ্ছে বা বদলে দিয়ে যাচ্ছে। সোমরস আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে সেই সনাতন লেবুর রস। ভবে এসে করলেম কী? এর জন্যে অবশ্য আমাকে অপাঙ্‌ক্তেয় হতে হলো না।

আন্তর্জাতিক সেক্রেটারি ডেভিড কার্ভার পুরাতন আলাপী। জাপানের পি ই এন কংগ্রেসে আলাপ। এমনি দু'তিনজনের সঙ্গে পুনরালাপ হয়। নতুন আলাপ যাঁদের সঙ্গে তাঁদের একজনের নাম ভুলে গেছি। রুশদেশের পলাতক লেখক, বোধহয় অধ্যাপক। মঙ্গোল জাতির ইতিহাস লিখছেন। মঙ্গোলদের একটি শাখা কেমন করে দক্ষিণ মুখে আসতে আসতে ভারতে প্রবেশ করে ও সেখানে মঙ্গোল সাম্রাজ্য পত্তন করে। যার চলতি নাম মুঘল সাম্রাজ্য। ভারতীয় ধারার সঙ্গে মঙ্গোল ধারা একটু একটু করে মিশে যায়। যেখানে মিশে যায় সেখানে এঁর গবেষণা শেষ হয়েছে। আকবর পর্যন্ত এসে ইনি দাঁড়ি টেনেছেন। মুঘল ভারতের আদি পর্ব যে মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসের অঙ্গ এটা উপলব্ধি করে আমি যেন নতুন দৃষ্টি লাভ করি। ইউরোপের ইতিহাস না পড়লে যেমন ব্রিটিশ আমলের ইতিহাস ঠিকমতো বোঝা যায় না, তেমনি মধ্য এশিয়ার ইতিহাস না পড়লে মুঘল আমলের, তার আগে পাঠান আমলের, তার আগে আরো কয়েকটা আমলের। পেছোতে পেছোতে যতদূরেই যাই মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র পাই। কখনো ওদের ইতিহাসে আমাদের পদপাত, কখনো আমাদের ইতিহাসে ওদের পদসঞ্চার। রাজ্য আর বাণিজ্য আর ধর্ম আর সংস্কৃতি এমন ভাবে একজোট হয়েছে যে শুধুমাত্র ধর্মের লেবেল আঁটা অন্যায়। সেইজন্যে আমি আর হিন্দু যুগ বা মুসলিম যুগ বলিনে।

গত তিন চার শতাব্দীতে হয়েছে এই যে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে, তার বদলে যোগসূত্র গাঁথা হয়ে গেছে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে। এটাকেও ছিন্ন করতে হবে একথা যিনি বলেন আমি তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারিনে, কারণ ইতিহাস বলছে যে ভারত কোনোদিন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি। এটা ছিন্ন হলে আর একটা যোগসূত্র এর স্থান নেবে। বরং এটাকে অটুট রেখে সেটার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে হবে। বিপুলা চ পৃথ্বী।

।। বিয়াল্লিশ ।।

সাত দিনের অতিথি, লণ্ডনের বাইরে যেতে উৎসাহ ছিল না, কিন্তু গেলে কোনখানে যাব সেটা জানা ছিল। কেম্‌ব্রিজ। ইংলণ্ডের দুটি চোখের একটি চোখ। অক্সফোর্ড তার দক্ষিণ নেত্র, আর কেম্‌ব্রিজ বাম নেত্র। জ্ঞান বিজ্ঞান ও মূলনীতি নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের দুটি কেন্দ্র। সাধারণত কেমব্রিজ অপেক্ষাকৃত বামপন্থী আর অক্সফোর্ড তার তুলনায় দক্ষিণপন্থী। আমি অবশ্য বাম বা দক্ষিণপন্থী নই, আমার পক্ষপাতের কারণও নেই। সময় থাকলে অক্সফোর্ডেও ঘুরে আসতুম। কিন্তু কেম্‌ব্রিজ আমাকে টেনে নিয়ে যায় বিদগ্ধ বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ফর্স্টারের খোঁজে। যদিও সে সন্ধান ব্যর্থ হয়। আরো একটি টান ছিল। যথাকালে বলব। এটা আমার সেন্টিমেণ্টাল জার্নি।

ক্যাম নদী আর সেই কলেজগুলির পিছনের দিক ছাড়া আর কিছুই আমার মনে ছিল না। সেই মনোরম দৃশ্য তেমনি মনোরম রয়েছে। তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন নেই। আমার প্রদর্শিকা এক অধ্যাপকপত্নী। মিসেস লিপস্টাইন বলেন, 'দু'শ' বছর আগে এলে যা দেখতেন আজ তাই দেখছেন। দু'শ' বছর পরে এলেও তাই।'

অথচ পরিবর্তন যে হচ্ছে না তা নয়। ট্রিনিটি কলেজে দেখি এক দল মিস্ত্রী কাজ করছে। মেরামতির কাজ তো লেগে আছেই, অদলবদলের কাজও চলছে। ছেলেরা তো মোমবাতির আলোয় পড়বে না। বিদ্যুৎ চাই। তেমনি একালের উপযোগী কলের জল, ড্রেন, স্যানিটারি ফিটিং। এর জন্যে ভাঙাগড়া দরকার হয়। কিন্তু মোটের উপর পুরাতনকে পুরাতনই রেখে দেওয়া হয়। অসুবিধা হলে হবে। কী করা যায়!

সাত শ' বছরের বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু অতকালের ইমারত নেই। কিন্তু দু'শ' বছরের পুরাতন কলেজ আছে। দেখতে যাইনি, বাড়িটা কতকালের বলতে পারব না। কিন্তু যীশাস কলেজের বাড়ির যে অংশ এককালে সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীদের অধিকারে ছিল সেটার অবশেষ পঞ্চদশ শতাব্দীর। তেমনি ষোড়শ শতাব্দীকে দেখতে পেলুম কিংস কলেজের গির্জায় গিয়ে। মধ্যযুগের ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যনিদর্শন। তার চিত্রিত কাচের দীর্ঘকায় বাতায়ন কোলোন ক্যাথিড্রালের কথা মনে করিয়ে দেয়। একই যুগ, একই ধর্ম, শুধু বিভিন্ন দেশ। আমাদের এদিকে হলে বলা যেত প্রদেশ।

ষোড়শ শতাব্দীকে আরো কত জায়গায় দেখলুম। কুইনস কলেজের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ অধ্যক্ষের আলয়ে। চমৎকার তেমনি ক্লেয়ার কলেজের হলঘরে। সপ্তদশ শতাব্দীকে দেখলুম ক্লেয়ার কলেজের সেতুতে। ক্যাম নদী বয়ে চলেছে। নদীর উপর ঝুঁকে রয়েছে উইপিং উইলো।

লনগুলি তখনো সবুজ, কিন্তু গাছের পাতার দিকে চেয়ে সবুজ বড়ো একটা নজরে পড়ে না। পাতাই থাকছে না। খসে পড়ছে। শূন্য হয়ে যাচ্ছে শাখা। 'আর সাতটা দিন আগে যদি আসতেন তা হলে দেখতেন শরতের কী শোভা!' আফসোস করে বললেন আমার প্রদর্শিকা। হায়, কেন যে সেটা মাথায় আসেনি! কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব হতো!

বৃষ্টি! বৃষ্টি! চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি আসে সহজে কি থামে? হাঁ, আমার মনে আছে আগের বারও কেম্‌ব্রিজ আমাকে বর্ষণ উপহার দিয়েছিল। দু'দিন কি তিন দিন ছিলুম, কিন্তু স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারিনি।

বৃষ্টির জন্যে অবশ্য কারো কোনো কাজ আটকায় না। আমিও খুঁজে বার করি অধ্যাপক বেরিলকে। আমার ছোট ছেলেকে পড়াতেন। ভদ্রলোক হেসে বলেন, 'এই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে

আপনি কেম্‌ব্রিজে এসেছেন? এমন দিনে কেউ দেখতে আসে?' কথাটা ঠিকই। কিন্তু কোন্‌দিন বৃষ্টি পড়ত না কেউ বলতে পারেন কি?

বৃষ্টি ধরে যায়। ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে লাইব্রেরি দেখি। নিউটনের হাতের লেখা, সপ্তদশ শতাব্দীর। বারট্রাণ্ড রাসেলের লেখা, এই সেদিনকার। পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে তাঁর অপ্রিয় ভাষণও কেম্ব্রিজ সাদরে সঞ্চয় করেছে। জনপ্রিয়তার জন্য কেম্‌ব্রিজের তোয়াক্কা নেই। এখানকার পণ্ডিতেরা সংস্কারমুক্ত। তাই তো বায়রনের মূর্তি কোন্‌খান থেকে কুড়িয়ে এনে সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করছেন। অথচ এই বায়রনকেই এককালে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেকালের গ্রীকদের মতো নগ্নদেহে ফোয়ারার জলে অবগাহন করার অপরাধে। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। অমন দেহ অনাবৃত করাই হলো অপরাধ! সেই ফোয়ারাও দেখলুম।

কয়েকটি পুরাতন গির্জার ভিতরে যাই। তখনকার দিনে কেম্‌ব্রিজ ছিল ধর্মমতের দ্বন্দ্বে প্রোটেস্টাণ্ট পক্ষে। তার থেকে আর এক কাটি সরেশ। পিউরিটান। কিন্তু নিউটনের সময় থেকে মোড় ঘুরে যায়। গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করার পর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগামী হয় কেম্‌ব্রিজ। গত শতাব্দীতে প্রবেশপ্রার্থীদের খ্রীস্ট ধর্মসংক্রান্ত পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তখন ছাত্রসংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। আর অধ্যাপকদের নিয়োগ করা হয় ধর্ম দেখে নয়, যোগ্যতা দেখে। নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীদের কোল দেওয়া হয়। যেটা ছিল ধর্মশাস্ত্রীদের অন্যতম পীঠ সেইটেই হলো তার্কিকদের আড্ডা। তর্ককালে একটা তেপায়া টুল ব্যবহার করা হতো, তার থেকে পরীক্ষার অনার্সকে বলা হয় ট্রাইপস। আর গণিতশাস্ত্রে প্রথমশ্রেণীর অনার্স যদি কেউ পান তাঁকে বলা হয় র‍্যাংলার। অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক শিরোমণি। তর্ক মল্ল।

কিন্তু তর্ক তো তর্কের খাতিরে নয়। সত্যের খাতিরে। কেম্‌ব্রিজে রেনেসাঁস নিয়ে আসেন এরাসমাস। আর রেফরমেশনের নেতা হন ল্যাটিমার। ক্লেয়ার কলেজের পড়ুয়া। ধর্মসংস্কার তো বিনা দ্বন্দ্বে হয় না। ধর্মদ্রোহিতার দণ্ড আগুনে পুড়িয়ে মারা। কে না জানে পুড়তে থাকা সমধর্মা রিডলীকে পুড়তে থাকা সংস্কারক ল্যাটিমারের অন্তিম উক্তি—

'Be of good comfort, Master Ridley, and play the man; we shall this day light such a candle by God's grace in England as (I trust) shall never be put out.'

না। সে আলোক নিবে যায়নি। সে জ্যোতি অনির্বাণ। কেম্‌ব্রিজ সেই দীপশিখাকে কেবল ধর্মসংস্কারের নয়, মনোজীবনের বিচিত্র বিভাগে নিরলস সাধনার দ্বারা জ্বালিয়ে রেখেছে। আর ইংলণ্ডের জাতীয় চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে সেই তেজ যার বর্ণনা এখন ইতিহাস—

(Latimer) 'received the flame (as it were) embracing it. After he had stroked his hands, and (as it were) bathed them a little in the fire, he soon died (as it appeared) with very little pain or none.'

রাষ্ট্রবিপ্লব বা সমাজবিপ্লবের মতো সেটাও ছিল একপ্রকার বিপ্লব। ইউরোপের একভাগের মূলবিশ্বাস রাতারাতি বদলে যায়। আরেকভাগের বদলায় না। ক্যাথলিক ধর্মমত অপরিবর্তনীয়। তবে প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদের সঙ্গে লড়তে লড়তে ও সহ-অবস্থান করতে করতে তারও ধীরে ধীরে বিবর্তন ঘটেছে। সংস্কৃতের মতো ল্যাটিন ছিল দেবতাদের ও পুরোহিতদের ভাষা। চার শ' বছর আগে লোকভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে গিয়েই বিশ্বাসের বিপ্লব ঘটে। এখন তো ক্যাথলিকরাও লোকভাষায় শাস্ত্রপাঠ ও মন্ত্রপাঠের অনুমতি লাভ করেছেন। তা বলে প্রোটেস্টাণ্টদের ইংরেজী তর্জমা চলবে না। চাই ক্যাথলিকদের নিজস্ব ইংরেজী তর্জমা। একই বাইবেল, একই ইংরেজী, তবু সেখানেও গভীর প্রভেদ।

অক্সফোর্ড তো কলকারখানার শহরে পরিণত হয়ে তার মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। কেম্‌ব্রিজ সেটা এখনো হারায়নি। সামান্য কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। নইলে কেম্‌ব্রিজ এখনো নিসর্গের কোলে। কিন্তু বড়ো বড়ো ল্যাবরেটরি দিকে দিকে মাথা তুলছে। দিনে দিনে তারাই সকলের মাথা ছাড়িয়ে যাবে। সেকালের ঐতিহ্যময় পরিবেশ কি বিশ ত্রিশ বছর বাদে যাদুঘরের মতো সুরক্ষিত অথচ কারখানার মতো কোলাহলমুখর হবে না? আর আগেই তোমাকে আমি এক নজরে দেখে নিলুম, কেম্‌ব্রিজ। বিশ্ববিদ্যানগরী!

ছাত্রদের শহর কেম্‌ব্রিজ। ছাত্ররা কোথায় নেই? গাউন পরা মূর্তি দেখে মনে হয় না যে, প্রথার শাসন অমান্য করার সাহস আছে। কলেজের নিয়মকানুন তেমনি কড়া। দু'বেলা একসঙ্গে বসে ভোজন করার পাট শিথিল হয়নি। হাই টেবিলে বসেন অধ্যক্ষ ও ফেলোমণ্ডলী। অধ্যক্ষ নির্বাচন সাধারণত ফেলোদেরই হাতে। আর ফেলো নির্বাচন গভর্নিং বডির হাতে। অধ্যক্ষ আর ফেলোদের দিয়ে কলেজগুলি স্বায়ত্তশাসিত। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হাত দেয় না। বলা বাহুল্য কলেজমাত্রেই আবাসিক।

খাবার ঘরগুলিতে দেখি টেবিল পাতা রয়েছে। টেবিলের উপর ছুরি কাঁটা সাজানো। যদিও রাতের খাওয়ার তখনো অনেক দেরি। পরিষ্কার তকতকে চারদিক। দেয়ালে কতকালের সব ছবি। কলেজের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা বা প্রাচীন অধ্যক্ষ। তাঁদের কেউ কেউ ঐতিহাসিক চরিত্র। অক্সফোর্ড আর কেম্‌ব্রিজ মিলেই তো ইংলণ্ডের বিদ্বান সমাজ। সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজের প্রাক্তন ছাত্রদের সংখ্যা চিরকাল বেশী ছিল, এখনো কম নয়। কারণ শ্রমিক দলের লোকেরাও অক্স-ব্রিজের কদর বোঝে। পারলেই ছেলেদের পাঠায়। আর ইদানীং অধিকাংশ ছাত্র স্কলারশিপ নিয়ে আসে। তাই বলতে পারা যায় না যে, এই বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি কেবল বড়লোকের ছেলেদের জন্যে।

কিন্তু এরা যখন কোনো মতেই ছাত্রসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে দেবে না তখন দেশের বর্ধিত ছাত্রসমষ্টির জন্যে অন্যত্র ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্যে গত শতাব্দী থেকেই লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছিল, ইদানীং নানান ছোট ছোট জায়গায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এদের বলা হয় রেড ব্রিক বা লাল ইটের বিশ্ববিদ্যালয়! পড়াশুনা তা বলে নিকৃষ্ট নয়। বরং প্রথার পীড়ন থেকে ছাড়া পেয়ে রকম রকম এক্সপেরিমেণ্ট করতে পারা যাচ্ছে।

বিদায় নেবার আগে একটি প্রিয় কৃত্য বাকী ছিল। সেণ্ট ক্যাথারিনস কলেজ দর্শন। পঞ্চদশ শতাব্দীর এই কলেজে বিংশ শতাব্দীর একটি ছাত্র থাকত। কলেজের পোর্টার এখনো আমার ছোট ছেলেকে মনে রেখেছেন। কিন্তু কোন্ ঘরে সে থাকত সেটা তিনি বলতে পারেন না। শুধু বারান্দার একটা সিঁড়ির সংকেত দেন। সিঁড়ি পর্যন্ত যাই। দাঁড়াই। দেখি। ঘরগুলোর দিকে একবার কৌতূহলী দৃষ্টিক্ষেপ করি। এমন সময় হঠাৎ আবার শুরু হয়ে যায় বৃষ্টি। গাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিই। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

সেণ্ট ক্যাথারিনস কলেজের ডাকনাম 'ক্যাটস'। তার সঙ্গে 'ডগস' যোগ করলে যেমন হয় তেমনি বৃষ্টিতে কেম্‌ব্রিজ বেড়ানো সাঙ্গ হয়।

॥ তেতাল্লিশ ॥

ফিরে যাই লণ্ডনে। একদা যে ছিল বাদল সুধী উজ্জয়িনীর লণ্ডন। কল্পলোকের অধিবাসী ওরা। কেউ ওদের মনে রাখবে কী করে! এটা আমার একার পরিক্রমা। প্রদর্শক নেই। এবার আমি গোল্‌ডার্স গ্রীনের অমিয়কৃষ্ণ ও শান্তি বসুর অতিথি।

আরো একটা দিন অতিরিক্ত পাওয়া গেল। আগে থেকে প্রোগ্রাম তৈরি না থাকায় আমিই আমার মালিক। ভবানীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সেকালের স্মৃতির সঙ্গে একালের অভিজ্ঞতার জাল বুনি। মাঝখানে বড়ো বড়ো ফাঁক। কেমন করে সে ফাঁক ভরবে? যুদ্ধকালে তো ছিলুম না। আর সেই সময়ই না জাতি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। তখনকার সেই কৃচ্ছ্রসাধনার ডিসিপ্লিন তো দেখিনি। বাইরের আগুনকে প্রতিহত করে ভিতরের আগুন। সে আগুন আবার ঝিমিয়ে পড়েছে।

সাম্রাজ্য চলে গেছে বলে ইংরেজ জাতি হতমান বা হীনবল হয়নি। এমন কি তার স্বাচ্ছন্দ্যের মান হানি হয়নি। সামলে নেবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে তার। তবে নেতৃত্ব করার মতো সামর্থ্য আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ। বিশ্বনাথবাবু বহুদিন এদেশে বাস করছেন। হঠাৎ কী মনে করে বলেন, 'আমি ভেবে অবাক হই যে, এই জাতি দেড় শ' বছর আমাদের উপর রাজত্ব করেছিল। দেখে বিশ্বাস হয়?'

এর উত্তর, মনের দিক থেকে ওরা এগিয়ে রয়েছিল। ওদের সেই নেতৃত্ব আজ আর নেই। লণ্ডন এখন আর বিশ্বকেন্দ্র নয়। সভ্যতার মুখ্য স্রোত আর টেমস নদী দিয়ে প্রবাহিত হয় না। নানা বিচিত্র কারণে ওয়াশিংটন আর মস্কো এখন দুনিয়া ভাগ করে নিয়েছে। লণ্ডনের জন্যে আলাদা করে কিছু রাখেনি। মহাশূন্য বিহারের গৌরব যাদের তাদের কেউ রাশিয়ান কেউ মার্কিন। আর সেই হলো মানবসাধ্যের আধুনিকতম পরিমাপ। সমুদ্র আর সমুদ্রগামী জাহাজই ইংলণ্ডকে মহাশক্তিমান করেছিল। এখন সমুদ্র তো গোষ্পদ হয়ে গেছে আর আকাশ থেকে জাহাজকেও কেমন বেচারা মনে হয়।

অনেকেই এখন বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে রাজী। তাঁরা চান 'লিটল ইংলণ্ড'। তা হলে বিরাট নৌবহর পুষতে হয় না। পারমাণবিক অস্ত্রের জন্যেও হাতীর খোরাক জোটাতে হয় না। হিসাব করে দেখা গেছে এক-একটি সৈনিকের পিছনে বছরে খরচ হয় এক এক হাজার পাউণ্ড। মাসে এগার শ' টাকা। কিন্তু অধিকাংশের মানসিক এখনো আক্ষরিক অর্থে 'গ্রেট ব্রিটেন'। এ মানসিকতা আপনি যাবার নয়। যাবে অর্থনীতির নির্মম লজিকের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে। তার দেরি আছে।

ইংরেজরা ওদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু বাণিজ্য গুটিয়ে নিলে ওরা বাঁচবে না। অপর পক্ষে স্বতন্ত্র একটা পারমাণবিক আত্মরক্ষা ব্যবস্থাও ক্রমশ ওদের সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফ্রান্সেরও। পরে পশ্চিম জার্মানী যদি এ খেলায় নামে তো সোভিয়েট খতম হবার আগে এই তিন শক্তি পরস্পরকে খতম করে থাকবে। ইংলণ্ডের যেটা সত্যিকার সংকট সেটা বাইরের নয়, ভিতরের। শ্রেণীসাম্য প্রতিষ্ঠা না করে শ্রমিকরা ক্ষান্ত হবে না। সেটা যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয় তবেই সব দিক রক্ষা। আব নয় তো গণতন্ত্র বিপন্ন। আসল ইসুটাকে এড়িয়ে চলা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে।

হে ব্রিটেন, তুমি তোমার গণতন্ত্র বাঁচিয়ে আমাদের গণতন্ত্রটিকেও বাঁচতে দাও। তোমার গণতন্ত্র যদি হালে পানি না পায় আমাদেরটিও ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যাবে। তোমার গণতন্ত্র যদি সর্বপ্রকার চরমপন্থার মাঝখান দিয়ে যাত্রা করে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় তবে আমাদের গণতন্ত্রও পৌঁছে দিতে পারবে।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়ে পড়লুম। সেখানে আরো কয়েকজন বাঙালীর সঙ্গে দেখা। পায়ে হেঁটেই আমরা ইণ্ডিয়া ক্লাবে হাজির হলুম। দেশী মতে খাওয়া। ইতিপূর্বে একদিন ইণ্ডিয়া হাউসেও সেটা হয়েছে। ও কে ঘোষের আমন্ত্রণে।

এর পর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে নিয়ে যান অ্যাকাডেমি সিনেমায় একটি নামকরা ফরাসী নাটকের মার্কিন চিত্ররূপ দেখাতে। জেনে (Genet) রচিত 'ব্যালকনি'। চিত্ররূপকে আমি অবিশ্বাস করি, বিশেষত সেটা যদি সাংকেতিক বা রূপক নাটকের বা উপন্যাসের হয়। জেনে এমন একজন লেখক যাঁর উপর বই লিখেছেন স্বয়ং জাঁ পল সার্তর। নাম দিয়েছেন 'সাঁ জেনে'। সন্ত জেনে। খ্রীস্টীয় সন্তরা ওকথা শুনলে কবরের ভিতরে গা নাড়া দেবেন। অভাবে ও কুসঙ্গে পড়ে যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় ততদূর গিয়েও রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হয়ে উঠেছেন এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী নেই। জেনে সেইরূপ একটি দৃষ্টান্ত। তবে তাঁকে সন্ত বললে তিনিই কবরে ঢুকতে চাইবেন। ওটা বাড়াবাড়ি। মোট কথা, জেনে পাপের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে পাপীদের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেছেন ও পরে কলম হাতে নিয়ে স্বভাব-লেখকের মতো আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। কিছুই গোপন করেননি, দার্শনিকতায় আবৃত করে সহনীয় করেননি, পর্নোগ্রাফি দিয়ে উত্তেজক করেননি, টাকার জন্যে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে তোলেননি। জীবনের করাল রূপ কি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই দেখা যায়? জেলখানায়, বেশ্যালয়ে, সমাজের রসাতলে, এমনি কত জায়গায় বিকটভাবে প্রকট। এই নাটকটির স্থান বেশ্যালয়। সেখানে গিয়ে জুটেছেন ধর্মযাজক, সেনাপতি প্রভৃতি।

খুশি হবার মতো জিনিস নয়। জেনেও বোধ হয় চাননি যে, আমরা খুশি হই। এই যে এত বড়ো একটা বিশ্বব্যাপার, এটাও তো আমাদের খুশি করার জন্যে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি যিনি করেছেন, তিনি কারিগরী দেখাতেও চাননি। সাহিত্যে শুধু খুশি করবার মতো সত্যই থাকবে, অপ্রিয় সত্য থাকবে না, এ শর্তে সৃষ্টি করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সাহিত্য অমন করলে তার স্বাধীনতা হারায়। একালের সাহিত্য রুদ্ধ দুয়ার দেখলে কড়া নাড়ে, ধাক্কা দেয়। নিষিদ্ধ ফল দেখলে পেড়ে এনে খায়। বিষ বলে ভয় দেখালে উল্টে সাহস দেখায়। তার জেদ সে সোজাসুজি জীবনের দোরগোড়ায় যাবে ও সরাসরি মোকাবিলা করবে। পূর্বসূরীদের জীবনজিজ্ঞাসায় অনেক কিছু ধরে নেওয়া হয়েছে। আগে থাকতে ধরে নিলে জিজ্ঞাসা আর মুক্ত মনের জিজ্ঞাসা নয়। যে পথ অন্যদের দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে, সে পথে মোটর চালাবার স্বাধীনতা দিলে একপ্রকার অগ্রগতি হয় বইকি, কিন্তু জল কাদা ও পাঁকের ভিতর দিয়ে যে পথ আপনি তৈরি করে নিতে হয়, সে পথে পিছলে পড়তে পড়তে ওঠা ও পেছোতে পেছোতে এগোনোর স্বাধীনতা দিলে আরেক প্রকার অগ্রগতি হতে পারে। উত্তরসূরীদের দাবি এই স্বাধীনতা।

সন্ধ্যাবেলা তাঁর কাছে বিদায় নিতে যাই, যিনি আমার দৃষ্টিতে ব্রিটানিয়া। এর পরে ইংলণ্ডে আমার আর কোনো আকর্ষণ রইল না। আমার সেন্টিমেণ্টাল জার্নি ফুরিয়ে এলো। এখন আমি নিঃস্পৃহ।

নৈশভোজনের জন্যে বসু পরিবারে যাঁদের নিমন্ত্রণ ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার সেকালের লণ্ডনের বন্ধু শশধর সিংহ। সঙ্গে তাঁর পত্নী মার্থা। বসুদের মতো সিংহরাও বাড়ি কিনে

বসবাস করছেন। এমনি আরো অনেকে। যার যেথা দেশ। ভারতের তখনকার দিনের ইংরেজ সরকারের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে কট্টর জাতীয়তাবাদী সিংহ চলে আসেন সটান ব্রিটিশ সিংহের বিবরে। পড়াশুনা শেষ করে এইখানেই স্বদেশের কাজ করতে করতে ঘরসংসার পাতেন। স্বাধীনতার কিছু আগে দেশে গিয়ে দায়িত্বের কাজ নেন। পরে আরো বড়ো দায়িত্বের কাজ। কিন্তু বনিবনা হয় না। আদর্শবাদীকে পীড়া দেয় অভিনব বাস্তব। আবার ইংলণ্ড। এখন স্বাধীনভাবে লেখার কাজ নিয়ে আছেন। কিন্তু শরীরটি গেছে। দেখে দুঃখ হয়।

এই পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে বলেই যেন আমি সাত দিনের জায়গায় আট দিন রয়েছি। এঁরা যখন শুভরাত্রি জানিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে চলে যান, তখন আমার মনে হয়, আমার যা যা দেখবার আমি সব দেখেছি, এ যাত্রা আমার আর কিছু দর্শনীয় নেই, এবার বাকী থাকে শয্যাগ্রহণ ও প্রাতরুত্থান ও বিমান ধরার উদ্যোগ।

।। চুয়াল্লিশ ।।

'এ টেল অফ টু সিটিজ।' লণ্ডন আর প্যারিস। লণ্ডন থেকে প্যারিস।

এবার ফ্রান্সের 'কারাভেল' আমাকে নিয়ে উড়ছে আসমান ভেদ করে। খেলাঘরের কেল্লার মতো ইংলণ্ডের তটভূমির নগরগুলি পশ্চাতে পড়ে থাকছে। জল। জল। কিন্তু কতটুকু জল! ইংলিশ চ্যানেলের এপার মিলিয়ে যেতে না যেতে ওপার ভেসে ওঠে।

বিদায়, ব্রিটেন! বন্দে, ফ্রান্স!

ফ্রান্সের কর্ষিত ভূমির উপর দিয়ে ওড়া। দু' চোখ মেলে তার শ্যামল রূপ অবলোকন করা। ফ্রান্স! ফ্রান্স! একদা আমার রোমান্টিক কল্পনার লীলাভূমি ফ্রান্স। নিরাসক্ত মননের ও নিরলস রূপজিজ্ঞাসার সচলায়তন ফ্রান্স। প্রত্যেক মানুষেরই নাকি দুটি করে দেশ। একটি তো তার জন্মভূমি। আরেকটি নাকি ফ্রান্স। অত্যুক্তি সন্দেহ নেই। তবু একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। আমিও এককালে ওটা অনুভব করেছি। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানে আমার মোহভঙ্গ ঘটে।

ফ্রান্সের পতন আমাকে বিচলিত করে। কিন্তু যেসব কারণে আমার মোহভঙ্গ, সেই সব কারণেই তার পতন। তাই নিয়তিকে দোষ দিইনি। ব্যক্তিবিশেষকেও না। ইতিমধ্যে ফ্রান্স যে মাটিতে পড়েছিল, সেই মাটি ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন পশ্চিম ইউরোপের মধ্যমণি। তার একদিকে ইটালী, একদিকে পশ্চিম জার্মানী, একদিকে ইংলণ্ড, একদিকে স্পেন। তার এই স্ট্রাটেজিক গুরুত্ব দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ইউরোপের বিস্ময়। আগেকার দিনে জার্মানীর যে গুরুত্ব ছিল, এখন তা ফ্রান্সের। ইউরোপ দুই ব্লকে বিভক্ত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীও দুই ভাগে বিভক্ত। ঠিক যেমন ভারতবিভাগ ও বঙ্গবিভাগ। এর ফলে ফ্রান্সের দিকে গুরুত্বের কেন্দ্র সরে এসেছে।

ফ্রান্সের অপ্রতিদ্বন্দ্বী জননায়ক তথা রাষ্ট্রপতি দ্য গল এটা জানেন বলেই তাঁর এত জোর আর এত জাঁক। দুই ব্লক জুড়ে যাক, জার্মানী একাকার হোক, তখন ফ্রান্সের এ গুরুত্ব থাকবে না। দ্য গল বাজি হেরে যাবেন। এটাও কি তিনি কারো চেয়ে কম জানেন? সেইজন্যে পশ্চিম জার্মানীর যেটা মূল নীতি তাঁর সেটা মূল ভীতি। জার্মান ঐক্যের জন্যে পশ্চিম জার্মানীর যে আকুলতা, ফ্রান্স তার প্রতি উদাসীন। তাই যদি হলো, তবে পশ্চিম জার্মানী আমেরিকার দিকে না ঝুঁকে ফ্রান্সের দিকে

ঝুঁকবে কোন্ দুঃখে! সেই জন্যে পশ্চিম ইউরোপীয় সংহতি দানা বাঁধছে না, যদিও কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও বহু ব্যাপারে বিভিন্ন দেশ হাত মিলিয়ে দেশোত্তর সংস্থা গড়ে তুলেছে।

দিনটি পরিষ্কার। ফ্রান্স যেন আমার জন্যে কার্পেট পেতে রেখেছে। কিন্তু লাল শালু নয়। প্যারিসের বিমানবন্দর শহরের বাইরে অর্লিতে। সেখানে অবতরণ করে বাস যাত্রা। টার্মিনালে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের রাষ্ট্রদূতাবাসের অতীন্দ্র ভৌমিক আর চিত্রশিল্পী শক্তি বর্মনের সহধর্মিণী চিত্রশিল্পী মাইতে। পতিকুলের দেওয়া নাম রত্না।

বেরিয়ে দেখি এই সেই অ্যাঁভালিদ। নেপোলিয়নের দেহাবশেষ সেণ্ট হেলেনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যেখানে বিপুল সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ হয়। ফরাসী জাতির পরম গৌরবের তথা চরম পরাভবের প্রতীক। ফরাসী বিপ্লব এইখানে এসে বিরতি পায়। শুধু ফরাসীদের ইতিহাসের নয়, মানবজাতির ইতিহাসের একটি অধ্যায় সমাপ্ত হয়। কারণ ফরাসী বিপ্লব কেবল ফরাসীদের জন্যে নয়। সে উদ্দীপনার তুলনা নেই। এক হাতে রাজতন্ত্র, অন্যহাতে ধর্মসঙ্ঘ উভয়কে উৎপাটন করে ফরাসীরা বুনতে চেয়েছিল জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবাধ মুক্তি। সেই সঙ্গে সাম্য। তবে সাম্য ভাবনাটা বিপ্লবীদের সকলের ঐক্যবিধানের সূত্র না হয়ে অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের হেতু হয়। ঐক্য সংস্থাপনের আর কোনো সূত্র না থাকায় ক্ষমতা চলে যায় একনায়কের হাতে। তিনিই পরে হন সম্রাট। রাজতন্ত্র ফিরে এলে ধর্মসঙ্ঘ বাকী থাকে কী করে? পোপের হাত থেকে রাজমুকুট তুলে নিয়ে মাথায় পরেন নেপোলিয়ন। ফরাসী বিপ্লবের চেয়ে ফরাসী গৌরব বড়ো হয়। তবু তার আগুন সম্পূর্ণ নিবে যায় না। কারণ, তিনি স্বয়ং ওই বিপ্লবের শিশু। তাঁর শেষ পরাভবের পর আর আশা করবার কিছু থাকে না। গ্রাঁদ আর্মির ভূমিকা সারা হয়। বিপ্লবের জ্বালা জল হয়ে যায়।

প্যারিসের রাস্তায় পা দিয়ে ইতিহাসের পাতার পর পাতা সামনে দেখতে পাই। লণ্ডনের রাস্তাগুলির প্রত্যেকটির ইতিহাস আছে, কিন্তু প্যারিসের রাস্তাগুলি ইতিহাস থেকে নেওয়া। সমসাময়িক ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের নাম, ঘটনাগুলোর নাম, নেপোলিয়নের সেনাপতিদের নাম, সৈন্যদলের নাম, যুদ্ধক্ষেত্রগুলির নাম। ইতিমধ্যে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট উইনস্টন চার্চিল ইত্যাদির নামও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কে যে নেই, তাই ভাবি। মাইকেল এঞ্জেলো, মোজার্ট এঁরাও আছেন। রম্যা রলাঁকেও লোকে ভোলেনি। তাঁর নামেও একটি বুলভার্দ।

সেদিন আমার রথ আমাকে নিয়ে যায় সাঁজ এলিসী সংলগ্ন একটি পথে। পি ই এন ক্লাবের আন্তর্জাতিক নিবাসে। সেখানে আমার চার দিনের আস্তানা। এবার আমি কারো অতিথি নই, বৈদেশিক মুদ্রা কোথায় যে, প্যারিসের মতো খরচে জায়গায় আরো কিছু দিন থাকব।

যেতে যেতে সেন নদী পার হতে হয়। নদীর বাম তীর দক্ষিণে। দক্ষিণ তীর উত্তরে। শিল্পী আর পড়ুয়াদের পাড়া বাম তীরে। উত্তরেও শিল্পীদের পাড়া আছে। আগে যতবার এসেছি, পড়ুয়াদের পাড়া ল্যাটিন কোয়ার্টারে থেকেছি। সেই দিকটাই আমার চেনা। তারই কাছাকাছি একটি পাড়ায় বর্মণদের বাস। সেদিন তাঁরা তাঁদের কয়েকজন ফরাসী বন্ধুবান্ধবীকে খেতে বলেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাকেও বসিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একটি কন্যা, তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি চমৎকৃত। মা ফরাসী, বাপ জিপসী। তাঁর মুখে জিপসীদের গল্প শুনে ও দুটি-একটি কথা শুনে আমি তো হাঁ।

'মান্যুস' অবশ্য 'মানুষ'। অর্থ প্রায় একই। এমনি আরো কয়েকটি কথা, আধ চেনা, নিম চেনা। ফ্রান্সে এখনো কিছু জিপসী আছে। ফরাসীদের মধ্যে থেকেও ভারতীয়। তবে ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হয়েছে। যদিও তলে তলে হিন্দু। কন্যাটির বিশ্বাস, ওরা মুসলমানের অত্যাচারে দেশছাড়া হয়েছে। মোঘল যুগের শেষের দিকে। ঠিক কোন্ পথ ধরে গেছে তাঁর অজানা। তবে স্থলপথেই গেছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর পূর্বপুরুষ উত্তর ভারতের

পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী। ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে শরণার্থী হয়ে ওরা আরো পশ্চিমেই বা গেল কী করতে, যখন সেসব দেশও মুসলমানদের? সেসব দেশ ছাড়িয়ে যেতে পারলে খ্রীস্টানদের দেশ, কোথায় পেলো এ বার্তা? সেসব দেশেই বা অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে কে?

রহস্য! রহস্য! তবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ওরা ভারত থেকেই গেছে, ওদের ভাষা সংস্কৃতেরই আর-একটি সন্তান, বাংলার সঙ্গেও তার মিল আছে, হিন্দীর সঙ্গে তো নিশ্চয়ই। এটাও স্থির যে ওরা হাজার খানেক বছর আগে স্বদেশ থেকে বেরিয়ে পড়ে। ইরানে ওদের দেখা যায় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। ওদের একটি শাখা কালক্রমে হাঙ্গেরি হয়ে পশ্চিম জার্মানীতে গিয়ে হাজির হয় ১৪১৭ সালে, ইটালীতে ১৪২২ সালে, প্যারিসের দ্বারে ১৪২৭ সালে। তা হলে মোঘল যুগের পূর্বেই ওরা পশ্চিম ইউরোপে উপস্থিত হয়েছে। আবার এটাও স্থির যে, ইউরোপের মাটিতে পা দিয়ে ওরা বলে যে, ওরা তুর্কদের কবল থেকে পলাতক তীর্থযাত্রী খ্রীস্টান। বর্ণনা থেকে মিলে যায় যে, ওরা এক জাতের বেদে, ঘুরে বেড়ানোই ওদের স্বভাব, কোথাও বসতি করতে চায় না, নাচ-গানে ওস্তাদ। কারো সঙ্গে খাপ খায় না বলে ওরা সর্বত্র নির্যাতিত। ইহুদীদের পর ওরাই সবচেয়ে বেশী শহীদ। হিটলার ওদের ঝাড়ে মূলে উচ্ছেদ করেছেন যেখানে পেরেছেন। অথচ ওদের বাদ দিয়ে ইউরোপ নয়। ওরা না হলে মেলা জমে না। ইউরোপীয় গীতবাদ্যে ওদের অনেকের নামডাক আছে।

'বোহেমিয়ান' কথাটা এখন বাংলা সাহিত্যেও চলতি হয়েছে। 'বোহেমিয়ান' যুবকযুবতীরা কি জানে যে, বহুকাল পূর্বে হঠাৎ একদল বেদেবেদেনীকে প্যারিসের সদর দরজায় দেখে তখনকার দিনের ফরাসীরা ঠাওরায় ওরা বোহেমিয়া দেশের আগন্তুক? তার থেকে ওদের জীবনযাত্রার ধারাটাই হয় বোহেমিয়ান ধারা। পরে শিল্পী ও সাহিত্যিক মহলের ওটাই হয়ে দাঁড়ায় আদর্শ। এ নিয়ে কত না উপন্যাস, কত না গল্প, কত না কবিতা লেখা হয়েছে। এমন কি, অপেরা পর্যন্ত।

হে ভারত, তুমি তোমার এই বংশধরদের ভুলেছ। এরা কিন্তু তোমাকে ভোলেনি। এদের উপর যাতে নির্যাতন না হয়, তার জন্যে কি তুমি কিছু করতে পার না? নির্যাতন এদের ললাটলিখন। স্পেনের মহান লেখক সার্ভান্টিস (Cervantes) এদের একজনের উক্তি লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

'Having learnt early to suffer, we suffer not at all . . . the cruellest torment does not make us tremble; and we shrink from no form of death, which we have learnt to scorn. . . . . well can we be martyrs, but confessors never . . . We sing loaded with chains, and in the deepest dungeons . . . . .'

এসব কি বেদে-বেদেনীর মতো কথা? রহস্য! রহস্য! হয়তো এরা কোনো ধর্মসম্প্রদায়ই হবে। সহজযান কি চর্যাপদের সাধনায় বিশ্বাসী। মুসলমানদের উপদ্রবে দেশছাড়া না বর্ণাশ্রমী পুনরুত্থানে সমাজছাড়া, কে বলতে পারে? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? এরা যে মাতৃতান্ত্রিক ও ট্রাইবাল। অথচ আদিবাসী নয়। এরা আর্যভাষী। চেহারাও আর্যের মতো। প্রকৃতির কোলে থাকতে চায় বলেই ভবঘুরে। তা বলে সমাজবন্ধনহীন নয়। শখের বোহেমিয়ানদের এটা অজানা।

ফেরবার সময় আণ্ডারগ্রাউণ্ড দিয়ে ফেরা। প্যারিসের মেট্রো সেইরকমই আছে। রাত কিছু বেশী হয়েছিল। আমার পক্ষে। প্যারিসের পক্ষে নয়। কিন্তু সদর দরজা বন্ধ। কঁসিয়ার্জ নেই যে খুলে দেবে। ভাগ্যিস শক্তি ছিলেন সঙ্গে। তাঁর ছোঁয়া লেগে দরজা আপনি ভিতর থেকে খুলে যায়। নইলে সারারাত পথে পথে বোহেমিয়ান হতে হতো। ভিতরে গিয়ে দেখি লিফ্‌ট আছে। লিফ্‌টম্যান নেই। অটোমেটিকের যুগ। এটার একটা কায়দা ছিল। শক্তি দেখিয়ে দেন। ফ্ল্যাটের চাবি যদিও আমার পকেটে ছিল, তবু তার ব্যবহার আমাকে শেখানো সত্ত্বেও মনে ছিল না। শক্তিপরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। অবশেষে আমি আমার ঘরে ঢুকতে পাই।

।। পঁয়তাল্লিশ ।।

সাঁজ এলিসীর পূর্ব প্রান্তে প্লাস দ্য লা কঁকর্দ আর পশ্চিম প্রান্তে এতোইল। পূর্ব প্রান্তে ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদ উন্মাদনার সাক্ষ্য। আর পশ্চিম প্রান্তে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের বিজয়তোরণ। পূর্বটাই তো পূর্বে। সেখানেই প্রথমে যাই।

কী সুন্দর নাম! প্লাস দ্য লা কঁকর্দ। বিসম্বাদের নয়, মিতালির স্থান। অথচ এইখানেই কিনা সন্ত্রাসের রাজত্ব। গিলোটিন যন্ত্র স্থাপন করা হয় এইখানেই। রাজা ষোড়শ লুই, রানী মারি আঁতোয়ানেৎ থেকে আরম্ভ করে কত মানুষকে যে গিলোটিন করা হয় তাঁদের নামের তালিকায় স্বয়ং গিলোটিন যন্ত্রের উদ্ভাবক গিলোটিন মশায়ও পড়েন। রাজতন্ত্রীদের পর প্রজাতন্ত্রীদের পালা, বামপন্থীদের পর অতি-বামপন্থীদের পালা। এমনি করে একে একে নিহত হন ফরাসী বিপ্লবের নাটের গুরু দাঁতঁ, স্যাঁ জুস্ত, রোবেসপীয়ার প্রমুখ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ। তিন লাখ নরনারীকে সন্দেহ সূত্রে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের মধ্যে সতেরো হাজারকে গিলোটিন করা হয়। হাঁ, এইখানেই। যেখানে আজ আমি দাঁড়িয়ে। রক্তের দাগ কি সত্যি মুছে গেছে?

আহা, সেই হতভাগ্য রাজা! তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে কি না, এটা সাব্যস্ত হয় প্রজা-প্রতিনিধিদের ভোট নিয়ে। ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। যেমন হিন্দী বনাম ইংরেজী। মাত্র একটি ভোটের আধিক্যে কতবড়ো একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যায়! বাইশ বছর যেতে-না-যেতে বুরবঁবংশীয় রাজারা আবার সিংহাসনে বসেন। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তবাগীশদের অনেকেই গিলোটিনে চড়ে স্বর্গে চলে গেছেন।

সেইজন্যেই কি এই তরুবীথিশোভিত প্রশস্ত রাজপথ বা জনপথের নাম 'স্বর্গীয় ময়দান'? পূর্ব প্রান্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিম প্রান্তে তাকাই। দূরে, বহুদূরে বিজয়তোরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেদিকটা উঁচু। কিন্তু মাঝখানে ওসব কী! হাজার হাজার পাখি যেন ডানা ঝটপট করছে। হাজার হাজার ছাতাও হতে পারে। উঠছে আর নামছে। কী ব্যাপার? বাইনোকুলার ছিল না। অনিমেষ নিরীক্ষণ করি। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর বুদ্ধি খুলে যায়। উটের কাফেলা নয়, মোটরের কাফেলা। এদিক থেকে দু'সার কি তিন সার মোটর ছুটে যাচ্ছে। ওদিক থেকে দু'সার কি তিন সার মোটর ছুটে আসছে। মোটর! মোটর! মোটরে মোটরারণ্য! এই রাস্তা একাই চারটে রাস্তার সমান। আর এই প্লাসও পৃথিবীর বৃহত্তম প্লাসগুলির অন্যতম। রমণীয়তম প্লাসগুলির অন্যতমও বটে।

এক শতাব্দী আগে প্যারিস শহরটাকে ঢেলে সাজাবার ভার দেওয়া হয় হাউসমান নামক নগরশাসককে। মাথার উপর ছিলেন খোদ সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন, আর সামনে ছিল তাঁর ঢালা হুকুম। কাজেই বেপরোয়াভাবে হাউসমান চালিয়ে যান তাঁর ভাঙাগড়া। জ্যামিতি আর সুমিতি এই দুই ভাবনা ছাড়া তাঁর তৃতীয় কোনো ভাবনা ছিল না। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। ওই টাকাই তাঁর কাল হয়। পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে হিসাব মেলে না। কিন্তু যা রেখে গেছেন হাউসমান তা নগর পরিকল্পনার দিক থেকে একটা বিপ্লব।

এইসব বুলভার্দ আর আভেনু আর স্কোয়ার আর প্লাস এমন ছক কেটে বানানো হয়েছে যে একটা থাকলে তার বিপরীতটাও থাকে। তৃতীয় নেপোলিয়ন তো এইজন্যেই বেঁচে আছেন। আশ্চর্য ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ছিল তাঁর। কেমন করে জানলেন যে মোটরগাড়ী উদ্ভাবন করা হবে আর ফরাসীরা তাই নিয়ে মেতে উঠবে আর চালাবার জন্যে লম্বা চওড়া সড়ক চাইবে? এক শতাব্দী আগে না করে পরে

করলে দশ গুণ কি বিশ গুণ খরচ পড়ত। তৃতীয় নেপোলিয়নের তৃতীয় নয়নের প্রশংসা করতে করতে চলি ভৌমিকের মোটর যানে। শুনতে পাই প্রতি পাঁচজন ফরাসীর একটি করে হাওয়া গাড়ী। শ্রমিকরা আর ধর্মঘট করে না। অনন্য মনে মোটর নির্মাণ করে! সব ক'টা না হোক কয়েকটি কারখানা এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। কিন্তু ডান দিকে না বাঁ দিকে একদিকে ঘুরে গিয়ে কী একটা কেনার দরকার হতেই দেখি পথে মোটর ঘোরানোর উপায় নেই। যেতে হবে সেই বিজয়তোরণ অবধি, গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে মোড় নিতে হবে। তার মানে শুধু মোটর থাকলে চলবে না, তেলও থাকা চাই। ফরাসীদের এখন খুব তেল হয়েছে। তা তো প্রত্যক্ষ।

যুদ্ধে একটি বাড়িও ভাঙেনি। হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে এসব পুরোনো দৃশ্য আর আস্ত থাকত না। হিসাবে তাতে লোকসান হয়নি, কিন্তু আত্মসম্মানে সেই যে ঘা লেগেছে সেটা একটা চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে গেছে। ভাগ্যিস একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্রতিরোধও ছিল। তা না হলে ফরাসীরা মুখ দেখাত কী করে। দ্য গলের প্রতিপত্তির মূল কারণ বাইরে থেকে প্রতিরোধ চালিয়ে তিনি স্বাধীনতার হোমানল জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। আর এখনো তাঁর মূলনীতি হলো সেই আত্মসমর্পণের গ্লানি থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করা। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ইতিমধ্যে আরো কয়েকটা গ্লানি। যেমন ইন্দোচীনে পরাজয়, সুয়েজে পশ্চাদ্ অপসরণ, আলজেরিয়া থেকে মানে মানে বিদায়। এই শেষ সিদ্ধান্তটি তিনি ভিন্ন আর কেউ নিতে পারতেন না। প্রাণের মায়া থাকতে তিনিও কি পারতেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে প্রমাণ করতে হচ্ছে যে ফ্রান্স দুর্বল নয়, দরিদ্র নয়। তা যে নয় তার প্রমাণ শুধু পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নয়, অর্থনৈতিক নিরিখে ফ্রান্স এখন আগের চেয়ে অনেক তেজী।

নদীর এপার ওপার ঘোরাফেরা করে পরিচয়টা ঝালিয়ে নিই। ভৌমিকরা থাকেন বোয়া দ্য বুলোন ছাড়িয়ে। তাঁদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন করে আবার নিষ্ক্রমণ। এবার আমার সেকালের স্মৃতিজড়িত ল্যাটিন কোয়ার্টার। পথে যেতে যেতে একটা বাড়ির দিকে ইশারা করে ভৌমিক বলেন, 'জাঁ-পল সার্তর ওখানে থাকেন।' তাঁর মতো আরো অনেকেরই সেন নদীর বাম তীরে বাস। বাম তীর আর বামপন্থী একাকার হয়ে গেছে। বোহেমিয়ান আজকাল আর চোখে পড়ে না। সমৃদ্ধির মান বেড়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বোহেমিয়ান জীবনধারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু কমিউনিস্ট জীবনবেদ বাসি হয়ে যায়নি। ওই যে সার্তর উনি অতন্দ্র। একদিকে যেমন দ্য গল অপর দিকে তেমনি সার্তর। কোনো আপোস নেই, মধ্যপন্থা নেই। যে সত্তা একদা বিপ্লব ঘটিয়েছিল সে ঠিক এই মুহূর্তে ইতিহাসের মঞ্চ জুড়তে পারছে না, কিন্তু ফ্রান্সের বামপন্থা আত্মবিশ্বাসে প্রতীক্ষারত। এও এক শবরীর প্রতীক্ষা।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেসব কাফে রেস্তোরাঁ আর সেইরূপটি নয়। সেই যে একটা ঢিলে ঢালা দিল খোলা ভাব সেটা গেছে। সময়ের দাম অনেক, জিনিসপত্রের দাম অনেক, শ্রমের দাম অনেক। কম দামী আজকের দিনে কী আছে? বোধহয় মানুষের প্রাণ। রাষ্ট্র যখন খুশি দাবি করে বসবে। তা নিয়ে খুব যে একটা মাথাব্যথা আছে তা নয়। এক পুরুষ আগে এটা ছিল। এখন ঘরপোড়া গরু আর সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় না। কপালে যা আছে তা হবে। ভেবে কি কোনো ফল আছে? মানবিকবাদ বলতে যদি বোঝায় মানবনিয়তির উপরে হাত তবে সেটা কমিউনিস্ট মহলে হয়তো আজো টনটনে। সাধারণ মানুষ তার চেয়ে পারমাণবিকবাদে আস্থাবান। মদ, জুয়া ইত্যাদি দারুণ বেড়ে গেছে।

সন্ধ্যায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। ব্রিয়ের দম্পতীর ককটেল পার্টি। এঁদের সঙ্গে আলাপ জাপানে। পি ই এন কংগ্রেসে। বিজয়তোরণের অনতিদূরে এঁদের ফ্ল্যাট। আশ্চর্য নির্জন পরিবেশ। যেন শহরে

থেকেও শহরে নেই। এক এক করে আসেন প্যারিসের লেখক লেখিকারা। কিন্তু সেই সঙ্গে ডাক্তার ডাক্তারপত্নীরা। কারণ স্বামী ডাক্তার। কয়েকজন প্রখ্যাত লেখক লেখিকার সঙ্গে নামমাত্র আলাপ হলো।

ফ্রান্স এমন দেশ যেদেশে সেনাপতিরাও সাহিত্যে যশঃপ্রার্থী। তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়েই ক্ষান্ত নন। সাহিত্যেও অমর হবেন। সুতরাং সাহিত্যের স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছে কে? দ্য গল ডিকটেটর নন। ব্যক্তিস্বাধীনতা তাঁর আমলে কমেনি। কিন্তু ফ্রান্সের ঐতিহ্য হচ্ছে রাজনীতিকদের চেয়ে এদেশে সাহিত্যিকদের সম্মান বেশী। এমনটি বোধহয় আর কোন দেশে নেই। এমন কি ভারতেও না। ভলতেয়ার রুশো দিদেরো প্রভৃতি যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন সেটা হলো সাহিত্যিকের সব বিষয়ে কথা বলার অধিকার। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম কোনো বিষয়ই বাদ নয়। এই তো সেদিন আঁদ্রে জীদ এমন সব নিষিদ্ধ বিষয়ে লিখে গেলেন যে ফ্রান্স বলেই সব চেয়ে কম ঝড় উঠল। সাহিত্যিক কী নিয়ে লিখবেন, কেন লিখবেন এর জবাবদিহি আর কারো কাছে নয়, তিনি তাঁর এলাকায় সোভরেন। বহু সাহিত্যিকের জেল জরিমানার ফলে এই অধিকারটা ফরাসী সাহিত্যিকরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন।

কিন্তু দ্য গলের অভ্যুদয়ে রাজনীতিকরা যেমন নির্বীর্য হয়েছেন সাহিত্যিকদেরও তেমনি বিশুদ্ধ সাহিত্য নিয়ে এইটুকু সীমার বাঁধনে বাঁধা থাকতে হচ্ছে। এতে তাঁরা সুখী নন। ফরাসী সাহিত্যিকদের জন্যে এক শ' পুরস্কার। সরকার থেকে নয়, বিভিন্ন সংস্থা থেকে। অর্থের অভাব নেই। স্বাধীনতারও অভাব নেই। কিন্তু অভাব সেই ভূমিকার যে ভূমিকা সেকালে ইতিহাস রচনা করেছে। হেন বিষয় নেই যে বিষয়ে ফরাসী লেখকরা দু'কথা বলতে ছাড়তেন। কিন্তু এখন সকলেই জানেন যে লিখে কোনো ফল হবে না। রাজনীতি বা অর্থনীতির উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। নিজের চরকায় তেল দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। অতএব কলকাতায় যা দেখা যাচ্ছে প্যারিসেও তাই। বাড়ি, গাড়ি, নারী। অবশ্য ফ্রান্স শেষোক্ত বিষয়ে আরো উদার।

আলাপই ছিল ফরাসীদের প্রাণ। এখনো আছে, কিন্তু এ আলাপে প্রাণ নেই। কারণ এতে সংসার বা সমাজ বদলে যায় না। দ্য গল ও জনসাধারণের মাঝখানে দাঁড়াবার সাধ্য কারো নেই। তাঁর মতে তিনি ঠিকই করছেন, লোকের মতেও তাই। অপোজিশন একটা আছে বইকি। কিন্তু পাল্টা নীতি কেথায় যে অপোজিশনকে লোকে জিতিয়ে দেবে? কমিউনিস্টরা যা করত তাও তো তিনি করে রাখছেন। অনেক কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর। রুশের সঙ্গেও তিক্ত নয়। তাঁর বনিবনা হচ্ছে না মার্কিনদের সঙ্গে, ইংরেজদের সঙ্গে। জনমত তাঁরই দিকে। যদিও উচ্চবিত্ত মহলের মত তা নয়। সংস্কৃতিবান মহলের মতও তা নয়।

এককথায় সাহিত্যিকরাও ডাক্তারদের মতো প্রোফেশনাল হয়ে যাচ্ছেন। তা যদি হয় তবে তাঁদের রচনাও সারজিকাল অপারেশনের মতো নিখুঁত ও যথাতথ্য হবে। কিন্তু রুগী বাঁচবে কি? না সেটা সার্জনের ভাবনা নয়? রিয়ালিটিকে চিরে চিরে দেখতে গেলে তার সাক্ষাৎ মেলে না। অসুখ সারানোর অভিপ্রায় থাকলে অসুখও সারে না। যে অসুখ আমি তখন লক্ষ করেছি সে অসুখ এখনো লক্ষ করছি। ফ্রান্সের সে 'malaise' মজ্জাগত। বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব প্রায় দুই শতাব্দী ধরে তার রক্তের ভিতরে বাসা বেঁধেছে। এটা রাজনীতি অর্থনীতির চেয়ে গভীর স্তরের ব্যাপার। এর মধ্যে দর্শনের প্রশ্ন আছে। জীবনদর্শনের প্রশ্ন। সহজে এর হাত থেকে নিস্তার নেই। ফ্রান্স জার্মানীর মতো দু'ভাগ হলে হয়তো বা কতকটা সুস্থ বোধ করত। সেটা তো কেউ চায় না। অথচ বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লব কোনোটাই কোনোটাকে পথ ছেড়ে দেবে না। মধ্যপন্থা ফরাসীদের অজানা। এটা শ্রেণীদ্বন্দ্ব নয়, তার চেয়েও গভীর স্তরের অন্তর্দ্বন্দ্ব। জার্মানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এর চেয়ে ঢের সহজ। আর

ইংরেজদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তো মধ্যবিত্তরা মাঝখানে থেকে বাফারের মতো রোধ করছে।

ফ্রান্স, তোমার জন্য আমি চিন্তিত।

॥ ছেচল্লিশ ॥

প্যারিসে আমার দুটি প্রিয় কৃত্য ছিল। ও দুটি যতক্ষণ না সারা হয়েছে ততক্ষণ আমার সোয়াস্তি নেই। পরের দিন লুভর মিউজিয়ামে গিয়ে ওই দুই প্রিয় বান্ধবীর পুনর্দর্শন লাভ করে আসি। ওঁদের বয়স একটা দিনও বাড়েনি। ওঁরা চিরযৌবনা। আমিই বুড়িয়ে গেছি। তা হোক। ওঁদের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াই তখন আমারও বয়সের মুখোস খসে পড়ে। আমিও যৌবন ফিরে পাই। আবার খুঁজে পাই তাকে যে ভিনাস ডি মিলো আর মোনালিসা দেখতে দেখতে দেশকাল ভুলে রূপলোকে হারিয়ে যেত।

আবার আমি হারিয়ে যাই। রূপলোকে হারিয়ে যাই। আমার প্রত্যয় হয় এই সত্য, আর সব মায়া। শিল্পীর চেয়েও সত্য সে যাকে সৃষ্টি করে। সে তো নিমিত্তমাত্র, তার কথা মনে রাখবে কে? ভিনাস ডি মিলো যে কার হাতের প্রতিমা কেউ তা জানে না। আর মোনালিসা যে লেওনার্দো দা ভিঞ্চির হাতের পট তা জানা থাকলেও তাঁর চেয়ে তাঁর সৃষ্টিরই সমাদর বেশী। তাঁর সৃষ্টির মূল্যেই তাঁর মূল্য।

যেদিক থেকেই দেখি না কেন মোনালিসা আমার দিকে তাকিয়ে। আমি যাই তো তিনি আমার পিছন পিছন যান। বার বার ফিরে তাকাই। ফিরে আসি। শেষকালে জোর করে ছাড়িয়ে নিই আপনাকে। ওই হয়তো শেষ দেখা। তবু বলি, পুনর্দর্শনায় চ। তেমনি ভিনাসের বেলা। ভিনাস মূর্তিকে সামনে থেকে পাশ থেকে পিছন থেকে যেদিক থেকেই নিরীক্ষণ করি না কেন সমান সুন্দর। সমান জীবন্ত। মূর্তিতে জীবন্যাস করার এই যে কৌশল এর ছাপ প্রতি অঙ্গে। 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।' কিন্তু যতই কাঁদি আর যতই বিলাপ করি, হে রতি, তোমার ওই বাহু দুটির কী যে ভঙ্গী তা অনুমানের অসাধ্য। তুমি কি আমাকে ধরা দিতে আসছিলে না ঠেলা দিতে আসছিলে? বাহু দুটি ভেঙে দিয়ে মহাকাল কী যে রঙ্গ করেছেন! অনুমান করতে করতে পাগল হয়ে যাই আর কি!

এই লুভর মিউজিয়ামের চিত্রভাস্কর্যশালা এক মহাতীর্থ। যাঁদের কীর্তি এখানে সমাহৃত হয়েছে তাঁরা দেশকালের সীমা অতিক্রম করেছেন। তাঁদের কীর্তিই তাঁদের জীবন। তাঁরা জীবিত। আমি যখন জীবিত থাকব না তখনো তাঁরা জীবিত থাকবেন। একথা স্মরণ হতেই মাথা আপনি নত হয়। তাঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলবার ছিল, সেটা বলারও একটা রীতি ছিল, পদ্ধতি ছিল। একালের শিল্পীরা সেসব রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন না, সেসব বক্তব্যেরও ধার ধারেন না, তা বলে কি এঁরাই ঠিক, ওঁরা বেঠিক? এখানে দৃশ্যের সঙ্গে দর্শকের সরাসরি সম্পর্ক। চোখ যদি আটকে যায়, যদি তৃপ্তি পায় তাহলে প্রকৃতির অনুকৃতি বলে বা জীবনের সদৃশ বলে এককথায় লাঘব করতে পারি কি? অনুকৃতি বা সাদৃশ্যই সব কথা নয়। এর ভিতরে আরো কিছু আছে। তার নাম সৌন্দর্য। যাঁরা গড়েছেন বা এঁকেছেন তাঁরা নয়নগামী সুন্দরকে দেখেছেন, তার সঙ্গে অন্তরবাসী সুন্দরের যোজনা করেছেন। সেও সুন্দর। তা ছাড়া এতে রয়েছে এক একজন সৌন্দর্যসাধকের

হাতের স্বাক্ষর। আত্মার স্বাক্ষর। আধুনিকরা যদি তাঁদের খাটো করেন পরবর্তীরা এঁদেরও খাটো করবেন।

অপরপক্ষে পূর্বসূরীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে আধুনিক আর্ট যথেষ্ট স্বাধীনতা পেতো না, গতানুগতিকের জের টেনে চলত। সমাজে ও রাষ্ট্রে যদি বিপ্লব ঘটে থাকে তো আর্টে ঘটাও বিচিত্র নয়। বরং সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব ব্যাহত হয়েছে বলেই আর্টের ভিতর দিয়ে অবাধে পথ কেটে নিতে চেয়েছে ও পেরেছে। সাহিত্যের চাইতেও চিত্রকলা ও ভাস্কর্য এদিক দিয়ে এগিয়ে। সাহিত্যে উপরওয়ালাদের দিক থেকে বাধা পেয়ে আপনাকে আপনার খোলার ভিতর গুটিয়ে নিচ্ছে। কিংবা রূপের চেয়ে রসের চেয়ে বাণীকেই সার মনে করে যেদিকে মোড় নিচ্ছে সেটা বামপন্থী হতে পারে, কিন্তু রূপসম্পন্ন নয়, রসসম্পন্ন নয়। ললিতকলা কিন্তু সোজাসুজি বিদ্রোহী। এটা রাজনৈতিক অর্থে নয়। বরং রাজনীতিকে এড়াতে গিয়ে অপর অভিমুখে অভিযান। সেটা কলাবিদ্যার নিজের ঘরে। বাপ ঠাকুরদাদের বিরুদ্ধে। প্যারিস এর সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠ। শিল্পীদের এখানে সাত খুন মাফ। মায় সামাজিক অনীতি।

সেন নদীর বক্ষে যুগল স্তনের মতো ছোট ছোট দুটি দ্বীপ। সেতুবন্ধের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। তাদের একটিতে নোৎর দাম। দ্বাদশ শতাব্দীর এই ক্যাথিড্রাল প্যারিস নগরীর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। স্থানমাহাত্ম্য আরো আট শ' বছর পুরাতন। এর অভ্যন্তরে গিয়ে মধ্যযুগের ধর্মপ্রাণতার আবহে নিঃশ্বাস নিই। যেমন পুরীর মন্দিরের অভ্যন্তরে। তেমনি প্রার্থনা আরাধনা চলেছে। মোমবাতি জ্বলছে। ধূপ পুড়ছে। যাজকরা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। সন্ন্যাসিনীরা যাত্রীদের সাহায্য করছে। ভগবৎ প্রেম ও মানবপ্রেম যীশুর ও তাঁর জননীর জীবন অবলম্বন করে আশীর্বাদের মতো ঝরে পড়ছে। সব অশান্তি শান্তিতে গলে যাচ্ছে। পাপীতাপীরও এই পুণ্যক্ষেত্রে ঠাঁই আছে। অকপটে পাপ স্বীকার করলেই পাপের বোঝা নেমে যায়।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখি নতুন এক মূর্তি। এই শতাব্দীর। কে ইনি? জোন অফ আর্ক। সেই যাঁর আধুনিক নাম সেন্ট জোন। মধ্যযুগের গির্জাকে আধুনিকতা দিচ্ছে এঁর প্রতি সুবিচার। এঁর ভক্তরা এঁর মূর্তির কাছে মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে যাচ্ছে। হৃদয়ে স্থান তো চিরদিন ছিল। মন্দিরে স্থান এই প্রথম। আমারও সাধ যায় মোমবাতি কিনে নিয়ে জ্বালাতে, কিন্তু পেছিয়ে যাই। মনে মনে প্রণাম নিবেদন করি সেই প্রাণকে যা আগুনে পুড়ে ভস্ম হয় না, যা আগুনের চেয়ে অনির্বাণ। ইতিহাস কেবল অন্যায়ের সাক্ষী নয়, অবশেষে ন্যায়ের জয়েরও সাক্ষী। কিন্তু যে দুঃখ নিরপরাধকে পেতে হলো সে দুঃখ তা বলে দূর হয় না। সম্ভবত জোনের জীবনের ওইটেই নাটকোচিত পরিণতি। বিধাতা নামক নাট্যকার ও ছাড়া আর কী করতে পারতেন? কী করলে ঠিক মানাত?

নদীর উত্তরবাহু পেরিয়ে ওপারে যাই। যেতে যেতে যেখানে পৌঁছই, সেখানে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন সৌধ কোনো রকমে খাড়া আছে। মাথার উপর বাড়ি পড়ো পড়ো। এসব পাড়ায় যারা বাস করে, তারা গরীব ইহুদী বা আলজেরিয়। তাদের দেখে মনে হয় যেন আমাদেরি দেশের লোক। আর তাদের পাড়া যেন আমাদেরি কোনো একটা পাড়া। কিন্তু ওরই এক স্থলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সেকালের ভদ্রাসন রয়েছে। এই যেমন রাজমন্ত্রী সুলির 'ওতেল'। হোটেল কথাটার আদি অর্থ ভবন। মোজার্ট যখন প্যারিসে থাকতেন তখন তাঁর যেটা আস্তানা ছিল, সেটা যদিও বেদখল হয়ে গেছে তবু তার অস্তিত্ব আছে। বিরাট এক সদর দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। ভিতরে বিভিন্ন বাড়ি।

এ পাড়ার গলিগুলোর উপর হাউসমানের দৃষ্টি পড়েনি মনে হয়। এই হলো সনাতন প্যারিস।

যেমন সনাতন কাশী। একে বিদায় দেওয়া সহজ হবে না। নূতন ও পুরাতন পাশাপাশি সহ-অবস্থান করবেই। সুলির বাসভবন যেমন পুরাতন বলে রক্ষণীয় র‍্যু স্যাঁৎ আঁতোয়ানও তেমনি পুরাতন বলে রক্ষণযোগ্য। প্যারিসের প্রাচীনত্বের নিদর্শন তো নির্বিচারে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। যে শহর যত প্রাচীন তার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দাখিলের দায় তত বেশী। তবে এসব দালান কিছুদিন বাদে আপনি পড়ে যাবে। জমির যা দাম, বাড়িওয়ালার স্বার্থ পড়তে দেওয়া। তখন স্কাইস্ক্রেপার উঠবে। রাস্তাও চওড়া হবে।

থিয়েটারের টিকিটের ভার মাইতের উপর ছিল। প্যারিসে অন্তত পঞ্চাশটা থিয়েটার। কিন্তু কোথাও কম নোটিসে টিকিট পাওয়া যায় না। ভাগ্যক্রমে রেনেসাঁস থিয়েটারে টিকিট মেলে। সেখানে মার্সেল মার্সো তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মূকাভিনয় দেখাবেন। মাইম বা প্যান্টোমাইম। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সেখানে গিয়ে জমিয়ে বসি। ভিড় কম নয়। মূকাভিনয় দেখতে যে এত লোক আসতে পারে এটা কল্পনা করা শক্ত।

মূকাভিনয়ের ঐতিহ্য গ্রীক রোমান যুগ থেকে প্রবহমান। ভরতনাট্যের মতো এরও কতকগুলি নিয়মকানুন আছে। অভিনয় যিনি করবেন তিনি একক। একাই তিনি বিভিন্ন ভূমিকায় বিচিত্র অভিনয় করবেন। এই মুহূর্তে তিনি খুনের আসামী, এর পরের মূহূর্তে তিনিই পুলিশ, ক্ষণকাল পরে তিনিই বিচারক, অবশেষে তিনিই জল্লাদ, আবার তিনিই মৃত। বেশ পরিবর্তন করতে হয় না। ইঙ্গিতের সাহায্যে, ভঙ্গীর সাহায্যে, বোঝাতে হয় কে তিনি, কী তিনি করছেন, কাহিনীটা কী।

গত শতাব্দীর প্যারিসে দেবুরো বলে এক জন প্রসিদ্ধ মূকাভিনেতা ছিলেন। পিয়েরো বলে একটি চরিত্র তাঁর অমর সৃষ্টি। তীর্থযাত্রীর মতো দলে দলে লোক যেত পিয়েরোর বিষণ্ণ মুখ দেখতে। তাঁর সেই ধারা এখনো বহতা রয়েছে। মার্সো সেই ধারার মূকাভিনেতা। এঁরও একটি চরিত্রসৃষ্টি আছে। বিপ তার নাম। সেদিন প্রথম অর্ধে আমরা ছোট ছোট কয়েকটি পালা দেখে দ্বিতীয় অর্ধে দেখি বিপ নামক চরিত্রনাট্যের নানা অঙ্ক। শেষ অঙ্কে বিপ বিভিন্ন ভাবের মুখোশ মুখে আঁটছে। সত্যিকার মুখোশ নয়। কাল্পনিক মুখোশ। কিন্তু একটি মুখোশ তার মুখে এঁটে যায়। সে কিছুতেই খুলতে পারে না। সেটা হাসির মুখোশ। অথচ অভিনয়টা সবচেয়ে করুণ। আমরা হাসব না কাঁদব!

মার্সো সব মানুষের ও সব জিনিসের অনুকরণ করতে পারেন। তাঁর দেহ সুগঠিত ও নমনীয়। মেক-আপের ধার অল্পই ধারেন। ভুরুর উপরে আরো এক জোড়া নকল ভুরু কেন যে আঁকা ছিল জানিনে। বোধ হয় ভাব-প্রকাশের দিক থেকে ওটাই ব্যঞ্জনাময়। মূকাভিনয় সাধারণ অভিনয়ের চেয়ে কঠিন। বাক্যের সহায়তা না নিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে হয়, অথচ দর্শকের বোধগম্য হওয়া চাই।

॥ সাতচল্লিশ ॥

প্রতিদিন আমার জন্যে অলৌকিক ঘটনা ঘটবে, নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝখানেও আকাশ থেকে আলোর নহর নামবে, রেনকোট গায়ে না দিয়ে দিব্যি ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াব। একটানা এমন সৌভাগ্য কি আমি প্রত্যাশা করতে পারি যে, পরের দিন বৃষ্টিতে বেরোতে না পেরে

মুখ অন্ধকার করে বসে থাকব?

না, প্যারিস শহরে কেউ বসে নেই, যে যার কাজে বেরিয়েছে। মাইতে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায় ওদের ফ্ল্যাটে। ওদের দু'জনের স্টুডিওতে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিয়ে যায় মডার্ন আর্ট মিউজিয়াম দেখাতে। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে গেছে। বাসে চড়ে চলেছি একদল সন্ন্যাসিনীর সহযাত্রী হয়ে।

কিন্তু কিসের একটা ছুটি ছিল সেদিন। মিউজিয়াম বন্ধ। নিরাশ হতে হলো। কারণ পরের দিন প্লেন ধরার আগে সময় পাব না। ল্যাটিন কোয়ার্টারে যাই, ছবির বই দেখি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। ঘোল কিনি। দেশে ফিরে গিয়ে আস্বাদন করা যাবে।

নৈশভোজনের জন্যে ব্রিয়ের দম্পতীর নিমন্ত্রণ। একটি ইটালিয়ান রেস্টোরান্টে। বিজয়তোরণের অদূরে। ইটালিয়ানরা এ বিদ্যায় ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী। তা ছাড়া ওদের কয়েকটা পদ আছে যা অমৃতসমান। ইতালী বেড়িয়ে এসে ব্রিয়ের দম্পতী ভুলতে পারছেন না। এই সূত্রে তাঁদেরও ইটালী পুনর্ভ্রমণ হয়ে যায়। আমারও। এযাত্রা আমি ইটালীর উপর দিয়ে উড়ে যাব। নামব না।

আমার গোটা কতক জিজ্ঞাসা ছিল। মাদামকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি। নাৎসীরা প্যারিস দখল করার পর প্যারিসের জীবনযাত্রা কেমনতর হয়েছিল? ফরাসীদের পক্ষে দুর্বহ? বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন?

ব্রিয়ের দম্পতী সে সময় প্যারিসের বাইরে গিয়ে কোনো একটি ছোট শহরে বাস করেন। সেটাও নাৎসীদের দখলী এলাকায়। তবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিন্তু প্যারিসে যাঁরা থেকে যান তাঁরাও নিরাপদে থাকেন। নাৎসীরা ফরাসীদের সঙ্গে সাধারণত ভালো ব্যবহারই করত। স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ করত না। তবে প্রতিরোধ করলে প্রতিশোধ নিত।

ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের সেই কলঙ্কিত অধ্যায় নিয়ে আমি আর বেশী নাড়াচাড়া করতে যাইনি। দেশের একভাগ লোক যে নাৎসী পক্ষে ছিল, এটা এখন ইতিহাস। রেনোর মোটর কারখানা পরে এই অপরাধে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। নাৎসী অধিকারের সময় কলকারখানা সমানে চলেছে, জার্মানদের সরবরাহ করে লাভবান হয়েছে।

ফ্রান্স পাঁচ বছরকাল পরাধীন হয়েছে, ইংলণ্ড একটা দিনও পরাধীন হয়নি। এই দুটি তথ্যের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা উনিশ বিশ নয়, সেটা আকাশ পাতাল। নীতির দিক দিয়ে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে সেটা এমন একটা বৈরূপ্য যে, বিশ পঁচিশ বছরে বিলুপ্ত বা বিস্মৃত হবার নয়। উভয়ের সম্পর্ক সহজ হতে আরো বেশী সময় লাগবে। দ্য গল নামক ব্যক্তিবিশেষ নন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাগ্যবৈষম্য এর জন্যে দায়ী। দ্য গল ওটাকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছেন। নতুন কোনো বীরত্বের পরিচয় না দিলে ওটা মুছে যাবে কি শুধু হাইড্রোজেন বোমা বানিয়ে? ইংলণ্ড সেদিক দিয়ে ইতিহাসের পাতায় এগিয়ে রয়েছে।

জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এদের এক এক দেশের এক এক নিয়তি। কী করে এরা এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে পশ্চিম ইউরোপীয় কনফেডারেশন গঠন করবে? বৈষয়িক স্বার্থ যদি বা সমান হয় তবু নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি অসমান। অবস্থার চাপে বাধ্য না হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার মতো পটভূমিকা কোথায়?

তা হলে কি নেশন স্টেট চিরন্তন? না, তার দিন যাচ্ছে। ফরাসী সম্পত্তিবানরা জার্মান সম্পত্তিবানদের সঙ্গে যুদ্ধকালে হাত মিলিয়েছিলেন, পরেও মিলিয়েছেন। ধনতন্ত্রবাদ জাতীয়তাবাদকে প্রত্যহ অতিক্রম করছে। ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি বিবর্তিত হতে হতে নেশনস্টেটকে অতিবর্তন করবে। তেমনি নর্থ আটলান্টিক ট্রীটি অর্গানাইজেশন বিবর্তিত হতে হতে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানীকে অতিবর্তন করবে। এমনি অনেকগুলি সংস্থা বিবর্তিত হতে হতে সরকারগুলিকে অতিবর্তন করবে। কনফেডারেশন বলে প্রত্যক্ষ কিছু হয়তো হবে না, কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে যা যা হবে তাদের একসঙ্গে ধরলে বেনামীতে ওই একই জিনিস হবে।

এই আশা নিয়ে আমি দেশে ফিরব যে, ফের যুদ্ধবিগ্রহ না বাধলে পশ্চিম ইউরোপ ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধবে আর যুদ্ধবিগ্রহ যদি বাধেই তবে ক্রমে ক্রমে নয়, অবিলম্বে দানা বাঁধবে।

পায়ে হেঁটে সাঁজ এলিসী দিয়ে আন্তর্জাতিক নিবাসে ফিরি। রাতের প্যারিস তার জৌলুস নিয়ে চার দিক আলো করে রয়েছে। দিনের আলোতেই বরং সে নিষ্প্রভ। এইবার নাইট ক্লাবের জীবন শুরু হবে। আমার নিবাসের দিকে পা বাড়াতেই নাইট ক্লাব। বাইরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একরাশ ছোট ছোট ফোটোর মালা। দাঁড়িয়ে যাই। নিরীক্ষণ করি। নগ্ন নারী অঙ্গের ভঙ্গী। এও একপ্রকার মূকাভিনয়, কিন্তু এর আবেদন আর্টের নয়। পর্নোগ্রাফির। নারীর লজ্জাহীনতাই এর পুঁজি। পুঁজিবাদ নারীকে কোন নিম্নতায় নামিয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকেও!

পরের দিন সকালে সওদা করতে বেরোই। মেয়ের জন্মদিনের জন্যে কেক কিনতে হবে। এসেন্স কেনা, রেকর্ড কেনা এগুলিও আমার তালিকায়। তা ছাড়া এমনি একবার দোকান পসারের উপর চোখ বুলিয়ে নিই। প্যারিসের প্রাণ তার ছোট বড়ো বিপণি। মনে রাখতে হবে যে, প্যারিস আসলে একটা বন্দর। যেমন কলকাতা আসলে একটা বন্দর। সমুদ্রগামী জাহাজ যদিও অতদূর আসে না, তবু সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে বজরা চলে। বন্দরের জেটিগুলোর মোট দৈর্ঘ্য নাকি এক শ'মাইলের মতো। তা ছাড়া কলকাতার মতো প্যারিসও দেশের বাণিজ্যকেন্দ্র। তথা কলকারখানা কেন্দ্র।

দোকানগুলো মেয়েরাই চালায়। অত্যন্ত এফিসিয়েন্ট, অত্যন্ত স্মার্ট, অত্যন্ত ভদ্র এই ভদ্রারা পুরুষদের স্থান বেদখল করে তাদের স্থানান্তরে পাঠিয়েছে। স্ত্রী-পুরুষে এই যে নতুন শ্রমবিভাগ ঘটে গেছে এটার সূচনা আমি আগের বারই লক্ষ করে গেছি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এটাকে আরো অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। যেটা আশঙ্কা করা গেছল সেটা কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ। পুরুষরা বেকার হয়নি। তাদের জন্যে আরো বেশী রোজগারের পন্থা খুলে গেছে।

তা ছাড়া ফরাসীরা আমাদেরি মতো ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানার পক্ষপাতী। স্বামী-স্ত্রী মিলে মিশে দোকান দেখে ও সংসার সামলায়, এ ধরনের শ্রমবিভাগ বহুকাল থেকে চলে আসছে। এখনো অচল হয়নি। বরং এখনি কারো ব্যাপক হয়েছে। পুঁজিবাদ একে বাতিল করা দূরে থাক, দু' হাতে সাহায্য করছে। কমিউনিস্টদের পক্ষে বড় বড় রাঘব বোয়াল জালে ফেলা যত সহজ হবে ছোট ছোট পোনা মাছ জালে আটকে রাখা তত সহজ হবে না। এ থীসিস এখন প্রমাণ করা শক্ত যে. বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খেয়ে আরো বড় হচ্ছে। প্রমাণ নেই তা নয়, কিন্তু ক্যাপিটালিজম এখন সতর্ক। রাষ্ট্র ইতিমধ্যে বহু ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে রাঘব বোয়ালদের জালে জড়িয়েছে।

নিবাসের কাছেই এক আহারস্থান। সেখানে কেউ কাউকে পরিবেশন করে না। বুফের মতো ব্যবস্থা। লাইন ধরে যাও। বাঁ দিকে যা যা সাজানো রয়েছে তার দাম দেখে তার থেকে তোমার যেটা খুশি প্লেটে তুলে নাও। নিলে হয়তো চারটে কি পাঁচটা জিনিস। এগিয়ে গিয়ে মাদামকে দেখাও। তিনিই এখানকার চিত্রগুপ্ত। এক নজরে দেখেই বুঝতে পারেন কোনটার কত দাম। অমনি কল থেকে বেরিয়ে আসে একটা বিল। সেটা প্লেটের সঙ্গে পেটে যায় না। ডানদিকে টেবিল চেয়ার আছে, যাও, খেতে বস। খেতে খেতে বিল মিটিয়ে দাও। এর নাম সেলফ সার্ভিস।

আত্মসেবা কিছু মন্দ জিনিস নয়। আমার তোষণের জন্যে আমারি মতো একটি মানুষকে

খিদমদগার বনতে ও বকসিসের জন্যে হাত পাততে হয় না। অপর পক্ষে এটা যেন একটা কলের মতো ব্যাপার। কলে মুদ্রা ফেললে খাবার বেরিয়ে আসে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। সম্পূর্ণ অমানবিক ও হৃদয়বৃত্তিহীন প্রক্রিয়া। পরিবেশনের জন্যে 'গারশ' আসতেন, তাঁকে কত সমীহ করে বলতে হতো, 'মহাশয়, অনুগ্রহ করে আপনি...।' তত্ত্ব নেবার জন্যে 'পাত্র' আসতেন, তাঁর সঙ্গে শিষ্টাচার ও রসিকতা বিনিময় করা হতো। আমি কি সাধারণ বুভুক্ষু? আমি সম্মানিত অতিথি। আপ্যায়ন না করলে আমি আসব কেন? কিন্তু এই আত্মসেবার আহারস্থান আমাকে সাধারণ বুভুক্ষুর পর্যায়ে ফেলেছে।

তখনকার দিনে আহারটা ছিল উপলক্ষ। গল্পটা বা তর্কটা বা আড্ডাটা ছিল লক্ষ্য। সময় নষ্ট হতো সেটা ঠিক, কিন্তু এমন কিছু কানে আসত বা মাথায় ঢুকত যা পরে কাজে লেগে যেত। বলতে বলতেই বাক্য স্পষ্ট হতো, শব্দ শাণিত হতো, শুনতে শুনতেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হতো। যুক্তির পিঠ পিঠ যুক্তি, তর্কের পিঠ পিঠ তর্ক যেন খই ফুটত। বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ, চুল চিরে চিরে বিচার এমনি করেই রপ্ত হতো। কাফেতে বা রেস্তোরাঁতে বসেই ইস্তাহার রচনা করা হতো। কোনোটা লেখকদের, কোনোটা শিল্পীদের। স্টুডিও যাদের নেই কাফেই তাদের স্টুডিও। চিঠি লেখার কাগজ ও ডাকটিকিট পর্যন্ত এখানে মিলত। এখনো মেলে। এখনো মোটের উপর সেইসব পাট আছে। শুধু একটি সামগ্রী সংক্ষেপ করতে হয়েছে। সময়। মানুষ আর অত সময় পায় না যে এক ঠাঁই এক দেড় ঘণ্টা খরচ করবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা ছিল, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর।' ফরাসীরা অবশ্য এ নগর ফিরিয়ে দেবে না, তবে আমার মনে হয় তারাও একদিন প্রার্থনা করবে, 'দাও ফিরে সে সময়, লহ এ সংক্ষেপ।' নয়তো হারিয়ে ফেলবে তাদের বাগ্‌বিভূতি, তাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি, তাদের নব নব উন্মেষশালিনী শিল্পপ্রতিভা। এই যে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ঘোড়দৌড় এতে জিতে তাদের ধনদৌলতের পরিসীমা থাকবে না, কিন্তু এর তলায় চাপা পড়বে তাদের সৃষ্টিশীলতা। তার স্থান নেবে এক শ' রকম কলকৌশল, সাহিত্যিক বা শিল্পবিষয়ক টেকনোলজি। আর নয়তো একান্ত দিশেহারা ভাব।

এই দিশেহারা ভাবটা এখন আন্তর্জাতিক। আজকের দুনিয়াতে স্থিরনিশ্চিত বলে যদি কিছু থাকে তবে তা ধর্ম। কিন্তু যারা সাহিত্যের বা শিল্পের ঘরের ঘরানা তাঁরা অল্পস্থলেই ধর্মপ্রাণ। সাহিত্যই বা শিল্পই তাঁদের ধর্ম। এ ধর্ম এ জগতের মতো অস্থির অনিশ্চয়তাপীড়িত। ফরাসী সাহিত্য বিচিত্র পথে যাত্রা করে বিচিত্রকেই পাচ্ছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই তাকে ক্ষ্যাপার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। ক্ষ্যাপাকে পরশ পাথর কে দেবে! দিলে ও কি রাখবে! ওর যে সবতাতেই সংশয়।

তবে লেখনীর উপর বিশ্বাস আছে, তুলির উপর বিশ্বাস আছে, বিশ্বকর্মার যেমন হেতেরের উপর বিশ্বাস। আজকের দুনিয়ায় এমন দেশ সত্যি কটা যেখানে শিল্পী বা লেখক সাহিত্যে বা আর্টে বিশ্বাস করেন! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের বা আর্টের উপর থেকে মন সরে গেছে কোনো একপ্রকার উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে। তবে হাত সরে যায়নি এই যা রক্ষা। মোটরচালকের হাত স্টীয়ারিং হুইলের উপরে, কান ট্রানজিস্টার রেডিওর দিকে। একথা ফ্রান্সের লেখক বা শিল্পীর বেলা খাটে না। সেইজন্যে ফ্রান্সের উপর আমার এত ভরসা।

।। আটচল্লিশ ।।

বিদায় যদি নিতেই হয় তবে সেন নদীর কাছ থেকে। প্যারিসকে যে চিরসরস করে রেখেছে। এ নদীকে আমিও ভালোবাসি। ফরাসীদের মতো।

আবার সেই অ্যাঁভালিদ। সেই এয়ার টার্মিনাল। সেখানে সেদিন যাঁদের সঙ্গে প্রথম দেখা আজ তাঁদের সঙ্গে শেষ দেখা। এই ক'দিনেই তাঁরা আমার আপনার হয়ে গেছেন। বিদায় দিতে ও নিতে ক্লেশ। হাতে হাত রাখি।

দিনটি পরিষ্কার। আমাকে প্যারিসের বিদায় উপহার। অর্লিতে গিয়ে আবার প্লেন ধরতে হয়। লুফ্‌টহান্সার। যদিও 'ফিন এয়ার' থেকে মনে হয় ফিনল্যাণ্ডের।

আসমান থেকে প্যারিসের উপর দৃষ্টিপাত করি। প্রাচীন আধুনিক বর্ধিষ্ণু মহানগর। বাড়তে বাড়তে বারো মাইল দূরে অর্লিকেও একদিন আত্মসাৎ করবে। এবার প্যারিসের বাইরে পা দেবার সুযোগ হয়নি। এ ভুল আমি করব না যে প্যারিসই ফ্রান্স। যদিও কয়েক শতাব্দী ধরে ফরাসীদের জাতীয় জীবন প্যারিসেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে ও প্যারিসকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। রাজরাজড়াদের বেলা যে রীতি প্রজাতন্ত্রীদের বেলাও সেই রীতি। প্যারিস এত বড় একটা চুম্বক যে নৈরাজ্যবাদী বা সাম্যবাদীরাও তার দ্বারা আকৃষ্ট। যদি কোনো দিন কমিউনিস্টদের হাতে ক্ষমতা আসে তা হলে প্যারিসই হবে তাদের মস্কো।

এইখান থেকে ফ্যাশনের মডেল যায় দেশের সবর্ত্র শুধু নয়, ইউরোপের সব দেশে। লুকিয়ে লুকিয়ে কমিউনিস্টদের মুলুকেও। এশিয়ার মহিলা মহলেও প্যারিসের ফ্যাশন অনুপ্রবেশ করেছে। জাপানে তো বটেই, তুর্কিতে, ইরানে, সীরিয়ায়, লেবাননে, মিশরে। মিশরকে আমি এশিয়ার মধ্যে ধরেছি, কারণ ওর সংস্কৃতিটা এশিয়ার। কিন্তু আফ্রিকাতেও প্যারিসের ফ্যাশন জাঁকিয়ে বসবে মনে হয়। তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তেমনি সাহিত্য বা আর্ট সংক্রান্ত ফ্যাশনও। প্যারিস আজ যে পরীক্ষা করে, ইউরোপ কাল সে পরীক্ষা করে, জাপান পরশু সে পরীক্ষা করে। না, জাপানও কাল সে পরীক্ষা করে। প্যারিস আজ যে 'ইজম' নিয়ে মেতে ওঠে, ইউরোপ কাল সে 'ইজম' নিয়ে মেতে ওঠে। জাপান পরশু—না, না, জাপানও কাল—সে 'ইজম' নিয়ে মেতে ওঠে। কিন্তু একথা বোধ হয় আর যথার্থ নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এমন একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছে যে, যুদ্ধপূর্বের সঙ্গে যুদ্ধোত্তরের জোড়া লাগছে না। যারা প্যারিসের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে থাকত, তারা যুদ্ধের কয়েক বছর অন্যত্র তাকাতে অভ্যস্ত হয়েছে, তার পর প্যারিসের দিকে তাকিয়ে আর সেই ক্রমান্বয় ফিরে পায় না। প্যারিসও এমন একটা বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছে যে, তার মনোজগতের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা সেই অভিজ্ঞতার শরিক যারা নয় তাদের পক্ষে কষ্টকর। কারুজগতের অনুসরণ করা অন্য কথা। সেটা বন্ধ্যা।

মহৎ আইডিয়া বা তত্ত্ব বা প্রেরণা প্যারিসের সৌরলোক থেকে আগের মতো বিচ্ছুরিত হচ্ছে কম। তা হলেও মানতে হবে যে, সংস্কারমুক্ততায় ও মানবিক সাহসিকতায় প্যারিস এখনো এগিয়ে রয়েছে। বেড়াগুলো এক-এক করে হটিয়ে রূপলোক ও রসলোকের পরিসর ও বৈচিত্র্য ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে চলেছে। নিষিদ্ধ ফল সকলের আগে প্যারিসের দর্শক বা পাঠকরা ভক্ষণ করে, তার পরে অপরের পাতে পড়ে। ফরাসীরা কঠোর বিচারক, তারা কিছুই ধরে নেয় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন

তোলে, প্রত্যেকটি যাচাই করে নেয়। সেই জন্যে স্রষ্টাদেরও সৃষ্টির মান উঁচু রাখতে হয়।

তা ছাড়া ওদের শিক্ষাব্যবস্থাটাও শক্ত। স্কুলের ছেলেদেরও কলেজের ছেলেদের মতো আত্মনির্ভর হতে শেখায়। মুখস্থ করে উদ্ধার নেই, যুক্তির অনুশীলন করতে হবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার উপরেও জোর দেওয়া হয়। লিখতে লিখতে হাত পাকে। অভ্যাসযোগ। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, বালকবালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ক্যাথলিকদের সঙ্গে যুক্তিবাদীদের টাগ অফ ওয়ার এখনো অসমাপ্ত। যমে মানুষে টানাটানির মতো ধর্মে মানবিকতায় টানাটানি প্রায় দুশ' বছর ধরে চলেছে। একবার চার্চ বলে, 'হেঁইও'। একবার ষ্টেট বলে, 'হেঁইও'। ফরাসীরা ভৌগোলিক অর্থে বিভক্ত না হলেও অন্য অর্থে বিভক্ত জাতি। সাহিত্য তাদের জনমন ঐক্যবিধায়ক বলে সাহিত্যের উপরে তাদের এত বেশী টান। সেনাপতিদেরও সাহিত্যিক হওয়া চাই, আকাদেমির সদস্য হওয়া চাই। দ্য গলও একজন সাহিত্যিক।

প্যারিস ও তার আশপাশ দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। ফ্রান্সের উত্তরাংশের উপর দিয়ে আমি উড্ডীয়মান। চাষের ক্ষেত। বন। ছোট ছোট নদী। ছোটখাটো শহর। ইতিহাসে এসব অঞ্চল বহুশতকের কুরুক্ষেত্র। যুদ্ধ করতে করতে ফরাসীদের চোদ্দ পুরুষ কেটে গেছে। তাই সামরিকতা সম্বন্ধে তাদের প্রত্যয় অতি গভীর। ইংলণ্ডের মতো সমুদ্রবেষ্টনী নেই। তাই সেনাবাহিনীর উপর এত বেশী নির্ভরশীলতা। মিলিটারী বলতে ইংরেজরা অজ্ঞান নয়। ফরাসীরা গৌরবমুগ্ধ। সৈনিকদের মাথায় করে রাখলে তারাও মাথা কেনে। একদিন মিলিটারী ভয় দেখিয়ে বলে, 'দ্য গলকে কর্তা করো। নয়তো আমরা ক্যু করব।' আলজেরিয়া থেকে ফরাসী সৈন্যদল এসে প্যারিসের উপর চড়াও হবে, পার্লামেণ্ট ভেঙে দেবে এর আভাস পেয়ে পার্লামেণ্ট মানে মানে দ্য গলকে নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁরই শর্তে তাঁকে ক্ষমতা সম্প্রদান করে। মিলিটারী ঠাণ্ডা হয়।

সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার পীঠভূমি এখনো এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়নি, তাই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও মিলিটারীর ইচ্ছায় কর্ম। ইংরেজরা ওটা সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্রমওয়েলের সঙ্গে সঙ্গে চুকিয়ে দিয়েছে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কখনো মিলিটারীর ইচ্ছার কাছে মেরুদণ্ড নত করবে না। দেশ বিপন্ন হলেও না। হয়তো সমুদ্রবেষ্টনীর জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিংবা সেই ম্যাগনা কার্টার সময় থেকেই অনবরত রাজশক্তির সঙ্গে বলপরীক্ষার ফলে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মেরুদণ্ড শক্ত হয়েছে। মোট কথা ফরাসীরা সঙ্কটে পড়লে সিভিলের চেয়ে মিলিটারীকে বিশ্বাস করে বেশী। তাই দ্য গল পরে জনসমর্থনও পান। মিলিটারী কেবল দেশের শত্রুর সঙ্গে লড়ে না। দরকার হলে দেশকেও সুশৃঙ্খলভাবে চালায়।

তা হলে লিবার্টি মন্ত্রের জন্যে ইতিহাস তোলপাড় করা হলো কেন? দেশে দেশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো কেন? লিবার্টি দেবীর বেদীমূলে লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী বলি দেওয়া হলো কেন? একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার তিনবার বিপ্লব ঘটেছে যে দেশে সে দেশে লিবার্টি এখনো দৃঢ়মূল হয়নি। আর কবে হবে? আরো একবার বিপ্লব ঘটলে? কে বিশ্বাস করবে যে প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরশিপ পত্তন হলেই লিবার্টির বনিয়াদ মজবুৎ হবে? ফ্রান্সের ইতিহাস যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি। লিবার্টির স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে। মানুষ ভুলতে পারছে না। ইতিমধ্যে সাম্যের প্রশ্ন তীব্রতর হয়েছে। দক্ষিণপন্থা ও বামপন্থা বলতে যা বোঝায় তা সাম্যের লক্ষ্যে পৌঁছনোর দুই বিভিন্ন পন্থা। এদেরও মিলিটারীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে।

দেখতে দেখতে ফ্রান্স মিলিয়ে যায়।

ফ্রান্স, তুমি মাঝে মাঝে শত্রু কবলিত হলেও তোমার মনোজীবন একটি দুর্ভেদ্য সুরক্ষিত দুর্গ।

মাঝে মাঝে মিলিটারী শাসিত হলেও তোমার আত্মা একটি নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা। মানবজাতির জন্যে তুমি অনেক সাধনা ও অনেক সংগ্রাম করেছ। বিদায়, ফ্রান্স।

।। উনপঞ্চাশ ।।

কখন একসময় সীমান্ত অতিক্রম করি। জার্মানীর উপর দিয়ে উড়ি। প্রথমটা দেশবদলের মতো লাগে না। লাগে যখন রাইন নদ পার হই। সরু একটি সিঁথি। এই ঐতিহাসিক সীমান্তের জন্যে এত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে যে একত্র করলে আর একটা রাইন নদ হয়।

দেখতে দেখতে রাইনও মিলিয়ে যায়। একটু পরে দেখি প্লেন নামছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট। গ্যেটের জন্মস্থান। এইখানে আমার যাত্রা শুরু হবার কথা ছিল। হতে যাচ্ছে যাত্রা সারা। তবু ভালো যে একরাত্রের জন্যে বুড়ি ছুঁতে পাচ্ছি। এবার আমি লুফ্‌টহান্সার অতিথি। ভারতগামী আকাশপোতের জন্যে প্রতীক্ষমান। এই আমার ইউরোপের বাহুপাশে শেষ রজনী। এবারকার মতো এইখানেই ইতি।

ফ্রাঙ্কফুর্ট। প্রথম শতাব্দীর রোমক উপনিবেশ। পরে জার্মান রাজন্যদের নির্বাচনক্ষেত্র। পরে নির্বাচিত রাজাদের বা সম্রাটদের অভিষেকস্থল। এ প্রথা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। পরে জার্মান কন্‌ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হলে তার রাজধানী। পরে সংবিধান প্রণয়নের জন্যে জাতীয় মহাসভা আহূত হলে তার অধিবেশনকেন্দ্র। গত মহাযুদ্ধের পরে ইঙ্গমার্কিন দ্বৈত অধিকারে যে অর্থনৈতিক পরিষৎ গঠিত হয় সেটিকে পুনর্গঠিত করে তার হাতে গভর্নমেন্টের দায়িত্বভার অর্পণ করা হলে তার অকথিত রাজধানী। পরে পশ্চিম জার্মান সরকার বন্‌বাসী হলে ইউরোপীয় যোগাযোগের বিশিষ্ট কেন্দ্র। বাণিজ্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র। ব্যাঙ্কের বিশিষ্ট কেন্দ্র। এর ব্যাঙ্কনোট সরকারী নোটের সমান। বন্দর হিসাবেও গুরুত্বসম্পন্ন। মাইন নদ পড়েছে রাইন নদে আর রাইন নদ পড়েছে সমুদ্রে। মাইন থেকে খাল কেটে ডানিউবের সঙ্গেও সংযোজন করা হয়েছে, সেইসূত্রে অপর সমুদ্রের সঙ্গে। এর একটি পোতাশ্রয় আছে। সুদীর্ঘকাল এ ছিল স্বাধীন সাম্রাজ্যিক নগরগুলির অন্যতম। এখন নয়।

গত মহাযুদ্ধে এ শহর বিধ্বস্ত হয়। গ্যেটেভবনও ধূলিসাৎ হয়। বোমা তো মহতের মহিমা বোঝে না। এতদিনে শহর ও ভবন পুনর্নির্মিত হয়েছে। দেখিনি, শুনেছি অবিকল পুরাতন গ্যেটেভবনের মতো। নব নব নির্মিতির দ্বারা শহর এখন আরো জমকালো হয়েছে। বছরে দু'তিনবার করে আন্তর্জাতিক মেলা বসিয়ে পর্যটক টেনে এনে ফ্রাঙ্কফুর্ট এখন ফেঁপে উঠেছে। চেনা জায়গা। তবু পঁয়ত্রিশ বছর ব্যবধানে অচেনা। সন্ধ্যা হয়ে যায় হোটেলে পৌঁছতে। পায়ে হেঁটে বেড়াই। সওদা করি। কাল একেবারে সময় পাব না।

সকাল সকাল শুতে যাই। আকাশবিহারে শ্রান্ত। সামনে আরো দীর্ঘ পথ। ইউরোপ থেকে ভারত। ঘুম কিন্তু আসতেই চায় না। সে যেন বিশ্বাসই করতে চায় না যে আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে তাকে বরণ করতে পারি। না, পারিনে। কত কথা মাথায় ঘুরছে।

ইউরোপের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলুম। পারলুম কি মেলাতে? এক পুরুষের অদর্শনের ব্যবধান কি এক মাসে অপগত হয়? বৃথা অভিলাষ। ওটা হবার নয়। তবু একেবারে

নিরাশ হইনি। শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে আমিও কয়েক পা হেঁটেছি। যদিও সকলের পিছনে তবু তো সকলের সঙ্গে।

চৌত্রিশ বছরের ফাঁক ভরানো যদি এত কঠিন হয় তবে চার শ' বছরের ফাঁক বোজানো কত কঠিন! সেই চেষ্টা করছে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট দুই ধর্মসঙ্ঘ। আগেকার দিনে এটা ছিল অভাবনীয়। এখন ভাবতে পারা যায়, যদিও কার্যে পরিণত হতে কে জানে কতকাল লাগবে! হয়তো আরো চার শ' বছর।

না, অতকাল নয়। যেসব কারণে এটা এখন ভাবতে পারা যাচ্ছে তার একটা হচ্ছে কমিউনিজমের চ্যালেঞ্জ। ওই মতবাদ সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় নেমেছে। গরিব দেশগুলির মেষশাবকরা আর পাদ্রীর কাছে আসতে চায় না। জড়বাদ তাদের মাথা খাচ্ছে। এদিকে ইউরোপের আধখানা লাল হয়ে গেছে। বাকী আধখানা যে হয়নি সেটা পারমাণবিক অস্ত্রের কল্যাণে। যীশুখ্রীস্টের ধর্মের পক্ষে পারমাণবিক অস্ত্রের উপর অতখানি নির্ভরতা ভালো দেখায় না। অথচ ওকে বর্জন করতে বলাও সহজ নয়। এই নৈতিক সঙ্কটে খ্রীস্ট ধার্মিকমাত্রেই এক নৌকায়।

কমিউনিস্ট উপস্থিতি এখন বার্লিনে, প্রাগে, বুডাপেস্টে। এসব ঘাঁটি ইউরোপের বাইরে নয়, দূরে নয়, ঘরের মাঝখানে। এটাও একদিন অভাবনীয় ছিল। এখন প্রত্যক্ষ বাস্তব। এ রাহু কবে যে বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করতে আসবে তার ঠিক নেই, তাই ধার্মিকমাত্রেই যেমন এক নৌকায় সৈনিকমাত্রেই তেমনি এক শিবিরে। ডাক পড়লেই একই কমাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে লড়তে হবে। যে যার আপনার জাতীয়তা ধুয়ে খেতে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি কাজের কথা নয়। অবশ্য জাতীয়তাবাদ এখনো সবচেয়ে জোরদার শক্তি, যেমন জার্মানদের মধ্যে তেমনি রুশদের মধ্যে। কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধ সত্যি একদিন বাধে তা হলে সেই যুদ্ধের প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদ গৌণ হবে, মুখ্য হবে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বনাম জনগণতন্ত্রবাদী সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ইতিমধ্যে খানিকটা সমাজতন্ত্র এরাও নিয়েছে, খানিকটা গণতন্ত্র ওরাও নিচ্ছে।

রম্যা রলাঁ নেই, বার্নার্ড শ নেই, টোমাস মান নেই, ইউরোপের কণ্ঠস্বর বলতে সেই বারট্রাণ্ড রাসেল। তিনি প্রাণপণে যুঝে চলেছেন পরম বিনষ্টির বিরুদ্ধে। কিন্তু আশানুরূপ সমর্থন পাচ্ছেন না। পাবেন কী করে? তিনি তো বাতলাতে পারছেন না কেমন করে কমিউনিজমকে বার্লিন, প্রাগ, বুডাপেস্ট থেকে হটিয়ে আবার কোণঠাসা করতে পারা যাবে। পারমাণবিক অস্ত্রকে তিনি যত ভয় করেন অন্যেরা তত ভয় করেন না, অন্যদের তার চেয়ে বেশী ভয় কমিউনিজমের সংক্রমণকে। তা ছাড়া আরো একটা অলিখিত ভয় আছে। সেটা কমিউনিজমকে নয়, ক্যাপিটালিজমের অন্তর্নিহিত মন্দাকে। যুদ্ধ প্রস্তুতি চলেছে বলেই মন্দা আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। নইলে এই সমৃদ্ধি সাতদিনের আশ্চর্য। এটা একটা রূপকথার জগৎ। পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ বা ব্যবহার বন্ধ করলেও যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ থাকবে না। হয়তো মন্দা এসে কলকারখানা দোকানপাট ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বন্ধ করে দেবে। আবার তো সেই ষাট লক্ষ বেকার ও হিটলার।

আমি যতক্ষণ ঘুমিয়ে পারমাণবিক প্রহরী ততক্ষণ জেগে। সমস্তক্ষণ দু'পক্ষের প্রহরী ততক্ষণ আসমানে আসমানে টহলদারি করছে। একমুহূর্ত অসতর্ক থাকার জো নেই। কেউ কাউকে এক সেকেণ্ড স্টার্ট দেবে না। এক সেকেণ্ড কী বলছি! এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশ। মানুষের ইতিহাসে এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের এত বেশী গুরুত্ব আর কোনো যুগে ছিল না। ইউরোপের আকাশে বিরাট এক শকুন পক্ষবিস্তার করে দিবারাত্র উড্ডীন। সব ক'টা গভর্নমেন্টের চেয়েও, সব ক'টা

রাষ্ট্রের চেয়েও, সব ক'টা চার্চের চেয়েও সে শক্তিমান। তার দুই পক্ষ দুই শিবিরের রক্ষী। আপাতত সে রক্ষক। কোনো একদিন সে ভক্ষক। সেদিন তাকে ঠেকাবে কে? কোথায় সেই বৃহত্তম শক্তি? ইউনাইটেড নেশনস? যীশুখ্রীস্টের প্রতিনিধি পোপ? মহাত্মা গান্ধীর বিদেহী আত্মা?

মরাল লীডারশিপ আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। কে জানে তার জন্যে কোথায় কারা রাত জাগছে। ওই প্রহরীদের মতো অতন্দ্র প্রহরী। ওদের চেয়েও সতর্ক। ওরা চলে ডালে ডালে তো এরা চলে পাতায় পাতায়। ইটালীতে ফ্রান্সে ছোট ছোট অহিংসাবাদী গোষ্ঠী একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে শুনি। তারা আধুনিক যন্ত্রপাতির ধার ধারে না। ক্যাপিটালিস্ট ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক পাতায় না। সবাই মিলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন আনে দিন খায়। আদি খ্রীস্টশিষ্যদের মতো। ইংলণ্ডেও ঠিক এই রকম না হলেও এ ধরনের গোষ্ঠী সক্রিয়। মানবাত্মা অবশ্যম্ভাবী নিয়তির পায়ে আগে থাকতে আত্মসমর্পণ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র নয়।

আর একখানা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর উপাদান জড় হচ্ছে অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে। এপিক লেখকের দৃষ্টিতে যদি দেখি তবে এর একটা তাৎপর্য পাই। এই দ্বন্দ্বের, এই বিনাশের, এই দুর্ভাগ্যের, এই যন্ত্রণার, এই বৃহত্তর সামঞ্জস্যের, এই মহত্তর চেতনার, এই সমষ্টিগত অভ্যুদয়ের, এই সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসের। এর শেষ পর্ব প্রলয় নয়, শান্তি। কিন্তু সে শান্তি চড়া দাম দিয়ে পেতে হবে।

ইতিমধ্যে আরো একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সেটাও যুদ্ধ ও শান্তির সঙ্গে জড়িত। জনসংখ্যার বিস্ফোরণকে কী দিয়ে ঠেকান যায়? সবাইকে সন্ত না বানিয়ে যদি এর কোনো উত্তর থাকে তবে আগামীকাল জানতে পাওয়া যাবে। আজ আমাকে একটু ঘুমোতে দাও। রাত এখন অনেক।

দেওয়াল জোড়া কাচের বাতায়ন দিয়ে দেখি মাইন নদ বয়ে চলেছে। ওপারেও ফ্রাঙ্কফুর্ট ভিতরের বাতি নিবে গেছে। বাইরের বাতি জ্বলছে। চারদিক নিস্তব্ধ।

॥ পঞ্চাশ ॥

এবার আমার উল্টোরথ।

বিমানবন্দরে গিয়ে পুষ্পকরথে উঠে বসি। লুফ্‌টহান্সার টাইম মেশিন আমাকে কেবল স্বস্থানে নয়, স্ববয়সে ফিরিয়ে দেবে। বিদায়, ফ্রাঙ্কফুর্ট! বিদায়, কবিগুরু!

এই একমাস আমি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ঘুরেছি। পিছন ফিরে তাকাবার অবকাশ পাইনি। পিছন ফিরে তাকালে সামনের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হয়। যা দেখতে আসা তা দেখা হয় না। এখন আমার সেই সামনের দিকটাই পিছনের দিক। এখন সেদিকে ফিরে তাকানোই তাকে আরো কিছুক্ষণ দেখা, আরো ভালো করে দেখা।

অফুরন্ত প্রাণশক্তির আধার ইউরোপ। অতি প্রচুর রক্তমোক্ষণেও তার রক্তাল্পতা ঘটেনি! সে বলহীন নয়। যে দৃশ্য দেখলুম তা ভাঙনের নয়, ক্ষয়ের নয়। এসব শব্দ যদি প্রয়োগ করতেই হয় তবে একটা গোটা দেশ বা জাতির সম্বন্ধে না করে শ্রেণীবিশেষের বেলা প্রয়োগ করলে ভুল সবচেয়ে কম হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনো দীর্ঘকাল খোশ মেজাজে ও বহাল তবিয়তে বাঁচবে, তবে

তার রাজত্বের দিন চলে যাচ্ছে। সামগ্রিক পুনর্বিন্যাসের জন্যে চাই কুবেরের মতো বিত্ত আর দৈত্যের মতো শ্রম। ধনিক আর শ্রমিক এদের ভূমিকার তুলনায় আর কারো ভূমিকা নয়। মধ্যবিত্ত যেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাইনর ক্যারেকটার।

তবে ভিতরে ভিতরে একপ্রকার ভাঙনেরও আভাস মেলে। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশন গ্রামীণ সমাজ ভেঙে দিয়ে গেছে। সায়েন্টিফিক রেভোলিউশন স্ত্রী-পুরুষ সবাইকে ঘরের বাইরে খাটিয়ে নিয়ে ঘর অর্থাৎ হোম ভেঙে না দিয়ে যায়! চাপটা পড়বে শিশুদের উপরে। সুতরাং আরো দু'এক পুরুষ বাদে মালুম হবে। মানুষ কেবল কতকগুলো ভোগ্যপণ্যের কাঙাল নয়। বাড়ি, গাড়ি ও নারী পেলেও সে তৃপ্ত হবে না। তাকে সৃষ্টি করতে দিতে হবে। তার সে সৃষ্টি শুধু হাত বা মগজ দিয়ে নয়, সমস্ত সত্তা দিয়ে। 'হোল ম্যান' বা পুরো মানুষটাকে নিবিষ্ট রাখতে হবে। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় পুরো মানুষটা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কতকগুলো টুকরো মানুষের জোড়াতালির নাম সমাজ নয়। জন সমষ্টিকে প্রবল পরাক্রান্ত করলেও টুকরো মানুষ টুকরোই রয়ে যায়, ভিতরে ভিতরে অসহায় বোধ করে। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির, কর্মের সঙ্গে কর্মীর, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবনের 'এলিয়েনেশন' ঘটে যাচ্ছে। কমিউনিজমে এর প্রতিকার নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনকে আরো ঠেলে নিয়ে যাওয়া, সায়েন্টিফিক রেভোলিউশনকে আরো এগিয়ে দেওয়া, 'এলিয়েনেশন'কে আরো দ্রুত করা, এর মধ্যে সমস্যার সমাধান কোথায়? ক্যাপিটালিজম বনাম কমিউনিজম এর 'বনাম'টাকেই ফলাও করে দেখানো হয়। কিন্তু উভয় সমাজের মূলেই ভাঙন ধরেছে।

বহুদিন হতেই ভাইটালের তুলনায় মরাল বা আইডিয়াল খাটো। কিন্তু গত ত্রিশচল্লিশ বছরে যত খাটো হয়েছে তত বোধহয় তার পূর্বের দু'তিন শতাব্দীতে নয়। উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপর যতটা জোর দেওয়া হয় উপায়জিজ্ঞাসার উপর ততটা নয়। সঙ্কটে পড়লে গণতান্ত্রিক উপায়ও কি হালে পানি পাবে? আধশতাব্দী আগে ইংরেজরা ভাবতেই পারত না যে সব নাগরিককে ধরে ধরে যুদ্ধে পাঠানো যায়। এখন ওটা স্বতঃসিদ্ধ। তেমনি ইংরেজ ফরাসী বা জার্মানরা ভাবতেই পারত না যে নিরীহ নারী ও শিশুর উপর বোমা পড়তে পারে, তাও আকস্মিকভাবে নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে। এখন ওটা স্বতঃসিদ্ধ। এতখানি গেলার পর বাকিটুকু গিলতে দ্বিধা। পারমাণবিক গণহত্যা। এসবের দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? যারা বেঁচে থাকবে তারা কোন লক্ষ্যে উপনীত হবে? ক্যাপিটালিজম যদি জেতে সে আবার মন্দায় ভুগবে, সুতরাং আরো একটা যুদ্ধের জন্যে তৈরি হবে, কে জানে কার সঙ্গে! কমিউনিজম যদি জেতে তবে তার নিজের ঘরেও তো সাংঘাতিক বিরোধ। রুশ বনাম চীন।

কখন একসময় সীমান্ত অতিক্রম করি। জার্মানী দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায়। হে জার্মানী, তোমার মধ্যে যে গভীরতা আছে ইউরোপের আর কোনো দেশে তা নেই। তোমার সঙ্গীত সমস্ত সত্তাকে মথিত করে। অব্যক্ত বেদনায় ও অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দেয়। তোমার যা ধ্রুব তার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখবে কি? বিদায় জার্মানী।

সুইটজারল্যাণ্ডের উপর দিয়ে উড়ি। ক্ষুদ্র হলেও মহান দেশ। কখনো কারো ক্ষতি করেনি। কারো কাছে মাথা নোয়ায়নি। ওই আল্পস পর্বতের মতো। দেখতে দেখতে সেও স্বপ্ন হয়ে যায় প্রখর রৌদ্রে দিবাস্বপ্নের মতো।

এবার উত্তর ইটালী। হ্রদরাজিনীলা। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে ইটালী পার্থিব ঐশ্বর্যে ভাঙিয়ে নিচ্ছে। সারা দেশটাই যাদুঘর। দু'হাজার পুরাকীর্তি ও শিল্পনিদর্শন যত্রতত্র বিকীর্ণ। মধ্যযুগের অন্ধকারের কথাই আমরা শুনি। সৌন্দর্যে সে আধুনিকের চেয়েও অগ্রগামী।

উপকূলভাগকে বাঁ দিকে রেখে সাগরের উপর দিয়ে ওড়া। ছবি ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে। চিনতে কিছু কিছু পারা যায়। পিসা নগরীর সেই হেলে পড়া টাওয়ার যেন আরো হেলে পড়েছে। কাছেই

মার্বল পাথরের পাহাড়। যা দিয়ে টাওয়ার তৈরি। দ্বাদশ শতাব্দীর।

রোম। আকাশ থেকে পাখির চোখে দেখা। দেখতে দেখতে নামা। ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে এবার ভূমিস্পর্শ করতে পাই। ওই আমার ইটালীবিহার। বিদায় রোম! বিদায় ইটালী!

দেখতে দেখতে ওরা মিলিয়ে যায়। এটনা আগ্নেয়গিরি থেকে ধোঁয়া ওঠে এদিকে। ওদিকে সমুদ্রের কোলে মাথা তোলে ক্রীট। পাঁচ হাজার বছর পুরাতন সভ্যতার জন্মভূমি। সেও যখন অদর্শন হয় তখন ইউরোপের কাছ থেকে বিদায় নিই।

হে ইউরোপ, আধুনিক সভ্যতার তুমি মধ্যমণি। কিন্তু আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে তুমি এখন হারামণি। তুমিই হয়তো মধ্যস্থ হয়ে ওদের একদিন মেলাবে। এই দ্বিভাজ্যতা হয়তো সেতুবন্ধনের উদ্যোগ। তা যদি না হয় তবে মুখ্যস্রোত ক্রমেই তোমার কূল থেকে সরে যাবে। চৌত্রিশ বছর বাদে দেখে গেলুম তুমি আর কেন্দ্রস্থানীয় নও। কিন্তু কুরুক্ষেত্র। হে ইউরোপ, তুমি আবার মানস সরোবর হও। বিদায়! বিদায়! পুনর্দর্শনায় চ।

পিছন ফিরে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাতেই চোখ ধন্য হয়ে যায়। ভূমধ্যসাগরে সূর্যাস্ত। জবাকুসুমসঙ্কাশ বিরাট গোলক একটু একটু করে ডুবতে ডুবতে চকিতে অদৃশ্য হয়। সমুদ্রের জল লাল হতে হতে নীল হয়ে যায়। লক্ষ করি যে সমুদ্রের সংস্পর্শে সূর্যকে অনেক বড় দেখায়।

অন্ধকারে মিশরের উপর দিয়ে উড়তে উড়তে আলো ঝলমল কায়রো। কাহেরা। বিমান থেকে নেমে ভূমিস্পর্শ করি পৃথিবীর প্রাচীনতম এক সভ্যতার মাতৃভূমির। ইদানীং আরব জাহানের সদর। এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোজক।

এর পরে দক্ষিণ-পূর্ব আরবের তৈল শহর ধারান। জ্বালামুখীর মতো আগুন জ্বলছে। মরুভূমির ডগায় জনবিরল বসতি। আরব সাগরের কূলে। অপর কূলে ভারত পাকিস্তান।

করাচীতে আমার সহযাত্রী ইস্পাহানী জুনিয়র নেমে যান। সেখান থেকে অন্য বিমানে পাড়ি দেবেন চট্টগ্রামে। এতক্ষণ পূর্ব পাকিস্তানের গল্প হচ্ছিল। বিদেশে আমরা একজাতি।

এবার আমি একাই দু'খানা আসনের অধিকারী ও অনধিকারী হয়ে নিদ্রার সাধনা করি। চোখের পাতা হয়তো আধঘণ্টার জন্যে জুড়ে এসেছিল। হঠাৎ বাতায়ন দিয়ে দেখি, ও কী! কোথায় আগুন লাগল!

না। আগুন নয়। ফাগুন। ফাগ। হোলিখেলা। পূর্ব দিগন্ত রাঙা হয়ে গেছে। অথচ ভোর হতে অনেক দেরি। রাত তখন বোধহয় সাড়ে তিনটে। ততক্ষণে আমি ভারতের উপর দিয়ে উড়ছি। কিন্তু ঠিক কোন রাজ্যের উপর দিয়ে তা ঠাহর হয় না। নিচের দিকে তাকাই। জনবসতি দেখতে পাইনে। মাঝে মাঝে আলোর নিশানা দেখে মনে হয় শহর।

সবাই তখন নিদ্রায় মগ্ন। আমিই একা বাতায়নের ধারে বসে অনিমেষে চেয়ে। বোধহয় ত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে বোধহয় এক হাজার মাইলব্যাপী দিগন্ত জুড়ে সূর্যোদয়ের পূর্বরাগ নিরীক্ষণ করছি। এ এক অপূর্ব ভোজবাজি। শুধু এই দৃশ্য দেখার জন্যেই নিশান্ত বিমানযাত্রার সার্থকতা আছে। মাটিতে দাঁড়িয়ে কেউ কোনো দিন এই রাত-পোহানী রঙিন পট অবলোকন করতে পায়নি ও পাবে না। এ পটের অনেকখানিই পাতালে প্রলম্বিত। এ যেমন একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মেলে দেওয়া তেমনি উপর থেকে নিচে এলিয়ে দেওয়া। অনাদিকাল হতে এই নিত্য লীলা চলেছে, অনন্তকাল ধরে চলবে। প্রকৃতির জগতে চিরবসন্ত বিরাজমান। শাশ্বতের সঙ্গে আমাব মুখোমুখি হয়। আপনাকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিই।

সেই যে রক্তিম অম্বর সে আমাকে তন্ময় করে রাখে একঘণ্টার মতো। ইতিমধ্যে একসময় নজরে পড়ে বাঁ দিকের বাতায়নে কালো ছায়ার মতো ও কী প্রতিফলিত হচ্ছে! প্রথমে মনে হয়

মেঘ। কিন্তু মেঘ কখনো বিমানের সমান উঁচু হয়? মেঘ কখনো দিগন্তের শত শত মাইল জুড়ে প্রসারিত হয়? ওদিকের আসনের অধিকারীদের জাগাতে ভয় পাই। মাঝখানের চলাচলের পথের উপর হাঁটু গেড়ে বসি। আরো ভালো করে দেখি। মেঘের ওপারে ও কী! ও তো কালো নয়, শাদা। তবে কি ওই মেঘখানা হিমালয় আর ওই শাদা আমেজ তার কোনো শৃঙ্গের বরফ? অপরূপ! অপূর্ব! আমি মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করি। একবার বিমানের এপাশ থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বরঙ্গ। একবার ওপাশ থেকে হিমালয়ের কালোধলো। একবার এপাশ। একবার ওপাশ। কেউ দেখলে ঠাওরাত আমি পাগল। চোদ্দই নভেম্বর ১৯৬৩ আমার জীবনে একটি অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর। আমি ধন্য! আমি ধন্য!

কোনখান দিয়ে যাচ্ছি বোঝবার জন্যে নিম্নমুখে তাকাই। কয়েকটা বড়ো বড়ো নদী বয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা নয় তো? শোণ নয় তো? পাহাড়ে জায়গা দেখে অনুমান হয় ছোটনাগপুর। দেখতে দেখতে ফরসা হয়ে যায়। আকাশের রঙ বদলায়। হঠাৎ দেখি সূর্য! ততক্ষণে আমরা দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি। একটু বাদে দমদম।

দুটি চোখ দুটি চোখকে খুঁজে পায়।

—

চেনাশোনা

সূচী

চেনাশোনা

॥ এক ॥

এত কাল যার সঙ্গে ঘর করছি, এক একদিন তার দিকে তাকিয়ে মনে হয় না কি—কতটুকু এর চিনি!

তেমনি স্বদেশের।

স্বদেশকে আর একটু চিনতে চাই বলে বেড়াতে যাই। বেড়নো বলতে বুঝি চেনাশোনা।

॥ দুই ॥

এমনি এক চেনাশোনার যোগাযোগ ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে। আমরা বেড়াতে যাচ্ছি শুনে বম্বে থেকে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া লিখলেন তাঁর অতিথি হতে।

বম্বে যতবার দেখেছি ততবার নতুন লেগেছে। তার সম্বন্ধে আমার মোহ চিরদিনের। ভারতে কতকটা বহির্ভারতের স্বাদ পাওয়া যায় একমাত্র সেই দ্বীপটিতে। সমুদ্রগামী পোত। বিস্তীর্ণ নীলাম্বু। দিগ্বলয়ে বহুদর্শী সহ্যাদ্রি। দিগ্বিদিকে নানা দেশের নরনারী। কত সাজ, কত রং, কেমন বাহার! মনে হয় আধাআধি বিদেশে এসেছি, এবার জাহাজে উঠতে পারলে পরোপুরি বিদেশ। দেশেরও এমনতরো বিচিত্র সঞ্চয়ন আর কই?—ভারত দেখতে যাদের সময় নেই তারা যদি শুধু বম্বে দেখে, তাহলে ভারত দর্শনের ফল হয়।

শ্রীমতী সোফিয়ার স্বামী সেই প্রসিদ্ধ ওয়াডিয়া যিনি গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে হোমরুল আন্দোলন করে মিসেস বেসাণ্টের সঙ্গে অন্তরীণ হয়েছিলেন। পরে ইনি পৃথক হয়ে যান, পৃথক একটি সংস্থা সংগঠন করেন। ইনি পারসী, এঁর সহধর্মিণী ফরাসী, কিন্তু উভয়েই গভীরভাবে ভারতীয়। স্বামী পরেন মোটা খদ্দরের পায়জামা পাঞ্জাবী, স্ত্রী মিহি খদ্দরের শাড়ি। এঁদের সঙ্গে এক বাড়িতে স্বতন্ত্র থাকেন যে কয়টি পরিবার ও ব্যক্তি, তাঁদের কেউ ইংরাজ, কেউ আমেরিকান, কেউ নরওয়েজিয়ান, কেউ পারসী। এঁরা সকলে কিছু ভারতীয় ধারায় জীবনযাপন করেন না, বৈদেশিক পদ্ধতিও চলে। তবে ভারতীয়তার মর্যাদা মানেন। টাউনসেণ্ড আপিস থেকে ফিরলে খদ্দরের পাঞ্জাবী পায়জামা পরে ভারতীয় হয়ে যান। টেনব্রুকের ছেলে তাই পরে ইস্কুলে যায়, মাথায় একটা গান্ধী টুপি। ছেলেটি গুজরাতী পড়ে, তার বোনটি তো পরিষ্কার গুজরাতী বলে।

ওয়াডিয়ারা নিরামিষাশী। শুধু তাই নয়, তাঁদের খোরাক খাদি ভাণ্ডারের ঢেঁকিছাঁটা বা হাতে-ছাঁটা চালের ভাত। তার সঙ্গে সংগতি রেখে ডাল তরকারি ফলমূল চাপাটি। আমাদের জিজ্ঞাসা করা হলো আমরা কোন্ রীতি পছন্দ করি। আমরা ছিলুম ঘোর আমিষাশী, কিন্তু অপাঙ্‌ক্তেয় হতে ইচ্ছা ছিল না। তাই ওঁদের রীতি বরণ করলুম। ভাগ্যক্রমে দেশী পোশাক সঙ্গে ছিল। নইলে আমার ময়ূরপুচ্ছ আমাকে নাকাল করত।

পাণ্ডে নামে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাওরেছিলুম কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ।

চেহারাটাও অনেকটা সেইরকম বা তার চেয়ে ভালো। কিন্তু শুনে অবাক হলুম তিনি পারসী। পারসীদের পদবী যে পাণ্ডে হয়, তা কী করে জানব? পরে একটি পারসী বিবাহে বরযাত্রী হয়ে পঙ্‌ক্তিভোজনে বসে দেখি পরিবেশকরা অবিকল রাঁধুনি বামুন। অথচ পারসী। পারসীদের সবাই বড়লোক নয়। এমন কি মধ্যবিত্তও নয়। পাছে পরে লিখতে ভুলে যাই সেইজন্যে এখনি বলে রাখি যে, নেমন্তন্ন খেয়েছিলুম কলাপাতায়, যদিও টেবিলের ওপর। পারসীরা যে গোঘ্ন তা বোধ হয় অজানা নয়, কিন্তু ক'জন খোঁজ রাখেন যে তারা উপবীতধারী? তাদের বিয়ের মন্ত্র অংশত সংস্কৃত।

পাণ্ডে মহাশয়ের কাছে ছিল সেদিনকার খবরের কাগজ। পড়লুম পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রত্যাবর্ত্তন সমাচার। পরের দিন তাঁকে আজাদ ময়দানে অভ্যর্থনা করা হবে। মনস্থ করলুম যাব। শুনতে হবে তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা।

পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত তখন বম্বেতে কাজ করেন, তাঁকে পাকড়ানো গেল। তিনি ও আমি আজাদ ময়দান অর্থাৎ এসপ্লানেড ময়দানে গিয়ে রবাহূতদের ভিড়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু দাঁড়াতে দিলে তো? কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার, পরনে খাকী শার্ট হাফ-প্যান্ট, পুলিসী স্বরে বললেন, 'বৈঠ যাও।' রামরাজ্যে কেউ কাউকে 'আপনি' বলবে কি না বোঝা গেল না, অন্তত ভলান্টিয়ারের মুখে তার নমুনা ছিল না। বোধ হয় পোশাকটার স্বভাব এই যে, পরলেই মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। লঙ্কায় গেলে যদি রাক্ষস হয়, তবে খাকী পরলে খোক্কস হয়।

ঘাসের ওপর পা মেলে দিয়ে আরাম করে বসবার মতো জায়গা যতক্ষণ খালি ছিল ততক্ষণ আমরা পণ্ডিতজীর প্রতীক্ষা করলুম। মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত স্থানীয় নেতারা জনতার ধৈর্য বিধান করতে গান জুড়ে দিলেন; তাতেও ধৈর্য রক্ষা হয় না দেখে শঙ্কররাওজী শুরু করে দিলেন বক্তৃতা। বাগ্মী বলে তাঁর প্রসিদ্ধি আছে, অযথা নয়।

আমাদের পাঠ্য জুটে গেল একখানি কমিউনিস্ট পত্রিকা। সেখানি কিনতে হলো একটি নীলকৃষ্ণ স্কার্ট পরা বালিকার কাছে। মেয়েটি পারসী কি মুসলিম কি হিন্দু তা বুঝতে দেওয়া হয়তো সাম্যবাদীদের নীতিবিরুদ্ধ। অথবা যে-কোনো প্রকার ভারতীয়তাই তাদের পক্ষে আপত্তিকর ফাসিস্টতা। আমার কিন্তু ধারণা, যে কারণে জাতীয় পতাকাধারীর অঙ্গে খাকী হাফ-প্যান্ট ও শার্ট, সেই একই কারণে রক্ত নিশানধারিণীর পরিধানে স্কার্ট। কারণটা আর কিছু নয়, শাসক ও শোষককুলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। আমরা ইংরাজকে চাইনে, কিন্তু ইংরেজীকে চাই। আমরা কায়ায় ইংরাজ নই কিন্তু মনোবাক্যে ইংরাজ।

তা কমিউনিস্টরা উদ্যোগী বটে। বাঘের ঘরে ঘোগের মতো কংগ্রেসী জনসভায় সাম্যবাদী ইশ্‌তাহার। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের—অন্তত কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর—নিন্দাবাদ। তখনো আন্দাজ করিনি যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গৃহবিবাদের উদ্যোগপর্ব চলেছে। তখনো ত্রিপুরীর ঢের দেরী।

অন্ধকার হলো। জবাহরলালজীর পথ চেয়ে আমাদের মুখচোখ লাল হলো। বেরিয়ে আসছি এমন সময় ব্যাণ্ড বেজে উঠল মনে পড়ে। নহবত নয়, লাউড স্পীকারে শোনা গেল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ কিন্তু সন্ধ্যার আবছায়ায় স্পষ্ট দেখা গেল না তাঁর দণ্ডায়মান মূর্তি।

রাজপথের ওপর খাড়া হয়ে গৃহিণীদ্বয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি, তাঁরা ছিলেন মহিলাবিভাগে। এবার রামরাজ্যের পুলিস নয়, সাম্রাজ্যের পুলিস এসে হটতে হুকুম দিল। বাপ রে! সে কী পুলিস সমাবেশ! পণ্ডিতজীর সম্বর্ধনার জন্যে কংগ্রেসমন্ত্রীরা স্বয়ং না আসুন, সান্ত্রী প্রেরণ করেছিলেন অগণ্য। গোরা সার্জেন্ট এমন কড়া পাহারা দিচ্ছিল যে রাস্তায় একটিও পদাতিক ছিল না।

জীবনসঙ্গিনীদের সাক্ষাৎ পেয়ে জীবন ফিরে পাচ্ছি, হেনকালে আলাপ হয়ে গেল জবাহরভগিনী কৃষ্ণার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আরো দু'একজন মহিলা ছিলেন, বোধ হয় সরোজিনী নাইডু

মহাশয়ার ভগিনীও। এঁদের কাছে সংবাদ মিলল যে, দিন দুই পরে ওয়েস্ট-এণ্ড সিনেমায় চীন ও স্পেন বিষয়ক ফিল্ম প্রদর্শিত হবে। উপস্থিত থাকবেন ও উদ্বোধন করবেন জবাহরলাল। টিকিট চেষ্টা করলে এখনো কিনতে পাওয়া যায়, সে ভার দাশগুপ্ত নিলেন। তিনি একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণের জোগাড়ে ছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণা বললেন তাঁর দাদা দারুণ ব্যস্ত, স্পেনের জনগণের জন্যে এক জাহাজ খাদ্য পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছেন।

॥ তিন ॥

ওয়েস্ট-এণ্ড সিনেমায় ফিল্ম দু'টি দেখানো হলো দুপুরের আগে। চীনের গেরিলা যুদ্ধ। চু তে। মাও ৎসে-তুং। স্পেনের ধ্বংসলীলা। নো পাসারান। রোমাঞ্চকর দৃশ্য। আমরা তো ছায়ামাত্র দেখে শিউরে উঠছি, ওদিকে ওরা বাস্তবের সঙ্গে হাতাহাতি করছে।

করবার কিছু নেই। শুধু অনুভব করি। সহানুভবী আমরা ঘরশুদ্ধ লোক। কারো মুখে পাইপ, কারো পরনে জর্জেট। বম্বের শৌখিন সমাজের অনেকেই সমুপস্থিত। গান্ধী টুপিও সংখ্যায় কম নয়। আবহাওয়াটা কস্‌মোপলিটান। সামনের সারিতে বসেছিলেন জবাহরলাল, উঠে কয়েকটি কথা ইংরেজীতে বললেন। যাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি তাঁর স্পেনের অভিজ্ঞতা সচিত্র করবেন তাঁরা নিরাশ হলেন। তা বলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ওটা তো সভা নয়, ওখানে আমাদের কাজ ছবি দেখা। জবাহরলালের সঙ্গে ছবি দেখা।

তিনি বাগ্মী নন। তাঁর বক্তৃতা যেন বক্তৃতা নয়, একটু উঁচু গলার কথাবার্তা। সম্ভবত আতশবাজির আর্ট তাঁর অজানা। মনে হলো বেশ সহজ সরল মানুষ তিনি। খেয়ালীও বটে। হঠাৎ এক সময় উঠে গেলেন, শুনলুম তাঁর ভালো লাগে না নিজের প্রশস্তি। সভাপতি না কে যেন সেই সময় তাঁর গুণগান করছিলেন। দেখলুম তিনি বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন।

সেদিন আলাপ হলো কয়েক জনের সঙ্গে। চীন ও স্পেনের জন্যে সত্যিকার মাথাব্যথা যাঁদের তেমন কারো কারো সঙ্গেও। তাঁরাই এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা, সংগৃহীত অর্থ চীনদেশে পাঠিয়ে তাঁরা মানবের প্রতি মানবকৃত্য করছেন। এই ফ্যাশনেবল জনতায় তাঁদের নিরাভরণ নির্জিত রূপ কেমন একটা করুণ ছাপ রেখে যায়। দরদী হবার অধিকার তাঁদেরই, আমরা তো সংসারী লোক। একটু পুণ্য করতে এসেছি।

পরের দিন আমাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল ক্রিকেট ক্লাব অফ ইণ্ডিয়ায়। নিমন্ত্রাতা সরোজ চৌধুরী ক্লাবেই ঘরগৃহস্থালী পাতিয়েছেন। চিরকুমারের পক্ষে ওর চেয়ে আরাম আর নেই। সেকালের বৌদ্ধ বিহারের আধুনিক সংস্করণ এই সব ক্লাব, সঙ্ঘারামের আরাম তথা সঙ্ঘ দুই রয়েছে এতে।

অথচ হুবহু বিলিতী ব্যাপার, অফ ইণ্ডিয়াটুকু প্রক্ষিপ্ত। ক্রিকেট কথাটাও প্রক্ষিপ্ত না হোক, উৎক্ষিপ্ত। কারণ সেখানকার সভ্যেরা কদাচিৎ খেলোয়াড়, অধিকাংশই সামাজিকতার সুযোগসুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট। কাজের সময় কাজ, ছুটির সময় ক্লাব, এই মহাতত্ত্ব জগতের প্রতি ইংলণ্ডের দান। পৃথিবীময় যার অনুকরণ হচ্ছে ভারতে তার অনুকরণ মার্জনীয়।

চৌধুরী সুদীর্ঘকাল বম্বের নাগরিক। একটি ইংরাজ কোম্পানীর জেনারল ম্যানেজার। তথা পার্টনার। কলকাতা হলে এর মতো বড়ো সাহেব বোধ হয় বাংলা বলতেন না, কিন্তু বম্বের একটা বিশিষ্টতা হচ্ছে এখানকার স্বাধীনজীবীরা স্বাধীনচেতা। বিদেশীর সঙ্গে সমান হতে গিয়ে এঁরা স্বজাতির নাগালের বাইরে চলে যান না। পক্ষান্তরে পরদেশীয় পরশ বাঁচিয়ে গদির উপরে লক্ষ্মীর বাহনটির মতো রাতদিন বসে থাকেন না।

চৌধুরীর ডিনারে এক বাঙালীর মেয়ে আমাকে চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন আমার সহধর্মিণীর সীমন্ত রক্তিম কেন?—আমি বললুম, ও যে সিঁদুর। তিনি জানতে চাইলেন, সিঁদুর কেন? আমার ধারণা ছিল হিঁদুর সঙ্গে সিঁদুর এমন অবিচ্ছিন্ন যে, ভূভারতে কেউ নয় সে বিষয়ে অজ্ঞ। খোঁজ নিয়ে বোঝা গেল তিনি কোনো দিন বাংলা দেশে যাননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিস্ময় দূর হয় না। বাংলা দেশে না যান, হিন্দুস্থানে তো রয়েছেন। আমার বন্ধুরা ব্যাখ্যা করলেন যে, সীমন্তে সিন্দুর পশ্চিম ভারতের প্রথা নয়, হিন্দুর সঙ্গে ওর সম্বন্ধ প্রাদেশিক সীমান্তেই নিবদ্ধ। তাই তো। পশ্চিম ভারতে এপ্রথা নেই, দক্ষিণ ভারতেও না। উত্তর ভারত সম্বন্ধে নিশ্চিত নই। তবে এটা বঙ্গের বিশেষত্ব। উৎকলেরও। বোধ হয় আসাম ও মিথিলারও। এসব প্রদেশ চীনদেশের নিকটে বলেই কি? চীনদেশ থেকে খাঁটি সিঁদুর আসে বলেই কি? বলিদানের রক্ত কপালে মাখতে মাখতে সেই অভ্যাস থেকে এই অভ্যাস জন্মায়নি তো? তন্ত্রপ্রধান অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব কি তন্ত্রপ্রভাবের সাক্ষী?

তার পরের দিন বিচারপতি সেন মহাশয়ের সদনে মরাঠী সাহিত্যিকদের আসরে আমার নিমন্ত্রণ। ক্ষিতীশচন্দ্র একদা রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি রাজভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতার পদ্যানুবাদও তাঁর সুকৃতি। তাঁর আজকাল অবসর নেই, কিন্তু লেখার হাত এখনো আছে, চিঠিপত্রে ধরা পড়ে। তাঁর বাংলা লেখা তাঁর অন্তরঙ্গদের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগায় যে, কেন তিনি এমন ক্ষমতার অনুশীলন করেন না? অন্তঃসলিলা ফল্‌গুধারার মতো যে রসপ্রবাহ তাঁর হৃদয় আর্দ্র করেছে, তাঁর আলাপ আলোচনাও সেই রসে সিক্ত। বিচারপতি হয়ে তিনি মথুরাপতি হননি, সব বয়সের ও সব অবস্থার মানুষ তাঁর কাছে অভয় পায়, পায় আন্তরিক অমায়িকতা।

অভ্যাগতদের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন মামা বারেরকার। অন্তস্থ ব। মহারাষ্ট্রে তাঁর নাটকনাটিকার খ্যাতি তাঁকে সর্বজনের মাতুলসম্পর্কীয় করেছে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম মামা নয়। মামা বারেরকার, কাকা কালেলকার, দাদা ধর্মাধিকারী—এ ধরনের সার্বজনীন সম্পর্কসূচক নাম মহারাষ্ট্রেই চলে। কেবল সাহিত্যক্ষেত্রে নয় রাজনীতিক্ষেত্রেও। নানা সাহেব, নানা ফর্দনবীশ, এসব নাম এখন ইতিহাসের পাতায়। মাধব শ্রীহরি অণে মহাশয়কে বাপুজী অণে বলা হয়।

এটি সম্ভব সে প্রদেশের পদবীগুলি মুখুয্যে বাঁড়ুয্যে ঘোষ বোসের মতো সুলভ নয় বলে। বাংলা দেশের জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে অন্তত জন দুই চাটুয্যে, জন তিনেক মুখুয্যে, জনা পাঁচ ছয় বাঁড়ুয্যে ছিলেন ও আছেন। কাকেই বা মামা বলে ডাকি, কাকেই বা খুড়ো বলে? চাচা ইসলাম ও মামু আহমদ বললে কে কে সাড়া দেবেন? মরাঠী লেখিকারা পিতা ও পতির পদবী অম্লানবদনে আত্মসাৎ করেন। যথা কমলাবাই দেশপাণ্ডে। বাংলায় কিন্তু দেবীদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি না হোক তেত্রিশ তো বটেই। কা দেবী সর্বভূতেষু মাসীরূপেণ সংস্থিতা?

যা হোক, আমাদের মামা একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তাঁর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কথাবার্তা হলো। মামা বললেন তাঁর প্রদেশে বাংলার মতো ব্যবসায়িক রঙ্গালয় নেই, যা আছে তা শখের। তাতে অভিনেত্রীর অভাব। মরাঠা মেয়েরা ইদানীং সিনেমায় যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই কুলাঙ্গনা ও বিদুষী। কিন্তু থিয়েটারে একজনও প্রবেশ করছেন না। মামা চেষ্টা করছেন অন্তত একটি শখের সম্প্রদায় গড়তে। তাতে মেয়েরাও থাকবেন। এ হোলো চার বছর আগের হালচাল। ইতিমধ্যে হাওয়া হয়তো বদলেছে।

॥ চার ॥

মালাবার পাহাড়ের সমুদ্রতীর ছোটবড় শিলাখণ্ডে বন্ধুর। সেখানে বিহারের স্থান সংকীর্ণ, স্নানেরও পরিসর নেই। কোনো মতে একটা ডুব দিয়ে উঠে আসা তো স্নান কিংবা অবগাহন নয়। চেষ্টা করলে

সেখানেও প্রোমেনাড নির্মাণ করা যেত, কিন্তু জমির দাম এত বেশী যে বাড়ী তৈরির দিকেই নাগরিকদের ঝোঁক। তা ছাড়া পাহাড় ধোওয়া ময়লা জল সেখান দিয়ে নেমে সমুদ্রের জলে মেশে। সেটা অবশ্য বর্ষায়। অন্য সময়েও নর্দমার সঙ্গে সমুদ্রের প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ থাকায় মাঝে মাঝে একটা গন্ধ ওঠে, নাকে রুমাল দিতে হয়। এইসব কারণে কেউ সমুদ্রের ধারে ফিরে তাকায় না, বাড়ীগুলো পশ্চিমমুখী না হয়ে পূর্বমুখী। তবে সূর্যাস্তের বিশাল মহিমা উপলব্ধি করবার জন্যে বাতায়ন খোলা রাখে। আরব সাগরের সূর্যাস্ত ভারতবর্ষের একটা দৃশ্য।

মালাবার পাহাড়ের অপর প্রান্তের এক কোণে চৌপাটি। সেখানে বালুর উপর পায়চারি করে লোকজনের মেলায় আপনাকে মিলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যাবেলাটা কাটে। মরাঠা মেয়েরা যায় খোঁপায় ফুলের মালা জড়িয়ে। শাদা ফুল। মাথায় কাপড় দেওয়ার বিধি কেবল বিধবাদের বেলায় মহারাষ্ট্রে। কারণ তাদের কেশদাম মুণ্ডিত বা কর্তিত। শাদা ফুলের কুণ্ডলী দেখে চমক লাগে, সৌরভে নিঃশ্বাস আকুল হয়। প্রকৃতির দেওয়া এই আভরণের কাছে সোনারুপা নিষ্প্রভ, আতর এসেন্স অকিঞ্চিৎকর। গুজরাতী পারসী ললনারা কিন্তু আমাদেরই মতো লজ্জাবতী ও সাজসজ্জায় কৃত্রিমতার পক্ষপাতী। তা হলেও গুজরাতীদের প্রসাধন তাদের ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করে না, তারা সুসংবৃত হয়েই সন্তুষ্ট। তাদের মধ্যে আমি এমন একটা সুষমার সন্ধান পাই যা নিসর্গেরই দান। মহারাষ্ট্রীয়েরা বহু শতাব্দী ধরে মানুষ হয়েছে পাহাড়ে পর্বতে, গুজরাতীরা সমতলে ও সমুদ্রবক্ষে। পারসীদের বসনভূষণের সমারোহ বোধ হয় ইরানী উত্তরাধিকার। ধনের সঙ্গে ওর গভীর সম্পর্ক নেই, কেননা ধনিক পরিবারেও আমি অকপট সারল্য লক্ষ্য করেছি।

যাঁদের মোটর আছে তাঁদের মোটরে করে বেড়ানোর জন্যে মেরিন ড্রাইভ। সমুদ্রের পাড় ধরে এই সড়কটি আগে ছিল না, সমুদ্রকে হটিয়ে দিয়ে তার কবল থেকে যে জমিটুকু উদ্ধার করা হয়, এটি তারই সামিল। এক দিকে আরব সাগরের পশ্চাদ উপসাগর, ব্যাক বে। অপর দিকে অত্যাধুনিক হর্ম্য। কোনোটি সদ্য নির্মিত, কোনোটি অসমাপ্ত। কালক্রমে এটি মালাবার পাহাড়েরই মতো ফ্যাশনেবল জনারণ্য হবে, মোটরিস্টদের ভূস্বর্গ।

ব্যাক বে দেখে তৃপ্তি হয় না। আমার ভালো লাগে মুক্ত পারাবার। খিড়কির চেয়ে সদর শ্রেয়। সদরের খোঁজে একদিন আমরা শহরের উত্তরে যাত্রা করলুম, হাজির হলুম জুহুতে। জুহুর সমুদ্র পুরীর মতো অবারিত, প্রশস্ত বালুশয্যা দিগন্তে মিশেছে। দূর থেকে অয়শ্চক্রের মতো দেখায় কি না জানিনে, কিন্তু বেলাভূমি বঙ্কিমাকৃতি। তমালতালী বনরাজি না হোক, নারিকেলসারি ঘন সাজে সেজেছে। পাশাপাশি অনেকগুলি বাংলো, কোনোটি যথেষ্ট জায়গা জোড়েনি, গাছের ছায়ায় ঝাড়ের মতো গজিয়েছে। তাদের এক টেরে ঘোষ বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার বাস করেন, কাজ তাঁর জুহুর এরোড্রোমে। ঘোষ তখন কাজে বেরিয়েছেন, খবর পাননি যে আমরা আক্রমণ করছি। ঘোষের কেউ নেই, জুহুর সেই হুহু করা হাওয়ায় নারিকেলের পল্লবমর্মরে তাঁর সেই ঘোষবতী বীণার মতো কুটীরখানিতে চিরন্তন চির নূতন ঝংকার উঠছে—শূন্য মন্দির মোর। শূন্য মন্দির মোর।

মানুষের অদৃষ্টে সুখ নেই। সাধ ছিল জুহুতে ঢেউয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে সাঁতার কাটব। শুনলুম ঢেউ যেখানে আছে তত দূর গিয়ে কেউ কেউ আরো দূরে চালিত হয়েছে জলজন্তুর জলপানি হতে। শুনে আর সাঁতার কাটা হলো না। হাঁটুজলে হামাগুড়ি দিয়ে জলকেলি সাঙ্গ করলুম। তার পরে ঘোষের চৌবাচ্চায় আমার তিন বাচ্চার অনধিকার প্রবেশ ও অঙ্গ প্রক্ষালন। তবে দিনটা মন্দ কাটল না। বালুর উপর ঝিনুক কুড়ানো, বাড়ী বানানো, পায়চারি থেকে ছুটোছুটি সবই করা গেল সপরিবারে ও সবান্ধবে। দাশগুপ্তরা ছিলেন, চৌধুরীও।

জুহুর সঙ্গে জুজুর সম্পর্ক কাল্পনিক না বাস্তবিক তা বোঝা যায় না, যখন দেখি জেলেরা

ঢেউয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, জেলেনীরা জাল ধরে টানছে। ভয়ংকরের প্রতি ওদের ভ্রূক্ষেপ নেই। ভাবছিলুম নারী তো পুরুষের বহিঃসঙ্গিনীও বটে, শুধু গৃহসঙ্গিনী নয়। শ্রমিক শ্রেণীতে এটা স্বতঃস্বীকৃত, যত বিতর্ক কেবল পরাসক্ত শ্রেণীর বেলায়। পুরুষেরা পরগাছা বলে মেয়েরাও পরগাছা।

সেদিন জুহু থেকে ফিরে বেশ পরিবর্তন করে বরযাত্রী হতে হলো। নিমন্ত্রণ করেছিলেন জাহাঙ্গীর ব্যাঙ্কার ও তাঁর পত্নী। তাঁদের পুত্র হোমির শুভ বিবাহ। নিমন্ত্রণপত্রে কন্যার নাম তো ছিলই, ছিল কন্যাকর্তা ও কন্যাকর্ত্রীর নামও। নিমন্ত্রণপত্রটি ইংরেজী ভাষায়। বরের ভগিনী থিয়সফিস্ট, সম্ভবত ওয়াডিয়াদের জ্ঞাতি। তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বিবাহমণ্ডপে।

পারসীদের বিবাহ হয় এমন একটি স্থানে যেটি বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ কারো নিজস্ব সম্পত্তি নয়। খ্রীস্টানদের যেমন গির্জায় গিয়ে দু'পক্ষের মিলন হয় পারসীদের তেমনি এক বারোয়ারিতলায়। তার মালিক পারসীসমাজ। আমরা যেখানে নীত হলুম সেখানটার নাম অল-ব্লেস বাগ। All-Bless একটি ইংরাজী সমাস, মানে সর্বমঙ্গল। শোনা যায় এক পারসী কুবেরের ঐ পদবী ছিল, তিনিই সমাজকে ঐ ভূখণ্ড দান করে গেছেন। আর Baug মানে বাঘভালুক নয়, বাগবাগিচা। যেমন আরামবাগ। ভূখণ্ডের উপর মণ্ডপ ও অন্যান্য কয়েকটি ভবন বিবাহকালে ব্যবহার করার অধিকার যে কোনো পারসীর আছে, তবে তার জন্যে অনুমতি নিতে হয় ন্যাসীমণ্ডলীর। বোধ হয় কিছু চাঁদাও দিতে হয় ব্যবহার বিনিময়ে। এই রকম বাগ বম্বে শহরে আরো কয়েকটি আছে, নইলে এক রাত্রে একাধিক শুভকর্ম অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

মণ্ডপের প্রাঙ্গণে সারি সারি চেয়ার, লক্ষ করিনি কোনগুলি কোন পক্ষের। মনে হলো তেমন কোনো সীমানির্দেশ নেই, উভয়পক্ষের যাত্রীযাত্রিণীরা নির্বিশেষে সমাসীন। আমরা গিয়ে দেখি প্রভূত জনসমাগম। প্রায় সকলেই পারসী। ব্যাঙ্কার ও তাঁর সহধর্মিণী এসে অভ্যর্থনা করলেন, ঠাঁই করে দিলেন সামনের দিকে। তাঁরা যে কেবল ভদ্র তাই নয়, অত্যন্ত সরল ও স্নেহশীল। নানা ভাবে পশ্চিমের অনুকরণ করলেও অন্তরে তাঁরা পুবদেশী। আমার তো এক বারও বোধ হলো না যে ইউরোপে এসেছি। ঠাট বদলেছে, কিন্তু প্রাচ্য আন্তরিকতা তেমনি রয়েছে। তেমনি মাসীপিসীর মতো মানুষটি বরের মা। তাঁর কোথাও একরত্তি মেমসাহেবিয়ানা নেই।

পারসীদের সকলের পরিধানে সাদা পোশাক। আমিই একমাত্র কৃষ্ণ মেষ। সারাক্ষণ কুণ্ঠিত ভাবে বসেছিলুম, কী দেখলুম কী শুনলুম সব স্মরণ নেই। মণ্ডপের তিন দিকে জুঁই ফুলের সাজসজ্জা, এক দিক খোলা। সেটি অবশ্য সামনের দিক। মণ্ডপে আসবার পথে বরের মায়ের সঙ্গে কনের মায়ের ডালিবিনিময় হলো। ডালিতে ছিল শাড়ি, নারিকেল ইত্যাদি। তার পরে বরের মা দিলেন কনেকে উপহার, আর কনের মা বরকে। তার পরে বর কনে দুজনে বসলেন মণ্ডপের উপর দুখানি উচ্চাসনে। যেন রাজা ও রাণী। দুজনের দুদিকে দু'পক্ষের পুরোহিত দাঁড়িয়ে। বরের কাছে কন্যাপক্ষের পুরোহিত, কনের কাছে বরপক্ষের পুরোহিত। পুরোহিত ব্যতীত আরো দুজন ছিলেন, সাক্ষী কিংবা best men। পুরোহিতেরা পরম উৎসাহে বরকন্যার অঙ্গে তণ্ডুল নিক্ষেপ করতে থাকলেন, উচ্চারণ করতে থাকলেন অবেস্তার মন্ত্র। মন্ত্রের মধ্যে সংস্কৃত ছিল। বোধ হয় দীর্ঘকাল ভারতে বাস করে ওটুকু গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা হিন্দু ও ইরানী উভয়েরই পূর্বপুরুষ এক, ভাষাও মূলতঃ তাই। যা হোক পুরোহিতদ্বয়ের পরাক্রম দেখে স্থির করলুম পরজন্মে পারসী হব না। হলে তো কানে ঢুকবে মন্ত্রের বুলেট, চোখে বিঁধবে চালের কার্তুজ। রাজা হয়ে মজা নেই, যদি রাণীর পুরোহিত হিতে বিপরীত করেন।

এর পরে সিভিল রেজিস্ট্রেশন। দেখা গেল পারসীরা কোনো অনুষ্ঠান বাদ দেননি। তা হোক,

সবই সংক্ষিপ্ত। হিন্দু বিবাহের তুলনায় সময় লাগল সিকির সিকি ভাগ। মাঝে মাঝে নহবতের বদলে ইউরোপীয় নাচের অর্কেস্ট্রা বাজছিল। শেষ হলো যতদূর মনে পড়ে ইউরোপীয় কণ্ঠসংগীতে। অতঃপর পঙ্‌ক্তিভোজন। সারি সারি টেবিল চেয়ার, বিরাট ব্যাঙ্কেট। তবে ঐ যে—কলার পাতায় বিলিতী ফলার। বিলিতী মদিরাও ছিল, খুরিতে কি কাঁচের গ্লাসে ঠিক স্মরণ নেই। হাঁড়ি হাতে রাঁধুনি বামুন গম্ভীর ভাবে চলছেন সামনে দিয়ে, হাতা দিয়ে তুলে দিচ্ছেন যার যা দরকার। এঁরাও পারসী। যতদূর জানি উপবীতধারী। দেশী বিদেশী হিন্দু খ্রীস্টান বিভিন্ন আচার মিলিয়ে সে এক অপূর্ব সমন্বয়। যেমন কস্‌মোপলিটান বম্বে শহর তেমনি কস্‌মোপলিটান তার অগ্রণী সম্প্রদায়।

হোমি ও তাঁর সদ্যপরিণীতা বধূ ভোজনরতদের তত্ত্বাবধান করে গেলেন। এক সঙ্গে বৌভাত সারা হলো। সময়সংক্ষেপের মতো ব্যয়সংক্ষেপও ঘটল। পারসীদের কাছে আমাদের অনেক শেখবার আছে, তবে ঐ নাচের অর্কেস্ট্রাটি বাজে খরচ। বিদায়কালে ব্যাঙ্কারগৃহিণী ও তাঁর কুমারী কন্যা আমাদের গলায় মালা পরিয়ে দিলেন সযত্নে। এটি বড় সুন্দর প্রথা। যেমন সুন্দর ঐ যুথিকাবিতান।

সন্ধ্যায় আরম্ভ, রাত দশটায় শেষ। উৎসব বলতে আমি এই বুঝি, যাতে নিদ্রার ব্যত্যয় নেই। পারসীরা কাজের লোক, রাতের ঘুম মাটি হলে দিনের কাজ মাটি হবে, এটুকু বিবেচনা আছে। তাই উৎসবকে অনিয়ম বলে ভুল করেনি। কিন্তু একান্ত নিঃশব্দপ্রকৃতি তারা, এত বড় উৎসবেও কলরব করেনি। আমি কিন্তু হৈ চৈ ভালোবাসি। বিয়ের সময় না হোক, ভোজের সময়।

॥ পাঁচ ॥

শহরের সাহিত্যিক ও সাহিত্যে আগ্রহীদের সঙ্গে যাতে আমাদের আলাপ পরিচয় হয় তার জন্যে একটি উদ্যান সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে গুজরাতী সমালোচক ঝাবেরীর ও গুজরাতী লেখিকা লীলাবতী মুনশীর প্রদেশের বাইরেও সুনাম আছে। লীলাবতীর স্বামী কন্‌হাইয়ালাল্ কংগ্রেসমন্ত্রীমণ্ডলীর উজ্জ্বলতম রত্ন। তিনি যে গুজরাতী সাহিত্যেরও উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক এ সংবাদ সকলে রাখে না। উপরন্তু তিনি একজন সমাজসংস্কারক। অসবর্ণ বিবাহের পথিকৃৎ। সেদিন তিনি শহরে ছিলেন না।

তৈয়বজী পরিবারের ফৈয়জ ও তাঁর পত্নী সেখানে ছিলেন। বম্বের মুসলমানদের এক প্রকার বিশিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, ফৈয়জ তাই পরেছিলেন। আচকানের বদলে আলখাল্লার মতো, ফেজের পরিবর্তে সোনালী পাগড়ি, যত দূর মনে পড়ে। তাঁর পত্নীর পরিধানে শাড়ি। তবে তাতেও বোধ হয় বিশেষত্ব ছিল। শাড়ি আজকাল সকলেই পরেন, কিন্তু পারসীরা যেমন করে পরেন মুসলমানেরা তেমন করে পারেন না, গুজরাতীরা যে ঢঙে পরেন মরাঠীরা সে ঢঙে না। ক্রমশ একটা নির্বিশেষ রীতি বিবর্তিত হচ্ছে সেটা বিলেত না গেলে মালুম হয় না। সেখানে ভারতীয় মহিলা মাত্রেরই নিখিল ভারতীয় রীতি।

আর ছিলেন কুমারাপ্‌পাদের এক ভাই, সস্ত্রীক। এঁরা শ্রমিকদের বস্তিতে কর্মীদের শিক্ষালয় চালান। মিসেস নায়ার। এঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ, প্রায় সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছেন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্যে। একটি হাসপাতাল, একটি মেডিকেল স্কুল না কলেজ, এমনি আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চলে তাঁর সদাব্রতে। কৌয়াসজী জাহাঙ্গীর-ভগিনী মিসেস সবাওয়ালা। অল্পবিত্ত পারসী মহিলাদের জন্যে ইনি ও এঁর সহকর্মিণীরা মিলে একটি শিক্ষাসত্র খুলেছেন, সেখানে যতরকম হাতের কাজ শেখানো হয়। হাজার হাজার পারসী দুপুর বেলা আপিসে বসে এঁদের কাছ থেকে কেনা টিফিন খেয়ে এঁদের সাহায্য করেন। বহু পারসী পরিবারে এঁরা কেক বিস্কুট জ্যাম

জেলি সরবরাহ করেন। শাড়ি বোনা, শাড়ির পাড় তৈরি, দরজির কাজ, সূক্ষ্ম সেলাই, মাখন তোলা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাপার এঁদের আটটি বিভাগকে ব্যাপৃত রাখে। এই ভাবে অসংখ্য মেয়ে দিনে অন্তত আট আনা রোজগার করে। একটি বাড়ির চারটি মেয়ে মিলে দিনে দুটি করে টাকা রোজগার করলে মাসে অন্তত পঞ্চাশটি টাকা। দক্ষতা অনুসারে উপার্জন বাড়ে।

পরিচয় দিতে দিতে নিতে নিতে পার্টির হাট ভাঙল। হাটের মতো পার্টিও ভাঙে আরেক দিন জোড়া লাগতে। সেদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন শ্রীমতী লীলাবতী মুনশী। মুনশীরা বাড়ী করেছেন ওর্লি শহরতলীতে। সমুদ্রের ধারে প্রোমেনাড, তার ওধারে বাড়ী। কন্হাইয়ালাল বাড়ী ছিলেন না, মন্ত্রীর কাজে যন্ত্রের মতো ঘুরছিলেন মফঃস্বলে। সাহিত্য সম্বন্ধে যে দুচার কথা হলো তার এইটুকু স্মরণ আছে যে বাংলার মতো গুজরাতীতেও আধুনিকতার বাহন হয়েছেন প্রাচীন সংস্কৃত। গান্ধীজী যে পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাকৃত জনের খাতিরে প্রাকৃত ভাষায় লিখতে সে পরামর্শ শিকায় তোলা রয়েছে। উন্নততর ভাব প্রকাশ করতে গেলে দুরূহতর শব্দ ব্যতীত গতি নেই, এই স্বীকৃতি কেবল বাঙালী লেখকদের মুখে নয়, গুজরাতী লেখকদেরও মুখে। আমি যত দূর দেখতে পাচ্ছি, এই গতিহীনতা থেকে আসবে প্রগতিহীনতা, ঘটবে চক্রগতি। অভিধান থেকে নয়, সাধারণ ব্যবহার থেকে সংগ্রহ করতে হবে চিন্তার বাসা বাঁধবার খড়কুটো। চিন্তা একেই আকাশচারী, তার বাসা বা ভাষা যদি আকাশে হয় তবে মাটির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই থাকে না। মানুষের তা ফানুস ওড়ানো।

এই সময় ক্রিকেট ক্লাব সংলগ্ন ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে খেলা চলছিল হিন্দু মুসলমানে। পেন্টাঙ্গুলার বা পঞ্চকোণী ক্রিকেট বম্বের বিশেষত্ব। সম্প্রতি করাচী প্রভৃতি স্থলেও এর প্রসার ঘটেছে। হিন্দু মুসলমান পারসী ইউরোপীয় এই চারটি দল ছিল আগে। এখন হয়েছে দেশীয় খ্রীস্টান এবং আরো কয়েকটি সম্প্রদায় মিলে পঞ্চম দল। ইংরেজরা যদিও ভারতের মালিক তবু ক্রিকেটের উপর তাদের ভাগ্য নির্ভর করে না। তারা সচরাচর হারে ও তার দরুন লজ্জার ধার ধারে না। কিন্তু হিন্দু মুসলমানের এ নিয়ে উত্তেজনার ও মর্মবেদনার অবধি নেই। সারা বছর ধরে তারা দিন গুনতে থাকে কবে খেলা হবে, কবে দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পাবে। আমি যেদিন খেলা দেখতে যাই সেদিন হিন্দু মুসলমানে ফাইনাল খেলা, চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। হিন্দুরা দারুণ হারছিল, এমন অকারণে হারতে কখনও কাউকে দেখিনি। সম্ভবত ক্যাপটেনের উপর রাগ করে তারা নিজেদের নাক কাটছিল। মুসলমানেরা ব্যাট হাতে যেই দৌড় দেয় অমনি মুসলিম দর্শকদের তালে তালে তালি বাজে। হিন্দুর বলে যেই মুসলমান আউট হয় অমনি হিন্দু দর্শকদের করতালিতরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠে। তালির সাহায্যে যদি খেলোয়াড়দের জিতিয়ে দেওয়া যেত হিন্দু মেজরিটির তালপরিমাণ তালি সেদিন তৃতীয় পাণিপথের শোধ তুলত। কিন্তু পাণির পথে পাণিপথ জেতা যায় না।

॥ ছয় ॥.

পারপিয়া গুজরাতী মুসলমান। তাঁর পূর্বপুরুষ বাণিজ্য করতে চীন দেশে গিয়ে সাত দরিয়ার পার পেয়েছিলেন, সেই থেকে বংশপদবী 'পারপিয়া'। যাঁর কথা লিখছি তিনি আমার সঙ্গে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন, আমরা দু'জনে একই জাহাজে তিন দরিয়ার পার পাই।

সপত্নীক পারপিয়া একদিন সপত্নীক আমাকে তাজমহলে নিয়ে গেলেন, অথ হোটেল। গড়নটা যথাসম্ভব পুবদেশী, তাজমহলের সঙ্গে ভাসা ভাসা সাদৃশ্য আছে। ভিতরে বিলিতী খানাপিনা গানবাজনা আদবকায়দা। স্বয়ং শাজাহান এলে মোগলের ঘরে ঘোগলকে দেখে চমকে উঠতেন। এটি বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় হোটেল যেটি পশ্চিমকে পরাস্ত করেছে তার নিজের খেলায়।

মালিকরা পারসী, তাঁরা পরিচালনার দিক থেকে কোথাও কোনো খুঁত রাখেননি। তাই সাহেবলোকেরাও সমুদ্রযাত্রার আগে এইখানে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য পান করেন, সমুদ্রযাত্রার শেষে এইখানে শুয়ে বাদশাহী স্বপ্ন দেখেন।

সেই যে মিসেস নায়ারের কথা বলেছি একদিন তাঁর ওখানে নিমন্ত্রণ! তিনি মহারাষ্ট্রীয়া, তাঁর স্বামী ডাক্তার নায়ার ছিলেন যত দূর মনে পড়ে কেরলপুত্র, জামাতা ডাক্তার বেঙ্কটরাও কর্ণাটকী। এঁরা বৌদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধদেরই মতো হিন্দু সমাজের থেকে অবিচ্ছিন্ন। এঁরা একরকম একাকী একটা হাসপাতাল চালান। হাসপাতালটির নাম বাই যমুনাবাই হাসপাতাল। এখানে জাতিভেদ বা ধর্মভেদ নেই, কাউকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করারও অভিসন্ধি নেই। বিশুদ্ধ মানবসেবা এর আদর্শ। হাসপাতালটির যেখানে অবস্থান সেখানটি ধ্বনিবিরল ও নিভৃত। বেঙ্কটরাও আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘুরতে ঘুরতে আমরা হাজির হলুম হাসপাতালসংলগ্ন বৌদ্ধবিহারে। সেখানে আবিষ্কার করলুম দুটি সন্ন্যাসীকে।

একজনের নাম লোকনাথ। ইনি ইতালীয় বৌদ্ধ। এঁর কর্মস্থল ছিল আমেরিকা, ইনি রাসায়নিক ছিলেন। যুদ্ধকালে মানবধ্বংসী বহু প্রক্রিয়া উদ্‌ভাবন করে পরে এঁর পরিতাপ জন্মায়। তারপর থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। রাত্রে নাকি আসনে বসে নিদ্রা যান।

অপর জনের নাম সদানন্দ। ইনি জার্মান বৈষ্ণব। ইনি কেন সংসার ত্যাগ করলেন জানিনে। বয়স অল্প। বেশ বাংলা বলেন, চৈতন্যচরিতামৃত পড়েছেন। চেহারাও কতকটা বাঙালী বৈষ্ণবের মতো হয়েছে, দেখে বিশ্বাস হয় যে ইনি গৌরভক্ত। মানুষ কত সহজে বিদেশকে স্বদেশ করতে পারে তার দৃষ্টান্ত আগেও দেখেছি, তাই আশ্চর্য হইনি। পারবে না কেন? সবই তো মানুষের দেশ। পারে না তার কারণ অক্ষমতা নয়, অনিচ্ছা। অথবা সুযোগের অভাব।

অভিপ্রায় ছিল বম্বের শ্রমজীবী অঞ্চলে ঘোরাফেরা করব, স্বচক্ষে দর্শন করব তারা কী ভাবে থাকে। এই সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে কার্নিক নামে এক ভদ্রলোক এলেন। তাঁর কাছে যেসব তথ্য পাওয়া গেল তাতে আমার স্বদেশের ধনিকদের প্রতি টান কিছু শিথিল হলো। এখন থেকে বলা যেতে পারে, বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ ধনিকুলেষু চ। তাঁদেরও স্বদেশবিদেশ নেই, লাভের অঙ্কই ইষ্টদেবতা। সেই অপদেবতার পায়ে শ্রমিকের বলিদান যেমন বিদেশী কলে তেমনি স্বদেশী কলে। সরকারী আইনকেও যে তাঁরা কী ভাবে ফাঁকি দেন কার্নিক তা বিশদ করলেন। শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র তো ধর্মঘট। সেই অস্ত্রের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগসত্ত্বেও তারা যে তিমিরে সেই তিমিরে। বরং তাদের কারো কারো অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা বেকার।

অধ্যাপক অল্‌তেকার শহরতলিতে থাকেন। শহরতলির নাম ভিলে পার্লে। এটা কোন্ দেশী নাম জানিনে। বোধ হয় পর্তুগীজ। একদিন আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন মধ্যাহ্নভোজনে। দেশী মতে অর্থাৎ মরাঠী মতে রান্না। গৃহিণীর স্বহস্তে পাক। পিঁড়িতে কি আসনে বসে খাওয়া গেল, পরিবেশনও গৃহকর্ত্রীর স্বহস্তে। এঁরা প্রাচীনপন্থী, প্রাচ্য আতিথেয়তার সবটুকু সৌন্দর্যের অধিকারী। ভাষার অভাব যে কত বড় অভাব, অনুভব করি যখন ভালো লাগা বোঝাতে চাই। আমার জানা ভাষা কর্ত্রীর অজানা। অধ্যাপকের কাছে পাঠ শিখে নিয়ে তবে মুখরক্ষা। বর্গীর হাঙ্গামার সময় থেকে মরাঠাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা পরম্পরাগত ভীতি আছে। সেই যে 'বর্গী এলো দেশে' বলে ছেলেভুলানো ছড়া, তার প্রভাব আমার মনের উপর বহুকাল ছিল। এবার তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মিশে কফি খেয়ে, সাহিত্যালাপ করে মনের উপর থেকে পর্দা সরে গেল। বিচারপতি সেন মরাঠাদের বিশেষ ভালোবাসেন, আমিও অল্পকালের মধ্যে তাঁদের পক্ষপাতী হয়ে উঠি। কেন, কী করে বলব? একটা কারণ বোধ হয় তাঁদের বিদ্যানুরাগ। বিদ্যার জন্যে বিদ্যা ক'জন চায়?

মরাঠাদের মধ্যে যে বিদ্যানুরাগ লক্ষ করলুম তা দেশানুরাগের মতো জ্বলন্ত ও নিঃস্পৃহ।

পারপিয়ারা আমাদের উইলিংডন ক্লাবে নিয়ে গেলেন। বম্বের ইঙ্গবঙ্গদের প্রধান ঘাঁটি। নাচ চলছিল ল্যামবেথ ওয়াক কি রূম্বা। পারপিয়ারা আমাদের ডাকলেন, কিন্তু আমরা ও রসে বঞ্চিত। দেখতে না দেখতে তাঁরা ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, আমরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। অপরূপ পাগড়ি মাথায়, কী একটা পোশাক পরে কয়েকজন কচ্ছী জমিদার এসে আমাদের কাছাকাছি আসন নিলেন, শুনলুম মুসলমান। যাদের সঙ্গে বসলেন তাঁরা হিন্দু। নাচিয়েদের দলে পারসী স্ত্রীপুরুষও ছিলেন। কসমোপলিটান আসর।

॥ সাত ॥

বম্বে থেকে পুণা যেন কলকাতা থেকে আসানসোল। বাঁচি বলতে পারলে দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের আভাস দেওয়া চলত। ভয় ছিল শীতে হয়তো জমে যাওয়া যাবে, কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। বরং বম্বের গরমের পর পুণার ঠাণ্ডা আমাদের জানিয়ে দিল যে ওটা শীতকাল।

আবাহবিদ্যামন্দিরের ডক্টর এস. এন. সেন ও তাঁর গৃহিণী আমাদের ঠাঁই দিলেন। 'কত অজানারে জানাইলে তুমি,' কবি যথার্থ বলেছেন, 'কত ঘরে দিলে ঠাঁই!' দিন তিনেক পরে যখন বিদায় নেবার সময় এলো তখন সত্য হলো তার পরের পঙ্‌ক্তিটি—'দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।'

এই সেই পুণ্য নগরী যার সকাশে ভেট আসত দিল্লী থেকেও। দিল্লী থেকে, গুজরাট থেকে, উৎকল থেকে, তাঞ্জোর থেকে। এত বিশাল ছিল মহারাষ্ট্র সীমান্ত! সেই নগরী এখন প্রদেশের রাজধানীও নয়। তার প্রধান আকর্ষণ তার ঘোড়দৌড়, প্রধান পরিচয় তার স্কন্ধাবার। বম্বের কুবেরকুল সেখানে বাগানবাড়ী করেছেন, শহরে অতিষ্ঠ বোধ করলে বাগানবাড়ীতে ছুটি কাটাতে আসেন। তাতে মোটরিং-এর ফুর্তিও হয়। আর হয় নিচু দরের দার্জিলিং-এর শীতভোগ।

এখনো বহু দেশীয় রাজ্য মরাঠাদের অধিকারে। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বড়োদা, কোল্‌হাপুর ইত্যাদি জুড়লে মহারাষ্ট্রের সীমান্ত সুদূরপ্রসারী। মরাঠাদের মনের উপর এর প্রভাব কোনো দিন নিষ্প্রভ হয়নি। বাংলার বাইরে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সসম্মানে বাস করছে বলে বাঙালীর পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া শক্ত। চার দিক থেকে বিতাড়িত হওয়ায় প্রাদেশিকতার সূচনা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দশ দিকে ছড়িয়ে যাওয়াও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। তেমনি মরাঠাদের পক্ষে প্রাদেশিক হওয়া দুষ্কর। তাদের মধ্যে বরং একটু সাম্রাজ্যবাদের অভিমান আছে। কী করা যায়, মরাঠা সাম্রাজ্য তো ফিরবে না। তার বদলে যদি হিন্দু সাম্রাজ্য হয় তা হলে মন্দ হয় না। 'হিণ্ডুডম' এই অপরূপ শব্দটি মহারাষ্ট্রীয় মস্তিষ্কের অপূর্ব উদ্‌ভাবন। আপাতত পুণা শহরটাই 'হিণ্ডুডম'-এর প্রেসিডেণ্টধানী।

সেদিন অল্‌তেকারকেও পুণায় পাওয়া গেল। তিনি আমাকে প্রথমে নিয়ে গেলেন ফারগুসন কলেজ দেখাতে। এটি মরাঠাদের অতুল কীর্তি। গোখলের ত্যাগ ভারতবিদিত, কিন্তু ত্যাগ আরো অনেকের। কলেজ তখন বন্ধ ছিল। খোলা ছিল লাইব্রেরী। বসে পড়াশোনা করার জন্যে বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার নিজের বই নেই তার বইয়ের ভাবনা নেই। কলেজটির অবস্থান, তার নির্মাণসৌষ্ঠব, তার বিদ্যার্থীভবন, সবই উন্নত ধরনের। পরের দিন আলাপ হলো মহজনীর সঙ্গে। ইনি কলেজের অধ্যক্ষ। বয়স অল্প, মনীষা অসাধারণ। কেবল পড়ার গুরু নন, খেলার সাথী ও সেনানায়ক। এত বড় কলেজের অধ্যক্ষ, কিন্তু থাকেন একটি নগণ্য বাংলোয়। গোখলের মতো মহাজনেরা যে পথে গেছেন মহাজনী সেই পন্থা অনুসরণ করে স্বচ্ছন্দে না থাকুন স্বস্তিতে আছেন।

এর পর সার্ভ্যাণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে গিয়ে কোদণ্ড রাওকে একটা চমক দেওয়া গেল।

নিজেও পেলুম একটা চমক। এঁরা কত অল্পের মধ্যে ঘরসংসার চালান! সমস্ত ক্ষণ যেন তাঁবুতে। কখন কোন্‌খান থেকে ডাক আসবে, অমনি সুটকেস হাতে নিয়ে দু'এক হাজার মাইল রেলদৌড়। নিজের বলতে এঁরা বেশী কিছু রাখেননি। তবে একেবারে ফকির নন। গোখলে যে কেমন করে গান্ধীর আচার্য হলেন তার সাক্ষী এই ভারতসেবক সমিতি। এর রাজনীতি যাই হোক না কেন, এর কর্মনীতির তুলনা নেই। বিভিন্ন প্রদেশের নিঃস্বার্থ কর্মী ও বিদ্বানদের নিষ্ঠাপর জনসেবা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, দশকের পর দশক পরিচালিত হচ্ছে এই কেন্দ্র থেকে। এঁদের কার্যতালিকা বৈচিত্র্যময়। কোল ভীল অস্পৃশ্যদের মধ্যেও কাজ হচ্ছে, আবার মিল শ্রমিকদের মধ্যেও। বিদেশে এ দেশের শ্রমিকরা কী ভাবে থাকে তদন্ত করার জন্যে মাঝে এঁরা প্রতিনিধি পাঠান। কোদণ্ড রাওয়ের মুখে শোনা গেল ফরাসী ইন্দোচীনে তাঁর প্রবেশনিষেধের কাহিনী।

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ব্যবধান ইদানীং ধামাচাপা পড়েছে বটে. কিন্তু তার সত্তা এখনো রয়েছে। নেই যারা ভাবেন তাঁরা কখনো বাঁকুড়া জেলায় বাস করেননি, মহারাষ্ট্রে প্রবাস করেননি, উৎকলে মানুষ হননি, দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেননি। অল্‌তেকার বললেন আমি যদি তাঁর প্রদেশকে সব দিক থেকে চিনতে চাই তবে যেন অব্রাহ্মণদের সঙ্গেও মিশি। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন অধ্যাপক খাড়্‌য়ের আবাসে।

খাড়্‌য়ে সুধী ও সুপুরুষ। তাঁর সঙ্গে যা নিয়ে আলোচনা তার কিছুই স্মরণ নেই। শুধু মনে আছে পুণার মিউনিসিপাল পলিটিক্‌সে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ বিদ্যমান। তা বলে সেটা মারাত্মক নয়, অব্রাহ্মণ দলে ব্রাহ্মণও জোটে. ব্রাহ্মণ দলে অব্রাহ্মণও। সাম্প্রদায়িকতার মতো জাতিভেদও দেখছি হনুমান ও বিভীষণের মতো অমর। রাবণরূপী সাম্রাজ্যবাদ যদি বা মরে এই দুটি আয়ুষ্মান যুগোচিত মুখোশ পরে লাফালাফি দাপাদাপি করতে থাকবে, যতদিন না অসবর্ণ ও অসাম্প্রদায়িক বিবাহ দেশব্যাপী হয়।

পরের দিন মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলুম। মহারাষ্ট্রের আরেকটি অনুপম কীর্তি। কার্বের দর্শন পাওয়া গেল। সাদাসিধে নিরীহ মানুষটিকে দেখে দিনমজুর ভেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলুম। অল্‌তেকার বললেন, ইনিই কার্বে। অশীতিপর বৃদ্ধ, সেকালের মহাস্থবির। একদা এঁরাই ভারতের সঙ্ঘপতি ছিলেন, কখনো মিলিত হতেন পাটলীপুত্রে, কখনো পুরুষপুরে, কখনো নালন্দায়, কখনো বিক্রমশীলায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু কার্বের কাজ মহিলাদের নিয়ে। তাঁর আবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা মাতৃজাতির শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। মরাঠীর মতো একটি প্রাদেশিক ভাষায় ক'খানাই বা কেতাব আছে যা পড়ে ইতিহাসে দর্শনে গণিতে বা রসায়নে গ্রাজুয়েট হওয়া যায়। তবু কার্বের দুঃসাহসে তাও সম্ভব হয়েছে। পরে এক গুজরাতী কুবেরজায়ার দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ হয়েছে, গুজরাতী মেয়েদের জন্যে শিক্ষার বাহন হয়েছে গুজরাতী। তাদের সুবিধার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগ স্থানান্তরিত হয়েছে বম্বেতে। পুণায় যেটুকু অবশিষ্ট সেটুকু দেখে সম্যক ধারণা হলো না।

এর পরে হিন্দু বিধবাভবন। এটিও পুণার তথা মহারাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। বিধবারা এখানে লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তার করেন। শহরের বাইরে অবস্থান, স্বাস্থ্যকর আবেষ্টন। ফারগুসন কলেজ ও সার্ভ্যান্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মতো এই প্রতিষ্ঠানটিরও কয়েকজন স্থায়ী কর্মী আছেন। অন্যূন বিশবছর কর্ম করবেন এই অঙ্গীকার দিতে হয়, বিশ বছর পরে নিষ্কৃতি। পরিচালনার ভার পনেরোজন নিষ্ঠাপর স্থায়ী কর্মীর হাতে। এঁদের মধ্যে কার্বে তো আছেনই, আছেন আটজন বিদুষী মহিলা, প্রায় সকলেই কার্বের প্রাক্তন ছাত্রী। এই প্রতিষ্ঠানটির অধীনে কয়েকটির শাখা প্রতিষ্ঠান বা পাঠশালা আছে বিভিন্ন জেলায়।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুণা কলেজের অধ্যক্ষ কমলাবাই দেশপাণ্ডে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কেলকার মহাশয়ের কন্যা। ইউরোপের প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর। তার আগে নিজেদের মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ইনি বিধবাভবনেরও একজন স্থায়ী কর্মী। দুঃখের বিষয় অল্প বয়সেই বিধবা। সেকালের তপস্বিনীদের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনায় একটি চিত্র আছে, কমলাবাইকে সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মিলে যায়। তা বলে বল্কল কিংবা চীবর পরিধান করেন না, অনাহারে কঙ্কালসার নন। প্রভূত প্রাণশক্তির অধিকারিণী, সেই সঙ্গে মনস্বিতার। 'প্রাচীন ভারতে শিশু' নামে একটি সন্দর্ভ লিখেছেন বিদেশী ভাষায়।

লোকমান্য টিলকের কর্মপন্থার উত্তরাধিকারীরূপে কেলকারের পরিচয় আমার অগোচর ছিল না। কিন্তু মরাঠাদের সেই লাল রঙের শিরস্ত্রাণ দেখলেই আমার শিরঃপীড়া জন্মায়। বাঁচা গেল সন্ধ্যাবেলা কেলকারকে নাঙ্গা শির দেখে। আদৌ ভীষণ নন, বেশ সহজ মানুষ, তবে রাশভারি। বাংলাদেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন, যৌবনে যেন কিছু বাংলা শিখেছেন, মনে পড়ছে। বড় বড় মরাঠী বই লিখেছেন, একখানা দেখালেন। গম্ভীর বিষয়ের পুঁথি মরাঠারা কেনে। মরাঠারা সংখ্যায় বাঙালীর চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তাদের রাজারাজড়ারা শুধু সংখ্যায় নন, দাক্ষিণ্যেও অগ্রগণ্য।

দক্ষিণে

প্রথমে আমার কল্পনা ছিল চট্টগ্রাম থেকে জলপথে যাত্রা করে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল পরিক্রমা করব। তারপর রেলপথে ফিরে আসব। কিন্তু আমি তো একা নই, সঙ্গে স্ত্রী ও তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। এবং দু'জন বেয়ারা। বয়সও আমার পঁয়ত্রিশ। আরো দশ বছর কম হলে চোখ বুজে ঝুঁকি নেওয়া যেত। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা উপকূল দিয়ে যেসব জাহাজ যাতায়াত করে সেগুলি মালবাহী জাহাজ। যাত্রীর জন্যে স্থান যদি বা মেলে আহারাদির অব্যবস্থায় ভ্রমণের আনন্দ মাটি হবে।

শেষপর্যন্ত স্থির হলো আমরা জলপথে শুরু না করে রেলপথে যাব বম্বে। সেখান থেকে শুরু করব জলপথে। যদি যাত্রীবাহী ভালো জাহাজ পাই। কত দেশের যাত্রীবাহী জাহাজ তো বম্বের বন্দর ছুঁয়ে যায়। সেখান থেকে কলম্বো ও কলম্বো থেকে পণ্ডিচেরী ও মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা ফেরা কি সম্ভব হবে না? কিন্তু বম্বেতে গিয়ে খোঁজ করে জানতে পারি যে সঙ্গে দুটি চাকর নিয়ে সিংহলে ঢুকতে হলে বিশেষ অনুমতিপত্র লাগবে ও সে অনুমতি মাদ্রাজ থেকে নিতে হবে। তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের শেষভাগে পাশপোর্ট বা ভিসার বালাই ছিল না। আমরা অক্লেশে যেতে পারতুম। শুধু স্বাস্থ্যঘটিত কয়েকটা বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু চাকর দুটিকে বাদ দিলে শিশুদের দেখবে শুনবে কে? আমরাই যদি দেখি শুনি তো ঘোরাফেরা করব কখন? মেলামেশা করব কখন?

রেলপথে মাদ্রাজ যাওয়াই শ্রেয়। সেখান থেকে জলপথে কলম্বো। তার আগে আমরা একবার পুণা বেড়িয়ে আসি। তার বৃত্তান্ত 'চেনাশোনা'য় বর্ণনা করেছি। এখন যেটা লিখছি সেটা 'চেনাশোনা'-র জের। মাঝখানে কেটে গেছে ত্রিশটি বছর। তার আগেও প্রায় আরো পাঁচটি বছর। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সেই আমি এখন পা দিয়েছি সত্তর বছরে। তখন যা স্পষ্ট ছিল এখন তা আবছা। কাগজে যা টোকা ছিল তা গেছে হারিয়ে। নির্ভর করতে হচ্ছে স্মৃতির উপরে। কিন্তু স্মৃতিও

কি নির্ভরযোগ্য?

পুণা থেকে ফিরে আসার পর বিচারপতি ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের অতিথি হই। বন্ধুরা বলেন মরাঠাদের স্বস্থান যেমন দেখেছি তেমন গুজরাটীদের নিজ বাসভূমিও দেখা উচিত। বম্বে সেদিক থেকে যথেষ্ট নয়। কারণ বম্বে শহরটা হচ্ছে কসমোপলিটান। মরাঠারা যাই বলুক না কেন বম্বের ঐতিহ্য মহারাষ্ট্রের চরিত্র নয়। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে ভাষা অনুসারে প্রদেশ ভাগ করতে গেলে বম্বেকে নিয়ে অনর্থ বাধবে। মাদ্রাজে গিয়ে দেখি একই মনোভাব। কিন্তু সেকথা পরে।

পুণা যখন দেখেছি তখন আহমদাবাদও দেখতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা বলেন, আহমদাবাদ নয়, বড়োদা। সেখানে তখন গায়কোবাড় সরকারের সর সুবা ছিলেন রাজ্যরত্ন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। বিচারপতি ক্ষিতীশচন্দ্র সেনের সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদক। তাঁর সাদর আহ্বান পাই। কিন্তু বড়োদা যাত্রার পূর্বে আমরা যাই অজন্টা এলোরা দেখতে। ওটা আমাদের বহুদিনের সাধ। বম্বে থেকে রেলপথে ঔরঙ্গাবাদ। তখন সেটা নিজাম রাজ্যে। নিজাম সরকারের সদ্যনির্মিত হোটেলে আমাদের অভ্যর্থনা করেন ইউরোপীয় ম্যানেজার। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় আমাদের এলোরা অজন্টা দর্শন। আর একদিন দৌলতাবাদ।

দেশভ্রমণ আমার কাছে নিছক স্থানদর্শন নয়। স্থানের সঙ্গে যোগ দেয় কাল। ঔরঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদের ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর। কারণ ওর আদি নাম ছিল দেওগিরি। যেমন ঔরঙ্গাবাদের আদি নাম ছিল ফতেনগর। ফতেনগর থেকে দেওগিরি গেলে বেশ কয়েক শতাব্দী পেছিয়ে যেতে হয়। তার চেয়ে আরো বেশী পেছিয়ে যেতে হয় এলোরার বেলা। ব্যবধান আরো অনেক শতাব্দীর। আর অজন্টার যেটা আদিপর্ব সেটা তো খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। পেছিয়ে যেতে হয় আরো অনেকদূর। চার দিনে আমরা পেছিয়ে যাই বিংশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে, সেখান থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে, সেখান থেকে চতুর্থ শতাব্দীতে, সেখান থেকে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এ এক বিস্ময়কর কালপরিক্রমা। দু'হাজার বছর পেছিয়ে গিয়ে দু'হাজার বছর আগেকার অতীতকে ছুঁয়ে আসা। যে অতীত যুগে যুগে বিভিন্ন।

পথের মাঝখানে খুলদাবাদে দেখি ভারতসম্রাট ঔরঙ্গজেবের কবর। কবরের উপর সৌধ নেই। একপ্রস্থ চাদর। সেটা সরাতেই একফালি মাটি। তার উপর জল সেচন করা হয়েছে। মনে হয় যেন সবে গোর দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বিশাল সাম্রাজ্য অশোকের পর আর কারো ছিল না। সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যখন দক্ষিণের সুবাদার তথা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন তখন পত্নীর জন্যে নির্মাণ করেছিলেন সাদাসিধে একটি তাজমহল। ঔরঙ্গাবাদে সেটিও আমরা দেখি। তাহলে নিজের জন্যও তো সেইখানেই একটু জায়গা বরাদ্দ করে রাখতে পারতেন। শাহ্‌জাহান যেমন করিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তর বয়সে তাঁর জীবন সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যবর্জিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে ঐশ্বর্য তাঁর কাম্য হবে কী করে? জীবনে তিনি যতই অন্যায় করে থাকুন মরণে তিনি মহান। দেশ বিদেশের সম্রাটদের মধ্যে আমি তো তাঁর মতো বিষয় বৈরাগ্য দেখতে পাইনে। আহা, তিনি যদি অদূরদর্শী না হতেন! অজন্টার রাস্তায় পড়ে আসাইর যুদ্ধক্ষেত্র। ইংরেজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলস্লী যেখানে মরাঠাদের পরাস্ত করেন ঔরঙ্গজেবের পর একশো বছর যেতে না যেতেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মরাঠাদেরও পতন ঘটে।

এইরূপ আর একজন অদূরদর্শী অধিপতি ছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক। সেকালের জগতে তিনি ছিলেন অতুলনীয় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান। চরিত্রেও তিনি ঔরঙ্গজেবের মতো সংযত। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় এমন এক একটি কাণ্ড করতেন যা কেউ সুরার নেশায় বা নারীর নেশায় করে না। এমনি এক কাণ্ড হলো দৌলতাবাদে রাজধানী অপসরণ। দিল্লীর নাগরিকদের উপর ফারমান

জারী হলো তাঁরাও দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে অপসরণ করবেন, সেখানকার নাগরিক হবেন। তাও তিনদিনের মধ্যে। ফলে দিল্লী হলো মরুভূমি। অথচ দৌলতাবাদ যে জনাকীর্ণ হলো তাও নয়। শেষে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের হুকুম দেওয়া হলো 'দিল্লী চলো'। বেচারিরা নিজেদের ঘরবাড়ী জায়গা জমি ছাড়তে বাধ্য হলো, কিন্তু দিল্লীর শূন্যতা পূরণ করতে পারবে কেন?

দৌলতাবাদে তাঁর আমলের দুর্গটি ছাড়া কিছুই নেই দেখবার। সেটার অভ্যন্তরভাগ যাদব রাজাদের আমলের। অত্যন্ত দুর্গম গিরিবর্ত্ম দিয়ে শীর্ষে উঠতে হয়। সেকালের পক্ষে ওর সামরিক গুরুত্ব অশেষ। ওই দুর্গ থেকে সারা দক্ষিণাপথ আয়ত্তে রাখা যায়। তাছাড়া ওটাই তাঁর মতে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষে স্বাভাবিক সদর। দিল্লী তো কেন্দ্রস্থল নয়। কথাটা এক হিসাবে ঠিক। তাই যদি না হতো তবে ঔরঙ্গজেবকেই বা কেন জীবনের শেষ আটাশ বছর দিল্লী ছেড়ে আহমদনগর শোলাপুর প্রভৃতি স্থানে শিবিরবাস করতে হতো। রাজধানীর মায়া কাটানো কি এতই সহজ? সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বড়ো। দক্ষিণ বার বার স্বাধীন বা স্বশাসিত হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের পরে দক্ষিণের সুবাদার নিজাম রাজ্য স্থাপন করেন। ঔরঙ্গাবাদ হয় তাঁর রাজধানী। পরবর্তী কালে রাজধানী হায়দরাবাদে স্থানান্তরিত হয়। তখন ঔরঙ্গাবাদ তার গুরুত্ব হারায়। আমি যখন যাই তখন ওটি একটি জেলা সদর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম বরকত রায়। উত্তর ভারতের কায়স্থদের নাম ও রকম হয়।

দৌলতাবাদের ওই ঐতিহাসিক দুর্গের একপ্রান্তে দেখি হিন্দুদের দেবস্থান। যতদূর মনে পড়ে শিবলিঙ্গ। হিন্দু পুণ্যার্থীরা অবাধে যাচ্ছে। বোধহয় তাদের সে অধিকার চিরকাল অব্যাহত রয়েছে। জানিনে এই গিরিদুর্গের নাম দেওগিরি হলো কেন। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জন্যেই কি? তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইনিই কালজয়ী। দুর্গাধীশরা নন।

এলোরার শৈলখাত কৈলাসও শিবমন্দির। তার সৌন্দর্যের তুলনা ভূ -ভারতে নেই। এর নির্মাণকাল অষ্টম শতাব্দী। তখন গুপ্তযুগ শেষ হয়ে এসেছে। গুপ্ত যুগের স্বর্ণাভা তার অঙ্গে। যুগটা গুপ্তদের হলেও এলাকাটা রাষ্ট্রকূট রাজাদের। তাদের আগে চালুক্য রাজবংশের। পাহাড়ের ধার কেটে গুহা খনন শুরু হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। দক্ষিণপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করলে দর্শনযোগ্য চৌত্রিশটির মধ্যে ১২টি বৌদ্ধ, ১৭টি ব্রাহ্মণ্য ও ৫টি জৈন।

পাশাপাশি এই যে তিন পর্যায় গুহা এ যেন তিনটি স্বতন্ত্র ধর্মমতের বিচিত্র শিল্পপ্রদর্শনী। কিন্তু কাদের জন্যে? নিকটবর্তী গ্রামিকদের জন্যেই কি? তারা এর কতটুকু বোঝে? তিনটি সম্প্রদায়ই যে একই গ্রামাঞ্চলে পাশাপাশি বাস করত এটাই বা ধরে নেব কী দেখে? যখন বৌদ্ধ বা জৈন বলতে ধারে কাছে কেউ নেই। আছে কয়েক ঘর গরীব ব্রাহ্মণ। যতদূর মনে পড়ে আর কয়েক ঘর অস্পৃশ্য। তবে কি এখানে বিভিন্ন মতের সন্ন্যাসীরা নির্জনবাস করতেন? তাই যদি হয় তবে দুই শতাব্দী ধরে গুহা খনন, মন্দির নির্মাণ, মূর্তি খোদাই, চিত্রাঙ্কন ও কারুকার্য কেন?. ধর্মসাধনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী? তা হলে কি লক্ষ্য ছিল বহুদূর থেকে জনগণকে আকর্ষণ করা? আসত ওরা দর্শন করতে, শিক্ষালাভ করতে, আনন্দ পেতে? প্রণামী দিতে? যাতে ওই সন্ন্যাসীদের আহার্য ও পরিধেয় জুটত।

আর এক কারণ এই হতে পারে যে পর্বতের মতো চিরন্তন অন্য কিছু নয়। অশোকও তো বেছে বেছে পাহাড়ে পর্বতে উৎকীর্ণ করেছিলেন তাঁর শিলালিপি। কেই বা যেত সেখানে সেসব পাঠ করতে? পাঠ করার মতো অক্ষরজ্ঞান ছিল ক'জনের? তাঁর নীতি ও নির্দেশ অক্ষয় হবে এই বোধহয় ছিল তাঁর ধারণা ও প্রেরণা। লোকে হয়তো পড়েনি, হয়তো দেখেও নি। তবু মহাকাল সযত্নে সংরক্ষণ করেছে। এই হলো শিলার গুণ। অশোকের যুগে মন্দির নির্মাণের রীতি ছিল না। না জৈনদের মধ্যে, না বৌদ্ধদের মধ্যে না ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের মধ্যে। শিবলিঙ্গ অবশ্য অতি প্রাচীনকাল

থেকেই ছিল। সেটা হলো প্রতীক। শিবের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। বুদ্ধের সঙ্গে সাদৃশ্য বৌদ্ধধর্মের আদি পর্বে নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধের স্থানে বোধিবৃক্ষকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হতো। স্তূপও একপ্রকার প্রতীক। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাও সম্ভবত বৌদ্ধদের প্রতীকরূপে কল্পিত। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সঙ্গে জগন্নাথের কোনো সাদৃশ্য নাই। নামটাও জৈনদের মতো। ইতিহাসে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের কীর্তিকে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত করেছে এর নিদর্শন খ্রীস্টানদের রোমে ও মুসলমানদের কনস্টান্টিনোপলে আছে। ভারতেও কী হিন্দু কী মুসলমান কেউ এর থেকে মুক্ত নয়। এমনি করেই বুদ্ধ পরিণত হন বিষ্ণুর অবতারে। যেমন অক্টারলোনি পরিণত হয়েছেন শহীদে। আর মনুমেণ্ট পরিণত হয়েছে মিনারে। বৌদ্ধরা যদি জিতে যেত তারাও হয়তো দাবী করত যে কৃষ্ণ একজন বোধিসত্ত্ব ও রাধা তাঁর পারমিতা। তবে এই বৌদ্ধ গুহাগুলি যে বৈষ্ণব বা শৈব গুহায় পরিণত হয়নি এর কারণ বোধহয় এগুলি বহুশতাব্দীকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। তেমনি ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি যে কালাপাহাড়দের দ্বারা ধ্বংস হয়নি তারও বোধহয় সেই কারণ। যাই হোক এই যে সহ-অবস্থান এটা অন্যত্র বিরল বলেই এত মূল্যবান।

অন্য এক পাহাড়ের একপাশ কেটে অজণ্টার দর্শনযোগ্য ত্রিশটি গুহাও খনন করা হয় খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী অবধি। এই নয় শতাব্দীকাল জুড়ে একমাত্র বৌদ্ধরাই তাদের শিল্পমেলা বসায়। জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সহ-অবস্থানের নিদর্শন মেলে না। অজণ্টা কেবল ভারতে অদ্বিতীয় নয়, বৌদ্ধ জগতেও অদ্বিতীয়! এর আদল মেলে জাপানের হোরয়ুজীতে। প্রায় বিশ বছর বাদে জাপানে গিয়ে অভিভূত হই। এদেশের শিল্পীরা যে ওদেশের শিল্পকেও প্রেরণা দিয়েছিলেন এটা হাতে কলমে প্রমাণিত হয়। এঁরা কি কেবল অজণ্টাতেই স্বাক্ষর রেখে যান? আর কোথাও নয়? নিশ্চয়ই ভারতের অন্যান্য স্থানেও অজণ্টার অনুরূপ ছিল। ভাগ্যক্রমে অজণ্টাই রক্ষা পেয়েছে। সেটা তার দুর্গম অবস্থানের কল্যাণে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত না হলে আমরা কেউ জানতেও পেতুম না তার অস্তিত্বের কথা। অথচ ঐতিহাসিক উত্তর দক্ষিণ বাণিজ্যপথের অদূরবর্তী নয় অজণ্টা নামক গ্রাম। না, গ্রামবাসীরাও গভীর অরণ্যের ভিতরে যেত না। মৌমাছিতে তাড়া না করলে একজন ইউরোপীয় সৈনিকও যেতেন না। আলো বাতাসের ছোঁওয়া লাগেনি বলে গুহাচিত্রগুলি সঙ্গোপনে সুরক্ষিত ছিল। এখন তো দিন দিন নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বা ঝরে পড়ছে। তাদের সংরক্ষণ করাই এখন সমস্যা।

শীতের দুপুর। তবু গুহার ভিতরে ঘোর অন্ধকার। কিছু খরচ করলে ইলেকট্রিক ল্যাম্প ভাড়া পাওয়া যায়। সেটা হাতে করে নিয়ে যায় একটি পিয়ন। তারই আলোয় দেয়ালে ও সীলিংএ ঝলসে ওঠে নানা রঙের ছবি। একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়াই সার। নয়তো খরচ বাড়ে। একজন মার্কিন সহযাত্রী আমাদের সহভাগী না হলে খরচও পড়ে যেত অনেক। এখন কী ব্যবস্থা হয়েছে জানিনে। তখন তো এই ছিল ব্যবস্থা। এইসব অসূর্য্যম্পশ্যা গুহার অভ্যন্তরে মুরাল চিত্র অঙ্কন সহজ ছিল না নিশ্চয়। কিসের আলোয় আঁকিয়েরা আঁকতেন? দেখিয়েরা দেখতেন? দর্শক না থাকলে অঙ্কনের সার্থকতা কী? কার জন্যে এত কিছু আঁকা? গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের আত্মতৃপ্তির জন্যে? নয় শতক ধরে রামায়ণ মহাভারতের মতো বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলিও ছিল সেকালের জনসাধারণের আনন্দের তথা শিক্ষার আধার। লোকশিক্ষা তথা লোকরঞ্জনের জন্যেই সেগুলির সৃষ্টি। সুতরাং যেখানেই বৌদ্ধ শিল্প সেখানেই জাতকের গল্প।

দেওয়াল জুড়ে গল্পের পর গল্প বলা হয়েছে। সীলিং জুড়েও তাই। এসব কাহিনীর অল্পই আমাদের জানা ছিল। গাইডবুক দেখে যতটা পারি বুঝি। পরবর্তীকালে আমি জাতক পড়েছি ও তার অনুরক্ত হয়েছি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও দ্বিতীয়বার অজণ্টা যাত্রা হয়ে ওঠেনি। একটি অতি

মনোহর যুগকে সচিত্র করা হয়েছে, ধরে রাখা হয়েছে ওখানে। নরনারী পশুপাখী তরুলতা ফুলফল বসনভূষণ সকলই সুন্দর, সমস্তই জীবন্ত। এ ছাড়া দেবদেবী যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ভূতপ্রেত পিশাচ। সমসাময়িক জনমানসের কল্পলোক। হিন্দু কোথায় শেষ হয়েছে, বৌদ্ধ কোথায় শুরু হয়েছে বলা কঠিন। তবে ছিল একটা ভেদরেখা। বৌদ্ধরা দেবতার চেয়ে মানুষকেই বড়ো করে দেখত। অন্ততঃ একজন মানুষকে বড়ো করে দেখত। তিনি বুদ্ধ। কোন দেবতার অবতার নন তিনি। নিজেও দেবতা নন। 'বুদ্ধদেব' এ কথাটি বৌদ্ধদের মুখে শোনা যায় না। এতে বুদ্ধত্বের গৌরব হানি হয়, দেবত্বের গৌরব বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধ হয়েছেন যে মানব তিনি সব দেবতার ঊর্ধ্বে। মানুষ একদিন দেবতা হবে একথা যারা বলে তারা বৌদ্ধ নয়, তারা হিন্দু। মানুষ একদিন দেবতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধ হবে একথা যারা বলে তারাই বৌদ্ধ। অমরত্বকে বৌদ্ধরা মহামূল্য মনে করে না। তার চেয়ে মূল্যবান নির্বাণ। দেবতাদের মাহাত্ম্য তো এইখানে যে তাঁরা অমর।

হিন্দুরা যখন গুণমুগ্ধ হয় তখন বলে, 'মানুষ তো নন, দেবতা।' বৌদ্ধরা যখন গুণমুগ্ধ হয় তখন বলে, 'মানুষ তো নন, বোধিসত্ত্ব।' অর্থাৎ বুদ্ধ হতে চলেছেন, বুদ্ধ হবেন। বলা বাহুল্য হিন্দু বলতে প্রচলিত অর্থে বুঝেছি। আগেকার দিনে দেশশুদ্ধ লোক ছিল দেশ সুবাদে হিন্দু। তার মানে ভারতীয়। মুসলমান আগমনের পর ধর্মগত বিভেদের উপর জোর দেওয়া হয়। তার আগে থেকেই বৌদ্ধরা মহাপ্রস্থানের পথে। রাজ্যহারা সঙ্ঘহারা বিহারহারা হয়ে তাঁরা দেশান্তরী হন। তাঁদের মধ্যে গৃহী যাঁরা তাঁরা কোনোকালেই জাত ছাড়েননি, শুধু ধর্মই ছেড়েছিলেন। যে যার জাতব্যবসা করতেন। জাত ছেড়েছিলেন শুধু সন্ন্যাসীরাই। সন্ন্যাসীদের বিদায়ের পর গৃহীরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যজমান ও বৈষ্ণব গুরুর বা শৈব গুরুর শিষ্য হয়। ইতিমধ্যে আরো একদল সন্ন্যাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন, এঁরা শঙ্করাচার্যের অনুগামী। বৌদ্ধদের এঁরা তর্কদ্বন্দ্বে হারিয়ে দেন। রাজশক্তি এঁদের সহায় হয়। নিজেদের মধ্যে অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের সংহতি হারিয়েছিল। সংহতিই তাদের শক্তির উৎস। সংহতির অভাব না হলে তারাও জৈনদের মতো থেকে যেত। জৈনরা কেউ হিন্দু হলো না, অথচ বৌদ্ধরা সবাই হিন্দু হয়ে গেল, নয়তো পালিয়ে গেল, এর একাধিক কারণ। কিন্তু এটা কখনো একটা কারণ হতে পারে না যে বৌদ্ধ ধর্মটাই হিন্দুধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। জাপানে বা সিংহলে গেলে বুঝতে পারা যায় ভেদ অতি স্পষ্ট। আড়াই হাজার বছরেও ভেদরেখার বিলোপ হয়নি। ইহুদীধর্ম খ্রীস্টধর্মের মতো।

অজন্টার শ্রেষ্ঠ চিত্র বোধ হয় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির। করুণার প্রতিমূর্তি। জাপানীরা বলে করুণার দেবী। সে দেশে ইনি পুরুষ নন, নারী। আসলে বোধিসত্ত্বরা ছিলেন এঞ্জেলদের মতো সেক্সলেস। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না বলে পুরুষ কিংবা নারীরূপে কল্পনা করে। বুদ্ধ আর অবলোকিতেশ্বর মহাযান শাখার চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে আর সকলের উপরে। তার পরেই বোধ হয় প্রজ্ঞাপারমিতা। বোধি, করুণা ও প্রজ্ঞা শিল্পীরা চেয়েছে মানুষের মুখে চোখে হাতে ও ভঙ্গীতে ফোটাতে। অজন্টায় অবশ্য আমি প্রজ্ঞাপারমিতার সাক্ষাৎ পাইনি। দেখেছি হল্যাণ্ডের একটি যাদুঘরে। জাভায় নির্মিত মূর্তি। বৌদ্ধ শিল্প ভারতে নিবদ্ধ ছিল না। হিন্দু শিল্পও ভারতের সীমানা ছাড়িয়েছিল। হিন্দু ঘরে ফিরে এল। বৌদ্ধ ফিরল না। ভারতে তার স্থান নিল মুসলিম।

অজন্টার চেয়ে প্রাচীন, অজন্টার চেয়ে সুন্দর, অজন্টার চেয়ে মানবিক আর কিছু আমি পরে দেখতে পাব বলে আশা করিনি দক্ষিণে বা সিংহলে। অজন্টাই আমার এবারকার ভ্রমণের শীর্ষবিন্দু। শাস্ত্রে বলে ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। আমি বলব শিল্পস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। শিল্পী বলে আমরা যারা পরিচয় দিই তাদের উচিত অজন্টায় গিয়ে কয়েক মাস থাকা ও দিনের পর দিন গুহায় গিয়ে দেখা। ভাগ্যবান তাঁরাই যাঁদের জীবনে সেটা সম্ভব হয়েছে। ধর্মের প্রেরণা পেয়েছে অথচ

সেকুলার, লোকের জন্যে অভিপ্রেত অথচ ক্লাসিকাল, অতিপ্রাকৃতকে বর্জন করেনি অথচ মানবিক, নীতিবোধ প্রখর অথচ রসবোধ অতি সূক্ষ্ম, প্রত্যেক চিত্র মৌন অথচ প্রত্যেকটি চরিত্র মুখর—অজণ্টার শিল্পীদের কাছে কত কী শেখবার আছে। কিন্তু সময় যে নেই। সময় যে নেই। আমি সরকারী কর্মচারী। আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। তার উপর আমি সপরিবারে ভ্রমণে বেরিয়েছি। হোটেলে বাচ্চারা কী করছে কে জানে! সন্ধ্যার আগেই ফেরা চাই। পথ বড়ো কম নয়। উপরন্তু নির্জন।

আশ্চর্যের কথা, ফিরতি ট্রেনে আলাপ হয়ে গেল আমাদের সহযাত্রিণী কুমারী রাইহানা তৈয়বজীর সঙ্গে। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বই হয় আলাপের সূত্র। বড়োদায় তাঁর বাড়ী। আমাদেরও বড়োদা যাওয়া স্থির। বললেন তাঁর ওখানে একদিন যেতে। বম্বেতে পৃথ্বীশচন্দ্র দাশগুপ্তের ওখানে বিশ্রাম করে আবার ট্রেনে উঠি। বড়োদায় সর সুবা মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের জন্যে স্টেট গেস্ট হাউসের একটি অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের করা হয় স্টেট গেস্ট। বড়োদায় দেখবার মতো যা ছিল তা একদিনেই কাবার। তা হলে থাকি কেন? থাকি গুজরাটীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গুজরাটকে ওইখান থেকে চেনবার জন্যে। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক রমণলাল দেশাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তার বিষয় গুজরাটী সাহিত্য। কুমারী রাইহানা তৈয়বজী ইংরাজীতে একখানি বই লিখেছিলেন, 'একটি গোপীর হৃদয়।' বাইরে মুসলমান, অন্তরে বৈষ্ণবী। বিখ্যাত তৈয়বজী পরিবারের কন্যা, বড়োদার সম্ভ্রান্ত নাগরিক। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, নিষ্কাম ও নিষ্কিঞ্চন।

আমার এইবারকার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেবল দেশ দেখা নয়, মানুষ চেনা। একজন সমজদার মানুষ ছিলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। অকস্‌ফোর্ড না কেম্ব্রিজের কৃতী ছাত্র। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়ে বড়োদার রাজকার্যে যোগ দেন। ছেলেবেলায় 'মডার্ন রিভিউ'তে তাঁর অনুবাদকর্ম দেখেছি। স্বভাবটা সাহিত্যরসিকের, সেটা তাঁর লাইব্রেরী থেকেও বোঝা যায়। বড়োদা রাজ্যের সেনসাস রিপোর্ট তাঁরই রচনাসৌষ্ঠবের নিদর্শন। সাহিত্যের লোক পথ ভুলে প্রশাসনে জড়িয়ে পড়েছেন, কিন্তু পড়াশুনা করেন। তাঁর স্ত্রী অরুণা দেবী আসামের সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কন্যা। তাঁর শাশুড়ী স্বনামধন্যা সুলেখিকা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে। মহর্ষির নাতনি। তাঁর আমিষ ও নিরামিষ ও মিষ্টান্ন আহারের বই ছিল বিদেশের মিসেস বীটনের মতো এদেশের প্রামাণিক রন্ধনগ্রন্থ। এঁদের সঙ্গেও আলাপ হয়। আমরাও বার বার আমিষ ও নিরামিষ ও মিষ্টান্ন ভোজনের শরিক হই। তবে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে নয়। তিনি তখন সদ্যবিধবা।

বড়োদার চিত্রকলার অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয়। তাঁর নাম ভুলে গেছি। তেমনি ভুলে গেছি বড়োদার সংস্কৃত গ্রন্থমালার সম্পাদক এক বিশেষজ্ঞ বাঙালীর নাম। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য কি?

এঁদের কর্মস্থলে গিয়ে এঁদের সঙ্গে আলাপ করি। সংগ্রহ দেখি। মনে পড়ে রাগমালার ছবি। মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোবাড় তখনো জীবিত, কিন্তু প্রায়ই বিদেশে বাস করতেন। সেটা বোধ হয় ইংরেজ রেসিডেণ্টের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে। দেওয়ান ছিলেন ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী। রাজকর্মপ্রবীণ। স্বাধীনতার পরে যাঁকে দিল্লীর প্ল্যানিং কমিশনে নেওয়া হয়। ভদ্রতার খাতিরে তাঁর সঙ্গেও একবার সাক্ষাৎ করে আসি। কিন্তু রেসিডেন্সীর ছায়া মাড়াইনে। দেশীয় রাজ্যে রেসিডেণ্টই প্যারামাউন্ট পাওয়ারের প্রতিভূ। সুতরাং এপক্ষের লোককে ওপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে দেখলে বন্ধুরা বিব্রত হতেন। দেশীয় রাজ্যে চক্রের ভিতর চক্র। মিস্টার মুখার্জির মত না নিয়ে আমি

একটি পদক্ষেপও নিইনে।

মুখার্জিরা একদিন আমাদের বড়োদা ক্লাবে নিয়ে যান। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল ইংরেজী বর্ষশেষের রাত্রি। দারুণ শীত। অপেক্ষা করতে হলো যতক্ষণ না রাত বারোটা বাজে। বর্ষারম্ভ আমরা প্রথাসিদ্ধ স্ফূর্তির সঙ্গে করি। তখন কি জানতুম যে সেটা আনহ্যাপি নিউ ইয়ার? নিয়ে আসবে শোক?

আবার বম্বে। বম্বে যেন আমাদের ছাড়তে চায় না। আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি তাকে ছাড়ি। বাঙ্গালোর অভিমুখে যাত্রা করি। পথে পড়ে ধারওয়ার। সেখানে ট্রেন বদলের ফাঁকে এক বাঙালী ভদ্রলোকের পরিবারে দিনযাপন করি। নাম ভুলে গেছি। অতিশয় সজ্জন। রেল কর্মচারী। ধারওয়ার রাঙা মাটির দেশ। এইটুকু তার সম্বন্ধে আমার মনে আছে। সন্ধ্যাবেলা ট্রেনে উঠে বসি। ভোরবেলা বাঙ্গালোর।

সেখানে যাঁর অতিথি হই তিনি আমকো ব্যাটারির অরবিন্দ বসু। তাঁর স্ত্রী জার্মান বংশীয়া। কিন্তু তাঁদের চালচলন শুদ্ধ ভারতীয়। বম্বের শীতকালটা ছিল দিব্যি গরম। আর বড়োদারটা তেমনি ঠাণ্ডা। বাঙ্গালোর নাতিশীতোষ্ণ। বারো মাসই নাকি না ঠাণ্ডা না গরম। সেইজন্যে স্বদেশের ও বিদেশের বিস্তর ভদ্রলোক দেখি অবসর নিয়ে এখানে সপরিবারে বসবাস করছেন। জায়গাটা কেবল স্বাস্থ্যকর নয়, সস্তা। মহারাজা তো রাজর্ষি। আর তাঁর দেওয়ান সার মির্জা ইসমাইল তাঁরই মতো উদারমনা। দেশীয় রাজ্য হলেও মৈশুর ব্রিটিশ ভারতের কোনো কোনো প্রদেশের চেয়েও সুশাসিত। তখন থেকেই মৈশুর রাজসরকারের পলিসি শিল্পবিস্তার। সেইজন্যেই নানা দেশ ও প্রদেশ থেকে উৎসাহ পেয়ে হাজির হয়েছেন শিল্পপতি ও প্রযুক্তিবিশারদ গোষ্ঠী। ব্রিটিশ ভারতেও এতখানি উৎসাহ কেউ তাঁদের দেয়নি। স্থানীয় লোকও বন্ধুভাবাপন্ন। তারাও তো সমৃদ্ধির ভাগ পাচ্ছে। মৈশুর দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যে জিনিসটি আমি চেয়েছিলুম সেটি পেলুম না। সাহিত্যিক সঙ্গ। কন্নড় সাহিত্যের খবর। কন্নড়ভাষীরা সে সময় চতুর্ধা। বিভক্ত কতক বম্বেতে, কতক মাদ্রাজে কতক হায়দরাবাদে, কতক মৈশুরে। সেই যে ধারওয়ার সেটা বম্বে প্রেসিডেন্সীর অঙ্গ। তেমনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অঙ্গ মাঙ্গালোর। তেমনি হায়দরাবাদের অন্তর্গত গুলবর্গা। কন্নড় সাহিত্যকে তাই ধরতে ছুঁতে পারিনে। দেশীয় রাজারা সদয় হলে কী হবে, তাঁদের প্রজারা স্বাধীন ভাবে লিখতে সাহস পায় না। সাহস যাদের আছে তারা ব্রিটিশ প্রজা। তখনকার দিনে এই ছিল বাস্তব চিত্র। স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে না পারলে সাহিত্যের বিকাশ হয় না। এই সেদিন এক কন্নড় লেখক এসেছিলেন দেখা করতে। বললেন কন্নড় সাহিত্যের রেনেসাঁস হয় বিংশ শতাব্দীতেই। বাঙালীদের পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার। ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বঙ্গ না থাকলে বাংলা সাহিত্যের হয়তো অনুরূপ দশাই হতো। তবে সম্প্রতি কন্নড় সাহিত্য অনুকূল পরিবেশ পেয়ে দ্রুত উন্নতি করছে।

অরবিন্দ বসুও একজন বিপ্লবী ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে তার মোহ ভঙ্গ হয়।

তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ভারতকে থাকতে হবে তার আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠায় অটল। তা বলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির চোরাবালিতে নয়। তিনি রমণ মহর্ষির শিষ্য। রাইহানাবেন আমাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন রমণ মহর্ষিকে দেখতে যেতে। অরবিন্দ বসুরও সেই অভিমত। তিনি মহর্ষির সম্বন্ধে অনেক চমৎকার কথা বলেন। মহর্ষি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও অব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করতেন। আর তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যরা করতেন অপর পঙ্‌ক্তিতে বসে। মহর্ষির ওটা একক প্রতিবাদ। স্বভাবত তিনি স্বল্পভাষী বা মৌন। কথা বলতে বলতে অন্তরে ডুব দিতেন। তখন তিনি কোন্ অতলে! তাঁর সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কি উক্তি দিয়ে প্রকাশ করা যায়! সঙ্গীদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। অরবিন্দ বসুর মুখ দেখে বোঝা যেত তিনি সত্যি কিছু পেয়েছেন। গভীর শান্তি।

বাঙ্গালোর থেকে মোটরে করে একদিন মৈশুর শহর ঘুরে আসি। উচ্চভূমির উপর অবস্থিত

সুদৃশ্য নগর। অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডী। মহিষাসুরমর্দিনী। মহিষাসুর থেকেই নাকি মহিসুর বা মৈশুর। মহিষাসুরও তাহলে তারানাম রেখে গেছে। কারো সঙ্গে আলাপের সুযোগ বা সময় হলো না। কারণ সেইদিনই বাঙ্গালোরে ফিরতে হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিতে হয়। পথে পড়ে বৃন্দাবন উপবন। তৎকালীন মহারাজার রমণীয় কীর্তি। উপবনটি আলোকমালায় সজ্জিত হলে নন্দনবনের মতো দেখায়। দূর থেকেই চোখ বুলিয়ে নিই।

মৈশুরের পথে পড়ে হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের রাজধানী। সেরিঙ্গাপটম বা শ্রীরঙ্গপত্তনম্। দেবতার নামেই নামকরণ। নদীবেষ্টিত একটি দুর্গের ভিতরেই মন্দিরনগর। দুর্গের ও নগরের এখন ভগ্নদশা। দুই সুলতানের কবর আর মসজিদ ইত্যাদিও সাক্ষ্য দেয় মুসলিম অধিকারের। হায়দার আলীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পূর্ণায়া নামক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। যেমন রণজিৎ সিংহের প্রধানমন্ত্রী আজীজউদ্দীন নামক বিচক্ষণ মুসলমান। দেশীয় রাজ্যের ঐতিহ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক। রাজা বা নবাবরা যে যার ধর্মে পরমবিশ্বাসী হলেও প্রজাদের ধর্মে আঘাত করতে চাইতেন না। করলে মিত্র হারাতেন, শত্রু বাড়াতেন। ওটা রাজনীতি নয়। হিন্দুরাজবংশের উপাধির তালিকায় মুসলিম উপাধিও থাকত। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজা কোনোকালেই বাদশার অধীন ছিলেন না, অথচ তাঁর উপাধির মধ্যে ছিল সুলতান ও শমসেরজঙ্গ। শমসের জং বাহাদুর তো নেপালের রাণাদেরও পদবী। কোনোকালেই তাঁরা বাদশাহী আনুগত্য স্বীকার করেননি। তেমনি কোনো কোনো হিন্দু রাজবংশে শাহাজাদা উপাধিও লক্ষ করেছি। তেমনি মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে রাজা, রাণা ও রাও উপাধি। ঠাকুর তো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষণীয়। খান্‌ও তাই। ঠাকুরটা যতদূর জানি তুর্কী, খান্‌টা মঙ্গোলীয় আর শাহ্‌টা পারসিক। শাহ্ ও খান্ ইসলামপূর্ব পারসিক ও মঙ্গোলীয় ইতিহাসে মেলে। হিন্দু মুসলমান অভিজাত শ্রেণী ধর্মে পৃথক হলেও স্বার্থে এক ছিল। রাজা বা নবাব যিনিই হোন, তাঁর পেছনে হিন্দু মুসলিম সামন্ত শ্রেণী। তবে রাজার বা নবাবের ধর্মই ছিল পয়লা নম্বর ধর্ম। সেক্ষেত্রে মেজরিটি মাইনরিটি অবান্তর। জার্মান ইতিহাসে যেমন রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম ভারতের ইতিহাসে তেমন নয়।

বৈদিক আর্যদের অসহিষ্ণুতাকে বহুপরিমাণে সংযত করেছিল বৌদ্ধ ও জৈন মানবিকতা। তেমনি তুর্কী ও মোগলদের অসহিষ্ণুতাকে বৈষ্ণব ও শৈব মানবিকতা। দক্ষিণ ভারতে এই চারটি সম্প্রদায়ই মানবিকতার ঐতিহ্যে অভিষিক্ত। তাই ধর্ম নিয়ে দাঙ্গা দক্ষিণের মাটিতে বাধে না। দক্ষিণের সমস্যা ধর্মগত নয়, বর্ণগত ও জাতিগত। জাতি বলতে বুঝতে হবে রেস। এটি আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকা। উত্তরভারতের মানুষ অত বেশী বর্ণসচেতন ও রেসসচেতন নয়। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ গোড়ায় ছিল আর্য দ্রাবিড় ও গোরা কালা। এই হাজার বছরের মেলামেশা হয়েছে, কিন্তু মিশে যাওয়া হয়নি। দাঙ্গা এরা করবে না, কিন্তু অশান্তিকে অন্য আকার দেবে।

মৈশুর রাজ্য জৈন ভাস্কর্যের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু সময় যে নেই, সময় যে নেই। দিন কয়েক পরে আমরা রাতের ট্রেনে মাদ্রাজ রওনা হই। সকালে উঠে দেখি মাদ্রাজ। এটা ইংরেজদের হাতে গড়া। এমন বিজাতীয় নাম আর কোনো শহরের নয়। একটা স্থানীয় নাম ছিল এর। চেন্নাই বা চেন্নাইপত্তনম্। মাদ্রাজ শহর থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী। তার থেকে মাদ্রাজী বা মান্দ্রাজী। বাইরের লোক যাদের মাদ্রাজী বলে তাদের কেউ বা তামিল, কেউ বা তেলুগু, কেউ বা কন্নড়, কেউ বা মালয়ালী। যখনকার কথা লিখছি তখন এটা তেমন স্পষ্ট ছিল না। এখন তো ভাষা অনুসারে রাজ্য হয়েছে। কিন্তু তখনো লক্ষ করেছি ভাষা অনুসারে প্রেসিডেন্সী ভাগ হলে মাদ্রাজ শহরটা কাদের ভাগে পড়া উচিত এই নিয়ে তীব্র মতভেদ। তামিল ও তেলুগুভাষীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। মধ্যিখানে একটা ছোট্ট নদী। এপারটা তামিলপ্রধান, ওপারটা তেলুগুপ্রধান। তাহলে কি শহর ভাগাভাগি হবে? কিন্তু তামিলদের তাতে আপত্তি। যে কারণে বম্বের বেলা মরাঠাদের আপত্তি। পরে এর সমাধান হলো মাদ্রাজটা তামিলদের রাজ্যের ও হায়দরাবাদটা তেলুগুদের রাজ্যের

রাজধানী হবে। কিন্তু হায়দরাবাদ নিয়ে এরই মধ্যে বিবাদ বেধে গেছে। হায়দরাবাদ মুলুকের তেলুগুতে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তেলুগুতে। একই ধর্ম, একই ভাষা, কিন্তু দুই অঞ্চল। যখনকার কথা বলছি তখন কেউ হায়দরাবাদ পাবার স্বপ্নও দেখত না। দেশীয় রাজ্যের বিলোপ ছিল অকল্পনীয়। প্রজারা শুধু চেয়েছিল রাজারা গণতান্ত্রিক সংবিধান মেনে নিন। বাঁচুন আর বাঁচতে দিন। তাঁরা যদি দেয়ালের লিখন পড়তে জানতেন!

মাদ্রাজে আমরা অমূল্য গুপ্তর অতিথি হই। রেলওয়ে অফিসার। করিৎকর্মা ব্যক্তি। আমাদের ঘুরিয়ে দেখান। সমুদ্রের কূলে হাইকোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ সৌধ। পাশ্চাত্য রীতির। অবশ্য দ্রষ্টব্য একটি অ্যাকোয়ারিয়াম। সেই জলাধারে কত রকম মাছ যে আছে? আর কী সুন্দর। বেশীর ভাগই সমুদ্রের।

থিয়সফিকাল সোসাইটির বিশ্বকেন্দ্র আডিয়ার মাদ্রাজের একপ্রান্তে। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। অ্যানী বেসান্টের দেহান্তের পরে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। একদল আলাদা হয়ে যান ও তাঁদের ইউনাইটেড লজের সদর হয় বম্বে। মিসেস বেসান্টের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অন্তরীণ করা হয়েছিল যে দু'জনকে তাঁদের একজন ছিলেন ওয়াডিয়া ও অপরজন এরাণ্ডেল। বম্বের ভার নেন ওয়াডিয়া। তিনিও তাঁর বন্ধুজন মিলে যে 'আর্যসঙ্ঘ' স্থাপন করেন আমরা থাকি তারই গেস্ট হাউসে। আর এরাণ্ডেল ও তাঁর পত্নী তথা অন্যান্য অনেকের কর্ম পরিচালিত হয় আডিয়ার থেকে। আমরা আগে থেকে চিঠি লিখে বা খবর দিয়ে যাইনি, তাই কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। শুধু স্থান পরিক্রমা করি। আশ্রমের উপযুক্ত পরিবেশ। এইখানেই জনাকয়েক ইউরোপীয় ও ভারতীয় মিলে কংগ্রেসের কল্পনা করেন। ধর্ম আর সমাজ আর শিক্ষা আর রাজনীতি আর সাংবাদিকতা সমস্তই ছিল এর কর্মসূচির অঙ্গ। পরে রুক্মিণী দেবী এরাণ্ডেলের উদ্যোগে কলাক্ষেত্র সংযুক্ত হয়। কিন্তু রাজনীতি হয় পরিত্যক্ত। দলাদলির ফলে ধর্মেরও আর সে প্রভাব থাকে না। ওঁদের ধর্ম অবশ্য সর্বধর্ম সমন্বয়। কার্যত হিন্দু বৌদ্ধের অংশটাই বেশী। থিয়সফিকাল সোসাইটি মাদ্রাজকে যে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দেয় তা অভূতপূর্ব। তেমনি অ্যানী বেসান্ট দেন নিখিল ভারতীয় গুরুত্ব।

একদিন আমরা তেরো শতাব্দী পেছিয়ে গিয়ে মামল্লপুরম্ দেখে আসি। মাদ্রাজ হবার হাজার বছর আগে মামল্লপুরম্ বা মহাবলীপুরম্ ছিল সমুদ্রপথে যাতায়াতের বন্দর। বাণিজ্য চলত এদিকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ওদিকে ইউরোপের সঙ্গে। ওই রকম আরো কয়েকটি বন্দর ছিল পূর্ব পশ্চিম উভয় উপকূলে। আরব শক্তি ভারত মহাসাগরে প্রবল হবার আগে ভারতীয় শক্তিই ভারত মহাসাগরে প্রবল ছিল। ইণ্ডিয়া বলতে বোঝাত কাবুল থেকে বালী দ্বীপ অবধি ভূখণ্ড। সেই সুপ্রশস্ত যুগ পরে অপ্রশস্ত হয়। সংকীর্ণ হিন্দু দৃষ্টিতেই সব কিছু দেখার অভ্যাস জন্মায়। শৈলখাত প্যাগোডার নাম পাণ্ডব রথ কেন হবে তার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা নেই। পাথরে তৈরী সাতটি শোর টেম্পলের ছ'টিকে সমুদ্রে গ্রাস করেছে। বাকী একটিতে বিগ্রহ নেই। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা গঙ্গাবতরণ, অর্জুনের তপস্যা প্রভৃতি দৃশ্য কালজয়ী হয়েছে। অপূর্ব কারুকার্য। হাতী, সাপ প্রভৃতি প্রাণীর ছড়াছড়ি। অদ্ভুত প্রাণবন্ত। পল্লব রাজবংশ অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।

দক্ষিণ ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে আমরা ফরাসী জাহাজ ধরে মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যাই। কলম্বো থেকে রেলপথে ফিরব ও দেখতে দেখতে আসব এই ছিল সংকল্প। সঙ্গীত নাট্য ইত্যাদি হাতে রেখে দিই। চেনাশোনাও ধীরে সুস্থে হবে। ওসব অপেক্ষা করতে পারে, জাহাজ তো সবুর করবে না। সমুদ্রযাত্রার এই দ্বিতীয় সুযোগ আমার জীবনে।

সিংহলে

অলৌকিক ঘটনা এখনো ঘটে। সেদিন একখানা উপহার পাওয়া বইয়ের পাতা উল্টাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করি আমার নিজের একটি অসমাপ্ত রচনার একপৃষ্ঠা গোঁজা রয়েছে। কবে যে এটি লিখতে শুরু করেছিলুম কিছুতেই মনে আনতে পারছিনে। তবে ভিতরের রেফারেন্স থেকে অনুমান হয় দশ বছর আগে। নাম দিয়েছিলুম সিংহলের স্মৃতি।

এখন এই অসমাপ্ত রচনাটিকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারছিনে। অলৌকিক ঘটনা যেন এই কথাই মনে করিয়ে দিতে এসেছে যে, আরম্ভ যে কাজ করবে তার সমাপ্তির দায়ও তোমার। যদি সাধ্যে কুলোয়! দুঃখের বিষয় সিংহল ভ্রমণের পর একত্রিশ বছরে আমার স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছে। যা লেখা উচিত ছিল ত্রিশ বছর আগে, যার একপৃষ্ঠা লেখা হয়েছে দশ বছর আগে, তা শেষ করতে চাইলেই স্মৃতি সহজে সাড়া দেয় না। এই আমার গৌরচন্দ্রিকা।

ছিন্ন পৃষ্ঠাটি যেমনকে তেমন রাখছি। সিংহল ভ্রমণের পরেও আমি আরো একবার ভারতের বাইরে গেছি। জার্মানীতে, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে। সংশোধন এই পর্যন্ত।

॥ সিংহলের স্মৃতি ॥

ভারতের বাইরে যতবার গেছি ততবার গেছি একটা না একটা দ্বীপে। প্রথমবার তো ইংলণ্ডে। তৃতীয়বার জাপানে। দ্বিতীয়বার? সিংহলে।

সিংহলের কথা এতকাল আমি লিখিনি। কেটে গেছে একুশ বছর। লিখতুমও না। লিখতে হঠাৎ ইচ্ছা হলো সে দেশে একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন শুনে। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম আর তাঁর দেশেও প্রথম। ধন্য ধন্য শ্রীমা ভাণ্ডারনায়ক। ধন্য ধন্য শ্রীলঙ্কা পার্টি। সলোমন ভাণ্ডারনায়ক! তোমার আত্মা জয়যুক্ত হয়েছে।

এখন বলি কেমন করে আমি সিংহলে বা শ্রীলঙ্কায় গিয়ে পৌঁছই। 'চেনাশোনা' নাম দিয়ে একখানা ভ্রমণের বই লেখার পরিকল্পনা ছিল, সেটা মাঝপথে থেমে যায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' মাসিক থেকে ত্রৈমাসিক হওয়ায়। কাহিনীটাকে সিংহল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হলে বাঙ্গালোর, মৈশুর ও মাদ্রাজ অতিক্রম করতে হতো। আমার এই বৃত্তান্ত মধ্যপদলোপী। একুশ বছর পরে স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে এসেছে।

মাদ্রাজ থেকে তখনকার দিনে মেসাজেরি মারিতিমের ফরাসী জাহাজ ছাড়ত। সে জাহাজ সিংহল ঘুরে কলম্বোয় থামত। আমরা স্থির করলুম সমুদ্রপথেই সিংহলযাত্রা করব। মাদ্রাজে দিন কয়েক কাটিয়ে মেসাজেরি মারিতিমের জাহাজে উঠে বসলুম। জাহাজটার নাম গেছি ভুলে। তবে বেশ মনে আছে সেটা দুমার উপন্যাস 'থ্রী মাসকেটীয়ার্স'-এর একজনের নাম কিংবা তাদের বন্ধু দার্তাঞা (d'Artagnan)-র নাম। যুদ্ধ তখনো আরম্ভ হয়নি। হতে আট মাস দেরি। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধের ছায়া সেই জাহাজের ভাঁড়ারের উপরে। ফরাসীরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদেরও ভালো খেতে দেয়নি। সম্ভবত সৈনিকদের জন্যে সঞ্চয় করতে। এ ছাড়া সমুদ্রপথের যা আরাম সব পেয়েছি।

॥ কলম্বো ॥

এর দশ বছর আগে সমুদ্রপথে ইউরোপ থেকে ফিরেছি। সমুদ্রের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল। ইউরোপে যেতে পারছিনে যখন তখন সিংহলেই যাওয়া যাক। নয়তো গতানুগতিক রেলপথ কীই বা এমন মন্দ ছিল!

আরো একটা কারণ ছিল। সেটা পণ্ডিচেরীর টান। মাদ্রাজ থেকে কলম্বোর পথে ফরাসী জাহাজ পণ্ডিচেরী ধরে। সে সময় একবার পণ্ডিচেরীতে নেমে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম দর্শন করে আসা যেতে পারে না কি? প্রিয় বন্ধু দিলীপকুমার রায় তখন সেখানে থাকতেন। তাঁকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে জানিয়ে দিয়েছিলুম যে পণ্ডিচেরীতে কিছুক্ষণের জন্যে নামতে ইচ্ছা। ইঙ্গিত ছিল যে তিনি জাহাজ অবধি এসে নিয়ে যেতে পারেন তো বেশ হয়।

জাহাজ যেখানে নোঙর করল সেটা বন্দর থেকে অনেকখানি দূরে! নেমেই যে অমনি কূল পাওয়া যায় তা নয়। নৌকায় করে অশান্ত সাগর অতিক্রম করতে হয়। সেই নৌকাও জাহাজের থেকে এতখানি নিচে যে সিঁড়ি বেয়ে নামা ওঠা কষ্টকর। আমার ভয় করতে লাগল যে আমি পড়ে যাব। দিলীপদার পাত্তাই নেই। একদল অচেনা যাত্রীর সঙ্গে পণ্ডিচেরী গিয়ে ঠিকমতো ফিরে আসতে যদি না পারি তো পরিবারের কী হবে! তার চেয়ে মাথায় রইল পণ্ডিচেরী দর্শন। শ্রীঅরবিন্দ দর্শন তো হবার নয়।

পণ্ডিচেরীর পর আর কোথাও জাহাজ ভেড়েনি। ডেকে বসে চুপচাপ উপকূলের দৃশ্য দেখা গেল। যতদূর দৃষ্টি যায়। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে ক্যাবিনে গিয়ে বার্থে গা মেলে দেওয়া হলো। কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর জেগে উঠে দুলুনি থেকে বুঝতে পারি যে আমি জাহাজে।

সিংহলের তটরেখা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। ভারত কখন একসময় অদৃশ্য হয়ে গেছে। অথচ সিংহলও সুস্পষ্ট নয়। সঙ্গে বাইনোকুলার থাকলে তটশোভার আস্বাদন পাওয়া যেত। সহযাত্রী ও যাত্রিণীদের ভাষা বুঝিনে। ওঁদের কতক ফরাসী, কতক ইন্দোচীনী।

না, আমি বলতে পারব না যে আমি যুদ্ধের আভাস কারো মুখে পেয়েছি। তা হলেও মনে হচ্ছিল ওরা অস্বাভাবিক গম্ভীর। একটা কী জানি কী হয় ভাব ওদের ফুর্তি করতে দিচ্ছিল না। নইলে এমন ফুর্তিবাজ জাত ফরাসীরা! ইন্দোচীনীদের আমি আগে দেখিনি। ওদের তল পাওয়া আমার সাধ্য নয়। বেশ একটা সীরিয়াস ভাব ওদের মুখে। তখন আমি ইন্দোচীন সম্বন্ধে এত কম খবর রাখতুম যে ফরাসীদের সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা ছিন্নপ্রায় মনে হয়নি। তবে এটুকু লক্ষ করি যে ওরা বা ফরাসীরা কেউ কারো সঙ্গে মিশছে না।

বেলা এগারোটা কি বারোটার সময় কলম্বো বন্দরে অবতরণ করি আমরা স্বামী-স্ত্রী, তিন ছেলেমেয়ে, সঙ্গে যথেষ্ট লটবহর। বন্ধুর আত্মীয় ডক্টর ভূপেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন তখন সিংহল সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের ডাইরেক্টর। তিনি স্বয়ং এসেছিলেন আমাদের নিতে।

দাশগুপ্ত মহাশয় আমাদের নিয়ে যান সিনামন গার্ডেনসে তাঁর বাড়ীতে। সিনামন গার্ডেনস বললে যেমন কবিত্বময় শোনায় আসলে তেমন কিছু নয়। দারুচিনির নাম থাকতে পারে, গন্ধও নেই, রূপও নেই সে পাড়ায়। বাগানও চোখে পড়ে না। সম্ভ্রান্ত পল্লী। সম্ভ্রান্ত নাম। কলম্বোর একটি নামকরা অঞ্চল।

বাড়ীতে মিসেস দাশগুপ্ত মহাশয়া আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সাদর অভ্যর্থনা করলেন। বাড়ীর একাংশ ছেড়ে দিলেন। ভোজন যা হলো তা অতি পরিপাটি। জাহাজের অর্ধভোজনের পর ভারতীয় মতে ভোজ রীতিমতো মনে রাখবার মতো। তবে ছোটখাটো জিনিসই মানুষের মনে থাকে একত্রিশ বছর পরে। রান্নাটা নারকেল তেল দিয়ে। সিংহলের ও কেরলের দস্তুর ওই। যেমন মাদ্রাজের দস্তুর তিল তেল। এ ছাড়া মনে আছে মিসেস দাশগুপ্তর হাতে গড়া সবেদার পিঠে। সিংহলীদের প্রিয়।

কথা ছিল দাশগুপ্তদের ওখানে বিশ্রাম করে কোন একটা হোটেলে উঠে যাব। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল হোটেলে আমাদের জন্যে স্থানাভাব। মাসটা জানুয়ারী। কলম্বোর শখের সীজন। চেষ্টা করলে আরো বেশী খরচের হোটেলে ঠাঁই মিলতে পারত, কিন্তু দাশগুপ্তরা সেটা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। আমরা তাঁদের ওখানেই রয়ে গেলুম। তাঁরা দু'জনে আমাদের জন্যে যৎপরোনাস্তি করেন। অতুলনীয় তাঁদের অতিথিচর্যা। অপরিশোধ্য ঋণ।

আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী তখন সেখানে কর্মরত। তাঁদের অন্যতম ডক্টর করুণাদাস গুহ ছিলেন শিল্পবিভাগের ডাইরেক্টর। তখনো তিনি অবিবাহিত। তিনি হলেন গাইড। কলম্বো কথাটি সিংহলী ভাষার নয়। শব্দটি যতদূর জানি ইতালীয় ভাষার। অনুরূপ শব্দ ফরাসী প্রভৃতি লাটিন গোষ্ঠীর ভাষায় আছে। নামটি যতদূর জানি পর্তুগীজদের দেওয়া। বহির্বাণিজ্য প্রথমে পড়ে পর্তুগীজদের হাতে, তারপরে ডাচদের হাতে, তারপরে ইংরেজদের হাতে। বণিকের মানদণ্ড যথারীতি রাজদণ্ডে পরিণত হয়।

শতখানেক বছর আগেও বন্দর হিসাবে কলম্বোর চেয়ে প্রধান ছিল গল্। ইতিমধ্যে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কলম্বো কেবল রাজধানী হিসাবে নয়, বন্দর হিসাবেও সিংহলের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু সংস্কৃতিকেন্দ্র এখনো রয়ে গেছে পূর্বতন রাজধানী কাণ্ডিতে। সেখানে বৌদ্ধদের প্রভাব অপ্রতিহত। দীর্ঘকাল ধরে কাণ্ডির রাজাই ছিলেন সিংহলের রাজা। সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চল পরহস্তগত হলেও পার্বত্য অঞ্চল ছিল রাজন্যশাসিত একপ্রকার স্বাধীন রাষ্ট্র। পরে একসময় রাজার হাত থেকে রাজত্ব কেড়ে নেওয়া হয়।

কলম্বো মিউজিয়ামে সুবর্ণ রাজসিংহাসন, মুকুট, দণ্ড ইত্যাদি রক্ষিত হয়েছে দেখা গেল। সেইসঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও রত্ন। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাসে রাবণ বা রাক্ষসদের কোনো চিহ্ন নেই। সেটা নিতান্তই ভারতীয়দের কল্পনা। কিন্তু লোকনৃত্যে রাক্ষুসে সাজপোশাক, মুখোশ ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। মিউজিয়ামে তার সংগ্রহ লক্ষ করা গেল।

সিংহলীদের সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তারা ভারত থেকেই বসতি করতে আসে। তাদের আগে ছিল বেদ্দা প্রভৃতি আদিবাসী। এখনো রয়েছে। বিজয়সিংহ নামে একজন রাজপুত্র সিংহল বিজয় করেছিলেন এই ঘটনা বা কিংবদন্তী থেকেই সিংহলের ইতিহাস শুরু হয়। কিন্তু জোর করে বলা যায় না তিনি বাংলা থেকে গেছলেন না গুজরাট থেকে। ভারতের ইতিহাসে এর কোনো পোষক প্রমাণ নেই। সিংহলের পুঁথিপত্র যা বলে তার একাধিক অর্থ সম্ভব। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে একবার গুজরাটের পক্ষের যুক্তি শুনিয়েছিলেন ও সে যুক্তি ছিল বাংলার পক্ষের যুক্তির চেয়ে জোরালো।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল ডক্টর করুণাদাস গুহকে তাঁর সিংহলী গুণমুগ্ধরা যে মানপত্র দিয়েছিল তাতে ছিল উভয়ের পূর্বপুরুষ বিজয়সিংহের গৌরবগান। সিংহলীদের মানসে গুজরাট নয়, বাংলাই বিরাজ করছে। যদিও সে আজ আড়াই হাজার বছর পূর্বের কথা। আর বাংলাও যে আজকের বাংলা ছিল তা নয়। বিহারও হয়তো তার সঙ্গে ছিল। বিজয়সিংহ সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতা থাকলেও

অশোকপ্রেরিত মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা আর বৌদ্ধধর্ম প্রচার তো সর্বস্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্য। অনুরাধপুরে এখনো বোধিবৃক্ষের জীবিতাবশেষ আছে। নামটি অনুরাধা থেকে নয়, অনুরাধ থেকে। যেমন বিশাখাপত্তনমের নাম বিশাখা থেকে নয়, বিশাখ থেকে।

দক্ষিণ ভারতের সঙ্গেই সিংহলের নিকটতম সম্পর্ক। কিন্তু সেটা প্রীতির না হয়ে অপ্রীতির সম্পর্ক যুগ যুগ ধরে হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের বিরুদ্ধে সিংহলীদের সংস্কার পুরুষানুক্রমে বিরূপ। সেই জন্যে তারা দক্ষিণ ভারতীয়দের বিদায় করতেই চায়। তার থেকে ধারণা হতে পারে যে ভারতীয়মাত্রেই তাদের বিরাগভাজন। তা নয়। সিংহলীরা বৌদ্ধ, অধিকাংশক্ষেত্রে। উত্তর ভারতের প্রতি তাদের সেই সূত্রে অনুরাগ। তথা বাংলার প্রতিও। সিংহলী ছাত্ররা সুযোগ পেলেই বাংলাদেশে আসে, উত্তর ভারতে যায়, কিন্তু দক্ষিণের সঙ্গে কোনরূপ আত্মীয়তা অনুভব করে না বা করতে চায় না।

বৌদ্ধধর্মের বন্ধন, রক্তের বন্ধন থাকলেও সিংহলীরা ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে বিমুখ। যেমন ইংরেজরা কন্টিনেণ্টাল বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। ভারত ইতিহাসের মুখ্য স্রোতের থেকে দূরে সরে থাকার পরিণাম হয়েছে এই যে সিংহলীরা কায়মনোবাক্যে স্বতন্ত্র। তবে ভারতীয় সংস্কৃতি যে তাদেরও প্রাচীন সংস্কৃতি এটা তাদের অন্তরের স্বীকৃতি পায়। সিংহলীভাষার শতকরা আশিটি শব্দ নাকি সংস্কৃত। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ শাস্ত্রমালাই সিংহলী সংস্কৃতির উৎস।

যে-কোন কারণেই হোক বৌদ্ধধর্ম ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিকেই আশ্রয় করে বেঁচে আছে। নেপাল, সিকিম, ভূটান, চট্টগ্রাম ও বর্মার মতো সিংহলও একটি প্রত্যন্ত প্রদেশ। সংস্কৃতির দিক থেকে এরা ভারতের থেকে অভিন্ন। কিন্তু রাজনীতির দিক থেকে তা নয়। মাঝখানে ব্রিটিশ আমল এদের সব ক'টিকে ভারতের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথেছিল, নতুবা ইউরোপীয় দেশগুলির মতোই এগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন থাকত।

সিংহলে গিয়ে আমরা ভারতের বাইরে গেছি, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির বাইরে নয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে ভালো করে চেনাশোনার দরকার ছিল, কারণ ওরা বহুশতক ধরে ভারত থেকে নির্বাসিত। তার কিছু সুযোগ পাওয়া গেল, কিন্তু সময় স্বল্প। পর্তুগীজ ও ডাচরা ওদের উপরে উৎপাত যা করে গেছে ব্রিটিশ আমলে তার খানিকটে নিরসন হলেও ওরা এখনো নিজের ঘরে পুরোপুরি মালিক হতে পারেনি। খ্রীস্টানদের মতো হিন্দুদেরও পর মনে করে। আর হিন্দুরাও তো মোড়লি করতে ছাড়ে না। ওদের সমান ভাবে না।

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করা গেল যে পুরুষদের প্রত্যেকের একটি করে খ্রীস্টান নাম পর্তুগীজ আমল থেকে চলে এসেছে, যদিও তাঁরা ধর্মে বৌদ্ধ। জাতীয়তাবাদ যাঁদের মধ্যে তীব্র তাঁরাও এদিক থেকে ইউরোপীয়। যেমন বার্নার্ড আলুবিহারে। জবাহরলালের বন্ধু। একদিন আলাপ হলো তাঁর সঙ্গে। তিনি ভারতের স্বাধীনতার আশায় বসে আছেন, কারণ ভারত স্বাধীন হলে সিংহলও স্বাধীন হবে।

সিংহলীদের মধ্যে দুই প্রধান ভাগ ঃ সমতলবাসী ও অসমতলবাসী। লো কান্ট্রি ও আপ কান্ট্রি। এককালে বাংলাদেশকেও বলা হতো লোয়ার প্রভিন্স। আপ কান্ট্রি বলতে বোঝাত বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব। কিন্তু সিংহলে সমতল অসমতল উভয় অঞ্চলের ভাষা একই। তা সত্ত্বেও অধিবাসীদের মধ্যে আঞ্চলিকতা আছে। সমতল অঞ্চলের অধিবাসীরাই অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। সিংহলের উত্তরপূর্বভাগের লোক সিংহলীভাষী নয়, তামিলভাষী বৌদ্ধ নয়, হিন্দু। জাতিতে সিংহলী নয়, ভারতীয়। অথচ তারা নবাগতও নয়। তারাও চারশো পাঁচশো বছর ধরে সিংহলের একাংশ জুড়ে বাস করছে। সংখ্যালঘু হলেও তাদের

ঐতিহ্য গৌরবময়, আর আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা দুষ্কর। সেই জন্যে সরকারী চাকরিবাকরিতে তারা এক কদম এগিয়ে রয়েছে। তার ফলে সিংহলেও একপ্রকার সাম্প্রদায়িক তথা প্রাদেশিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। নবাগত ভারতীয়দের বিদায় করে দিলেও চারশো-পাঁচশো বছরের জাফনা অঞ্চলের তামিলভাষী হিন্দুদের বিতাড়ন করা সম্ভব হবে না। তেমন কিছু করতে গেলে দ্বীপটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে হবে। আর-একটি আয়ারলণ্ড।

একজন তামিলভাষী নেতার সঙ্গেও আলাপ হলো। নামটি মনে পড়ছে না। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'সমস্যাটা এই যে সবাই চায় আরামের চাকরি। সাম্প্রদায়িকতার তথা প্রাদেশিকতার রহস্য তো এইখানে। ভারতেও কি তাই নয়?'

দীর্ঘকাল পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজদের পদানত থেকে সিংহলীদের তথা তামিলভাষীদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেছল। সেটা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে দেখে আমি আশ্বস্ত হই যে সিংহলও অচিরেই স্বাধীন হবে। কিন্তু শাপমুক্ত হলেও সমস্যামুক্ত হবে না। আভ্যন্তরিক দ্বিভাজ্যতা আয়ারলণ্ডকে যেমন সমস্যামুক্ত করেনি।

তবে তামিলভাষীরাও ভারতের দিকে ফিরে তাকায় না। ভারতের সামিল হওয়া তাদের কাছে অভাবনীয়। অথচ ভারত বা সিংহল কোন একটার সামিল না হয়ে পুরোপুরি স্বতন্ত্র হওয়াও তাদের কাম্য নয়। বেছে নিতে হলে তারা সিংহলকেই বেছে নেবে। সেখানে একদা তারা প্রভুত্ব করেছে। রাজাদের মধ্যে তামিলও ছিলেন। চারশো-পাঁচশো বছর বাদে তারা আর ভারতীয় নয়। যদিও তারা হিন্দু। এই পার্থক্যটুকু মনে রাখতে হবে যে সব ভারতীয় যেমন হিন্দু নয়, সব হিন্দু তেমনি ভারতীয় নয়।

এ হলো জাফনা অঞ্চলের তামিলদের কথা। নবাগত ভারতীয়রা চা বাগান বা রাবার বাগানে মজুর হয়ে এসেছে। ওদের দাবী চারশো পাঁচশো বছরের বসতির বা রাজ্যবিস্তারের দাবী নয়।

শিকড় ওদের ভারতের মাটিতেই লেগে আছে। বাংলাদেশের পশ্চিমা মজুরের মতো ওরা যখন খুশি যাওয়া-আসা করে। সিংহলকে ওরা আপনার করে নেয়নি, সিংহলও ওদের আপনার মনে করে না। নবাগত ভারতীয়দের সমস্যা সম্পূর্ণ অন্যজাতের। ইতিমধ্যে স্থির হয়েছে যে ওরা কিস্তিবন্দীভাবে ভারতেই ফিরে আসবে।

কলম্বোর আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তার বন্দরের দরুন। ওর মতো অবস্থানসৌভাগ্য বম্বেরও নয়, মাদ্রাজেরও নয়, করাচীরও নয়, কলকাতারও নয়, রেঙ্গুনেরও নয়। কলম্বোর তুলনা ভারত মহাসাগরের একমাত্র সিঙ্গাপুর। ইউরোপ ও চীন, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়া এই দুই জলপথের যাবতীয় লাইনার জাহাজ তখনকার দিনে কলম্বো হয়ে যেত। ইদানীং সুয়েজ খাল বন্ধ থাকায় কলম্বো উপেক্ষিত হচ্ছে। এটা সাময়িক হলেও এর প্রতিক্রিয়া সাময়িক নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা হারিয়ে সিংহল অনিবার্যভাবে সমাজতন্ত্রী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, স্বাধীনতাও ছিল আকাশকুসুম। সিংহলীরা তখন আধা ইউরোপীয়, আধা বৌদ্ধ। সিংহলের কলেজগুলো ছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ভালো ছেলেরা পাড়ি দিত লণ্ডনে। বিলেত ফের্তা ক'ভাই, সাহেব সাজত সবাই।

কলম্বোর ইংরেজী দৈনিকগুলো রোজ পড়তুম। অধিকাংশের সম্পাদনা ও পরিচালনা সিংহলীদের। জাতীয়তার চেয়ে আন্তর্জাতিকতার সুর ছিল প্রধান। ইউরোপীয়রা সিংহল ছেড়ে চলে যাক, এটা তাদের মনের কথা ছিল না। এখনকার সঙ্গে তখনকার অনেক তফাৎ। ওদের শিক্ষিতদের কাছে বিলেত আর সিংহল ছিল একই মুদ্রার দুটি পিঠ। জাতীয়তাবাদ তখনো খুব জোর পায়নি। তার জোর আসে বৌদ্ধ সাধুদের কাছ থেকে। তাঁদের চোখে তাঁদের ধর্মের দুই হাজার বছরের

ঐতিহ্য ছিল কয়েক শতকের ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে মূল্যবান। বৌদ্ধ সাধুরাই এতকাল সিংহলের আত্মাকে পর্তুগীজ ও ডাচ খ্রীস্টানদের দাপট থেকে সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। ইংরেজরা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ বলে সিংহলের বৌদ্ধ পুনরুজ্জীবন মোটের উপর নিষ্কণ্টক হয়েছে। তেমনি ইউরোপের প্রতি অনুরাগ স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। রাবার, চা প্রভৃতি শিল্প ইউরোপীয়দেরই প্রবর্তন। তার থেকে সিংহলীদেরও আয় হয় প্রচুর। নইলে সাহেবিয়ানার খরচ জুটত কী করে?

সিংহলের সাধারণ লোক কিন্তু গরীব। আমাদেরই মতো তণ্ডুলভোজী, আমাদেরই মতো দুর্বল। আর আমাদেরই মতো কালো। তখনো কতক লোক ঝুঁটি বাঁধত। মেয়েরা অনেকবেশী স্বাধীন।

সিংহলী মহিলারা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নন। বরং বলা যেতে পারে ভারতীয়ভাবাপন্ন। শাড়িকে তাঁরা একটু অন্যরকম করে পরেন। বোধহয় তাঁদের পূর্বতন পরিচ্ছদের অনুসরণে। শাড়ির আদর অত্যাধিক বলে ভারত থেকে অজস্র শাড়ি আমদানি হয়। সিংহলের মেয়েরা যদি শাড়ি না পরে ইউরোপীয় সাজ পরতেন তাহলে তার ইতিহাস অন্যরূপ হত। আজকের এই আত্মসম্মানবোধের জন্যে প্রথম অভিনন্দন অবশ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাপ্য। দ্বিতীয় অভিনন্দন প্রাপ্য ভারতীয় সভ্যতার দান শাড়ির, সিংহলী ধরনে পরা শাড়ির।

সিংহলের বা লঙ্কার একটা মিথ্যা ছবি আঁকা হয়েছে রামায়ণে। একবার ওই ছবি যাদের মনে বসে যায় তারা সিংহলীদের সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা নিয়ে মানুষ হয়। সিংহলের কাহিনী আমরা কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও পড়েছি। শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল রামায়ণের লঙ্কার মতো বর্বর নয়। তবে তেমনি সমৃদ্ধিশালী। সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা একদা বাঙালী বণিকমাত্রেরই পরমকাম্য ছিল। এখন যেমন বিলেত যাত্রা বাঙালী অবস্থাপন্ন মাত্রেরই জীবনের সাধ। সমুদ্রযাত্রা কী জানি কেন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তাম্রলিপ্তি বন্দরটাও সমুদ্রের থেকে দূরে পড়ে যায়। তা না হলে মধ্যবর্তী কয়েক শতাব্দীর অপরিচয় এমন ব্যবধান রচনা করত না।

আমার ঠাকুমার কাছে ছেলেবেলায় শুনেছিলুম বিভীষণ এখনো আছেন ও লঙ্কায় এখনো রাজত্ব করছেন। বিভীষণও হনুমানের মতো অমর। ঠাকুমা আমাকে আরো একটা গল্প বলতেন। লঙ্কায় নাকি একটা প্রাচীর আছে। প্রাচীরের উপরে উঠে যে-ই ওপারে তাকায় সে-ই একবার মুচকি হাসে। তারপরে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর ফিরে আসে না। এই রহস্যের কোন কূলকিনারা দিতে পারতেন না ঠাকুমা। তাই তো আমার ইচ্ছা হত স্বয়ং একবার সিংহলে গিয়ে অনুসন্ধান করতে। ওপারে কী এমন আছে যা দেখে অনিবার্যরূপে হাসি পায় আর লম্ফদানের প্রবৃত্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

ঠাকুমা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতেন বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা। আর সেই প্রাচীরে উঠে ওপারে কী আছে তা দেখেছি কিনা। দেখিনি যে তার প্রমাণ আমি জলজ্যান্ত ফিরে আসতে পেরেছি। তবে বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি বলে আমি দুঃখিত। রাজা নন, রাজবংশীয় বা অভিজাতবংশীয় একজনের নাম সার কুদ্দা রাতওয়াতে। পুরাতন রাজধানী কাণ্ডিতে বাস করেন। একদিন তাঁর সঙ্গে চা খেয়ে আসার সৌভাগ্য হয়। তার আগে আমরা কলম্বো থেকে কাণ্ডিতে যাই।

কলম্বো হলো ইউরোপীয়দের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বা বম্বে। আর কাণ্ডি হলো স্বদেশীয়দের পাটলীপুত্র বা বারাণসী। আমরা যেন একাল থেকে সেকালে যাই।

॥ কাণ্ডি ॥

কাণ্ডির আগেও আরো কয়েকটি জায়গায় রাজধানী ছিল। তাদের একটির নাম হলো পোলোন্নারুওয়া। এখনো তার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কাণ্ডিতে থাকতে একদিন আমরা মোটরে করে পোলোন্নারুওয়া ঘুরে আসি। তেমনি আরেক দিন —তার আগের দিন—সিগিরিয়া নামক বিখ্যাত শৈল। যার প্রাচীরচিত্র অজণ্টার সমসাময়িক।

প্রথমে বলি কাণ্ডির কথা। কলম্বো থেকে মোটরে করে কাণ্ডি পৌঁছতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে। পথের দু'ধারে রাবার বাগান। লোকালয় নজরে পড়ে না। সমতল থেকে অসমতলে যাত্রা। অপেক্ষাকৃত গরম থেকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডায়।

কাণ্ডিতে পৌঁছেই আমরা আশ্রয় নিই একটি সরকারী রেস্ট হাউসে। ব্যবস্থা এমন কিছু মন্দও নয়, এমন কিছু ভালোও নয়। দুজনে হলে সেইখানেই থেকে যেতুম, কিন্তু সংখ্যায় আমরা পাঁচজন, তাদের মধ্যে তিনজনের বয়স এক থেকে ছয় বছর। কোথায় এদের জন্যে দুধ পাই, কোথায় জ্বাল দিই, এমনি কতরকম প্র্যাকটিকাল অসুবিধে। হোটেল তো নয় যে অর্ডার দিলে সব কিছু এসে হাজির হবে, সঙ্গে একখানি বিল।

ভাগ্যিস আমার সঙ্গে একখানা পরিচয়পত্র ছিল। দিয়েছিলেন আমার মৃত সতীর্থ বীররাঘবনের পিতা মহদাশয় বৃদ্ধ সার বিজয়রাঘবাচারিয়ার। আমাকে স্নেহ করতেন। যাঁর নামে দিয়েছেন তিনি আমারি সার্ভিসের অগ্রজ কিন্তু অপরিচিত বিঠ্ঠল পাই। মাঙ্গালোর অঞ্চলের সারস্বত ব্রাহ্মণ। পাই তখন কাণ্ডিতে ভারত সরকারের ট্রেড কমিশনার বা বাণিজ্য প্রতিনিধি। কলম্বোতে না হয়ে কাণ্ডিতে কেন তাঁর আপিস হলো তার কারণ কাণ্ডির আশেপাশেই অধিকাংশ চা বাগান বা রাবার বাগান, যেখানে নবাগত ভারতীয় শ্রমিকদের আস্তানা। আপিস আর বাসস্থান একই প্রাঙ্গণে।

রেস্টহাউসে সবাইকে রেখে পাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি তো মহাখুশি। বলেন, 'আমার স্ত্রী এখন মাদ্রাজে। বাড়ীটা প্রায় খালি পড়ে আছে। আপনারা রেস্টহাউস ছেড়ে এখানেই চলে আসুন। আমার অতিথি হবেন। আমিই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। আপনাদের ছেলেমেয়েদের সামলাব। আপনারা একদিন সিগিরিয়া ও একদিন পোলোন্নারুওয়া ঘুরে আসবেন। কলম্বো থেকে যে মোটর ভাড়া করে এনেছেন সেই মোটরই এসব জায়গা ঘুরিয়ে আনবে। আপনাদের জন্যে আমি কাণ্ডীয় নৃত্যের আয়োজন করব।'

এর চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে! বাইবেলে আছে, রাখালের ছেলে সল (Saul) বেরিয়েছিল হারানো গাধার খোঁজে। পেয়ে গেল একটা রাজত্ব!

কাণ্ডি যার জন্যে সব চেয়ে গৌরবান্বিত তার নাম দন্তমন্দির। দালাদা মালাগাওয়া। এখানে একটি আধারে রক্ষিত হয়েছে গৌতম বুদ্ধের দন্ত। আধারটি কতকালের পুরানো জানিনে, দাঁতটি তো আড়াই হাজার বছরের। বছরে একবার করে মন্দির থেকে মিছিল বেরোয়, উৎসব হয়। হাতীর পিঠে পবিত্র দন্তাধার। হাতীও সুসজ্জিত রাজহস্তী। জানুয়ারী মাস তার সময় নয়। সেইজন্যে উৎসব দেখা আমাদের হলো না। মন্দিরে গিয়ে যে কোন দিন পবিত্র দন্ত দর্শন যে কোন জনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ সদয় বলে পবিত্র আধারটি দূর হতে অবলোকন করা সম্ভবপর। পাই আমাদের জন্যে সেই ব্যবস্থাই করেন। আমরা মন্দিরের বৌদ্ধ পরিচালকদের কাছে সাদর সম্ভাষণ

পাই। আধারটিও নিরীক্ষণ করি। কিন্তু প্রভু বুদ্ধের দন্ত প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয় না।

অস্থি বা দন্ত সংরক্ষণ করা হিন্দুদের প্রথা নয়। আমরা ওকে অগ্নিসাৎ করি, নয়তো গঙ্গায় বিসর্জন দিই। বৌদ্ধরাও একই বৃন্তের ফুল। বুদ্ধের নিষেধসত্ত্বেও কেন যে এই সব নশ্বর পদার্থের মায়া তাদের মধ্যে দেখা দিল তা আমাকে আশ্চর্য করে। বৌদ্ধধর্মের আদিপর্বে মন্দির বা বিগ্রহ নির্মাণ করা হত না। হত কেবল স্তূপ বা চৈত্য। সিংহলীরা আদিপর্বের বৌদ্ধ। থেরবাদী বলে যারা আপনাদের পরিচয় দেয়। মহাযানীরা যাদের হীনযানী বলে। তারাও অবশেষে মন্দির নির্মাণ করল, জানিনে এর পেছনে কী আছে। সম্ভবত একপ্রকার অমরত্বের বাসনা। নির্বাণ বাসনার থেকে যা ভিন্ন।

কিন্তু সিংহলে যে কয়দিন ছিলুম কোথাও বুদ্ধবিগ্রহ লক্ষ করিনি। বিগ্রহের জন্যে মন্দিরও নয়। তবে আছে এসব কোন কোন স্থানে। মূর্তি থাকলেও পূজা হয় না। মূর্তি শুধু ধ্যানের সহায়তার জন্যে। বৌদ্ধদের মূর্তিস্থাপনা আদিপর্বের প্রথা নয়, কালক্রমে প্রচলিত হয়েছে। সিংহল যতদূর জানি আদিপর্বেই দৃঢ়মূল রয়েছে। সেটাও ভারতের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বিচ্ছিন্ন বলেই সেটা সহজসাধ্য হয়েছে। তবে এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলা আমার সাজে না। আমি তো সিংহলের সবটা ঘুরে দেখিনি।

বিচ্ছিন্ন যেমন সত্য অবিচ্ছিন্নও তেমনি। ভারতের মতো সিংহলেও জাতিভেদ আছে। জাতিভেদপ্রথা বৌদ্ধদের মধ্যে সেকালেও ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সকলের সামাজিক স্টীলফ্রেম ছিল জাতিভেদপ্রথা। তফাৎ এই যে বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের, পূজারীর বা গুরুর ধার ধারত না। লিঙ্গায়েৎরাও ধার ধারে না। গৃহস্থ বৌদ্ধরা জাতিভেদ মানত না এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। মানত না সন্ন্যাসী বৌদ্ধরা। তাদের সঙ্ঘ ছিল সকলের কাছে খোলা। সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা অস্পৃশ্য ভেদ ছিল না। সঙ্ঘ আর সমাজ একই জিনিস নয়। একের বেলা যেটা নিয়ম অপরের বেলা সেটা নিয়ম নয়।

ভারতের মতো সিংহলেও জাতিভেদ আছে, হরিজন আছে। যেমন হিন্দুদের মধ্যে তেমনি বৌদ্ধদের মধ্যেও। অনেকে জানেন না যে শিখদের মধ্যেও জাতিভেদ রয়েছে, হরিজন রয়েছে। ধর্মসংস্কার যতবারই হোক না কেন, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সমাজ থেকে যায়নি, গেছে সঙ্ঘ বা পন্থ থেকে। এখানে সিংহল ভারত অবিচ্ছেদ্য।

একটি মজার গল্প বলি। আমার মনে ছিল না, আমার স্ত্রীর মনে ছিল। আমরা সিংহলে যাবার আগে দিন কয়েক মাদ্রাজে কাটাই, সেকথা বলেছি। সে সময় মাদ্রাজের দক্ষিণে এক জায়গায় আমাদের দেখানো হয় সমুদ্রগামী কচ্ছপ। সেই কচ্ছপগুলো মাদ্রাজ থেকে সিংহলে যাতায়াত করত। তাদের এমনভাবে তালিম দেওয়া হয়েছিল যে তাদের পেটের তলায় মাল বাঁধা থাকত, তারা সে মাল পাচার করত। মাশুলবিভাগের চোখে ধুলো দেওয়া যেখানে মানুষের অসাধ্য সেখানে কচ্ছপের সাধ্য।

কাণ্ডিকে মনোরম করেছে একটি কৃত্রিম হ্রদ। রাজাদের সৃষ্টি। তার মাইল তিনেক দূরে পেরাডেনিয়া রয়াল বটানিক গার্ডেন। ওর মতো বিচিত্র উদ্ভিদ্‌সংগ্রহ এশিয়াতে বিরল। সিংহল নিজেই একটি বৃহৎ বটানিক গার্ডেন। তার মাটিতে কী না ফলে, কী না ফোটে! ওটি একটি দ্বীপ তো নয়, একটি রত্নদ্বীপ। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে না হোক, রূপময়তার দিক থেকে সত্যই সোনার লঙ্কা।

পাই আমাদের নিয়ে যান সার কুন্দা রাতওয়াতের ভবনে। এতদিন বাদে অবস্থান মনে নেই। তবে মনে আছে শহরের চেয়ে বেশ উঁচুতে। সার কুন্দার পোশাকও ঠিক মনে পড়ে না। তবে

ইউরোপীয় নয়। নয় সাধারণ সিংহলী। তাঁর চেহারায়ও বিশিষ্টতা ছিল। তিনি একজন আপ কান্ট্রি সিংহলী। বয়স বোধহয় পঞ্চাশ থেকে ষাট। কথাবার্তা কি এতকাল ধরে মনে থাকার মতো? তবে তাঁর মধ্যে একটা ব্যাকুলতা লক্ষ করি। এ জন্মে একবার বৌদ্ধদের পবিত্র স্থানগুলি প্রত্যক্ষ করতে চান। বোধগয়া, সারনাথ ইত্যাদি। জীবনে কখনো মাদ্রাজের উত্তরে যাননি। উপলক্ষ ঘটেনি। সিংহলীদের মনের গতি উত্তরমুখী নয়, পশ্চিমমুখী। দেশের বাইরে যদি কোথায় যায় তো বিলেতে। কিন্তু বৌদ্ধ হলে ও ধর্মে মতি থাকলে উত্তরভারতের দিকেও দৃষ্টি যায়।

পাই আমাদের জন্যে কাণ্ডীয় নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন। জনাকয়েক বলিষ্ঠ জোয়ান আমাদের বাসস্থানে এসে নাচের প্রদর্শনী দিল। অস্পষ্ট মনে আছে, তাদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র কিছু একটা ছিল। একজন কি দু'জন বাজাচ্ছিল। তিনজন কি চারজন নাচছিল। কখনো সবাই একসঙ্গে, কখনো এক এক করে। তাদের মাথায় ছিল মুকুট, বুকে বাঁধা ছিল একপ্রকার ঢাল, রুপোর তৈরি। তাদের পরনে ছিলো কোঁচানো ধুতি, কোমর থেকে কেশরের মতো ঝুলছিল। তাদের বাহুতে ছিল তাগা ও হাতে বালা। উত্তমাঙ্গ অনাবৃত ছিল। মোটামুটি এই পর্যন্ত মনে আছে। আমার চেয়ে বেশী আমার গৃহিণীর।

সে রাতে ওরা দেখিয়েছিল নাগের অঙ্গভঙ্গী, ময়ূরের অঙ্গভঙ্গী। পাখির অঙ্গভঙ্গীও দেখায়। প্রকৃতিই ওদের শিক্ষাগুরু। বিষয়ের জন্যে ওরা প্রকৃতির উপর নির্ভর। আর কলাবিদ্যার জন্যে গুরুর উপরে। সব ক'টা পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলে গুরুর হাত থেকে মুকুটলাভ হয়। মুকুট পরার অধিকার যে-কোনো নাচিয়ের নেই। সাধনাটা একেবারেই ব্যক্তিগত। দলগত নয়। যদিও ওরা দল গঠন করে।

কাণ্ডিতে একদিন থেকে আমরা সিগিরিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়ি একই মোটরে। মোটরটি কলম্বোর একজন মালিক-চালকের। নামটি বোধহয় জন। জন আমাদের সঙ্গে তিন দিনের কড়ারে এসেছিল। সেইজন্যে কোথাও থাকতে চাইলেও থাকার উপায় ছিল না। তবে আমরা সিগিরিয়াতে রাত না কাটিয়ে ফিরে এসে কাণ্ডিতে কাটাই। তেমনি পরের দিন পোলোন্নারুওয়াতে রাত্রিযাপন না করে কাণ্ডিতে রাত্রিযাপন করি। অমনি করে কাণ্ডিতে তেরাত্রি বাস সম্ভব হয়। সেটা আমাদের ছেলেমেয়েদের দিক থেকে হিতকর। কেন মিছিমিছি ঘুরত ওরা আমাদের সঙ্গে পথে পথে? রাত কাটাত অজানা রেস্টহাউসে বা ডাকবাংলায়? তেপান্তরের মাঠে? পাই ওদের যত্ন করে রেখেছিলেন।

তেপান্তরের মাঠ কথাটা রূপকথায় শুনেছি। এবার চাক্ষুষ করা গেল। সিগিরিয়া এমন জায়গায় যার ধারে কাছে জন বসতি বা জঙ্গল নেই। মাঠের মাঝখানে হঠাৎ মাথা তুলেছে এক পাহাড়। গ্রানিটের তৈরী। তার উপরটা সমতল। দূর থেকে ভ্রম হয় একটা অতিকায় সিংহ শুয়ে আছে। সিংহগিরি থেকে সিগিরিয়া। পাহাড়ের উপরে একদা এক দুর্গ ছিল। দুর্গেশ যিনি তাঁর নাম কশ্যপ বা কাশ্যপ। তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। এ হলো পঞ্চম শতাব্দীর ঘটনা। ভারতে তখন অজন্টার যুগ। সিংহলেও সেই যুগ সঞ্চারিত হয়। পাহাড়ের গায়ে নির্জন কোণে অজন্টার মতো ফ্রেসকো অঙ্কিত হয়। দুর্গম পথ দিয়ে চড়াই অতিক্রম করে আমরা সেইসব ফ্রেসকোর মুখোমুখি হই।

অজন্টার মতো অসংখ্য চিত্র নয়। মাত্র কয়েকখানি কাল পারাবার পার হয়েছে। আমার কাছে মাত্র ছয়খানির প্রতিলিপি দেখছি। কোনটিতে দুটি নারী। রাণী ও তাঁর সঙ্গিনী বা দাসী। কোনটিতে একটি নারী। রাণী কিংবা রাজকন্যা। সামাজিক মর্যাদা সূচনা করছে অনাবৃত বক্ষ। যার বক্ষ অনাবৃত নয় সে-ই সমাজে নিচু। যিনি রাণী বা রাজকন্যা তাঁর দক্ষিণ করে বা উভয় করে

লীলাকমল। সঙ্গিনীর ডান হাতে ফুলের সাজি বা বাদ্যযন্ত্র। একটি ছবিতে সঙ্গিনীর হাতে বাদ্যযন্ত্র দেখে অনুমান হয় যে রাণী বা রাজকন্যা যাঁকে ভাবছি তিনি হয়তো অপ্সরা বা নর্তকী। সঙ্গিনীর রং ময়লা, রাণীর বা রাজকন্যার বা অপ্সরার রং উজ্জ্বল। তেমনি মুখাবয়বও আর্য ধাঁচের একজনের, দ্রাবিড় ধাঁচের অপরজনের। ভঙ্গীরও বৈচিত্র্য আছে। অপ্সরা অপরূপ সুন্দরী ও মাধুর্যময়ী, তার সঙ্গিনী চলনসই।

অজণ্টায় যেমন জাতকের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে বেশ বোঝা যায়, সিগিরিয়ায় তেমন নয়। এসব কোথাকার কাহিনী, চিত্রিতারা কারা, তার কোনো সন্ধান আমার জানা ছিল না। আমার ধারণা এগুলি ধর্মীয় নয়, সেকুলার। কিন্তু যে যুগের চিত্র সে যুগে ধর্মীয় ভিন্ন আর কোনরূপ চিত্র ছিল কিনা সন্দেহ। সম্ভবত এসব ইন্দ্রপুরীর আলেখ্য। মর্ত্যের নয়। তলার দিকে মেঘের মতো দেখা যায়। জানু ঢেকেছে, পা ঢেকেছে। এরা কি তাহলে আকাশে সঞ্চরণশীল?

সিগিরিয়াতে সে সময় জনসমাগম ছিল না। আমরাই যে কয়জন দর্শক। অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সুযোগ পাইনি। সিগিরিয়ার সমসাময়িক আর কিছুই নেই সিংহলে। সে যুগটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রাজা কশ্যপের দুর্গও নেই দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের গায়ে যে রূপের মেলা বসেছে তাই বা ক'জনের জানা ছিল! এসব আধুনিক আবিষ্কার। অনুরাধপুরও তেমনি আধুনিক আবিষ্কার। পোলোন্নারুওয়াও তেমনি। অনুরাধপুর না দেখলে সিংহল দেখা হয় না। আমরা দেখতে চেয়েছিলুম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সম্ভব হলো না। পোলোন্নারুওয়া যে দেখতে পেলুম এও যথেষ্ট ভাগ্য। তখনকার দিনে এসব জায়গায় যেতে হলে অনেক খরচ করতে হত।

পোলোন্নারুওয়া রাজপ্রাসাদ রচিত হয় চতুর্থ শতাব্দীতে। কিন্তু রাজধানী থেকে যায় অনুরাধপুরে। পরে অষ্টম শতাব্দীতে পোলোন্নারুওয়া হয় রাজধানী। ক্রমেই তার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন সেখানে প্রথম পরাক্রমবাহু। এখনো তাঁর মূর্তি সেখানে দাঁড়িয়ে। তেজস্বী গম্ভীর মুখ, মর্যাদাবান ভঙ্গী। ধারে কাছে আর কিছু নেই। সব ভেঙে চুরে গেছে। জেতবনারাম বিহারের ভাঙা ভিত ও প্রাচীর দেখলুম।

পরাক্রমবাহু নামে আরো কয়েকজন রাজা ছিলেন। এঁর নাম প্রথম পরাক্রমবাহু। ইনিই সিংহলের শ্রেষ্ঠ মহীপাল। ইনি বর্মার সঙ্গে যুদ্ধে সফল হয়েছিলেন, কিন্তু দক্ষিণভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বে বিফল হন। দক্ষিণভারতের সঙ্গে বিরোধই সিংহলীদের ক্রমে ক্রমে অভ্যন্তরে হটিয়ে দেয়। যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু সমাপ্ত করে পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজরা। শেষ স্বাধীন সিংহলী নৃপতি সিংহলের অভ্যন্তরভাগেই রাজত্ব করতেন। উপকূলগুলো পরহস্তগত হয়ে যায়। সেইজন্যে আপ কান্ট্রি সিংহলীরাই অপেক্ষাকৃত বীর্যবান. স্বাধীনতাপ্রিয় ও রুক্ষ। সংস্কৃতির ঐতিহ্য এরাই রক্ষা করেছে। সকলেই গোঁড়া বৌদ্ধ। আমি যতদূর জানি শ্রীমা ভাণ্ডারনায়ক এঁদের ঘরের মেয়ে। কিন্তু তাঁর স্বামী সলোমন ভাণ্ডারনায়ক ছিলেন লো'কান্ট্রি সিংহলী। তফাৎটা যেন প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের। তথা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিকের।

প্রথম পরাক্রমবাহু ছিলেন একাধারে সামরিক শৌর্যে অদ্বিতীয়, তথা শাসনকার্যে বিচক্ষণ। তাঁরই প্রভাবে বহুধা বিভক্ত বৌদ্ধ সঙ্ঘ আবার এক হয়, ধর্মের মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বহু রাজপ্রাসাদ, বিহার ও মন্দির নির্মাণ করেন তিনি। তাছাড়া তাঁর রাজ্যের সেচ ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার। তিনি বলতেন 'আমার রাজ্যে একফোঁটা বৃষ্টির জলও মানুষের উপকারে না লেগে সমুদ্রে মিশে যাবে না।' কৃষির উন্নতিও ছিল তাঁর ধ্যান। তাছাড়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা তো বৌদ্ধরাজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

কিন্তু সিংহলী রাজারা যতই পরাক্রান্ত হন না কেন, সমগ্র সিংহল জয় করা ও শাসন করা

সাধারণত তাঁদের সাধ্যের অতীত ছিল। এদিক থেকে ভারতের সম্রাটদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যার মিল। ভারতের যেমন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সিংহলেরও তেমনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত। শ্রীরামচন্দ্রের সময় থেকেই সিংহলের উপর আক্রমণের ঢেউ একটার পর একটা ভেঙে পড়েছে। সিংহল যে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে এর কারণ অভ্যন্তরভাগটা বরাবরই ছিল অরণ্যসঙ্কুল, সমুচ্চ ও দুর্ভেদ্য। একই কারণে সিংহলীরা দ্বৈপায়ন প্রকৃতির হয়েছে।

সিংহলের ইতিহাসে দেখা যায় সিংহলী রাজারা গীতবাদ্য ভাস্কর্য চিত্রকলা স্থাপত্য নৃত্য প্রভৃতিতে একান্ত উৎসাহী ছিলেন। কন্টিনেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলে ইংলণ্ডে যেমন সে উৎসাহ ফলবান হত না, সিংহলেও তেমনি। সিংহলের বেলা কন্টিনেণ্ট বলতে বোঝায় ভারত। সিংহলীরা অনেকেই সে বিষয়ে সচেতন। মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অনাগরিক ধর্মপাল যে পথ প্রদর্শন করেন সে পথ এখন প্রশস্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত স্থাপন করতে পেরেছেন। এঁরা ভারতমুখী। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপমুখী হয়ে শিক্ষিত সিংহলীরা এখনো ভারতমুখী হতে কুণ্ঠিত।

॥ প্রত্যাবর্তন ॥

কাণ্ডি থেকে ফিরে এসে আমরা দাশগুপ্তদের সঙ্গে একরাত কাটিয়ে গুহ মহাশয়ের অতিথি হই। গুহ তখনো অবিবাহিত। তাঁর তখন ভবঘুরের সংসার। সে সংসারে আমার স্ত্রী স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। হঠাৎ বলেন, ‘চল, ঘরে ফিরে যাই।’

গুহ বেচারার পক্ষে ওটা একটা শেল। ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে ওঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়েছিল। অন্যান্য বাঙালীদের সঙ্গেও। তাঁরাও উৎসুক ছিলেন আমাদের আতিথ্য দিতে। কিন্তু মাস তিনেক ঘোরাঘুরি করে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। বেশীর ভাগ পশ্চিম ভারতে। খানিকটা দক্ষিণ ভারতে। বাকিটা সিংহলে।

দেশে ফেরার আগে, গুহ প্রস্তাব করেন যে সিংহলের একটি অখ্যাত অঞ্চলে একবার ঘুরে আসা যাক। সেখানে শান্তিনিকেতন অনুসরণে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা আশ্রম গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আদর্শ যে সিংহলের আদর্শ এটি স্বীকৃত হয়েছে।

কলম্বো থেকে বেশ কিছু দূরে রাবারের বাগানের মাঝখানে তার স্থিতি। যেতে হয় জনতাহীন পথ ধরে। কিন্তু একবার পৌঁছতে পারলে সভ্যজগতের সব কিছু পাওয়া যায়। প্ল্যান্টেশন জীবন যেমন হয়। প্ল্যান্টেশনের মালিক এক্ষেত্রে ইউরোপীয় নন, সিংহলী। কিন্তু নামটি ইউরোপীয় পদ্ধতির। উইলমট পেরেইরা। না, খ্রীস্টান নন। রীতিমতো বৌদ্ধ। তিনি ইউরোপীয় পোশাক পরলেও তাঁর স্ত্রী পরেন সিংহলী পোশাক। শুধু তাই নয়, শান্তিনিকেতনে থেকে বাঙালীর মতো হয়েছেন। গুরুদেবকে অগাধ ভক্তি করেন। গুরুদেবও তেমনি অসীম স্নেহ করেন তাঁদের তিনজনকে।

হাঁ, তিনজন। তৃতীয়টি তাঁদের বালিকা কন্যা। গুরুদেবই নাম দিয়েছেন এণকা। অর্থাৎ ছোট্ট হরিণছানা। যতদূর মনে পড়ে শান্তিনিকেতনী ছাঁদে গৃহসজ্জা। সিংহলীদের মনটাকে ভারতাভিমুখ করতে অনাগরিক ধর্মপাল অবশ্য অগ্রগণ্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নগণ্য নন। ভারতের বাইরে শান্তিনিকেতনের দোসর সিংহলেই দেখলুম। নাম তার শ্রীপল্লী। সেটিও নাকি গুরুদেবের দেওয়া নাম। মিসেস পেরেইরার প্রথম নামটি ভুলে গেছি। সেটি দেশীয়। তাঁর গৃহস্থালীকে তিনি দেশীয় প্রণালীতে পরিচালনা করেন।

শ্রীপল্লী বলে যেটির পত্তন হয়েছিল সেটির তখনো আদ্য অবস্থা। যেমন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছিল এই শতাব্দীর প্রারম্ভে। পরিবেশটি পরম মনোরম। প্রায় তপোবন বললেও চলে। চারদিকে বড় বড় মহীরূহ, মাঝখানে ছোট ছোট পাঠভবন ও বাসভবন। হিংস্র শ্বাপদের ভয় নেই। ভয় নেই সভ্যতার প্রলোভনের। রেল লাইন বা বোলপুর নেই। তপোবন বালকের মতো কয়েকটি ছেলে গান ও আবৃত্তি শোনাল। মনে হলো রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে। এ প্রভাব যদি অব্যাহত থাকে তবে সিংহলের সংস্কৃতিও অলক্ষে রবীন্দ্রপ্রভাবিত হবে। বুদ্ধের পরে আর কোন ভারতীয়কে ওরা তেমন আত্মীয় করে নেয়নি। যেমন নিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। তবে এই মন্তব্য একত্রিশ বছর পূর্বে প্রযোজ্য। বর্তমান অবস্থা আমার অজ্ঞাত। শ্রীপল্লী কি আছে?

গুহ আর নেই। বছর কয় আগে এই কলকাতায় তিনি দেহত্যাগ করেন। দাশগুপ্তও আর নেই। তাঁরও শেষ কর্মক্ষেত্র কলকাতা। এইখানেই দেহরক্ষা। একত্রিশ বছরে পৃথিবীর কত না বদল হয়েছে। সিংহলের হবে না? সবচেয়ে আনন্দের কথা সিংহল স্বাধীন হয়েছে, সেইসঙ্গে অখণ্ড থেকেছে। যেটা ভারতের বেলা সত্য হলো না সেটা যে সিংহলের বেলা সত্য হলো এর জন্যে সিংহলী ও তামিল উভয় সম্প্রদায়কেই ধন্যবাদ দিতে হয়।

জাফনা হলো তামিলদের ঘাঁটি। সেখানে যাবার কল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু অনুরাধপুর দেখবার কথা ছিল। সে আর হলো কোথায়। বন্ধুদের সময় দিলে তাঁরা তার ব্যবস্থা করতেন। ছুটিও হাতে ছিল। কিন্তু হঠাৎ স্থির করে ফেলি যে এ-যাত্রা ঢের হয়েছে, আর নয়। পরে আবার আসছি। সিংহল তো পালিয়ে যাচ্ছে না। বন্ধুরাও থাকছেন।

হায়! সুযোগ একবার হাতছাড়া হলে আর ফেরে না। 'আবার দেখা হবে' তো কতবার কতজনকে বলেছি, কত স্থানকে বলেছি। কটা ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে! সিংহল স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে পরও হয়ে গেছে। ভিসা, বিদেশী মুদ্রা ইত্যাদি কত কী হয়রানি! তাই দূর থেকেই ওকে ভালোবাসি। সিংহলীদেরও ভালোবাসি। ভালোবাসতে থাকব।

পুরো দশটা দিনও আমরা সিংহলে কাটাতে পারিনি, যদিও পরিকল্পনা ছিল মাসেকের। আমাদের বন্ধুরা তো আমাদের ধরে রাখতেই চেয়েছিলেন। এমন কি পেরেইরা দম্পতীও সেদিন ধরে রাখতেন, যদি আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের রেখে গেছলুম গুহর ওখানে। তাঁদের দোহাই দিয়েই শ্রীপল্লীর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিই।

সেইদিনই রাতের ট্রেনে আমরা কলম্বো থেকে বিদায় নিই। ভোরে উঠে ফেরি জাহাজে সমুদ্রপার। ভারতের মাটিতে পদার্পণ। ভারত ও সিংহল কত কাছাকাছি।

এইখানেই ইতি করতুম, কিন্তু মনে পড়ে গেল মেনকাকে। ভারতীয় নৃত্যশিল্পী। লীলা রায় থেকে লীলা মুখার্জী। তার থেকে লীলা সোখে। কলম্বোতে তাঁর নৃত্য দর্শন করাও একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ক'টাই বা দিন ছিলুম সিংহলে! কিন্তু দিনগুলি ও রাতগুলি সুধায় ভরা ছিল। তার বেশীর ভাগই এখন বিস্মৃতির অতলে।

সিংহল থেকে ফিরে

আমাদের সেবারকার পরিক্রমার দক্ষিণতম প্রান্ত ছিল সিংহল। আরো দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। মাদ্রাজ থেকে জাহাজে কলম্বো গিয়ে আমরা ভারত মহাসাগরেরও আমেজ পাই। ভারত

মহাসাগরের বিস্তার সিংহল থেকে অ্যানটারটিকা অবধি।

ফেরার পথে আমরা ফেরী স্টীমারে পাক প্রণালী পার হয়ে সিংহল থেকে ভারতে চলে আসি। হনুমানের মতো মহাবীরের পক্ষে ওটুকু ছিল লাফ দিয়ে পার হবার মতো দূরত্ব। সীতাকে সঙ্গে নিয়ে রাম সে রকম কোনো দুঃসাহসের কাজ করেননি। পুষ্পক বিমানে বসে অনায়াসে অতিক্রম করেন। ভারতের তটরেখা দর্শন করে বৈদেহীকে বলেন, কালিদাসের ভাষায়—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

তখনকার দিনে কলম্বো থেকে এদেশে আসার জন্যে বিমান ছিল না। তাই বলতে পারলুম না বিমান থেকে কেমন দেখায়। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি তিনটি সন্তানের জননী। সে বয়সে তিনিও যথেষ্ট তন্বী ছিলেন। আটাশ বছর বয়স একটা বয়সই নয়। আমারও বয়স ছিল তখন পঁয়ত্রিশ। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে।

পঁয়ত্রিশ বছর পরে লিখতে বসে আর ভ্রমণকাহিনী লেখা যায় না। লেখা যায় জীবনস্মৃতি। এটা তাই ভ্রমণকাহিনী বলে গণ্য হতে পারে না। যখন যেটুকু মনে আসছে সেইটুকুই লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছি। এটা একপ্রকার জীবনস্মৃতি।

সিংহলে থাকতে কখনো মনে হয়নি যে ভারতের বাইরে এসেছি। দেশটা এত বেশী ভারতের মতো। দেশের লোকও ভারতের লোকের মতো। তবে ওদের অধিকাংশই বৌদ্ধ, যেমন ছিল পাল যুগে বা আরো আগে বাংলার অধিকাংশ লোক। তাই হিন্দু দেবস্থান বড়ো একটা নজরে পড়েনি। তারপর বৌদ্ধ হলেও ভদ্রলোক শ্রেণীর পুরুষদের রীতি দেশীয় পদবীর পূর্বে একটি বিদেশী নাম বসানো। যেমন বার্নার্ড আলুবিহারে, উইলমট পেরেরা। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তবু সে রীতি এখনো বহুক্ষেত্রে বহাল রয়েছে। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তো সেইটেই ছিল সর্বসম্মত। এ ছাড়া ভারতের সঙ্গে তৃতীয় কোনো পার্থক্য নজরে পড়েনি। তাই ভারতের মাটিতে পা দিয়ে রোমাঞ্চ বোধ করিনি। সিংহল থেকে ফেরা ইউরোপ থেকে ফেরা নয়। আজকের দিনের বাংলাদেশ থেকে ফেরা।

সিংহলী, মালয়ালী ও বাঙালী এই তিনের মধ্যে আমি একটা পারিবারিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি। কী করে এটা সম্ভব হলো জানিনে। বোধহয় সমুদ্রপথে যাতায়াতের রেওয়াজ ছিল। সেটা এত সুদূর অতীতে যে রূপকথা ভিন্ন আর কোথাও তার চিহ্ন নেই। তবে বৌদ্ধ পুরাণে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাও অবিসংবাদিত নয়। তা বলে পারিবারিক সাদৃশ্যটা আমার বিভ্রম নয়। সিংহলীরা কিন্তু তামিলদের একেবারেই দেখতে পারে না। তাদের সঙ্গে বংশগত মিল স্বীকার করে না। দাবী করে যে সিংহলী ভাষাও আর্য ভাষা।

দক্ষিণ ভারতের মাটিতে পা দিয়ে বোঝা গেল যে এটা দ্রাবিড়দের অঞ্চল। তামিল এখানকার ভাষা। তাই তামিল নাড়ু। এরা বহু শতাব্দী ধরে আর্যীকৃত হয়ে এসেছে, কিন্তু এদের মূল ঐতিহ্য হচ্ছে আর্যপূর্ব। সে কথা সিংহলের বেলাও খাটে। এখন তো তার নাম রাখা হয়েছে শ্রীলঙ্কা। যে নামে সে বৌদ্ধ ও হিন্দু পুরাণে প্রসিদ্ধ। রামচন্দ্র সিংহল বিজয় করেননি, করেছিলেন লঙ্কা জয়। রামায়ণ যদি ইতিহাস হয়। কিন্তু সে জয়ও সাময়িক। লঙ্কা চিরদিন স্বতন্ত্র। আর সমুদ্র তার রক্ষাকবচ। যেমন ইংলণ্ডের।

মাঝখানে সমুদ্র না থাকলে দ্রাবিড়রা এতদিনে সমগ্র লঙ্কাকে আর একটি তামিল নাড়ুতে পরিণত করে থাকত। বৌদ্ধ ধর্মও যে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে সেও ওই সমুদ্রের কল্যাণেই। একদা দক্ষিণ ভারতেও বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণরা সেখানে বেদ পুরাণ নিয়ে পৌঁছবার

পূর্বেই বৌদ্ধ ও জৈনরা পৌঁছেছিলেন। পরে শৈব ও বৈষ্ণবরা এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতীক ধারণ করে বিভক্ত হয়ে যান। ব্রাহ্মণরা কেউ আমিষ খান না। না বৈষ্ণব, না শৈব। তাঁদের মধ্যে যদি শাক্ত থাকেন তবে দেবীভক্ত হলেও নিরামিষাশী। ব্রাহ্মণদের প্রেস্টিজের আদি কারণ যদিও বেদজ্ঞান তবু পরবর্তী কারণ অহিংসা। এটা বৌদ্ধ জৈন উত্তরাধিকার।

আমরা সমুদ্র পার হয়ে মাদ্রাজগামী ট্রেনে উঠি। কিন্তু পথের মাঝখানে ত্রিচিনোপলীতে নামি। সেখানে তখন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসার ছিলেন একজন বাঙালী। শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস। তিনি আমাদের পরম সমাদরে তাঁর বাংলায় নিয়ে যান। ত্রিচিনোপলী বা তিরুচিরাপ্‌পল্লী হচ্ছে তামিল নাড়ুর কেন্দ্রস্থল। অতি পুরাতন এর ঐতিহ্য। কিন্তু তার জন্যে আমরা এখানে যাত্রাভঙ্গ করিনি। করেছিলুম নিকটবর্তী শ্রীরঙ্গম দর্শন মানসে।

মাসটা ছিল ফেব্রুয়ারি। বাংলাদেশে তখন দিব্যি শীত। কিন্তু ত্রিচিতে রীতিমতো গরম। আমাদের বন্ধু বিশ্বাস বলেন, 'এদেশে তিনটি ঋতু। হট, হটার, হটেস্ট।' দিনরাত্রির প্রহরগুলিও তেমনি গরম, আরো গরম সব চেয়ে গরম। আমরা ত্রিচিতে তিষ্ঠতে পারিনে। কোনো মতে পরিদর্শনের দায় সারি।

পরের দিন সকালবেলা যাই মোটরে করে শ্রীরঙ্গম। স্বচ্ছতোয়া কাবেরী নদী রমণীয় স্থানটিকে দ্বীপের মতো বেষ্টন করেছে। মন্দির বলতে আমরা যা বুঝি দক্ষিণের মন্দির তার সঙ্গে মেলে না। প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করতে হয়। আর প্রত্যেকবারেই প্রাচীর ভেদ করতে হয় যে দ্বার দিয়ে তার নাম গোপুর্‌ম। এক একটি গোপুরম্ এক একটি মন্দিরের মতো বিরাট। গোপুরমের পর গোপুরম্ দিয়ে যেতে যেতে মধ্যস্থলের আসল মন্দিরটিতে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যায়। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আমাদের মুগ্ধ করে। দেবতার জন্যে আমাদের ব্যাকুলতা ছিল না। থাকলেও মূল মন্দিরে প্রবেশ পেতুম না। নোটিস আঁটা ছিল ইউরোপীয়দের প্রবেশ মানা। আমার সহধর্মিণীকে ওরা প্রবেশ করতে দিত না। এ প্রশ্ন নতুন নয়। ছেলেবেলায় পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে আঁটা ছিল একটি নোটিস। তার বয়ান ছিল এইরূপ : এই মন্দিরে মুসলমান, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম ও আর্য সমাজীদের প্রবেশ নিষেধ। সে নোটিস এখনো সেখানে আছে কিনা জানিনে। তবে এই সেদিন একজন আমেরিকান বৈষ্ণব যুবক পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ না পেয়ে সংবাদপত্রে বিলাপ করেছেন। বোঝেন না যে প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হতো ও তাকে পবিত্র করতে বিস্তর খরচ হতো।

যারা সত্যিই দেবদেবী মানে না বা প্রতিমাপূজায় বিশ্বাস করে না, তারা কেনই বা প্রবেশ করতে চাইবে? বাল্যকালে আমিও ছিলুম একটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের ছেলে, হপ্তায় দু'তিনবার ঠাকুমাকে নিয়ে পুরীর মন্দিরে যেতুম। নোটিসটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত ঠেকত। কিন্তু ষোল সতেরো বছর বয়সে আমি মনে মনে ব্রাহ্ম মতের পক্ষপাতী হই। তার পরে যখন মন্দিরে যেতুম তখন ধর্মের জন্যে নয়, শিল্পের জন্যেই যেতুম। শিল্পরসিকদের মন্দিরে যেতে না দিলে শিল্পের বিশ্বজনীন আবেদন থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়। কাজটা যে অন্যায় কবে হিন্দুরা এটা উপলব্ধি করবে? স্বাধীনতার পরে কারো কারো অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু অনেকের ঘটেনি। অপমান ডেকে আনার ভয়ে আমরাও কোথাও যাইনে।

শ্রীরঙ্গম থেকে ফেরার পথে আরো দুটি একটি মন্দির দেখি। পরে ত্রিচির গোলডেন রকে গিয়েও সেখানকার মন্দির পরিদর্শন করি। ইচ্ছা ছিল মাদুরা ও তাঞ্জোর গিয়ে মীনাক্ষী ও নটরাজ মন্দির দেখব, কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেশভ্রমণ করা মানেই ভাবনায় জর্জর হওয়া। কতক্ষণে বাসায় ফিরব, কখন তাদের সঙ্গে দেখা হবে, কী করছে তারা এসব ভেবে অস্থির হতে হয়। বয়স

তাদের একজনের তো দু'বছরও পূর্ণ হয়নি। আর দু'জনের ছয় ও চার।

ত্রিচি থেকে মাদ্রাজ যাবার সময় ট্রেন থেকে চাঁদের আলোয় দেখি তাঞ্জোরের সেই প্রসিদ্ধ মন্দির। দক্ষিণের এক একটি মন্দির যেন এক একটি নগর। তাতে ঘর বাড়ী দোকান পসার সব কিছু থাকে। গোটা সভ্যতাটাই ছিল মন্দিরকেন্দ্রিক। সন্ধ্যা হলে নাগরিকরা সবাই মন্দিরে গিয়ে হাজির হতো। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল পেতো। দেবদাসী বাদ দিয়ে মন্দির নয়। আর নৃত্যই তাদের একমাত্র কৃত্য নয়। ইদানীং এ প্রথা লোপ পেতে চলেছে। তার সঙ্গে নৃত্যকলাও লোপ পেতে পারে, যদি না সারাজীবন তাই নিয়ে থাকতে ভদ্রকন্যারা ইচ্ছুক হন। আর যদি না সে ইচ্ছা পুরুষানুক্রমিক হয়।

দক্ষিণ আর উত্তর অতীতে বিচ্ছিন্ন দুটি ভূখণ্ড ছিল। মাঝখানে বিন্ধ্য পর্বত। ব্যবধান ধীরে ধীরে দূর হলেও একেবারে দূর হয়নি। আমাদের কাছে উত্তর যেমন আপনার দক্ষিণ তেমন নয়। এর কারণ পরিচয়ের স্বল্পতা। কিন্তু পরিচয় যেখানে স্বল্প নয় সেখানেও অনেক জায়গায় বাধে। কোথাও একটা মৌল পার্থক্য রয়েছে যেটা আভ্যন্তরিক। আমি এর সংজ্ঞা দিতে পারব না। এটা অনুভবের বিষয়। তামিলরাও নিশ্চয় এটা অনুভব করে। সমাজে যেটা ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের বিরোধ সংস্কৃতিতে সেটা সংস্কৃত তামিলের বিরোধ। আর ইতিহাসে যেটা আর্য প্রাগ্‌আর্যের বিরোধ ভূগোলে সেটা উত্তর দক্ষিণের বিরোধ। বিরোধ থেকে সমন্বয়ে উপনীত হওয়া সহজ নয়। তিন হাজার বছরও তার জন্যে যথেষ্ট নয়। দক্ষিণের লোক উত্তরে এলে খোলা দরজা পায়। উত্তরের লোক দক্ষিণে গেলে দুয়ার খোলা পায় না। ভিতরে ভিতরে একটা প্রতিরোধের ভাব আছে। আর্যরা দাক্ষিণাত্য জয় করতে পারেনি। শস্ত্রের দ্বারা যেটা সম্ভব হয়নি সেটা শাস্ত্রের দ্বারা হয়েছে। কিন্তু সেই পর্যন্ত। উত্তরের নৃত্য গীত স্থাপত্য ভাস্কর্য দক্ষিণে প্রবেশ করেনি। দক্ষিণ বলতে প্রধানত তামিল ভূমির কথাই বলছি। তামিল ভূমিই হচ্ছে দক্ষিণের হার্ড কোর। কঠিন মেরুদণ্ড। তারই উপর পড়েছে সব চেয়ে কম আর্য প্রভাব, সব চেয়ে কম মুসলিম প্রভাব। কেবল ইংরেজ প্রভাবের বেলা সব চেয়ে কম নয়। তার পরে আবার যথাপূর্ব। সবচেয়ে কম হিন্দী প্রভাব। বিরোধটা এখন হিন্দী তামিলের বিরোধ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাবধান হতে হবে। যাতে সেটা উত্তর দক্ষিণের বিরোধে পরিণত না হয়।

মাদ্রাজে ফিরে এসে লক্ষ করি আরো একটা বিরোধ আছে। সেটা তামিল তেলুগুর বিরোধ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এক অপরের প্রাধান্য সহ্য করবে না। মাদ্রাজ শহরেও না। এতদিনে এর একটা নিষ্পত্তি হয়েছে। তেলুগুরা পেয়েছে হায়দরাবাদ শহর ও নিজামশাসিত তেলেঙ্গানা অঞ্চল। সংখ্যায় তারাই বেশী, আয়তনে তাদের রাজ্যই বৃহত্তর। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর আগে তামিলরাই ছিল এগিয়ে। তাই তেলুগুদের সঙ্গে ছিল রেষারেষি। মাদ্রাজ শহরের উপরেও ছিল তাদের দাবী।

শহরটির আসল নাম কিন্তু মাদ্রাজ নয় চেন্নাই বা চেন্নাইপত্তনম্‌। কলকাতা কেমন করে ক্যালকাটা হলো তা জানি। কিন্তু চেন্নাই কেমন করে ম্যাডরাস হলো সেকথা জানিনে। কারণ কেউ বলতে পারে না। দক্ষিণের বন্ধুরাও না। নামটা বিদেশী না স্বদেশী তাও অজ্ঞাত। বিদেশী হলে কোন্‌ দেশী।

আমরা যদি আরো ত্রিশ বছর আগে মাদ্রাজে যেতুম তা হলে দেখতুম তার একটি ভাগ শ্বেতকায়দের অঞ্চল, অপরটি কৃষ্ণকায়দের। দ্বিতীয়টির নাম ছিল ব্ল্যাক টাউন। প্রায় তিন শতক ধরে এই অবমাননা সহ্য করার পর কৃষ্ণকায়রা পায় রাজার করুণা। ব্ল্যাক টাউন হয় জর্জ টাউন। নামে কী আসে যায়! মর্যাদা তো দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দেরই মতো। সেইজন্যে গান্ধীজী পান বিপুল অভ্যর্থনা ও সমর্থন। কংগ্রেসের সর্বময় সাফল্যের মূলে ছিল শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের বর্ণভেদ। তার

আগে ছিল জাসটিস পার্টির অধিকতর সাফল্য। অব্রাহ্মণদের সেই পার্টির মূলেও ছিল বর্ণাশ্রমধর্মের বর্ণভেদ। সেটাও তো একদা শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়ের বৈষম্য সূচনা করত। জাসটিস পার্টি জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ভেসে যায়। কিন্তু বর্ণভেদ তা বলে মুছে যায় না। স্বাধীনতার পরে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে বৈষম্য রহিত হয়েছে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৈষম্য অন্তর্হিত হয়নি। তাই জাসটিস পার্টির উত্তরাধিকার বর্তেছে এখনকার দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাঝগমের উপর। উচ্চারণটা বোধ হয় কালহম্। ল উচ্চারণ আবার বাংলার মতো নয়। কতকটা ওড়িয়ার মতো। দক্ষিণীরা যখন 'তামিল' শব্দটি উচ্চারণ করে তখন তাদের উচ্চারণ আর কারো সঙ্গে মেলে না।

মাদ্রাজে এবার আমরা অতিথি হই ডক্টর মননকুমার মৈত্রের। এঁর পত্নী নরওয়ের কন্যা। কিন্তু বিবাহের পরে বাঙালীর মেয়ে। এঁদের ছেলেমেয়েরাও বাঙালীর মতো মানুষ হচ্ছে। এতদিন বাদে আমাদের ছেলেমেয়েরা মনের মতো খেলার সাথী পেয়ে মেতে যায়। আমিও নিশ্চিন্ত হই। মৈত্র যাচ্ছিলেন সরকারী সফর উপলক্ষে কোচিনে। আমাকে সঙ্গে নিতে চান। আমিও পেয়ে যাই আমার ভ্রমণের সাথী। নয়তো সে যাত্রা মাদ্রাজে আরো কিছুদিন থেকে সেখানকার বিদগ্ধমণ্ডলীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে দক্ষিণ থেকে বিদায় নিতুম। আমার মালয়ালমভাষী অঞ্চল দর্শন হতো না। তখনকার দিনে মালয়ালমভাষী অঞ্চল ছিল কতক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সামিল, কতক কোচিন ত্রিবাঙ্কুড়ের মধ্যে বিভক্ত। এখন সবটা জুড়ে কেরল হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত এরনাকুলামে আমরা নামি। তারপর একদিন রাজন্যশাসিত কোচিন শহর ঘুরে আসি। কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য চেরুতুরুতি গিয়ে কথাকলি নৃত্য উপভোগ। পি. ই. এন ক্লাবের সদস্য ছিলেন এরনাকুলামের শঙ্কর কুরুপ ও যতদূর মনে পড়ে শঙ্করণ নাম্বিয়ার। বম্বে থেকে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া এঁদের লিখেছিলেন যে আমি দেশ দেখতে বেরিয়েছি, এরনাকুলাম গেলে এঁরা যেন দেখতে সাহায্য করেন। কবি শঙ্কর কুরুপ স্বেচ্ছায় আমার গাইড হন। তখনো এঁর নাম বাইরে ছড়ায়নি। বছর পঁচিশ বাদে যখন একলক্ষ টাকা মূল্যের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রবর্তিত হয় তখন প্রথম বর্ষের পুরস্কার লাভ করেন কেরলের মালয়ালম ভাষার এই নম্র অনাড়ম্বর অধ্যাপক কবি। সরল সাদাসিধে মিতভাষী দরদী মানুষ। এঁর মূল্যবান সময়ের কতখানি ইনি আমাকে দিয়েছিলেন ভেবে কৃতজ্ঞতা বোধ করি। ইতিমধ্যে ইনি মহাকবি আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছেন।

তবে তখনকার দিনে মহাকবি বলতে সাধারণত যে দু'জনকে বোঝাত তাঁদের একজন ছিলেন বল্লতোল। দ্বিতীয়জনের নাম নলপত নারায়ণ মেনন।

বল্লতোল পরে আমাদের পি. ই এন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। কেরলের বাইরেও যথেষ্ট প্রখ্যাত ছিলেন। চেরুতুরুতির কেরল কলামণ্ডলম্ তাঁরই প্রতিষ্ঠান। তিনিই কথাকলি নৃত্যনাট্য পুনরুদ্ধার করে তার নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন। কথাকলির নাম সকলেই শুনেছেন, কিন্তু বল্লতোলের নাম শুনেছেন ক'জন। কেমন করে মনে পড়ছে না, আমার পরিচয় এঁর কাছে পৌঁছয়। চেরুতুরুতি ডাক বাংলায় আমাদের দুই বন্ধুর স্থান হয়। কেরল কলামণ্ডলের কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠানের বিশেষ আয়োজন হয় সেই সন্ধ্যায়। বিশিষ্ট দর্শক আমরা দুই বন্ধু ও ডাক বাংলার অপর অতিথি জাভাদেশবাসিনী নৃত্যশিক্ষার্থিনী তরুণী রত্না। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি সেখানে থেকে কথাকলি নৃত্যে তালিম নিচ্ছিলেন।

চেরুতুরুতি একটি গ্রাম। পরিবেশটি শান্তিনিকেতনের মতো। এখনকার নয়, পঞ্চাশ বছর পূর্বের। মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ। আসরও বলা যেতে পারে। নৃত্যনাট্যের নট বা নর্তক যাঁরা তাঁরা সকলেই স্থানীয় গ্রামিক। এটি একটি লোকশিল্প। রাজসভার বা নাগরিক মজলিশের নয়। বন্যপ্রাণী বনেই সুন্দর। কথাকলি গ্রামেই সুন্দর। গ্রামিকরাই এর দর্শক। তাদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। নইলে

জমবে কেন? অবশ্য মহাকবি বল্লতোলও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আর ছিলেন কলামণ্ডলের সেক্রেটারি। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক। মনে পড়ছে না সেদিনকার পালাটা কী ছিল। মহাভারতের বা রামায়ণের কোনো একটা আখ্যান। গান গেয়ে চলেছিল মঞ্চের একপাশে গায়েনের দল। গান গেয়ে গেয়ে তারা কাহিনীটা শোনাচ্ছিল। গানের ভাষা আমাদের দুর্বোধ্য। যদিও সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য। সেক্রেটারি আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন দয়া করে। এ সুযোগ তো কলকাতায় মেলে না। কাহিনীটাও অনুষ্ঠানের অঙ্গ। মূলত কথাকলি একটা গীতিনাট্য। তথা নৃত্যনাট্য। সদাহাস্যময় সৌম্যদর্শন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন বল্লতোল নারায়ণ মেনন। দুঃখের বিষয় তিনি সম্পূর্ণ বধির। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় দোভাষীর কাজ করেন তাঁর কন্যাস্থানীয়া এক মহিলা। বল্লতোল ইংরাজীতে বলতেন না। সেদিন কী বিষয়ে কথা হলো মনে পড়ে না। তাঁর কবিতার কতক অংশ পড়ে শোনান সেই মহিলা। দক্ষিণের ভাষাগুলির সঙ্গে উত্তরের ভাষাগুলির অমিল এত গভীর যে এখানে ওখানে সংস্কৃত শব্দের উপস্থিতি আমার কাছে অর্থবহ নয়। উত্তর দক্ষিণের সেতু বন্ধন করতে পারত সংস্কৃত, যদি সংস্কৃত ভাষায় আধুনিক লেখকদের কবিতা বা গল্প অনুবাদ করার রেওয়াজ থাকত। এখন সংস্কৃতের স্থান নিয়েছে হিন্দী। কিন্তু জনপ্রিয় না হলে সকলের সব রকম রচনা হিন্দীতে অনুবাদ করা হয় না।

দেশীয় রাজ্যের রাজধানী কোচিন শহর দেখে এলুম। তার মধ্যে ইহুদীদের অতি প্রাচীন সিনাগগ। ইহুদীরা আসে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সিনাগগ নির্মিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এ অঞ্চলে তারা এককালে এতদূর প্রভাবশালী ছিল যে নিজেদের একটি রাজ্যও স্থাপন করেছিল। চীনের সঙ্গে তারা বাণিজ্য করত। দেড় হাজার বছর ভারতে বাস করার পরও তারা আবার ফিরে যাচ্ছে প্যালেস্টাইনে। এতদিনে বোধ হয় কোচিন থেকে সবাই চলে গেছে। অথচ তাদের উপর কোনো অত্যাচারের বা বৈষম্যসূচক ব্যবহারের কথাও শোনা যায় না।

ইহুদীদের মতো সীরিয়ার খ্রীস্টানরাও এসেছিল। তাদের সংখ্যা বেড়েছে। স্থানীয় লোকও তাদের ধর্ম গ্রহণ করে তাদের সামিল হয়ে গেছে। যাঁদের নাম শুনে মনে হয় বিদেশী তাঁরাও ধর্মব্যতীত আর সব বিষয়ে স্বদেশী। পূর্বপুরুষদের মতো জাতও মানেন। হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের ঝগড়া নেই। লেখাপড়ায় তাঁরা এত উন্নত যে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হবার ভয় নেই। লেখাপড়ায় কেরলের প্রগতি সারা ভারতের পুরোভাগে। শুনেছি কেরল আর মিজোরাম এই দুটি অঞ্চলই লেখা পড়ায় সমান সমান। এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে কেরলে বাড়ীর ঝিরাও ম্যাট্রিক পাশ। 'আনন্দবাজারে'র পর ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত হয়। ভাস্কো ডা গামা যখন ভারত আবিষ্কার করেন তখন তিনি প্রথম ভূমি স্পর্শ করেন কালিকটে। অমনি করে আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয় কেবল কেরলের নয়, ভারতের। আবার একালে দেখা যাচ্ছে কেরলেই প্রথম ক্ষমতার আসনে বসে কমিউনিস্ট দল। কেরল দুই ভাবে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আমি যখন কোচিন বেড়াতে যাই তখন কিন্তু এর কোনো পূর্বলক্ষণ ছিল না। তখনকার সমস্যা ছিল দেশীয় রাজাদের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করা। আর ইংরেজদের হটানো। বিশ্বযুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনায় কোচিনের এক আলাপী বলেন, 'ভারত এ যুদ্ধে সহযোগিতা করবে না। করে লাভ কী হবে?'

কেরলের আরো পুরাতন বৈশিষ্ট্য মালয়ালী সমাজের ম্যাট্রিয়ার্কি বা মাতৃতন্ত্র। নরাণাং মাতুলক্রমঃ। পুত্র পিতার বংশনাম ধারণ করে না, করে মাতুলের বংশনাম। পিতা পুত্রকে উত্তরাধিকারী করেন না, ভাগিনেয়কে দেন উত্তরাধিকার। আমাদের কাছে এসব আজব দেশের আজগুবি কাণ্ড। চমকে উঠি যখন শুনি নায়ারের ছেলের পদবী নায়ার নয় মেনন। আর মেনন তার

পিত্রার সম্পত্তি পাবে না, পাবে তার মাতুল মেননের সম্পত্তি। এরনাকুলামে সে সময় একটি উত্তর ভারতীয় ছাত্র ছিল। সে আমাকে বুঝিয়ে দেয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের রীতি নীতি। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলে যে আজকাল ওসব মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে না। যারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাইরে গিয়ে বসবাস করছে তারা পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি গ্রহণ করছে। তাই পুরানো আইনকানুন বদলে যাচ্ছে। কিন্তু আগেকার দিনের নিয়ম ছিল এই যে স্ত্রী থাকবে স্ত্রীর মায়ের বাড়ীতে। স্বামী থাকবে স্বামীর মায়ের বাড়ীতে। রাত্রে মিলিত হবে। কিন্তু একসঙ্গে ঘরসংসার করবে না।

আরো বিচিত্র ব্যাপার, ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ হতো ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে। পাত্র বাংলাদেশের কুলীন পাত্রের মতো মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হয়ে একরাত্রি কাটিয়ে বিদায় হতেন। পুত্র হলে পিতৃকুলে ঠাঁই পেত না, তার হাতে কেউ অন্ন স্পর্শ করত না। মুখাগ্নির অধিকার স্বীকার করত না। পতিদেবতাও যে পত্নীর হাতে অন্নগ্রহণ করেন তা নয়। পাণিগ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত। এ প্রথাও অপ্রচলিত হয়েছে বা হয়ে আসছে। শুনলুম প্রথমে নামমাত্র ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগপত্র দেন বা নেন, তার কয়েক মিনিট পরে ক্ষত্রিয় পাত্রের সঙ্গে পুনর্বিবাহ বা প্রকৃত বিবাহ হয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নারীমাত্রেরই সহজাত অধিকার। সুতরাং নারীর দ্বিতীয় বিবাহ সমাজে নিন্দনীয় নয়। এখানে বলে রাখি যে এসব আমার শোনা কথা। যার কাছে শুনেছিলুম তার নামটাই ভুলে গেছি। আমরা যে ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশনের বুলি আওড়াই সে ইনটিগ্রেশন আমাদের সামাজিক জীবনে কি ছিল? কবে ছিল? এক এক অঞ্চলে এক এক রকম প্রথা। তামিল তেলুগুরা তো মাতুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেয়।

মৈত্র তাঁর কাজ সেরে ফিরে যাবার জন্যে দিন ফেলেছিলেন বলে আমাকেও ফিরতে হয়। সেইজন্যে স্থানীয় বাঙালীদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনি। এখনো মনে পড়ে রায় বলে এক ভদ্রলোকের কাতর অনুনয়। 'একটা দিন। একটা দিন থেকে যান।' টাটা অয়েল মিলসে কাজ করতেন ভদ্রলোক। প্রবাসে বাঙালীর প্রতি টান একান্ত নিবিড়। জানিনে আমার সাহিত্যিক খ্যাতি তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কিনা।

কেরলের নয়নাভিরাম নিসর্গদৃশ্য উপভোগ করতে হলে নৌকায় করে বেড়াতে হয়। তার জন্যে মনে মনে একটা প্রোগ্রামও তৈরী করেছিলুম বম্বেতে বসে। ইচ্ছা ছিল দক্ষিণের প্রত্যেকটি অঞ্চলেই কিছুকাল কাটাব। কিন্তু একজনের ইচ্ছাকে একটি পরিবারের স্কন্ধে চাপানো যায় না। মৈত্রর সঙ্গে আমি মাদ্রাজে ফিরে যাই ও সেখানেই আরো কয়েকদিন তাঁর অতিথি হই। এখন যার নাম অন্ধ্রপ্রদেশ সেখানেও দু'এক সপ্তাহ যাপন করা যেত। ওয়ালটেয়ারে বা বিশাখাপত্তনমে। সে বাসনাও ত্যাগ করতে হলো।

এখানে বলে রাখি যে নগরটির নাম বিশাখার নামে নয়। বিশাখা ছিলেন রাধার সখী, কিন্তু প্রাচীনকালে রাধা নিজেই তেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন না। বিশাখা নয়, বিশাখ। অর্থাৎ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। দক্ষিণে কার্তিকেয় বা সুব্রহ্মণ্য বা ষণ্মুখ যেমন প্রভাবশালী তেমনি জনপ্রিয়। বিশাখাপত্তনম্‌কে যেমন আমরা বিশাখার সঙ্গে যুক্ত করে ভুল করি তেমনি অনুরাধপুরকে অনুরাধার সঙ্গে যুক্ত করে। সিংহলের সেই প্রাচীন স্থান অনুরাধার নামে নয়; অনুরাধের নামে। অনুরাধ কে ছিলেন তা জানতে হলে বৌদ্ধ পুরাণ মন্থন করতে হবে। আমরা আমাদের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছি। তাই বৌদ্ধ শব্দগুলিকে বৈষ্ণব বা শৈব বা শাক্ত শব্দ বলে ভ্রম করি। বাংলাদেশের বৌদ্ধ দেবতারা এখন হিন্দু।

মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন ডক্‌টর বিমানবিহারী দে। একদিন তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি। কথায় কথায় তিনি বলেন, 'আচ্ছা, বিধুশেখর বসু কেমন কাজকর্ম

করছে?' বিধুশেখর বসু। কে তিনি! আমি বিস্ময় প্রকাশ করি। তখন অধ্যাপক বলেন, 'ও যখন আমার ছাত্র ছিল তখন ওর নাম ছিল বিধুশেখর বসু। ওই নামেই আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তারপর কিন্তু নাম পালটায়। বংশের নিয়ম মেনে ওর নাম হয় অচ্যুত মেনন। তারপর ওকে বেঙ্গলে নিযুক্ত করা হয়। এখন চিনতে পারছেন?' আমি চিনতে পারি। যদিও দেখা হয়নি তখনো। জানতে চাই বংশনাম যদি মেনন হয় তবে বসু কেমন ক'রে হলো। এর উত্তরে দে সাহেব বলেন, 'ওরা দু ভাই ছেলেবেলায় শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়। ওদের বাবা ওখানে বাস করতেন। এদিকে যেমন নায়ার ওদিকে তেমনি কায়স্থ। ছেলেদের দেন কায়স্থ পদবী। নন্দলাল বসুর অনুকরণে বসু পদবীই ওঁর পছন্দ। আবার বিধুশেখর শাস্ত্রীর অনুকরণে বিধুশেখর নামটিও তিনি বেছে নেন। একজনের নাম ও আর আরেকজনের পদবী মিলিয়ে বিধুশেখর বসু। আমি তো ধরে নিয়েছিলুম ও বাঙালী। পরে একদিন রহস্যভেদ হয়।'

অদ্ভুত ব্যাপার। ছুটির শেষে যখন কুমিল্লায় যোগ দিই তার কিছুদিন বাদে মেনন সেখানে বদলী হয়ে আসেন। 'হ্যালো, বিধুশেখর বসু' বলে আমি তাঁকে চমকে দিই।

মাদ্রাজ থেকে যখন ট্রেনে উঠে বসি তখন আমাদের সামনে লম্বা পাড়ি। পথে কারো সঙ্গে আলাপ হবে ভাবিনি। পরের দিন দেখি বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে রেলস্টেশনের দিকে। মাল্যবিভূষিত এক মন্ত্রীকে আমাদের ট্রেনে তুলে দিতে। আ-হা! এ যে আমাদের শান্তিনিকেতনের গোপাল রেড্ডি। এত কম বয়সে মন্ত্রী হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত ওঁর ছাড় নেই। মন্ত্রী হওয়ার সাজা। পরে একসময় ওঁর কামরায় গিয়ে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দিই। জানতে চান মাদ্রাজে ওঁকে খবর দিইনি কেন। দিলে নিয়ে যেতেন রাজাজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। অবিভক্ত মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী। তখনকার দিনে প্রধানমন্ত্রীই বলা হতো। আমার খেয়ালই হয়নি যে বম্বের মতো মাদ্রাজেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় সম্ভবপর। অন্য কোনো মন্ত্রীর সঙ্গেও।

ছুটি নিয়ে দেশভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল চেনাশোনা। দেশকে চেনা, দেশের মানুষকে চেনা। আর দেশের হালচাল শোনা। দেশ বলতে দেশের দক্ষিণাংশ। বম্বে, মাদ্রাজ, মৈশুর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, সিংহল। কতক দেখা হলো, কতক হলো না। তেলুগুদের সঙ্গে চেনাশোনা হলো না বলে মনে খেদ ছিল। খেদ নিয়ে ফিরছি, এমন সময় রেড্ডির আবির্ভাব। কথাবার্তা বেশীর ভাগই হলো রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে। মন্ত্রীমণ্ডলী জমিদারী উঠিয়ে দিতে না চাইলেও প্রজাদের স্বার্থে বহুবিধ সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছেন। অধিনায়ক রাজাজী একজন প্রেরণাদায়ক নেতা। ইনস্পায়ারিং লীডার। মাদ্রাজ তাঁর প্রেরণায় যেসব মহৎ কর্ম করে চলেছে তার অন্যতম হলো মাদকবর্জন বা প্রোহিবিশন।

বেচারা রাজাজী! বছর ঘুরতে না ঘুরতে তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করতে হলো যুদ্ধের ইস্যুতে। বাইরে থাকতে হলো ছ'বছরের উপর। রাজাজীকে তো মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী পদে ফিরতেও দেওয়া হলো না। তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। ক্ষমতাহীন রাজা। তাঁর শাসনপ্রতিভা যুদ্ধের জন্যে আর বিকাশের সুযোগ পেল না। কিন্তু তাঁর কথাই ফলে গেল। দেশ দু'ভাগ হলো। তখন তিনিই হলেন ভাঙা রাজ্যের রাজ্যপাল। নিজের ভবিষ্যদ্বাণীর স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে। দেশভাগের পর রাজ্যপাল রাজাজী একদিন রাজপুরুষদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হন। মনে আছে যে চীফ সেক্রেটারী সুকুমার সেনের পরামর্শে আমি তাঁকে একঝুড়ি মুর্শিদাবাদের আম উপহার দিই। বলা বাহুল্য সবাই মিলে ভোগ করেন। এর পরে তিনি গভর্নর জেনারেল হয়ে দিল্লী চলে যান। সেখানেও ক্ষমতাহীন রাজা। শাসনের সুযোগ পরে অল্পস্বল্প পেলেও মোটের উপর তিনি অদৃষ্টের দ্বারা বিড়ম্বিত। মধ্য পথে ব্যাহত।

এ পথ আমার অজানা নয়। বারো বছর আগে একবার এ পথ দিয়ে গেছি বিপরীতমুখী ট্রেনে বেজওয়াডা। সেখান থেকে বার দুই গাড়ী বদল করে বম্বে। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে ইউরোপ। 'পথে প্রবাসে' শুরু হয় এই পথের বর্ণনায়। এবার 'চেনাশোনা' সারা হয়ে আসছে এই পথের কথায়। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে রেখেছি।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সীমানা পার হবার আগে একটি স্টেশনে মন্ত্রী নেমে যান। আবার তেমনি শোভাযাত্রা, বাদ্যভাণ্ড, মাল্যদান। খুব খুশি হয়ে উপভোগ করছেন দেখা গেল। তিনি কি জানতেন যে মাথার উপরে ঝুলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, যুদ্ধকালে গান্ধীজীর যুদ্ধবিরোধী নীতি, পদত্যাগ, সত্যাগ্রহ, কারাদণ্ড, দণ্ডবিরতি, 'কুইট ইণ্ডিয়া', পুনরায় দণ্ড? প্রায় সাতটি বছর অরণ্যবাস?

তবে একটা কালো ছায়া সকলের উপরে পড়েছিল। সেটা মিউনিকের পর থেকে। বেশ মনে আছে সেই দুর্ভাগা দিনটি, যেদিন দিনের আলো অন্ধকার হয়ে আসে আমার বিষণ্ণ নয়নে। প্রবর্তক আশ্রমে শান্তির খোঁজে যাই। মওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী বলেন, 'চেকদের বলি দেওয়া হলো। অষ্টমীতে বলিদান।'

যাত্রারম্ভের মাথায় সেই যে ট্র্যাজেডী তার ছায়া যেন আমাকে অনুসরণ করছিল। বম্বেতে গিয়ে যেদিন মাদাম ওয়াডিয়ার গেস্ট হাউসে উঠি তিনি আমাদের ডেকে পাঠান আর্যসঙ্ঘের হল ঘরে। সেখানে একজন আশ্রমিকের মৃতদেহ শায়িত। আমরাও শোকসভায় যোগ দিয়ে প্রার্থনা করি।

পথের মাঝখানে আমরা যাত্রাভঙ্গ করে কটকে নামি। সেখানে দু'তিন দিন কাটিয়ে ঢেঙ্কানালে আমার জন্মস্থানে যাই। ছেলেমেয়েদের বলি, 'আর ভাবনা কী! এবার তোমরা যত খুশি খেলা কর। নিজেদের বাড়ি।'

নিয়তির পরিহাস! নিজেদের বাড়ীতেই দ্বিতীয় পুত্রের গুরুতর অসুখ। কটকে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে দিতে হলো। যেদিন শোনা গেল ভালো আছে সেইদিনই সব শেষ। আমার দেশপরিক্রমার বিয়োগান্ত পরিণতি।

এই শোক বহন করে নিয়ে আসে একপ্রকার পুনর্নবতা। রিনিউয়াল। যদিও সেই অর্থে নয় যে অর্থে আমি তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম। রিনিউয়ালের আশাতেই আমি পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম। সে যে এমনভাবে আসবে তা তো কল্পনা করিনি! পথ শেষ হয়ে আসার আগে সে এল ট্র্যাজেডীর বেশে। শোকও মানুষকে পুনর্নব করে। একদিনে নয়, দিনে দিনে। অনেক বছর ধরে।

—

পরিশিষ্ট

ভ্রমণকাহিনী

সম্প্রতি প্রবন্ধলেখকদের এক সম্মেলনে ভ্রমণকাহিনীকারদেরও আসন দেওয়া হয়েছিল। তখন এই প্রশ্নটা আমার মনে ওঠে, ভ্রমণকাহিনী কি প্রবন্ধের ঘরের পিসি, না কথাসাহিত্যের ঘরের মাসি? না একাধারে দুই?

এমন ভ্রমণকাহিনী আমরা অনেক পড়েছি যা গল্প উপন্যাসকেও হার মানায়। যার জনপ্রিয়তা তাদের জনপ্রিয়তাকেও ছাড়িয়ে যায়। কেন, তার কারণ খুঁজতে গেলে পাই অচেনা অজানা দেশের অচেনা অজানা নরনারীর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। কিংবা সমুদ্র বা পর্বত বা মরুভূমির প্রতি দুরন্ত কৌতূহল। যখন পড়তে বসি তখন আমরাও মনে মনে আমাদের কামনা পূরণ করে নিই। কোনোদিন তো ওসব স্বচক্ষে দেখা হবে না। দৌড় তো বড়জোর কাশী কি দিল্লী। ভ্রমণকাহিনী আমাদের সেই স্বচক্ষে দেখার আনন্দ দেয়, যদি লেখকের চোখ আমাদেরও চোখ হয়।

এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে লেখক যার বর্ণনা বা বিবরণ দিয়েছেন তা কল্পিত নয়। তা সত্যিকার। আর সত্যও তো অনেক সময় কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত। আমার জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা কল্পনার চেয়েও আশ্চর্য। এখন আমি যদি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখি তো সেগুলির মধ্যেও কথাসাহিত্যের স্বাদ আসে। কিন্তু এখানে বলে রাখি যে আমি সাধারণত সেগুলি গল্প উপন্যাসের জন্যেই তুলে রেখে দিই। সেগুলি বিদেশে ভ্রমণকালে ঘটেছে বলেই কি ভ্রমণকাহিনীর অন্তর্গত হবে? ঘটেছে আমার জীবনকালে। সেইজন্যে তাদের স্থান আমার জীবনের যেখানে সম্যক প্রকাশ সেই কথাসাহিত্যে।

তা ছাড়া মানুষকে চমকে দেওয়া আমার মতে ভ্রমণকাহিনীর উদ্দেশ্য নয়। চমক লাগাবার মতো ঘটনা তার বাইরে রাখলেই তার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। কিন্তু এ মত অন্যান্য ভ্রমণকাহিনীকারদের নয়। তাঁরা বরং কাহিনী উদ্ভাবন করবেন, সত্য থেকে অসত্যে যাবেন, তবু চমৎকারিণী শক্তিকে হেলায় ঠেলবেন না। তাতে কিন্তু প্রমাণ হলো না যে তাঁদের ভ্রমণকাহিনী তাঁদের ভ্রমণেরই কাহিনী। বরং এই বোঝা গেল যে তাঁরা ওস্তাদ গল্প বলিয়ে। ভ্রমণকাহিনীটা একটা উপলক্ষ মাত্র।

অপরপক্ষে এটাও কি দেখা যায় না যে লেখক তাঁর অভিমতগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে ভ্রমণকথা ভারাক্রান্ত করেছেন? কী দেখলেন কাকে দেখলেন তার দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিংবা সেটাও একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। খোলা মন আর খোলা চোখ নিয়ে ভ্রমণ না করলে লেখা কখনো কাহিনী হয়ে উঠতে পারে না। তা হলে সে প্রবন্ধেরই সামিল। তেমনি তথ্য যদি নিতান্তই জ্ঞানগর্ভ হয়, তার কোথাও যদি রসকষ না থাকে তবে তথ্যভারাক্রান্ত ভ্রমণকথাকে প্রবন্ধের কোটায় ফেলাই ভালো।

আমি নিজে খানকয়েক ভ্রমণের বই লিখেছি, কিন্তু সেগুলি কাহিনী কি প্রবন্ধ তা বলতে পারব না। ভ্রমণ করতে বেরোবার আগেই একটা দেশ সম্বন্ধে যত কিছু জানবার সব আমি জেনে নিতে চেষ্টা করি। যখন সেখানে পৌঁছই তখন আমি ঠিক বিদেশী নই। কয়েকটি ভ্রমণের নিমন্ত্রণ আমি ফিরিয়ে দিয়েছি এই বলে যে আগে থেকে পড়াশুনা করার জন্যে যথেষ্ট সময় নেই। আগে থেকে তৈরি হয়ে যাবার দরুন আমি কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশী দেখতে ও চিনতে পারি। কিন্তু এর উল্টো দিক হচ্ছে আগে থেকে অত বেশী জেনে গেলে অজানাকে অজানা ঠেকে না। অচেনাকে

অচেনা ঠেকে না। কাহিনীর গুণ সঞ্চার করতে পারা যায় না। পাঠকরা যদি কাহিনীখোর হয়ে থাকেন তবে তাঁদের খুশি করা শক্ত হয়। তবে ভ্রমণকাহিনী যে কাহিনীধর্মী হবেই সাহিত্যের ইতিহাস একথা বলে না।

সাহিত্যের ইতিহাসে যেসব ভ্রমণের বই থেকে যায় সেসব বই একটি বিশেষ ব্যক্তির একজোড়া বিশেষ চোখের ও একটি বিশেষ মনের দ্বারা একটি বিশেষ যুগে দেখা বিশেষ একটি দেশের প্রাণচিত্র। আমি যদি আমার গ্রন্থে বিদেশের প্রাণটিকে সঞ্চার করতে পারি তা হলেই আমি সার্থক। সেইজন্যে আমাকে একশো রকমে তৈরি হয়ে বেরোতে হয়। আর তেমন প্রস্তুতি না থাকলে আমি ঘরের কোণে বসে ভ্রমণ কথা পড়তে ভালোবাসি।

তারপর এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের সঙ্গে অবাধে মিশতে না জানলে যাওয়া না যাওয়া সমান। যখনি যাই তখনি বোধ করি ভাষা না জানাটা কত বড় একটা অভাব। ইংলণ্ড আমেরিকা আমাদের এত বেশী টানে তার কারণ আমরা ইংরেজী বলি ও বুঝি। কিন্তু আজকের জগৎ তার চেয়ে ঢের বড়ো নয় কি? কাজেই আরো কয়েকটা ভাষা শিখে রাখা দরকার। অথচ তার জন্যে আমার সময় কোথায়? সেইজন্যে আজকাল আমি ভ্রমণ ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পাইনে। রাশিয়ান ও চাইনীজ এ বয়সে শিখতে পারব না। আর ইংরেজী তো ওদের মনের কথার বাহন নয়।

তা সত্ত্বেও মানুষ চিরকাল আমাকে টানবে। আমি তেমন লোক নই যে জনমানবহীন চাঁদের দেশে পাড়ি দিতে বেরোব। আমার প্রথম দ্রষ্টব্য আমারই স্বজাতি। ওরা কেউ আমার কাছে পর নয়। আর ওদের ঘরও আমার কাছে পরের ঘর নয়। আমার ভ্রমণকাহিনী আমার আপনার জনদের কথা। আপনার ঘরের কথা।

ভ্রমণের সাধ অতি অল্প বয়স থেকেই আমার রক্তে আছে। ছেলেবেলার ভ্রমণগুলোও তখনকার শিশুচিত্তকে বিশ্বভ্রমণের মতো দোলাত। আমার সেই গোরুর গাড়ীই ছিল আমার বিমান আর পাটাতন নৌকাই ছিল লাইনার জাহাজ। সমবয়সীদের আমি আমার তখনকার দিনের ভ্রমণকাহিনী শুনিয়ে অবাক করে দিয়েছি, আর নিজেও অবাক হয়েছি নিজের মুখের কথা শুনে। আমি যে পরে একজন লেখক হব বা ভ্রমণকাহিনী লিখব এর বিন্দুবিসর্গ তখন আমার জানা ছিল না। কিন্তু পেছন ফিরে দেখছি যে এর প্রথম ভাগটা ছেলে বয়সেই শেখা।

অবশেষে সেই দিনটা এলো যেদিন সত্যি সত্যি আমি বিদেশগামী জাহাজে উঠে বসলুম। যদি আদৌ না আসত তা হলে কী হতো? তা হলে কি আমি মানুষ হতুম না? লেখক হতুম না? জীবনদেবতা একভাবে না একভাবে আমার উপর দক্ষিণ হতেন এ বিশ্বাস বরাবরই আমার ছিল। অন্ততঃ আমার দিক থেকে বিকল্প পরিকল্পনার অভাব ছিল না। অনেক সময় তো মনে হয় যে সেটাই হতো আরো ভালো। কিন্তু যেটা হয়েছে সেটা আমাকে অনায়াসে সাহিত্যালোকে সুপরিচিত করে দিয়েছে। ভ্রমণকাহিনী লেখার সুযোগ এনে দিয়ে।

যে আনন্দ আমি পাচ্ছি সে আনন্দ আর দশজনে পাচ্ছে না। যাতে পায় সেই জন্যেই আমি কলম তুলে ধরি। আর সে কলম আপনি আপনাকে চালিয়ে নিয়ে যায় পক্ষিরাজের মতো। আমি শুধু লাগামটা ধরে থাকি। এমনি করে লেখা হয়ে যায় ভ্রমণকাহিনী। আর এমনি করে আমি সৃষ্টির সুখ পাই। মানুষের জীবনে কত রকম সুখ আছে তার মধ্যে সৃষ্টির সুখই সেরা সুখ বলতে পারতুম, যদি না আমার জীবনে প্রেম আসত প্রায় একই সময়ে।

ওর জের চলে উপন্যাস পর্যায়ে। ওসব লেখা হতো না ভ্রমণ না করলে, ভ্রমণকাহিনী লিখে হাত না পাকালে, আত্মবিশ্বাস অর্জন না করলে। আমি তো দেখছি আমার জীবনের ও সাহিত্যচর্চার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সেই সমুদ্রযাত্রা ও বিদেশবাস।

কিন্তু তারপরে আজ তেমন সুযোগ দ্বিতীয়বার জুটল না। চেষ্টা করলে জুটত হয়তো, কিন্তু ইচ্ছাই ছিল না। সব দেখে শুনে আমার ধারণা জন্মেছিল যে আমার সত্যিকার কাজ স্বদেশে ও তার জন্যে যা দরকার তা উদ্ভিদের মতো এক জায়গায় শেকড় গেড়ে বসা। তার থেকে ভ্রমণকাহিনী জন্ম নিতে পারত না। সুতরাং ভ্রমণকাহিনীর পর্ব সেই শেষ।

তা বলে কি ভ্রমণবাসনা আমার ছিল না? ছিল বইকি। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখেছি? ক'জনকেই বা চিনেছি? সরেজমিনে না গেলে রাশিয়াকেই বা বুঝব কী করে? আর আমেরিকাকেই বা জানব কী করে? আর মহাচীনকেই বা কল্পনা করব কী করে? এমনি কত নাম করব? বেশ একটা পিপাসা বোধ করতুম অন্তরে।

কবির মতো আমিও ছিলুম সুদূরের পিয়াসী। কিন্তু তা নিয়ে আমার মনে কোনো খেদ ছিল না। যা দেখেছি যা পেয়েছি তা সারাজীবনকে ভরে রাখার মতো। দ্বিতীয় সুযোগ বিধাতার কাছে প্রার্থনা করিনি, আসেনি বলে নালিশও করিনি। বরং এই ভেবে সন্তুষ্ট রয়েছি যে সাহিত্যে আরো পাঁচটা বিভাগে প্রবেশপত্র পেয়েছি, ভ্রমণকাহিনীই তো একমাত্র বিভাগ নয়। আর ভ্রমণকাহিনী যদিও একজাতের সাহিত্যসৃষ্টি তবু তার চেয়ে বড় জাতের আছে। অনেক বেশী মনোযোগ না দিলে কাব্যও হয় না, কাহিনীও হয় না, মনে রাখবার মতো প্রবন্ধও হয় না। আর সাংসারিক জীবনের কর্তব্যের বোঝা বয়ে যে মানুষ শ্রান্ত তার সৃষ্টিশক্তি মাত্র ছুটির দিনের বিরলতায় সম্যক স্ফূর্তি পায় না।

না, আরো কিছু না করে আবার ভ্রমণকাহিনীতে হাত দেবার ইচ্ছাই আমার ছিল না। যেটা হতো সেটা নেহাৎ গায়ের জোরে হতো। তাতেও কিছু সার্থকতা থাকত, কিন্তু আর্ট হিসাবে তৃপ্তিকর কিছু নয়। তাছাড়া মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া আর দেওয়া না থাকলে একরাশ দৃশ্যের বর্ণনা বা পথের বিবরণ আমার কাছে উচ্চাঙ্গের সিদ্ধি নয়। তার চেয়ে শুয়ে শুয়ে ভ্রমণকাহিনী পড়া ভালো।

আমি ভ্রমণকাহিনীর একজন নেশাখোর পাঠক। গল্প উপন্যাস ফেলে ভ্রমণকাহিনী পড়ি, যে কোনো দেশের। এই তো সেদিন চাঁদ নিয়ে মেতে উঠেছিলুম। চন্দ্রলোকযাত্রা আমাকে আহার নিদ্রা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তা বলে যদি কেউ ভেবে থাকেন যে আমি প্রথম সুযোগেই চন্দ্রলোক ভ্রমণ করে আসব আর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণকাহিনী লিখব সেটা হবার নয়। আমার প্রধান আকর্ষণ দেশ নয় দেশের মানুষ। চাঁদে তো মানুষ নেই। থাকলে হয়তো গিয়ে আলাপ করে আসতুম। চাঁদের মা বুড়ীও যদি থাকত। বিজ্ঞান তাকে অদৃশ্য করে দিয়েছে। চাঁদ এখন আরো নির্জন।

তারপর যে কথাটা আমাকে ভ্রমণকাহিনীর উপর নিরাসক্ত করেছে সেটা হচ্ছে তার সংজ্ঞার দ্ব্যর্থতা। সে কি কাহিনী না প্রবন্ধ? কথাসাহিত্যের ঘরে তাকে আসন দেওয়া হয় না, কারণ সে বানানো নয়, তার সবটাই সত্যঘটনামূলক। প্রবন্ধের ঘরে তাকে মানায় না, কারণ তার কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নেই। সে তা হলে কী? আলাদা একটা বিভাগ? হাঁ, তাই। বিভাগটা পুরাতন হলেও নিত্য নূতন। নূতনত্ব ফুরোবার নয়। কিন্তু যে বইখানি তুমি লিখলে সেটি পাঁচ দশ বছর পরে পুরোনো হয়ে যেতে পারে। নতুন ভ্রমণকাহিনী এসে তাকে আউট অফ ডেট করে দিতে পারে। কাব্যে যা পারে না। উপন্যাসে যা পারে না। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ভ্রমণকাহিনী কালজয়ী হয় তবে তা প্রাণচিত্র বলেই প্রাণবন্ত।

ভালো ভ্রমণকাহিনী হচ্ছে সেই ভ্রমণকাহিনী যা পাঠককেও ব্যক্তিগতভাবে বেড়াতে নিয়ে যায় ও বেড়ানোর আস্বাদন দেয়। পাঠক হিসাবে আমি আজীবন বেড়িয়েছি ও দেশ বিদেশের স্বাদ নিয়েছি। কিন্তু লেখক হিসাবে আর কাউকে সঙ্গী করে পক্ষিরাজে চড়ে ঘুরেছি কি না আমি তা

বলতে পারব না, পাঠকরাই পারবেন। তবে সঙ্গী করার বাসনাটা বরাবরই ছিল। নিঃসঙ্গ হয়ে বেড়াতে আমি চাইনি। কেউ না কেউ আমার সঙ্গ রাখে। হয়তো সে জন অদৃশ্য। আমি যখন দেখি তখন তাকেও দেখিয়ে দেখি। কাজটা মনে মনে চলতে থাকে। পরে এক সময় লেখার রূপ ধরে।

ভ্রমণকাহিনী রচনার কি কোনো বিশেষ কৌশল আছে? কে জানে! হয়তো আছে। কিন্তু ওকথা কখনো ভাবিনি। যেমনটি দেখেছি তেমনটি দেখাতে চেয়েছি! এর মধ্যে কৌশল যদি কিছু থাকে তো সেটা দেখার কৌশল, লেখার কৌশল নয়। সকলে সব জিনিস দেখে না। সকলের চোখে সব জিনিস পড়ে না। বিশেষ একজনের চোখে বিশেষ একটা দৃশ্য ঘোমটা খুলে মুখ দেখায়। সেইজন্যে একই জিনিস একশোজন দেখে থাকলেও একের দেখা অপরের দেখা নয়। এই যে বিশেষ দর্শন এ ছাড়া আর কোনো কৌশল আমি তো জানিনে।

এ ক্ষেত্রে কাহিনীর স্বাদ আনার জন্যে বানানোর রেওয়াজ আছে। রেওয়াজটা আধুনিক কালের নয়, আবহমান কালের। সেইজন্যে বলা হয় ট্রাভেলারস টেল। আজগুবি না হলে সে কাহিনী জমে না। কিন্তু একই দেশে যদি একশো জন পর্যটক যান তাহলে আজগুবি ধরা পড়ে যাবেই। বিশেষ করে আজকের দিনে, যখন টুরিস্ট ট্রাফিকের এমন ভিড়। তবে যেসব দেশের চারদিকে লৌহ যবনিকা সেসব দেশে যে দু'একজন পর্যটক কোনো মতে প্রবেশ পান বা প্রবেশ করে প্রস্থানের পথ খোলা পান তাঁদের বর্ণনার সত্যমিথ্যা যাচাই করা শক্ত। সেইজন্যে আজগুবির দিন এখনো যায়নি।

আজগুবির দিন বোধহয় কোনোদিন যাবেও না। পৃথিবীর আজগুবি ফুরোলেও চাঁদেরটা তো থাকবেই। যতদিন না সেখানেও টুরিস্টদের ভিড় হয়। তারপরে অন্যান্য গ্রহের পালা।

ভ্রমণকাহিনী লেখার কাহিনী

ভ্রমণকাহিনী লিখতে হবে এই ভয়ে আজকাল আমি ভ্রমণ করতেই যাইনে। যদিও আমন্ত্রণ বা আহ্বান মাঝে মাঝে পাই। বেরোবার আগে আমি বিস্তর পড়াশুনা করি, ফিরে আসার পরেও আরো পড়ি, আরো ভাবি। তারপর লিখতে বসি ভ্রমণকাহিনী। এই নিয়ে যদি সময় কেটে যায়, তবে উপন্যাস লিখব কখন? বিশেষ করে বড়ো মাপের উপন্যাস। তার জন্যেও দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হতে হয়। যদি তেমন কোনো দুরভিলাষ থাকে।

সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার স্বপ্ন ছেলেবেলায় রূপকথা শুনে ও পড়ে। রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়ও রূপকথার শেষে থাকে। সুতরাং আমার স্বপ্নেরও। বছর নয় দশ বয়সে আমাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনাতে হতো। তাতেও দেখি সমুদ্রযাত্রা, ভাগ্যপরীক্ষা, রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়। আরো বড়ো হয়ে যখন ইতিহাস পড়ি তখন জানতে পারি চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়েন ভারত ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে যান সমুদ্রপথে সিংহল ও জাভা হয়ে। যাত্রীবাহী পালতোলা জাহাজ ছাড়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। ঘটনাটা খ্রীস্টোত্তর পঞ্চম শতকের। আরো আগে বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রার ও সেখানে উপনিবেশ স্থাপনের কথা বৌদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কোন্ দেশ থেকে যান তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে গুজরাট থেকে। কিন্তু সিংহলীরা নিজেরাই বলে বঙ্গ থেকে। আমার এক বাঙালী বন্ধুকে ওরা যে মানপত্র দেয় তাতে তাঁকে আত্মীয় বলে দাবী করা হয়।

সমুদ্রযাত্রার ঐতিহ্য রূপকথা, কিংবদন্তী, মঙ্গলকাব্য ও ছড়ার ভিতর দিয়ে চিরকাল বর্তমান ছিল, কিন্তু তাম্রলিপ্তি অব্যবহার্য হয়ে যাওয়ায় চট্টগ্রামই ছিল সবে ধন নীলমণি। সেখানে জাহাজ তৈরি হতো। সেখানকার লস্কররা দেশ-বিদেশে যেত। কালাপানী পার হওয়ার জন্যে তাদের সমাজচ্যুত হতে হতো না। কেন যে হিন্দুদের বেলা তেমন শাস্ত্রীয় বিধান আরোপ করা হয় তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ কেউ বলতে পারেন না। তবে তুলনা করে দেখতে পাচ্ছি প্রায় একই সময়ে ভারত, চীন ও জাপান একই রকম ঘরকুনো নীতি অবলম্বন করে। তারা দেশের বাইরে যাবেও না, দেশের বাইরে থেকে আর কাউকে আসতে দেবেও না। মুসলমান শাসকরা অবশ্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুয়ার খোলা রাখতেন। আর হজ যাত্রার অনুশাসনটা না মেনে তাঁদের গতি ছিল না। বহির্বাণিজ্য ক্ষীণ হয়ে আসে। চট্টগ্রামের মতো গোটাকয়েক বন্দর ব্যতিক্রম। লস্কর বা জেলে শ্রেণীর লোকরাও মুষ্টিমেয়। ইণ্ডোনেশিয়া, ইণ্ডোচীন, মালয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। সিংহলের সঙ্গে যদি থাকে তো সেটা স্থলপথে। সে পথও অতি দুর্গম।

কয়েক শতক পরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসীরাই উদ্যোগী হয়ে বাণিজ্য করতে আসে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে। শাসকরাই তাঁদের দেশের ধর্মপ্রচারকদের ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে পর্তুগীজরা নয়। অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, হল্যাণ্ডে এক নবযুগের সূচনা হয়। ধর্মের আওতা থেকে দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিতকলা মুক্তি পায়। পরধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগে। এই যুগটাকে বলা হয় এনলাইটেনমেণ্টের যুগ। যেসব ইউরোপীয় এদেশে শাসনকার্য উপলক্ষে আসেন তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গিয়ে রামমোহন রায় এনলাইটেনমেণ্টের ভিত্তিতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের মিলনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। এর জন্যে ইউরোপের বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি শাস্ত্রবিধান লঙ্ঘন করে

সাগরপারে যাত্রা করেন। তিনি রাজপুত্র না হলেও 'রাজা' খেতাবধারী। এতে ইউরোপীয় অভিজাত মহলে প্রবেশ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিছুদিন পরে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি এমন অকাতরে অর্থব্যয় করেন যে লোকে মনে করে তিনি একজন ইণ্ডিয়ান প্রিন্স। এঁরা কেউ ভাগ্য পরীক্ষা করতেও যাননি, রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়ের আশায়ও না। এঁদের পরে যাঁরা সাগরপারে যান তাঁরা সিভিলিয়ান ব্যারিস্টার বা অধ্যাপক হয়ে ফিরে আসেন, কেউ কেউ প্রেমেও পড়েন। তবে প্রেম থেকে পরিণয় রূপকথা বা মঙ্গলকাব্যের মতো সুগম ছিল না।

ততদিনে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি সামুদ্রিক বন্দর খুলে গেছে। প্রধানত বাণিজ্যের প্রয়োজনে। যাত্রীবোঝাই জাহাজ নিয়মিত যাচ্ছে আসছে। সুয়েজ খাল দিয়ে গেলে পনেরো দিনের মধ্যে মার্সেলিসে পদার্পণ করা যায়। সেখান থেকে বিলেত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার পথ। মাঝখানে প্যারিসে ট্রেন বদল। ক্যালে থেকে ডোভারে চ্যানেল অতিক্রম। কতরকম উদ্দেশ্য নিয়ে কতরকম যাত্রী যান। কেউ বা ধর্ম প্রচারের জন্যে, কেউ বা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, কেউ বা ব্যবসা বাণিজ্যের সুরাহার জন্যে, কেউ বা খেলাধূলা বা আমোদপ্রমোদের জন্যে, কেউ বা নিছক দেশ দর্শনের জন্যে। বই লিখে ওদেশে ছাপানোর কথাও কারো কারো উদ্দেশ্য ছিল। সেটাও বহু লেখকের জীবনে সম্ভব হয়, কিন্তু তার থেকে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি একটা অভাবনীয় ঘটনা। সেটা অকস্মাৎ ঘটে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা টেগোরের জীবনেই। পোয়েট থেকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রোফেট পর্যায়ে উন্নীত হন।

দেশে ফিরে তিনি তাঁর দাদার জামাতা প্রমথ চৌধুরীকে প্রবর্তনা দেন একটি নতুন পত্রিকা বার করতে। নাম রাখা হয় 'সবুজপত্র'। প্রমথ চৌধুরী বছর তিনেক বিলেতে থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছিলেন। তিনি ছিলেন বহুবিদ্য ব্যক্তি। সবরকম বইপত্র কিনতেন ও তারই মধ্যে ডুবে থাকতেন। ইতিমধ্যে তিনি সুরসিক লেখক রূপেও অন্যান্য পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত পরিসর পাননি। সাহিত্যিক মহলে তিনি নিঃসঙ্গ। 'সবুজপত্র' বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে সমজদার সমাজে সাড়া পড়ে যায়। তাঁর পত্রিকার প্রধান আকর্ষণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায়ের কবিতা, উপন্যাস ও গল্প। ইউরোপের আধুনিকতম সাহিত্যের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলা। প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল তাঁর দোসর। ছোটোখাটো একটা মণ্ডলীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ভাষায় এঁরা একটা যুগান্তর নিয়ে আসেন। চিন্তাধারায় এঁরা সর্বত্রগামী। রায়তদের সমস্যা নিয়ে যে এঁরা ভাবতেন না তা নয়। কতকটা লিবারল, কতকটা র‍্যাডিক্যাল এঁদের মতামত। এঁদের কালের পক্ষে এঁরা তরতাজা। ইউরোপের কয়েকটি দেশের সাহিত্যেও একদল 'সবুজ' বা 'গ্রীন' ছিলেন। চলতি ভাষার অভিমুখেই তাঁদের অভিযান। চিন্তাধারাও অনেকটা একই রকম।

বারো বছর বয়সে আমাদের হাই ইংলিশ স্কুলের ম্যাগাজিন রুমের ভার পেয়ে হাতে স্বর্গ পাই। হঠাৎ 'সবুজপত্র' আবিষ্কার করে হকচকিয়ে যাই। প্রথমেই পড়ি 'চার ইয়ারী কথা'র তিন নম্বর কথা। রিনি আমাকে টানে। ভিনাস ডি মাইলো আকর্ষণ করে। পরে সবটা পড়ি। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে না গেলে চলে না। যেতেই হবে একদিন না একদিন, যেমন করেই হোক। ইতিমধ্যে প্রস্তুত হতে হবে সর্বতোভাবে। ফরাসী বই একখানা যোগাড় করে পড়ি। কিন্তু বেশীদূর এগোতে পারিনে। দুটো বিদেশী ভাষা একই সঙ্গে শিখতে পারব কেন? ইংরেজী ছিল অবশ্যপাঠ্য। বাবা আমাকে ন'দশ বছর বয়স থেকেই সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পড়তে দিতেন। বুঝি আর না বুঝি পড়তেই হবে। না বুঝলে ইংরেজী অভিধান দেখতে হবে। স্কুলপাঠ্য বই ছিল বিলেতে ছাপা। ওদেশের ছেলেদের জন্য লেখা। পুরস্কারও পেয়েছি বিলেতে ছাপা ছেলেদের বই। কিছু বুঝি, কিছু বুঝিনে। তবু পড়ে যাই।

স্কুল লাইব্রেরীতে ছিল এনতার ইংরেজী বই। আমার সেখানে অবাধ প্রবেশ। নানা বিষয়ের বই নাড়াচাড়া করতে করতে একটি বিলিতী সিরিজের চারখানা বই আবিষ্কার করি। কেনা হয়েছে অনেকদিন আগে। কেউ পাতা কাটেনি। আমিই প্রথম পাঠক। নিষিদ্ধ বিষয়। সেক্‌স। খান দুয়েক পড়ে আর পড়িনে। পরে বুঝতে পারি বিলেত যারা যায় ওটাও তাদের জানা দরকার। কলেজে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কারের টাকায় একবার কিনি মারী স্টোপসের কেতাব। ইংরেজ প্রিন্সিপালের জ্ঞাতসারে, সুতরাং নিষিদ্ধ নয়। ওটাও আমার প্রস্তুতির অঙ্গ। তখন জানতুম না যে যাওয়া হবেই। হলো আই. সি. এসে সফল হয়ে। সেটাও পূর্ব পরিকল্পিত নয়।

ভ্রমণ করার সুযোগ পাওয়া এক জিনিস, ভ্রমণকাহিনী লেখায় অনুপ্রেরণা পাওয়া আরেক জিনিস। তেমন কোনো অনুপ্রেরণা আমি আগে কখনো পাইনি। তেমন কোনো সংকল্প আমার ছিল না। এটা হঠাৎ মনে আসে 'বিচিত্রা'র আবির্ভাবে ও তার জন্যে লেখা পাঠানোর অনুরোধে। লেখা শুরু হয়ে যায় বোম্বাইতে জাহাজ ধরার প্রাক্কালে। পথেই যার শুরু তার প্রায় সমস্তটাই লেখা হয় প্রবাসে। বাকীটুকু দেশে ফিরে এসে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওটা বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' পাঠেরই ফলশ্রুতি। ওর প্রস্তুতি চলছিল দশ বছর ধরে। আমার অজ্ঞাতসারে। শুধু ভাষা ও স্টাইলের দিক থেকে নয়, আইডিয়ার ও আইডিয়ালের দিক থেকেও। আমিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কামনা করেছি। প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিককে মেলাতে চেয়েছি। বাঙালীকে ইংরেজ ফরাসীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে হবে এটা আমারও অভিলাষ। বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উঠবে এটা আমারও সাধনা। তার জন্যে তাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ছাড়তে হবে, সামাজিক সংকীর্ণতা পরিহার করতে হবে। গতানুগতিক জীবনধারা থেকে মুক্ত হতে হবে। সাত সাগর তেরো নদীর পারে না যেতে পারলে এসব সম্ভব হবে না। এমনভাবে লিখব যাতে পাঠকের মনে বিদেশযাত্রার আগ্রহ জাগে। যারা যেতে পারবে না তারা অন্তত আমার লেখা পড়ে বিদেশের পরশ পাবে। পরে যারা আসবে তারা আমার কালের ভাবনাচিন্তার স্বাদগন্ধ পাবে। দেশদর্শন তো কেবল দৃশ্য অবলোকন নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের চেনাশোনা, ভাববিনিময়, মন দেওয়া নেওয়া। যেখানেই যাই সেখানেই চেষ্টা করি পরকে আপন করতে। প্রধান অন্তরায় ভাষাজ্ঞানের অভাব। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান আয়ত্ত করতে পারলে যেটা সহজসাধ্য হতো সেটা কেবলমাত্র ইংরেজী জেনে দুঃসাধ্য। ইংরেজমাত্রেরই উচ্চাভিলাষ উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে কণ্টিনেণ্টে গ্রাণ্ড টুর করতে বেরোনো। আমার জীবনে সে উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়েছিল। এর থেকে ভ্রমণকাহিনী উপজাত হলেও ভালো, না হলেও ভালো। পরে দেখা গেল 'সত্যাসত্য' শীর্ষক ছয় খণ্ড উপন্যাসও হয়েছে।

তেইশ বছর বয়সে আমি খোলা মন ও খোলা হৃদয় নিয়ে গেছি। বিয়ে করে গেলে বা বাগ্‌দত্তা হয়ে গেলে দ্বিতীয়টা সম্ভব হতো না। আমার উপন্যাসের নায়ক বাদলের জীবনের ট্র্যাজেডী সেই থেকে। অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন সেটা কি নিবারণ করতে পারা যেত না? আমি বলেছি, না। ওর মতো অবস্থায় পড়লে আমারও একই দশা হতো। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েও দেখি আমার বিলেত যাওয়া হবে না, কারণ হাতে তিন মাসের খরচ নিয়ে যাওয়া চাই, সেটা সরকার দেবেন না, গুরুজনের সামর্থ্য নেই। কাকাদের একজন বলেন, 'বিয়ে করো, আমার কাছে প্রস্তাব এসেছে, সদ্‌বংশের মেয়ে, বৌকেও নিয়ে যেতে পারবে।' আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে আমাদের বংশে কেউ বরপণ দেয়ও না, নেয়ও না। এক সমাজসংস্কারক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি আমাকে বলেন তিন হাজার টাকার লাইফ ইনশিওরান্স করে তাঁর কাছে পলিসিটা বাঁধা দিতে। সুদটা ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কের চেয়ে কিছু বেশী হওয়া চাই।

আমি অকূলে কূল পাই। বিলেতে গিয়ে পরে সেটা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

হৃদয় খোলা রেখে না গেলে ভ্রমণও হতো, ভ্রমণকাহিনীও হতো, কিন্তু তাতে রং ধরত না। তেত্রিশ বছর বয়সে গেলে মনটাও কি খোলা থাকত? না, সেটাও সম্ভব হতো না। ততদিনে আমি ইংরেজদের উপর হাড়ে চটা। ওরা মুসোলিনিকে আবিসিনিয়া দখল করতে দিয়েছে, হিটলারকে চেকোস্লোভাকিয়া ছেড়ে দেবার তালে আছে। আর এদেশেও তো কমিউনাল এ্যাওয়ার্ড চাপিয়ে দিয়ে ন্যাশনালিজম আর ডেমোক্রাসী দুটোকেই রাহুগ্রস্ত করেছে। যে দুটো ওদেরই প্রবর্তন। তখন অবশ্য দূরবীন দিয়ে দেখতে পাইনি যে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেশভাগ ও প্রদেশভাগ।

সকলের দৃষ্টিভঙ্গী একই রকমের নয়। কারো দৃষ্টি রসিকের দৃষ্টি, কারো ক্রিটিকের। কারো দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি, কারো পণ্ডিতের। কারো দৃষ্টি টুরিস্টের দৃষ্টি, কারো অনুসন্ধিৎসুর। কারো দৃষ্টি তীর্থযাত্রীর দৃষ্টি, কারো ধর্মপ্রচারকের। যাদৃশী দৃষ্টি সৃষ্টিও তাদৃশী। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কত ভাষায় কত বিচিত্র ভ্রমণকাহিনী লেখা হয়েছে। অনেকগুলি কালোত্তীর্ণ হয়েছে। আমার বই হাল্কা হাতের লেখা। ওটা ভ্রমণকাহিনীও নয়। প্রবাসের জীবনযাত্রার ব্যক্তিগত ইমপ্রেসন। ও জিনিস বেশীদিন টিকে থাকার কথা নয়। তেমন কোনো মোহ আমার ছিল না। এখনো নেই। যুগটাই বাসী হয়ে গেছে। কিন্তু লেখক কী করে জানবে তার লেখার দৌড় কতদূর যাবে। সেকালের বহু ভ্রমণকাহিনী একালেও তাজা। তথ্যের জন্যে নয়, তত্ত্বের জন্যে নয়, রসের জন্যে, রূপের জন্যে। প্রাণশক্তির জন্যে, যৌবনশক্তির জন্যে। ভ্রমণকাহিনীও আর্ট হতে পারে। 'আর্ট' কথাটি আমি বারো তেরো বছর বয়সে 'সবুজপত্রের' পাতাতেই পাই। তখন থেকেই মনে গেঁথে যায়। তা নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা ও ভাবনাচিন্তা করি। টলস্টয়ের, রবীন্দ্রনাথের, রম্যা রলাঁর দিকে তাকাই। প্রমথ চৌধুরীই একমাত্র দিশারী নন। তাঁর মধ্যে একটা কাঠিন্য বা আঁটসাট ভাব ছিল। আমি ঢিলেঢালা মেজাজের মানুষ। খালি গায়ে থাকি, খোলামেলা জায়গা পছন্দ করি। বজ্র আঁটুনী আমার জন্যে নয়। বেশী রকম সামাজিক লোক হতে গিয়ে তিনি স্বতঃস্ফূর্তির মূল্য দিয়েছেন। সেইখানেই তাঁর সীমাবদ্ধতা।

ঠিক সময়ে না পৌঁছলে আনা পাভলোভার ব্যালে দেখতে পেতুম না, পাডরেভ্স্কির পিয়ানো তথা ক্রাইজলারের বেহালা শুনতে পেতুম না, শালিয়াপিনের গান শোনা হতো না, বার্নার্ড শ তথা বারট্রাণ্ড রাসেলের বক্তৃতা শোনা হতো না, রম্যা রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হতো না। বহু বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী ও অপেরা সিঙ্গার তখনো জীবিত ছিলেন। কনসার্ট হলে, আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে প্রতীচ্য সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে অল্পস্বল্প পরিচিত হয়েছি। সেটা অবশ্য নিছক পল্লবগ্রাহিতা। খানিকটে হীরো ওয়ারশিপও বটে। কেবলি মনে হয়েছে যে এঁদের তুলনায় আমি কীই বা করেছি বা এক জীবনে করে যেতে পারি! এঁদের উচ্চতার সঙ্গে তুলনীয় প্রাচ্যের ক'জনেরই বা উচ্চতা! স্বদেশে অতীত নিয়ে আস্ফালন করা বৃথা। বর্তমান নিয়ে গৌরব করার কতটুকু আছে? কচের মতো মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা যদি নিয়ে আসতে না পারি তো গরিব দেশের টাকা কেন বড়লোকের দেশে উড়িয়ে দিতে যাই? প্রোবেশনার হিসাবে যেটা পাই সেটা তো ভারত সরকারেরই দেওয়া। তার থেকে বাঁচিয়েই আমাকে ইউরোপের নানান দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ছেলেবেলায় আমার এক সহপাঠী ছিল, তার কাকা থাকতেন আমেরিকায়। সেই থেকে আমেরিকায় গিয়ে ভাগ্যপরীক্ষার সাধ লালন করেছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি। বিলেত থেকে আমেরিকা পাড়ি দেবার জোগাড় একবার হয়েছিল। পনেরো দিনের না তিন হপ্তার রাউণ্ড ট্রিপ। কোনোরকমে কুলিয়ে যেত। কিন্তু বন্ধু পরামর্শ দেন সেই খরচে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী বেড়ানো যায়। যদি দু'জনে মিলে বেড়াই। সেই ভালো। আমেরিকা এত বিশাল দেশ যে জাহাজে যাওয়া আসার দিন দশেক বাদ দিলে হাতে যে ক'টা দিন থাকে তা দিয়ে নিউ ইয়র্ক ও শিকাগোর বুড়ী

ছোঁওয়া যায়, তার বেশী নয়। ওটা হলো টুরিস্টের ভ্রমণ। টুরিস্টের মতো দর্শন। পেছনে বিশেষ কোনো প্রস্তুতি ছিল না। যেমন ইউরোপের বেলা।

একটা এ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোথাও মধ্যবিত্ত পরিবারে পেয়িং গেস্ট, কোথাও অভিজাত অথচ অভাবগ্রস্ত পরিবারে পেয়িং গেস্ট, কোথাও খ্রীস্টীয় ধর্মশালায় সামান্য ব্যয়ে অতিথি, কোথাও ফোর্থ ক্লাস রেলগাড়ীতে চড়ে সসেজ খেয়ে মধ্যাহ্নভোজন, কোথাও রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে ট্রেন ধরা, কোথাও রাইনের বুকে বা ডানিউবের বুকে স্টীমারযাত্রা, কোথাও হোটেলের আরাম। লোকগুলি সব জায়গায় ভদ্র, সাহায্য করতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যায়। অথচ এরাই দশবছর আগে দানবের মতো লড়েছে। এগারো বছর বাদে মহাদানবের মতো লড়বে। না, সে সময় আমরা অনুমান করতে পারিনি। তবে আমার সহজবোধ আমাকে বলছিল জার্মানীকে নিয়ে আবার বিপদ বাধবে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়কে ওরা মন থেকে মেনে নেয়নি।

সঙ্গে একখানা বেডেকারস গাইড ও একখানা কুক্‌স টাইম টেবল থাকলে অনায়াসেই কণ্টিনেণ্ট ঘুরে আসা যায়। কিন্তু বাঁধা পথে চললেও পদে পদেই চমক লাগে। কিছু না কিছু ঘটে যা অপ্রত্যাশিত। অ্যাডভেঞ্চার তো যৌবনের ধর্ম। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরপুত্র ও কোটালপুত্রও তো অ্যাডভেঞ্চারেই বেরিয়েছিলেন। তবে আমরা কেউ রাজকন্যার দেখা পাইনি। যেটি আমার খোঁজে বার বার আসত ও দেখা পেলে প্রীত হতো সেটি একটি প্রিয়দর্শিনী দর্জি কন্যা। আপনারা হাসছেন যে! ওরাই তো এখন পূর্ব জার্মানী চালাচ্ছে। ওদের শ্রেণীর লোকই তো অর্ধেক ইউরোপের চালক। ভদ্রলোকরা কোথায়?

বানপ্রস্থের বয়সে জাপানে গিয়ে আমার একাধিকবার মনে হয়েছে, স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে কী ভুলই না করেছি! আমার কক্ষে তাঁর জন্যেও একটি শয্যা সংরক্ষিত ছিল। নিমন্ত্রণ কর্তারা ধরে নিয়েছিলেন যে অতিথিরা জোড়ে আসবেন। এসেওছিলেন একদল ফরাসী লেখক। জাপানীরা অত্যন্ত বিবেচক জাতি। তা নইলে এত উন্নতি করে! তাদের সরাইতে টেম্পোরারি ওয়াইফের জন্যে শয্যার একাংশ নির্দিষ্ট থাকে। মেজের উপর ঢালা বিছানা। যেমন নরম তেমনি চওড়া। লেপটাও কী মোলায়েম ও প্রশস্ত! এককথায় ফুলশয্যা। বৌ থাকলে বৌ। না থাকলে একজন মাসাজ করার জন্যে আপনা থেকে এসে হাজির হবেন। আমার এক বন্ধুর বেলা তেমন ঘটেছিল। তিনি যা বলেন তার মর্ম, 'পতিযোগ্য নহি, বরাঙ্গনে।' কাওয়াবাতা যে উপন্যাসটির জন্যে নোবেল প্রাইজ পান সেই 'স্নো কান্ট্রি'তে এমনি এক সরাইতে একত্র স্নান ও একত্র শয়নের মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। বিবাহিত পুরুষ। স্ত্রীকে তো বিট্রে করেই, সঙ্গিনীকেও নামমাত্র দস্তুরি দিয়ে বিদায় নেয়। যদিও বেশ বড়লোক।

এক এক দেশের এক এক আচার। অনুসন্ধান করলে অনেক কিছুই জানা যায়। কিন্তু সেরকম অনুসন্ধিৎসা আমার ছিল না। ইংলণ্ড প্রবাসের দ্বিতীয় বছর যখন আবার জার্মানীতে যাই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। ড্রেসডেনের এক সম্ভ্রান্ত হোটেলেই উঠি। যাঁর সঙ্গে যাই তিনি এক বিশিষ্ট মহিলা। উচ্চবংশীয়া। সঙ্গীত আর চিত্রকলা নিয়েই থাকেন। রাস্কিন, মরিস ইত্যাদির শিষ্যা। মোটা খদ্দর ছাড়া পরেন না। হাতে তৈরী জুতো ওখানে পায়ে দেন না। দীনহীনদের জন্যে তাঁর বান্ধবী এক আশ্রম চালান। সেইখানেই বছর দুই বাদে অতিথি হন মহাত্মা গান্ধী ও দলবল। জার্মানীতে আমরা এক হোটেলে উঠলেও এক ঘরে থাকিনে। যার যার ঘর তার তার। কখনো দূরে দূরে কখনো কাছাকাছি। ড্রেসডেনে পাশাপাশি। এখন হয়েছে কী, আমার ঘরের দেওয়ালে যে একটা চোরা দরজা আছে সেটা আমি দৈবাৎ আবিষ্কার করি। আলমারির আড়ালে লুকানো। একটু একসপেরিমেণ্ট করার জন্যে দরজাটা খুলে ফেলি। দেখি ওঘরে যাওয়ার পথ। বাইরের কেউ টের

পায় না, ভিতরে যিনি শুয়েছেন তিনিই ভয় পেয়ে চমকে ওঠেন। না, চোর নয়, ডাকাত নয়, আমিই। খেয়াল হয়নি যে ওটা অনধিকার প্রবেশ। প্রাইভেসী ভঙ্গ। দুটো একটা মিষ্টি কথা বলে পালিয়ে আসতে হয়।

আমি তখন অবিবাহিত। আমার সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাওয়ার মূলে ছিল রূপকথা ও মঙ্গলকাব্যের শ্রীমন্ত উপাখ্যান। আমার বাল্য সহপাঠীর কাকাও তো চোদ্দ বছর বাদে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন কচের মতো দেবযানীকে বিয়ে করে। কচের মতো না হোক, হতে তো পারত। আমার গুরুজনকে দেখাবার মতো নজীর পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তবে বিদেশে থাকতে তেমন ভাগ্য হয়নি। দৈবাৎ বরাত খুলে যায় দেশে ফেরার পর। রূপকথা কখনো কখনো সত্য হয়।

ভ্রমণ থেকেই হয় ভ্রমণকাহিনী। কিন্তু ভ্রমণকারীদের সকলের হাত দিয়ে নয়। যাঁদের হাত দিয়ে হয় তাঁদের যদি লেখার হাত না থাকে তো ঢের বেশী অভিজ্ঞতাও সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ করে না। এক শুভার্থী আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি কীই বা দেখলে, কীই বা জানলে, রায়! আমার তুলনায় শিশু। তুমি লিখতে পারো, আমি পারিনে। তাই তুমি ফাঁকি দিয়ে নাম করে নিলে। আমি অচেনা অজানা থেকে গেলুম।'

না, ভুল লিখেছি। স্মৃতির ভুল। কথাটা বলেছিলেন আমার ভ্রমণকাহিনী পড়ে নয়, আমার ভ্রমণভিত্তিক উপাখ্যান পড়ে। উপাখ্যানে যতখুশি বানিয়ে বল্যর রেওয়াজ আছে। সকলেই জানে ওটা কল্পনাশ্রয়ী। 'চার ইয়ারী কথা' সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য চিরকালের মতো গোপন রয়ে গেল। প্রমথ চৌধুরী সেটা উদ্ঘাটন করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মুখে মুখে রচিত 'আত্মকথা'য়। লিখে নিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। পাণ্ডুলিপিটার কতক অংশ বই হয়ে বেরোয়। কতক দেওয়া হয় বুদ্ধদেব বসুকে। তিনি সেটা প্রেসে দেন। প্রেস ছাপে তার একাংশ। একাংশ নষ্ট হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। তাঁকে যা দেওয়া হয়নি তা ইন্দিরা দেবী আমাকে দেন কোথাও প্রকাশ করতে। আমি দিই 'পূর্বাশা'কে। ছাপা হয়। সবচেয়ে আপসোসের কথা যে অংশটা নষ্ট হয় সেটাই ছিল বিলেতের প্রবাসবৃত্তান্ত। তাতেই ছিল এক সত্যিকার নারীর প্রসঙ্গ। সেই বিচিত্ররূপিণীই 'চার ইয়ারী কথা'র চার ইয়ারের চার নায়িকার মডেল। সম্ভবত চার নায়কও একই নায়কের রূপভেদ। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাকে ভাঙিয়ে যা বানিয়েছিলেন তাতে খাদ মেশানো ছিল বলে তা মেকি নয়।

ফাঁকি তখনি হয় যখন কেউ ভ্রমণকাহিনী লিখতে কলম ধরে সেই ছলে গাল গল্প ফেঁদে বসেন। পাঠকরা বিভ্রান্ত হন। সেটা সাহিত্যনীতিবিরুদ্ধ। সে রকম কাজ আমি কখনো করিনি। আমার ভ্রমণকাহিনীর থেকে আমি অনেক প্রসঙ্গই ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছি, দিলে সেসবও কিছু কম চটকদার হতো না। সত্য অথচ গালগল্পের মতো শোনাত। নিজেকে বা নিজের বন্ধুদের নায়ক করতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। নিজের বা তাদের বান্ধবীদের নায়িকা করতে তো কদাচ নয়। সাহিত্যেরও কয়েকটা বিধিনিষেধ আছে। লঙ্ঘন করলে ফ্যাসাদে পড়তে হয়। ভ্রমণকাহিনী থেকে কোনো কোনো প্রসঙ্গ বাদ যেতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে কাল্পনিক উপাখ্যান মিশিয়ে দেওয়া উচিত নয়। যদিও সেটাই বাজারে চলে বেশ। তার থেকে ফিল্মও হয়। হয় না যেটা সেটা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য।

মানুষমাত্রেরই অন্তরে একটি রাধা আছে। বাঁশি শুনে সে আর স্থির থাকতে পারে না। চেনে না লোকটা কে। জানে না লোকটা কেমন। তবু সে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। পথ হয়তো অপথ বা বিপথ। পায়ে কাঁটা ফুটছে। রাত অন্ধকার। বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজছে। তবু তার যাওয়া চাই। আবার ঘরে ফিরবে কি না কে জানে! ফিরলে হয়তো কপালে ঝাঁটা আছে, লাথি আছে। প্রায়শ্চিত্ত বা সমাজচ্যুতি। হয়তো খেতে না পেয়ে মরতে হবে। তবু সে যাবেই। বাহির তাকে ডাকছে, বিদেশ তাকে ডাকছে। ঘর তাকে বাধা দিচ্ছে। দেশ তাকে টেনে রাখছে। কিন্তু বাঁশি যে তাকে পাগল করে

তুলছে। আমারও একটা বয়সে সেই 'রাই উন্মাদিনী' দশা ছিল। কন্টিনেন্টাল সাহিত্য পড়ে, ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমি আকুল বোধ করেছিলুম।

এমনি এক বাঁশির সুর শুনেছিলেন রামমোহন, শুনেছিলেন মাইকেল, শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র। শুনেছিলেন জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বিধানচন্দ্র। শুনেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল গুপ্ত। শেষোক্ত তিনজন বাড়ী থেকে পালিয়ে কলকাতা বন্দরে জাহাজে চেপে হাওয়া হয়ে যান। আমরাও তিন বন্ধু—দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমি—বোম্বাই থেকে জাহাজে উঠে সাগর পাড়ি দিই। যারা ঘরে পড়ে রইল তারা বাইরের কথা শুনতে চায়, তাদের শোনানো উচিত, এটাই ছিল আমার অন্তরের তাগিদ। ভিতর থেকে এই বাঁশির সুর শুনেই আমি লিখতে শুরু করি।

রুশ সাহিত্যকেও আমি ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্তর্গত বলে জানতুম। টলস্টয়ের উপকথা পুরস্কার পেয়েই আমি তার থেকে একটি বাংলায় অনুবাদ করি। 'প্রবাসী' সেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করে। বাংলাসাহিত্যে সেই আমার প্রথম পদক্ষেপ। তখন থেকেই আমি রুশ সাহিত্যের পক্ষপাতী পাঠক। রাশিয়া দেখে আসতে আমার ইচ্ছার অভাব ছিল না, ছিল অর্থের তথা অনুমতির অভাব। বছর দশেক পরে স্টালিনের অত্যাচারে মোহভঙ্গ হয়। স্বাধীনতার বছর দশেক বাদে বার দুয়েক সুযোগ পাই, কিন্তু নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠে না। সাহিত্যিক বন্ধুরা যাঁরা গেছেন তাঁদের প্রশ্ন করে জেনেছি তাঁরা সে দেশের কোনো সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে বা তাঁদের কথা শুনতে পারেননি। বছর দুই তিন থেকেও যে তাঁদের মন জেনেছেন তাও নয়। যেখানে মনের আদান প্রদান নেই সেখানে গিয়ে আমি যা শিখতুম তা বাড়ী বসেও শিখতে পারি। তাঁদেরকেই বা আমার কী বলার আছে? আমিও টলস্টয়, ডসটয়েভ্স্কি, টুর্গেনিভ, চেকভের মতো সেকেলে একজন লেখক। তাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। ভারত প্রসঙ্গে দু'চার কথা বলতে পারতুম। কিন্তু সেটাও তো গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের ভারত! স্বরাজোত্তর ভারত সম্বন্ধে গর্ব করার মতো কী আছে? আগে তো গর্ব করবার মতো কিছু দেখি।

চীন সম্বন্ধেও আমার ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু চীন ভারত সংঘর্ষের পর মন ভেঙে যায়। তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা শুনে মোহভঙ্গ হয়। জাপানে যাবার জন্যে তেমন কোনো আগ্রহ বোধ করিনি, তবে আমার এক ভাইকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম, সে ফিরে এসে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। চীনদেশে গেলে জাপানেও যেতুম, নয়তো নয়। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জাপানে যাবার সুযোগ মিলে যায়। উপলক্ষ আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. কংগ্রেস। ভারতীয় কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েকজন বাছা বাছা সাহিত্যিক যাচ্ছেন, আমিও যেন যাই। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে সাহিত্যিকরা আসবেন, তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপের উপযুক্ত স্থান কি জাপান? সেটা তো কট্টর জাতীয়তাবাদী দেশ। গিয়ে দেখি আশ্চর্য কস্মোপলিটান আবহাওয়া। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সত্যিকার মিলনকেন্দ্র। কংগ্রেস উপলক্ষে মিলিত হলেও আমরা অন্যান্য উপলক্ষ একই কালে পাই। আমি আরো কিছুদিন থেকে গিয়ে আরো বেশী দেখি ও শিখি। জাপানের বর্ষীয়ান সাহিত্যিকদের বাড়ী গিয়ে আলাপ করি। জাপানে এখন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। বর্ষীয়ানরা প্রাচ্যকেই ভালোবাসেন, প্রতীচ্যকে নয়। তাই কংগ্রেসে যোগ দেননি। সেখানে সবাই প্রতীচ্যপ্রেমিক। জাপানী চিত্রকলাতেও একই দোটানা।

কংগ্রেসে না হলেও তার বাইরে রুশপ্রেমিকও ছিলেন। তাঁরা মস্কো থেকে আনিয়েছিলেন বিখ্যাত বলশয় ব্যালে। ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন আমার কলেজ জীবনের চেনা। তাঁর অতিথি হয়েও কয়েকদিন কাটাই। তিনিই আমাকে নিয়ে যান বলশয় ব্যালে দেখতে। নইলে টিকিট পাওয়া যেত না। রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের মধুর সম্পর্ক। তাই ব্যালেরিনা ও ব্যালে নর্তকরা তাঁর ভবনে

ভোজ খেতে আসেন। তাঁদের সঙ্গে মেশার সুযোগ মেলে। আরো একটি পার্টিতেও মিলেছিল। জাপানী বন্ধুদের সৌজন্যে থিয়েটারও দেখি। মঞ্চের আড়ালে গিয়ে কথাও বলি ও শুনি। পাপেট থিয়েটার জাপানের সম্পদ। সেটাও দেখা হয়, মঞ্চের আড়ালে গিয়ে আলাপও হয়। কাবুকিও দেখি, নো নাটকও দেখি। সব চেয়ে আনন্দ দেয় সেকালের বৌদ্ধ মন্দির ও মঠবাড়ী।

ইউরোপে আমি দু'বছর ছিলুম, জাপানে মাত্র একমাস। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী লিখতে গিয়ে দেখি আকারে জাপানেরটাই বড়ো। একবছর ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো লিখি। সেটা যখন বই হয়ে বেরোয় তখন একটা পুরস্কারও পায়। সেই সুবাদে পশ্চিম জার্মানী থেকে একটা নিমন্ত্রণও আসে। তাঁদের আগ্রহ দেখে আমিও আমার হারানো যৌবনকে চৌত্রিশ বছর বাদে খুঁজতে বেরোই। সেটা আমার বিস্মৃতির অতলে ফেরা। সেই সুযোগে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে দিন কয়েক কাটিয়ে আসি। সেটা আমার সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি। একজন বাদে কেউ আমাকে চিনতে পারে না, আমিও কাউকে চিনতে পারিনে। সেই একজনেরও চেহারা বদলে গেছে। আমারও চেহারা কি একই রকম আছে? ভাগ্যে পুনর্দর্শন হলো। এ জন্মে আবার হবে তাঁর কিংবা আমার কারো সে বিশ্বাস ছিল না। দেখা গেল অঘটন আজও ঘটে। সেটা হলো আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন। তার জন্যে আমার নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

দেশে ফিরে আবার ভ্রমণকাহিনী লিখি। কম পরিশ্রম করিনি। কিন্তু এবারকার দিনগুলি 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল' তো নয়। সে ফীলিং পাব কোথায়! আর ফীলিং না থাকলে ভ্রমণকাহিনী হৃদয় স্পর্শ করে না। সবাই আজকাল আকাশপথে ইউরোপ ঘুরে আসছে, আমার কাছ থেকে নতুন কথা কী শুনবে? আমার এবারকার প্রধান কাজ ছিল সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর ভাববিনিময়। সেটা আশানুরূপ হয়নি। আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের দিক থেকে আগ্রহ তেমন একটা নেই। যে-কোনো কারণেই হোক ভারত হচ্ছে ব্যাক নম্বর। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ভাঙিয়ে তো বেশী দিন চলে না। এত সব বাজে লোককে ওসব দেশে পাঠানো হয় যে ভারত সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা একান্ত স্বাভাবিক। তারপর ভারতের বৈদেশিক নীতি চক্ষুঃশূল। ওঁদের যারা শত্রু, কেন তাদের সঙ্গে ভারতের এত দহরম মহরম? তারপর ভারতের একাংশ পাকিস্তান নাম নিয়ে দিনরাত ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে। তার দিকেই টান বেশী, কারণ তার সঙ্গেই সামরিক চুক্তি। পশ্চিমের লোকের ধারণা ভারতই কাশ্মীর আক্রমণকারী। ভারতের পক্ষে হাজার ওকালতী করলেও কেউ কর্ণপাত করবে না। ইতিমধ্যে ভারত গোয়া কেড়ে নিয়েছে। কালা আদমীরা গোরা আদমীদের ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে অপরাধের কি মার্জনা আছে? রাজনীতিকদের পিত্তি সাহিত্যিকদের ঘাড়ে চাপে। তা সত্ত্বেও আমি মনের মণিকোঠায় ঢুকতে পেরেছি। দুর্মূল্য দুষ্প্রাপ্য টিকিট পেয়ে থিয়েটারে, অপেরায়, সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করেছি। তা ছাড়া পি. ই. এনের কল্যাণে পার্টিতে গেছি, ভবানী ভট্টাচার্যের আর আমার খাতিরে পার্টি দেওয়া হয়েছে। প্যারিসে পি. ই. এনের অতিথিশালায় বিনা ভাড়ায় থেকেছি। লেখকদের মধ্যে ন্যাশনালিজমের চেয়ে আন্তর্জাতিকতাই প্রবল।

এক জীবনে কেই বা কতটুকু দেখতে পারে? দেখলে লিখতে পারে? লিখলে স্থায়ী সম্পদ রেখে যেতে পারে? বেশীর ভাগই হয়ে যায় সমসাময়িক বিবরণ। তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যেমন মেগাস্থেনিস বা হিউয়েন ৎসাঙের। তাঁরা কেউ সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁদের ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যও নয়। আমি বরাবরই সাহিত্যসচেতন, আর্টসচেতন। তা বলে আমার ভ্রমণকাহিনী রসোত্তীর্ণ হয়েছে এমন কথা আমি বলব না। কালোত্তীর্ণ হবে কি না মহাকালই জানেন।

ভ্রমণবিরতি

ছেলেবেলায় দেশভ্রমণের শখ ছিল ষোল আনা, কিন্তু পকেটে এক আনাও ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছিল একখানা য়্যাটলাস। সেখানকার সবটা ছিল আমার নখদর্পণে। য়্যাটলাস খুলে বসে আমি অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো দিগ্বিজয় করে আসতুম। বড়ো হয়ে অনেক দেশ বেড়িয়েছি, দেশভ্রমণের সাধ ষোল আনা না হোক পাঁচ আনা মিটেছে। বাকী এগারো আনাও কে জানে কবে মিটবে! কিন্তু ততঃ কিম্!

ততঃ কিম্ শুনে আপনারা হয়তো অবাক হবেন। আমিও এক কালে অবাক হতুম যদি কেউ বলত, কী হবে এত দেশ বেড়িয়ে। গণেশ তার জননীর চতুর্দিক পরিক্রমা করে বিশ্বপরিক্রমার ফল পেয়েছিলেন। কার্তিক সারা জগৎ ঘুরে মিছে হয়রান হলেন। যা ঘরে বসেই পাওয়া যায় তার জন্যে কে-ই বা যায় বাইরে টো-টো করতে! এ ধরনের কথা শুনলে কেবল যে অবাক হতুম তাই নয়, হতাশ হতুম এ দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে বিদেশীরা আসত এ দেশে বাণিজ্য করতে, এ দেশের ধন-দৌলত লুঠ করতে। ঘরে বসেই যদি এসব মিলত তবে কেন তারা এতদূর আসত? আর আমাদের পূর্বপুরুষরাই কি একদা সাত সমুদ্রে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাননি? ধরণীর ঐশ্বর্য হরণ করে আনেননি?

ততঃ কিম্‌কে তখনকার দিনে আমি উপহাস করেছি, ধিক্কার দিয়েছি তারুণ্যের অভাব বলে। কিন্তু আমার নিজেরই মন এখন প্রশ্ন করছে, ততঃ কিম্? ততঃ কিম্? তবে কি আমার নিজেরই তারুণ্যের অভাব ঘটল? বয়স বাড়তে বাড়তে চল্লিশ পার হয়েছে, পাকা চুল দেখা দিয়েছে মাথায়। জরার জয়ধ্বজা শীর্ষে বহন করে আমিও কি এখন গণেশের মতো স্থবির হয়েছি?

তা নয়। ইংরেজীতে বলে, ফার্স্ট থিঙ্গস ফার্স্ট। প্রথম কাজটি প্রথমে। যতক্ষণ না প্রথম কাজটি শেষ হয়েছে ততক্ষণ দ্বিতীয় কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রথম কাজ দেশকে স্বাধীন করা। এর জন্যে তাঁকে সমস্তক্ষণ ভারতবর্ষেই থাকতে হচ্ছে। নানা দেশের আমন্ত্রণ তিনি বার বার প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন। গত পঁচিশ বছরে তিনি একবার মাত্র বিদেশে গেছলেন রাউণ্ড টেবল কন্‌ফারেন্সে স্বাধীনতার দাবি পেশ করতে। স্বাস্থ্যের জন্যে সিংহলে যাওয়াটা বাদ দিচ্ছি। অথচ এই গান্ধীই এক কালে ভারতের বাইরে সারাটা যৌবন অতিপাত করেছেন। তখন তাঁর হাতের কাজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। সে কাজ শেষ না করে অন্য কাজ হাতে নিলে অন্যায় করতেন।

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমি যে কাজ হাতে নিয়েছি সেটি শেষ না করে আমার ছুটি নেই। সেই কাজটির খাতিরে আমাকে আপাতত সমস্ত যৌবন অতিবাহিত করতে হবে। আমার কর্মক্ষেত্র বাংলা দেশ। কারণ আমি বাঙালী সাহিত্যিক। এখন আর আমি প্রবাসী বাঙালী নই। মাঝে মাঝে পরিবর্তনের জন্যে আমি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাব, ভারতের বাইরেও যেতে পারি। কিন্তু মন পড়ে থাকবে এখানে। এই বাংলা দেশে। কারণ এ যে আমার কর্মক্ষেত্র। আমার সাহিত্যের কাজ আমার প্রথম কর্ম। সাহিত্যের মধ্যে একটা সহিতের ভাব আছে। সকলের সহিত একাত্ম না হলে সাহিত্য হয় না। কী করে একাত্ম হব, যদি একত্র না থাকি? বাংলার সাহিত্যিককে তাই বাঙালীর সঙ্গে একত্র বাস করে একাত্ম হতে হবে। সেইজন্যে আমাকে দীর্ঘকাল দেশভ্রমণের আশা ত্যাগ করতে হবে।